রঙ্গলাল রচনাবলী

॥ একখণ্ডে সম্পূর্ণ ॥

সম্পাদক

ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

ও

শ্রীহরিবন্ধু মুখটি
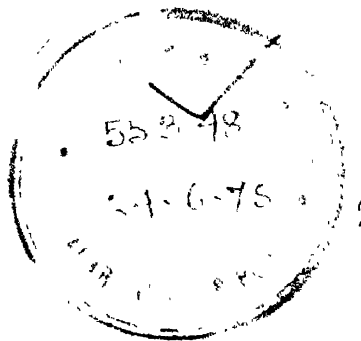
দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : ১লা আশ্বিন ১৩৬১

মূল্য : শোভন—পঁচিশ টাকা
সাধারণ—কুড়ি টাকা

নবীনচন্দ্র গ্রন্থ প্রচার সমিতির পক্ষে শ্রীসঞ্জীব দত্ত চৌধুরী কর্তৃক সমিতির কার্যালয়
১৩৬, রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, দমদম, কলিকাতা—২৮ হইতে প্রকাশিত এবং
স্বকল্যাণী প্রেস ১৫বি, বিনোদ সাহা লেন, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক
সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়
সত্যেন্দ্রনাথ বসু'র
পুণ্য স্মৃতির
উদ্দেশ্যে

প্রকাশকের নিবেদন

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়"-এর কবি শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাবলী গ্রথিত করা হ'লো। এ গ্রন্থখানি তাঁহার সাহিত্যকৃতির পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ তা' বলছি না। কারণ যে সমস্ত পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনাগুলো বেরুত, সেগুলোর বেশির ভাগই আজ বিলুপ্ত হ'য়েছে। আরও বেশ কয়েক দশক আগে যদি কেউ কবিবরের প্রতি সহৃদয় হয়ে তাঁর রচনাবলী প্রকাশে সচেষ্ট হ'তেন, তাহলে আজ আর আমাদের এ অনুতাপ করতে হতো না। চেষ্টা যে না হয়েছে এমন নয়; তবে এ কথা মানতেই হবে যে সে প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। শোভাবাজারের আদর্শচরিত্র বিদ্যানুরাগী রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রেরণায় শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী প্রথম প্রকাশ করেন (১৩১২ সাল) হিতবাদী কার্যালয় থেকে। এই সঙ্কলনে কবিবরের পাঁচখানা বিখ্যাত কাব্য এবং একখানা খণ্ড-কাব্য সংযোজিত হয়েছিল। রঙ্গলালের নিবন্ধ, কবিতা, গান, হিন্দী দোঁহার অনুবাদ বা নাটক তাতে স্থান পায় নি। কাব্য বিশারদ মহাশয় রঙ্গলালের সমস্ত কাব্য ও কবিতার স্বত্ব কিনে নিয়ে আর কারো পক্ষে পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশের পথে একটা মস্ত বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। তিনি হিতবাদী সংস্করণে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন, "এই পুস্তকের ও রঙ্গলাল-কৃত যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ ও কবিতার স্বত্ব তাঁহার উত্তরাধিকারী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমি ক্রয় করিয়া লইয়াছি। এক্ষণে এই সকল গ্রন্থে হিতবাদীর স্বত্ব রহিল। গ্রন্থস্বত্ব বিধানানুসারে রেজেস্টরি করিয়া রাখিলাম।" রঙ্গলালের কাব্যগুলোই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে স্বীকৃত; এগুলোকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রচনার সঙ্কলন প্রকাশ লাভজনক ব্যবসা হবে না—এ ভেবেই হয়তো কোনো প্রকাশক একাজে উৎসাহী হন নি। কাব্য বিশারদমহাশয় বর্ধিত কলেবরে কবিবরের গ্রন্থাবলীর আর কোন সংস্করণও প্রকাশিত করলেন না, আর কাউকে প্রকাশ করার সুযোগও দিলেন না। ফলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিবরের যে সমস্ত রচনা ছড়িয়ে পড়ে রইলো তা, আর-কেউ গ্রথিত করে রাখার সুযোগ পেলেন না। এরও অনেক বছর পরে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির রঙ্গলালের কাব্যগুলো জনসাধারণের কাছে পরিবেশনে প্রচেষ্ট হন। বসুমতী সংস্করণেও হিতবাদী সংস্করণ অপেক্ষা কোন কিছু বেশী সঙ্কলিত হয় নি। ফলে রঙ্গলালের অনেক রচনাই মহাকালের কোলে স্থান করে নিয়েছে যা আর কোনদিনই উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

কবিবরের যে সমস্ত রচনা এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব তার সকলই এই সংকলনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আমাদের সম্পাদক মহাশয়রা সংযোজিত করেছেন। একশ বছরেরও বেশী পুরোন পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠোদ্ধার করা যে কি দুরূহ কাজ হয়ে পড়ে ছিল—তা ঠিক লিখে প্রকাশ করা যাবে না। এ দুঃসাধ্য কাজটি যথেষ্ট ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন অন্যতম সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীহরিবন্ধু মুখটি। এই একনিষ্ঠ সেবার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যের যে উপকার সাধন করলেন, তারজন্য প্রত্যেক সাহিত্যরসিকের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে রইলেন।

এই রচনাবলী প্রকাশের জন্য যাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম উল্লেখ করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয়

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। তিনি রচনাবলী ছাপার জন্য সমিতির অনুকূলে আংশিক সরকারী অনুদান মঞ্জুর করে আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছেন। [চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী— আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রসারকল্পে পশ্চিমবঙ্গসরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের স্বলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে।] দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপক ডঃ অলোক রায়। তিনি তাঁহার আবাসিক গ্রন্থালয়টি যথেচ্ছ ব্যবহারের স্বযোগ দিয়ে আমাদের অশেষ সহায়তা করেছেন। কবিবরের জন্মভূমি বাকুলিয়া গ্রামনিবাসী, "মহাকবি রঙ্গলাল স্মৃতিরক্ষা কমিটির" সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং "বাকুলিয়া অগ্রগামী সংঘে"র সাধারণ সম্পাদক শ্রীস্বনীল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় কবিবরের সম্পর্কে অনেক তথ্য সরবরাহ করে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা গত ৭ই পৌষ ১৩৮০ সালে আমাদের সমিতির সভাপতি ডঃ বিনোদ-বিহারী দত্ত, সহ-সভাপতি শ্রীকালিপদ সেন ও শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, সম্পাদক ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত এবং আমাকে কলিকাতা থেকে গাড়ী করে কবির জন্মদিনে বাকুলিয়া নিয়ে গিয়েছিলেন কবির জন্মভিটা দেখাবার জন্য। ঐদিনই ডঃ বিনোদ বিহারী দত্ত মহাশয়কে দিয়ে কবির জন্মস্থানে রঙ্গলাল স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করান হয়। তাই এঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আর বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রীশিবদাস চৌধুরীর আন্তরিক সহযোগিতায়। তাঁর সাহায্য ছাড়া ইংরাজী রচনাগুলো প্রকাশ করা সম্ভবপর হতো না। সহযোগিতা করেছেন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির কর্মীবৃন্দও। এঁদের সকলকে জানাই আমরা ধন্যবাদ। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার রায়কে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তিনি আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। পরিশেষে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও শ্রীমতী শিপ্রা সরকারকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বইখানির আগাগোড়া প্রুফ দেখেছেন। নির্ভুল ছাপার কৃতিত্ব সবটুকুই তাঁদের। তবে সম্পূর্ণ নির্ভুল ছেপে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছি এবিশ্বাস আমার নেই।

১লা আশ্বিন বইটি বের হওয়ার কথাছিল এবং সেই অনুযায়ী টাইটেল ছাপাও হয়েছিল কিন্তু প্রেস ছাপা শেষ করতে না পারায় আজ শুভ মহালয়ার দিনে বইটি প্রকাশ করা হলো।

—ইতি

সঞ্জীব দত্তচৌধুরী

নিবেদন

সিপাহী বিদ্রোহ—১৮৫৭ সাল : পরাভূত হ'লেও এই বিদ্রোহ এক নবশক্তির সূচনা করলো, জাতীয় জীবনে জাগালো নবচেতনা।

১৮৫২ সালে 'বীটন-সোসাইটি'তে বাংলা কবিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়, প্রবন্ধে অন্যতম বক্তব্য ছিল যে, বাঙ্গালীরা দীর্ঘ পরাধীনতার মানসিক অস্বাচ্ছন্দে আচ্ছন্ন বলেই উৎকৃষ্ট কবিতা রচনায় অক্ষম ছিল। এক মাসের মধ্যেই রঙ্গলাল বীটন সোসাইটিতে প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পাঠ করেন। রঙ্গলালের মনোভাব তাতেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে : প্রকাশ পায় বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর মমতা এবং দেশপ্রেম।

১৮৫৮ সাল : সমস্ত ভারতবর্ষ সন্ত্রস্ত, ব্যক্তি-স্বাধীনতা অবলুপ্ত। ঠিক এই সময় দেশপ্রেমিক বাঙালি-কবির অমর-কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হ'লো। বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষায় যথেষ্ট শিক্ষিত না হ'লেও অন্তরস্থ দেশপ্রেমের স্থির-লক্ষ্য তাঁকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গভীর এবং প্রখর ইতিহাস জ্ঞান 'স্বাধীনতা-হীনতা'র যুগে কবিকে নিয়ে গিয়েছিল রাজস্থানের সমৃদ্ধ সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথায়। কবি কিন্তু নিশ্চিন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেই ইতিহাসকে কেন্দ্র ক'রে শুনিয়েছেন সমসাময়িক জীবনের কথা। গ্রীক কবি-নাট্যকারদের মতই এ কাজটা তিনি সুচারু-ভাবে করেছেন—"The stories which are the subjects of Greek tragedies were drawn, with very few exceptions, from the great body of legend and tradition known as Greek mythology...Thus the action was set in the remotest past. But the Attic poets were not historical novelists, and though they might draw some antique colour from the old epic poems which were in many cases their immediate source, the background of the action was largely the Greece of their own day." [Lucas : The Greek Tragic Poets].

ব্যক্তিগত সাধনালব্ধ দূরদৃষ্টি থেকে রঙ্গলাল বুঝেছিলেন যে, মার্জিতরুচি পাঠক-শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাই 'উলঙ্গ আদিরসের' কবিতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার ক'রে নারীত্বের মহিমা প্রদর্শনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মধ্যযুগে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন নারীত্বের গৌরবোজ্জ্বল মহিমান্বিত মূর্তিকে নূতন যুগোপযোগী ক'রে প্রকাশ করলেন তিনি।

দেশের আত্মায় ইউরোপীয় কায়া যুক্ত করার একটা অর্ধচেতন অদৃশ্য চেষ্টা চলছে তখন। রঙ্গলাল তাঁর কাব্যের বহিরঙ্গ রূপ আনলেন ইংলণ্ডীয় রীতি থেকে। কাব্যের আত্মাকে সাজালেন বাছাই করা স্বপ্নগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে। সব দিক দিয়েই নূতন যুগের স্পষ্ট পদধ্বনি শোনা গেল তাঁর কাব্যে।

— শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

---

* প্রেসের এবং সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয়ের ভুলের জন্য গ্রন্থপরিচিতি ৫৪৯ এর স্থলে ৫৫৯ ছাপা হয়েছে। পাঠকদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন এই (১০পৃষ্ঠা) ভুল ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন

ভূমিকা

ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল : স্বদেশ-প্রেম ও ভারত চেতনা

বাংলা সাহিত্য তথা বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসে রঙ্গলালের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, রসগ্রাহী সমালোচক ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আজো সে কথা অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে। রঙ্গলালের পূর্বগামী ঈশ্বর গুপ্তকে যেমন 'যুগসন্ধির কবি' ও 'খাঁটি বাঙ্গালি কবি' বলা হয়েছে, তেমনি রঙ্গলাল 'বাংলা কাব্য-সাহিত্যের' নবযুগের প্রধান প্রবর্তক* বলে অভিহিত হয়েছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাল্য জীবনের কাব্য সাধনার গুরু ও উৎসাহ-দাতা ঈশ্বর গুপ্তকে 'খাঁটি বাঙ্গালী কবি' হিসাবে তার বৈশিষ্ট্যের বা দোষগুণের উল্লেখ করেছেন ও তাঁর কবিতাকে 'রাম প্রসাদের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তকে শুধু একটা বিশিষ্ট দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করেই বঙ্কিমচন্দ্র তাকে খাঁটি বাঙ্গালি কবি বলে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছেন,—ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যাবলী রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের রচনার মতো প্রতীচ্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নি, তাই বলতে গেলে ঈশ্বর গুপ্ত মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। আমরা জানি বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি ঈশ্বর গুপ্ত পরম শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরানুকরণ ও পাশ্চাত্য চর্চার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীগণকে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন, মিশনারীদের ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ রক্ষণশীল না হয়েও সে যুগের সমাজ সংস্কার আন্দোলন নিয়ে স্থূল ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে গেলেন। কিন্তু সমগ্র ভারতের আত্মার বাণী তার চিন্তায় প্রতিফলিত হয়নি, তার রচনায়ও 'ভারত চেতনা' বা 'ভারত বোধের' কোনো নিদর্শন নেই, তথাপি তিনিই প্রথম বাঙ্গালী জাতিকে স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের দীক্ষা দান করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ প্রেম সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির ভেতর সীমাবদ্ধ হলেও তিনিই প্রথম গেয়েছিলেন—

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেম পূর্ণ নয়ন মেলিয়া,
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'

তথাপি, ঈশ্বর গুপ্তের ওপর তার পরিবেশ, তৎকালীন ধর্মান্দোলন ও বাঙ্গালী জীবনে সংস্কৃতি-সঙ্কট প্রভৃতির প্রভাবের কথা চিন্তা করলে তাকে খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলা চলে না। এ বিষয়ে আমি আমার 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে' সবিস্তারে আলোচনা করেছি, ঈশ্বর গুপ্তের 'ঈশ্বর বিষয়ক কবিতার' ওপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছি।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে আর একটি কথাও আমাদের স্মরণীয়। 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কিশোর বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা সাগ্রহে নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। 'রঙ্গলালে'র চরিতকার মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন—

'ঈশ্বর গুপ্ত প্রতীচ্য কাব্যসাহিত্য পাঠে বিভোর নবীন কবিগণের নূতন আদর্শে রচিত কবিতাবলী সানন্দে স্বীয় পত্রে প্রকাশিত করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষায় গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য

---

* রঙ্গলাল, মন্মথনাথ ঘোষ।

উৎসাহ দান করিয়া ছিলেন। (পৃঃ ৫৪) তাই সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত সমগ্র রচনাই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না, অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি ছিলেন' এই মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। আবার ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীকে স্বদেশ প্রেমে উদবুদ্ধ করলেও তাঁর এই স্বদেশ-চেতনার মূলে রয়েছে পরিবেশের প্রভাব, এটা খাঁটি স্বদেশী জিনিস নয়, তাই প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোথাও এই ধরনের স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে এ কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা চলে যে তিনি বাঙ্গালী জাতিকে,—তার আহার-বিহার, চাল-চলন, রীতি-নীতিকে ভালোবাসতেন, তার ধর্মানুষ্ঠানকে তার গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শকে, বাংলার ধর্মপ্রাণা মেয়েদের ব্রত-আচার-পাল-পার্ব্বণ প্রভৃতিকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি গভীর কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন—
—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড়ো শত্রু ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বাঙ্গালী কপটতা, অন্ধ পরানুকরণ, ভয়াবহ পরধর্ম-গ্রহণ প্রভৃতি পরিহার করে খাঁটি মানুষ হয়ে উঠুক। বাংলার বাউলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি বলতে পারতেন—

'ভিতর বাহির দুই সমান রেখো ভাই
মানুষ যদি হতে চাও।'

ঈশ্বর গুপ্তের ভেতর যে শুধু ভারত-বোধ বা ভারত-চেতনার অভাব ছিল, তাই নয়, ভারতের পরাধীনতায় তীব্র বেদনা-বোধও ছিল না। তিনি সিপাহী যুদ্ধ-বিষয়ক যে সকল কবিতা লিখেছেন, তাতে তিনি বলদৃপ্ত ইংরেজের শৌর্য বীর্যের প্রশংসা করেছেন এবং বিদ্রোহী সিপাহীদের ধৃষ্টতাকে কশাঘাত করেছেন। এমন কি, বীরাঙ্গনা ঝান্সির রাণী ও দুর্দ্ধর্ষ বীর নানা সাহেবকে গ্রাম্য ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন। এই সব কবিতা পাঠ করে আমাদের মনে গভীর ক্ষোভেরই সঞ্চার হয়। তাই আমি অন্যত্র লিখেছি, ঈশ্বর গুপ্তের ভেতর একটা দ্বৈতসত্তা ছিল, তাঁর ভেতর এক দিকে ছিল স্বাজাত্যাভিমান এবং সেই জন্যে তিনি মোহগ্রস্ত বাঙ্গালীকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এবং অপর দিকে ছিল অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত, সভ্যতাগর্ব্বী ইংরেজের প্রতি একটা বিস্ময় মিশ্রিত সম্ভ্রমবোধ। তাই বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্যের প্রবর্ত্তক রঙ্গলালের ভেতরেই আমরা সর্ব্বপ্রথম সর্ব্ব-ভারতীয় চেতনা ও ভারতের পরাধীনতায় বেদনাবোধ লক্ষ্য করে থাকি। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের ভেতর যে অকৃত্রিম বাঙ্গালী-প্রীতি আমরা লক্ষ্য করি, রঙ্গলালের রচনায় তার সাক্ষাৎ পাই না। রঙ্গলাল যে সময় ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন বাংলা সাহিত্য বা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস রচিত হয় নি, বিদেশী ঐতিহাসিকগণ, তখন বাঙ্গালী চিরদিন ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বল এই মিথ্যা অপবাদ-প্রচারে পঞ্চমুখ, আর এইরূপ অপপ্রচার দ্বারা রঙ্গলাল যে প্রভাবিত হন নি, তা বলা যায় না। রাজপুতদের বীরত্ব-কাহিনীই রঙ্গলালকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে, তাই তিনি লিখেছেন—

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধান কালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত…এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকতাগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

'কর্ম্মদেবী' নামক আখ্যান-কাব্যে রঙ্গলাল বাঙ্গালী চরিত্রের ভীরুতা, পৌরুষহীনতাকে ও কাপুরুষতাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—শিশুর ক্রীড়ার ভেতর দিয়েই একটা জাতির চরিত্র প্রতিফলিত

হয়। বাংলার লোক যে সাহসহীন, বিলাসী, ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত, বাঙ্গালী শিশুর পুতুল-খেলার ভেতরই তার আভাস পাওয়া যায়। রঙ্গলাল লিখেছেন—

'যে দেশে যেরূপ বৃত্তি, সেইরূপ মতি।
সেইরূপ ক্রীড়ারস, সেইরূপ রতি ॥
শৈশব হইতে সেই দিকে চিত্ত ধায়।
অন্যরস, অন্যরূপ ক্রীড়া নাহি চায় ॥
যথা বাঙ্গালার লোক নহেক সাহসী।
নারীপ্রিয়, কেলিকলা-কৌতুক-বিলাসী ॥
শিশুর পুতুলে দেখ আভাস তাহার।
কামকলা ছলা তাহে প্রত্যক্ষ প্রচার ॥...
পশ্চিমের প্রজাপুঞ্জ পুরুষার্থ চায়।
সেই মত দেখহ শিশুর খেলনায় ॥'

কিন্তু রঙ্গলালের এই বিদ্রূপাত্মক পঙ্‌ক্তিগুলি কি বাঙ্গালী-প্রীতিরই নিদর্শন নয়? বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়তো সামান্য ছিল, প্রাচীন বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্যের কাহিনী সম্পর্কেও সে কালের শিক্ষিত বাঙ্গালীরা প্রায় অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু রঙ্গলাল সে যুগের বাঙ্গালী-চরিত্রে বলিষ্ঠ পৌরুষের অভাব দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর অন্তরের বেদনা থেকেই ব্যঙ্গাত্মক পঙ্‌ক্তিগুলি উৎসারিত হয়েছিল। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে রঙ্গলালের ভেতর বাঙ্গালী প্রীতির অভাব পরিলক্ষিত হলেও তিনি চেয়েছিলেন, বাঙ্গালী খাঁটি মানুষ হোক। পরবর্তী কালে নবীনচন্দ্র ও বলেছিলেন—

'স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
অথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত,
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়,
কার্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।'

'দুরন্ত আশা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব', তিনি বলেছেন এই ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে উল্লসিত, কর্ম্মবিমুখ, তর্কপ্রিয় বাঙ্গালী হয়ে জন্মগ্রহণ করার চাইতে স্বাধীন, দুর্দ্ধর্ষ আরব বেদুঈন হওয়া বহুগুণে বাঞ্ছনীয়। আবার স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসও বাঙ্গালীর তোষামোদ-প্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—

'বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়,
হেন ঘোর মিথ্যাভাষী,
অনুগ্রহ-অভিলাষী,
জগতে ধনীর দাস আর কেহ নয়।'

এই সব কবিতা কী একই উৎস-মুখ থেকে উৎসারিত হয় নি? স্বজাতির দুর্গতিতে বেদনা বোধ কী স্বজাতি-প্রীতিরই নিদর্শন নয়?

বাস্তবিক, রঙ্গলাল মনে-প্রাণে বাঙ্গালীকে ভালোবাসতেন, বাংলার সাধনা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিন্দা শুনলে ক্ষুব্ধ হতেন। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় নিষ্ণাত ছিলেন বলেই তাঁর বাঙ্গালী-প্রীতি ঈশ্বর গুপ্তের মতো অন্ধ বা বিচারবিহীন ছিল

না। বাঙ্গালী পাঠককে বীরত্ব ও মহত্ত্বের কাহিনী শুনিয়ে তিনি তাদের মনুষ্যত্বের সাধনায় উদবুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যকে তিনি অশ্লীলতারূপ কলুষ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যে প্রেম দুঃখ বরণ ও আত্মত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি সেই প্রেমকে মহিমান্বিত করেছিলেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি শক্তিসাধকগণ ও বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিয়ালগণ তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি এক সময়ে কবির দলের 'কবি' নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং কয়েকটি 'কবির গানের পালা রচনা করেছিলেন। 'রঙ্গলালের' চরিতকার মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন,—

'রঙ্গলাল সাধক কবি রামপ্রসাদ ও ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শে শক্তি ও বিষ্ণু বিষয়ক অনেকগুলি সুমধুর প্রাণস্পর্শী ভক্তিগীতি রচনা করিয়াছিলেন'।* বাস্তবিক, রঙ্গলাল শুধু স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভক্ত। রঙ্গলাল কবি ছিলেন, কিন্তু কবি রঙ্গলালের চেয়েও মানুষ রঙ্গলাল ছিলেন বড়ো।

এ যুগের পাঠক কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটির সঙ্গে পরিচিত। বৈষ্ণব মহাজনের দৃষ্টিতে নিত্য বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধার নিত্য লীলা চলেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাই যে তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে এক পাদও যেতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধা স্বরূপতঃ অভিন্ন হয়েও রস-আস্বাদনের জন্যই দেহভেদ স্বীকার করেছেন। তাই শ্রীরাধার মনে হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় কুঞ্জবন অন্ধকার করে চলে গেছেন। রঙ্গলালের একটি গানে শ্রীরাধার এই বিরহ এমন চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করেছে যাতে মনে হয় তিনি মহাজনগণের ভাবধারার ধারক ও বাহক। রঙ্গলাল লিখেছেন—

'দেখ ওগো বৃন্দে, বিহনে গোবিন্দ, শূন্যময় কুঞ্জবন।
জলশূন্য সরোবর, অলিশূন্য ইন্দীবর,—
প্রাণশূন্য কলেবর, হরিশূন্য বৃন্দাবন।
শুনেছি সই এ সংসারে, একান্তে যে ভাবে যারে,
তন্ময় হয় সে জন, কহে জ্ঞানিগণ,—
আমি তো সই নিরন্তর, ভাবি সে শ্যামসুন্দর,
তবে কেন কৃষ্ণগত না হয় জীবন,
কহে রঙ্গ, তব হরি, বৃন্দাবন পরিহরি,
এক ক্ষণ নাহি রন, কথা পুরাতন।
ভাব দেখি আত্ম ভাবে, এখনি তাহারে পাবে,
বল গো কোথায় যাবে, তব কৃষ্ণবর্ণ'।†

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রঙ্গলালের শ্রীমতী রাধা কিন্তু মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের রাধার মতো প্রাকৃত নায়িকা নন। রঙ্গলাল বৈষ্ণবীয় অপ্রাকৃত সাধনার একেবারে মর্ম্ম-মূলে প্রবেশ করেছেন। মধুসূদনের চরিতকারেরা বলেছেন, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েও শ্রীমধুসূদন ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালী। এ কথা অস্বীকার করা চলে না, তথাপি তাঁকে কিছুতেই বৈষ্ণব মহাজনদের ভাব-সাধনার উত্তরাধিকারী বলা যায় না।

*রঙ্গলাল,—মন্মথনাথ ঘোষ, পৃ—৮৪
†রঙ্গলাল—মন্মথনাথ ঘোষ, পৃঃ ৮৬ - ৮৮।

জয়দেবের গীতিগোবিন্দের 'মধুর কোমলকান্ত-পদাবলী' ও বিদ্যাপতির শব্দচয়ন-নৈপুণ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছে সত্য কিন্তু শ্রীমতী রাধার যে দুর্নিবার প্রেম তাঁকে সমাজের শৃঙ্খল ভগ্ন করে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে আকুল করেছে, তিনি সেই প্রাকৃত প্রেমেরই মহিমা গান করেছেন। এ ক্ষেত্রে রঙ্গলালই বৈষ্ণবীয় ভাব-সাধনার যথার্থ ধারক ও বাহক।

রঙ্গলালের চরিতকার মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় রঙ্গলাল রচিত দুটি বাৎসল্য রসের পদ উদ্ধৃত করেছেন,—একটি পদে তিনি বৈষ্ণব পদকর্তাদের ও অপর পদে শাক্ত সাধকদের ভাবের অনুসরণ করেছেন। এই দুটি পদেই কবির অনুভূতির গভীরতা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। আমরা পদ দুটি নিম্নে উদ্ধৃত করছি। প্রথম পদে মা যশোদার স্নেহধারা নির্ঝরের ধারার মতো স্বত উৎসারিত—

'আয় আয় আয়রে, আয় যাদু আয়রে,
আয় কোলে আয়রে।
কেমনে ভুলিয়ে ছিলি অভাগিনী মায় রে।
গোঠে পাঠাইয়ে তোরে, সারাদিন আঁখি ঝোরে,
অবিরত দুগ্ধ ক্ষরে স্তন ফেটে যায় রে।
ক্ষুধায় আকুলী ব্যাকুলী, সর্বাঙ্গে ধূসর ধূলি,
কেহ ননী মুখে তুলি দেয়নি তোমায় রে॥
তুমি হে অন্ধের নড়ি, কৃপণের ধন-কড়ি,
না দেখিলে এক ঘড়ী, ঘটে ঘোর দায় রে॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু, যুক্ত তব মুখ-ইন্দু,
হেরি মম দুঃখসিন্ধু, উথলিত হায় রে।
কহে রঙ্গ চমৎকার, পুত্রস্নেহ যশোদার,
এমন জগতে আর না দেখি কোথায় রে॥

আর একটি বিজয়ার গান, এই গানে মেনকার কন্যা-বিচ্ছেদের বেদনা অভিব্যক্ত।

ওহে গিরি দিনকর হইল উদয়।
উমা শরদের শশী অস্তগত হয়।
ওই দেখ গিরিরায়, প্রাণকুমারী গিরিজায়
শিবালয়ে লয়ে যায়, জামাতা নিদয়॥
ওহে গিরি কালযামিনী, কি পুরুষ কি কামিনী
সুখে ছিল সমুদয়—
আজ আমায় হয়ে নিদয়া,—ছেড়ে যায় অভয়া,
মায়াহীন মহামায়া—কঠিন হৃদয়। †

সাধক কবি শ্রীরামপ্রসাদ যে বাৎসল্যরসসিক্ত আগমনীর ও বিজয়ার গানের প্রবর্তন করেছিলেন, মধুসূদনের কবিচিত্তে তার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। মেঘনাদবধ ও প্রমীলার চিতারোহণের পর শোকাকুলা লঙ্কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে,
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'।

---

* রঙ্গলাল, পৃঃ ৮৯।

† রঙ্গলাল, পৃঃ ৮৮।

পাশ্চাত্ত্য দেশে অবস্থান-কালে শ্রীমধুসূদন যে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেছেন, তাতে বাঙ্গালী কবি মধুসূদনের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে। তিনি বিজয়া সম্পর্কে যে সনেটটি রচনা করেছেন, তাতে আসন্ন কন্যাবিচ্ছেদের ভাবনায় শোকাকুলা মাতা মেনকার অন্তরের বেদনা কী চমৎকার প্রকাশলাভ করেছে। তাই বলতে হয়, বাৎসল্যরসে-স্নিগ্ধ শাক্ত পদ রচনায় রঙ্গলাল ও মধুসূদন উভয়েই অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছেন।

আবার শ্রীমধুসূদনের ওপর বিদ্যাপতি, জয়দেব, কৃত্তিবাস (বা কীর্ত্তিবাস), কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদের প্রভাব থাকলেও তাঁর রচনার কোথাও যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বা শ্রীমন্নিত্যানন্দের উল্লেখ নেই, এটা বিস্ময়কর। এ যুগের কবি যে গৌরাঙ্গদেব বা নিমাই সম্পর্কে বলেছেন—'বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া', তিনি ও তাঁর পরিবারবৃন্দ বা লীলাসহচরবৃন্দ বাংলায় তথা ভারতের নানা অঞ্চলে যে নব-জাগরণের প্রবর্ত্তন করেছিলেন, যে নূতন অলঙ্কার-শাস্ত্র ও জীবন-দর্শন পরিবেশন করেছিলেন, ভাগবত-ধর্ম্মের ওপর যে নতুন আলোক-পাত করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। রঙ্গলাল এ বিষয়ে শ্রীমধুসূদনকে অতিক্রম করেছেন। রঙ্গলালও বিদ্যাপতি ও জয়দেবের পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কন চণ্ডী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন, এমন কি, ত্রিপুরার রাজবংশীয়দের কাহিনী 'রাজমালার' সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল, অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দের লীলা তাঁকে গভীরভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। কার্য্যোপলক্ষে উড়িষ্যায় অবস্থানকালে তিনি 'উৎকলভাষোদ্দীপনী' সভায় যে বক্তৃতা করেছিলেন এবং যা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রবর্ত্তিত 'রহস্য-সন্দর্ভে' প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তিনি বলেছেন—

"ধর্ম্মান্দোলনের প্রভাবে সাহিত্যের যে অভাবনীয় উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে বিদ্যাপতি, * চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ অপূর্ব্ব পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। তারপর শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের সময়ে এই সাহিত্য বিপুল আকার ধারণ করে। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতেও এক দিকে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ ও অপর দিকে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মপ্রচারের ফলে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।" অবশ্য, এই যুগে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারও বাংলা সাহিত্যের দ্রুত উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করেছে।

বাংলার সংস্কৃতির প্রতি কবি রঙ্গলালের শ্রদ্ধা কতখানি গভীর ছিল, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলে 'স্বপ্নাবেশে দেশভ্রমণ' কবিতায়। এই কবিতাটি 'রহস্য সন্দর্ভে' প্রকাশিত হয়েছিল। রঙ্গলালের চরিতকার লিখেছেন—

'এই কবিতায় কবি শ্রীকুল্লুক ভট্ট, জয়দেব, রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বাঙ্গালীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন'।

এই কবিতায় কবি বাংলার অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান দুর্গতির কথা স্মরণ করেছেন। রঙ্গলাল ভক্তকবি বলেই বাংলার ভাবমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছেন। জয়দেবের কবিত্বকে তিনি

* সেকালের সমালোচকগণ মৈথিল কবি বিদ্যাপতিকে বাংলার আদি কবি বলে বিশ্বাস করিতেন।

'বাংলার কীর্তিকল্পলতিকার মূল' বলেছেন। বাস্তবিক জয়দেবই মধুর কোমল পদাবলীর প্রবর্ত্তক। শুধু তাই নয়, জয়দেব ভক্ত ও রসিক কবি, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরা লীলায় জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত ও রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক তাঁর অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে আস্বাদন করতেন। দুঃখের বিষয়, এ যুগের কয়েকজন বরেণ্য বাঙ্গালীও জয়দেবকে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের কবি বলে অভিহিত করেছেন। শ্রদ্ধাবান রঙ্গলাল ধ্যানে যে জয়দেবকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি কিন্তু ভাবুক ও রসিক কবি।

'দেখিলাম এক দ্বিজ মত্তচিত্ত গানে,
উপনীত নারায়ণ—ক্ষেত্র সন্নিধানে,
মুখে 'জয় জগদীশ হরে' অবিরাম,
শুনিলাম কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর ধাম।
এমন মধুর গাথা আর নাহি হবে।
কে বলে ধরায় নাহি অমৃত সম্ভবে॥
শব্দসিন্ধু ভাবসিন্ধু করিয়া মন্থন,
শ্রীগীতগোবিন্দ সুধা করিল গ্রন্থন'॥

আবার রঙ্গলালই হচ্ছেন প্রথম বাঙ্গালী কবি যিনি বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার মনে পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে জাগ্রত করেছিলেন। মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের মুখে এ কথা শুনেছি। তিনি বলেছেন—বাংলার কাব্য-সাহিত্যে রঙ্গলালের আবির্ভাবের পর ঈশ্বর গুপ্তের কবি-যশ অনেকখানি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও হাস্যরসিক অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেছেন—

"ঈশ্বর গুপ্তের 'মিউটিনি' প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও যিনি নব্য বঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্র উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশ-হিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল'।

রঙ্গলাল এই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ করেছিলেন টমাস মুর, স্কট, বায়রণ প্রভৃতির কবিতা থেকে। শ্রীমধুসূদনের মতো রঙ্গলালও ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গেও রঙ্গলালের গভীর পরিচয় ছিল, তিনি মহাকবি কালিদাস-রচিত কুমারসম্ভব নামক মহাকাব্যের প্রথম সাত সর্গ ও বহু সংস্কৃত প্রবচন সুললিত বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু তাঁর ওপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবই ছিল সর্ব্বাধিক। তিনি স্বয়ং লিখেছেন—

'আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহু দিনের অভ্যাস'।

রঙ্গলাল তাঁর রচনায় পাশ্চাত্ত্য কবিদের প্রভাব সম্পর্কে স্বয়ং বলেছেন—'আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশকরণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন, তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই, **সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে**। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতাকলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্তাবতের প্রেমিক দলের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে'।

সকলেই জানেন, উনিশশতকে বাঙ্গালী-চেতনার যে নব অভ্যুদয় ঘটেছিল তার মূলে ছিল পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ও নবীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ভারতবর্ষকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা। এ দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে রাজা রামমোহন যে দীর্ঘ পত্র লর্ড আমহার্ষ্টকে লিখেছিলেন, তার কোনো কোনো অংশে অতিরঞ্জন থাকতে পারে কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যে অনেকাংশে কল্যাণপ্রদ হয়েছিল,

সে কথা মনীষী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেছেন। আচার্য্য গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় বলেছেন—প্রতীচ্য সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলেই বাংলা সাহিত্য নানা ক্ষেত্রে দ্রুত উৎকর্ষ লাভ করেছিল, আর প্রতীচীর ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙ্গালী মনীষীদের মনে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হয়েছিল এবং তাঁরা সর্বভারতীয় ঐক্যের বা সংস্কৃতির আদর্শে ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যাঁরা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে জাতিকে নব চেতনায় উদবুদ্ধ ও মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলতে চেয়েছিলেন যাঁরা স্বাধীনতার মন্ত্রে দেশবাসীকে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, রঙ্গলাল হচ্ছেন তাঁদের অগ্রগামী। 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়' এই মন্ত্রের যিনি উদ্‌গাতা, যুগ-প্রবর্ত্তক কবির গৌরব কী তাঁর প্রাপ্য নয়? আবার তাঁর রচিত 'পদ্মিনী-উপাখ্যানেই' আমরা দেখতে পাই, বীরবিক্রমে পাঠান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুপথযাত্রী বাদল জননীকে বলেছেন—

'রণে যেই ত্যজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান
কেবল কৈবল্য তার স্থান।
জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগ্‌ দশ
কভু তার নাহি অবসান।'

উপরি-উদ্ধৃত পদ্যাংশে আমরা রঙ্গলালের স্বদেশ প্রেমের একটি দিকের সঙ্গে পরিচিত হই। স্বদেশপ্রেমিক রঙ্গলালের সাহিত্যসাধনার লক্ষ্য ছিল—স্বজাতির কল্যাণ সাধন। এই জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যকে কুরুচি থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সাহিত্য-রচনায় যত্নবান হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে মহদ্ভাব সকল চয়ন করে বাঙ্গালী পাঠককে পরিবেশন করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় অশ্লীলতার প্রাচুর্য্য দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তাই বাংলা সাহিত্যে তিনি এনে ছিলেন সুরুচি ও শালীনতা। অবশ্য, গুপ্ত কবির কবিতার স্থানে স্থানে আমরা যে অশ্লীলতা দেখতে পাই, তার জন্যে তাঁর যুগের পরিবেশ অনেকখানি দায়ী ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত যে স্বয়ং নির্ম্মল চরিত্র হলেও কখনো কখনো স্থূল রসিকতা-সৃষ্টির প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেননি, তার মূলে রয়েছে যুগের প্রভাব। তা ছাড়া, দেশ ও কাল-ভেদে যে অশ্লীলতার আদর্শ ভিন্ন হতে পারে, সে সম্পর্কেও তিনি বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখিয়েছেন, ভারতীয় দৃষ্টিতে যে ভাবটি পরম পবিত্র, ইউরোপীয় পাঠকের নিকট তা অশ্লীল, আবার পাশ্চাত্ত্য পাঠকের রুচিতে যা দূষনীয় নয়, ভারতীয় পাঠকের নিকট তা' কদর্য্য ও নিন্দনীয়। এ সব কথা আলোচনা করেও বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনা স্থানে স্থানে বাস্তবিকই অশ্লীল। গুপ্ত কবির শিষ্যবর্গের ভেতর দীনবন্ধু কোনো দিনই এই দোষ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু রঙ্গলাল চিরদিনই বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্যরচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে জাতিকে মহদ্ভাবে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনায় গুপ্ত কবির অশ্লীলতার প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে লক্ষ্য করা গেলেও অচিরেই তিনি এই দোষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন—'নির্ম্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য বঙ্কিমই প্রথম বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করেন। যাই হোক, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হলে সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী যে তাঁকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তার একটি প্রধান কারণ—তাঁর রুচির বিশুদ্ধতা। ভারতচন্দ্রের মতো ছন্দোচাতুর্য্য ও শব্দচয়ন-

নৈপুণ্য তাঁর ছিল না, ঈশ্বর গুপ্তের মতো 'স্যাটায়ারিষ্ট'ও, তিনি ছিলেন না, তথাপি ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বরচন্দ্র সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর রস-পিপাসাকে চরিতার্থ করতে পারে নি। তাঁরা ইংরেজি সাহিত্যে যে রসের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার প্রথম প্রতিফলক দেখলেন রঙ্গলালের কাব্যে। তাঁর রচনায়ই প্রথম অখণ্ড ভারত চেতনার প্রকাশ ঘটলো। তাই রঙ্গলাল হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যে একটা যুগের স্রষ্টা ও প্রতিনিধি। আবার এক হিসাবে তিনি যুগ-সন্ধির কবিও বটেন, কারণ, ছন্দ-প্রয়োগে প্রাচীন-পন্থী হলেও তিনি প্রথম বাঙালীর চিন্তাজগতে এনেছিলেন বিপ্লব। তাই তাঁকে আমরা আধুনিক ভারতে জাতীয়তা-বোধের প্রথম কবি বলতে পারি।

অবশ্যি প্রাচীন ও মধ্য-যুগীয় ভারতবাসীর মনে অখণ্ড ভারত-চেতনার অস্তিত্ব একেবারেই ছিলনা, এ কথাও সত্য নয়। ভারতের পুরাণশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভারতভূমি দেবভূমি আর ভারত-বহির্ভূত অংশ হচ্ছে ভোগ-ভূমি। ভারত-মাতা হচ্ছেন মহামায়ারই প্রতীক, তাই ভারত-মাতার উপাসনা হচ্ছে মহামায়ারই উপাসনা। জগন্মাতা সতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়ে সমগ্র ভারতে একান্নটি পীঠস্থান রচনা করেছে। এই পীঠস্থান সমূহে পরিক্রমা করা ছিল ভারতীয় হিন্দুদের ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ। কাজেই তীর্থদর্শনের ভেতর দিয়ে সেকালের মানুষ সমগ্র ভারতের একটা ভাব-গত ঐক্য উপলব্ধি করতেন। তা ছাড়া, ভারতের নানা অঞ্চলের হিন্দুদের ভেতর আচার-ব্যবহার-গত বা রীতিনীতিগত বহু অনৈক্য থাকলেও সমগ্র ভারতবাসীর বিদ্বজ্জনের ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই সংস্কৃত ভাষাই ছিল ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান বাহন। বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাসী সংস্কৃতের 'মাধ্যমেই' বেদ, বেদাঙ্গ, আরণ্যক, উপনিষদ, ষড়্‌দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ ও আগমশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করতেন। আর এই সংস্কৃত ভাষাই সমগ্র ভারতবসীর মনে অখণ্ড ভারত-চেতনাকে জাগ্রত করে রেখেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই অখণ্ড ভারত-চেতনা পাশ্চাত্ত্যের ন্যাশান্যালিজম্ নয়, ইংরেজিতে যাকে 'নেশন' বলে, তার কোনো প্রতিশব্দও বাংলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে আমরা প্রতীচীর 'ন্যাশন্যালিজ্‌ম্'-এর আদর্শকে গ্রহণ করেছিলাম সত্য কিন্তু পশ্চিমের যে উদগ্র জাতিপ্রেম 'ধর্ম্মের ভাষাতে চাহে বলের বখান', সে জাতিপ্রেম আমাদের কখনো আকর্ষণ করেনি। যে জাতি-প্রেম মানবধর্ম্মের অবিরোধী, রঙ্গলাল ছিলেন সেই জাতি প্রেমেরই প্রথম কবি।

রঙ্গলাল তাঁর কাব্যসাধনার ভেতর দিয়ে ভারতের নানা প্রদেশকে ঐক্য সূত্রে বদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। উৎকল দেশীয় কাহিনী অবলম্বনে তিনি 'কাঞ্চী-কাবেরী' নামে যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তার ভূমিকায় লিখেছেন—

'উৎকল-দেশ ঘৃণার্হ দেশ নহে। অত্রত্য লোকের পূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ-দর্শনে সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গত হইতেছে যে, উৎকলীয় লোকের মানসে অনেকগুলি গৌরবভাজন শক্তিবীজ নিহিত আছে এবং তাহারা এক সময়ে বীরত্ব এবং ধীরত্বভূষণে ভূষিত ছিল। বঙ্গদেশের সহিত এ প্রদেশের প্রতিযোগিতা-সম্পর্ক-বশতঃ বহুকাল পর্য্যন্ত সুপরিচয় আছে। কিন্তু উভয় দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্দ্য যত বর্দ্ধিত হয়, তত সুখের বিষয়। সেই সৌহার্দ্দ্য-রজ্জুর খণ্ডৈক ক্ষীণসূত্র বা তৃণবৎ আমি এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম'।

ওড়িয়া ভাষায় নিষ্ণাত রঙ্গলাল 'উৎকলদর্পণ' নামে একখানি সংবাদপত্রেরও প্রবর্ত্তন করেছিলেন এবং এই পত্রিকা-সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তিনি ওড়িয়া ও গৌড়িয়াগণকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

হিন্দী সাহিত্যেও রঙ্গলালের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। তিনি বহু হিন্দী দোঁহার সুললিত কাব্যানুবাদ করে হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় সাধন করেছিলেন। তিনি একখানি আদিরস প্রধান হিন্দি কাব্য-গ্রন্থের কাব্যানুবাদ করেছিলেন, আর এই গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'রতনচুর'। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে প্রীতি লাভ করেছিলেন কিন্তু তিনি হিন্দি কবির রচনার বহু স্থানে অশ্লীলতা লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন—এই অনুবাদ প্রকাশিত হলে রঙ্গলালের কবি-যশ ক্ষুণ্ণ হবে। রাজেন্দ্রলালের উপদেশে এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় নি, ফলে বাঙ্গালী পাঠক এই কাব্যের রসস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা-দোষ লক্ষ্য করে রঙ্গলাল ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগী, 'কুমার সম্ভব', ও ঋতুসংহার অনুবাদক রঙ্গলাল 'পিউরিটান' ছিলেন না। তিনি লিখেছিলেন—

'বাস্তবিক আদিরসে কিছুই মন্দ নাই' তাহা সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যের জীবন—মনুষ্য তদ্বিরহে থাকিতে পারেন না। তবে অনধিকার প্রয়োগ না হয়'।

সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে বিপুল জ্ঞান ও রসের ভাণ্ডার, তাই সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের সঙ্গে এই সাহিত্যের পরিচয় সাধন করার জন্যে তিনি মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহার' ও 'কুমার সম্ভব' কাব্য এবং বহু সূক্তি বা সুভাষিতের অনুবাদ করে ছলেন। এই সকল কাব্যানুবাদের রস একদিন বাঙ্গালী পাঠক আস্বাদন করেছিল। 'কুমার সম্ভবের' বিজ্ঞাপনে রঙ্গলাল লিখেছেন-

'আমরা ভিন্ন দেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায়, ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারাদি পরিহার পূর্ব্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এই ক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্য্যালোচনা-করণে স্বদেশ হিতৈষীমাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণকরণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর, বিশেষতঃ, স্বদেশী পুরাতন কাব্যকলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে'।

দেখা যাচ্ছে, 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি কাব্যের অনুবাদের মূল প্রেরণা ছিল—কবির স্বদেশহিতৈষনা। রঙ্গলালকে তাই ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকারী বলতে পারি।

সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল

বাংলার কাব্যসাহিত্যে ও সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্তের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে। গুপ্ত কবি শুধু সাহিত্য-সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্যিক-স্রষ্টা, শক্তিশালী নবীন কবিগণের উৎসাহ-দাতা।' যে সকল তরুণ কবিদের রচনা 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশ করে তিনি তাঁদের মনে আত্ম-প্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছিলেন, তাঁদের ভেতর বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারী (ইনি অকালে মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন), রঙ্গলাল ও অক্ষয়কুমার দত্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী কালে অক্ষয়কুমার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার' সম্পাদক রূপে এবং একজন মননশীল, যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখকরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। যাই হোক, 'সংবাদ প্রভাকরকে' আশ্রয় করে এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ যে কবিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তা' সে কালের পাঠক-সমাজে যথেষ্ট কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল।

'প্রভাকর' ছিল দৈনিক ও সাময়িক পত্র। তা ছাড়া, ঈশ্বর গুপ্ত 'সাধুরঞ্জন' নামে একখানি ক্ষুদ্রাবয়ব কাগজেরও সম্পাদক ছিলেন। সেকালে এই দ্বার্থবোধক ছড়াটি সকলের মুখে মুখে শোনা যেতো—

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর'॥

ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বর গুপ্ত পরম ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ধর্মনিষ্ঠ হলেও কালের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেন নি। তাই তাঁর কোনো কোনো রচনায় অশ্লীলতা বা কুরুচির পরিচয় আছে। গুপ্ত কবির রচনার আর একটি দোষ অনুপ্রাস যমকাদির প্রাচুর্য্য। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো রচনায় 'ভক্তিবিলসিত হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস' আছে, কোথাও বা বৈরাগ্যের স্বরও ধ্বনিত হয়েছে। আমরা 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে 'প্রভাকরে' প্রকাশিত কবিতার একটু নিদর্শন দিচ্ছি।

কোনো কবি লিখেছেন—

'পাপানল ধর ধর, জ্বলিতেছে ধর ধর
সর সর ওহে বন্ধুগণ'।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন-

'দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর,
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর
বাবা গৌরব প্রচুর'।

পুনশ্চ— 'দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার ময়
বাবা অন্ধকার ময়'॥

ঈশ্বর বিষয়ক বা পরমার্থ বিষয়ক বহু কবিতাও গুপ্ত কবি রচনা করেছেন এবং এগুলি 'প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করেছে। প্রভাকরকে আশ্রয় করেই গুপ্ত কবির এবং বহু তরুণ কবির প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। ১২৬০ সালের নববর্ষ-সংখ্যায় 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত রচিত এই ভক্তি-রসাত্মক কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে—

'অম্বুদ অম্বর গহন-শিখর পৃথিবী সলিল অনল অনিল
দৃষ্টি করি আমি যাহে। রবি শশী আর তারা।
হেন মনে লয় ওহে দয়াময় নিয়ম তোমার করিয়া প্রচার
বিরাজিত তুমি তাহে॥ পরিচয় দেয় তারা'॥

এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ঈশ্বর গুপ্ত 'তত্ত্ববোধিনী সভার' অন্যতম সভ্য ছিলেন এবং তাঁর আধ্যাত্মচিন্তায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল। 'নির্গুণ ঈশ্বর' কবিতাটি এই প্রভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যে সব বাল্যরচনা 'সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছে, তার ভেতর আমরা একদিকে পাই আদিরসের প্রাচুর্য্য, আর এক দিকে, পাই অনুপ্রাস-যমকাদির বাহুল্য। 'বঙ্কিম জীবনীতে' বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি বাল্যরচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, যথা— শিশির-বর্ণনাছলে স্ত্রীপতির

কথোপকথন, বর্ষাবর্ণনাচ্ছলে দম্পতীর রসালাপ, দূরদেশ-গমনের বিদায়, ও চন্দ্রদূত। শেষোক্ত কবিতাটি বাংলা ভাষায় দূত কাব্যরচনার প্রয়াস বলে মনে করা যেতে পারে। এই কবিতায় প্রতিভাবান কিশোর কবি পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি নানা ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য বালক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্যরচনাও (চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে লিখিত) 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়। এই রচনার মূল বক্তব্য হচ্ছে—মানুষ যেন দেহ-গেহাদির অনিত্যতা উপলব্ধি করে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিমান হয়। এই গদ্যরচনায় দীর্ঘ বাক্য, দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ এবং অনুপ্রাসাদির প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করে ঈশ্বর গুপ্ত ও মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন—

'ইহার লিপিনৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন'।

সংবাদপ্রভাকরের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, ইহাতে 'কবির লড়াই' নামে এক শ্রেণীর ছড়া মুদ্রিত হয়ে পাঠকদের চিত্ত বিনোদন কোরতো। এই বাগ্-যুদ্ধ বা কলেজীয় কবিতাযুদ্ধে দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র অংশ গ্রহণ কোরতেন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র 'বঙ্কিম-জীবনীতে' লিখেছেন—

'যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বাংলায় কবি, হাফ্ আখড়াই ও পাঁচালীর বড়ই প্রাধান্য। রাম বসু, হরু ঠাকুর, ভোলানাথ, যজ্ঞেশ্বরী, কৃষ্ণকমল তখন লোকান্তরে গমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি লুপ্ত হয় নাই, দাশরথি রায়ও তখন জীবিত। তাঁহাদের প্রভাব তখনকার কবিদিগের রচনার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলি এতদ্‌বিষয়ে জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনিও ছড়া ও গান বাঁধিতেন। একপক্ষ অপর পক্ষকে গালি দিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করিত। দীনবন্ধু বাবু, দ্বারকানাথ অধিকারী ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এইরূপ কবির লড়াই চলিত। দ্বারকানাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে চট্ট কবি বলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই, দীনবন্ধু বাবুকে সহুরে কবি নাম দিয়া পাঁচালি সাজাইয়াছেন। দীনবন্ধু পাল্টা গাহিয়া দ্বারকানাথকে বুনোকবি নামে আখ্যাত করিয়াছেন'।*

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিতে সাময়িক পত্রের দান সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে সর্ব্বপ্রথম 'সংবাদ-প্রভাকরের' উল্লেখ করতে হয়। এই পত্রিকার সম্পাদকরূপে ঈশ্বর গুপ্ত শক্তিধর তরুণ কবিগণের কাব্য রচনায় উৎসাহ দিয়ে তাদের আত্মপ্রত্যয়কে জাগিয়ে তোলেন। আধুনিক ধরনের ব্যঙ্গকবিতা বা স্যাটায়ারেরও তিনিই প্রবর্ত্তক। তিনিই সর্ব্বপ্রথম সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেন। (অবশ্যি এই সকল কবিতার সর্ব্বত্র ঈশ্বর গুপ্তের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না।) তিনি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকদের স্বদেশ-প্রেমে দীক্ষিত করেন এবং তাঁদের মনে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার করেন। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যে ঐতিহাসিক চেতনা এবং সত্যানুসন্ধিৎসা প্রবল ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে, তিনি সে যুগে বহু আয়াস স্বীকার করে রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের জীবন-কাহিনী সংকলন করেছেন। যদি তিনি যে সময়ে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত না হতেন, তা হলে এই সকল কবিদের চরিত-কথা বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হয়ে যেতো। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অক্লান্তকর্ম্মী ও অমেয়াত্মা পুরুষ, আবার মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্রের

* আমরা বাহুল্যভয়ে কবিতাযুদ্ধের নমুনা উদ্ধৃত কারনি। কৌতূহলী পাঠক 'বঙ্কিমজীবনী' পড়ে দেখতে পারেন।

চাইতেও বড়ো। ঈশ্বর গুপ্তের সব চাইতে বড়ো কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলা দেশে প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং এই সেতু-নির্ম্মাণে তাঁর প্রধান সহায় ছিল 'সংবাদ-প্রভাকর'।

'সংবাদ প্রভাকরে' যাঁদের বাল্য রচনা (গদ্য ও পদ্য) প্রকাশিত হয়েছিল এবং কবি ঈশ্বর গুপ্ত যাঁদের প্রতিভাকে অভিনন্দিত করেছিলেন, রঙ্গলাল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। রঙ্গলাল-সম্পর্কে গুপ্ত কবি লিখেছিলেন—'কবিতা নর্ত্তকার ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।

রঙ্গলালের জীবনচরিতে (সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৩৭) স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে এই কবির একটি বাল্য-রচনা উদ্ধৃত করেছেন। কবিতাটির নাম 'প্রভাত', এতে তরুণ কবির লিপি-কৌশলের পরিচয় আছে। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখে, তখন বাংলা দেশে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের' প্রবর্ত্তক, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যুগ চলেছে। এই আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা-প্রণালী রঙ্গলালের ধর্ম্মচিন্তার ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই কবিতাটির উপসংহারে তিনি লিখেছেন—

'ব্রহ্ম-আরাধনে রত, ব্রহ্ম-উপাসক যত,
হেরি ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আগত।
মোহন প্রণব শব্দ কাস্তেরে করয়ে স্তব্ধ,
মানস ভাসায় ভক্তিরসে।
ধন্য ধন্য নিরঞ্জন, গর্ব্ব-পর্ব্বত-ভঞ্জন
পৃথিবী পূরিল ভাবরসে॥'

রঙ্গলাল অতি তরুণ বয়সেই সাময়িক পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক 'সংবাদ রসসাগরের' সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর রঙ্গলাল এই পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেছিলেন। ক্ষেত্রমোহনের জীবিত কালেই পত্রিকাখানি বারত্রয়িকে পরিণত হয়েছিল। রঙ্গলালের সম্পাদনায় পত্রিকাখানি প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার আত্মপ্রকাশ কোরতো। রঙ্গলাল পরে পত্রিকাখানির নাম কিছু সংক্ষিপ্ত করে 'সংবাদ সাগর' রাখেন। রঙ্গলালের সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত পাঠকদের মনোরঞ্জন করেছিল। (ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছেন—রঙ্গলাল প্রথম থেকেই 'রস-সাগরের' সম্পাদক ছিলেন, তাঁর চরিতকার মন্মথনাথ ঘোষের এই উক্তি ভ্রমাত্মক)।

রঙ্গলাল অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে এই সাময়িক পত্রখানির সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর এই পত্রিকাখানির লক্ষ্য ছিল—স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ-সাধন, দেশের তরুণগণকে আত্ম-সম্বুদ্ধ ও জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তাঁদের শ্রেয়ের পথে পরিচালন। রঙ্গলালের চরিতকার লিখেছেন—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের কার্য্য এই পত্রের বিশেষ সমালোচনার বিষয় ছিল। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদ সুধাংশু' ছিল সে যুগের 'মিশনারিদের' সমর্থক। 'মিশনারি-দৌরাত্ম্য' সম্পর্কে কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে রঙ্গলালের যে বাগ্‌যুদ্ধ হয়, তাতে রঙ্গলালই জয়ী হয়েছিলেন। যাই হোক, রঙ্গলাল যখন বিশেষ কার্য্যানুরোধে সম্পাদকীয় ব্রতোদযাপনে অক্ষম হলেন, তখন কবি ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ-প্রভাকরে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন—

'যত্নমাত্র না করিয়া আমরা সর্ব্বদাই সাগরোদ্ভূত অমূল্য মহারত্ন সকল প্রাপ্ত হইলাম। অধুনা সেই অত্যুৎকৃষ্ট অব্যক্ত সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হইলাম। যাঁহার রচিত গদ্য পদ্য জনসমূহের পক্ষে অনন্ত শ্রুতিসুখকর এবং উপকারজনক তিনি লিপিকার্য্যে বিরত হইলে তদপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?'

সে কালে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল সাময়িক পত্রের অভাব ছিল না, কিন্তু রঙ্গলাল যে লোক কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই পত্রিকা-সম্পাদকের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন,—ঈশ্বর গুপ্তও একথার উল্লেখ করেছেন

'রসসাগরের' সম্পাদন-ভার পরিত্যাগ করেও রঙ্গলাল মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত মাসিক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' সহিত নানাভাবে সহযোগিতা করেন। দেশের জনগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার এই পত্রিকা খানির অন্যতম লক্ষ ছিল। রঙ্গলালের বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর রঙ্গলাল সরকারী শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহের' সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। (প্রথম প্রকাশ, ৪ঠা জুলাই, ১৮৫৬)। যদিও পত্রিকাখানির সম্পাদক রূপে রেভারেণ্ড ও' ব্রায়েন স্মিথ ও' সহকারীরূপে রঙ্গলালের নাম প্রকাশিত হয়েছিল, তথাপি রঙ্গলালই পত্রিকা-পরিচালনার গুরু দায়িত্ব বহন করেছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রঙ্গলাল এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে মনস্বী ভূদেব পত্রিকাখানির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

মেজর ডেভিড্ লেষ্টার রিচার্ডসন—প্রবর্ত্তিত 'কলিকাতা লিটারেরি গেজেটেও' রঙ্গলালের অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যে অনুরাগী রঙ্গলাল 'মুর্খাজ্জিস্ ম্যাগাজিনে' কয়েকটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

তিনি উড়িষ্যায় অবস্থিতি কালে যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে 'উৎকল দর্পণ' নামে সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন, তার কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে তিনি উড়িষ্যায় প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনেই বাংলা ভাষায় 'কাঞ্চী-কাবেরী' নামে কাব্য রচনা করেছিলেন।

সরকারী শিক্ষাবিভাগ প্রথমতঃ রেভারেণ্ড ও'ব্রায়েন স্মিথকে "এডুকেশন" গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে তিনি বাংলা ভাষায়, উত্তমরূপে ব্যুৎপন্ন হয়ে 'ইংলণ্ডের ইতিহাস', 'আরব্য রজনী প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তা ছাড়া তিনি ছিলেন 'সত্যার্ণব' নামে ধর্ম্মীয় পত্রিকার সম্পাদক। অবশ্য এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক ভাবে বাঙ্গালীদের ভেতর খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার, আর পত্রিকাখানির প্রবর্ত্তক ছিলেন রেভারেণ্ড্ জেম্স্ লঙ। যা হোক, 'এডুকেশন গেজেটের' পরিচালন-ব্যাপারে রঙ্গলালই ছিলেন স্মিথ সাহেবের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। রঙ্গলাল যতদিন পত্রিকাখানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ততদিন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। তাঁর জীবনের ব্রতই ছিল স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন। ঈশ্বর গুপ্ত ও ছিলেন, স্বদেশ প্রেমিক কবি, কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকরের' সর্ব্বত্র তিনি সুরুচির পরিচয় দিতে ও বাঙ্গালীর মনে অখণ্ড 'ভারত'-চেতনা জাগ্রত করতে পারেন নি। তাই সংবাদপত্র-সেবার ভেতর দিয়ে রঙ্গলালই প্রথম পাঠকদের সুরুচি-বোধ ও অখণ্ড ভারত-চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন।

রঙ্গলাল ও তাঁর কাব্যের আদর্শ

রঙ্গলাল মহাকাব্য রচনার প্রয়াস না পেলেও ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য রচনায় তিনিই পথ-প্রদর্শক। এই সব কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকেই তিনিই এই সব কাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম আখ্যায়িকা-কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যান বাঙ্গালীর অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাজাত্যাভিমান জাগিয়ে তুলেছিল। এর পর তিনি আরও তিনখানি ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য রচনা করেছিলেন—কর্ম্মদেবী, শূর সুন্দরী ও কাঞ্চীকাবেরী। সংস্কৃত ও বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করেও তিনি মাতৃভাষাকে শ্রীসম্পন্ন করে তুলেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে রঙ্গলালের দানের কথা আলোচনা করতে হলে যথার্থ কাব্য সম্পর্কে তার কি ধারণা ছিল, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার প্রয়োজন। আর সমালোচক রঙ্গলালের পরিচয় পেতে হলে তাঁর রচিত 'বাংলা কবিতা বিষয়ক' প্রবন্ধও আমাদের প্রণিধান যোগ্য।

রঙ্গলালের মতে তিনিই যথার্থ কবি যিনি রসসৃষ্টির ভেতর দিয়ে মানবের কল্যাণ-সাধন করতে পারেন। অবশ্যি 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্',—কাব্যের এই সংজ্ঞা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে যথার্থ কাব্য পাঠকের মনে শুধু অনির্ব্বচনীয় আনন্দই উৎপন্ন করে না, তাকে শ্রেয়ের পথেও নির্দ্দেশ দেয়। রঙ্গলাল লিখেছেন—

প্রকৃত কবিদিগের অন্তঃকরণ সহস্রধারা নামক বিচিত্র উৎসস্বরূপ, তাহাতে যেরূপ সামান্যরূপ শব্দ করিলেই ধারা নির্গত হয়, কবিদিগের অন্তঃকরণ হইতে সেইরূপ সামান্য ঘটনাতে ভাবধারা নিঃসৃত হইতে থাকে।

'কবিতার অপর এক গুণ এই তাহা সাংসারিক সামান্য চিন্তাজাল ও ইন্দ্রিয় ভোগশক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে সর্ব্বদা বিমুক্ত রাখিতে পারে।'

রঙ্গলাল ছিলেন একাধারে রসস্রষ্টা কবি, সঙ্গীতকুশল গীত-রচয়িতা, সহৃদয় সমালোচক, পরিহাসরসিক কিন্তু সুরুচিসম্পন্ন। ইহা বাঙ্গালীর পরম দুর্ভাগ্য যে, এককালে যিনি বাংলার প্রায় সকল মনস্বীদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তিনি আজ প্রায় বিস্মৃত। 'বঙ্গসাহিত্যে রঙ্গলালের দান' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর চরিতকার বলেছেন—

রঙ্গলাল সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডীয় কাব্যের সুরুচিপূর্ণ রসাধার আনিয়া মুমূর্ষু বাংলা কাব্যকে নব-প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

• *দ্বিতীয়তঃ রঙ্গলাল প্রতীচ্য কাব্যের নিকট তাঁহার ঋণ অসঙ্কোচে স্বীকার করিলেও তিনি এমন কোনও বিজাতীয় ভাব স্বদেশীয় সাহিত্যে আনয়ন করেন নাই যাহাতে আমাদের জাতীয়তা নষ্ট হয়।

*তৃতীয়তঃ, স্বদেশীয় সাহিত্যে, কেবল বাংলা সাহিত্যে নহে, সংস্কৃত, উৎকলীয়, হিন্দি প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রঙ্গলালের কাব্যকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছে।

*চতুর্থতঃ, রঙ্গলাল এমন কোনও রচনা প্রকাশ করেন নাই যাহাতে পাঠকের মন উন্নত না হইয়া ক্ষণকালের জন্যও মলিন হয়।'

শব্দ-চয়ন ও অলঙ্কার-প্রয়োগে রঙ্গলালের নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। তাঁর কবিত্ব-শক্তির নিদর্শনস্বরূপ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি। পদ্মিনীর অসাধারণ রূপলাবণ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো প্রাচীন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসু নবীন পর্য্যটককে বলছেন,—

'কোন্ মূঢ় চিত্রকরে, পদ্মদেহ চিত্র করে
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?

কিংবা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে,
অতি সুখ লভে মনোলোভা ?
কষিত কাঞ্চন কায় কিবা কার্য্য সোহাগায়,
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কেহে দিবে ইন্দ্রধনু দেহে
অভিনব রূপ রঙ্গ ঘটা ?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর ভাতি
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দুরে মাজি গজ মুক্তাফল রাজি
সাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল'।

রঙ্গলালের কাব্যসাধনার উদ্দেশ্য ছিল—বাংলা কাব্যকে কুরুচি থেকে মুক্ত করে পাশ্চাত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠকগণের রস-পিপসা চরিতার্থ করা এবং তাঁদের মনকে শৌর্য্য, বীর্য্য, মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এই দিক দিয়ে বিচার করলে রঙ্গলালকেই নব্য বাংলার আদি কবি বলা যায়। ইংরেজি সাহিত্য থেকে অনেক মহৎ ভাব চয়ন করে রঙ্গলালই প্রথম স্বীয় আখ্যান কাব্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন, আর তাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষাই পরিস্ফুট হয়েছে। সেকালে ক্ষত্রিয়গণের প্রতি ভীমসিংহের উৎসাহ-বাক্য বাঙ্গালীর প্রাণে কী উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, আজ আমরা হয়তো তা ধারণাও কর্ত্তে পার্ব্বো না। ভীমসিংহ বলছেন—

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায় ॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার ॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নির্বান হে
ভয়ের নির্বান।
ক্ষত্রিয়ের জাতি যম বেদের বিধান হে
বেদের বিধান ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাইরে
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই' ॥

ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের কথা ও স্বদেশ রক্ষার দৃঢ় সংকল্প বীরগণের শৌর্য্য-ও পরাক্রমের কথা স্মরণ করে রঙ্গলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন—

'কোথা সে বীরত্ব আর বিক্রম বিশাল।
সকলি করেছে গ্রাস সর্ব্বভুক্ কাল' ॥

'পদ্মিনী উপাখ্যানে' মুমূর্ষু বাদল জননীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—

'রণে যেই ত্যজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান
কেবল কৈবল্য তার স্থান।
জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগ্‌দশ
কভু তার নাহি অবসান' ॥

রঙ্গলাল স্বয়ং বলেছেন, "আমি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে অনেক উৎকৃষ্ট অংশের অনুবাদ করে আমার রচিত কাব্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছি।" কিন্তু লিপিকুশলতার গুণে রঙ্গলালের অনুবাদ কখনো অনুবাদ বলে মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলতে পারি, আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত কাব্যাংশ 'কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে ইত্যাদি সেক্‌স্‌পীয়ার রচিত King John এর চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের 'To gild refined gold, to paint the lily......is wasteful and ridiculous excess'-অংশের অনুবাদ। আবার ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি ভীমসিংহের উৎসাহ বাক্য পাঠ করে আমাদের স্মরণ হয় টমাস মূরের উদ্দীপনাময়ী বাণী—

From life without freedom,
Oh! who would not fly?
For one day of freedom
Oh! who would not die?
Hark!—hark, t'is the trumpet!
the call of the brave,
Tha death-song of tyrants
and dirge of the slave.

Our country lies bleeding—
Oh! fly to her aid;
One arm that defends is worth
hosts that invade.
From life without freedom
Oh! who would not fly?
For one day of freedom
Oh! who would not die'?

আবার কোথাও রঙ্গলালের রচনায় পাশ্চাত্ত্য কবিগণের চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। পদ্মিনী উপাখ্যানে' পদ্মিনীর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি—

'পরিপূর্ণ খনি, কত শত মণি,
কে তার সন্ধান লয়?
ধনিকণ্ঠ-হারে নিরখি তাহারে
চোরের লালসা হয়'।

আমাদিগকে গ্রের সুপ্রসিদ্ধ কবিতার নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

'Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert-air.'

রঙ্গলালের আখ্যান-কাব্যের ভেতর দিয়ে তাঁর ধর্ম্মমতও জানতে পারা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের মতো রঙ্গলালের ওপরও আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ

ও সর্ব্বভূতে বিরাজমান, প্রকৃতির ভেতর যা সুন্দর, যা মহান, যা উর্জ্জিত, যা শ্রীমৎ তা হচ্ছে শ্রীভগবানেরই বিভূতি। হিন্দুগণ নানা ভাবে একই পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, কখনো কখনো পাষাণ বা প্রতিমায় তাঁর অর্চ্চনা করেন, কখনো বা নানা নাম বা রূপের ভেতর দিয়ে তাঁর উপাসনা করেন কিন্তু তাঁরা জানেন একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মই তাঁদের উপাস্য। আমাদের শাস্ত্রকারগণ প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা দিয়েছেন যাতে সাধকগণ নিরাকার পরব্রহ্মের ধারণা করতে পারেন। রঙ্গলাল লিখেছেন—

হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম এই সর্ব্বভূতে যিনি।
যত্র তত্র কর পূজা জানিবেন তিনি॥
জল, স্থল, আকাশ, সমীর, বৈশ্বানর।
দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্র-নিকর॥
তরুলতা, পাষাণ, প্রতিমা নানামত।
দৃশ্যমান এ জগতে পঞ্চীকৃত যত॥
উপাস্য না হয় তারা, উপাস্য ঈশ্বর।
যিনি সেই সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত নিরন্তর'॥

(কর্ম্মদেবী)

তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্' কিন্তু 'একম্ সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। তাই তিনি বলেছেন—

'যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজাপতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী, তিনিই পার্ব্বতী'॥

কিন্তু তিনি অধিকার ভেদে মূর্ত্তি পূজার বিরোধী ছিলেন না।

এক বিষয়ে রঙ্গলাল ছিলেন যুগের অগ্রগামী। বিহারীলালের 'সারদা' ও রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার মূলে যে ধ্যান-ধারণা, তার সুস্পষ্ট প্রথম প্রকাশ আমরা পাই রঙ্গলালেরই কাব্যে। শূরসুন্দরী কাব্যের 'মঙ্গলাচরণে' রঙ্গলাল কবিত্ব-শক্তিকে সম্বোধন করে যা 'বলেছেন, তা' বিহারী লালের 'সারদা-মঙ্গল' কাব্যের 'সারদাকে' ও রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতাকে' মনে করিয়ে দেয়। রঙ্গলাল বলেছেন—

'তুমি মম কিশোর কালের সহচরী।
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা-বিভাবরী॥
বিজনে তটিনী-তটে শষ্পশয্যা করি।
তরুচ্ছায়ে মৃদু বায়ে সুখে শ্রম হরি॥
তুমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি
দেখাইতে নিসর্গের যত রূপরাশি॥
স্থলজ জলজ পুষ্প প্রকাশ মাধুরী।
বিধাতার তাহে কত চিকণ চাতুরী॥
তুমি চারু মন্ত্রবলে মোহিতে নয়ন।
অতি পুরাতন বস্তু হইত নূতন॥
দিনকর নিত্য নিত্য নব ভার ধরি।
বিস্তারিত দিগন্তরে লাবণ্য-লহরী॥

* * *

কোথায় আছ গো দেবি দেহ দরশন।
আর আমি পাব নাকি শান্তি সংমিলন॥
কভু কভু স্বপ্নাবেশে হইয়া উদয়।
অপ্সরার বেশে মুগ্ধ কর গো হৃদয়॥
জাগ্রত ছায়ার প্রায় কভু দেহ দেখা।
শূন্যে জাত যথা মন্দাকিনী-ফেন-লেখা'॥

উনিশ শতকের বাংলায় মহাকাব্যের রচনার প্রয়াসের যুগে বিহারীলালই আধুনিক গীতি-কবিতা বা আত্মগত ভাবপ্রধান কবিতার প্রবর্ত্তক। তিনিই বাংলার কাব্য সাহিত্যে আনেন নতুন সুর, নতুন আদর্শ। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হয়, এই নতুন সুরটি রঙ্গলালের কণ্ঠেই আমরা প্রথম শুনতে পাই। পরবর্ত্তী কালে এই সারদাকে সম্বোধন করেই বিহারীলাল বলেছিলেন—

'তোমারে হৃদয়ে রাখি, সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দুই ভালো লাগে।'
অথবা,— 'তোমা-হারা হলে আমি প্রাণহারা হই'।

বাংলা সাহিত্যে প্রেমের কবিতার এ এক নতুন ধারা। কবির কাব্যজীবনের ইতিহাস এই সারদার সঙ্গে মিলন ও বিরহেরই ইতিহাস। ইনিই রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম জীবন-দেবতা, টমসনের ভাষায় ইনিই কবির ক্রম-উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তি-সত্তা। (ever-evolving personality). এই জীবন-দেবতাকে সম্বোধন করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম,
দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায়,
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ,
দলিত দ্রাক্ষাসম'।

কখনো তিনি এই জীবন-দেবতার সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন, কখনো তাঁকে 'রে মোহিনি, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা কঠোরা স্বামিনি' বলে সম্বোধন করেও পরক্ষণেই দেবীর নির্দ্দেশকে দুরূহ সৌভাগ্য বলে শিরোধার্য করে নিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, রঙ্গলাল যাঁকে 'কিশোর কালের সহচরী' বলেছেন, কল্পনা-বলাসা কবিকে যিনি নিসর্গের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে দেখিয়ে মুগ্ধ করেছেন, তিনিই বিহারীলালের সারদা—

'কিরণ-মণ্ডলে বসি, জ্যোতির্ম্ময়ী স্বরূপসী,
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে'।

আবার ইনিই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কবির সঙ্গে যিনি বিচিত্র ভাবে লীলা করেছেন।

আমরা বলেছি, রঙ্গলাল শুধু রস-সৃষ্টির জন্যেই কাব্য সাধনা করেন নি, প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস বা জনশ্রুতির পটভূমিকায় কাব্য রচনা করে তিনি স্বদেশবাসীকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন, সে স্বাধীনতার আদর্শ প্রাচ্য আদর্শ নয়, প্রতীচ্য আদর্শ,—'ক্ষত্রিয়গণের প্রতি ভীমসিংহের উৎসাহ-বাক্য' যে পাশ্চাত্ত্য কবির বাণীরই প্রতিধ্বনি, তাও আমরা দেখেছি। স্যার ওয়াল্টার স্কটের উক্তি ও নিশ্চয়ই রঙ্গলালের মনে পড়েছে—

Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said,
'This is my own, my native land?

[হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে উদ্ধৃত অংশের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ এই কবিতাটির যে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন, তার সঙ্গেও বাঙ্গালী পাঠকগণ পরিচিত।]

কিন্তু রঙ্গলাল যে স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপন করেছেন, উহা মানবধর্ম্মের বিরোধী নয়। ভারতের কবিগণ স্বাধীনতা ও স্বাজাত্যবোধের মহিমা উপলব্ধি করেন নি, একথা সত্য নয়, কিন্তু তাঁরা মনে করেছেন, স্বদেশপ্রেম মানুষের জীবনে সর্ব্বোত্তম আদর্শ নয়, এর চাইতে মহত্তর আদর্শ হচ্ছে সর্ব্বমানবে প্রীতি, আবার মানব-প্রীতির চাইতে উদারতর আদর্শ হচ্ছে সর্ব্বভূতে দয়া, কিন্তু মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সর্ব্বজীবে আত্মানুভূতি। পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ গ্রীক ও

রোমান জাতির নিকট থেকে স্বদেশ প্রেমের ও মহামানব খ্রীষ্টের নিকট থেকে মানবতার দীক্ষা গ্রহণ করেছে, কিন্তু একমাত্র ভারতের সাধক ও সিদ্ধ পুরুষদের কণ্ঠেই আমরা শুনতে পেয়েছি, 'স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্'। এ দেশের সাধক বলেছেন—

'মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা মনুজাঃ সর্ব্বে স্বদেশে ভুবনত্রয়ম্'।

পাশ্চাত্যের জাতিপ্রেম অনেক ক্ষেত্রে উগ্র ও মানবধর্ম্ম-বিরোধী হতে পারে, এইরূপ নরঘাতী বীভৎস জাতিপ্রেমে ক্ষুব্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—

'জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়,
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়'।

রঙ্গলাল কখনো এই উদগ্র নিষ্ঠুর মানবতা-বিরোধী জাতিপ্রেমকে সমর্থন করেন নি কিন্তু একথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন যে স্বাধীনতায় প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত অধিকার আছে এবং এই জন্যে অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, আক্রমণকারী, ও লুণ্ঠনকারী বিদেশী জাতির বিরুদ্ধে যারা সংগ্রামে লিপ্ত হয় বা স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে যারা আত্ম-বিসর্জ্জন দেয়, তারা স্বধর্ম্ম পালন করে, আর যারা অত্যাচারীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, তারা পাপভাক্ হয়। তাই রঙ্গলাল ভারতের অতীত ঐতিহ্য থেকে বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাগণের আত্মত্যাগের কাহিনী আহরণ করে আমাদিগের ভেতর মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল যদিও এই বিপ্লবের ফলে পাশ্চাত্য দেশে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহাকবি হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের ভেতর দিয়ে আমাদিগকে স্বদেশ-প্রেমের দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, স্বৈরাচারী দানবপ্রকৃতি বিদেশীগণের কবল থেকে স্বদেশকে মুক্ত করতে হলে চাই দধীচির মতো ত্যাগ ও আত্মদান। আবার নির্জীব ভারতের চৈতন্য সম্পাদনের জন্যে কবি হেমচন্দ্র যেদিন ভেরী-নিনাদ করেছেন, সেদিনও আমরা সহসা জাগরিত হয়ে ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কথা স্মরণ করেছি। ভারতের অবনতির যুগে দেশের দুঃখ-দৈন্যে পীড়িত এক মহারাষ্ট্রীয় যুবকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবি হেমচন্দ্র গেয়েছেন—

বাজ্ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
অই দেখ তোরা মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা করে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু বীরদর্প, বুদ্ধি-পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর-জঙ্গম
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?
সকলি তো আছে,—সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান-নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ, সে উন্নতি কই?
কোথারে আজি সে জাতি মহিমা?
হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি,
আর কি ভারত সজীব আছে?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত, ভারতের নিশি প্রভাত হইত
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত, হায়রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে'।

হেমচন্দ্রকে অনেকে জাতি বৈরের কবি বলেছেন। উপরি-উদ্ধৃত কবিতার এক স্থানে কবি আমাদিগকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছেন ('খোল তরবার', 'এ সব দৈত্য নহে তেমন' প্রভৃতি উক্তি স্মরণীয়), তাই তাঁকে মোগল যুগ ও মহারাষ্ট্রীয় যুবকের অবতারণা করতে হয়েছে। অবশ্যি, রঙ্গলালের মতো হেমচন্দ্রও ভারতেতিহাসের গৌরবময় যুগের কথা, ভারতের বীর সন্তানগণ ও বীরাঙ্গনাগণের শৌর্য্য, বীর্য্য ও আত্মত্যাগের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদিগকে মোহপ্রবুদ্ধ ও আত্মসম্বদ্ধ করে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন —

'দেখ নাকি চেয়ে জগৎ উজল,
এই সে ভারত হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী যমুনার জল,
সিন্ধু-গোদাবরী সরযূ সাজে।
জাননা কি সেই অযোধ্যা কোশল,
এই খানে ছিল কলিঙ্গ পঞ্চাল,
মগধ, কনৌজ, সুপবিত্র ধাম,
সেই উজ্জয়িনী নিলে যার নাম,
ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে।
এই রঙ্গভূমে করেছিলা লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী, প্রাচীন মহিলা,
সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে
এই রঙ্গভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল, স্বাধীন, পবিত্র অন্তরে,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে,
খুলি কেশপাশ দিত পরাইয়া,
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।'

কবি হেমচন্দ্রের রচিত মহাকাব্যে ও কয়েকটি খণ্ড কবিতায় যেমন সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরাধীনতার বেদনা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তেমনি নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে' ও 'শবসাধন' প্রভৃতি খণ্ড কবিতায়ও তাদের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্খাই প্রতিফলিত হয়েছিল। 'পলাশীর যুদ্ধ' সম্পর্কে অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায় বলেছেন—

'বাংলা ভাষায় এই প্রথম বাংলার ইতিহাস কাব্যরূপ গ্রহণ করিল, মোহনলালকে আশ্রয় করিয়া নবীনচন্দ্র জাতিকে নবীনভাবে দীক্ষাদান করিলেন'। জগৎ শেঠের মন্ত্রভবনে বাঙ্গালী শেঠজীর কণ্ঠে শুনতে পেল—

'সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে,
কেড়ে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে?
স্বর্গ-মর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত,
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়,
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ

কবি নবীনচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলার' চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত করেছেন বলে বাংলার একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অভিযোগ করেছিলেন। পরলোকগত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় নবীনচন্দ্রকে তথ্যবিকৃতির অপরাধে অপরাধী করেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রমাণ করেছেন সিরাজের চরিত্র ছিল নানা দোষে কলঙ্কিত, তাঁর চরিত্র-অঙ্কণে নবীনচন্দ্র বিশেষ তথ্যবিকৃতি ঘটান নি, বরং অসংযত উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী সিরাজের পতনে তিনিই প্রথম সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। সিরাজের পতনের পর আমরা মোহনলালের কণ্ঠে শুনতে পাই—

'কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র কিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে দেব ! করিলে গমন
আসিবে যবন-ভাগ্যে বিষাদ-রজনী ।
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মল অন্তরে,
ডুবায়ে যবন-রাজ্য যেও না তপন ।
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ করে,
কি দশা দেখিয়া, আহা ! ডুবিছ এখন !
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ-আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন ।'

আমরা দেখতে পাচ্ছি, রঙ্গলালই আধুনিক বাংলার আদি কবি, যিনি সাহিত্যসৃষ্টির ভেতর দিয়ে বাঙ্গালীকে স্বদেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দান করেছিলেন এবং তাঁদের অন্তরে অখণ্ড ভারত চেতনা জাগ্রত করেছিলেন ।

অনুবাদ সাহিত্যে রঙ্গলাল

অনুবাদ-সাহিত্যে রঙ্গলালের কৃতিত্ব সামান্য নয় । আমরা পূর্ব্বেই বলেছি রঙ্গলাল ইংরেজি সাহিত্য থেকে এমন উৎকৃষ্ট অংশ সকল চয়ন করেছেন যা আমাদের স্বদেশ-প্রেম ও মানবতা-বোধকে জাগ্রত করে এবং ওই সকল অংশের অনুবাদ স্বীয় আখ্যান-কাব্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন ; কিন্তু তাঁর লিপিকুশলতা গুণে সেই সব অনূদিত অংশকে মৌলিক রচনা বলে মনে হয় । এছাড়া রঙ্গলাল অনুবাদের ভেতর দিয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় সাধন করেছেন । রঙ্গলালের অনূদিত কাব্য গ্রন্থাবলী ও খণ্ড কবিতাগুলির মধ্যে মহাকবি কালিদাসের ঋতু-সংহার ও কুমারসম্ভবের কাব্যানুবাদ এবং মহাকবি হোমরের নামে প্রসিদ্ধ একখানি ব্যঙ্গ রচনার প্রাঞ্জল কাব্যানুবাদের কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । কবি এই শেষোক্ত কাব্য গ্রন্থখানির নামকরণ করেছেন 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ' (a mock-heroic poem, জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্যের মতো) । 'ইউরোপ ও এশ্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালার দ্বিতীয় ভাগে রঙ্গলাল রেঃ জে লং সাহেব কর্ত্তৃক সংকলিত নানা ভাষার (জার্ম্মাণ, ইতালীয়ান, স্পানিশ, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী চীনা, তামিল, মালয়ালম্, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি) প্রবাদ বা প্রবচনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন । তিনি মহাকবি কালিদাস-রচিত 'কুমার সম্ভবের প্রথম সাত সর্গ ও অষ্টম সর্গের সন্ধ্যা-বর্ণনের যে অনুবাদ করেছেন তা প্রশংসনীয় । এই অনুবাদ-কর্ম্মে 'তিনি' প্রাচীন কবিগণের অনুসরণে নানা ছন্দের প্রয়োগ করেছেন । ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি রঙ্গলালের শ্রদ্ধাবোধ কতখানি গভীর ছিল, 'কুমারসম্ভবে'র কাব্যানুবাদের 'বিজ্ঞাপনে' তার নিদর্শন আছে । রঙ্গলালের আর একটি উদ্যমও প্রশংসনীয় । তিনি কয়েকটি সংস্কৃত নীতিকবিতার (didactic poems) বঙ্গানুবাদ করে নীতি কুসুমাঞ্জলি' নামে প্রকাশ করেন । কিছু উদ্ভট শ্লোকেরও তিনি বাংলায় তর্জ্জমা করেছিলেন । রঙ্গলালের অনুবাদের একটি নমুনা দিচ্ছি । কোনো প্রাচীন পণ্ডিত বলেছেন—

'দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে ॥'

রঙ্গলাল শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন—

কোকিল গর্ব্বিত নহে চূতরস পিয়ে।
ভেক মকমক করে কর্দ্দম খাইয়ে ॥

ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্যে রঙ্গলাল

রঙ্গলাল মহাকাব্য রচনা করেন নি, ইতিবৃত্ত ও জনশ্রুতি মূলক আখ্যান-কাব্য রচনা করেছেন। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' রঙ্গলালের রচিত প্রথম ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য। (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।) সংকলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Annals of Rajsthan থেকে রঙ্গলাল এই কাব্যের বিষয়-বস্তু গ্রহণ করেন। এই কাব্যের আখ্যান-বস্তু এইরূপ—

কোনো এক উৎসাহী পর্য্যটক ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। পরে তিনি রাজপুতানায় উপস্থিত হন। চিতোর নগরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ হন। কিন্তু চিতোর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে তাঁর অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হয়। এই সময়ে সরোবরকূলে আগত এক স্নানার্থী ব্রাহ্মণের নিকট তিনি চিতোরের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন ব্রাহ্মণ তাঁর নিকট চিতোর দুর্গের ধ্বংসের কারণ বর্ণনা করেন।

চৌহান কুলোদ্ভব সিংহল-নৃপতির কন্যা পদ্মিনী ছিলেন রূপে-গুণে অতুলনীয়া। তাঁর রূপ-গুণের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়েছিল। তার স্বামী ভীমসিংহও পরম রূপবান, বীর্য্যবান, তেজস্বী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক লক্ষ্মণসিংহ রাজকার্য্য-পরিচালনায় অশক্ত ছিলেন, সুতরাং ভীমসিংহই ছিলেন ছিলেন চিতোরের যথার্থ অধিপতি। যোগ্য পাত্রের সঙ্গেই পদ্মিনীর মিলন ঘটেছিল।

কিন্তু পদ্মিনীর অসামান্য রূপ-লাবণ্যই চিতোরের সর্ব্বনাশের কারণ হোলো। তাঁর রূপের খ্যাতি সম্রাট আলাউদ্দীনের কর্ণগোচর হলে তিনি পদ্মিনীকে লাভ করার জন্যে উন্মত্তপ্রায় হোলেন। অবশেষে তিনি অগণিত সৈন্য নিয়ে চিতোর আক্রমণ করলেন। তারপর দীর্ঘকাল রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ করেও আলাউদ্দীন চিতোর দুর্গ অধিকার করতে পারলেন না। তখন তিনি ভীমসিংহের নিকট একটি সর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন সর্ত্তটি হচ্ছে—যদি তিনি একবার মাত্র পদ্মিনী দর্শন লাভ করেন, তবে তিনি আর রাজপুতগণের সঙ্গে যুদ্ধ না করে রাজধানীতে ফিরে যাবেন। এই অপমানসূচক প্রস্তাবে ভীমসিংহ মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন কিন্তু তাঁর প্রতিকার করার কোনো শক্তি ছিল না। তখন পদ্মিনী চিতোরকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি ভীমসিংহকে বল্লেন—পাঠানরাজ আলাউদ্দীন যদি সাক্ষাৎ ভাবে আমাকে দর্শন করে, তা হলে আমাদের কুল কলঙ্কিত হবে, কিন্তু যদি সে দর্পণে আমার ছায়া দর্শন করে সসম্মানে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে, তা হলে উভয় কুল রক্ষিত হয়। দুষ্টবুদ্ধি আলাউদ্দীন এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু দর্পণে পদ্মিনীর রূপ দর্শন করে তিনি তাকে লাভ করার জন্যে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি কৌশলে ভীমসিংহকে কারাগারে নিক্ষেপ

করলেন। তিনি ভীমসিংহকে বল্লেন—যদি পদ্মিনীকে লাভ করতে না পারি, তা হলে তোমাকে হত্যা করে চিতোর নগরী ধূলিসাৎ করব। এই অবমাননাকর প্রস্তাবের উত্তরে ভীমসিংহ আলাউদ্দীনের প্রতি বাক্য-হুতাশন বর্ষণ করলেন। ভীমসিংহের বীরোচিত উত্তর শুনে আলাউদ্দীন বল্লেন—সপ্তাহ কাল মধ্যে পদ্মিনীকে লাভ করতে না পারলে শুধু তোমাকেই হত্যা করা হবে, এমন নয়, চিতোরের দেবমন্দির সমূহ কলুষিত ও নারীর সম্ভ্রম নষ্ট হবে। এই সংবাদ শুনে পদ্মিনী বিপদ সাগরে মগ্ন হলেন কিন্তু ধৈর্য্যহারা হলেন না। তিনি পতির প্রাণ-সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তিনি আলাউদ্দীনের নিকট এই বার্ত্তা প্রেরণ করলেন যে, যদি সম্রাট তাঁর পদমর্য্যাদার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন, তবে তিনি স্বেচ্ছায় সম্রাটের শিবিরে গমন কর্বেন। যদি সম্রাট তাঁর সঙ্গে শিবিকারোহণে সহস্র দাসীকে শিবিরে গমনের অনুমতি প্রদান করেন, তা হলেই তাঁর পদমর্য্যাদাকে স্বীকৃতি দান করা হবে। এই প্রস্তাবে আলাউদ্দীন সম্মত হলেন। তিনি ভীমসিংহকে পদ্মিনীর লিপি দেখালে সেই ক্ষত্রিয় বীর শোকে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

এ দিকে পদ্মিনীর নির্দ্দেশে সহস্র বীর সৈনিক নারীর ছদ্মবেশে শিবিকায় আরোহণ করলেন। কতিপয় সৈন্য শিবিকা বহন করে ভীমসিংহকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পদ্মিনীও দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার মতো বিচিত্র প্রহরণে সজ্জিতা হলেন। ইতিমধ্যে ভীমসিংহের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়েছিল। তখন তিনি চিন্তা করলেন, তাঁকে কারাগার থেকে উদ্ধার করার জন্যেই পদ্মিনী এরূপ প্রস্তাব করেছেন। পদ্মিনীও আলাউদ্দীনের শিবিরে গমন করে কারাগার থেকে পতিকে উদ্ধার করলেন। তারপর সেই বীরাঙ্গনা পতিসহ চিতোরের দুর্গে ফিরে এলেন।

এ দিকে পদ্মিনী যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়াতে আলাউদ্দীনের ক্রোধের সঞ্চার হোলো। আলাউদ্দীন সৈন্যগণকে নির্দ্দেশ দিলেন, শিবিকার আরোহিণীদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করতে। তখন পাঠানদের সঙ্গে রাজপুতগণের সংগ্রাম আরম্ভ হোলো। এই যুদ্ধে রাজপুতগণ বীরবিক্রমে পাঠান সৈন্য সংহার করলেও পরিণামে জয়ী হতে পারেন নি, কারণ, পাঠানেরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছিল। এই সংগ্রামে চিতোরের প্রধান সেনাপতি গোরা অগণিত শত্রু-সৈন্য সংহার করে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বালক বাদল বীর বিক্রমে সংগ্রাম করে মুমূর্ষ অবস্থায় জননীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করে তাঁকে প্রবোধ দেন। গোরার বীর-পত্নী চিতানলে আত্মাহুতি দেন।

এ দিকে অগণিত সৈন্য ক্ষয় হওয়ায় আলাউদ্দীন রাজধানীতে চলে গেলেন কিন্তু এক বৎসর গত হতে না হতেই বহু সৈন্য নিয়ে আবার চিতোর আক্রমণ করলেন। এই অতর্কিত আক্রমণে ভীমসিংহ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি যেন দেখতে পেলেন—জগন্মাতা চণ্ডিকা তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছেন। তিনি ক্ষুধায় কাতরা, ভীমসিংহের একাদশটি পুত্র যদি যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জ্জন দেয়, তবেই তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে। তিনি অমাত্যগণকে এই জাগ্রৎ স্বপ্নের বলা বল্লে—তাঁরা বল্লেন—আমাদের মনে হয়, এটা আপনার দৃষ্টিবিভ্রম, দেবী চণ্ডিকার আবির্ভাব আপনার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। বিষম বিপদের সময় মানুষের মন চিন্তাকুল হলে তাঁর এরূপ দৃষ্টি বিভ্রম* ঘটে থাকে।

এমন সময়ে দৈববাণী হোলো, ভীমসিংহের পুত্রগণ যেন সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে জাতীয়

* Hallucination

ধর্ম এবং চিতোরের গৌরব রক্ষা করেন, ইহাই দেবীর আদেশ। তখন ভীমসিংহ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলে তিনি ভীম বিক্রমে পাঠান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে সমরানলে আত্মাহুতি দিলেন। এই ভাবে ভীমসিংহের দশটি পুত্র পর পর বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করলে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে যুদ্ধ যাত্রার অনুমতি দিলেন না। তিনি স্বয়ং সৈন্যগণকে ক্ষাত্রধর্ম পালনে উৎসাহিত করে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করলেন। তিনি এই সময়ে সৈন্যগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়'। বীরাঙ্গনা পদ্মিনীও এই সময়ে তাঁর বীর পতির যুদ্ধগমনের সংকল্পকে অভিনন্দিত করলেন। তিনি স্বয়ং সহচরীবৃন্দের সঙ্গে একটি পর্ব্বত গুহায় চিতানলে আত্মাহুতি দিলেন। এই স্থানে তাঁরা জহর ব্রত উদ্‌যাপন করলেন। এই ব্রত উদ্‌যাপনের পর ভীমসিংহ পদ্মিনীর অনুমতি গ্রহণ করে স্বয়ং যুদ্ধে গমন করলেন। তখন সেই বীরাঙ্গনা সহচরীদিগকে জহরব্রত পালনে উৎসাহিত করে স্বয়ং চিতানলে আত্মাহুতি দিলেন। সহচরীগণ প্রসন্ন বদনে পদ্মিনীর নির্দ্দেশ পালন করলেন। অগ্নিপ্রবেশের পূর্ব্বে তারা দিবাকরের স্তব পাঠ করলেন।

তারপর মুসলমান সৈন্যগণ চিতোর নগরীকে মহাশ্মশানে পরিণত করলো। শুধু বাদশাহের নির্দ্দেশে তারা পদ্মিনীর মনোহর অট্টালিকাটি রক্ষা করলো।

স্নানার্থী ব্রাহ্মণ নবীন পর্য্যটকের নিকট এই সব কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁকে চিতোরের ধ্বংসাবশেষ দেখালেন। যে গিরি গুহায় পদ্মিনী ও তার সহচরীগণ চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, সেই গিরিগুহার দিকেও পথিক ব্যথিত হৃদয়ে চেয়ে দেখলেন।

কর্ম্মদেবী (১৮৬২)

রঙ্গলালের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্য 'কর্ম্মদেবীর' গল্পাংশও কর্ণেল টডের 'রাজস্থান' থেকে গৃহীত। অবশ্যি, রঙ্গলাল এই সব কাব্য রচনায় বায়রণ, মুর, স্কট প্রভৃতি কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। রঙ্গলালের এই কাব্যে নানা দোষ-ত্রুটি থাকা সত্বেও যে স্থানে স্থানে যথার্থ কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে, মনস্বী রাজেন্দ্রলালের এই অভিমতকে অগ্রাহ্য করা চলে না। রঙ্গলাল নায়িকার নামানুসারেই এই, কাব্যখানিরও নামকরণ করেছেন। 'কর্ম্মদেবীর' আখ্যানবস্তু এইরূপ—

রাজস্থানে যশল্মীরের অন্তর্বর্ত্তী পুগল দেশের রাজা ছিলেন অনঙ্গদেব। তাঁর পুত্র সাধু ছিলেন নানা গুণে অলঙ্কৃত। তাঁর স্বদেশ প্রেমও ছিল অসাধারণ। মুসলমানেরা ভারতবর্ষ অধিকার করে তার পুরাতন কীর্ত্তিকে অনেকাংশে ধ্বংস করেছে, এই চিন্তায় তাঁর চিত্ত অনেক সময় ক্ষুব্ধ থাকতো। তাই যখন তিনি বিপাশা নদীর তীরে মুসলমানদের আগমনের বার্ত্তা শ্রবণ করলেন, তখন সৈন্যগণ সহ সেখানে উপস্থিত হলেন। তারপর তিনি বীর বিক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করলেন।

সাধু গৃহে ফিরে যাবার সময় ঔরিণ্ট নগরের রাজা মাণিক্য দেবের অতিথি হলেন। তাঁর ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা প্রগলভা কর্ম্মদেবী সাধুকে দর্শন ও তাঁর বীর্য্যবত্তার কথা শ্রবণ করে মুগ্ধ

হন। রাঠোর রাজ অরণ্যকমলের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হলেও তিনি তাঁকে নিজের যোগ্য পাত্র বলে মনে করেন নি। তাই বিহার অরণ্যে সখীগণের নিকট তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন,—হয় সাধুকে স্বামিত্বে বরণ, নতুবা জীবন-বিসর্জন, এই আমার প্রতিজ্ঞা। এই কথা বলতে বলতে কর্ম্মদেবী মূর্চ্ছিতা হলে সখীগণ করুণ স্বরে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করলেন। দৈবক্রমে সাধু তখন সেই পথ দিয়ে চলেছিলেন। নারীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করে তিনি প্রাচীর লঙ্ঘন করে কর্ম্মদেবী ও তার সখীগণকে দেখতে পেলেন। ইতিমধ্যে কর্ম্মদেবীরও মূর্চ্ছাভঙ্গ হলো। সখীদের মুখে সাধু সকল বৃত্তান্ত অবগত হলেন। পরদিন তিনি অপূর্ব্ব বীরত্বের সঙ্গে তার প্রতিপক্ষ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করেন। এর পর কর্ম্মদেবী তাঁর এক সখীর হস্তে সাধুকে একটি কুসুমের হার প্রেরণ করেন। কর্ম্মদেবীর পিতা সাধুর হস্তে কন্যা সমর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু কন্যার সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে অবশেষে এই বিবাহে স্বীকৃত হন। বিবাহের পর অরণ্য কমল সাধুকে এক পত্র লিখে তাঁকে সমরে আহ্বান করেন। চন্দনা নদীর তীরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। সাধু যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে বীরাঙ্গনা কর্ম্মদেবী চিতানলে আত্মাহুতি দেন। যেখানে এই শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়, সে স্থানটি 'কর্ম্মসরোবর' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।

শূরসুন্দরী (১৮৬৮)

'শূরসুন্দরী' কাব্যেও রাজস্থানের একটি বীরাঙ্গনা চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। মোগল সম্রাট আকবরের চরিত্র অঙ্কিত করে কবি দেখিয়েছেন, তেজস্বী মানুষের মধ্যে বহু ব্যক্তি বিরাজ করে বলে মানব-চরিত্র অতি জটিল ও দুর্জ্ঞেয়। তাই যে সম্রাট আকবর করুণাসিন্ধু, ন্যায়বান ও সকল জাতির প্রতি সমদর্শী ছিলেন, সেই আকবরই একদিন প্রতিহিংসার বশে হিন্দুধর্ম্মকে সংহার করার ও মেবারের রাণার কুলে কালি দেবার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

জয়পুরের অধিপতি মানসিংহ সম্রাট আকবরকে ভগিনী দান করেন। এই জন্যে তিনি জাতিভ্রষ্ট হন। তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব পুনঃপ্রাপ্তির জন্যে রাণা প্রতাপের সঙ্গে একত্র পানভোজনের অভিলাষে উদয়পুরে যাত্রা করিলেন। রাণা প্রতাপ তার সঙ্গে পান-ভোজন তো করলেনই না, বরং তিনি যখন রাণার অনুগ্রহপ্রার্থী হলেন, তখন রাণা তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন। মানসিংহের অপমানের কথা শুনে আকবর ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। তিনি পুত্র সেলিমকে বিপুল মোগল বাহিনী এবং সেনাপতি মানসিংহ ও প্রতাপের বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা শক্তিসিংহ সহ প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। কিন্তু সুদৃঢ়চেতা উদয়-তনয় মোগলের নতি স্বীকার করলেন না, বরং অপরিসীম দুঃখ বরণ করে ও বন্য ফল মূল আহার করে তিনি বীরবিক্রমে শত্রু-সৈন্য সংহার করতে লাগলেন। একবার প্রতাপের জীবন যখন বিপন্ন হয়েছিল, তখন ঝালবার-পতি তাঁর প্রাণরক্ষার জন্যে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

হলদিঘাটের সেই স্মরণীয় যুদ্ধের পর প্রতাপ যখন অশ্ব-পৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন দুজন মোগল সেনাপতি তাকে বধ করার জন্যে তার অনুগমন করছিলেন। এই সময়ে শক্তি সিংহের অন্তরে লুপ্ত স্বাজাত্যবোধ জেগে ওঠে। তিনি সেনাপতিদ্বয়কে হত্যা করে প্রতাপের প্রাণরক্ষা করেন। এরপর দু' ভ্রাতার মিলন ঘটে।

কৌশলী আকবর তখন মিবারের পবিত্র কুল কলঙ্কিত করার প্রয়াস পেলেন। ভিকন রাজের ভ্রাতা ছিলেন মোগলের পরম প্রনুগ্রহভাজন। তিনি শক্তিসিংহের কন্যা সতীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অকবর এই পতিব্রতা সতীকে নিজের অঙ্কশায়িনী করার দুরভিসন্ধি করেছিলেন। তাই আকবরের আদেশে প্রতি মাসে 'নওরোজা পর্ব্বের' অনুষ্ঠান হতে লাগলো। এই অনুষ্ঠানে শুধু নারীদেরই প্রবেশাধিকার ছিল, নারীরাই এখানে ক্রয়-বিক্রয় ও নানারূপ আলাপ-সম্ভাষণ করতো। আকবর প্রথমে ভিকনের রাণীকে তাঁর বশীভূত করলেন, তারপর সম্রাটের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্যে ভিকনের রাণী সতীকে উৎসব দেখাবার ছলে সেই নৌরোজা হাটে উপস্থিত হলো। সহসা ভিকনের রাণী কোথায় যেন আত্মগোপন করলেন। সেই জনতার মধ্যে সতী পথ হারিয়ে ফেললেন। তিনি বিভ্রান্ত হয়ে একটি পুরীতে প্রবেশ করতেই আকবরের সম্মুখীন হলেন। আকবর তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলে বীরাঙ্গনা সতী অপরিসীম সাহসের পরিচয় দিলেন। তিনি মোগল সম্রাটকে পদাঘাত করলেন এবং এবং তরবারির দ্বারা তাঁর শিরশ্ছেদে প্রয়াসী হলে সম্রাট তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হলেন। তিনি এই মর্ম্মে এক স্বীকৃতি-পত্র লিখে দিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি কোনো রাজপুত-রমণীকে তাঁর অঙ্কশায়িনী করবেন না।

কাঞ্চী-কাবেরী (১৮৭৯)

কটকে অবস্থিতির সময় রঙ্গলাল উড়িষ্যার প্রাচীন বীররসাত্মক কাহিনী অবলম্বনে 'কাঞ্চী-কাবেরী' কাব্য রচনা করেন। তিনি এই আখ্যান কাব্য রচনার দুটি কারণ নির্দ্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ উৎকলবাসীদের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করে উৎকল যে ঘৃণার্হ দেশ নহে, বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট এই সত্য প্রতিপন্ন করা এবং বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত করা, দ্বিতীয়তঃ উড়িষ্যা—সম্পর্কে লেখনী সঞ্চালন করার জন্যে কতিপয় উৎকলবাসী বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করা। বস্তুতঃ, রঙ্গলালের এই কাব্যখানি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—উৎকল দেশ সম্পর্কে বহু বাঙ্গালীর কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করা এবং উড়িষ্যার অধিবাসিগণ যে 'এক সময়ে বীরত্ব ও ধীরত্বভূষণে ভূষিত ছিল', সেই সত্য উদ্‌ঘাটন করা।

'কাঞ্চীকাবেরীর' আখ্যানবস্তু এইরূপ—

কাঞ্চী নগরের রাজার কন্যা পদ্মাবতী পরম রূপবতী ও নানা গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। উড়িষ্যার অধিপতি পুরুষোত্তম পদ্মাবতীর রূপের খ্যাতি শ্রবণে তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। এতে কাঞ্চীর অধিপতি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু তিনি প্রথমে উড়িষ্যাবাসীদের আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দর্শন করার জন্যে পুরীধামে উপস্থিত হন। তিনি জানতে পারেন, পুরুষোত্তম বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হন নি, উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের ভেদও স্বীকৃতি লাভ করেনি, অধিকন্তু তিনি স্বচক্ষে দেখলেন, রথযাত্রার সময় উড়িষ্যার অধিপতিকে সুবর্ণ নির্ম্মিত সম্মার্জ্জনীর দ্বারা নীচ জাতীয় লোকের মতো পথ পরিষ্কৃত করতে হচ্ছে। তখন গণেশের উপাসক কাঞ্চীরাজ পুরুষোত্তমকে কন্যা-সম্প্রাদানে অস্বীকৃত হন। তিনি জগন্নাথের নিন্দা করলে

পুরুষোত্তমও ক্ষুব্ধ হন এবং সসৈন্যে কাঞ্চী বিজয়ের উদ্দেশে অগ্রসর হন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কাঞ্চীরাজের ইষ্ট দেবতা গণপতি তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এদিকে পুরুষোত্তমের ইষ্ট দেবতা জগন্নাথও বলরামকে সঙ্গে নিয়ে কালো ও সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। উৎকলাধিপতি পথিমধ্যে মাণিক নামে এক গোপকন্যার সাক্ষাৎ পান। গোপকন্যা তাঁকে একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করে। সে বলে, দুজন বীর পুরুষ শ্বেত ও কৃষ্ণ অশ্বে আরোহণ করে কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করার সময় তার নিকট থেকে দুগ্ধ পান করেছে এবং তাকে এই অঙ্গুরীয় প্রদান করেছেন, উৎকলের অধিপতিকে এই অঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে দুগ্ধের মূল্য প্রদান করতে হবে। তখন পুরুষোত্তম সেই গোপবালাকে প্রচুর অর্থ দান করেন। তারপর পুরষোত্তম কাঞ্চীরাজকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। কাঞ্চীরাজের কন্যা অবরুদ্ধ হন। রথযাত্রার সময় রাজা যখন জগন্নাথ-দেবের পথ পরিষ্কৃত করতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে মন্ত্রী রাজার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন।

'কাঞ্চীকাবেরীর' আখ্যান-ভাগে ইতিহাস ও জনশ্রুতি মিশ্রিত হয়ে আছে। এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা-কীর্ত্তন, কিন্তু প্রাচীন উৎকলবাসিগণ যে শৌর্য্যো-বীর্য্যে হীন ছিলেন না, 'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ', এই প্রবাদ বাক্যটি যে নিতান্ত অমূলক ছিল ন, পুরুষোত্তমের চরিত্রে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর চরিত্রে অনমনীয় পৌরুষের সঙ্গে দৈন্য ও আর্ত্তির যে সমন্বয়, তাই আমাদের বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে। আবার, রাজস্থানের কাহিনী-অবলম্বনে রচিত আখ্যান-কাব্যগুলিতে রঙ্গলাল বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাগণের চরিত্র অতি নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করে আমাদিগকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি সে কালের বাংলার বহু আত্মচেতনাহীন তরুণদের দৃষ্টি ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের দিকে আকৃষ্ট করে তাঁদের আত্মসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। মোটামুটি এ কথা বলা চলে, রঙ্গলালের সাহিত্য সাধনার মূল উৎস ছিল স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ, রসসৃষ্টির মধ্য দিয়ে লোককল্যাণ-সাধনার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি অনলস সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : ৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার ১২৩৩ বঙ্গাব্দ।

মৃত্যু : ৩১শে বৈশাখ, শুক্রবার ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

বাকুলিয়া গ্রামের পাঠশালা
কবি এখানে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন

রঙ্গলাল স্মৃতি সৌধ
— বাকুলিয়া - হুগলী।
(ফটো : নিমাই চাঁদ সাধুখাঁ)

রঙ্গলাল রচনাবলী

কলিকাতা-কল্পলতা

প্রস্তাবনা (১)

……এইক্ষণেও কলিকাতা নগরে এমন দুই চারিজন লোক পাওয়া যায় যাঁহারা অমরাবতীতুল্য চৌরঙ্গীকে ব্যাঘ্রনিবাস জঙ্গল ও গড়ের মাঠে জলপ্রবাহ দৃষ্টি করিয়াছেন, যে সময়ে দস্যুভয়ে সাহেবদিগের ভৃত্যগণ শুভ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মলিনবেশে ঐ মাঠ দিয়া গমনাগমন করিত এবং রাত্রিযোগে সাহেবরা প্রাণভয়ে মুহুর্মুহু বন্দুকধ্বনি করিতেন। 'অন্যে পরে কা কথা' যে হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্ব-পশ্চিম তীর এক্ষণে বিদ্যাচর্চ্চার গণ্যস্থান হইয়াছে; দিবসের মধ্যভাগে সেই সরোবরকে লোকে ভয়াবহ জ্ঞান করিত এবং সন্ধ্যার পর কাহার সাধ্য সেই মুখে গমন করে? একশত বৎসর হইল—কলিকাতা নগরী ভয়াবহ ব্যাঘ্র নক্রাদির সঙ্কুল জঙ্গলময় বসতিস্থলী ছিল কিন্তু এক্ষণে সেই কলিকাতায় নিয়ত ৫।৬ লক্ষ লোক বাস করিতেছে। (১)

কলিকাতা কি ছিল এবং কি হইয়াছে তদ্বিষয়ে অনেক বক্তব্য পর পৃষ্ঠার তালিকায় প্রকটিত পুরাতন দুর্গের চিত্র(২) দেখিলে এখনকার লোকেরা বিস্ময়াপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, যেহেতু এক্ষণে উক্ত দুর্গের চিহ্নমাত্র নাই—পরন্তু তাহা অন্য কোন নগরের প্রতিরূপ বোধ হইতে থাকিবে। আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি, পরিচ্ছদ, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে কলিকাতার লোকের এই স্বল্পকালমধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে যে, যদি বৈষ্ণবচরণ শেঠ প্রভৃতি বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ লোকেরা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতার পুনর্দর্শন করেন তবে এখনকার কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায়কে দেখিয়া স্বদেশীয় জ্ঞান করিতে সাহসী হইবেন না।

অতএব এই সময়ে আসিয়াখণ্ডের সর্ব্বপ্রধান নগরী এই কলিকাতার শত শত বৎসরের পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করা অতি প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। যেহেতু এই স্মরণীয় বিষয় এক্ষণে সংগৃহীত না হইলে কিছুকাল পরে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাও ব্যর্থ হইবে। এখনও অনেক স্থানীয় লোক জীবিত আছেন এবং দুই-একখানি প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে এতদুভয় দুর্লভ হইয়া উঠিবে। এইসব বিবেচনা করিয়া "কলিকাতা কল্পলতা" নামে এই অভিনব গ্রন্থের রচনাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গেল।

সংগ্রাহকের মন্তব্য

(১) কবিবরের পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবনাটি চারি পৃষ্ঠায় লিখিত ছিল কিন্তু প্রথম দুইখানি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই—সম্ভবতঃ তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবনা অংশের শেষ দুই পৃষ্ঠা সংগৃহীত হওয়ায় তাহাই এখানে দেওয়া হইল।

(২) এখানে দেখা যাইতেছে যে কলিকাতার পুরাতন দুর্গের একখানি চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিবার জন্য রঙ্গলাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপির মধ্যে কোন চিত্র সংগৃহিত না থাকায় তিনি পুরাতন দুর্গের ঠিক কোন্ চিত্রখানির কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাহা ধরা গেল না।

প্রথম অধ্যায়

কলিকাতার প্রাচীনত্ব—বাঙ্গালাদেশের আদ্য রাজধানী নিচয়—প্রাচীন গ্রন্থে কলিকাতার নামোল্লেখ—কবিকঙ্কণ—ঘটকের কারিকা—কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি—শেঠ, বসাকদিগের আদ্যস্থান,—ঢাকা, হরিদপুর, পাতুরিয়াঘাটায় প্রবাস—শেঠ, বসাকদিগের নাম—প্রথম ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ পরিবার।

কলিকাতার প্রাচীনত্ব বিষয়ে অনেক মহাশয়ের ভ্রান্তি আছে। অনেকে কলিকাতা নাম অতি আধুনিক মনে করেন—ফলতঃ আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতেছি যে, কলিকাতা গত শতাব্দীর মধ্যে নগর হিসাবে পরিগণিত হইলেও বস্তুতঃ বহু কালাবধি গ্রাম পদবীতে গণনীয় ছিল। কোন মহাশয় গ্রন্থ বিশেষে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতাকে বাঙ্গালাদেশের ষষ্ঠ রাজধানীরূপে গণ্য করা যাইতে পারে—প্রথম গৌড়; দ্বিতীয় রাজমহল; তৃতীয় ঢাকা; চতুর্থ নবদ্বীপ; পঞ্চম মুর্শিদাবাদ এবং ষষ্ঠ কলিকাতা। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালাদেশের আদ্য রাজধানী যে গৌড় নগর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু নবদ্বীপ নগর প্রকৃত প্রস্তাবে রাজধানী মধ্যে গণনীয় নহে। সেনবংশীয় ভূপতিরা গৌড় নগরেই অবস্থানপূর্ব্বক রাজকার্য্য অবধারিত করিতেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে সুবর্ণ গ্রামে এবং নবদ্বীপে বিরাজ করিতেন—এজন্য যদি নবদ্বীপ রাজধানী মধ্যে ধর্ত্তব্য হয়, তবে সুবর্ণ গ্রাম এবং বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থল সপ্তগ্রামকেও রাজধানী বলা যাইতে পারে। সপ্তগ্রামের প্রতিভা বিষয়ে এতদ্দেশীয় কোন প্রাচীন কবি এইরূপ উক্তি করেন। যথা :—

"কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গাদি কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট॥
বারেন্দ্র বন্দব বিন্ধ্য পিঙ্গল সঙ্কর।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয় নগর॥
মথুরা দ্বারকা কাশী কল্পপুর কায়া।
প্রয়াগ কৌরবক্ষেত্র গোদাবরী গয়া॥
ত্রিহট্ট কাঙ্গর কোচ হাঙ্গর শিলট।
মাণিক করিকা লঙ্কা প্রলম্ব লাঙ্গট॥
বাগন বলিয়া দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বর আহুলন্ধাপুর স্বর্ণগ্রাম॥
শিবাহট্ট মহাহট্ট, হস্তিনা নগরী।
আর যত সহর না বলিবারে নারি॥
এ সব সহরে যত আছে সদাগর।
কত ডিঙ্গা লয়ে তারা যায় দেশান্তর॥
সপ্তগ্রামী বণিক কোথাও নাহি যায়।
ঘরে বস্যে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।
তীর্থ মধ্যে পূর্ণ তীর্থ ক্ষিতি মোক্ষ ধাম
সপ্তঋষি শাসন বলিয়া সপ্তগ্রাম॥

পরন্তু যদিও মুর্শিদাবাদের ভঙ্গদশান্তে কলিকাতার শ্রীসৌষ্ঠব বৃদ্ধি হউক, বস্তুতঃ সরস্বতী নদীর স্রোতমান্দ্য বশতঃ এই সপ্তগ্রাম নগরীর গরিমা হ্রাস হওয়াতেই কলিকাতায় বাণিজ্য লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে ; পূর্ব্বে কি ইউরোপীয় এবং কি এদেশীয় বণিক মাত্রই সপ্তগ্রামে যাইয়া বাণিজ্য করিতেন। সপ্তগ্রামের শ্রীহীনতার অব্যবহিত পরেই পর্ত্তুগীজদের অধীনে কিছুকাল হুগলী নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু সপ্তগ্রামীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ী বণিকেরা ইউরোপীয়দিগের মধ্যেই ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত ব্যবসায়ে অধিক লভ্য ও তাঁহাদিগের অধীনে নির্ব্বিঘ্নে বসতি করণের সমধিক উপযোগিতা দর্শন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বসতি করিলেন, তদবধি এই নগরের শোভা প্রতিভা পদ্মবনের ন্যায় অতি অল্পকালের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

অপিচ কলিকাতার প্রাচীনত্বের বিষয় আমরা পুনর্ব্বার অনুস্মরণ করি,—এই স্থান যে নিতান্ত আধুনিক নহে, তাহার বহুল প্রমাণ লব্ধ না হইলেও পুষ্টিপূরক বিলক্ষণ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এদেশের একজন প্রাচীন কবি অর্থাৎ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত আছেন—তৎরচিত চণ্ডী কাব্যে শ্রীমন্ত সাধুর সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য প্রস্থান প্রকরণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা :—

নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানী॥
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে গোন্দল পাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়ে গেলেন নপাড়া॥
ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী সেই ঘাটে মেলা।
ইছাপুর এড়াইল বাণিয়ার বালা॥
উপনীত হইল নিমাই তীর্থ ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা জবা ফুল ফোটে॥
ত্বরায় চলয়ে তরী তিলেক না রয়।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ কয়॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়ে যায়।
সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগল মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী।
কুচিনাল এড়াইল সাধু শ্রীয়পতি॥
তীরসম ছোটে তরী তরঙ্গের ঘায়।
চিত্রপুর এড়াইয়া শালিখাতে যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বাণিয়ার বালা।
বেতরতে উত্তরিল অবসানে বেলা॥
বেতাঙ্গ চণ্ডিকা পূজা করি সাবধানে।
ধনতার গ্রাম সাধু এড়াইল বামে॥
ডাহিনে ত্যজিয়া যায় হিজলীর পথ।
কিনিয়া লইল রাজহংস পারাবত॥
বালীঘাটা এড়াইল বাণিয়ার বালা।
কালীঘাটে উপনীত অবসানে বেলা॥

এক্ষণে ত্রিবেণী হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত উল্লেখিত গ্রামনিচয়ের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয় মাত্র থাকিতে পারে না। কলিকাতা দূরে থাকুক, খিদিরপুরের উত্তরে অবস্থিত বালীঘাটার নাম পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেছে অথচ খিদিরপুরের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রভৃত এই কাব্যগ্রন্থ অল্পদিনের নহে। কবিকঙ্কণ লেখেন :—

শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কব কত দিল গীত হরের বণিতা॥

'অঙ্কস্য বামাগতি' এই নিয়মে গণনা করিলে চণ্ডীগ্রন্থ ১৪৬৬ শকে প্রস্তুত বিধায় ইহাই প্রমাণ হইতেছে কলিকাতা গ্রাম তিনশত বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল।

অপর, দেবীবর কর্ত্তৃক এদেশীয় কুলীনদিগের মেল বদ্ধ হইলে পর তাঁহারা যে যে স্থানে বসতি করেন, সেই সেই স্থানের নামানুসারে বিখ্যাত হন। যথা :- ফুলিয়ার মুখুটি; খড়িয়ার চাটুতি; সাগরদহের বন্দ্য; কলিকাতার ঘোষাল—ইত্যাদি। ঘোষাল বংশীয় পদ্যে হইতে কলিকাতার ঘোষাল নাম হয়। যথা কারিকা—(১)

এই পদ্য (২) অনূন ··বৎসর গত হইল বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং ইহাতেও কলিকাতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বহুতর কল্পনা কল্পিত হইয়াছে। কোন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, অনেক নগরের নাম দেবমণ্ডপাদির আখ্যা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে অতএব বোধহয়—কলিকাতার অদূরবর্ত্তী পীঠস্থান কালীঘাটের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়া থাকিবে। অর্থাৎ কলিকাতার নাম, কালীঘাট অথবা কালীঘাটার অপভ্রংশ মাত্র। অন্য এক মহাশয় লেখেন, ইং ১৭৪২ অব্দে মহারাষ্ট্রীয় উৎপাত নিবারণার্থ যে খাল খনিত হয়, সেই 'খালকাটা' হইতে 'কলিকাতা' নাম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। যেহেতু উক্ত অব্দের পূর্ব্বে কলিকাতা নাম প্রচলিত ছিল না। এই উভয় ব্যুৎপত্তি যে নিতান্ত অমূলক তাহা উপরিভাগে উদ্ধৃত পদ্য ও কবিকঙ্কণ বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিতেছে, কারণ ইং ১৭৪২ অব্দের অনেক পূর্ব্বে কলিকাতা নাম প্রচলিত ছিল।

প্রাগুক্ত ব্যুৎপত্তিদ্বয় ব্যতীত আর এক হাস্যজনক ব্যুৎপত্তি এই যে, ইংরাজেরা যখন প্রথমে এইস্থানে বাণিজ্যার্থ আপনারা আগমন করিলেন তখন পথিমধ্যে দণ্ডায়মান কোন লোককে অঙ্গুলি প্রসারণপূর্ব্বক স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে ব্যক্তি সেইদিকে শায়িত এক ছিন্নবৃক্ষ দেখিয়া মনে করিল সাহেবেরা কবে ঐ বৃক্ষচ্ছেদন হইয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অতএব সে উত্তরচ্ছলে কহিল —"কালকাটা"। সেই হইতে ইংরাজেরা ইহার নাম "ক্যালকাটা" রাখিলেন। এই ব্যুৎপত্তি অমূলক হইলেও ইহার রচয়িতার চতুর বুদ্ধির ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ কোৎরঙ্গ —কুচিনান প্রভৃতি গ্রামাখ্য যেমন নিরর্থক,—কলিকাতা শব্দও যে সেইরূপ নিরর্থক তাহাতে সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই।

এইরূপে কলিকাতার প্রাচীনত্ব সাব্যস্ত হইলেও তাহা বহুকালাবধি ইতর লোকের বাসস্থান ছিল,—অনন্তর অনুমান দুইশত বৎসর বিগত হইল সপ্তগ্রামের শেঠ ও বসাকখ্যাত তন্তুবায় জাতীয় ব্যবসায়ীগণ উক্ত প্রাচীন নগরের নিকটবর্ত্তী আপনাদিগের বাসস্থান হরিদপুর গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। এই শেঠবসাকদের পূর্ব্ব নিবাস ঢাকায় ছিল। অদ্যাপি তৎপ্রদেশে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির ভূসম্পত্তি আছে। আমাদিগের

আত্মীয় (৩) কোন বসাকের নিকট তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অধিকৃত ঢাকার নিকটস্থ কতিপয় গ্রামাদির কাগজপত্র আছে ; ফলতঃ অন্যূন একশত বৎসর হইল তাঁহারা ঐ বিষয়ের অধিকার ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

ঢাকার শেঠবসাকেরা যদিও কলিকাতার শেঠবসাকদিগের সহিত একগোত্রজ হউন কিন্তু বহুদিবস যাবৎ তাঁহাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদবশতঃ এক্ষণে করণ কারণ রহিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের তন্তুবায় কারফরমাদিগের সঙ্গেও কলিকাতাস্থ শেঠবসাকদিগের এইরূপ সম্বন্ধ। মৃত রাধাকৃষ্ণ বসাক কারফরমাদিগের সহিত পুনর্ব্বার কুটুম্বিতাকরণের প্রস্তাব করেন। তাহাতে কারফরমারা সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু এক সামান্য অনৈক্য সূত্রে এই বাঞ্ছনীয় সদ্ভাব সংস্থাপনে ব্যাঘাত সম্ভূত হয়। তাহা এই যে, কারফরমাকুলের অঙ্গনাগণ বামাঙ্গে রজতালঙ্কার পরিধান করেন কারফরমারা সেই পুরুষ পরম্পরাপ্রচলিত কুলাচার পরিত্যাগে সম্মত না হওয়ায় রাধাকৃষ্ণ বসাক পূর্ব্ব প্রস্তাবে পরাঙ্মুখ হইলেন। সে যাহাই হউক ঢাকাই শেঠবসাকদিগের আদ্যস্থান। তথা হইতে তাঁহারা প্রথমে মুর্শিদাবাদে ও তৎপরে সপ্তগ্রামের নিকট হরিদপুরে বসতি করেন। তদনন্তর সপ্তগ্রাম ও হুগলীর প্রতিভা হ্রাস হইলে কলিকাতায় আসিয়া বড়বাজারে বসবাস করিতে লাগিলেন—অভিপ্রায় এই যে, সরস্বতী মন্দা পড়িয়া গেলে ভাগীরথী প্রবলা থাকায় ইউরোপীয়েরা সেই নদী হইয়া আগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য-ব্যবসা করিবেন—সুতরাং যত অগ্রসর হইয়া থাকা হয় ততই উভয়পক্ষের মঙ্গল। শেঠবসাকেরা ঐ স্থানে বসতিপূর্ব্বক আপনাদিগের ব্যবসায়ানুসারে 'সুতানুটী' শব্দে তাহার নামকরণ করিলেন। (৩)

হিন্দু ভদ্রগ্রামের লক্ষণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থাদি সজ্জাতির বাস—যেহেতু তাঁহাদিগের অভাবে যজন, যাজন, চিকিৎসা পথ্যাদ লিখন-পঠনের উপায় থাকে না। অতএব উক্ত সুসম্পন্ন তন্তুবায়েরা একঘর ব্রাহ্মণ, একঘর বৈদ্য এবং একঘর কায়স্থ আনাইয়া আপনাদিগের নিকটে সংস্থাপিত করেন। পাতরিয়াঘাটার শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ঠাকুরগোষ্ঠী উক্ত ব্রাহ্মণের এবং সেইস্থানে মজুমদার খ্যাত বৈদ্যেরা উক্ত বৈদ্যের এবং কলিকাতা নিবাসী প্রথম কায়স্থের বংশধরগণ হয়েন।

মন্তব্য

(১) বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সমাজে যে কৌলিন্য মর্য্যাদা আছে, তাহার বিরাট ঐতিহ্য এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বহু "কুলগ্রন্থ" সকল রচিত হইয়াছিল। এই সকল 'কুলগ্রন্থ' তখনকার দিনে ঘটকদিগের নিকট থাকিত। দেবীবর ঘটক রচিত যে "কারিকা"র কথা রঙ্গলাল এখানে উল্লেখ করিতেছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ করা বর্ত্তমানে সম্ভবপর হইল না। সংক্ষেপে একটা ধারণা দেওয়া হইল মাত্র। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টী যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন শাস্ত্রাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নাম যথাক্রমে :—(১) শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণ, (২) ভরদ্বাজ গোত্রজ শ্রীহর্ষ (৩) কাশ্যপ গোত্রজ দক্ষ, (৪) বাৎস্য গোত্রজ সুধানিধি এবং (৫) সাবর্ণ গোত্রজ বেদগর্ভ। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণই যথাক্রমে বর্ত্তমান বাঙ্গালার—বন্দোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ঘোষাল এবং গঙ্গোপাধ্যায় পদবাধারি ব্রাহ্মণবংশীয়দিগের আদিপুরুষ। রাজা আদিশূরের পুত্র

ভূশূর রাজ্যচ্যুত হইয়া রাঢ়দেশে (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলা) সামান্য জমিদার মাত্র হন। তার পৌত্র ধরাশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলাচল এবং সংশ্রোত্রীয় এই দুইভাগে বিভক্ত করেন। ধরাশূর হইতে ৫ম পুরুষ চন্দ্রশূরের দৌহিত্র এবং বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমগ্র বঙ্গদেশ ও উত্তর বিহার অধিকার করেন। তিনি কুলাচল ব্রাহ্মণদিগের গুণাগুণ বিচার করিয়া তাঁহাদের মুখ্য কুলীন ও গৌণ কুলীন এই দুই পর্য্যায়ে ভাগ করিয়া যান। অতঃপর ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলে দেশের সামাজিক প্রগতি অবরুদ্ধ হয়। তারপর ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ভট্টনারায়ণ হইতে ১৮শ পুরুষ বিখ্যাত দেবীবর ঘটকের আবির্ভাব ঘটে। এই দেবীবর এক সামাজিক সভা আহ্বান করিয়া কুলীনদিগের দোষাবলী বিচার করিয়া তাঁহাদের ৩৬টি মেলভুক্ত করেন। অর্থাৎ কৌলিন্য মর্য্যাদা হিসাবে তিনি কুলীনদিগকে ৩৬টি পর্য্যায়ে বিভক্ত করেন। দেবীবর ঘটকের পর আর কেহ সামাজিক সভা আহ্বান করেন নাই।

(২) দেবীবর ঘটক, কনোজাগত সুধানিধি হইতে ১৬শ পুরুষ পশ্চাৎ অর্থাৎ পশুপতি ঘোষালকে সর্ব্বানন্দী মেলভুক্ত করিয়াছিলেন। দেবীবর ঘটক কর্তৃক বঙ্গীয় কুলীনদিগের "মেলবন্ধ" হইয়াছিল ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে এবং পশুপতি সে সময় কলিকাতা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন কাজেই রঙ্গলালের এই গ্রন্থ রচনা কাল (১৮৫০ খৃঃ) হইতে পশুপতি ঘোষালের বিদ্যমানতার ব্যবধান দাঁড়ায়—৩৭০ বৎসর।

(৩) এখানে দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত শেঠ-বসাকেরা তাঁহাদের বাসভূমি সপ্তগ্রামের সন্নিহিত হরিদপুর গ্রাম হইতে কলিকাতার বড়বাজারে আসিয়া প্রথম বসবাস করেন, তাঁহাদের নামগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তক মধ্যে দিবার ইচ্ছা রঙ্গলালের ছিল। কিন্তু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মধ্যে উক্ত স্থানটি শূন্য থাকায় এরূপ অনুমান হয় যে, তিনি হয়তো নামগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংরাজদিগের বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য করণার্থ অনুমতি প্রাপ্তি—বালেশ্বর ও হুগলীতে বাণিজ্যালয় স্থাপন—ভাগীরথীতে ইংরাজদিগের জাহাজ প্রবেশ—নিরন্তর বাণিজ্যকরণের শক্তি-লাভ—সাগরসঙ্গমের নিকট দুর্গ নির্ম্মাণের অভিসন্ধি—নবাবের সহিত ইংরাজদিগের মতান্তর—পোতাধ্যক্ষ নিকলসনের দশখানা জাহাজ সমভিব্যাহারে ভাগীরথী প্রবেশ—হুগলী নগর ধ্বংস—ইংরাজদিগের বাণিজ্যালয় সমূহের প্রতি আক্রমণ—সুতানুটিতে চার্ণক সাহেবের প্রস্থান ও তথা হইতে হিজলী উপদ্বীপে আশ্রয়—ইব্রাহিম খাঁ নবাব কর্ত্তৃক ইংরাজদিগকে পুনরাহ্বান—কলিকাতা নগর স্থাপন—দোভাষি শব্দের ভ্রমক্রমে জনৈক ধোবার সৌভাগ্য।

কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠা প্রকরণ গণনা পূর্ব্বে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ জাতির এদেশে আগমন বৃত্তান্ত বিবৃত করা কর্ত্তব্য বলে চিত্ত হইতেছে। অহো! এদেশে ইংরাজদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্যের ক্রমশঃ প্রাখর্য্য বৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যেরূপ বায়সভুক্ত বটবীজ অঙ্কুরিত হইয়া শত শত জীবের আশ্রয়দাতা সুবিস্তীর্ণ ছায়া সমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে শোভা পাইতে থাকে। যেরূপ অত্যল্প অনল স্ফুলিঙ্গ কর্তৃক অল্পকাল মধ্যে ভয়াবহ দাবদাহ আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং যেরূপ হিমালয় শৃঙ্গোপরে তুষার রাশিচ্যুত রজত রেখাকার তটিনীসকল সঞ্চিত হইয়া পরিণামে কত কত শৈলভেদ পূর্ব্বক বহিস্ফূর্তবেগে গিরিতলে পতিত হইয়া সহস্রাধিক ক্রোশ ব্যবধানে সিন্ধুশাখাবৎ আকৃতি ধারণ করিতেছে-সেইরূপে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের আধুনিক প্রবল পরাক্রমের নিদান স্বরূপ এই বাঙ্গালাদেশে ক্ষুদ্র এক বাণিজ্যালয় স্থাপন মাত্র।

ইংরাজী ১৬৩৪ অব্দে যে সময়ে শাহজাহান বাদশাহ ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহার্থ প্রবাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার এক দুহিতার বস্ত্রে একদা দৈবাৎ অনল সংলগ্ন হওয়ায় তাহার শরীর গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়া যায়। সেই রাজকুমারীর যাতনা প্রতিকার নিমিত্ত সুরাটস্থ ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যকুঠি হইতে জনৈক ইংরাজ চিকিৎসক আনয়নার্থ সংবাদ প্রেরিত হইলে বোটন নামক একজন সাহেব উক্তকার্য্যে বৃত হন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার চিকিৎসা কৌশলে নৃপনন্দিনী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করাতে সম্রাট মহোদয় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বোটনকে কহিলেন—"তোমার ইচ্ছানুসারে আমি পুরস্কার করিব, অতএব তোমার কি ইচ্ছা কহ।"

উদারচিত্ত স্বদেশহিতৈষী বোটন কহিলেন—"আমার আত্মস্বার্থে কিছু প্রার্থনা নাই। আমার দেশীয় লোকেরা বাঙ্গালাদেশে শুল্ক ব্যতীত বাণিজ্য করিবার জন্য বাণিজ্যালয় স্থাপনের অনুমতি পাইলেই আপনাকে প্রভূতরূপে পুরস্কৃত জ্ঞান করিব।"

সম্রাট যদিও 'তথাস্তু' বলিয়া বরপ্রদান করিলেন বটে কিন্তু পর্তুগীজদিগের অত্যাচারে অনুশোচনা হওয়ায় বালেশ্বরের নিকট পিপ্‌লি নামক স্থানে বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ বিধান করিলেন। তদনুসারে ইং ১৭৩৪ অব্দে তথায় প্রথম বাণিজ্যালয় সংস্থাপন হইল। তদনন্তর ইং ১৬৩৯ অব্দে শাহজাহান বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা বাংলাদেশের নবাবী পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজধানী রাজমহলে আসিলে পর বোটন সাহেব স্বজাতির পক্ষ হইতে যথা বিহিত

সম্মান প্রদর্শনিকরণার্থ উক্ত স্থানে যান। দৈবাধীন অন্তঃপুরচারিণী কোন রাজ মহিলার সাংঘাতিক পীড়া হইলে বোটন সাহেবের চিকিৎসানৈপুণ্য সুবিখ্যাত হইয়া উঠায় নবাব উক্ত রোগ প্রতিকারার্থ তাঁহাকেই বরণ করিলেন। তাহাতে বোটন সাহেব স্বীয় বিদ্যাবলে ভূপতি ভামিনীকে নিরাময় করাতে সুলতান সুজা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া বালেশ্বর এবং হুগলী নগরে ইংরাজদিগকে বাণিজ্যালয় স্থাপনে অনুমতি দান করেন।

তারপর নবাব সায়েস্তা খাঁর অধিকারকালে ইং ১৬৬৮ অব্দে ইংরাজেরা ভাগীরথী বাহিয়া হুগলী নগরীর নিকট জাহাজ লইয়া যাইতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা স্লুপ যোগে দ্রব্যাদি লইয়া বাহির সমুদ্রে জাহাজ বোঝাই করিতেন। অপর প্রত্যেক নূতন নবাবের শাসনারম্ভেই তাঁহাদিগকে নূতন ফার্ম্মাণ অর্থাৎ বাণিজ্যকরণের অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইত—তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল। কিন্তু নবাব সায়েস্তা খাঁর অনুগ্রহে সে দায় হইতেও তাঁহারা মুক্ত হন। এই নবাব দিল্লীতে প্রস্থান করিলে তৎসমভিব্যাহারে ইংরাজদিগের বাণিজ্যকুটির বড় সাহেব গমন করতঃ এক ফার্ম্মাণে নিরন্তর বাণিজ্যকরণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। যদিও বিস্তর ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক তাহা লব্ধ হউক কিন্তু তাহা পাইয়া ইংরাজেরা এরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই উপলক্ষ্যে তিনশতবার তোপধ্বনি করিয়াছিলেন।

ইহার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেখিলেন বিলাত হইতে অপরাপর অনেক ব্যবসায়ী আসিয়া বাণিজ্য করাতে তাঁহাদিগের লাভের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। অতএব কোর্ট অব ডাইরেক্টর সভার আজ্ঞানুসারে উক্ত প্রতিযোগীদিগের আগমন নিবারণ নিমিত্ত গঙ্গাসাগরের নিকট এক দুর্গ নির্ম্মাণার্থ নবাবের স্থানে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ইহা ব্যতীত এই সময়ে বেহারপ্রদেশে রাজদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় পাটনাস্থ ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যকুটির সাহেবের উপর সন্দেহ হইলে নবাব ইংরাজদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, তাঁহাদিগের বাণিজ্য সম্পত্তি মাত্রের মূল্য অনুসারে শতকরা ৩৷৷০ টাকা করিয়া কর দিতে হইবে। পূর্ব্বে সম্রাটের আজ্ঞানুসারে তাঁহারা বার্ষিক তিন সহস্র টাকা মাত্র দিয়া নিস্তার পাইতেন। ইংরাজদিগের প্রতি নবাবের বিরুদ্ধভাব জানিতে পারিয়া তদধীন রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিতে লাগিল। নবাবের লিখনানুসারে সম্রাট অত্যন্ত ক্রোধাপন্ন হইয়া ইংরাজদিগের প্রতি উত্তেজনাকরণে অনুমতি দেওয়ায় তাঁহারা মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন। এই সকল সমাচার ইংলণ্ডাধিপের শ্রবণগোচর হইলে তিনি কোম্পানীর আনুকূল্যে নিকলসন নামক জনৈক পোতপতির অধীনে ৬ শত সেনা পূর্ণ দশখানা রণপোত প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল তরণী বাত্যাভিপাতে সমুদ্রে দলভঙ্গ হইয়া পড়ে; কয়েকখানা মাত্র ভাগীরথী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত মান্দ্রাজের বড় সাহেব হুগলীস্থ কুটির সাহায্যের জন্য ১ শত পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁ জলপথে এবং স্থলপথে এই সকল সমরায়োজন দেখিয়া সঙ্কুচিত চিত্তে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দৈবাধীন একটা সামান্য কলহোপলক্ষে তদনন্তর অগ্নিকুণ্ড উপস্থিত হইল। তাহা এই যে, তিনজন ইংলণ্ডীয় সৈন্য হুগলীর বাজারে ভ্রমণার্থ উঠিলে নবাবের সৈন্যেরা তাহাদিগকে গুরুতর প্রহারে আহত করে। তৎ শ্রবণমাত্রে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ইংরাজ সেনা তীরস্থ হইলে উভয়পক্ষের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং নিকলসন সাহেব জাহাজ হইতে একধারে গোলা বর্ষণ করিতে থাকেন; তাহাতে অন্যান

৫ শত গৃহ ধূলিসাৎ হইয়া যায়—তন্মধ্যে কোম্পানীর গুদাম সকলও বিধ্বংস হওয়াতে ৩০ লক্ষ টাকা অপচয় হয়।

ইহা শ্রবণে নবাব কোম্পানীর পাটনা, ঢাকা ও কাশীমবাজারস্থ শাখা বাণিজ্যালয় সকল আক্রমণ পূর্ব্বক ইংরাজদিগকে বাঙ্গালাদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত করণার্থ অশ্বারোহী ও পদাতি সেনাসমূহ প্রেরণ করিলেন। হুগলী কুটির বড় সাহেব ইং ১৬৮৬ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর দিবসে সুতালুটিতে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন। যেহেতু ঐস্থানে তৎকালে শেঠ-বসাকেরা অধিবসতি করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব থাকাতে বাণিজ্যকার্য্য স্থগিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ঐ মাসের শেষে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য নবাব স্বীয় পক্ষ হইতে তিনজন দূত প্রেরণ করেন—তাহাতে পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা অনুসারে ইংরাজেরা বাণিজ্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সন্ধি করিবার পক্ষে নবাবের আন্তরিক অভিসন্ধি এই যে, কোনমতে কালহরণ হইলে সহসা একদা ইংরাজদিগের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে এককালীন এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। অতএব ইং ১৬৮৭ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে হুগলীতে প্রচুর সৈন্য প্রেরণ করিলে চার্ণক সাহেব সুতালুটিতে আপনাকে নির্বিঘ্ন না বুঝিয়া স্বদল সমভিব্যাহারে সাগরসঙ্গমে গিয়া হিজলি নামক এক অস্বাস্থ্যকর উপদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ স্থানে বাস করিবার অব্যবহিত পরেই রোগোপদ্রবে অধিকাংশ ইংরাজ পরলোকগত হইলেন।

এই সময় ইংরাজদিগের এরূপ দুর্গতি হইয়াছিল যে, তাঁহারা বাঙ্গালাদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বিলাতীয় কর্তৃপক্ষ বাদশাহকে স্বকীয় বল বিজ্ঞাত করণার্থ আপনাদিগের সুরাটস্থ বাণিজ্যালয় স্থগিত করিয়া উক্ত স্থানের নিকট কয়েকখানা রণতরী রাখাইয়া দিলেন। তথা হইতে যে সকল মুসলমানীয় তরণী মক্কাভিমুখে যাত্রী লইয়া যাইত, সেই সকল নাখোদা চালিত জাহাজের উপর উক্ত পোতাধ্যক্ষেরা মহা উৎপাত আরম্ভ করিলে বাদশাহ অগত্যা ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। অতএব তাঁহার আজ্ঞানুসারে সায়েস্তা খাঁ পুনর্ব্বার চার্ণক সাহেবকে ডাকাইয়া স্বেচ্ছানুসারে বাঙ্গালাদেশের যে কোন স্থানে বাণিজ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিলেন; আর শতকরা ৩॥০ টাকা হারে যে শুল্ক গ্রহণের রীতি ছিল, তাহাও রহিত হইল—ইংরাজেরা উলুবেড়িয়াতে আসিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই বিশ্বাসঘাতক নবাব পুনর্ব্বার তাহাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করাতে বিলাতীয় কর্তৃপক্ষ কাপ্তেন হীথ সাহেবের অধীনে প্রচুরতর সামুদ্রিক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যদিও এই সময়ে ইংরাজদিগের সহিত নবাবের পুনর্ব্বার সৌহার্দ্দ জন্মনের সম্ভাবনা হইয়াছিল কিন্তু হীথ সাহেবের অব্যবস্থিত চিত্ততাবশতঃ তাহা সমূলে উচ্ছিন্ন হওয়ায় ইংরাজদিগের এরূপ দুর্দ্দশা হইল যে তাঁহারা বাঙ্গালাদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে বাধ্য হইতেন। তখন সমুদ্রপথে ইংরাজ রণপোতাধ্যক্ষগণ মুসলমানীয় জাহাজ মাত্রের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে দিল্লীশ্বর অত্যন্ত জ্বালাতন হইয়া ১৬৮৯ অব্দে নবাব ইব্রাহিম খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন, ইংরাজদিগের পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করা গেল, তাহাদিগের ৩০০০ সহস্র টাকা মাত্র বার্ষিক কর লইয়া পুনর্ব্বার বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা দিবে। তদনুসারে সন্ধি হইলে ইং ১৬৯০ অব্দের ২৪শে আগষ্ট দিবসে জব চার্ণক সাহেব সুতানুটিতে পুনর্ব্বার উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা নগর প্রতিষ্ঠা

করিলেন। স্থতরাং ঐ দিবস হইতেই কলিকাতা,—নগর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। অতএব দেড়শত বৎসরাধিক হইল এই মহারাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত শুভকার্য্যের দুই বৎসর পর মহাত্মা প্রতিষ্ঠাতা চার্ণক সাহেব লোকান্তরিত হন। অদ্যাপি তাঁহার সমাধি সেণ্ট যন্স চর্চ অর্থাৎ পাতরিয়া গীর্জ্জায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নামেই চাণক গ্রামের নামকরণ হইয়াছে।

এক্ষণে এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা যে ওলন্দাজ, ফরাসীস্, ও দীনেমার প্রভৃতি অপরাপর ইউরোপীয়েরা গঙ্গার পশ্চিম পারে সকলেই নগর প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু ইংরাজেরা কিজন্য পূর্ব্ব পারে স্থান গ্রহণ করিলেন? পশ্চিম পারে নদীর স্নমধুর সমীরণ প্রবাহিত ও প্রভাতে স্র্য্যোদয়ের শোভা বিলোকিত হয়—পূর্ব্ব পারে পূর্ব্বোক্ত ত্বগেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সুখলাভ হয় না। কিন্তু পূর্ব্ব পারে কলিকাতা স্থাপনের ভিন্ন ভিন্ন তিন কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম—পশ্চিম পারাপেক্ষা পূর্ব্ব পারে ভাগীরথীর গভীরতা, দ্বিতীয়—শেঠ বসাকদিগের অনুরোধ এবং তৃতীয়—মহারাষ্ট্রীয়েরা গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিত না। (১)

অনেক স্থলে সামান্য একটি ভ্রমসূত্রে মহত্তর কীর্ত্তিকলাপ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। মহাত্মা কলম্বস পৃথিবী পরিধির অসম্যকজ্ঞানজনিত ভ্রমে নব ভূখণ্ড প্রকাশে উৎসাহী হন। আটলাণ্টিক সমুদ্রের প্রকৃত পরিসরের পরিজ্ঞান থাকিলে তিনি তৎকালে কদাচই উক্ত সাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন না। যদি মহদ্বিষয়ের সহিত ক্ষুদ্র বিষয়ের তুলনা সাধ্য হয়, তবে কলিকাতা নগরের প্রথমাবস্থায় এইরূপ এক ভ্রমের কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। তাহা এই যে, ইংরাজেরা প্রথমতঃ কলিকাতার নীচে ভাগীরথীতে জাহাজ লাগাইয়া শেঠ দিগের স্থানে একজন দ্বিভাষী প্রার্থনা করিয়া পাঠান। মান্দ্রাজে দ্বিভাষী শব্দের অপভ্রংশ "দোবাস" শব্দ—স্থতরাং সাহেবরা "দোবাস" চাই বলিয়া পাঠাইলে এই অশ্রুত অপূর্ব্ব শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তন্তুবায়মণ্ডলী মহাচিন্তিত হইলেন। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রাচীন চাঁই বহুক্ষণ বুদ্ধিচালনাপূর্ব্বক কহিলেন যে, ইংরাজেরা জনৈক "ধোবা" চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। অতএব উক্ত বৃদ্ধের বচন অনুসারে তাঁহারা একজন ধোবাকে সাহেবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। ধোবা জাহাজে উত্থানমাত্র সাহেবেরা মহাপুলকিত হইয়া তোপধ্বনিপূর্ব্বক তাহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করতঃ রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা* দিয়া বিদায় করিলেন। ঐ ধোবা অত্যন্ত চতুর বুদ্ধিজীবী ছিল। সে অতি অল্পকালের মধ্যে ইংরাজদিগের সমুদয় কার্য্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন করায় তাঁহারা তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন এবং রজকপুত্র কিছুকাল পরে কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান ধনী হইয়া উঠে। ঐ সৌভাগ্যশালী রজকের নাম—(২) পাতরিয়াঘাটার উত্তরাংশে রঘু সরকারের নামে যে বর্ত্ম বিখ্যাত আছে (৩)—ধোবা ঐ রঘু সরকারের পিতামহ ছিল। এই কোটীশ্বর রজক উক্ত স্থানে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসতি করে কিন্তু শেঠদিগের বাটীর সম্মুখে ঐ অট্টালিকার সিংহদ্বার নির্ম্মিত হইলে প্রভাতে রজকের মুখদর্শন অশুভকর বিধায় মেয়র আদালতে শেঠেরা আপত্তি উপস্থিত করেন। তাহাতে মেয়র সাহেব, ধোবাদিগের ইতরত্ব বিষয়ে সংশয় উপস্থিত করিলে শেঠেরা বলেন—"সাহেব! তোমার বেয়ারাগণ যদি ঐ ধোপার পাল্কী বহন করে, তবে তাহাদের ভদ্রত্ব বিষয়ে আমাদের কোন আপত্তি নাই।" তাহাতে মেয়র সাহেব স্বীয় বেয়ারাদিগকে রজক নন্দনের পাল্কী বহিতে কহিলে তাহারা অস্বীকার করাতে বিচারপতি ধোবাদিগের নীচত্ব বিষয়ে সংশয়শূন্য হইয়া উক্ত সদর দরজা বন্ধ করিয়া বাটীর পশ্চাদ্ভাগে

* Preface of Ram Comal Sen's Dictionary.

গম্যপথ প্রস্তুত করিবার অনুজ্ঞা দেন। কিন্তু এখন যদিও বাহকেরা রজক বহনে অস্বীকার করুক তথাপি রাজদ্বারে উক্ত প্রকার অবিচার কখনই হইবার সম্ভাবনা নাই।

মন্তব্য

(১) রঙ্গলাল লিখিতেছেন যে, গঙ্গার পূর্ব্বপারে কলিকাতা স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, মহারাষ্ট্রিয়েরা গঙ্গার পূর্ব্বপারে আসিত না। ইতিহাসে দেখা যায় যে, বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা ঘটে—১৭৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসর কাল অর্থাৎ ঐতিহাসিক বর্গীর হাঙ্গামার প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরী স্থাপিত হয়। মহারাষ্ট্রনায়ক শিবাজীই প্রতিবেশী রাজ্য ও মোগল অধিকৃত রাজ্য হইতে "চৌথ" ও "সরদেশমুখী" নামে দুইটি কর আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যে অঞ্চল স্বেচ্ছায় এই কর দিত না, সে অঞ্চলে মারাঠা সৈন্যেরা লুটতরাজ করিত। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয় এবং শম্ভুজী রাজা হন কিন্তু ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শম্ভুজী ঔরঙ্গজেবের হস্তে পতিত হইয়া নিহত হইলে শিবাজীর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রাজারাম রায়গড় হইতে পলাইয়া কর্ণাটক প্রদেশের জিঞ্জিতে যান ও নিজেকে মারাঠারাজ হিসাবে ঘোষণা করেন। মোগল ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরিয়া মারাঠা সেনানায়কগণ বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে 'জনযুদ্ধে'র সৃষ্টি করিয়া ঔরঙ্গজেবের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময় বাঙ্গলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত থাকায় মারাঠাগণ বাঙ্গলার পর্য্যন্ত সে সময় উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে ইতিহাসে স্পষ্ট কিছু লিখিত থাকিতে দেখা যায় না কিন্তু এই "জনযুদ্ধে"র সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিহীন মহারাষ্ট্র জননায়কগণ মোগল সাম্রাজ্যের যেখানে সেখানে খুসিমত উৎপাত করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতেছিল—এরূপ একটা আভাস পাওয়া যায়। কাজেই ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ সময়ে মারাঠারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাঙ্গালাতেও যে দৌরাত্ম্য করিতে আসে নাই—এমন কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে রঙ্গলালই লিখিতেছেন ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রিয়েরা ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে বাঙ্গালায় আসিয়া মহা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। কাজেই এরূপ অনুমিত হয় যে, ঐতিহাসিক বর্গীর হাঙ্গামা ঘটিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই মারাঠারা বাঙ্গালায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

(২) কলিকাতা পত্তন সময়ে একজন রজক ইংরাজদিগের দোভাষী হইয়া বিশেষ ধনী হইয়াছিল। পুস্তকে এই রজকের নাম দিবার ইচ্ছা রঙ্গলালের ছিল কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই রজকের নাম সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হওয়ায় এখানে তাহা দেওয়া গেল না।

(৩) পাথুরিয়াঘাটার উত্তরাংশে রঘু সরকারের নামে একটি রাজপথের উল্লেখ এই গ্রন্থে রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ষ্ট্রীট ডাইরেকটরীতে রঘু সরকারের নামে কোন রাজপথের নাম না থাকিলেও পাথুরিয়াঘাটায় "রঘুনন্দন লেন" নামে একটি পথের নাম আছে। এই গলিপথটি ৩৬নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গলাল কথিত রঘু সরকারের বর্ত্মটিই বর্ত্তমানে "রঘুনন্দন লেনে" রূপান্তরিত হইয়াছে কিনা তাহা বলা কঠিন।

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্গ নির্ম্মাণ—কলিকাতার সৌভাগ্য বৃদ্ধি—মুর্শিদকুলি খাঁর দৌরাত্ম্য—কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ৩৮ খানা গ্রাম পাইবার কল্পনা—ইংরাজদিগের প্রতি সুজাউদ্দিনের আচরণ—কলিকাতা নগরীয় সাহেবদিগের ভোগাতিশর্য্য—বড় ঝটিকা এবং ভূমিকম্প—মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাত—মহারাট্টা ডিচ নামক পরিখা খনন—সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের প্রথম বিবাদ—গভর্ণর ড্রেক সাহেব—কলিকাতার বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার আগমন।

যেরূপ প্রাবৃটকালীন ঘোরতমা অমানিশায় পথ ভ্রমণকালে পান্থগণ ক্ষণপ্রভার অনিশ্চিত ক্ষণিক জ্যোতির আশ্রয় গ্রহণে গম্যপথ প্রাপ্ত হন; কলিকাতার পুরাবৃত্ত লিখিতে আমাদেরও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে। যেহেতু ঘটনাসমূহ সুশৃঙ্খলরূপে প্রাপ্তব্য নহে। একটি বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লাভ হইবার পর তৎক্ষণাৎ সংঘটিত বিষয়ের স্থূল স্থূল বিবরণও পাওয়া যায় না। তথাপি আমরা সাধ্যানুসারে সেই সকল অসম্পূর্ণ ঘটনারূপ কুসুম যোগে এই প্রবন্ধমালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইং ১৬৯৭ অব্দে ইংরাজদিগের সৌভাগ্যক্রমে এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে তাঁহাদিগের বহুকালের সঞ্চিত বাসনা সম্পূর্ণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল অথচ সেই অভিলাষ সিদ্ধি পক্ষে তাঁহারা পূর্ব্বে বিস্তর উপাসনা ও প্রচুর উৎকোচ প্রদানে সম্মত ছিলেন। সেই আন্তরিক বদ্ধমূল কামনা এই যে, আপনাদিগের বাণিজ্যালয়ের চতুর্দ্দিক গড়বন্দী করিয়া বাস করেন। এইবার সেই কামনা সফল হইবার দিন সন্নিকট হইল। চেটুয়া বরদার ভূম্যাধিকারী শোভাসিং উড়িষ্যাদেশীয় রহিম খাঁ নামক আফগানের সহিত সমবেত হইয়া বর্দ্ধমানের রাজাকে অধিকারচ্যুত করিয়া দেশমধ্যে মহা অরাজকতা উপস্থিত করিল। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য যশোহরের ফৌজদার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত সেনাপতি হুগলীতে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদের প্রাবল্য দর্শনমাত্র সসৈন্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় বণিকদল আপনাপন বাণিজ্যালয় রক্ষার্থ সৈন্যরক্ষা ও গড়বন্দী করিবার নিমিত্ত নবাবের স্থানে অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রয়োজনমত অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে অনুমতি দেন, কিন্তু ইউরোপীয়েরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সে অনুমতি বিস্তীর্ণ অর্থে গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনাপন স্থান গড়বন্দী করিতে লাগিলেন। অতএব ইংরাজেরা উক্ত আদেশ পাইবার পরেই আপনাদিগের বাণিজ্যকুটিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য সমাধা হইল সে পর্য্যন্ত দিবারাত্র আপনাদিগের অধীনস্থ সমুদয় লোককে সেই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেন। ঐ দুর্গ পূর্ব্ব-পশ্চিমে লালদীঘি হইতে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে ঐ দীঘি উত্তর ধার পর্য্যন্ত বিরাজমান ছিল। ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে ঐ দুর্গ নির্ম্মিত হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়ম নামে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়—ঐ নামে নূতন দুর্গেরও নামকরণ হইয়াছে। প্রাচীন দুর্গ এরূপ সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হয় যে, ১৮১৯ অব্দে কাষ্টম হাউসের কারণ যখন তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয় তখন কত কত গাঁতি ও শাবল চূর্ণ হইয়া যায় এবং পরিশেষে বারুদযোগে তাহা উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল

সে সময়ে গুড়, পাট ও চুণ স্বরকীযোগে এরূপ এক সুকঠিন মশলা প্রস্তুত হইত যে, তদ্দ্বারা কোন বাটী গ্রথিত হইলে তাহা বজ্রবৎ দুর্ভেদ্য হইয়া যাইত। এই দুর্গ রক্ষার্থ প্রথমে ২০০ মাত্র সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল।

ইং ১৭০০ অব্দে কলিকাতা নগরের এরূপ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইল যে, অনেক ধনবান হিন্দু পরিবার আসিয়া তথায় বসতি করিতে লাগিলেন, কারণ সে সময়ে ইংরাজদিগের আশ্রয়ে বাস করিয়া লোকে অধিক স্পর্দ্ধা হইত; কোন প্রকার অত্যাচারের আশঙ্কা থাকিত না। কোম্পানি সুতালুটি, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা এই তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হওয়ায় গঙ্গাতীরে প্রায় দেড় ক্রোশাধিক তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হুগলীস্থ ফৌজদারের ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেজন্য তিনি নূতন নগরে একজন কাজী প্রেরণে উদ্যত হইলে ইংরাজেরা উপযুক্ত উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক ফৌজদারের মুখ বন্ধ করিলেন।

অনন্তর মুর্শিদকুলি খাঁর অধিকারকালে ইংরাজেরা পুনর্ব্বার প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। ঐ নবাব দেখিলেন যে বাঙ্গালাদেশের সৌভাগ্যবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংরাজদিগের বাণিজ্যব্যাপারের প্রচুরতা—সেজন্য তিনি মুসলমানদিগকে বাণিজ্য ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক ইংরাজদিগের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা নবাব সুজা খাঁ ও দিল্লীশ্বর আওরংজেবের সময়ে যে-সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মুর্শিদকুলি খাঁ সেইসব হরণপূর্ব্বক এদেশীয় বণিকদিগের তুল্য শুল্ক অথবা ভূরি ভূরি উপঢৌকন প্রদানে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিলেন। কোম্পানী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত আপনাদের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে হইতে উপযুক্ত লোককে দৌত্যে বরণপূর্ব্বক পাঠাইলেন। ঐ দূতদিগের সঙ্গে খোজা সরহান্দ নামক একজন সুযোগ্য আর্ম্মেনী ও চিকিৎসাকার্য্য করিবার জন্য ডক্টর উইলিয়ম হামিল্টন সাহেব গমন করেন। খোজা সরহান্দ এদেশীয় ভূপতিদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। দিল্লীশ্বরকে উপঢৌকন প্রদান নিমিত্ত কোম্পানী তিন লক্ষ টাকা মূল্যের উত্তম উত্তম বস্ত্র ক্রয় করিয়া পাঠান। সরহান্দ দিল্লীতে তাহার মূল্য দশলক্ষ টাকা বলিয়া লিখিয়া পাঠাইলে ফেরোকশাহ প্রত্যেক স্থানের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি আদেশ করিলেন ইংরাজদূতেরা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হন, সকলে এমন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিবেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ দেখিলেন ইংরাজেরা তাঁহার শক্তি উল্লঙ্ঘন করিবার বিলক্ষণ পন্থা প্রস্তুত করিতেছে। সেজন্য তাঁহাদের চেষ্টা বিফলীকৃত করিবার জন্য সাধ্যানুসারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বোধহয় তাঁহার উদ্যোগ সফল হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু দৈবাধীন এক সুঘটনা ক্রমে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সময়ে দিল্লীশ্বরের সহিত রাজা অজিত সিংহের কন্যার পরিণয়ঘটিত মহা আড়ম্বর উপস্থিত হয়, কিন্তু ফেরোকশাহ পীড়িত হওয়ায় তাহা স্থগিত হইল। হাকিম সাহেবেরা সম্রাটকে নিরাময় করিতে অক্ষম হইলেন। পরিশেষে খাঁ দৌরাণের পরামর্শ মতে ইংরাজ দূতদিগের সহিত আগত ডক্টর হ্যামিল্টনের চিকিৎসা গ্রাহ্য করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সম্রাট উক্ত চিকিৎসককে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলিলে হ্যামিল্টন সাহেব উদারাত্মা বোটনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক কহিলেন ইংরাজ দূতগণ যে সকল প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ হইলে তিনি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত জ্ঞান করিবেন। দিল্লীশ্বর

তাহাতে সম্মতি বিজ্ঞাপন করিলেও ছয়মাসকাল উক্ত বিবাহের ধূমধামে কাল বিগত হওয়ায় দূতদিগের মানস সিদ্ধ হইল না।

প্রার্থনাপত্রের মর্ম্ম এইরূপ যে,—(১) কলিকাতার বড় সাহেবের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র দৃষ্টে নবাব কর্ম্মচারীগণ কোম্পানীর বাণিজ্য দ্রব্যাদির তল্লাসী না লইয়া ছাড়িয়া দিবেন। (২) মুর্শিদাবাদের টাকশাল হইতে কোম্পানী মাসের মধ্যে তিনদিন আপনাদের মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া লইবেন। (৩) ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি কোম্পানীর নিকট ঋণী থাকিলে নবাব বড় সাহেবের প্রার্থনা মতে তাহাকে ধরিয়া কলিকাতায় চালান দিবেন। (৪) কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ৩৮ খানা গ্রাম ক্রয়ে কোম্পানী সনন্দ প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল প্রার্থনা পক্ষে মন্ত্রিগণ বিস্তর আপত্তি উপস্থিত করিলেও পরিশেষে তাহা গ্রাহ্য হইল। তারপর দূতেরা কলিকাতায় প্রত্যাগমন নিমিত্ত যাত্রাকালে শুনিলেন সনন্দপত্রে সম্রাট সাক্ষর করেন নাই। সচিববর তাহাতে নামাঙ্কিত করিয়াছেন! ইহা শুনিয়া দূতগণ পুনঃ পুনঃ আবেদন করিলেও দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন উত্তর না পাইয়া দিল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুরাটের বড় সাহেব উক্ত নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান তীর্থ তরণীর উপর অত্যাচার করিবার জন্য বোম্বাই যাত্রা করিবামাত্র সম্রাট প্রাগুক্ত প্রার্থনায় নাম সাক্ষর করিতে আর কাল বিলম্ব করিলেন না।

অনন্তর ইং ১৭১৭ অব্দে ইংরাজ দূতেরা জয়ডঙ্কা বাজাইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলে মুর্শিদকুলি খাঁ বিরাগানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। ইংরাজেরা উক্ত ৩৮ খানা গ্রাম প্রাপ্ত হইলে গঙ্গার উভয় পারে ৫ ক্রোশ করিয়া তাঁহাদিগের অধিকার বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে একপ্রকারে বাঙ্গালাদেশের সমুদয় বাণিজ্যকার্য্যের উপর তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। নবাব ইংরাজদিগের অন্যান্য অভিনব ক্ষমতার বিষয়ে অনভিমত মাত্র প্রকাশ করিলেন না কিন্তু যাহাতে তাঁহারা কোনরূপে ঐ ৩৮ খানা গ্রাম ক্রয় করিতে না পান তজ্জন্য সেই সেই স্থানের ভূম্যাধিকারীদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন, ইংরাজদিগকে কেহ যদি সূচ্যগ্রবিমিত ভূমি বিক্রয় করেন তবে তাঁহাকে তিনি কখনও ক্ষমা করিবেন না। সুতরাং এই প্রশাসক বাক্যে ভূম্যাধিকারীরা ভীত হওয়ায় ইংরাজেরা একখানি গ্রামও ক্রয় করিতে পারিলেন না। (১) কিন্তু তাঁহারা আর যে সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেগুলি অত্যন্ত হিতকর হওয়ায় কলিকাতাবাসিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি দেখিয়া অন্যত্র হইতে দলে দলে লোকসমূহ আসিয়া তথায় বসতি করিতে লাগিল—তাহাতে অতি অল্পকালের মধ্যে কলিকাতা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিল।

ইং ১৭০৯ অব্দে নবাব সুজাউদ্দীনের অধিকারকালে ইংরাজদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য কিছুকালের জন্য অশুভ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। হুগলীর ফৌজদার অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাদের একখানা রেশমের নৌকা আটক করিলে তাঁহারা একদল সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক তাহা উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। নবাব এই সংবাদ শ্রবণমাত্র দেশীয় লোকমাত্রকে কলিকাতায় শস্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন; সুতরাং ইংরাজেরা মহাবিপন্ন হইয়া অগত্যা বিশিষ্টরূপ মুদ্রাপুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে তিনি ক্ষান্ত হন।

এই সময়ে কলিকাতাস্থ ইংরাজদিগের ভোগাতিশয্যের পরিসীমা ছিল না। তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর বেতন ৩০০ মুদ্রার অধিক না হইলেও স্বকীয় গোপনীয় বাণিজ্য দ্বারা তাঁহারা এরূপ সম্পন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রকৃত রাজা-রাজড়ার ন্যায় ধুমধামের সহিত

বিলাস-বিহ্বলতায় কালক্ষেপ করিতেন। বড় সাহেব দূরে থাকুন, তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীরাও ৬ ঘোড়ার গাড়ী আরোহণে সমীরণ সেবন করিতেন এবং ভোজনে বসিলে তাঁহাদিগের সম্ভ্রমনিমিত্ত সুমধুর বাদ্যোদ্যম হইত। ইহার অনেক বৎসর পরেও তাঁহাদিগকে সৌখিনতার কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইং ১৭৭৪ অব্দে কোন সাহেব লেখেন, কোম্পানীর কেরাণীরা বেতন ও অন্য উপার্জ্জন দ্বারা বার্ষিক দুই সহস্র টাকা না হইলেও সকলের সঙ্গে সঙ্গে এক একজন হুকাবর্দ্দার থাকে, তাহাদিগকে মুহুর্মুহু আল্‌বোলা প্রস্তুত রাখিতে হয়—বিশেষতঃ তাঁহাদিগের অন্তঃপুরচারিণী বিলাসিনীসমূহ রক্ষায় কত অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।* এই সকল মহামহিমদিগের এদেশীয়, বিশেষতঃ মুসলমান কর্ম্মচারীদের বংশধরেরা এখন আপনাদিগকে বড় মানুষ বলিয়া অভিমান করেন।

কার্ত্তিকী ঝটিকা

ইং ১৭৩৭ অব্দে ১১ই অক্টোবর রজনীতে গঙ্গাসাগরে এক ভয়ানক ঝটিকা উদয় হইলে ঊর্দ্ধে একশত ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রদেশ পর্য্যন্ত তাহার প্রবল পরাক্রম অনুভূত হইয়াছিল। ইহাতে কলিকাতার যেরূপ দুর্গতি হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। এই সময়ে আবার একটা ঘোরতর ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া নগরের শ্রীহীনতার অবশেষ মাত্র রাখে নাই। দুই শত বাটী বিধ্বংস হয় ও কলিকাতাস্থ গীর্জ্জার শোভনতম চূড়া ভগ্ন না হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। জাহাজ স্লুপ ও বোট প্রভৃতিতে লইয়া অন্যূন বিংশতি সহস্র তরণী গঙ্গামগ্ন অথবা ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভাগীরথীতে ৯ খানা জাহাজের মধ্যে ৮ খানা জাহাজ আরোহীগণ সমেত বিনাশ পায়। দ্বি-সহস্র মণ ভারবাহী তরণীসমূহ নদী হইতে এক ক্রোশ অন্তরে বৃক্ষাদির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। অন্যূন তিন লক্ষ লোক নিহত হয়। ভাগীরথীর জল স্বাভাবিক অপেক্ষা ৪০ হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। এই দুর্ঘটনার পর বৎসর দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতার বড় সাহেব সহৃদয়তাপূর্ব্বক এদেশীয় দুঃখী লোকদিগের পরিত্রাণকল্পে সমুচিত মত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। এক বৎসরের খাজনা মাফ হয় ও কৃষিকার্য্যের জন্য দাদন দেওয়া হয়। তণ্ডুলের উপর যে মাশুল নির্ণীত ছিল, তাহাও রহিত হয়। নিতান্ত দুঃখীদিগকে ডাকাইয়া আনাইয়া সাহেবেরা খাদ্য বিতরণ করিতেন।

ইং ১৭৪২ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাস্বর পণ্ডিতের অধীনে বাঙ্গালাদেশে আসিয়া মহা উৎপাত আরম্ভ করিল। আজিও বর্গীর হাঙ্গামার কথা উঠিলে লোকের হৃদয় কম্পিত হয়। দুষ্টেরা বালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ উৎসন্ন করিয়া কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলে ইংরাজেরা আপনাদিগের দুর্গের পুনঃ সংস্কার ও নগরের চতুর্দ্দিকে এক পরিখা খনন করিতে লাগিলেন। ঐ পরিখার ব্যবধান সাড়ে তিন ক্রোশ অবধারিত হইয়াছিল কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য উপশম হইলে সেই কার্য্য পরিত্যক্ত হয়। এখনও শ্যামবাজারের পুলের নীচে তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং প্রকৃত পরিখা না থাকিলেও "মহারাট্টাডিচ্" অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় পরিখা এই কথা অধুনা সকলের হৃদয়ে জাগরূক আছে।

---

*Genuine Memoirs of Asiaticus.

ইং ১৭৫৬ অব্দের ১০ই এপ্রেল দিবসে সিরাজউদ্দৌল্লা নবাবী পদ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিযোগী ঢাকার নবাব নেওয়ারিশ মহম্মদের মৃত্যুর পরে তৎবণিতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াও ক্ষান্ত হইল না। নেওয়ারিশের সহকারী রাজা রাজবল্লভ বিপুল বিভববিশিষ্ট হওয়ায় সিরাজউদ্দৌল্লা তাঁহাকেও নিঃস্ব করণার্থ মুর্শিদাবাদে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সুচতুরতাপূর্ব্বক সমুদয় সম্পত্তি নৌকায় বোঝাই করিয়া সপরিবারে গঙ্গাসাগরে অথবা পুরুষোত্তম তীর্থে যাইবার ছলে প্রস্থানপূর্ব্বক ১৭ই মার্চ্চ দিবসে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার বড় সাহেব তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আশ্রয় দিলেন। কৃষ্ণদাস স্বীয় পিতার বন্ধনদশা বিমোচন সমাচার না পাওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজবল্লভের কুবেরতুল্য ধনরাশি হস্তচ্যুত হওয়ায় সিরাজউদ্দৌলা মহাক্রোধাপন্ন হইয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণপূর্ব্বক কৃষ্ণদাসকে তাহার হস্তে প্রদান করিবার আদেশ পাঠাইলেন। ঐ দৌত্যে মেদিনীপুরের ভূম্যাধিকারী রাজারামের ভ্রাতা নারায়ণ সিংহ নিযুক্ত হইয়া আসে কিন্তু সে ছদ্মবেশে কলিকাতায় প্রবেশ করাতে ড্রেক সাহেব তাহাকে নগর হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। মুসলমানদিগের অসৌভাগ্য নিশাগম এবং ইংরাজদিগের সৌভাগ্য সূর্য্যোদয়ের এই ঘটনাকেই এক প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

তাহার পর ইউরোপে ফরাসীসদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিগ্রহ উপস্থিত হইলে কলিকাতার গভর্ণর সাহেব ফরাসডাঙ্গার ফরাসীসদিগের আক্রমণ নিবারণ নিমিত্ত ও পুনর্ব্বার সুদৃঢ়রূপে কলিকাতার দুর্গ মেরামত করিতে আরম্ভ করেন। সিরাজউদ্দৌলা তাহা শ্রবণে একেবারে জ্বলিতাঙ্গ হইয়া ঐ কার্য্য রহিত পূর্ব্বক অবিলম্বে কৃষ্ণদাসকে সমর্পন করিতে লিখিয়া পাঠাইল কিন্তু ড্রেক সাহেব সেই উভয় আদেশ অবজ্ঞা করিয়া পত্রোত্তর প্রেরণ করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা এই সময়ে পূর্ণিয়াতে সোকৎজঙ্গের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য রাজমহলের নিকট সসৈন্যে গঙ্গাপার হইতেছিল। ড্রেক-সাহেবের পত্র প্রাপ্তি মাত্র তাহার শরীরে যেন কোটি কোটি বিষধর এককালে দংশন করিল। অতএব পূর্ণিয়া গমন ব্রত উদ্‌যাপন পুরঃসরঃ সেই সৈন্যসিন্ধু সমভিব্যাহারে কলিকাতা অভিমুখে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিল। আগমনকালে পথিমধ্যে ইংরাজদিগের কাশীম বাজারের কুঠী লুঠ করিয়া সেখানকার সাহেবদিগকে বন্দীদশায় নিক্ষেপ করে। এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবকে কাশীমবাজারনিবাসী কান্ত নামক একজন তৈলিক আশ্রয় প্রদান করাতে পরে তাহার সৌভাগ্যের সীমা থাকিল না। ঐ কান্ত পরে কান্তবাবু খ্যাতি লাভ করে ও তৎপুত্র লোকনাথ হেষ্টিংসের অনুগ্রহে রাজোপাধি প্রাপ্ত হয়।

ইংরাজেরা গত ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় একপ্রকার নিশ্চিন্ত ভাবে থাকা হেতু দুর্গের প্রাচীর-প্রকারাদি ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল। দুর্গমধ্যে ১৭০ জন মাত্র সৈন্য থাকিত—তন্মধ্যে আবার ৬০ জন ইউরোপীয় এবং অবশিষ্ট এদেশীয় লোক। বারুদ পুরাতন হওয়ায় অকর্ম্মণ্যপ্রায় ও তোপ সমূহে মর্চ্যা ধরিয়া গিয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলা ৪০।৪৫ সহস্র সৈন্য ও তদুপযুক্ত তোপ সমভিব্যাহারে এই নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে—ইহা শ্রবণ মাত্র ইংরাজেরা সশঙ্কিত হইয়া বারংবার সন্ধি প্রার্থনা ও ভূরি-ভূরি অর্থ উপঢৌকন প্রদান করিবার

ইচ্ছা জানাইয়া পাঠাইলেন। নবাব সে সকল কথা কিছুমাত্র না শুনিয়া ইংরাজদিগকে একেবারে উচ্ছিন্ন করিবার মানসে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৬ই জুন দিবসে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী সেনা চিৎপুরে পৌঁছিল। ঐ স্থানে ইংরাজেরা পূর্ব্বাহ্নে এক মুর্চা বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন। সেখান হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে নবাবের সেনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া দমদমায় যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিল।

(১) ১৭১৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইংরেজ দূতেরা সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের আবার সুযোগ পান। সম্রাট কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সব বক্তব্য শুনে কলিকাতার দক্ষিণে নদীর দুই দিকে ৩৮ খানি গ্রাম কতকগুলি শর্ত্তাধীনে ক্রয় করবার অনুমতি দান করেন। সম্রাট ফররুখশিয়ার প্রদত্ত ফরমানে এই ৩৮টি গ্রামের যে তালিকা ছিল তা নীচে উদ্ধৃত করা হল।

(১) শালিখা, (২) হাওড়া, (৩) কাসুন্দিয়া, (৪) রামকৃষ্ণপুর, (৫) ব্যাটরা, (৬) দক্ষিণ পাইকপাড়া, (৭) চিৎপুর, (৮) হোগল কুড়ে (চণ্ডী), (৯) উল্টাডাঙ্গা, (১০) দক্ষিণ বাড়ী, (১১) গোবরা, (১২) বাহির দক্ষিণ বাড়ী, (১৩) শ্রীরামপুর ইটালী, (১৪) ইটালী (হিঙালী), (১৫) গোঁদল পাড়া, (১৬) কাঁকুড়গাছি, (১৭) কুলিয়া, (১৮) শুঁড়া (১৯) ট্যাংরা, (২০) বাহির শুঁড়া, (২১) শিয়ালদহ, (২২) ধলন্দা, (২৩) বির্জি, (২৪) তিলতলা (তালতলা), (২৫) তোপসে, (২৬) সাপগাছি, (২৭) চৌরঙ্গী, (২৮) কালিন্দা, (২৯) চৌবাগা, (৩০) জলা কালিন্দা (৩১) মির্জ্জাপুর, (৩২) বেলগাছিয়া, (৩৩) শেখ পাড়া, (৩৪) সিমলে, (৩৫) মাকন্দা, (৩৬) আর্কুলি, (৩৭) কাষার পাড়া, (৩৮) বাঘমারী।

কলকাতার ব্যাপ্তি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত গ্রামগুলি আপন স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব হারিয়ে কলকাতার মধ্যে মিশে যায়। যদিও কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল এখনও গ্রামের আদি নাম বহন করছে।—কলিকাতা-সমাচার, শ্রীপ্রণবকুমার ঘোষ।

চতুর্থ অধ্যায়

কলিকাতা নগর আক্রমণ—ব্ল্যাকহোল নামক কারাগার—হলওয়েল সাহেবের নিষ্কৃতি—কর্ণেল ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন কর্ত্তৃক কলিকাতার পুনরুদ্ধার—সিরাজউদ্দৌলার পুনর্ব্বার ইংরেজের বিরুদ্ধে আগমন ও পরাজয়।

১৭ই জুন দিবসে নবাবের সেনা কর্ত্তৃক কলিকাতা নগর আক্রান্ত হয়। ইংরাজেরা আত্মরক্ষার জন্য বাগবাজারে উমাইচাঁদের বাগানে, হাল্সীর বাগানের নীচে, লালদীঘির পূর্ব্বধারে, পার্ক অর্থাৎ মৃগশালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাগে ও ছোট দীঘির ধারে এক এক করিয়া পরিখা খনন ও মূর্চা স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু এ সকল আয়োজন প্রাবৃট কালের স্রোতস্বতীর মুখে বালুকার সেতুবন্ধনবং ব্যর্থ হইয়া গেল। প্রতি মূর্চায় ৫।৭ জন করিয়া প্রহরী রক্ষিত হইয়াছিল। নবাবের সৈন্য বাগবাজারে স্থাপিত মূর্চার গোলার আঘাতে জর্জ্জরীভূত হওয়ায় সে দিক দিয়া নগর আক্রমণ না করিয়া ১৮ই দিবসে হালসীর বাগানের পূর্ব দিক হইয়া বৈঠকখানায় উত্তীর্ণ হইল। ইংরাজের দুর্গের নিকটে যে সকল পরিখা খনন করিয়াছিলেন, তাহাতে শত্রুদিগের অপকার না হইয়া উপকারই হইল। কারণ খনিত মৃত্তিকারাশি পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপে স্তূপে রক্ষিত থাকাতে দুর্গ হইতে যে সকল গোলা বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা শত্রুদিগের উপর পতিত হইয়া তেমন কিছু অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। মুসলমানেরা প্রাচীরের বহির্ভাগ স্থিত বাটী সকল অধিকার করিয়া তথায় কামান তুলিয়া এমন অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, দুর্গস্থ প্রাণী মাত্রে কেহ স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া নির্গত হইতে সাহস করে নাই।

নূতন চীনাবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সে সময় ইংরাজদিগের নৃত্যালয় ছিল—শত্রুদল তাহা অধিকার পূর্ব্বক অবিশ্রাম দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ করে। ঐ দিন ইংরাজ পক্ষে বিস্তর হতাহত হইল। রজনীতে মুসলমানেরা দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাটীতে অগ্নি লাগাইয়া দিল। সাহেবেরা সভা করিয়া বসিয়া নিস্তারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাঁহারা সংগ্রাম কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কহিলেন যে, পলায়ন ব্যতীত আর উপায়ন্তর নাই। দুর্গমধ্যে যে পরিমাণে এদেশীয় লোক প্রাণভয়ে আশ্রয় লইয়াছিল, সে পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ছিল না। অতএব ঐ সভায় ইহাই অবধারিত হইল যে, ভাগীরথীতে যে কয়েকখানা জাহাজ আছে তাহাতে আরোহণ করিয়া পরদিন প্রভাতে প্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলায় পরিচালন করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন এক ব্যক্তিও ছিলেন না। সকলেই কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। অতএব কোন কার্য্যে বহু নায়ক উপস্থিত হইলে যেমন অমঙ্গল ঘটে, ইংরাজদিগেরও তাহাই ঘটিয়া উঠিল। জাহাজে প্রথমতঃ বিবিগণ উঠিবামাত্র সাহেবদিগের অন্তঃকরণে মহাআতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় সকলেই নদীতীরে যাইয়া নৌকারোহণে সত্বর পরপারে গিয়া জাহাজে উঠিতে লাগিলেন। গভর্ণর সাহেব এবং সেনাপতি সাহেব সকলের আগেই পলায়ন করিয়াছিলেন। ড্রেক সাহেবের পলায়ন সংবাদ শুনিয়া দুর্গস্থ ইংরাজেরা হলওয়েল সাহেবকে কর্ত্তৃত্ব পদে বরণ করিলেন। যে কয়েকখানা জাহাজে পলায়িত ব্যক্তিরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলি একক্রোশ দূরে যাইয়া সেদিন থাকে। পরদিন মুসলমানেরা দুর্গ প্রবেশের উদ্যোগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সাহেবেরা দুর্গ হইতে নিশান দ্বারা জাহাজস্থ

লোকদিগকে বারম্বার এই ইঙ্গিত করিতে থাকেন যে, তাঁহারা আসিয়া দুর্গস্থ লোকদের পরিত্রাণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পলায়িত সাহেবেরা উক্ত দুই দিবসের মধ্যে একবারও ঐ ইঙ্গিত অনুসারে প্রত্যাগমন করিলেন না। তখন শেষ ভরসা চিৎপুরের নিম্নে সেণ্ট জর্জ্জ নামক যে জাহাজ লাগান থাকিত, হলওয়েল সাহেব তাহাকে দুর্গের নীচে আনিবার জন্য দুইজন সাহেবকে সংগোপনে পাঠাইয়াছিলেন। বিপদের সময় সকল উদ্যোগই ব্যর্থ হয়। ঐ জাহাজ আসিতে আসিতে এমন চড়ায় সংলগ্ন হইয়া গেল যে, তাহা মুক্ত করিবার নিমিত্তে চেষ্টা হইলেও কোন ফল হইল না। সুতরাং দুর্গস্থ অভাগাদিগের শেষ আশা একেবারে নিরাশা নীরে নিমজ্জিত হইল।

২০শে জুন প্রভাতে শত্রুদল প্রবল পরাক্রমে পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিলে হলওয়েল সাহেব নিরুপায় দেখিয়া নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদের নিকট সন্ধির প্রার্থনাপূর্ব্বক এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ঐ পত্র কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বণিক উমাইচাঁদের দ্বারা লেখাইয়াছিলেন। তাছাড়া রায়দুর্লভকে সম্বোধন পূর্ব্বক দ্বিতীয় পত্র লেখাইয়া সাহেব স্বয়ং হস্তে লইয়া সন্ধি বিজ্ঞাপন পতাকা উড্ডয়ন পূর্ব্বক ঐ পত্র প্রাচীরের উপর হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। পত্র পতিত মাত্রে জনৈক পদাতিক তাহা হস্তে করিয়া লইয়া গেলে সেখানে জনতা হইল। হলওয়েল সাহেব উপর হইতে সন্ধির প্রার্থনা করিলে নবাবের জনৈক কর্ম্মচারী কহিল:—"পতাকা নামাইয়া দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যদি আত্ম সমর্পণ কর, তাহা হইলে রক্ষা পাইতে পার।"

হলওয়েল সাহেব ইহার উত্তরে কথা কহিতে না কহিতে শুনিলেন যে, শত্রুদল পূর্ব্বদিকের দ্বার ছেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব সন্ধির পতাকা নামাইয়া দুর্গস্থ সকলের প্রতি এই আজ্ঞা দিলেন যে, যা কিছু তোপ বন্দুক প্রভৃতি আছে, তাহাতে গোলাগুলি ভরিয়া প্রস্তুত হও। এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে, প্রহরীরা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পশ্চিমদিকের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। তখন চারিদিকে শত্রুসেনা দৃষ্ট হইলে হলওয়েল সাহেব নবাবের জমাদারের হস্তে স্বীয় পিস্তল ও তলবার প্রদানপূর্ব্বক প্রাচীর হইতেই সেলাম করিলেন।

সিরাজউদ্দৌল্লা উত্তরদিক বেষ্টনপূর্ব্বক পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্র এক দ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। কিছু পরে বন্ধনদশাপ্রাপ্ত হলওয়েল তাহার চতুর্দ্দোল সমীপে আনীত হইলে নবাব তাহার বন্ধন মোচন করাইয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিল—"তোমার মস্তকের কেশস্পর্শ করিতেও কাহারো ক্ষমতা হইবে না।"

এরূপ এক সামান্য দল মনুষ্যকর্ত্তৃক তাহাদের অপেক্ষা চারিশত গুণ অধিক সৈন্যদলের অনিষ্ট চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় নবাব আশ্চর্য্যবোধ করিল। পরে দরবার হইলে কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলে সকলে বিবেচনা করিল নবাব তাহার উপর স্বীয় প্রচণ্ড কোপানল প্রদর্শন করিবে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সিরাজউদ্দৌল্লা কৃষ্ণদাসকে খেলয়ৎ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিল।

নিশাগমে সিরাজউদ্দৌল্লা স্বীয় শিবিরে প্রস্থানকালে জনৈক কর্ম্মচারীর হস্তে দুর্গ রক্ষার ভারার্পণ করিল। সেই কর্ম্মচারী ইংরাজ বন্দীদিগকে বদ্ধ করিবার জন্য ব্ল্যাকহোল নামক কারাগারে লইয়া গেল। ঐ কারাগৃহ দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট ও প্রস্থে ১৪ ফিট মাত্র পরিমিত ছিল। তাহার দুই অন্তঃসীমায় এক একটি বাতায়ন দিয়া বায়ু প্রবেশ করিত। দুরন্ত সেনাদিগকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা ঐ স্থানটি নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র গৃহে নবাবের কর্ম্মচারী ইংরাজ বন্দীদিগকে বলপূর্ব্বক নিবেশিত করিল। একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে

অন্ধকূপবৎ সংকীর্ণ কারাকুটির মধ্যে ১৪৬ জনের সন্নিবেশে কিরূপ ভয়ানক ক্লেশের উদয় হয় তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। বন্দীগণ অত্যল্পকালের মধ্যে ঘোরতর তৃষ্ণাকুল হইয়া হা-জল, যো-জল বলিয়া চাৎকার করিতে লাগিল। বহুতর অনুনয় বিনয়ের পরে প্রহরীরা বাহির হইতে বাতায়ন পথ দিয়া জল প্রদান করিলে, তাহা পান করিবার নিমিত্ত সকলেই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সকলেই নিঃশ্বাস লইবার জন্য উক্ত বাতায়ন-সমীপে কষ্টেসৃষ্টে যাইতে লাগিল এবং অসহ্য যাতনায় প্রহরীদের কাছে অনবরত এই ভিক্ষা করিল যে, তাহারা গুলি করিয়া তাহাদের দুর্গতির শেষ করুক। এইরূপে কিছুকাল মহাকষ্টে কালক্ষেপপূর্ব্বক একে একে ভূতলে পতিত হইয়া গতায়ু হইতে থাকিল। অবশিষ্ট কয়েক ব্যক্তি অধিক স্থান পাওয়ায় শব স্তূপের উপর উপবেশনপূর্ব্বক ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করতঃ মুমূর্ষুপ্রায় অচৈতন্য অবস্থায় থাকিল। প্রভাতে দ্বার-মোচন হইলে দেখা গেল যে, সেই ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র জীবিত আছে।

এই কালরাত্রির হৃদয় বিদীর্ণকর বিবরণ পাঠকালে অতিশয় নির্দ্দয় ব্যক্তিদেরও নয়ন হইতে করুণাশ্রু পতিত হইতে থাকে। এখনও সকল দেশে এই নির্দ্দয় কাণ্ড দুরাত্মা সিরাজউদ্দৌল্লার চূড়ান্ত কুকীর্ত্তিরূপে পরিগণিত আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তাহার সম্যক্ দোষ সপ্রমাণ হয় না—কারণ সে কেবল ইংরাজদিগকে বদ্ধ রাখিতে মাত্র আদেশ দিয়াছিল—কিন্তু তাহার ব্যাঘ্রবৎ নিদারুণ কর্ম্মচারীর দ্বারাই এই কুক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। (১)

সিরাজউদ্দৌল্লা হলওয়েল সাহেবকে কোম্পানীর কোষ প্রকাশ করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ৫০,০০০ টাকা মাত্র প্রাপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। অতএব পূর্ব্বদিবস সাহেবদিগকে অভয় প্রদান করিয়াও পরদিবস মীরমদন নামক সেনাপতির হস্তে তাহাদিগকে বন্ধনদশায় সমর্পণ করিল। অনন্তর নয় দিন কলিকাতায় থাকিয়া আলীনগর নামে কলিকাতার নূতন নামকরণ করিল এবং মাণিকচাঁদকে তাহার কর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল। গমনকালে ওলন্দাজ ও ফরাসীদের নিকট হইতে বহু লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া যায়।

ইহার পর মীরমদন, হলওয়েল ও অপর তিনজন সাহেবকে দুর্ভেদ্য নিগড়ে বন্ধন করিয়া একখানা উলাকে আরোহণ করাইয়া প্রভু সমীপে প্রেরণ করিল। পথিমধ্যে শান্তিপুরের নিকট ঐ উলাক জলনিমগ্ন হইলে একখানা জালিয়া ডিঙ্গি আরোহণ করিয়া সাহেবেরা গমন করেন। হলওয়েল সাহেব লেখেন, প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল ও ভাগীরথীর জল মাত্র ভোজন পানার্থ প্রদত্ত হইত। শেষে সেখ বাদল নামক একজন প্রহরী দয়ার্দ্র হইয়া মুড়ি, গুড়, রম্ভা ও সঙ্গের দুই চারিটা করেলা দেওয়াতে সাহেবেরা মহাআহ্লাদপূর্ব্বক আহার করিতেন। এইরূপে বহুকষ্টে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে তাঁহারা একটা অশ্বশালায় রক্ষিত হন এবং তাঁহাদের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইবার উপক্রম হয়, কেবল সিরাজউদ্দৌল্লার মাতামহী নবাব আলীবর্দ্দির মহিলার বিশেষ অনুগ্রহে তাঁহারা পরিত্রাণ পাইলেন।

পার্শ্বে অঙ্কিত যে সমাধির প্রতিরূপ দৃষ্ট হইতেছে, সেই সমাধি হলওয়েল সাহেব ব্ল্যাকহোল কারাগারে বিনষ্ট ব্যক্তিদিগের স্মরণার্থ লালদিঘির পশ্চিম-উত্তর কোণে সংস্থাপিত করেন। লর্ড ময়রা সাহেব ঐ সমাধিকে ইংরাজদিগের দুর্দ্দশার অভিজ্ঞান বিবেচনা করিয়া তাহা ভগ্ন করান। (২)
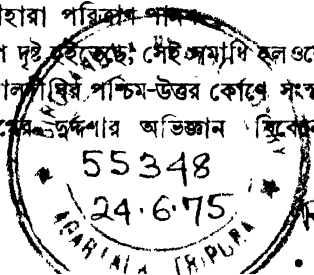
কলিকাতা পতনের সংবাদ মান্দ্রাজে পৌছিলে সেখানকার ইংরাজেরা অস্থির হইলেন। সেইসময় ইউরোপে ফরাসীদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ায় দেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্রই বিপদ ও বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, অধিকন্তু পণ্ডিচেরীস্থ ফরাসীদিগের প্রতিকূলাচরণ জন্য তাঁহাদের মান্দ্রাজে থাকাই কর্ত্তব্য ছিল। তথাপি কলিকাতায় ইংরাজদিগের বিপদবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এডমিরাল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইভ সাহেবের অধীনে জলপথীয় ও স্থলপথীয় উভয় প্রকার সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্গালাদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইভ সাহেব ১৮ বৎসর বয়সে কোম্পানীর সিবিল সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বিলাত হইতে আগমন করেন কিন্তু আপনাকে সাংগ্রামিক কার্য্যে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া পরে মিলিটারী পদ গ্রহণ করেন এবং তাহাতে এমন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ হয় যে, তাঁহার ন্যায় কীর্ত্তিবান পুরুষ ইংরাজদিগের মধ্যে অতি অল্প দেখা যায়। তাঁহার পরাক্রম ও বুদ্ধিবলেই ইংরাজেরা এই বৃহৎ রাজ্যের অধুনা অধীশ্বর হইয়াছেন।

ক্লাইভ ও ওয়াটসন সাহেব ৯০০ শত ইউরোপীয় ও ১৫০০ শত এদেশীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মান্দ্রাজ হইতে যাত্রা করিলেন কিন্তু উত্তরীয় সমীরণের প্রতিঘাত বশতঃ বহু কষ্টে ২০শে ডিসেম্বর দিবসে ফল্তায় আসিয়া উপস্থিত হন। উলুবেড়িয়ার দক্ষিণে ফল্তা অবস্থিত—ইহার বর্ত্তমান নাম—পল্তা বিরাশি।

২৮শে তারিখে মায়াপুরে পৌছিয়া বজবজিয়ার দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য ক্লাইভ সাহেব সসৈন্যে তীরস্থ হইবামাত্র কলিকাতা হইতে সহসা মাণিকচাঁদ প্রচুর সেনা সমভিব্যাহারে আসিয়া পড়ায় দুই দলে যুদ্ধারম্ভ হইল। কিছুকাল পরে ইংরাজদিগের একটা গোলা মাণিকচাঁদের হাউদার নিকট দিয়া চলিয়া যাওয়ায় সে কলিকাতায় পলায়ন করিলে ইংরাজেরা জয়ী হইলেন। ভীরু স্বভাব মাণিকচাঁদ কলিকাতাতেও আপনাকে নির্বিঘ্ন না ভাবিয়া কলিকাতা রক্ষার জন্য ৫০০ শত মাত্র লোক রাখিয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া স্বীয় প্রভুর সহিত মিলিত হইল। সুতরাং এডমিরাল ওয়াটসন সাহেব কিছু সময় গোলাবর্ষণ পরেই প্রাণহানি বিরহে ইং ১৭৫৭ অব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন।

এখানে বাঙ্গালী শাসনকর্ত্তা মাণিকচাঁদের বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য যে, সে ব্যক্তি পদস্থ হইলে যদিও অন্যান ৫০,০০০ সহস্র এদেশীয় লোক পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া বসতি করিয়াছিল কিন্তু তাহার নির্দ্দয়তা ও অপহারকতার বিষয় বিখ্যাত থাকায় ধনীদিগের মধ্যে প্রায় কেহ নগরে প্রত্যাগমন করেন নাই। অদ্যাপি খিদিরপুরের একক্রোশ দক্ষিণে মাণিকচাঁদের বেড নামে একটা স্থান আছে। মাণিকচাঁদ ঐ স্থানে বাস করিত।

কলিকাতা পুনরধিকারপূর্ব্বক ক্লাইভ সাহেব বিবেচনা করিলেন, নবাবকে ভয় প্রদর্শন না করিলে সে কদাপি সন্ধি করিবে না। সেজন্য দুই দিবস পরে রণতরী সমূহ প্রেরণ পূর্ব্বক মহাধনশালী হুগলী নগর আক্রমণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে জগৎ শেঠের মধ্যস্থতায় ইংরাজদিগের সহিত নবাবের সন্ধি হইবার কল্পনা ছিল কিন্তু ক্লাইভ কর্ত্তৃক হুগলী আক্রমণের সমাচার প্রাপ্ত হইবামাত্র সিরাজউদ্দৌল্লা মহাক্রোধাপন্ন হইয়া ইংরাজদিগকে পুনর্ব্বার বাঙ্গালাদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রাপূর্ব্বক ৩০শে জানুয়ারী দিবসে হুগলীর নিকটে আসিয়া গঙ্গা পার হইল। ২রা ফেব্রুয়ারী দিবসে ক্লাইভ সাহেবের ছাউনীর অর্দ্ধক্রোশ দূর দিয়া গমনপূর্ব্বক হুগলীর পশ্চাদ্ভাগে শিবির সংস্থাপন করিল। তারপর কিছুকাল উভয়পক্ষে সন্ধির প্রস্তাব হইলে ক্লাইভ সাহেব বুঝিলেন

নবাব বিষকুম্ভ পয়োমুখবৎ শঠতাকরণ করিতেছে। অতএব তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দিবসে ইউরোপীয় ও এদেশীয় সমগ্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ২১৫০ জন মাত্র, নবাবের সৈন্য তাহা অপেক্ষা বিংশতি গুণ অধিক হইবে। কিছুকাল যুদ্ধের পর নবাবের সেনাদলে বিস্তর লোক নিহত হইলে সে ৯ ক্রোশ অন্তরে গিয়া রহিল। ক্লাইভ সাহেব পুনরায় আক্রমণের উদ্যোগ করিলে নবাব বিগ্রহজনিত ক্লেশে পরিশ্রান্ত হওয়ায় সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। এই সন্ধি পত্র ৯ই ফেব্রুয়ারী দিবসে সাক্ষরিত হয়।

মন্তব্য

(১) রঙ্গলাল এখানে অন্ধকূপ হত্যার (Black Hole Tragedy) বিবরণ দিয়াছেন। উত্তরকালে এদেশীয় ঐতিহাসিকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, অন্ধকূপ হত্যা একটি কাল্পনিক ঘটনা। কারণ ১৮ ফিট দীর্ঘ ও ১৪ ফিট প্রস্থ একটি কক্ষের মধ্যে গাদাগাদি করিয়া রাখিলেও ১৪৬ জন লোকের স্থান সংকুলান হয় না। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ নবাবী অত্যাচার প্রকাশ করিয়া বর্ণনা করিবার জন্য তাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্ক হইতে এই কাহিনী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই কাহিনী বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া বালকগণকে বিদ্যালয়ে পাঠ করানো হইত। রঙ্গলাল যে সময় এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সে সময় ইংরাজ সরকারের কল্যাণে লোকে অন্ধকূপ হত্যাকে সত্য ঘটনা বলিয়াই মনে করিত।

(২) অন্ধকূপ হত্যার কল্পিত ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার জন্য হলওয়েল সাহেব যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার একখানি চিত্র রঙ্গলাল এখানে দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমরা এই চিত্র পাই নাই এবং যে ঘটনা উত্তরকালে অলীকরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার স্মৃতিস্তম্ভের চিত্র এখানে সন্নিবেশিত করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। রঙ্গলাল লিখিতেছেন যে, লর্ড ময়রা (মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস) এই স্মৃতিস্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত ভঙ্গকরণের কোন তারিখ দেন নাই। ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে লর্ড ময়রা ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে উক্তপদে ইস্তাফা দেন। ইহাতে এরূপ অনুমিত হয় যে, ঐ দশ বৎসরের মধ্যে যে-কোন সময় স্তম্ভটি ভাঙ্গা হইয়া থাকিবে এবং রঙ্গলাল যে সময় বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময় স্মৃতিস্তম্ভটি বিদ্যমান ছিল না। লর্ড কার্জ্জন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলে তৎকর্ত্তৃক স্তম্ভটি পুনর্নির্ম্মিত হয় এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নূতন স্তম্ভটির আবরণ উন্মোচিত হয়। ইহার পর ভারতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিচালনায় কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলী উক্ত স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে (১৯৫৮) এই কুখ্যাত স্তম্ভটি আর নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ধিপত্রের মর্ম্ম নূতন দুর্গারম্ভ—গোবিন্দপুর—টাকশাল সংস্থাপন—ক্লাইভ কর্ত্তৃক তিন সুবার দেওয়ানী প্রাপ্তি—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাব রায়ের প্রতি বিচার—সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন—নন্দকুমারের ফাঁসি।

এই নূতন সন্ধিপত্রের মর্ম্ম এই যে, ইংরাজেরা পূর্ব্বে যে সকল ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন। দেশের মধ্য দিয়া তাঁহাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানিকালে সেজন্য শুল্ক গৃহীত হইবে না। তাঁহারা কলিকাতায় এক দুর্গ ও টাকশাল স্থাপন করিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত নবাব কর্ত্তৃক তাঁহাদের যে কিছু সামগ্রী গৃহীত অথবা বিনষ্ট হইয়াছিল নবাব সেই সকল বিষয়ের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন।

দুর্গ নির্ম্মাণ ও টাকশাল স্থাপন বিষয়ে ইংরাজেরা ৬০ বৎসর ধরিয়া ব্যগ্র ও তৎপর ছিলেন। নূতন সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুসারে সেই চির অভিলাষ পূর্ণ হইবার বিঘ্ন চিরতরে বিগত হওয়ায় ক্লাইভ সাহেব সেই দুইটি প্রতিষ্ঠায় আর কাল বিলম্ব করিলেন না। অতএব পলাশী ক্ষেত্রের সুবিখ্যাত সমর বিজয় পরেই তিনি গোবিন্দপুর গ্রাম উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে অভিনব দুর্গ নির্ম্মাণ অবধারিত করিলেন। এই গ্রামের বার্ষিক আয় ১৭০৮ অব্দে ৬১০১৲ টাকা মাত্র ছিল কিন্তু ১৭৫২ অব্দে ২২৭৬০৲ টাকা আদায় হইত; তন্মধ্যে মুণ্ডিবাজার নামে গঞ্জ ছিল। এই গঞ্জে ধান্য, তণ্ডুল, দাল, তামাক, ঘৃত, গুবাক, কার্পাস, সূতা প্রভৃতি সামগ্রীর সুন্দর রূপ বাণিজ্য চলিত। এই মুণ্ডিবাজার ভাঙ্গিয়া খিদিরপুর, ভবানীপুর ও কালীঘাটের বাজার সকল সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে। এই গোবিন্দপুরেই ভূকৈলাশের ঘোষাল মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ কন্দর্প ঘোষালের বাস ছিল। ক্লাইভ সাহেব তাঁহার বাটী ও ভূমির পরিবর্ত্তে খিদিরপুরে যে স্থানে "পুরাণো বাটী" (১) নামক ঘোষাল পরিবারের ভগ্নাবস্থাপন্ন প্রকাণ্ড প্রাসাদ ও পটোলডাঙ্গায় এক্ষণে যে স্থলে কলেজসমূহ ও সরোবর বিরাজমান আছে—এই উভয় স্থান প্রদান করেন। আমরা শুনিয়াছি এই "পুরাণো বাটীর" সমুদয় একতল গৃহ গোবিন্দপুরের বাটীর ইষ্টকে নির্ম্মিত। খিদিরপুর ও বৈঠকখানা প্রভৃতি স্থান নিবাসী চাষা-ধোবাদিগেরও গোবিন্দপুরে বাস ছিল। এই গ্রামের সন্নিকটেই নোনা জলাশয় সমূহ ছিল, সেখানে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে সাহেবেরা বন্য মহিষাদি শিকার করিতেন।

১৮৩৬ অব্দ হইতে ৭০ অব্দ পর্য্যন্ত ডাক্তার ষ্ট্রং ও জেম্‌স্ প্রিন্সেপ সাহেবের সদস্যতায় ফোর্ট উইলিয়ম মধ্যে এক কূপ খনিত হয়, তাহাতে ৫০০ পাদের নিম্নে সমুদ্র প্রবাহিত আছে। ইহাতে নির্ণীত হইয়াছে বয়র নামক একজন বিপণিপতি কর্ত্তৃক এই নূতন দুর্গের আকার কল্পিত হয়। ক্লাইভ সাহেব এই আলেখ্য দেখিবামাত্র তাহাতে সম্মতি দিলেন কিন্তু বোধ হইতেছে, সেই কল্পনা অনুসারে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে যে বিপুল অর্থব্যয় হইবে এ চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় না হইয়া থাকিবে, যেহেতু ইহা নির্ম্মাণে ক্রমে ক্রমে দুই কোটি টাকা ব্যয় হয়। ফলতঃ এই বিপুল অর্থের যে অধিকাংশ অপচয় হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। ইহার এক উদাহরণ এই যে, জয়নারায়ণ পাকড়াশী নামে একজন ব্রাহ্মণ দুর্গের একাংশ নির্ম্মাণের ভার পাইয়া কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ পূর্ব্বক শরীর গোপন করে।

বর্ত্তমানে ঐ পাকড়াশীর নামে বৌবাজারে এক গলি (২) বিখ্যাত আছে। হলওয়েল সাহেব উক্ত অর্থ-অপহরণের অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা পাইলে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে একলক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়াছিল—সাহেব তাহা কোম্পানীর খাতায় জমা দেন।

যদিও পলাশীর সংগ্রাম-বিজয়ের বর্ষেই (৩) কলিকাতার পুরাতন টাকশাল স্থাপিত হয় কিন্তু ১৭৫২ অব্দের ১৯শে আগষ্ট দিবসে ইংরাজদিগের প্রথম মুদ্রা অঙ্কিত হয়। ঐ বৎসরাবধি ১৭৯১ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর টাকা চুক্তি দ্বারা প্রস্তুত হইত। মৃত জেম্‌স্ প্রিন্সেপ সাহেবের পিতা ফল্‌তা বিরানীতে এক যন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক পয়সা প্রস্তুত করিতেন এবং উক্ত বর্ষ হইতে ১৮৩২ অব্দ পর্য্যন্ত পাতরিয়া গীর্জ্জার পশ্চিম দিকের বর্ত্ম অন্তরালবর্ত্তী এক বাটীতে টাকা প্রস্তুত হইত। ঐ বাটীতে এখন "ষ্ট্যাম্প ষ্টেশনারী" আফিস স্থপিত হইয়াছে।

অতঃপর ১৭৬৫ অব্দে ক্লাইভ সাহেব তিন সুবার দেওয়ানী পাইবার নিমিত্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত দিল্লীশ্বরের উদ্দেশ্যে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। ঐ বর্ষের ১২ই আগষ্ট তারিখে প্রয়াগনগরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে দিল্লীশ্বর আহ্লাদপূর্ব্বক কোম্পানীর পক্ষ হইতে ক্লাইভ সাহেবকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ সময়ের কোন মুসলমান গ্রন্থকার লেখেন যে, একটা গর্দ্দভ বিক্রয় করিতে যে সময় লাগে, দিল্লীশ্বর তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করেন। পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর এই সফলময় কার্য্যকে ইংরাজদিগের রাজ্যপ্রাপ্তির দ্বিতীয় কারণ রূপে জ্ঞান করিতে হইবে, যেহেতু এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদের নবাবের যে কিছু শক্তি ছিল তাহা এককালে বিলোপ প্রাপ্ত হইল। ক্লাইভ সাহেব অভিলষিত লাভে মহা আনন্দিত হইয়া জয় জয় ধ্বনিতে ৭ই সেপ্টেম্বর দিবসে কলিকাতায় পুনরাগমন করিলেন।

ইং ১৭৭০ অব্দে অথবা বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে বিখ্যাত আছে। এই দুর্ভিক্ষ দ্বারা বাঙ্গালাদেশ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। সেই সময়ের দুঃখী লোকের যাতনা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। লোকে কহে তিন দিবস পর্য্যন্ত এদেশ হইতে লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এই দেশের কিরূপ দুর্ভাগ্যজনক হইয়াছিল তাহা এক কথাতেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এদেশের প্রজাসংখ্যার তিনভাগের একভাগ ক্ষুধানলে জলিতাঙ্গ হইয়া কাল সদনে গমন করে।

ইং ১৭৭২ অব্দে হেষ্টিংস সাহেব নবাবকে সম্পূর্ণরূপে শক্তি শূন্য করিবার মানসে বাঙ্গালাদেশের নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ ও বেহারের নায়েব দেওয়ান রাজা সেতাব রায়কে কলিকাতায় আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের দোষানুসন্ধান করিতে থাকেন। পরে অতি অল্পকালের মধ্যে সেতাব রায়ের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইলে কলিকাতার কাউন্সিল তাঁহাকে খেলয়ৎ ও বেহারের রায় রায়া পদে অভিষিক্ত করিয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু সেতাব রায় প্রথমতঃ পদচ্যুত হইয়া পাটনা হইতে কলিকাতায় বন্দীবৎ আনীত হওয়ায় মানহানি বশতঃ অচিরাৎ গতাসু হন। মহম্মদ রেজা খাঁর বিষয় লইয়া কৌন্সিলে বহুকাল যাবৎ বিচার হয়। চিৎপুরে 'নবাবের বাগান' নামে এখন যে জঙ্গলময় উদ্যানবাটী আছে—রেজা খাঁ এই স্থানে থাকিতেন। এই স্থান পূর্ব্বে অতিশয় মনোহর ছিল। ফরাসডাঙ্গা চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নগর হইতে যখন ভিন্ন দেশীয় কোন রাজপুরুষ কলিকাতায় আসিতেন তখন ঐ

নবাবের বাগানে উঠিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন ; তারপর ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক কলিকাতাস্থ গভর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া আসিতেন।

ইং ১৭৭৪ অব্দের ১লা আগষ্ট দিবসে পার্লামেণ্টের আজ্ঞানুসারে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামক বিচারালয় সংস্থাপিত হয়, এই বিচারালয় ইংলণ্ডীয় মহীপালের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমতঃ কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট ছারখার করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ১৭২৭ অব্দ হইতে মেয়র কোর্ট নামক বিচারালয় ছিল। ঐ বিচারালয়ে মেয়র খ্যাত প্রাড্বিবাক ও তদধীন ৯জন আল্ডর্ম্যান উপাধি বিশিষ্ট সহকারী বিচারপতি বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইঁহাদিগের অন্যায় বিচারের দুই এক দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইবে —তাহা পাঠে রহস্য রসোদয় হয়। ঐ মেয়র কোর্ট নামক বিচারালয় এখন যেস্থলে সেণ্ট আন্ড্রুস্ গীর্জ্জা রহিয়াছে, সেই স্থলে স্থাপিত ছিল। সুপ্রীম কোর্টের কার্য্যও প্রথমতঃ ঐ বাটীতে আরম্ভ হয় পরে ১৭৯২ অব্দে সুপ্রীম কোর্টের নূতন বাটী প্রস্তুত হইলে লালদীঘির ঈশান কোণবর্ত্তী বিচার বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। আজিও ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী বর্ত্ম "ওল্ড কোর্ট হৌসষ্ট্রীট" নামে খ্যাত আছে।

ঐ বর্ষের ৫ই আগষ্ট দিবসে (৪) কুলিবাজারের নৈঋতে কোণে রাজা নন্দকুমারের ফাঁসী দ্বারা প্রাণদণ্ড হয়। এই ব্যক্তি বিবিধ ষড়যন্ত্র লিপ্ত ও নানা অপরাধে অপরাধী হইলেও তাঁহার প্রতি এই দণ্ড অতি অন্যায় হইয়াছে, অবশ্যই বলিতে হইবে। যেহেতু যে অপরাধে তিনি অপরাধী হন, সে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড হওয়া হিন্দুদায় শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং এইক্ষণেও ইউরোপীয় বিচার দ্বারে এ অপরাধের নিমিত্ত ফাঁসীর আদেশ হয় না। বশেষতঃ সুপ্রীম কোর্ট সংস্থাপনের ৪ বৎসর পূর্ব্বে নন্দকুমার ঐ অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সুতরাং তজ্জন্য সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা বিচার হওয়াই অতীব ন্যায়বিরুদ্ধ। নন্দকুমারের দোষের বিবরণ এই যে, তিনি কোন কাগজে কৃত্রিম স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন—তাঁহার বিরুদ্ধে কমলউদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান উক্ত অভিযোগ উপস্থিত করাতে, সেই দোষ সপ্রমাণ হইলে পর স্যর ইলাইজা ইম্পি সাহেব নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের অনুমতি দেন। কিন্তু এই অবিচারের মূলীভূত কারণ অপ্রকাশিত নহে। তাহা এই যে, রাজা নন্দকুমার হেষ্টিংস সাহেবের বিরুদ্ধে কৌন্সিলে এই অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, ঐ সাহেব মুর্শিদাবাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক নবাব নজমউদ্দৌল্লার রক্ষণাবেক্ষণ করণীয় ভারে তাহার মাতা মণিবেগম ও নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে অভিষিক্ত করিয়া তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। হেষ্টিংস সাহেব ইহারই প্রতিশোধ নিমিত্ত কমলউদ্দিনকে সুপ্রীম কোর্টে খাড়া করিয়া স্বীয় শত্রুর প্রাণ লইয়া ক্ষান্ত হইলেন। যে বিচারপতি এই অন্যায় আজ্ঞা বিধান করেন তিনি হেষ্টিংস সাহেবের সমাধ্যায়ী ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। রাজা নন্দকুমারের ফাঁসী শুনিয়া দেশীয় লোক মাত্রে একেবারে পরিতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তিন দিবস পর্য্যন্ত অনেকে জলগ্রহণ করেন নাই এবং ফাঁসীর পরেই হিন্দু মাত্রে গঙ্গায় যাইয়া স্নান করেন।

মন্তব্য

(১) খিদিরপুরে ঘোষাল পরিবারের ভগ্নাবস্থাপন্ন "পুরাণো বাটী"র কথা এস্থলে উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে। ভূকৈলাশের রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়নারায়ণের পিতামহ কন্দর্প ঘোষাল মহাশয় তাঁহার গোবিন্দপুরের বাস উঠাইয়া খিদিরপুরে হুগলী নদীর তীরে এক প্রাসাদোপম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বঙ্গাব্দ ১১৬১ সাল অর্থাৎ ইং ১৭৫৩।৫৪ খৃষ্টাব্দ বরাবর এই বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার খিদিরপুরে জাহাজ মেরামতের জন্য ক্ষুদ্র একটি পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ করেন। উক্ত পোতাশ্রয়ের জন্য কন্দর্প ঘোষালের বাটী ও তৎসংলগ্ন জমি-জায়গা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইলেও ঘোষালদের বাটীখানি ভূমিসাৎ করিবার আবশ্যক না হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুর বন্দর সম্প্রসারিত হইলে বাটীখানি ভাঙ্গিয়া সেখানে ঘড়িস্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। রঙ্গলাল যে সময় এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে সময় কন্দর্প ঘোষালের বাটীখানি পোর্ট কমিশনারদিগের দখলে থাকিলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। এই বাটীখানি খিদিরপুর পল্লীতে নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রথম পাকা ইমারৎ—তাছাড়া কন্দর্প ঘোষালের অন্যতম পুত্র গোকুল ঘোষাল বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মিষ্টার ভেরেলষ্টের দেওয়ান হইয়া বিশেষ বিখ্যাত হন এবং তিনিও এই বাটীতে আজীবন বাস করিয়াছিলেন। এই সব কারণে কন্দর্পের এই বাটীকে একটি ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্যে গণ্য করা যায়। রঙ্গলাল উক্ত বাটী দেখিয়া তাঁহার প্রথম জীবনে একটি পদ্য রচনা করিয়া ১২৫৫ সালের ২৫শে চৈত্র (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল) দিবসে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত কবিতার সহিত পত্রিকায় সম্পাদকের (কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) উদ্দেশ্যে লিখিত কবির পত্রখানিও মুদ্রিত হয়। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণে রঙ্গলালের পত্র ও কবিতাটি নিম্নে দেওয়া গেল :—

"সম্পাদক মহাশয়, কীর্ত্তিমান পুরুষদিগের বংশলোপ অথবা তৎ-সন্তানদিগের প্রতি কমলার কোপ নিরীক্ষণ করিলে মনোমধ্যে এক অব্যক্ত খেদমিশ্রিত ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ঐ ভাব প্রকাশ করা কবি ব্যতীত আর কাহারও সুসাধ্য নহে; তথাপি সামান্য-পদ্যে উক্ত বিষয়ক এক কবিতা প্রেরণ করি—পত্রস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক। খিদিরপুর গ্রাম যে মহাশয়দিগের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে; সেই ঘোষাল মহোদয়দিগের পুরাতন বাটী অর্থাৎ যে অট্টালিকায় দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় বিরাজমান ছিলেন, সেই প্রাচীন নিকেতনে কোন কার্য্যবশতঃ গমন করত তাহার ভগ্নাবস্থা বিলোকনে হঠাৎ মন্নয়নে শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিম্নলিখিত পদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, যদিও তন্মধ্যে যথার্থ কাব্য অথবা তৎশক্তির চিহ্ন কিছুই নাই তথাপি পাঠমাত্রে মহাশয়ের কীর্ত্তির কিঞ্চিৎ পুনরুল্লেখ হইতে পারে :—

কোথা সে পুরুষ অদ্য নামে যাঁর সদ্য সদ্য,
সম্ভ্রমে লোমাঞ্চ হয় দেহ।
ভগ্ন সব গৃহগণ, বন সম উপবন,
তত্ত্ব তাঁর নাহি লয় কেহ ॥ ১

অশোক কুসুম ফুটে, শোকশেল হৃদে ফুটে,
কে বলে অশোক তার নাম।
রুধিরে লোহিত কায়, তরু পরে শোভা পায়,
নীরস বিরস অভিরাম ॥ ২

কোথা সে ভাবুক কবি,* কবিতা কমলরবি,
উদয় নহেন কেন তিনি।
কবিতা রচনা ছলে, প্রকাশিলা ধরাতলে,
তরঙ্গিনী ভক্তি তরঙ্গিনী ॥ ৩

হারাপ্রিয়া শিষ্যা যাঁর হার শিষ্যা সহ তাঁর,
আবির্ভাব ছিল এককালে
কোথায় গো কবিপ্রিয়া, এই কি তোমার ক্রিয়া,
তব পুরী লয় করে কালে ॥ ৪

সিংহ সম পিতা তব ঘোষিত গৌরব রব,
ঘোষাল ঘোষণ দিকদেশে।
গৃহপাল অবসান, গৃহপাল মূর্ত্তিমান,
ফেরুপাল সহ গৃহে বসে ॥ ৫

এককালে ছিল যথা আমোদ প্রমোদ কথা
বিষাদ প্রমাদ সে প্রাসাদ।
হর্ম্ম্যতল নহে রম্য, মনুষ্যের নহে গম্য,
মন সহ চক্ষের বিবাদ ॥ ৬

দান ধ্যান যাগ যজ্ঞ, মূর্ত্তিমন্ত বেদ প্রাজ্ঞ,
যেখানেতে ছিলেন সতত।
সেখানেতে একি ভাব অচলা সচলা ভাব
অভাব স্বভগা মতি যত ॥ ৭

বিদ্যাদেবী অন্তর্ধান, অবিদ্যার অধিষ্ঠান,
রোদন গীতের অনুকল্প।
মনোহর কীর্ত্তিচয়, কালদন্তে সমুদয়,
ক্রমে ক্ষয় হয় অল্প অল্প ॥ ৮

দেখি ভগ্ন ঘর দ্বারে, মনে হয় কমলারে,
কাল বুঝি উপহাস করে।
অতএব ধনজন, হেরি সব অকারণ
নিত্য নহে সংসার ভিতরে ॥ ৯

* 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' রচয়িতা ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই মহাত্মা দেওয়ানজীর জামাতা ছিলেন।

সকলে প্রধান কাল, বলবান অধিপাল,
প্রতি পলে পড়িছে প্রলয় ।
নমঃ কাল মহেশ্বর, সংহার ত্রিশূল ধর,
নমো নমো ভুবন ভিতর ।। ১০

দর্শকস্য।"

(২) এখানে দেখা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থ রচনাকালে কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলে—জয়নারায়ণ পাকড়াশীর নামে একটি গলির নাম ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকালের ষ্ট্রীট ডাইরেক্টরিতে জয়নারায়ণ পাকড়াশীর নামে কোন গলিপথের নাম নজরে না পড়িলেও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ডাকঘরের এলাকাভুক্ত অঞ্চলে "জয়নারায়ণ লেন" নামে একটি গলি আছে। বর্ত্তমান বহুবাজার অঞ্চলের এই "জয়নারায়ণ লেন"ই কি উক্ত পাকড়াশী মহাশয়ের নামানুসারে হইয়াছিল—তাহা এখন সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা দুরূহ।

(৩) এই গ্রন্থের দু' এক স্থলে পলাশীর যুদ্ধের নামমাত্র উল্লেখ দেখা যায়। যেন রঙ্গলাল পলাশীর যুদ্ধ ব্যাপারকে একেবারে এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এমন কি কোন্ তারিখে পলাশীতে যুদ্ধের প্রহসন ঘটিয়াছিল—তাহাও রঙ্গলাল এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। যাহা হউক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে এখানে উল্লেখ করা গেল যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর প্রাঙ্গণে ইংরাজের তথাকথিত সমর বিজয় ঘটে।

(৪) রঙ্গলাল এখানে লিখিতেছেন যে, ঐ বর্ষের ৫ই আগষ্ট দিবসে কুলিবাজারের নৈঋত কোণে রাজা নন্দকুমারের ফাঁসী দ্বারা প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী পংক্তিতে তিনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের কথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কাজেই সাধারণভাবে এরূপ অর্থ দাঁড়ায় যেন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দেরই ৫ই আগষ্ট নন্দকুমারের ফাঁসী হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পাণ্ডুলিপির এই স্থানে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত কোন কিছুর উল্লেখ ছিল এবং লিখিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে। নন্দকুমারের ফাঁসীর বিবরণ এইরূপ :—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে বিচারপতি লেমেষ্টার ও হাইডের আদালতে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল করার অভিযোগ দায়ের হয়। উক্ত বিচারপতিদ্বয় মোকর্দ্দমাটি বিচারের জন্য প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পের নিকট পাঠান। ঐ বর্ষের ৮ই জুন তারিখ হইতে ৮ দিন ধরিয়া মামলার শুনানী চলে এবং ১৬ই জুন তারিখে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ইংলণ্ডের রাজার নিকট আপীল করিবার উদ্দেশ্যে এই দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিবার নিমিত্ত বহু আবেদনপত্র দাখিল হইয়াছিল। এই সব আবেদনকারীদের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমার এবং মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমও ছিলেন। ইম্পে সমস্ত আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিয়া ৫ই আগষ্ট তারিখে ফাঁসীর দিন ধার্য্য করেন এবং সেইদিন প্রাণদণ্ড কার্য্যে পরিণত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হালহেড কৃত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ—সুপ্রীম কোর্টের সহিত গভর্ণমেণ্টের বিবাদ—পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক সুপ্রীম কোর্টের শক্তির খর্ব্বতা—কলিকাতায় প্রথম সংবাদপত্র—স্যর উইলিয়ম জোন্স কর্ত্তৃক আসিয়াটিক সোসাইটি সংস্থাপন—দশশালা বন্দোবস্ত—গভর্ণমেণ্ট হাউস নির্ম্মাণ—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপন—সংস্কৃত কলেজ।

মুসলমানদিগের সহিত ইংরাজদিগের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে যে কত তারতম্য তাহা বর্ণনাতীত বলিলেই হয়। মুসলমানদিগের রাজ্যকালে এই দেশ দারিদ্র্য, দাসত্ব এবং দৌরাত্ম্য প্রভৃতি দুর্দ্দশায় পতিত ছিল। ইংরাজদিগের অধিকারে তাহার বিপরীতে বিদ্যা, বাণিজ্য, সদ্বিচার ও শান্তিরসের অধীন হইয়াছে। আমরা এই বিষয়ের এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। মুসলমানেরা সার্দ্ধ পঞ্চশতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়া কস্মিন্‌কালে এদেশীয় ভাষা প্রভৃতির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার উদ্যোগ মাত্র করে নাই, বরং তাহা বিলুপ্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল কিন্তু ইংরাজেরা বাঙ্গালাদেশের দেওয়ানী পাইবার দ্বাদশ বর্ষ পরেই বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিবার বিশেষ মতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ই° ১৭৭৮ অব্দে একজন ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হয়—ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার আর কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই।

ই° ১৭৭০ অব্দে হালহেড নামক একজন সদগুণসম্পন্ন ইংরাজ সিবিল পদ ধারণ করিয়া এদেশে আগমন করতঃ গুরুতর পরিশ্রম সহকারে এখানকার বিবিধ ভাষা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে অতি অল্পকালের মধ্যে এদেশীয় ভাষাসমূহে এরূপ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, সে সময় তাঁহার সদৃশ কোন ইংরাজ সে বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন নাই। ই° ১৭৭২ অব্দে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের প্রতি রাজকার্য্য পরিচালনের ভার অর্পিত হইলে হেষ্টিংস সাহেব বিবেচনা করিলেন এদেশীয় দায়াদিতে তাঁহাদের বিজ্ঞতা থাকা অতীব প্রয়োজনীয়। হালহেড সাহেব সে কারণ হিন্দু ও মুসলমানদিগের দায়শাস্ত্র সংকলন করেন—সেই গ্রন্থ ১৭৭৫ অব্দে মুদ্রাঙ্কিত হয়। হালহেড সাহেব এরূপ আগ্রহাতিশয় সহ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, যে সকল ইংরাজ বঙ্গভাষাজ্ঞানে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উক্ত মহাশয়কেই অগ্রে গণনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ছিল না, তিনি ১৭৭৮ অব্দে তাহা প্রকাশ করিলেন। কলিকাতায় সে সময় যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হয় নাই। চার্লস্ উলকিন্স নামক কোন সাহেবের হুগলীতে এক মুদ্রাযন্ত্র ছিল। এই মহাশয় ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা অভ্যাসে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহাতে নৈপুণ্য লাভ করেন। অধিকন্তু তিনি একজন সুচতুর শিল্পী ও কীর্ত্তিকুশল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বহস্তে বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা সর্ব্বাগ্রে ক্ষোদিত করেন এবং সেই অক্ষর যোগে তদীয় বন্ধু হালহেড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট কৌন্সিলের সহিত নব বিরচিত সুপ্রীম কোর্ট বিচারালয়ের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ আপনাদিগকে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি জ্ঞানে এদেশের সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কি রাজস্ব, কি দায়, কি বিগ্রহ কোন

প্রকার রাজকীয় ব্যাপারই তাঁহাদের অনধীন ছিল না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, মুর্শিদাবাদের নবাব ইংলণ্ডাধীপের প্রভুত্ব স্বীকার না করিলেও এক বিষয়ে তাঁহার উপরও সুপ্রীম কোর্টের পরওয়ানা জারি হয়। ইং ১৭৭৯ অব্দের আগষ্ট মাসে কাশীজোড়ার রাজার কলিকাতাস্থ গোমস্তা কাশীনাথ বাবু তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাঁহার উপর তিন লক্ষ টাকার প্রতিভূ পাইবার নিমিত্ত এক পরোয়ানা বাহির হয়। রাজা তাহা শুনিয়া পলায়ন পূর্ব্বক আত্মগোপন করিলে ঐ পরোয়ানা জারি না হইয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মালখানা ক্রোক করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পরোয়ানা বাহির হয় ও তাহা জারি করিবার নিমিত্ত শরীফ সাহেব ৬০ জন অস্ত্রধারী সার্জেন্ট পাঠান। তাহারা রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ভৃত্যদিগকে প্রহার দ্বারা আহত করিয়া দ্বারভঙ্গ পূর্ব্বক পুরী মধ্যে যায় ও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ ও দেবালয় প্রভৃতি অপবিত্র করে এবং প্রজাদিগকে রাজস্ব প্রদানে নিষেধ করাতে আদায় স্থগিত হয়। হেষ্টিংস সাহেব সুপ্রীম কোর্টের এই সকল অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাজাকে এই আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি কদাচ কোর্টের প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন না এবং মেদিনীপুরের সেনাপতিকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন শরীফের লোকদিগকে ধরিয়া রাখেন। এই আদেশ পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহারা রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া যথেচ্ছাচার করিয়াছিল কিন্তু প্রত্যাগমনকালে ধৃত হয়। গভর্ণর জেনারেল সাহেব ইহা ব্যতীত জমিদার ও তালুকদারদের প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, কেহ যেন ঐ কোর্টের পরোয়ানা মান্য না করেন ও প্রাদেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন ঐ কোর্টের কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত কেহ সৈন্য সাহায্য না দেন। পক্ষান্তরে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকেরা গভর্ণর-জেনারেলের এই সকল আদেশ অবগত হইয়া প্রথমতঃ কোম্পানীর উকিলকে কারারুদ্ধ করিলেন, কারণ ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক কথিত আদেশ নিচয় প্রচারিত হয়। অধিকন্তু কাশীনাথ বাবুর প্রার্থনামতে (সার্জেন্টদিগকে ধৃত করণাপরাধে) গভর্ণর-জেনারেল ও কৌন্সিলের মেম্বরগণ অপরাধী বিধায় তাঁহাদিগের উপরও সুপ্রীম কোর্টের শমন জারি হইয়াছিল। এই ব্যাপার ১৭৮০ অব্দে সংঘটিত হয়—অবশ্য হেষ্টিংস সাহেব ঐ শমন অগ্রাহ্য করেন। ইহার পর কলিকাতাস্থ ইংরাজেরা ও গভর্ণর কাউন্সিল বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা হ্রাস করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়া পাঠাইলে পার্লামেণ্ট অচিরাৎ সেই আবেদন গ্রাহ্য করিয়া এক ব্যবস্থা দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার লাঘব করিলেন।

১৭৮০ অব্দে আর এক মহতী কীর্ত্তির অনুষ্ঠান হয়। ঐ বর্ষের ২৯শে জানুয়ারী দিবসে কলিকাতা নগরে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে তৎপূর্ব্বে অপর কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই।

ইং ১৭৮৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুবিখ্যাত বিদ্যাধর স্যার উইলিয়ম জোন্স মহোদয় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির ভার লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে বিদ্যাবিষয়ে বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস, ধর্ম্ম, রীতি, নীতি প্রভৃতি অনুসন্ধান করাই তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতায় উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ সেই ভাষায় বিজ্ঞ পণ্ডিত পাইতে মহা ব্যাঘাত ঘটিল। পরিশেষে বহু অনুসন্ধানের পর সংস্কৃত

বুৎপন্ন জনৈক বৈদ্যজাতীয় পণ্ডিতকে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া তিনি স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ২০।৩০ টাকা পাইলেই কৃতার্থমন্য মানিয়া ম্লেচ্ছদিগকে দেবভাষার উপদেশ দেন কিন্তু সে সময়ে একজন অম্বষ্ঠ ৫০০ টাকার ন্যূনে তাঁহার শিক্ষকতা স্বীকার করেন নাই—ইহাতেই কালের পরিবর্ত্তনকারী নিয়মের সুলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। স্যর উইলিয়ম জোন্স তিন চারি বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিলেন যে, তিনি অনায়াসে মনুসংহিতা অনুবাদে সক্ষম হইলেন। পর বৎসর জানুয়ারী মাসে ঐ মহোদয় আসিয়াটিক সোসাইটি নাম্নী সভা সংস্থাপিত করেন। এই সভা স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত, ভাষা, বিধি প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনুসন্ধান মাত্র। তাঁহার এই সদনুষ্ঠানে অনেক মহাশয় ব্যক্তি সেই সভার সভ্য হন। ঐ মহোদয়দিগের প্রযত্নবশতঃ ইউরোপীয়েরা এদেশ সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রথম পন্থা প্রাপ্ত হন। হেষ্টিংস সাহেব উক্ত সমাজের প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

তাহার পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্ত্তৃক দশশালা বন্দোবস্ত হয়। ইহার বিবরণ এই যে, পূর্ব্বে এদেশীয় জমীদারেরা রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র ছিলেন। ভূমির উপর তাঁহাদের কিছু মাত্র স্বত্ব ছিল না। লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিয়া নির্দিষ্ট কর অবধারণ পূর্ব্বক ভূ-স্বামীত্ব প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্য প্রচলিত হয়, তজ্জন্য দশশালা বন্দোবস্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। এই বন্দোবস্ত বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট সম্মতির নিমিত্ত পাঠাইলে তাঁহারা এই প্রথা চিরকালের নিমিত্ত সংস্থাপনে আজ্ঞা দেন। তদনুসারে বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশের ভূমি রাজস্ব ৩১,০৮৯১৫০৲ টাকা অবধারিত হয়। এই বন্দোবস্ত প্রস্তুত করিবার সময় কর্ণওয়ালিশ, সাহেব জন্ শোর ও কটর্ক কায়স্থ রাজা রাজবল্লভের দ্বারা বিস্তর উপকার পাইয়াছিলেন। শেষোক্ত মহাশয় বাগবাজারে বসতি করিতেন। আজিও তাঁহার নামে এক রাজপথ বিখ্যাত আছে। (১) ইহার ন্যায় সচ্চরিত্র অথচ ক্ষমতাশীল কর্ম্মচারী সে সময় অল্প ছিলেন।

ইং ১৭৯৯ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী দিবসে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লির শাসনকালে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট হাউসের শিলাপত্তন হয়। টিমথি হিকি নামক কোন সাহেব এই মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করেন। এই অট্টালিকার নিমিত্ত ৮০,০০০৲ টাকায় ভূমি ক্রয় এবং তাহার নির্ম্মাণে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়—ইহা ব্যতীত তাহার সজ্জাদির কারণ অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লাগিয়াছিল। এখন যেখানে ট্রেজারি রহিয়াছে সেইখানে পূর্ব্বে সামান্য প্রকার এক বাটীতে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাগণ বিরাজ করিতেন কিন্তু ওয়েলেস্লি বাহাদুর কহিয়াছিলেন যে, রাজপ্রাসাদে উপবেশন পূর্ব্বক রাজবৎ সভা ধারণ করিয়া ভারতবর্ষ শাসন করা কর্ত্তব্য; বস্ত্র ও নীল ব্যবসায়ীদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহকারে এক পণ্যশালায় বসিয়া এই গুরুতর কার্য্য অবধারণ করা উচিত নহে।

ইং ১৮০০ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্লি বাহাদুর সিবিল সংক্রান্ত রাজপুরুষদিগের এদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতা নিবারণ নিমিত্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপিত করিলেন। এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্য নিমিত্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি এদেশীয় ও ডাক্তার কেরী প্রভৃতি ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ নিযুক্ত হন। এক্ষণে যে দুইটি বাটীতে হরকরা যন্ত্রালয় ও

একস্চেঞ্জ নীলাম স্থাপিত আছে ; ঐ দুই বাটীতে প্রথমতঃ উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই কালে দ্বিতীয় তলোপরি এক বারান্দা দ্বারা উভয় বাটীর সংযোগ ছিল।

ইং ১৮২৩ অব্দের পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত রাজকোষ হইতে নবদ্বীপ এবং ত্রিহুত অর্থাৎ মিথিলাদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অর্থ প্রদান করা হইত কিন্তু উক্ত অব্দে গভর্ণর-জেনারেল বাহাদুর হুজুর কৌন্সিলে ইহাই অবধারিত করিলেন যে, উক্ত অর্থদান রহিত করিয়া কলিকাতা নগরে বারাণসীস্থ সংস্কৃত কলেজের ন্যায় এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা যাউক। তদনুসারে ১৮২৪ অব্দের জানুয়ারী মাসে বৌবাজারে এক কোঠা বাড়ীতে তাহার কার্য্যারম্ভ হয়। সে সময় ৫০ জন বৃত্তিধারী এবং ২৬ জন বৃত্তিহীন ছাত্র ৮ জন অধ্যাপকের অধীনে অষ্ট পংক্তিতে বিভক্ত হইয়া ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। পর বৎসর পটোল ডাঙ্গায় নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইলে তথায় তাহা সংস্থাপিত হইল। অনন্তর ১৮ ৬ অব্দে আয়ুর্ব্বেদ পাঠের নিমিত্ত একশ্রেণী ও তৎপর বৎসর ইংরাজী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত শ্রেণী স্থাপিত হয়। সম্প্রতি অধ্যাপনা পক্ষে বিহিত উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রাজকোষ হইতে অর্থ বরাদ্দ হইয়া এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। অধুনা প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (২) প্রযত্নে বৃত্তিদান প্রথা রহিত হইয়া ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন গৃহীত হইতেছে। পূর্ব্বে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সন্তানেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত—এখন সর্ব্বজাতীয় হিন্দু সন্তানেরা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল কার্য্যকর নিয়ম প্রচলন করাতে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

মন্তব্য

১) এখানে যে রাজা রাজবল্লভের নামোল্লেখ রহিয়াছে, তিনি নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ঐতিহাসিক রাজবল্লভ নহেন। তাই পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য রঙ্গলাল ইহাকে "কটকী কায়স্থ রাজা রাজবল্লভ" বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে বর্ত্তমানেও রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের অস্তিত্ব আছে। এই রাজপথটি ১৬৫নং আপার চিৎপুর রোড এই ঠিকানা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(২) এখানে রঙ্গলাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর হইতেছেন বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট পরিচিত—সম্ভবতঃ সেই কারণে রঙ্গলাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে অধিক কিছু উল্লেখ করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে "বিদ্যাসাগর" উপাধী লাভ করিয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজে সহকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন কিন্তু ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সে চাকুরি ছাড়িয়া দেন। তারপর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া বিদ্যাসাগর পুনরায় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। পর বৎসর উক্ত কলেজে প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্টি হইলে তিনি সেখানকার প্রথম প্রিন্সিপাল হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর ঐ প্রিন্সিপালের পদের উপর বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হন কিন্তু কিছুদিন উভয় পদে কাজ করিবার পর উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতের অমিল হওয়ায় তিনি অনায়াসে ৫০০ টাকা বেতনের চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

রঙ্গলাল এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের প্রিন্সিপাল হওয়া কালীন; পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের বিবরণ দিতেছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, তিনি সম্ভবতঃ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

কলিকাতার আদি বড় মানুষ—শেঠ পরিবার, বৈষ্ণবচরণ শেঠ—ঘোষাল পরিবার, দেওয়ান গোকুল ঘোষাল, জয়নারায়ণ ঘোষাল—বাগবাজারের মিত্র পরিবার, গোবিন্দ রাম মিত্র—স্বুবর্ণ বণিক ধর পরিবার, নকুধর, রাজা সুখময়—শোভাবাজারের রাজ পরিবার, নবকৃষ্ণ, গোপীমোহন দেব—হাটখোলার দত্তপরিবার—মল্লিক পরিবার, নিমাই মল্লিক—ঠাকুর পরিবার—দর্পনারায়ণ ঠাকুর, গোপীমোহন ঠাকুর—বনমালী সরকার—রাজা কাশীনাথ। (১)

কলিকাতায় অধুনা যে সকল এ দেশীয় মান্য পরিবার বিরাজ করিতেছেন, ইঁহাদের প্রায় সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি ইংরাজদিগের আগমনের সঙ্গে আরম্ভ হয়। শেঠ ও বসাকেরা কলিকাতার আদিম বড় মানুষ। ইঁহারা ইংরাজদিগের অধীনে কর্ম্ম না করিলেও ইংলণ্ডীয় বণিকদিগের সহিত বাণিজ্য করিয়া বিপুল বিভব উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সৌভাগ্য স্যূর্য্যোদয়কালে বৈষ্ণব চরণ শেঠ তন্তুবায়দিগের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর তুল্য ধনী এবং সাধু লোক সে সময় অল্প পাওয়া যাইত। ইহার সচ্চরিত্রতার বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, তৈলঙ্গাধিপতি রামরাজা তাঁহার মুদ্রাঙ্ক ব্যতিত এদেশ হইতে প্রেরিত গঙ্গাজল গ্রাহ্য করিতেন না। এখনও বৈষ্ণবচরণ শেঠের বংশে সেই মুদ্রা রহিয়াছে। তৈলঙ্গভূপালেরা এখনও সেই মুদ্রাঙ্ক ব্যতিত প্রকৃত গঙ্গাজল প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে কুকুরের মূত্র বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। অপর একটি দৃষ্টান্ত এই যে, এক সময় তিনি অংশীদার গৌরীসেনের নামে রঙ্গ ক্রয় করেন, ঐ রাঙ্গের মধ্য হইতে রজত প্রকাশ পাওয়ায় সাধুশীল বৈষ্ণবচরণ তাহা গৌরীসেনের ভাগ্য জনিত বলিয়া সেই লভ্যের অংশ গ্রহণ না করিয়া সে সমুদয় অংশীকে প্রদান করিলেন। গৌরীসেন এই আকাশভেদী বিপুল ধনের অধিপতি হইয়া ঋণদায়ের নিমিত্ত অথবা সৎপথে আনুকূল্য করিয়া যে সকল ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ অপরাধে দণ্ডার্হ হইত; তাহাদিগের ঋণ পরিশোধ এবং দণ্ডদান দ্বারা তাহাদিগকে কারামুক্ত করিতেন। এজন্য এখনও লোকে কথায় বলে—লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন।

বৈষ্ণবচরণ শেঠের অন্য এক সাধুতার দৃষ্টান্ত এই যে একদা তিনি বর্দ্ধমান নিবাসী গোবর্দ্ধন রক্ষিত নামে একজন তাম্বুলীর কাছে দশ সহস্র মন চিনি ক্রয় করিবার বায়না করেন। যখন ঐ শর্করা বড়বাজারের কদমতলা ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বৈষ্ণবচরণের লোকেরা বিক্রেতার নিকট হইতে উৎকোচ আকর্ষণ নিমিত্ত প্রভু সমীপে কহিল যে, নমুনার অপেক্ষা প্রেরিত চিনি অতিশয় অপকৃষ্ট। অতএব শেঠ মহাশয় দ্রব্যের তারতম্য অনুসারে মূল্যহ্রাস করিবার নিমিত্ত

রক্ষিতকে কহিয়া পাঠাইলে সে ব্যক্তি অসাধুতা কলঙ্ক স্বীকারে অনিচ্ছুক হইয়া সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদানপূর্ব্বক সমুদয় চিনি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিতে স্বীয় অধীন লোকদিগকে আজ্ঞা দিল। সেই আজ্ঞামত কয়েক সহস্র মন চিনি নিক্ষিপ্ত হইলে পর বৈষ্ণবচরণ সেই কথা শুনিবামাত্র রক্ষিতের সাধুতা সম্বন্ধে প্রশংসা করিতে করিতে সমুদয় মূল্য প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট কয়েক সহস্র মন গ্রহণে উদ্যত হন। কিন্তু গোবর্দ্ধন সমুদয় মূল্য লইলে পাছে সত্যে পতিত ও বৈষ্ণবচরণের অপেক্ষা সাধুতায় হীনকল্প হন, সেজন্য অবশিষ্ট চিনির মাত্র মূল্য গ্রহণ করিলেন। হায়! এরূপ সদাশয় ব্যক্তি এখন এদেশীয় লোকের মধ্যে কয়জন দেখা যায়!

ইহাও কথিত আছে যে, সিরাজউদ্দৌল্লা কর্ত্তৃক কলিকাতার দুর্গ আক্রমণকালে ইংরাজেরা বিপুল অর্থ বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট সংগোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বিষয় যদিও ইংলণ্ডীয় কোন গ্রন্থে লিখিত নাই কিন্তু এদেশীয় প্রাচীন মণ্ডলে ইহা সুবিদিত আছে; সুতরাং "নহমূলা জনশ্রুতি" এই ন্যায়ের উপর আমরা এস্থলে নির্ভর করিলাম।

অধিকন্তু এই শেঠ পরিবারের দ্বারা কলিকাতার অনেক লোক প্রধান পদবীস্থ হন। ইহাদিগের আশ্রয়ে ভূকৈলাসীয় ঘোষাল মহাশয়দিগের আদি পুরুষ মহা সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন। আমরা ঐ পরিবারের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাহুল্য বর্ণনা করিলাম।

ভাগীরথীর পশ্চিম পারস্থ শিবপুরের নিকটবর্ত্তী বাক্‌সাড়া গ্রামে রামদুলাল ঘোষাল ও কন্দর্প ঘোষাল নামে দুই ব্রাহ্মণ সহোদর বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠ পৌরহিত্য এবং কনিষ্ঠ সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহে কালহরণ করিতেন। অগ্রজ এদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ন্যায় অত্যন্ত সঞ্চয়ী ছিলেন। অনুজ উদার চরিত্র হওয়ায় সহোদর দ্বয়ে মানসিক ঐক্যের অভাব হয়। কোন সামান্য সূত্রে রামদুলাল ঘোষাল সুশীল সহোদরের প্রতি কটু কষায়ণ প্রয়োগ করিতেন। কোন জ্ঞানী কর্ত্তৃক উল্লেখিত আছে যে, পরমেশ্বর বিষ হইতে পীযূষ এবং পীযূষ হইতে বিষের উৎপত্তি করিয়া থাকেন। কন্দর্প ঘোষালের সম্পর্কে এই কথা সম্যক রূপে সপ্রমাণ হইয়াছিল। অগ্রজের কটূক্তি কালকূটে জর্জ্জরীভূত হইয়া তিতিক্ষায় আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে কন্দর্প উদাস্য পূর্ব্বক বাটী হইতে কলিকাতায় আসিয়া কোন শেঠ পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময় শূদ্রজাতির নিকট ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পূজনীয় ছিলেন। সে সময়ে কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাটীতে পদ ধূলি প্রদান করিলে গৃহস্থ আপনাকে কৃতার্থমন্য মানিতেন! অতএব কন্দর্প ঘোষাল উক্ত শেঠের দ্বারা অত্যন্ত সমাদৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন; ক্রমে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চারিত হইলে তিনি শেঠদিগের সমুদয় কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত ধর্ম্মশীল ব্যবসায়ীদিগের এই এক সুনিয়ম ছিল যে, তাঁহাদিগের অধীনে যতলোক থাকিত, তাহাদিগের বেতন হইতে কিছু কিছু বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর জাহাজ যোগে বিলাতে পাঠাইতেন—তাহাতে যে লভ্য উৎপন্ন হইত তাহা যথা অংশানুসারে সকলকে বিভক্ত করিয়া দিতেন। কন্দর্প ঘোষাল এই লভ্য বৎসর বৎসর গ্রহণ না করিয়া সেই উদ্দেশেই সমুদয় উৎসৃষ্ট রাখাতে কয়েক বৎসর পরে ধনশালী হইয়া উঠিলেন এবং গোবিন্দপুর গ্রামে বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসতি করিলেন। স্বীয় মণিবদিগের পক্ষ হইতে ইংরাজ বণিকদিগের সহিত সর্ব্বদা কথোপকথনাদি করাতে পরিশেষে তিনি ইংরাজী ভাষা কথনে এরূপ সুনিপুণ হইয়াছিলেন যে সে বিষয়ে সে সময় তাঁর

তুল্য কেহই ছিলেন না। একদা মুর্শিদাবাদে ইংরাজদিগের দূত প্রেরণ প্রয়োজন হইলে তাহার সঙ্গে কন্দর্প ঘোষাল দ্বিভাষী পদে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। সেখানে আলীবর্দ্দি খাঁ তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক প্রধান পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ মহাশয় এক দীন ব্রাহ্মণ তনয় হইয়াও স্বীয় সাধুতা, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অবিরাম পরিশ্রম ফলে সেই সময়ে দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য মনুষ্য হইয়া উঠিলেন।

ইং ১৭৬১ অব্দে লর্ড ক্লাইভ পদত্যাগ করিলে ব্যান্সিটার্ট সাহেব গভর্ণর হন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফর খাঁ জরাগ্রস্ত, অলস, ইন্দ্রিয় সুখসক্ত এবং অযোগ্য বিশেষতঃ দুষ্ট পরিষদবর্গে বেষ্টিত থাকায় দেশ ছারখার হইতেছে। এদিকে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে পাটনায় প্রচুর সৈন্য রক্ষা করিতে হইয়াছে এবং অন্যদিকে মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি কর্নাট প্রদেশে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। এই সকল দেখিয়া ব্যান্সিটার্ট সাহেব অকর্ম্মণ্য মীরজাফরকে পদাবনত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসীম খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। মীরকাসীম খাঁ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ছলে ইংরাজ সেনার ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম এই তিন জেলার নিখিল রাজস্ব এককালে প্রদান করিলেন এবং ইহা ব্যতীত কর্নাটিকের সাংগ্রামিক ব্যয়নির্ব্বাহ নিমিত্ত ৫ লক্ষ টাকা দিলেন।

এই পরিচ্ছদের প্রথমাংশে আমাদের লেখা উচিত ছিল যে কন্দর্প ঘোষালের তিন পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, মধ্যম কৃষ্ণচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ গোকুলচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় স্বল্প বয়সে পরলোকগত হন। মধ্যম কৃষ্ণচন্দ্রকে কন্দর্প স্বীয় তেজারতি কার্য্যের ভার দেন। সে সময় এই এক অযৌক্তিক জ্ঞান ছিল যে ম্লেচ্ছভাষা শিখিলে দৈব পৈত্র কার্য্যের সাফল্য হয় না। সেজন্য তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে ইংরাজী পারস্যাদি ভাষায় শিক্ষিত করান নাই। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল যাগ যজ্ঞ ও বাণিজ্য কার্য্যে সময় সম্বরণ করিতেন। ইহার সহিত নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৈত্রী অর্থাৎ মিতা সম্বন্ধ সন্নির্বন্ধ ছিল। কনীয়ান গোকুলচন্দ্র ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন এবং অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিজীবী মনুষ্য ছিলেন।

গভর্ণর ভেরেলষ্ট সাহেব তাঁহার বুদ্ধি চৈক্কণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রাগুক্ত তিন জেলার মধ্যে চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভারার্পণ করেন।

অনন্তর নবাবের রাজকীয় শক্তি ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে তিনি নামে মাত্র নবাব রহিলেন কিন্তু কোম্পানীর একজন কেরাণীর * যে প্রভুত্ব তাহাও তাঁহার রহিল না। এই সময়ে ইংরাজ, বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের দৌরাত্ম্যের কথা কি লিখিব, মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতও তাহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃকল্প ছিল। কলিকাতা, কাসিমবাজার, পাটনা এবং ঢাকা এই চারিস্থানে কোম্পানীর যে সকল কুটি ছিল, তাহা নামে কুটি থাকিলেও বস্তুতঃ ঐ চারিস্থানেই এদেশের সমুদয় রাজকীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইত। কলিকাতার কৌন্সিলের অধীন প্রত্যেক কুটিতে এক এক কৌন্সিল ছিল। ভেরেলষ্ট সাহেব গোকুলচন্দ্র ঘোষালের কর্ম্ম নৈপুণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায় ও বন্দোবস্ত ভার হইতে তাঁহাকে উন্নত করিবার জন্য ঢাকা কৌন্সিলের দেওয়ানী পদ দিলেন।

ইংরাজদিগের পরাক্রম সূর্য্যের পরাক্রম বৃদ্ধির সহিত দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের

* এখন যাঁহারা সিভিল সার্ভেন্ট নামে খ্যাত।

সৌভাগ্য সরোরুহের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছুকাল পরেই ভেরেলষ্ট সাহেব তাঁহাকে ঢাকা হইতে আনিয়া কলিকাতা কাউন্সিলের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই কালে দেওয়ানজির ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির কথা কি লেখা যাইবে। কলিকাতা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া ব্রহ্মদেশের সীমা পর্য্যন্ত গমন করিলে বোধ হয় ইহার মধ্যে আর কাহারও বিষয় ছিল না। গভর্ণমেণ্ট দেওয়ান গোকুল ঘোষালকে এমন এক সনন্দ দিয়াছিলেন যে চট্টগ্রামে যত নূতন চর রচিত হইবে, সেই সমস্তের বন্দোবস্ত তাঁহার সহিত ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির সহিত হইবে না। সেই সময়ে যে সকল চর রচিত হয়, তাহাদিগের নাম, যথা—কাকচর, বকচর, হবে চর, হচ্চেচর, উম্মেদচর ইত্যাদি। এই সকল চর এখন এক একটা জমীদারী হইয়া গিয়াছে। দেওয়ানজি এই সকল বিষয় ব্যতীত বর্দ্ধমানাধিপতির কাছে ৯ লক্ষ টাকায় এক জমিদারী ইজারা লইয়াছিলেন। এই সকল বিভব উপার্জ্জনে যে যথান্যায় পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমন নহে। সে সময়ে কি ইউরোপীয় এবং কি এদেশীয় কোম্পানীর ভৃত্যগণ এ প্রকার উপার্জ্জনকে অন্যায় উপার্জ্জন জ্ঞান করিতেন না। দেওয়ানজির ধুমধামের কথা লেখা যাইতেছে। তাঁহার দুর্গোৎসবের বাহুল্য ঘটা দেখিবার নিমিত্ত নবদ্বীপাধিপতিও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আসিতেন। একদা তাঁহার দীক্ষাগুরু কহেন—"বাপু, আমি কখন একলক্ষ টাকা একত্রে দর্শন করি নাই।" দেওয়ানজি তাহা শুনিয়া একলক্ষ টাকা স্তূপাকারে সাজাইয়া গুরুকে উৎসর্গ করিয়া দেন। কাউন্সিলের মেম্বর প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা তাঁহার বাটীতে আমোদ প্রমোদে কালহরণ করিতেন। তাঁহাদিগের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র বাটী সুসজ্জিত থাকিত। তাঁহারা যে বিলিয়ার্ড টেবিলে খেলা করিতেন, তাহা আজিও পুরাণো বাটীর সিংহদ্বারে পতিত আছে।

দেওয়ান গোকুল ঘোষাল বিপুল বিভবের স্বামী হইয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত এক ধনে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার প্রথম বয়সে এক পুত্রসন্তান জন্মিয়া অতি অল্প বয়সে লোকান্তর গমন করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিঃসন্তান হইয়া পরলোকগত হন; মধ্যম কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র—সুতরাং সমুদয় বাৎসল্য ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি বর্ত্তিয়াছিল। সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম জয়নারায়ণ ঘোষাল। বর্দ্ধমানেশ্বরের নিকট হইতে জমীদারী ইজারা গ্রহণের তাৎপর্য্য এই যে, মণ্ডলঘাট পরগণায় রাজা দুর্গারাম নামে একজন জমিদার ছিলেন। এক সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতির জননী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাত্রা করিয়া দুর্গারামের বাটীর নিকট হইয়া গমনকালে সেই সাময়িক রীতি অনুসারে দামামা ধ্বনি করিয়াছিলেন। তাহাতে দুর্গারাম ক্রোধোন্মত্ত হইয়া স্বদলবলে তীর্থানুরাগিণী মহিষীর তাম্বু লুট করেন। রাণী সেই অপমানে আর শ্রীক্ষেত্রে গমন না করিয়া অশ্রুমুখে স্বীয় পুত্রের নিকট দুর্গারামের অত্যাচার বিজ্ঞাপন করেন। তাহাতে বর্দ্ধমানাধিপতি জ্বলিতাঙ্গ হইয়া সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক ঐ জমিদারের সমুদয় জমিদারী কাড়িয়া লন। দুর্গারাম বিষয় বিনাশে ক্ষুণ্ণমনে পলায়নপূর্ব্বক গভর্ণমেণ্ট কৌন্সিলে দেওয়ান গোকুল ঘোষালের প্রভুত্ব জানিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেওয়ানজি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া তাঁহার কন্যার সহিত স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করাতে দুর্গারাম তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হন। কিন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হইলে দেওয়ানজি তাঁহার উপকার করা দূরে থাকুক, বর্দ্ধমানপতিকে ভয়-মৈত্রী দেখাইয়া দুর্গারামের বিষয় শুদ্ধ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে বহুলক্ষ টাকায় ইজারা লন। ঐ ইজারা বেমেয়াদী অর্থাৎ তাহাতে কালের নির্দ্দেশ ছিল না। কিন্তু এরূপ অন্যায় উপায়ে বিষয়োপার্জ্জন করিলে প্রায় কখন ভোগ

হয় না। গোকুলচন্দ্র, পুত্রমুখ দর্শনে লোলুপ হইয়া পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিলেন। তাহাতে এক পুত্র সন্তান জন্মিলে সেই পুত্রের প্রতি কিরূপ স্নেহ জন্মিয়াছিল এস্থলে তাহার বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ অতিশয় উপযুক্ত, বিষয় বিভবাদির অধিকাংশ তাহার নামে রহিয়াছে। সেজন্য ঐ পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষেই তাঁহাকে কৌশল ক্রমে কহিলেন :— "বাপু, জয়নারায়ণ! বর্দ্ধমানের ইজারা তোমার ভ্রাতাকে যৌতুক স্বরূপ দাও"।

জয়নারায়ণ ঘোষাল তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলে বর্দ্ধমান রাজ সমীপে জয়নারায়ণের নাম পরিবর্ত্তে স্বীয় পুত্রের নাম প্রচলনের নিমিত্ত গোকুল ঘোষাল লিখিয়া পাঠাইলেন। সেই সময় বর্দ্ধমানের রাজ কর্ম্মচারীগণ এক এক ধুরন্ধর ছিলেন। তাহারা দেওয়ান ঘোষালের সহিত পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অতি অন্যায় হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া পত্রোত্তরে লিখিলেন যে, পূর্ব্ব ইজারাদার জয়নারায়ণ ঘোষাল ইস্তফা না করিলে নূতন নামে বন্দোবস্ত হইতে পারে না। তদনুসারে জয়নারায়ণের ইস্তফা প্রেরিত হইলে বর্দ্ধমানাধিপতি লিখিয়া পাঠাইলেন পূর্ব্ব ইজারাদার ইস্তফা মঞ্জুর করা গেল কিন্তু ভবিষ্যতে আর ইজারা দিবার আবশ্যকতা নাই। এইবার পাঠকবর্গ দেওয়ানজির অপেক্ষা বর্দ্ধমানাধিপের চতুরালীর অবশ্যই সমধিক প্রশংসা করিবেন। দেওয়ানজি রাজা দুর্গারামকে ফাঁকি দিতে বসিয়াছিলেন—আপনিও তেমনি ফাঁকিতে পড়িলেন।

সং ১১৮৬ অব্দে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল চারিপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জয়নারায়ণ ঘোষাল বিষয় বিজ্ঞ অথচ চতুর বুদ্ধি হওয়ায় দেওয়ানজি তাহাকে একজন অছি করিয়া যান। কিন্তু এদেশে সাধারণতঃ কথায় বলে, শিশু নায়ক, বহুনায়ক এবং স্ত্রীনায়ক যে পরিবারে হয় সে পরিবারের কোন রূপেই ভদ্র নাই—ঘোষাল পরিবারেও তাহাই ঘটিয়া উঠিল। গোকুলচন্দ্র ঘোষালের দয়িতাগণ একে অপক্ক বুদ্ধিশীলা তরুণ বয়স্কা, তাহাতে শিশুগণ দুষ্ট মন্ত্রদাতা পরিবেষ্টিত, সুতরাং ঘোষাল পরিবারে অতি শীঘ্রই ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল। জয়নারায়ণ ঘোষাল পরিণামদর্শী ব্যক্তি ছিলেন; ভাবি বিপত্তি ভাবিয়া দেওয়ানজি বর্ত্তমান থাকিতেই ভূকৈলাসের বাটী-নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। শকাব্দ (২)··বর্ষে ভূকৈলাশ পত্তন হয়। এই ভূকৈলাশের প্রথম নাম কালীবাগান। শকাব্দা (৩)···বর্ষে জয়নারায়ন ঘোষাল বৃহৎ বৃহৎ শিবলিঙ্গ দ্বয় ও শকাব্দা (৪)...বর্ষে পতিত পাবনী প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে জয়নারায়ণ ঘোষাল ভূকৈলাশ পুরী নির্ম্মাণ করিতেছেন ওদিকে তাঁহার খুল্লতাত পুত্রগণ তাঁহার বিপক্ষে সুপ্রীম কোর্টে গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। এই মোকদ্দমা সূত্রে ঘোষালদিগের ভারি ভারি ভূসম্পত্তি সকল বিক্রীত হইয়া যায়। কেবল সুপ্রীম কোর্টের খরচারূপ অনলে ১৪ লক্ষ টাকা ভস্মীভূত হইয়াছিল। কলিকাতায় কোন কোন ধনী মহাশয়েরা এ বিষয়ে রঙ্গ দর্শনার্থ গৃহবিচ্ছেদ জননীর অভিসন্ধি যোজনার ত্রুটি করেন নাই। এই মোকদ্দমা রফা হইবার অনেক পূর্ব্বে দেওয়ান ঘোষালের বংশধরেরা একে একে স্বল্প বয়সে পরলোকগত হন।

জয়নারায়ণ ঘোষাল অতিশয় সাহসী ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিলেন। তিনি ইংরাজদিগের সংগুণাবলীর প্রশংসা করিতেন এবং আপনিও তদনুসারে কার্য্য করিতেন। এজন্য তাহার সহিত বাঙ্গালীদিগের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। তিনি তাঁহাদিগের ন্যায় সাহেবদের স্তাবক ছিলেন না। একদা শালিখা নিবাসী রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময় সদর বোর্ডের একজন মেম্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিলে রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাহেব ঘোষাল মহাশয়ের সহিত ইষ্টালাপ করিতে করিতে প্রসঙ্গতঃ ইংরাজ জাতির ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিলে তিনি ইংরাজদিগের রীতিনীতির বিস্তর প্রশংসা করিয়া স্বজাতীয়দিগের ব্যবহারের নিন্দা করিবার দৃষ্টান্তছলে রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখাইয়া কহিলেন—"দেখুন! ইনি আমাদিগের দেশের একজন ভদ্রলোক কিন্তু আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসায় উনি কি জন্য গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গোলামের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন?" এই কথা শুনিয়া সাহেব হাস্য করিতে লাগিলেন কিন্তু রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাতে বিরক্ত হইয়া সেই পর্য্যন্ত আর ভূকৈলাশে আগমন করিতেন না।

একদা জয়নারায়ণ, সুবিখ্যাত বিদ্বান স্যর এডওয়ার্ড কোলব্রুক সাহেবের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুত্র শম্ভুচন্দ্র রায় আসিয়া অন্যান্য কথা কহিতে কহিতে অসভ্যতা পূর্ব্বক কহিলেন—"ঘোষাল দাদা, আপনি জ্ঞানবান ব্যক্তি হইয়া একটা শ্যাবদন্ত রাখিয়াছেন—উচিত হয় শ্যাবদন্তটা পরিত্যাগ করেন।" হিন্দুশাস্ত্র মতে পূর্ব্ব জন্মে কেহ সুরাপায়ী হইলে পরজন্মে তাহার শ্যাবদন্ত হয়। জয়নারায়ণ ঘোষাল, তাহার উত্তরে কহিলেন—"রাজাভায়া, আমার শ্যাবদন্ত পরিত্যাগের পূর্ব্বে আপনার উচিত হয়, আপনার গলদেশে যে আব্‌টা আছে, তাহা কাটাইয়া ফেলেন।"

কোলব্রুক সাহেব তাঁহাদের এই বাকচাতুরীর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া জয়নারায়ণ ঘোষালকে তাহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সমীপোবিষ্ট প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর রঘুমণিকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন—উঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। ইহাতে রঘুমণি মহাবিপদে পড়িলেন শ্যাবদন্তের দোষের কথা অনায়াসে বলিতে পারেন কিন্তু আব্ থাকায় পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ অতি উৎকট। অতএব তিনি কোন বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তথাপি কোলব্রুক সাহেব মহাব্যগ্র হইয়া বারম্বার প্রশ্ন করিলে সুচতুর অধ্যাপক পুস্তক হইতে তাহা বাহির করিয়া রাজাকে পাঠ করিতে দিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন।

জয়নারায়ণ ঘোষালের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিষয়ে আরো অনেক কথা আছে কিন্তু সে সমস্ত লিখিলে বাহুল্য হইয়া উঠে, তথাপি আর এক কথা লিখিয়া এ বিষয় শেষ করা যাইতেছে। জয়নারায়ণ স্বীয় পিতার পরলোক গমন পরে রাজা নবকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে রাজা নবকৃষ্ণ কহিলেন—"আপনি অতি প্রধান লোকের পুত্র, দেওয়ান গোকুল ঘোষালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ক্রিয়া উপস্থিত, তাহাতে বিশেষ সমারোহ করিতে হইবেক, ওরে—কে আছিস্ রে—আমার মা ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধের খাতা লইয়া আয়।"

ঘোষাল কহিলেন—"মহাশয়! আমার পিতৃ শ্রাদ্ধ উপস্থিত! মহাশয়ের পিতৃ শ্রাদ্ধের ব্যয়ের ফর্দ্দ আনিতে আজ্ঞা করুন। আমার তো মা ঠাকুরাণীর ক্রিয়া উপস্থিত নহে।"

রাজা নবকৃষ্ণ একথা শুনিয়া অবাক হইলেন। কারণ তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার পিতৃ শ্রাদ্ধ তিল কাঞ্চন গঙ্গাজল বস্ত্রে সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল; যেহেতু সে সময় তাঁহার অবস্থা অতি সামান্য ছিল।

এইরূপে জয়নারায়ণ ঘোষাল দেশীয়গণের দ্বেষের পাত্র হইয়া বারাণসীতে গমন পূর্ব্বক নানা জনহিতকর কার্য্যে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এদেশীয় লোকের নিমিত্ত তিনিই সর্বাগ্রে এক অবৈতনিক বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ইংরাজী, পারস্ত, সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার শিক্ষার্থ প্রচুর দান করেন। আজিও ঐ বিদ্যালয় জয়নারায়ণ কলেজ নামে কাশীতে বিরাজমান রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা করেন! বারাণসীতে মহারাষ্ট্রীয়, মুসলমানীয় ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় যে সকল রাজন্যবর্গ গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া জীবনযাপন করিতেন, তাঁহাদিগের উপকারার্থ তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন। যেহেতু তিনি ইংলণ্ডীয় প্রধান মণ্ডলে অত্যন্ত গণ্যমান্য ছিলেন, কোন মান্য পরিবারের কোন বিষয়ে অসম্মান বা অসাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা ঘোষাল মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই কৃতকার্য্য হইতেন। এজন্য তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে বাবা জয়নারায়ণ নামে সম্বোধন করিতেন কারণ তিনি স্বার্থত্যাগী হইয়া পরোপকার ব্রত পালন করিতেন এবং এই জন্য দিল্লীশ্বর তাঁহাকে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধী প্রদান করেন। সেই রাজকীয় সম্মান চিহ্ন ঘোষাল মহাশয়েরা আজিও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ভোগ করিতেছেন।(৫)

জয়নারায়ণ ঘোষাল কোন ধর্ম্মের বিপক্ষ ছিলেন না। তিনি বারাণসীতে এক সভাতে বসিয়া বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মতবলম্বী মনুষ্যদিগকে লইয়া আমোদ করিতেন। তিনি এক সংবাদ পত্র প্রচারের অনুষ্ঠান করেন। ঐ অনুষ্ঠান পত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় লিখিত আছে। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিলে সে সময়ে এমন বিষয়ে অনুষ্ঠান আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ কি? অন্য দিকে তিনি মনে মনে এদেশীয় কৌলিন্য মর্য্যাদার প্রতিকূল ছিলেন—কারণ তাহার রচিত "কুলীন কন্যার উক্তি" শীর্ষক রহস্যজনক এক গীতেই তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা—

গীত

হায়! কবে লাগিবে লগন।
পতি বিনে হত গত জীবন যৌবন
পাপী কুলিনের ঘরে আমার জনন,
কুলিন নায়ক বিনে না হয় ঘটন,
স্বয়ম্বরা হইতে কহে জয়নারায়ণ॥

অধিকন্তু তাঁহার রচিত এক এক যুক্তিযুক্ত বাক্যের মূল্যও সাধারণ নহে। যথা—

"জগৎ তারণ যিনি * তিনি এক লকড়ি।
যা না খেলে প্রাণ বাঁচে না তারে বলে সকড়ি॥
যাতে জন্ম যার কর্ম্ম তা করিলে পাপ।
এমন দেশে থাক্‌বো নাকো বাপ্‌রে বাপ্‌॥"

এই মহাশয় (৬)...বর্ষে বারানসীতে প্রাণত্যাগ করেন।

---

* জগন্নাথ

মন্তব্য

(১) এই অধ্যায়ে দেখা যাইতেছে যে, কলিকাতার আদি বড় মানুষ হিসাবে কয়েকজন ধনী ব্যক্তি এবং কয়েকটি ধনী পরিবারের নাম অধ্যায়ের শীর্ষ দেশে উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু এই সপ্তম অধ্যায়ে রঙ্গলাল শেঠ পরিবার ও ঘোষাল পরিবারের বিবরণ ব্যতীত অপর কাহারও বিবরণ দেন নাই। সম্ভবতঃ অধ্যায়টির কলেবর বৃদ্ধি হেতু অপরাপর ব্যক্তি ও পরিবারের বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখা যাইতেছে যে, তিনি উক্ত অধ্যায়টিকে Addition to chapter VII অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায়ের বর্দ্ধিতাংশ এইরূপ সংজ্ঞা দিয়া—শোভাবাজারের রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবারের কথা লিখিয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন। কাজেই নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও পরিবার-গুলির নাম অধ্যায়ের গোড়ায় উল্লেখ থাকিলেও গ্রন্থ মধ্যে তাঁহাদের কোন বিবরণ নাই। পাণ্ডুলিপি মধ্যে যে 'পত্রাঙ্ক' আছে, তাহাতে এই সকল বিবরণযুক্ত পত্রগুলি যে হারাইয়া গিয়াছে বা বিনষ্ট হইয়াছে এরূপ কোন নিদর্শন নাই। বরং পাণ্ডুলিপির পত্রাঙ্ক ইহাই প্রমাণ করে যে, এই বিবরণগুলি রচিতই হয় নাই। এই তথাকথিত অরচিত বিবরণগুলি এইরূপ :—(১) বাগবাজারের মিত্র পরিবার—গোবিন্দরাম মিত্র। (২) স্বর্ণ বণিক ধর পরিবার—নকুধর—রাজা সুখময়। (৩) হাটখোলার দত্ত পরিবার। (৪) মল্লিক পরিবার—নিমাই মল্লিক। (৫) বনমালী সরকার। (৬) রাজা কাশীনাথ।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শোভাবাজারীয় রাজপরিবারের বিবরণ দিবার সময় পাদটীকায় রঙ্গলাল উল্লেখ করিতেছেন যে উক্ত প্রবন্ধটি তিনি রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের আনুকূল্যে রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রাজার প্রতি রঙ্গলালের এরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতি হইতে এরূপ অনুমান হয় যে, হয়তো তিনি, যে সমস্ত ধনী পরিবারের কথা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের বংশীয়গণের নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আনুকূল্য না পাওয়ায় প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে এই সব বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত করেন নাই।

(২) রঙ্গলাল লিখিতেছেন যে, ১১৮৬ বঙ্গাব্দে (১৭০০ শকাব্দ বা ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ) দেওয়ান গোকুল ঘোষালের মৃত্যু হয়। তিনি আরও বলিতেছেন যে, গোকুল ঘোষাল জীবিত থাকিতেই অর্থাৎ ১৭০০ শকাব্দের পূর্ব্বেই জয়নারায়ণ "ভূকৈলাসের" পত্তন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্ শকাব্দে ভূকৈলাশ রাজবাটীর পত্তন হয়, সে তারিখটি তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। রঙ্গলাল এই পরিচ্ছেদে যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে এরূপ অনুমিত হয় যে, গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেই জয়নারায়ণের পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কিন্তু ঠিক কোন্ তারিখে কৃষ্ণচন্দ্রের তিরোধান হয়—তাহা নির্ণয় করিবার বর্ত্তমানে উপায় নাই। অন্যান্য গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৬৯) কৃষ্ণচন্দ্র গয়া, কাশী ও প্রয়াগ ক্ষেত্রে গমন করেন। এই তীর্থ যাত্রার ভাজনঘাট নিবাসী বৈদ্য বিজয়রাম সেন কৃষ্ণচন্দ্রের সহযাত্রী ছিলেন। তীর্থান্তে বিজয়রাম কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে ১১৭৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৭০) "তীর্থমঙ্গল" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। এই "তীর্থমঙ্গল" কাব্য রচিত হইবার কিছুকাল পরে কৃষ্ণচন্দ্রের তিরোধান হয়। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ইং-১৭৭১ হইতে ১৭৭৮ পর্য্যন্ত এই কয় বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে ভূকৈলাশ রাজ বাটীর পত্তন হইয়া থাকিবে। পরিখা বেষ্টিত ভূকৈলাশের সুরম্য রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণে যে কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। রঙ্গলাল এই পরিচ্ছেদেই লিখিয়াছেন যে,

জয়নারায়ণ যে সময় ভূকৈলাশ পুরী নির্ম্মাণে রত, সেই সময় তাঁর খুল্লতাত পুত্রগণ তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন। রঙ্গলালের উক্তি হইতে এরূপ অনুমিত হয় যে, গোকুল ঘোষালের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই সম্ভবতঃ জয়নারায়ণ ভূকৈলাশের নির্ম্মীয়মান বাটীতে সপরিবারে চলিয়া গিয়া উক্ত বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বাটী সম্পূর্ণ হইলে তিনি সেখানে দেবালয়াদির নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করেন। এই সকল ঘটনা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আনুমানিক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে (শকাব্দ ১৭০১ বা বঙ্গাব্দ ১১৮৭) ভূকৈলাশ রাজবাটী প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

(৩) ভূকৈলাশ রাজবাটী নির্ম্মাণের পর মহারাজ জয়নারায়ণ তাঁর বাটীর সম্মুখে "শিবগঙ্গা" নামে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া উহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগে দুইটি সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দুইটি বৃহদাকারের শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তিনি তাঁর মাতা রক্তকমলা ও পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের নামে ঐ দুইটি শিবলিঙ্গের নামকরণ করেন—রক্তকমলেশ্বর এবং কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর বর্ত্তমানে ভূকৈলাশ রাজবাটীর ৺পতিত পাবনী দেবীর দেউল স্তম্ভে সম্বদ্ধ তাম্র ফলকে ইংরাজী অক্ষরে এরূপ খোদিত থাকিতে দেখা যায় যে, ১৭০১ শকাব্দের (ইং ১৭৮১ এবং বাং ১১৮৮) ২৯শে চৈত্র রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে এই মন্দির দুইটি স্থাপিত হইয়াছিল।

(৪) ভূকৈলাশ রাজবাটীর ৺পতিত পাবনী দেবীর দেউল স্তম্ভে সম্বদ্ধ তাম্রফলকে খোদিত আছে যে, ১৭০৩ শকাব্দের (বাং ১১৮৯ সাল) ফাল্গুন মাসে মধু ত্রয়োদশী সংক্রান্তি দিবস, রবিবারে মহারাজ জয়নারায়ণ ৺পতিত পাবনী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই তাম্রফলক জয়নারায়ণের পুত্র রাজা কালীশঙ্কর কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

(৫) রঙ্গলাল যে সময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে সময় পর্য্যন্ত ভূকৈলাসের ঘোষাল বংশীয়গণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে রাজকীয় সম্মান ভোগ করিতেছিলেন কিন্তু উত্তরকালে এই রাজোপাধীর বিলুপ্তি ঘটে। ভূকৈলাশ রাজবংশের বিবরণ এইরূপ:—গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে (বাং ১১৮৮ সাল) জয়নারায়ণের জন্য "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি আনাইয়া দেন। এই সময় দিল্লীর সিংহাসনে ছিলেন দ্বিতীয় শাহ আলম্ (১৭৫৯-১৮০৬)। জয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরা নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধী লাভ করেন। রাজা কালীশঙ্করের পর তাঁর চতুর্থ পুত্র সত্যচরণ "রাজা বাহাদুর" হইয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হইলে তাঁর অনুজ সত্যশরণ ভূকৈলাশের রাজা হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজা সত্যশরণ লোকান্তরিত হইলে রাজা সত্যশরণের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যানন্দ বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে রাজোপাধী পাইয়াছিলেন। রাজা সত্যানন্দের পর এই বংশে আর কেহ রাজা হন নাই। রাজা সত্যানন্দের চারিপুত্র—সত্যশ্রী, সত্যনিধি, সত্যসেবক এবং সত্যমোহন—ইহারা "কুমার বাহাদুর" ছিলেন। অতঃপর ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক ঘোষাল বংশে "কুমার বাহাদুর" খেতাব ব্যবহারও নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

(৬) ১২২৮ বঙ্গাব্দের (শকাব্দ ১৭৪২ এবং ইং ১৮২১) ২৫শে কার্ত্তিক তারিখের মধ্যাহ্নে, বারাণসীধামে, মণিকর্ণিকা তীর্থে মহারাজ জয়নারায়ণের দেহত্যাগ ঘটে। এই সময় তাঁর বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়ের বর্দ্ধিতাংশ

শোভাবাজারীয় রাজ পরিবার*

যদিও এই পরিবারের সৌভাগ্য প্রতিভা রাজা নবকৃষ্ণের শ্রীবৃদ্ধির উপর নির্ভর রহিয়াছে কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেও ঐ বংশের কীর্ত্তিকলাধর অনেক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের পিতাম্বর নামক জনৈক পূর্ব্বপুরুষ একদা ঘটক কুলীনদিগকে নিমন্ত্রন করিয়া পথিমধ্যে এক তটিনীর উপর ধান্য দিয়া সেতু বন্ধন পূর্ব্বক অহুতগণের পারাবতরণের সুপন্থা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "ধান্য পিতাম্বর" হয়। তা ছাড়া তিনি গৌড় রাজ্যাধিপতির নিকট হইতে "মিত্র" উপাধী প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশে দেবীদাস নামক অপর এক ব্যক্তি "মজমুয়াদার" উপাধীসহ মুড়াগাছা পরগণার কানুনগো ছিলেন। এই দেবীদাসের ষট্ তনের মধ্যে সহস্রাক্ষ এবং রুক্মিণীকান্ত মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাব মহাবৎজঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সহস্রাক্ষকে পিতৃপদে অভিষিক্ত করিয়া রুক্মিণীকান্তকে মুড়াগাছা পরগণার অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভূম্যধিকারী কেশবরাম রায় চৌধুরীর বিষয়-নির্ব্বাহক পদে ব্যবহর্ত্তা উপাধি প্রদান পূর্ব্বক নিযুক্ত করিলেন। তৎপুত্র রামেশ্বর ব্যবহর্ত্তা মুড়াগাছা পরগণা হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক আয় সম্ভাবিত করিয়া নবাব সরকারে বাহুল্যকর প্রদান করাতে কেশবরাম রায় তাঁহাকে স্বীয় পুরী মধ্যে কারারুদ্ধ করেন। রামেশ্বরের মধ্যমপুত্র রামচরণ মুর্শিদাবাদে যাইয়া রায় রাঁয়া চৈনরায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া মুড়াগাছা পরগণার রাজস্ব ৫০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিলে রায় রাঁয়া তাঁহাকে উক্ত পরগণার রাজস্ব বর্দ্ধক পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাঠান। রামচরণ স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জনককে কারামুক্ত করিবার পর প্রতিহিংসা ঋণ পরিশোধ নিমিত্ত কেশবরাম রায়কে কারাগারে বন্ধ করিলেন।

রামচরণ ব্যবহর্ত্তা মুড়াগাছা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া গোবিন্দপুরে বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বীয় পরিবারদিগকে তথায় রাখিয়া পুনর্ব্বার নবাবের দরবারে উপস্থিত। তাহাতে হিজলি, তমলুক ও মহিষাদল প্রভৃতি প্রদেশের লবণের ও অপর প্রকার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া ঐ কার্য্য এমন সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করেন যে মহাবৎজঙ্গ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক উচ্চতর পদে তাঁহাকে উন্নত করেন। তাহা এই যে, ঐ সময়ে আড়কাটের সুবেদারের সহিত তাঁহার ভ্রাতা মনিরুদ্দিন খাঁ দ্বন্দ্ব করিয়া রামচরণকে তাঁহার দেওয়ানরূপে নিযুক্ত করিয়া প্রচুর সৈন্য সঙ্গে দিয়া উক্ত অঞ্চলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাত নিবারণ কল্পে পাঠাইয়া দিলেন। ইঁহারা মেদিনীপুরের নিকট অতি অল্প মাত্র শরীর রক্ষক সেনা সহ উপস্থিত হইলে এক গোপনীয় স্থান হইতে ৪০০ অশ্বারোহী পিণ্ডারী সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। মনিরুদ্দিন ও রামচরণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে স্বদল বলে নিহত হন।

রামচরণের তিনপুত্র—রামসুন্দর, মাণিক্যচন্দ্র এবং নবকৃষ্ণ। রামচরণ স্বীয় সমুদয় বিভব হুগলী নগরীর ফকীর তজ্জার নামক জনৈক ধনবান বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। ফকীর তজ্জারের মৃত্যু হইলে উক্ত পিতৃহীনত্রয় একেবারে সর্ব্বস্বান্ত প্রায় হইলেন কিন্তু রামচণের পত্নী অতিবুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বিস্তর আয়াসে অবশিষ্ট সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয়

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত প্রবন্ধ রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের আনুকূল্যে লিখিত হইল।

সন্তান দিগকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ভাগিরথীর তীরবর্ত্তী হুগলী নগরীর বাটী জলসাৎ হওয়ায় ইহারা মুড়াগাছার অন্তঃপাতী পঞ্চগ্রামের (পাঁচ গাঁ) বাটীতে গিয়াছিলেন। বাং ১১৩৯ অব্দে রাজা নবকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন যাহা হউক উক্ত বুদ্ধিশীলা স্ত্রীলোক পুনর্ব্বার গোবিন্দপুরে আসিয়া এক নূতন বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুত্রগণ সহ বাস করিতে লাগিলেন। নবকৃষ্ণ শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তির বিলক্ষণ লক্ষণ প্রদর্শন করতঃ অতি অল্প কাল মধ্যে একজন সুনিপুণ পারস্য বিদ্যাবিদ্ রূপে বিখ্যাত হইলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে যাইয়া উক্ত বিদ্যায় সমীচীনতা লাভ করেন এবং কলিকাতায় থাকিয়া চলন মত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময়ে শেষোক্ত ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার ছিল তাহা সকলে বুঝিতে পারেন। নবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দর ব্যবহর্ত্তা পঞ্চকুটের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় পরিবার দিগকে প্রতিপালন করেন।

সিরাজউদ্দৌল্লার আগমন সংবাদে ড্রেক সাহেব যে সময় অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে রাজা রাজবল্লভ দূত দ্বারা তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে নবাবের পরিষদবর্গ বিশেষতঃ হিন্দু সম্ভ্রান্ত লোক মাত্রেই তাহার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিতেছেন এবং সকলের এমন ইচ্ছা যে, ইংরাজদিগের সহায়তা করেন। কিন্তু পত্র বাহক ড্রেক সাহেবকে কহিল এই পত্র কোন মুসলমান দ্বারা পঠিত না হইয়া হিন্দু দ্বারা পাঠ করাইবার আদেশ আছে। ইহা শুনিয়া ড্রেক সাহেব জনৈক পারস্যবিদ্যাবিৎ হিন্দুর অন্বেষণে চারিদেকে লোক পাঠাইলেন। দৈবাধীন সেই দিবস নবকৃষ্ণ ব্যবহর্ত্তা স্বকীয় কার্য্যোপলক্ষে বড় বাজারে গিয়াছিলেন। ড্রেক সাহেবের লোকেরা জনরবে তাঁহার পারস্য ভাষার ব্যুৎপত্তি বাহুল্যের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল! নবকৃষ্ণ ঐ পত্র পাঠ পূর্ব্বক ইংরাজীতে তাহার মর্ম্ম অবগত করিলে পর সাহেব তাঁহার দ্বারা পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। সেই সময় তাঁহার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক হয় নাই। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ড্রেক সাহেব ২০০ শত টাকা বেতনে নবকৃষ্ণকে কোম্পানীর মুন্সিপদে নিযুক্ত করেন। ঐ পদে তদপূর্ব্বে তাজুদ্দিন নামক একজন মুসলমান নিযুক্ত ছিলেন। সেই হইতে নবকৃষ্ণ মুন্সি নামে বিখ্যাত হন। ড্রেক সাহেব সেই সময়ের রীতি অনুসারে তাঁহাকে সওয়ারী খরচ প্রদান করিতেন। এই মুন্সিগিরি কার্য্যে তিনি এরূপ পারদর্শিতা প্রকাশ করেন যে তারপর ক্লাইভ সাহেব তাহাতে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া রাজকীয় গুরুতর কার্য্য মাত্রে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতেন। সিরাজউদ্দৌল্লা দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণে আসিলে তাহার সহিত সন্ধি নিবন্ধন ছলে নবকৃষ্ণকে উপঢৌকন সহ তাহার শিবিরে প্রেরণ করিলে তিনি নবাবী সৈন্যের প্রকৃত অবস্থা দর্শন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভূ সমীপে বিজ্ঞাপন করেন। অধিকন্তু মীরজাফরের সহিত ক্লাইভের গোপনীয় অভিসন্ধি সংস্থাপনে নবকৃষ্ণই উদ্যোগী ছিলেন। এই অভিসন্ধিহেতু সিরাজউদ্দৌল্লার সর্ব্বনাশ হয়।

অনন্তর মীরকাশেমের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি আডামস্ সাহেবের সহিত থাকিয়া বৃটিশ পক্ষে বিশেষ সাহায্য করেন। এই সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন। ক্লাইভ সাহেব যে সময়ে প্রয়াগে শাহ আলমের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে নবকৃষ্ণ মুন্সি বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিলেন। অযোধ্যাধিপতি সুজাউদ্দৌল্লার সহিত সন্ধির সময়ে তাঁহার কর্ম্মকুশলতা বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয়। বারানসী

পতি বলবন্ত সিংহ ও বেহারের রায় রাঁয়া সিতাব রায়ের সহিত বন্দোবস্ত কালেও মুন্সি মহাশয় প্রকৃষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। গভর্ণর ভেরেলষ্ট সাহেব রচিত বাঙ্গালা দেশের অবস্থা বর্ণনা গ্রন্থে তাঁহার বিষয়ে এরূপ লিখিত আছে, মীরজাফরের সুবাদারী পূর্ব্বে নবকৃষ্ণ ইংরাজ পক্ষে নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে পক্ষতা করিয়াছিলেন। মীরকাশেমের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যে পর্য্যন্ত উক্ত সুবাদার এ প্রদেশ হইতে দূরীভূত না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তিনি মেজর আডামস্ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। ইংরাজ পক্ষে তাঁহার অনুরাগ ও কার্য্য নৈপুণ্য দর্শনে লর্ড ক্লাইভ তাঁহাকে কমিটির মুৎসুদ্দি পদে নিযুক্ত করেন। এ পদে তিনি ভেরেলষ্ট সাহেবের শাসনকালে বৎসরত্রয় পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভেরেলষ্ট সাহেবের টিপ্পনী—"নবকৃষ্ণ গভর্ণরের মুৎসুদ্দি ছিলেন" এ কথা বলাতে বোল্ট সাহেবের ভ্রম হইয়াছে—"কমিটি এ দেশীয় রাজা রাজড়াদিগের সহিত রাজকীয় কার্য্য কদম্ব সম্পন্ন করণার্থ তাঁহাকে আপনাদিগের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ইং ১৭৬৫ অব্দে মুন্সি নবকৃষ্ণ লর্ড ক্লাইভের সহিত প্রয়াগে গমন করিলে শাহ আলম বাদশাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া হিঃ ১১৭৯ অব্দের ২রা শোওয়াল তারিখে রাজাবাহাদুর ও মনসব পঞ্চহাজারী উপাধিসহ বিবিধ সম্মানসূচক রাজপ্রাসাদ প্রদান করেন। সম্রাট সেই দিবস তাঁহার অগ্রজদ্বয়কে রায় ও মনসব একহাজারী উপাধী প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত নবকৃষ্ণ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে বিশিষ্টরূপ খেলয়ৎ ও অন্যান্য সম্মানচিহ্ন প্রাপ্ত হন।

অনন্তর লর্ড ক্লাইভ কলিকাতায় ফিরিয়া একদা কৌন্সিল গৃহে বসিয়া নবকৃষ্ণকে সমুচিতরূপে পুরস্কৃত করিবার নিমিত্ত স্বগণসহ পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময় আরকাটের নবাব প্রেরিত এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। লর্ড ক্লাইভ নবকৃষ্ণকে ঐ পত্র পাঠ করিতে আজ্ঞা করিলে তিনি দেখিলেন যে, তাহা তাঁহার অনিষ্ট হেতু লিখিত হইয়াছে। অতএব কিছুকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরে সে সমুদয় পাঠ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম, যথা :—

"আমার মানস এই যে, ইংরাজ কোম্পানীর সহিত বিগ্রহ শেষ হইয়া উভয়তঃ সন্ধি সংস্থাপন ও প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক কালহরণ করা যাইবে, কিন্তু কোম্পানীর কার্য্যকারক রাজা নবকৃষ্ণ আমার শত্রু মণিরুদ্দিনখাঁর সহচর মৃত দেওয়ান মামচাদের পুত্র বিপ্রো প্রস্তাবিত সন্ধি বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা করিবে। অতএব যে পর্য্যন্ত রাজা নবকৃষ্ণ উক্ত পদস্থ থাকে সে পর্য্যন্ত শান্তি সংস্থাপন হওয়া সুদূর পরাহত।"

লর্ড ক্লাইভ পত্র মর্ম্ম অবগত হইয়া রাজা নবকৃষ্ণকে কিছু কালের জন্য উক্ত গৃহাভ্যন্তরে যাইতে অনুমতি করিলেন। সেখানে তিনি মহাসঙ্কুচিত চিত্তে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইক্ষণেই আমি কর্ম্মচ্যুত হইব। লর্ড ক্লাইভ কিছুকাল সর্দ্দার গণের কথোপকথন করিয়া রাজা নবকৃষ্ণকে পুনরায় আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন—"তুমি আমাকে কিজন্য এ কাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন কর নাই যে, তুমি এই প্রকার সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? কোম্পানী তোমার পরিশ্রম ও কর্ম্ম-নৈপুণ্যে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু তোমার বংশ মর্য্যাদার বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকায় আমরা তোমার যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি নাই। এই দিন হইতে আমরা তোমাকে মহামহিম কোম্পানীর দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করিলাম—অতঃপর অতি শীঘ্র উপযুক্ত মত উপাধী ও খেলয়ৎ প্রভৃতি প্রদান করা যাইবে।"

ইং ১৭৬৬ অব্দে লর্ড ক্লাইভ শাহ আলম্ বাদশাহের নিকট হইতে নবকৃষ্ণের জন্য ষশ্‌হাজারী ও মহারাজা উপাধী প্রদানীয় সনন্দ আনাইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। যথা—

সনন্দ

তৎপ্রদানোপলক্ষে লর্ড মহোদয় বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষের অভিমতানুসারে তাঁহাকে পারস্যাক্ষর-মালা ও উক্ত মহোদয় এবং কোম্পানীর অভিজ্ঞান অর্থাৎ মুকুট ও অস্ত্রাদি খচিত স্বর্ণ পদক প্রদান করেন। তাহাতে তাঁহার সাধুতা এবং কৃতজ্ঞতার বিস্তর প্রশংসাবাদ লিখিত আছে। যথা—

মুদ্রা

উক্ত স্বর্ণ পদক ব্যতীত তিনি কোম্পানী পক্ষ হইতে দশ পর্চার খেলয়ৎ ও আর আর সম্মানসূচক পুরস্কার প্রাপ্ত হন—সে সকলের বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার গৃহদ্বারে সিপাহীর পাহারা নিযুক্ত হয় ও তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত মাসিক দুই সহস্র টাকা (তংখা) নির্দিষ্ট হয়। রাজা নবকৃষ্ণ বিনতি পূর্ব্বক উক্ত টাকা গ্রহণে অস্বীকারপূর্ব্বক কেবল দুইশত টাকা মাত্র গ্রহণে সম্মত হন। তিনি লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহের প্রতি ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিলেন,—“আপনার প্রসাদাৎ আমার কিছুর অভাব নাই, অতএব অনর্থক কোম্পানীর কোষ হইতে এতাধিক অর্থাকর্ষণ করা আমার কর্ত্তব্য নহে।”

লর্ড ক্লাইভ তাঁহার এই উক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত মাসিক বৃত্তি তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নির্দিষ্ট* করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া হস্তির উপর আরূঢ় করাইলে সভাভঙ্গ হইল। মহারাজা নবকৃষ্ণ মহা আড়ম্বরে গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতায় সেরূপ ঘটা বহুকাল হয় নাই।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গোবিন্দপুরে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ অবধারিত হইলে সেখানকার অন্যান্য পরিবারদিগের ন্যায় ব্যবহর্ত্তা পরিবারও স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে আড়পুলীতে দশ বিঘা ভূমি ও বাটীর মূল্য ৫০০০ টাকা প্রাপ্ত হন কিন্তু আড়পুলীর ভূমির প্রতি রামসুন্দর ব্যবহর্ত্তার বিরাগ থাকায় ১৭৬৩ অব্দে সুতানুটিতে এক বিঘা ভূমি ও একটি বাটী ক্রয় করিয়া বসতি করিলেন। ঐ বাটী পূর্ব্বে রামশঙ্কর ঘোষের ছিল—ঐ ভূমিখণ্ড মারাকম্ নামক কোন সাহেবের ঋণ পরিশোধার্থ বিক্রীত হয়। ঐ বাটীই শোভাবাজারীয় রাজবাটীর আদ্যস্থান। মহারাজা নবকৃষ্ণ অনুমান ১৭৬৪ অব্দে উক্ত প্রাসাদ শ্রেণী নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৮০ অব্দে তাহা সমাপ্ত করান; এই স্থান পূর্ব্বে “পবনা বাগান” নামে খ্যাত ছিল। শঙ্কর ঘোষের বাটীর চতুর্দিকে তিনি প্রথমতঃ বিংশতি বিঘা ভূমি ক্রয় * করিয়া তাহাতে ঠাকুরবাটী, দেওয়ানখানা ও অন্তঃপুর প্রভৃতি বিবিধখণ্ড নির্ম্মাণ করাইয়া অবশিষ্ট ভূমিতে উদ্যান স্থাপন করিলেন। এই সমস্ত এখন রাজা রাধাকান্তের সম্পত্তি। আর তিনি রাস্তার দক্ষিণ ধারে আরও ১৬ বিঘা ক্রয় পূর্ব্বক যে প্রাসাদ শ্রেণী নির্ম্মাণ করান, সেখানে এখন রাজা শিবকৃষ্ণ ও তৎভ্রাতৃগণ বসতি করিতেছেন। পুরাতন

---

* এই বৃত্তি রাজা নব কৃষ্ণের মৃত্যুর পরই রহিত হয়।

* তদনন্তর রাজা গোপীমোহন আরও কয়েক বিঘা ক্রয় করিয়া অতিরিক্ত বাটী সকল ক্রয় করেন।

বাটীতে যে নবরত্ন রহিয়াছে, তাহা মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শোভাবাজার রাজবাটীর পত্তন অবধি একাল পর্য্যন্ত তাহাতে কত কত নবাব, সুবাদার, রায়রাঁয়া, রাজা প্রভৃতি ও লর্ড ক্লাইভ হইতে লর্ড অকল্যাণ্ড পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেলগণ পদার্পণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিয়াছেন। অধিকন্তু অট্টালিকা শ্রেণীতে বহুকাল পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের অনেকানেক কার্য্যালয় উক্ত মহারাজার সদস্যতার অধীনে বর্ত্তমান ছিল। যথা—মুন্সি দফ্তর, আরজ্বেগি দফ্তর; ২৪ পরগণার তফ্শীল দফ্তর; জাতিমালা কাছারী; ২৪ পরগণার মাল আদালং এবং কোম্পানীর ধনকোষ—সে সময় ইহা মণি গুদাম" নামে খ্যাত ছিল।

১৭৬৭ অব্দে লর্ড ক্লাইভ বিলাত যাত্রা করিলে পর ভেরেলষ্ট সাহেবের শাসন সময়ে মহারাজা নবকৃষ্ণ রাজকীয় ব্যাপার নির্ব্বাহের দেওয়ানী পদে কিছুকাল অবস্থিত আছেন, এমন সময় তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল। মহারাজা নঃ ভূত নঃ ভাবি আড়ম্বরে তাঁহার আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করেন। তাহাতে শত্রুবর্গ কৌন্সিলের কোন মেম্বরকে কহে—"রাজা নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে আপনার সর্ব্বসান্ত করিয়া স্বীয়াধীন কোম্পানীর কোষ হইতে বহু লক্ষ টাকা ভাঙ্গিয়া কাঙ্গালী বিদায় করিতেছেন।"

মেম্বর মহোদয় সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া ভেরেলষ্ট সাহেবকে বিজ্ঞাপন করেন। অনন্তর শ্রাদ্ধ শান্তি পরে রাজা নবকৃষ্ণ গভর্ণর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সাহেব রহস্যছলে বলিলেন—"আমি শুনিলাম, তুমি নির্ব্বুদ্ধিতা পূর্ব্বক তোমার মাতৃ শ্রাদ্ধে আপনার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট করিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া কোম্পানীর কয়েক লক্ষ টাকা নাকি অপচয় করিয়াছ।" রাজা তাহা শ্রবণ মাত্র মেঝের উপর চাবিধরিয়া দিয়া কহিলেন—"এই দণ্ডেই জনৈক কাউন্সিলের মেম্বর আমার নিন্দাবাদককে সঙ্গে লইয়া গিয়া মণি গুদাম পরীক্ষা পূর্ব্বক বাকি বুঝিয়া লউন।"

ভেরেলষ্ট সাহেব বহুতর সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা পাইলে রাজা কহিলেন—"আমার চরিত্র ক্ষালনার্থ রাজকোষ পরীক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।"

ভেরেলষ্ট সাহেব পুনর্ব্বার কহিলেন—"আমি নিশ্চয় জানি কোষ মধ্যে সামান্য মাত্রও ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমার সচ্চরিত্রতার প্রতি সন্দেহ মাত্র রাখি না।"

তাহার উত্তরে রাজা কহিলেন—"যে পর্য্যন্ত উক্ত কোষ পরীক্ষা না হইবে সে পর্য্যন্ত আপনার এবং আমার চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপিত হইবে।" পরিশেষে রাজার দ্রাঢ্য হেতু ভেরেলষ্ট সাহেব অগত্যা উক্ত কোষ পরীক্ষা নিমিত্ত জনৈক মেম্বরকে প্রেরণ করিলেন। তিনি পরীক্ষান্তে গভর্ণর সাহেবকে কহিলেন—"কোম্পানীর তহবিলের কড়াক্রান্তি মাত্র গরমিল নাই—বরং তন্মধ্যে রাজার নিজ হিসাবে ৭ লক্ষ টাকা আমানৎ আছে।" ভেরেলষ্ট সাহেব ইহাতে লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক রাজার হস্তে পুনরায় চাবি প্রদান করিলে তিনি তাহা পুনর্গ্রহণে অস্বীকার করিয়া কহিলেন—"যখন আমার বিরুদ্ধে তহবিল ভঙ্গ করণের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, আপনি তখনি আমাকে কারারুদ্ধ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ অনুগ্রহ প্রত্যেক গভর্ণর আমার প্রতি প্রদর্শন করিবেন—এমন সম্ভাবনা নাই। অতএব কোম্পানী বাহাদুরের অধীনে আমি যে

সকল গুরুতর কার্য্যের ভারে দায়ী আছি, সেই সকল ভার হইতে এক্ষণে মুক্ত হই—এই আমার প্রার্থনা।"

পরদিনই রাজা স্বীয় বাটী হইতে সমুদয় দফ্‌তর উঠাইয়া আনিয়া গবর্ণর সাহেবের সমীপে সেই সকল প্রদান পূর্ব্বক রাজ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ ইংরাজদিগের প্রাচীন সমাধিস্থানের ভূমি ব্যতীত তৎসংলগ্ন অতিরিক্ত ৬ বিঘা জমি সেণ্টজন্‌স্ কাথিড্রাল নামক গীর্জ্জা নির্ম্মাণের নিমিত্ত প্রদান করেন। এই স্থানে পূর্ব্বতন দুর্গের অস্ত্রালয় ছিল। সে সময় ইহার মূল্য ৪৫০০০ টাকা নিরূপিত হয়। তিনি এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বেহালা হইতে কুল্‌পি পর্য্যন্ত অন্যূন ১৬ ক্রোশ পথ নির্ম্মাণ করিয়া দেন—তাহা এখন রাজার জাঙ্গাল নামে খ্যাত আছে। ইহা ব্যতীত শোভাবাজার রাজবাটীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্ম নির্ম্মাণেও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন, কারণ ঐ বর্ত্মের জন্য সমধিক মূল্য দিয়া ভূমি ক্রয় করিতে হইয়াছিল। তিনি জীবৎমানে স্বীয় ব্যয়ে প্রতিবৎসর ঐ পথের সংস্কার করাইতেন।

রাজা নবকৃষ্ণ ইং ১৭৮০ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার বন্দোবস্তি ভার গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত তাঁহার বিষয় রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হন। তাহাতে স্বীয় কোষ হইতে ৮,৭৪,৭২০্ টাকা প্রদান পূর্ব্বক বর্দ্ধমানাধিপতির অধিকার রক্ষা করিয়া পরিশেষে ক্রমে ক্রমে তাহা পরিশোধ করিয়া লন। তিনি স্বীয় নৌপাড়া নামক তালুক কোম্পানীকে প্রদান পূর্ব্বক তাহার পরিবর্ত্তে সুতানুটি, হোগলকুড়িয়া ও বাগবাজার প্রভৃতি কোম্পানীর সাবেক জমিদারী পুরুষানুক্রমে ভোগাধিকার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইহাতে এদেশীয় ধনী মাত্রই প্রায় রাজা নবকৃষ্ণের প্রজা হওয়ার অপমান জ্ঞানে একবাক্যে তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, নূতন ভূস্বামী তাঁহাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা তাঁহার নিকট কর প্রদান না করিয়া পূর্ব্ববৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা প্রদান করিবার প্রার্থনা করেন। সে সময়ে রেভেনিউ বোর্ডের অধ্যক্ষগণ সকলেই কৌন্সিলের মেম্বর হওয়ায় প্রার্থীদিগের ধৃষ্টতা বুঝিয়া এই আদেশ বিধান করিলেন; তাঁহাদিগের অনির্ব্বার্য্য ইচ্ছা এই যে, প্রার্থকেরা রাজা নবকৃষ্ণের নিকট কর প্রদান করিবেন কোনরূপে কেহ ইহার বিপর্য্যয় করিতে পারিবেন না।

রাজা নবকৃষ্ণ একজন অগ্রগণ্য পণ্ডিত—বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালাদেশের ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার সভাস্থ হইতেন। সুবিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁহার সভাশোভনের প্রকৃষ্ট রত্ন ছিলেন। সভাতে নানা শাস্ত্র বিষয়ক বাদবিতণ্ডা উপস্থিত হইলে তাহাতে যাঁহারা জয়লাভ করিতেন, তাঁহাদিগকে রাজা আশার অতীত পুরস্কার প্রদান করিতেন। তিনি ভারতবর্ষের নানাদেশ হইতে বহুমূল্য দুর্লভ সংস্কৃত ও পারস্য গ্রন্থ সকল আনিতে ব্যয়ের অবশেষ রাখিতেন না। সেই সকল গ্রন্থের সুচারু অক্ষরমালার প্রতিলিপি করাতে তাঁহার বিষয় বিভবাদির মধ্যে ঐ সকল গ্রন্থ অতুল্য ও অমূল্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

তিনি তৌর্য্যত্রিকের একজন অগ্রগণ্য প্রেমিক ছিলেন। কোন কার্য্যোপলক্ষ হইলে দূর-দূরান্তবর্ত্তী রাজন্যবর্গের সভা হইতে গায়ক গায়িকাগণ শোভাবাজারের রাজ নিকেতনে আসিয়া স্ব স্ব গুণ প্রদর্শন পূর্ব্বক যথাযোগ্য পুরস্কার লাভে পরিতুষ্ট হইয়া যাইত।

ইহার উপর তাঁহার পৌত্র রাজা রাধাকান্তের সহিত রামকান্ত সিংহ চৌধুরী নামক

কায়স্থ গোষ্ঠীপতির কন্যার পরিণয় সম্পাদন ও তদুপলক্ষে বিস্তর ব্যয়ে ঘটক কুলিনের এক-ষাই করাতে সকলে তাঁহাকে গোষ্ঠীপতিত্বে বরণ করিয়া তদবধি সর্ব্বাগ্রে মাল্যচন্দন প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ কত বড় ধনবান হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার যদিও বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়টি সাধারণের মধ্যে সুপ্রাপ্য নহে। মেজর আডামস্ সাহেব একদা মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এমন সময়ে ইংরাজ শিবিরে গুলীর অনটন হইলে রাজা নবকৃষ্ণ সাহেবকে বলিলেন—"আমার সঙ্গে এত রৌপ্য মুদ্রা আছে যে সেগুলি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত গুলীর কার্য্য করিতে পারে।"

মেজর সাহেব নবকৃষ্ণের অভিমতে উক্ত মুদ্রারাশি বর্ষণ পূর্ব্বক সেদিনে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দপুরের দুর্গ নির্ম্মাণকালে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে দেবনাগর অক্ষরাঙ্কিত একখণ্ড তাম্রপত্র প্রকাশ পাইলে হেষ্টিংস সাহেব রাজা নবকৃষ্ণকে তাহার অর্থ উদ্ধার করিবার ভার অর্পন করিলেন। রাজার অনুমত্যানুসারে জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন তাহার অর্থ জ্ঞাপন করিলে জানা গেল, তাহা রাজা রামচন্দ্রের কৃত একখণ্ড দানপত্র। রাজা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে গভর্ণর জেনারেলের নিকট লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে ভট্টাচার্য্য ম্লেচ্ছের দান গ্রহণ আশঙ্কায় তাহাতে বিরত হইলেন। বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে কহিলে তিনিও উক্ত আপত্তি করিলেন। পরিশেষে রাধাকান্ত তর্কবাগীশ নামক জনৈক পণ্ডিত সম্মত হইয়া মহারাজার সহিত হেষ্টিংস সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্থ করিয়া দিলে সাহেব তাঁহাকে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী এক সহস্র বিঘা ভূমি পুরস্কার করিলেন।

এই সময়ে মহারাজা নবকৃষ্ণের খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা কি উল্লেখ করা যাইবে। পার্লামেণ্ট মহাসভায় হেষ্টিংস সাহেবের পরীক্ষাকালে লর্ড থর্লোসাহেব তাঁহার বিষয়ে এইরূপ উক্তি করেন—'নবকৃষ্ণ হেষ্টিংস সাহেবের পারস্য শিক্ষক ছিলেন। সে সময়ে তাঁহারা উভয়েই যৌবন প্রাপ্ত। নবকৃষ্ণের এক্ষণে যে অত্যুচ্চপদ, সম্মান ও অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি হইয়াছে, তাহা হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার সংযোগের উপরই নির্ভর করিতেছে; যেহেতু তদ্দারাই তিনি লর্ড ক্লাইভের নিকট পরিচিত হন এবং ক্লাইভের শাসনকাল পর্য্যন্ত মহম্মদ রেজা খাঁ ব্যতীত নবকৃষ্ণের তুল্য রাজকীয় পরাক্রম ও লাভসূচকপদ ধারণ বিষয়ে আর কেহই তাঁহার তুল্য ছিল না।"

এইরূপে মহারাজা নবকৃষ্ণ অতুলিত খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পত্তি ও সুখ সম্ভোগান্তর স্থাবর অস্থাবর বিপুল বিষয় স্বীয় উত্তরাধিগণের প্রতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইং ১৭৯৭ অব্দের ২২শে নভেম্বর তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণ স্বীয় পুত্ররত্নে চরিতার্থ না হওয়ায় নৈরাশ্য বশতঃ হিন্দুদায় মতে স্বীয় অগ্রজ রামসুন্দর ব্যবহর্তার পুত্র গোপীমোহনকে পোষ্যপুত্রত্বে গ্রহণ করেন কিন্তু পুত্র প্রতিগ্রহের পর তাঁহার এক ঔরস পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন—তাঁহারই নাম রাজা রাজকৃষ্ণ। রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বিষয় বিভাগ লইয়া উভয় ভ্রাতার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে তাহার নিষ্পত্তি হয়—তদনুসারে উভয় ভ্রাতা তুল্যাংশ প্রাপ্ত হন।

গোপীমোহনদেব কৌন্সিলের মেম্বর ইবস্ সাহেবের প্রথমতঃ দেওয়ান ছিলেন, তৎপরে

প্রধান সেনাপতি স্যর জেম্‌স্‌ রিবেট কার্ণক সাহেবের দেওয়ানী করিয়া পরিশেষে গভর্ণর জেনারেল স্যরজন্‌ ম্যাক্‌ফারসন্‌ সাহেবের দেওয়ান পদ ধারণ করেন। তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া প্রভুদিগের প্রিয় হইয়াছিলেন। উক্ত মহাশয় পারস্য বিদ্যায় বুৎপন্ন ছিলেন এবং সংস্কৃত ন্যায়াদি দার্শনিক শাস্ত্রে এরূপ কুশাগ্র প্রমিত সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরিতেন যে, সে সময়ের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকগণ যে সকল কঠিন কূট উপস্থিত করিতেন তিনি অনায়াসে সে সকলের মীমাংসা করিয়া দিতেন। ইউরোপীয় ভূগোল ও খগোল বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঐ দুইটি শাস্ত্রে তাঁহার কিরূপ পারদর্শিতা ছিল তাহা ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি স্বীয় অধীনস্থ কারীকরদিগের দ্বারা ভূমণ্ডল ও নক্ষত্র মণ্ডলের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক বর্ষ, মাস, দিন, বার, তিথি প্রভৃতি প্রদর্শনার্থ আর একটি যন্ত্রের সৃষ্টি করিতেছিলেন কিন্তু তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। গোপীমোহনও রাজা নবকৃষ্ণের ন্যায় গুণী জ্ঞানী ও গায়ক গায়িকা দিগের মধ্যে পুরস্কার বিতরণে কার্পণ্য করিতেন না। তাঁহার নিরপেক্ষতার এরূপ খ্যাতি ছিল যে, এ দেশীয় কোন ভদ্র পরিবারে অথবা অন্য কোন স্থলে কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ হইলে সকলে তাঁহাকেই মধ্যস্থ রূপে মান্য করিতেন। তাঁহার দান শৌণ্ডতা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। তাঁহার মুখশ্রী এমন গাম্ভীর্য্য ভাবাপন্ন ছিল যে নিরতিশয় দুর্দ্ধর্ষ পুরুষেরাও তাঁর নিকটে গমন করিলে সভয়ে অবস্থান করিতে বাধ্য হইত।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর তাঁহার কাছে সর্ব্বদাই অতি গুরুতর রাজকীয় বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধির তৈক্ষ্ণ্য এবং অনুভব শক্তির গভীরতা ও বহুদর্শীতা প্রভৃতি গুণ গরিমা দৃষ্টে বিশিষ্ট রূপে পরিতুষ্ট হইয়া ৭ পর্চা খেলয়ৎ ও অন্যান্য রাজপ্রসাদ সহ রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার শরীর রক্ষার্থ ৬ জন শস্ত্রধারী পুলিশের প্রতি আজ্ঞা অর্পিত হইয়াছিল। রাজা গোপীমোহন দেব ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমে বাং ১২৪৩ অব্দের ৩রা চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করেন।

রাজা গোপীমোহনের একমাত্র পুত্র রাধাকান্ত দেব। ইনি ১৭০৫ শকের ১লা চৈত্র দিবসে সিমুলিয়াতে স্বীয় মাতুল গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। এই মহাশয় অতি অল্প বয়সে বিদ্যানুসন্ধানে অসাধারণ পরিশ্রম ও উৎসাহ পরবশ গভর্ণমেণ্ট হাউসে প্রথম যেদিন গমন করেন সেই দিনই খেলয়ৎ প্রাপ্ত হন এবং ১৮৩৭ অব্দের ১০ই জুলাই দিবসে লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাদুর তাঁহাকে ৭ পর্চা খেলয়ৎ ও তদুপযুক্ত মাওরা ও সজ্জাসহকারে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সর্ব্বাগ্রে ইউরোপীয় নিয়মে বাঙ্গালা বর্ণমালা রচনা করেন ও পারস্য ভাষা হইতে উদ্যান বিদ্যা বিষয়ক এক গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি 'শব্দ কল্পদ্রুম' নামক প্রসিদ্ধ অভিধান। আরও এই মহাশয় গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়েল আসিয়াটিক সোসাইটি নামক অদ্বিতীয় বিজ্ঞানাদি বুৎপন্ন মহাশয় মণ্ডলীর মেম্বর ছিলেন। ইহা ব্যতীত হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে স্যর হাইড ঈষ্ট সাহেবের সহিত ইনি বিহিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার অপরাপর নিদর্শন এ স্থলে প্রদর্শন করা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার এতাধিক গুণ গৌরব হেতু কলিকাতায় প্রায় এমন কোন সদনুষ্ঠান নাই যাহাতে তিনি অধ্যক্ষতা বা সভাপতিত্ব পদ না পাইয়াছেন। নিম্নলিখিত তালিকায় তাঁহার কতিপয় পদের সমষ্টি দেওয়া হইল :—

হিন্দু কলেজ—ডিরেক্টর।
স্কুল সোসাইটি—মেম্বর ও সেক্রেটারী।
বঙ্গ ভাষানুবাদ সমাজ—মেম্বর।
কলিকাতা কৃষিসমাজ—সহকারী সভাপতি।
ভারত বর্ষীয় সভা—সভাপতি।
হিন্দু হিতৈষিনী সভা—সভাপতি।
স্কুল বুক সোসাইটি—মেম্বর।
আসিয়াটিক সোসাইটি—মেম্বর।
আসাম টি (চা) কোম্পানী—মেম্বর।
ভূম্যধিকারী সভা—সভাপতি।
হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ—সভাপতি।
ধর্ম্মসভা—সভাপতি।

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর অগ্নিপুরাণ সম্মত যামিনীর দ্বিপ্রহর হইতে পর যামিনীর দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ২৪ হোরায় দিবানিশা বিভাগের নিয়ম প্রকাশ করাতে গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়েল আসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে উক্ত সভায় অধ্যক্ষপদ ধারণার্থ এক স্বকৃতি পত্র প্রেরণ করেন।

শব্দ কল্পদ্রুম মহাভিধানের উৎপত্তি বিষয়ে রাজা বাহাদুর আমার প্রতি যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থানে এরূপ লিখিত আছে :—

"আমার তরুণাবস্থায় সংস্কৃত ভাষাধ্যায়ণ ও পুরাণ শ্রবণ কালে সুকঠিন শব্দ সমূহের অর্থাদি ঘটিত টিপ্পনী লিখিয়া লইয়া স্বকীয় ব্যবহারার্থ নিয়োগ করিতাম, অনন্তর মান্য সমুদয় কোষ হইতে শব্দ সংগ্রহ পূর্ব্বক একত্র করত অকারাদি ক্ষকারান্ত নিয়মে এক সংস্কৃতাভিধান প্রকাশ করণের ইচ্ছা হইল; পরে ক্রমে ক্রমে তাহা অতি বৃহৎ পরিমাণ হইয়া উঠিবাতে ১৭৪৩ শকে তাহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করি এবং তাহার অর্থাৎ সপ্তম খণ্ড ১৭৭৩ শকে প্রচারিত হয়—ইহার পরিশিষ্ট এইক্ষণে যন্ত্রস্থ রহিয়াছে—অতি শীঘ্র প্রকাশ পাইবেক। গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়েল আসিয়াটিক সোসাইট এই শব্দকল্পদ্রুমকে সংস্কৃত ভাষার অখিলাভিধান পদে বাচ্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশ করি তখন ইহাই বাসনা ছিল, স্বদেশীয় লোকের সচরাচর ব্যবহার্থ ইহা উপকারে আসিবেক; কিন্তু সম্প্রতি অদ্ভুত মানিতেছি যে, ভারতবর্ষের এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্ব প্রদেশ হইতে ইহার প্রশংসা লিপি আসিতেছে।"

ঠাকুর বংশ

এই বংশের আদি পুরুষ জগন্নাথ ঠাকুর যশোহর জিলার অন্তঃপাতি ··ইশবপুর নিবাসী সুধারাম নামক জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীর তনয়ার পানী পীড়ন করাতে কুল কলুষিত করিয়া "পিরালী" অপবাদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র পঞ্চানন ঠাকুর গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। অতএব কলিকাতার উন্নতি সময়ে ভিন্নস্থানীয় মনুষ্যেরা যে ঐ গ্রামে আসিয়াই অধিকাংশ বসতি করিতেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এক সময়ে গোবিন্দপুরই কলিকাতার প্রধান বাণিজ্য স্থল এবং সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে ইংরাজদিগের সহিত পঞ্চাননের আলাপ কুশল হইলে তাঁহারা তৎপুত্র জয়রামকে ২৪ পরগণার রাজস্ব আদায়ক আমীন পদে নিযুক্ত করেন। জয়রাম কোন ভূসম্পত্তি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। ঐ জয়রামের রাধাবল্লভ নামক জনৈক বংশধর গোপীমোহন ঠাকুর প্রভৃতির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে এক দায় উপস্থিত করেন। তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠে জানা গেল যে কলিকাতা আক্রমণকালে জয়রাম কিছু নগদ টাকা ব্যতিত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ টাকা দেবসেবায় অর্পণ করিয়া স্বীয় পুত্রদিগকে সেবায়েৎ পদে অভিষিক্ত করিয়া যান।

জয়রামের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ লোপ পাইয়াছে। মধ্যমপুত্রের নাম নীলমণি—ইনিই দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতামহ। তৃতীয় পুত্রের নাম দর্পনারায়ণ ঠাকুর। ইহার সাতপুত্র যথা—রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন, পেয়ারীমোহন, লাড্‌লীমোহন এবং মোহিনীমোহন। এই সপ্তভ্রাতা মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর মহা বিখ্যাত হন। ইহার সৌভাগ্যসম্পদ ও যশঃপ্রভাবে ঠাকুর বংশের গৌরব চন্দ্রিকা অতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। গোপীমোহনের ষড়তনয়ের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর গুণ গরিমায় সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষদিগের নিকটে যে সকল মহাশয়েরা সর্ব্বাগ্রে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করেন, তন্মধ্যে দর্পনারায়ণ ঠাকুরও গণ্য হন। সুবিখ্যাতা রাণী ভবানী রাজসাহী, দিনাজপুর, যশোহর এবং রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার অধিকাংশে অধিকার রাখিতেন। তাঁহার প্রাচীনত্ব ও অন্যান্য হেতু বশতঃ কার্য্য শৈথিল্যে বাকি খাজনার দায়ে ঐ সকল ভূসম্পত্তির কিছু কিছু অংশ বিক্রীত হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে উত্তর স্বরূপপুর পরগণা দর্পনারায়ণ ঠাকুর অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করেন। ইহার বাৎসরিক আয় ১০,০০০ টাকা মাত্র ছিল। ক্রমশঃ রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, যশোহর এবং অন্যান্য স্থানের ভূস্বামীদিগের অধিকার নীলাম হইতে থাকিলে গোপীমোহন ঠাকুর এবং তাঁহার সহোদরেরা প্রচুর মূল্য প্রদান পূর্ব্বক সে সকল ক্রয় করিয়া অতি প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ইয়া উঠেন।

অষ্টম অধ্যায়

কলিকাতার পুরাণ পল্লীনির্ণয়—ডিহি কলিকাতা—গোবিন্দপুর—সুতানুটি—বাজার কলিকাতা :—বাগবাজার, শোভাবাজার, চার্লস্‌বাজার, ধোপাপাড়া বাজার, শ্যামবাজার, নূতনবাজার, হাটখোলা, বড়তলা বাজার, হোঁগলকুড়িয়া, বড়বাজার, মেছোবাজার, ফৌজদারী বালাখানা, আর্ম্মানী বাজার, মুর্গীহাটা, সন্তোষবাজার, তেরেটি বাজার, লালবাজার, বৈঠকখানা, বাদা, শিয়ালদহ, বেনিয়াপুকুর, পাগলাডাঙ্গা, টেংরা, দোলণ্ডা, কালীঘাট, আলিপুর, বেলভিডিয়া, টালীর নালা—বিলাতীচক্র হাবড়া—শালিখা।

আমরা কলিকাতার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণপূর্ব্বক এক্ষণে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি পল্লীর বিষয়ে কিছু বলিতেছি। ইহা দ্বারা ইহাই দেখা যাইবে যে কলিকাতার অন্তঃপাতি অনেক স্থানের নাম নিতান্ত আধুনিক নহে। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার আগমনের অনেক পূর্ব্ব হইতে ঐ সকল নাম পুরুষ পরম্পরা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। হলওয়েল সাহেব গোবিন্দরাম মিত্রের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করেন, সেই সকল অভিযোগ ঘটিত কাগজপত্র পাঠে প্রাগুক্ত স্থানাদির সবিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ফলতঃ তাহাতে ১৭৩৮ অব্দ পর্য্যন্তেরই সংবাদ লব্ধ হয়—তৎপূর্ব্বের সমাচার প্রাপ্তব্য নহে।

ইংরাজেরা কলিকাতায় বসতিপূর্ব্বক তাহা চারি অংশে বিভক্ত করেন। যথা—ডিহি কলিকাতা, গোবিন্দপুর, সুতালুটি এবং বাজার কলিকাতা। এই সকল প্রত্যেক স্থানে এবং বড়বাজারে এক এক কাছারী ছিল কিন্তু ডিহি কলিকাতার কাছারীতেই সমুদয় কাছারীর হিসাব নিকাষাদি হইত। এই চারিখণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৪৭২৷৷৹ বিঘা জমি ছিল। কোম্পানী ৩্ টাকা হারে কর আদায় করিতেন। ইহা ব্যতীত দেবালয়, মসজিদ ও গীর্জ্জা প্রভৃতিতে ৭৩৩ বিঘা পর্য্যন্ত ভূমি ছিল—কোম্পানী তাহার কর গ্রহণ করিতেন না। আর নিম্নলিখিত কতিপয় পল্লী কলিকাতার সীমার মধ্যে থাকিলেও সেগুলির অধিকারীগণ করদান বিষয়ে কোম্পানীর অধীন ছিলেন না। তাহাদের বিবরণ :—

সিমলিয়া	...	...	১০০০ বিঘা
মলঙ্গা	...	...	৮০০ ”
মৃজাপুর	...	...	১০০০ ”
হোগলকুঁড়িয়া	...	...	২৫০ ”
		মোট—	৩০৫০ বিঘা

এই সকর নিষ্কর উভয় বিভাগে অনুমান ১৪,৭১৮ সংখ্যক বাটী ছিল। পূর্ব্বোক্ত মত বিভাগ হইবার তাৎপর্য্য, এই কোম্পানী যে ফার্ম্মান পান' তাহাতে এমন নির্দ্দেশ ছিল যে, তাঁহারা ভূম্যধিকারীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানাদি ক্রয় করিয়া লইবেন। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিতে হয় সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড নির্ণীত হইল। সে সকল ভূম্যধিকারী ভূমি বিক্রয়ে পরাঙ্মুখ থাকিলেন, তাঁহাদের অধিকার নিমিত্ত কোম্পানীকে কর দিতে হইত না।

ইং ১৭৩৮ অব্দ হইতে ১৭৫২ অব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর অধিকারে নিম্নলিখিত বাজার ও হট্ট সমূহে নিম্নলিখিত মত আয় উৎপন্ন হইয়াছিল :—

গোবিন্দপুরের গঞ্জ অথবা মণ্ডিবাজার	...	১৬৯,২২১ টাকা
হাট সুতানুটি ও শোভাবাজার	...	৬৫,০৩৭ ,,
বাগবাজারের হাট ও বাজার, চার্লস্-বাজার, শোভাপাড়াবাজার, হাটখোলাবাজার ও খড়্দাপোস্তা	...	১৩,২৭১ ,,
বড়বাজার—প্রথম অংশ	...	৩৩,০৯১ ,,
বড়বাজার—দ্বিতীয় অংশ	...	২০,৭৫৪ ,,
বড়বাজার—তৃতীয় অংশ	...	১৬,৭৩৭ ,,
গোবিন্দপুরেরবাজার, বেগমবাজার ও গোষ্ঠতলাবাজার	...	১৩,৪০৭ ,,
লালবাজার ও সন্তোষবাজার	...	২৭,৫২৩ ,,
সুতানুটির নিমক মহল	...	৩০,১০৪ ,,
ডিহি কলিকাতার বাজার	...	৯,১৫০ ,,
শ্যামবাজার ও নতুনবাজার	...	৩২,৯২০ ,,
জানবাজার ও বটতলা	...	১১,৯২১ ,,
		মোট—৪ ৬৫,৩১৬

উপরিলিখিত আয়ের সহিত এখনকার আয়ের তুলনা করিলে অদ্ভুত রসের সীমা থাকে না অথচ এই পরিবর্ত্তন ১৩০ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। কোম্পানি এই সকল হাট ও বাজারে সকল প্রকার দ্রব্যের উপর কর গ্রহণ করিতেন। তাহা ব্যতীত কাচ, হিঙ্গুল, কলাইকর, কানাপাত্তি, তামাক, গাঁজা, সিন্দুক, মসলা, চামর, কায়ের, আতসবাজি, গেরা প্রভৃতি নানাদ্রব্য ও বিষয়ের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ইজারা বিলি হইত—তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭৫২ অব্দে ৬৫,৯৯৯ টাকা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই ন্যায্য আয় ব্যতীত নিম্নলিখিত মত অনির্দ্দিষ্ট উপার্জ্জনে কোম্পানীর বিস্তর আয় হইত। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে তাহারা সেকালের জমীদারদিগের ন্যায় অন্যায় উপার্জ্জনের ত্রুটি করিতেন না।

অনির্দ্দিষ্ট উপার্জ্জনের তালিকা

(১) বস্ত্রের উপর মাশুল (২) জরিমানা (৩) এত্তেলাদারীর তংখা (৪) নৌকা ও স্লুপ বিক্রীর তংখা (৫) দাস বিক্রয়ের তংখা (৬) পাট্টাসেলামী (৭) সোলেনামার তংখা (৮) ঋণ আদায়ের তংখা (৯) ছাড় মাত্রের তংখা (১০) বংকী কওয়ালার তংখা (১১) বিবাহ সেলামী (১২) রসী সেলামী (১৩) সুলুম (১৪) মুহুরী আনা (১৫) সুরা রপ্তানীর মাশুল (১৬) উৎসব করণের সেলামী (১৭) বাদ্যকরণের সেলামী (১৮) তণ্ডুল রপ্তানীর মাশুল।

ইং ১৭৪৬ অব্দের জুনমাসে সিক্কা একটাকা বিঘাহারে খাজনা দিয়া নবদ্বীপাধিপতি প্রভৃতি ভূম্যধিকারী গণের নিকট ইংরাজেরা বেনীয়াপুকুর, পাগলাডেঙ্গা, টেঙ্গরা ও দোলণ্ডা এই কয়েক স্থান

বন্দোবস্ত করিয়া লন। ঐ কয়েক স্থান জানমগর মধ্যে নিবিষ্ট হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জনৈক গোমস্তা ঐ সকল স্থানের অন্তঃপাতী ৪২ বিঘা ভূমির জন্য কোম্পানীর কাছে বার্ষিক সেলামী চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। কিন্তু হলওয়েল সাহেব গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে লেখেন এরূপ সেলামী দিলে কোম্পানীর অপমানের পরিসীমা থাকিবে না—অতএব তাহা না দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা আর কমলার চঞ্চলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি আছে? যে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ভৃত্যগণ কোম্পানীর কাছে সেলামী প্রার্থনা করিত, সেই কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারিগণকে এক্ষণে কোম্পানীর ভৃত্য অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল প্রভৃতিকে সেলাম প্রদান কল্লেও অন্য লোকের উপাসনা করিতে হয়।

পাঠক মহাশয়েরা উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়া বিবেচনা করুন—এখন কলিকাতায় যেমন অনেক নূতন নূতন হাট ও বাজারাদি প্রস্তুত হইয়াছে—তেমনি কতকগুলি বাণিজ্য স্থান একেবারে বিলুপ্ত হইয়াও গিয়াছে! যথা:—বেগম বাজার, পোষ্টতলা বাজার ইত্যাদি! তবে আমরা যে সকল হাট বাজারের কথা লিখিলাম, সেগুলি প্রথম অবস্থায় অধিকাংশ জঙ্গল ও জলাময় ছিল। গঙ্গাতীরেই ভদ্রলোকেরা বাস করিতেন; তাহার প্রমাণ কলিকাতার বুনিয়াদী বড় মানুষ বলিয়া যাঁহাদিগকে গণ্য করা যায়, তাঁহাদের সকলেরই আদ্য নিবাস আজিও গঙ্গাতীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখন কলিকাতার মধ্যভাগে শেঠের বাগান, কলা বাগান, জোড়াবাগান, চোরবাগান প্রভৃতি যে সকল জনাকীর্ণ স্থান দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে সে সকল স্থান আধুনিক বেলগাছিয়া, উল্টাডিঙ্গি, গড়পার প্রভৃতি স্থানের ন্যায় উদ্যানময় পল্লী ছিল। সে সময় মেছুয়া বাজার অতি নিম্নভূমি ছিল। এখনও সমুদ্রের অপেক্ষা তাহার উচ্চতা ৮ ফিটের অধিক নহে। ফৌজদারী বালাখানা নামক প্রসিদ্ধ বাটীতে সে সময়ে হুগলীর মুসলমান শাসনকর্ত্তা বাস করিতেন।

আরমানীরা কলিকাতা সংস্থাপনের প্রারম্ভ হইতে এই নগরে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং আরমানীটোলা প্রাচীন স্থান মধ্যে গণনীয়। তাহাদিগের নাজিরথ নামক এক্ষণে যে গির্জ্জা রহিয়াছে, তাহা ১৭২৪ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহার পূর্ব্বে চীনাবাজারে তাহাদিগের একটি ক্ষুদ্র ধর্ম্মালয় ছিল। আরমানীরা প্রথম অবস্থায় ইংরাজদিগের গোমস্তাগিরি কার্য্য করিত।

আধুনিক ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরা এদেশে সর্ব্বাগ্রে আগমন করে। ইং ১৫৩০ অব্দে তাহারা গৌড়নগরীয় ভূপতির অধীনে সৈন্য পরিচালনাদি কার্য্য করিত। চার্ণক সাহেব কর্ত্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই তাহারা মুর্গীহাটায় আসিয়া বসতি করে। পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজদের এমন প্রাদুর্ভাব ছিল যে এদেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় মাত্রের সহিত কথোপকথনে পর্ত্তুগীজ ভাষা ব্যবহার করিতেন—সেজন্য ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও দীনেমার প্রভৃতি সকল জাতীয় সাহেবদিগকে ঐ ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। আজিও ইহার প্রমাণ স্বরূপ বাংলা ভাষায় অনেক পর্ত্তুগীজ শব্দ সংযোজিত হইয়া গিয়াছে, যথা:—জানালা, ইস্ত্রাবন, কেদারা, বারাণ্ডা, সিঁয়র, পাঁও ইত্যাদি। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় এক সময় যাহারা ধরা মধ্যে অতি ধন্যমান্য বিশেষতঃ এদেশে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁহাদের বংশধর, বংশধরীগণ অধুনা বাবুর্চ্চি ও আয়ার কাজ করিয়া উদর পোষণ করিতেছে।

ইং ১৭৮৮ অব্দে তিরেটা নামক একজন ফরাসী কর্ত্তৃক তিরেটা (তেরিটি) বাজারের সৃষ্টি হয়। ঐ সাহেব কোম্পানীর রাস্তা ও ইমারতের সুপ্রীমটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার সময়ে ঐ বাজার হইতে মাসিক ৩৮০০৲ টাকা আয় হইত। পরে তিরেটা সাহেব দেউলিয়া পড়িলে তাঁহার

উত্তমর্ণগণ ঐ মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ঐ বাজার লটারী দ্বারা বিক্রয় করেন। হেরেটি বাজারের অনতিধারে ওয়েষ্টন নামক একজন উদ্যমী, দাতা, সদাশয় সাহেবের বসতবাটী ছিল। তিনি প্রতিমাসে কলিকাতা নগরীর দুঃখী লোকদিগকে স্বহস্তে ১৬০০৲ টাকা দান করিতেন।

লালবাজার হইতে লালগীর্জ্জায় গমনীয় যে বর্ত্ম এখন মিশন রো নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে রোপওয়াক্ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইং ১৭৬৮ অব্দে উক্ত গীর্জ্জা কির্লাণ্ডার সাহেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গীর্জ্জা অপেক্ষা ইংরাজদিগের আর কোন গীর্জ্জা পুরাতন নহে—এজন্য সাহেবরা তাহাকে পুরাতন গীর্জ্জা বলেন। ঐ গীর্জ্জার পূর্ব্বে পুরাতন দুর্গ মধ্যে যে গীর্জ্জা ছিল তাহা মুসলমানেরা ভঙ্গ পূর্ব্বক এক মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কির্লাণ্ডার সাহেব অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া লালগীর্জ্জা নির্ম্মাণ করান। সেই ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত তিনি স্বীয় বনিতার অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়াছিলেন।

ইংরাজী গত শতাব্দীতে লালদিঘি নগরের মধ্যস্থল বর্ত্তিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল ইহাতেই তখনকার নগরের পরিসর কেমন ছিল, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই লালদিঘি খননের দিন নির্ণয় হয় না। কোন প্রাচীন গ্রন্থকার ১৭০২ অব্দে লেখেন যে, কলিকাতার গভর্ণর সাহেবের ফলমূল সঞ্চয়ার্থ একটি উদ্যান ও মৎস্য যোগাইবার নিমিত্ত কয়েকটি পুষ্করিণী আছে। বোধহয় লালদিঘি তন্মধ্যে কোন এক পুষ্করিণী হইতে পারে, কারণ প্রাচীন লেখকেরা তাহাকে "মৎস্য পুষ্করিণী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইং ১৭৮৭ অব্দে পাতরিয়া গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গীর্জ্জা নির্ম্মাণের নিমিত্ত রাজা নবকৃষ্ণ ভূমি ব্যতীত ত্রিশসহস্র টাকা দান করেন। বঙ্গদেশস্থ গৌড়নগর হইতে চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব মার্ব্বল ও অন্যান্য প্রকার মূল্যবান দ্রব্য আনাইয়া উক্ত ধর্ম্মাগারের শোভাবৃদ্ধি করেন। এই গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক সাহেবের সমাধি রহিয়াছে।

নূতন গভর্ণমেণ্ট হাউস নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এখন যে স্থলে ট্রেজরি রহিয়াছে, সেই স্থানেই পুরাতন গভর্ণমেণ্ট হাউস ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব উক্ত ক্ষুদ্র গৃহে অধিবাস করিতেন কিন্তু তাঁহার পত্নী হেষ্টিংস ষ্ট্রিট নামক বর্ত্ম পার্শ্ববর্ত্তী যে বাটীতে অধুনা বার্ণ কোম্পানীর অফিস রহিয়াছে সেই বাটীতে অবস্থান করিতেন। বর্ত্তমান ট্রেজরি বাটী স্যর টম, ই বুট সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

ইং ১৭৯২ অব্দে টাউন হল নির্ম্মাণারম্ভ হয়। উহা নির্ম্মাণ কল্পে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্যর উইলিয়ম জোন্স মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত অট্টালিকার নিমিত্ত ইউরোপীয় ও এদেশীয় ধনীগণ অর্থদান করেন। টাউন হলের পূর্ব্বে ঐ স্থানে যে বাটী ছিল সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হাইড সাহেব ১২০০৲ টাকা মাসিক ভাড়া দিয়া তাহাতে বাস করিতেন।

সত্তর বৎসরাধিক হইল কসাইটোলা, খিদিরপুর প্রভৃতি শাখা নগরের ন্যায় গণনীয় ছিল। একশত বৎসর হইল তাহা জঙ্গলময় হওয়ায় সেখানে অতি অল্প লোক বাস করিত। ১৭৮০ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ষাকালে সেখানকার পথ ঘোরতর পঙ্কিল হইবার নিমিত্ত লোকের গমনাগমন রহিত হইত।

অধুনা যে বাটীতে পুলিশ রহিয়াছে ঐ বাটীতে বণিকরাজ জন্ পামার সাহেব বাস করিতেন। ইঁহার পিতা হেষ্টিংস সাহেবের সেক্রেটারী ছিলেন। জন্ পামার সাহেব অতিশয়

দানশীল ও উদার স্বভাব হওয়ায় তাঁহার "বণিকরাজ" উপাধি বিখ্যাত হয়। ইনি ১৮৩ অব্দে লোকান্তরিত হন। ইঁহার অনুগ্রহেই শ্রীরামপুর নিবাসী রঘুগোস্বামী ধনবান হইয়া উঠেন। পামার সাহেবের বাটীর অন্য পার্শ্বেই পূর্ব্বে কলিকাতার কারাগার ছিল। ইং ১৮০০ অব্দে ব্রজমোহন দত্ত নামক এক ব্যক্তি একটা ওয়াচ ঘটিকা অপহরণ অপরাধে ফাঁসীদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

ধর্ম্মতলার পূর্ব্বনাম এভেন্যু অর্থাৎ বারাসৎ, কারণ তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণী ছিল। ধর্ম্মতলা নাম হইবার কারণ এই যে হেষ্টিংস সাহেবের জমাদার জাফের নামক এক মুসলমান, যেখানে এখন কুকের আড়গড়া (১) রহিয়াছে সেখানে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করে। পরে সেই স্থানে বর্ষে বর্ষে কার্ব্বালার সময় সহস্র সহস্র মুসলমান একত্র হইতে থাকিলে ধর্ম্মতলা নাম হয়। এই ধর্ম্মতলার উত্তর পার্শ্বে এক খাল ছিল, তাহা চাঁদপাল ঘাটের নীচে গঙ্গার সহিত সংযুক্ত থাকাতে উত্তরকালে নগর পরিষ্কার-রক্ষণের বিশিষ্ট উপায় ছিল। কর্ণেল ফর্‌বস্ সাহেব লেখেন যে ঐ খালের পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহাতে স্বচ্ছন্দে বড বড় মহাজনী নৌকা গমনাগমন করিতে পারিত। এই খাল থাকাতেই মধ্যে মধ্যে বাদামিয়া দিবির ধস্ নামিয়া থাকে।

ইং ১৭৯৩ অব্দে পাদ্রী জন্ ওরেন সাহেবের উদ্যোগে নেটিভ হাঁসপাতাল নামক এদেশীয় লোকের চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয়। ইহাতে দেশ-বিদেশবাসী বহুলোক প্রচুর দান করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ, চীৎপুরের নবাব ও ঠাকুর গোষ্ঠি বিশিষ্টরূপ অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহা চীৎপুর রোডের ধারেই ছিল—তদনন্তর ইং ১৭৯৮ অব্দে কার্য্য-নির্ব্বাহকগণ ধর্ম্মতলার ভূমি ক্রয় পূর্ব্বক বর্ত্তমান বাটী নির্ম্মাণ করেন।

কলিকাতা নগরের শোভা প্রতিভার গর্ব্বস্থল চৌরঙ্গী দর্শনে সদ্য আগত বিদেশীয় লোকেরা চমৎকৃত হন, কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে এই চৌরঙ্গী ভয়ানক হিংস্র পশ্বাদির বসতিস্থলী ছিল। এই ক্ষণে এই নগরে এক বর্ষিয়সী বিবি বর্ত্তমানা আছেন যিনি চৌরঙ্গীতে দুইটি মাত্র বাটী দেখিয়া ছিলেন। তাহার একখানি বাটীতে স্যর ইলাইজা ইম্পি সাহেব বাস করিতেন। ঐ বাটীতে এখন ক্যাথোলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী কৌমার ব্রত ধারিণীগণ অবস্থান করিতেছেন। যে স্থানে ইহাদিগের ভজনালয় রহিয়াছে, ঐখানে পূর্ব্বে গোলতালাও নামে এক পুষ্করিণী ছিল। ইম্পি সাহেবের পার্ক অর্থাৎ মৃগালয় মিডিলটন ষ্ট্রিট হইতে আরম্ভ হইয়া পার্কষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ও তন্মধ্যবর্ত্তী পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী সুশোভিত ছিল। সেকালে চৌরঙ্গীতে দস্যুভয় প্রযুক্ত ইম্পি সাহেবের বাটী সিপাহীর প্রহরায় থাকিত। চৌরঙ্গীর দ্বিতীয় বাটীতে এক্ষণে সেণ্টপল্‌স নামক বিদ্যালয় সংস্থাপিত রহিয়াছে।

উডষ্ট্রীট নামক বর্ত্মপার্শ্বে পূর্ব্বে যে বাটীতে চক্ষুর চিকিৎসালয় ছিল, ঐ বাটীতে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট বাস করিতেন। ইঁহাকে সকলে "হিন্দু ষ্টুয়াট" কহিতেন, কারণ তিনি ভেদজ্ঞানী ছিলেন না। খৃষ্ট এবং কৃষ্ণকে সমতুল্য জ্ঞানে তিনি আরাধনা করিতেন।

হালসীর বাগানে উমাইচাঁদ নামক প্রসিদ্ধ ধনকুবের বাস করিতেন। অন্যূন ৪০ বৎসরাধিক এই ব্যক্তি কোম্পানীর সহিত বাণিজ্য করিয়া বিপুল বিভবের অধীশ্বর হইয়া ভূপালবৎ মহা আড়ম্বরে কালযাপন করিতেন। কলিকাতার প্রথম অবস্থায় তিনি তদ্রত্য অধিকাংশ বাটী ও ভূমির অধিকারী ছিলেন। ক্লাইভ সাহেব পলাশীর যুদ্ধে তাঁহাকে ত্রিশলক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ তাহাতে চাতুরী করায় উমাইচাঁদ ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

বৈঠকখানা নাম হইবার তাৎপর্য্য এই যে মহারাট্টারা গঙ্গার পশ্চিম পারে মহা অত্যাচার করাতে পূর্ব্বে পূর্ব্বাঞ্চল হইয়া বাণিজ্য কার্য্য চলিত সুতরাং বৈঠকখানাই উত্তর ও পশ্চিম দেশে যাইবার সিংহদ্বার স্বরূপ ছিল। ঐ স্থানে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে ব্যবসায়ীগণ সমবেত হইয়া যাত্রা করিতেন, তজ্জন্য বৈঠকখানা নাম হইয়াছে—ঐ বৃক্ষ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। বৈঠকখানায় পূর্ব্বে ৭০ পাদ উচ্চ এক রথ ছিল।

শিয়ালদহে পূর্ব্বে ধান্য জন্মিত! একশত বৎসর হইল উক্ত অঞ্চলের বর্ত্ম একটা জাঙ্গাল ছিল। এইখানে নবাবী সেনার সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ইং ১৭৮১ অব্দে হেষ্টিংস সাহেব মুসলমানদিগের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত পুরাতন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন—১৮২৪ অব্দে সেখান হইতে কলিঙ্গাস্থ নূতন অট্টালিকাতে তাহা স্থাপিত হয়। কোন বিজ্ঞ লেখক কহেন, যদিও মুসলমান বিদ্যাশিক্ষার স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া শোভনতম সৌধমধ্যে তাহা সংস্থাপিত হউক কিন্তু মুসলমানদিগের চরিত্র বিষয়ের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। শিয়ালদহ হইতে নূতন খাল আরম্ভ হয়। এই খালের ১৮২৪ অব্দে সূত্রপাত হইয়া ১৮৩৪ অব্দে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে! ইহাতে যদিও ১,৪৪৩,৪৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল কিন্তু শুল্ক যোগে তাহা পরিশোধ হইয়া এক্ষণে বিলক্ষণ লভ্যের কারণ হইয়াছে!

নগরের পূর্ব্বাংশে যে বাদা রহিয়াছে পূর্ব্বে তাহার গভীরতা ও পরিসর বাহুল্যরূপ ছিল। ১৭৪০ অব্দের বর্ষাকালে তাহা একাকার প্লাবিত হয়। পূর্ব্বে তাড়দহ ইহার তীরবর্ত্তী ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহা বাদা হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। এখন বাদার গভীরতা স্থানে স্থানে ২॥০ পাদের অধিক নহে এবং বোধ হয় তাহা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া আসিতেছে!

সদর দেওয়ানী আদালত গৃহের পূর্ব্বদিকবর্ত্তী জেনারেল হাঁসপাতাল নামক চিকিৎসালয় অতি পুরাতন অট্টালিকা! ইহা পূর্ব্বে কোন সাহেবের উদ্যান বাটী ছিল। ইং ১৭৬৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট ক্রয় করিয়া চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন।

বুড়িগঙ্গার পূর্ব্ব নাম গোবিন্দপুরের খাল। কারণ ঐ খাল গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমা ছিল! তৎপরে ইহা সামনের খাল নামে খ্যাত হয়। অনন্তর ১৭৭৫ অব্দে কর্ণেল টালী সাহেব স্বীয় ব্যয়ে ঐ খালের পঙ্কোদ্ধার ও স্থানে স্থানে পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় তাহার নাম টালীর নালা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১২ বৎসরের শুল্ক গ্রহণের অনুমতি দেন, তাহাতে খাল প্রস্তুত হইবার পরেই মাসিক ৪৩০০ টাকা আয় হইয়াছিল। কর্ণেল টালী সাহেব খালের কার্য্য সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই পরলোক গমন করেন। টালী সাহেবের অধীনে জগন্নাথ সরকার নামক একজন চণ্ডাল খাল খনন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন পূর্ব্বক খিদিরপুরে প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রস্তুত পূর্ব্বক মহা ধুমধামে কাল যাপন করিত। উক্ত চণ্ডাল দেওয়ান ঘোষালের জুতা ফিরাইয়া দিবার ভৃত্য ছিল। যাহা হউক কর্ণেল টালীর নামেই টালীগঞ্জ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রায় ৬৫ বৎসর গত হইল এই খালের ধারে বড়িশাবাসী সাবর্ণদিগের দ্বারা কালীঘাটের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (২)

আলীপুরের দক্ষিণে বেলভিডিয়র নামক মনোহর অট্টালিকাতে এখন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের আবাস হইলেও পূর্ব্বে ঐ বাটীই গবর্ণর জেনারেলদিগের আরাম গৃহ ছিল। ১৭৬৮ অব্দের অনেক পূর্ব্বে ঐ বাটী বর্ত্তমান ছিল এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। হেষ্টিংস সাহেব এই প্রাসাদে অবস্থান করিতেন এবং মহা ঘটায় নিকটস্থ জঙ্গলাদিতে প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্র

বরাহ প্রভৃতি বন্যজন্তু সংহার করিতেন। উক্ত পুলের উত্তরে ঘোড় দৌড়ের মাঠের মধ্যস্থলে হেষ্টিংস সাহেব স্বীয় প্রতিযোগী ফ্রান্সিস সাহেবের সহিত পিস্তল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে দুটি বটবৃক্ষ ছিল তন্মধ্যে একটি বৃক্ষের কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। সাহেবেরা ঐ বৃক্ষদ্বয়কে "হত্যাবৃক্ষ" নামে অভিহিত করিতেন।

ইং ১৭৮৩ অব্দে মেজর কিল প্যাট্রিক হাবড়াতে মিলিটারি অরফ্যান্ স্কুল স্থাপন করেন। তারপর সেই স্কুল ১৭৯০ অব্দে খিদিরপুরে স্থানান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান প্রকাণ্ড অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় (৩)। পূর্ব্বে এই দেশের গ্রীষ্মের আতিশয্য ভয়ে বিলাত হইতে বিবি লোকেরা অতি অল্প আসিতেন—সুতরাং দয়িতাভিলাষ পূরণের নিমিত্ত উক্ত বিদ্যালয় বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছিল। কারণ সেখানকার বালিকাগণ সুশিক্ষিতা হইলে পর বরের অভাব থাকিত না। সাহেবেরা দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া খিদিরপুরের বিদুষী মণ্ডলী মধ্যে মনোমত সঙ্গিনী নির্ব্বাচন পূর্ব্বক পাণী পীড়ন করিতেন। এজন্য তথায় মধ্যে মধ্যে রজনী যোগে নৃত্য ও ভোজনাদির মহতী সভা হইত।

ইং ১৮০৮ অব্দে কর্ণেল কীড সাহেবের এদেশীয় স্ত্রীজাত দুই পুত্র…ও জর্জ টমাস সাহেব কর্ত্তৃক খিদিরপুর ডক ইয়ার্ড স্থাপিত হয় (৪)। ঐ ভূমি তাঁহারা দেওয়ান গোকুল ঘোষালের পত্নী রাজেশ্বরী দেবীর কাছে পাট্টা করিয়া লন। কোন মহাশয় লিখিয়াছেন—কর্ণেল কীড হইতে খিদিরপুর নাম হইয়াছে কিন্তু এ কথা অতি ভ্রমমূলক। কর্ণেল কীডের অনেক পূর্ব্বে খিদিরপুর নাম প্রচলিত ছিল তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা খেজর নামে পীর হইতে এই স্থানের নাম আজিও খেজরপুর কহিয়া থাকে। কর্ণেল কীডের পুত্রেরা অতি অল্পকাল ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

এই ডক ইয়ার্ডের অব্যবহিত পরেই মুচিখোলা প্রবেশে যে উদ্যান বাটী আছে (৫) তাহাতে সার্মান সাহেব বাস করিতেন। ইনি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে কোম্পানীর কারণ শেষ ফার্ম্মান আনিতে গিয়াছিলেন। খিদিরপুরের পুলের পূর্ব্ব নাম সার্মান সাহেবের নামে খ্যাত ছিল।

মুচিখোলার পরপারেই কোম্পানী বাগান—এই বাগানের আদি প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল কীড সাহেব (৬)। তাহার স্মরণার্থ উদ্যানের মধ্যস্থলে সুচারু সমাধি গৃহ আছে। উদ্যানের কিছু পূর্ব্বদিকে বিশপস্ কলেজ নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়। এই কলেজের তুল্য বিদ্যাভ্যাসের উপযুক্ত রম্যস্থান ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। কোম্পানীর উদ্যানের অধ্যক্ষ সাহেবের বাটীর কিছু দক্ষিণে তানা নামক এক নবাবী দুর্গ ছিল। ইং ১৬৮৬ অব্দে সেই দুর্গের সৈন্যরা ইংরাজদিগের ৬০ তোপ বাহিনী এক তরণী প্রবেশে প্রতিবেধ উপস্থিত করিয়াছিল। (Calcutta Review NO. VIII—476—484 P. P)

ইং ১৭০০ অব্দে হাবড়াতে আরমানীদিগের বহুসংখ্যক বাটী ও উদ্যান ছিল। বহুকাল অবধি শালিখা জনাকীর্ণ স্থান মধ্যে গণনীয় আছে। ঐ স্থানে কাশীর পথ সমাপ্ত হওয়ায় বহুলোকের সমাগম হয়। ইং ১৮৫৫ অব্দে শালিখায় অন্যূন ৭৩৪৪৩ জন লোকের বসতি ছিল (৭)

মন্তব্য

(১) ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে "বুকের আড়গড়া" বলিয়া এখানে একটি বাটীর কথা রঙ্গলাল উল্লেখ করিতেছেন। বর্ত্তমানে (১৯৫৮ খৃঃ অঃ) "বুকের আড়গড়া" নাই। "আড়গড়া" বলিতে "বৃহদাকার আস্তাবল" নির্দ্দেশ করে। 'বুক্' কোম্পানী নামে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ১৫৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের ধারে প্রকাণ্ড এক আস্তাবল নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি

দেশ হইতে বন্য ঘোড়া আনিয়া রাখিত এবং ঘোড়াগুলিকে সায়েস্তা করিয়া এদেশে বিক্রয় করিত। ভারতে মোটর যানের প্রচলন বাড়িতে আরম্ভ করিলে কুক কোম্পানীর ব্যবসায়ে মন্দা পড়িতে থাকে এবং পরিশেষে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি কালে এই কোম্পানী ব্যবসা গুটাইয়া চলিয়া যায়। কুক কোম্পানী উঠিয়া গেলে আস্তাবলগুলির বহুপ্রকার সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়া সেখানে "কমলালয় ষ্টোরস্" নামে একটি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির সম্ভ্রান্ত ধরণের বিপনি প্রবর্ত্তিত করেন।

(২) এখানে রঙ্গলাল কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির নিম্মাণের কথা উল্লেখ করিতেছেন। কালীঘাটের এই পীঠস্থান বহু প্রাচীন হইলেও ৺কালীমাতার প্রচার মাত্র কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। ইংরাজগণের এদেশে আগমনের বহুপূর্ব্বেই কালীঘাট তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কালীঘাটের ৺কালীমূর্ত্তি প্রকৃতপক্ষে একখানি পাথর। এই পাথরখানি জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়াছিল। স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া জনৈক সন্ন্যাসী এই মূর্ত্তির রক্ষণ ও পূজার ভার গ্রহণ করেন। এইরূপে বহুকাল গত হইবার পর অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে (আনুমানিক ১৭৮৫ খৃঃ হইতে ১৭৯০ খৃঃ মধ্যে) মূর্ত্তিটিকে বর্ত্তমান স্থানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়গণের ব্যয়ে দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। তাঁদের কালীঘাট নিবাসী পুরোহিত হালদার বংশীয়গণের উপর ৺দেবীর সেবার ভার অর্পিত হয়। নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে দেবীর শিলার একটি মুখ খোদিত হয় এবং ভূকৈলাশের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল উক্ত দেবীর দুইটি স্বর্ণময় চক্ষু এবং চারিখানি রৌপ্যময় হস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মূর্ত্তিটির নিম্নদেশ এখনও গঠন করা হয় নাই।

(৩) রঙ্গলাল লিখিতেছেন যে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে "মিলিটারী অরফ্যান্স স্কুল"টি হাবড়া হইতে খিদিরপুরে স্থানান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান প্রকাণ্ড অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তিনি উক্ত বাটী খানির কোন অবস্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। যাহা হউক যে বাটীতে বিদ্যালয়টি উঠিয়া আসিয়াছিল সেই বাটীখানির নাম—খিদিরপুর হাউস এবং তাহার ঠিকানা ৪নং ডায়মণ্ড হারবার রোড। বর্ত্তমানে স্থানটি কলিকাতা কর্পোরেশনের ধার্য্য মত আলীপুরের সীমানা মধ্যে অবস্থিত।

(৪) রঙ্গলাল লিখিতেছেন যে, কর্ণেল কীডের এদেশীয় স্ত্রীজাত দুই পুত্র কর্তৃক খিদিরপুর ডক ইয়ার্ড স্থাপিত হয়। কিন্তু তিনি এই কীড বংশীয়গণের সম্পূর্ণ নামোল্লেখ করেন নাই। এই পংক্তিটি এরূপ ভাবে লিখিত হইলে সম্পূর্ণ হইত যথা:—ইং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল রবার্ট কীড সাহেবের এদেশীয় স্ত্রীজাত দুই পুত্র জেমস্ কীড ও জর্জ্জ টমাস সাহেব কর্তৃক খিদিরপুর ডক ইয়ার্ড স্থাপিত হয়।

(৫) রঙ্গলাল এখানে সার্মন সাহেবের উদ্যান বেষ্টিত বাটীর উল্লেখ করিতেছেন। রঙ্গলাল যে সময় গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন তখন উক্ত পুরাতন বাটীখানি বিদ্যমান ছিল কিন্তু ১৮৮৩।৮৪ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুর ডক সম্প্রসারিত হইলে বাটীখানি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। উত্তরকালে স্থানটিতে (৯নং গার্ডেনরীচ রোড) হুগলী জুট মিলস্ নামে একটি চটকল স্থাপিত হয়।

(৬) রঙ্গলাল এখানে মুচিখোলার পরপারে অবস্থিত কোম্পানীর বাগানের বিবরণ দিতেছেন। এই বাগানটির সম্পূর্ণ নাম হইতেছে—"শিবপুর রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন"। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল রবার্ট কীড এই উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করেন।

(৭) যদিও এই স্থানেই গ্রন্থ শেষ করা গেল কিন্তু যে ছিন্ন ও জীর্ণ পাণ্ডুলিপি সংগৃহিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থ সমাপ্তির কথা রঙ্গলাল লিখেন নাই। কাজেই এই অধ্যায়টি অথবা "কলিকাতা কল্পলতা" গ্রন্থটি যে বাস্তবিক সমাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

বঙ্গবিদ্যার আদ্য বিবরণ

বাঙ্গালাদেশের পুরাবৃত্ত যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি এবং উন্নতির কাল প্রভৃতিও সেইরূপ অনির্ণেয়। বাঙ্গালাদেশ যে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ী পালদিগের এবং তৎপরে আদিশূর তথা সেনবংশীয় ভূপতিগণের শাসনাধীন ছিল, সেকালে বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি এবং প্রচলন ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সেই সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে যে সকল গ্রন্থাদি বিরচিত হইয়াছিল—সে সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। জনপ্রবাদে বল্লাল সেন ও তৎপুত্রবধূ রচিত যে কবিতাময়ী লিপির উল্লেখ আছে—তাহাও সংস্কৃত। সেই তিমিরাবৃত সময়ের অঙ্কিত তাম্রপট্ট প্রভৃতি যে কিছু পুরাবৃত্ত সন্ধানের দীপস্বরূপ উপযোগে আসে, সে সকলের লিপিও সংস্কৃত। কিন্তু বাঙ্গালাভাষা যে নিতান্ত আধুনিক এমনও বোধ হয় না। ভারতবর্ষে যবন অধিকারের পূর্ব্বে নানা প্রদেশে নানা প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। যবনাধিকার কালে সরস্বত কাণ্যকুব্জাদি প্রদেশে হিন্দীভাষা প্রচলিত ছিল—ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পৃথ্বীরাজের সভাতে চাঁদকবি বর্ত্তমান থাকিয়া উক্ত ভাষাতেই রোমান, রাস্থ প্রভৃতি মনোহর কাব্য রচনা করেন। কিন্তু হিন্দী সংস্কৃত ধাতুময়ী, তাহাতে অপর অপভাষার সংস্রব নাই, আর বাঙ্গালাদেশে যখন কাণ্যকুব্জ দেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়া বসতি করেন, তখন হিন্দীই তাঁহাদের ভাষা ছিল। বাঙ্গালাদেশে সে সময়ে ধাঙ্গড়, মগ এবং আর আর অপভাষা মিশ্রিত এক প্রকার প্রাকৃতেরই চলন ছিল—বোধ হয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনাবধি তাহা ক্রমশঃ সংস্কৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা অক্ষরে যখন প্রথমতঃ গ্রন্থ গীতাদি বিরচিত হইতে থাকে—সে সময়ের বাঙ্গালা একজাতীয় হিন্দী বিশেষ—ইহা বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলীতেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তির উল্লেখে বাঙ্গালাদেশের আদি অবস্থার বিষয়েও কিছু লেখা প্রয়োজন। সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম এবং ঢাকার প্রাচীনত্ব বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। রেণেল সাহেব লেখেন, বাঙ্গালা বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। তমলুক ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান স্থান। ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন হিয়ানশাং নামক চীন ভ্রমণকারী এদেশে আগমন করেন, তখন তমলুক সমুদ্রকূলবর্ত্তী এক প্রকৃষ্ট বাণিজ্যস্থান ছিল আর সেখানে সহস্র সংখ্যক বৌদ্ধযতি তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাজন করিতেন। জম্বু দ্বীপেশ্বর অশোক ভূপতি তমলুক হইতে সমুদ্র যান যোগে সিংহল দ্বীপাধিপের নিকট দূত প্রেরণ করেন। গঙ্গাসাগরে অধুনা যে কপিল মুনির পুরাতন মন্দির দৃষ্ট হয়, তাহা ৪৩০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতএব রামকমল সেন কৃত ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধানের ভূমিকায় বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণাংশ গত ৩০০ বৎসরের মধ্যে সিন্ধুচরে পরিণত হইবার যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত আছে, তাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। অন্য অঞ্চলের কথা দূরে থাকুক, সুন্দরবন যে সময়ে বসতি পূর্ণ ছিল, সে সময়ে ইংলণ্ডেও সম্পূর্ণ সভ্যতার উদয় হয় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশের মানচিত্র প্রস্তুত হয়; সেই মানচিত্রে সুন্দরবনের স্থলে সাগর তটে পঞ্চ সংখ্যক নগরের চিহ্ন অঙ্কিত আছে। পর্ত্তুগালীয় দস্যুদিগের দৌরাত্ম্যে, জলপ্লাবনে এবং ভূমিকম্পাদি নৈসর্গিক উৎপাতে সুন্দরবনের

বর্ত্তমান অস্থন্দরাবস্থা হইয়াছে! বাঙ্গালাদেশ যে নিতান্ত আধুনিক নহে, ইহার বিশিষ্ট প্রমান রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। ত্রিবেণী, কালীঘাট, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি স্থান ভগিরথাদির সময়ে বর্ত্তমান ছিল। 'বৃহৎকথা'য় এক আখ্যায়িকার স্থান তমলুকে বলিয়া বর্ণিত আছে। রঘুবংশেও বাঙ্গালাদেশের নামোল্লেখ আছে। বাঙ্গালাদেশ যে অন্যুন ২৫০০ বৎসরাধিক সভ্যতার ভূমি ছিল—এমন সিদ্ধান্তে সংশয় আরোপ করিবার কারণ দেখা যায় না।

আমরা প্রস্তাব আরম্ভেই এই সংশয়বাদ লিখিয়াছি যে, গৌড় যে কালে বাঙ্গালাদেশের রাজধানী ছিল, সেকালে বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত ভাষা কি ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনেক বিবেচনা করেন পূর্ব্বে একটা বাঙ্গালা ভাষা ছিল, সেটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সে ভাষার কোন কোন শব্দ এখনকার চলিত বাঙ্গালার মধ্যে পাওয়া যায়, যথা:—উলটা, এমন, এখান, চাল, চাঁচরী, ধামা, পেট, সোজা ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল শব্দ যে কোল ভীল, ধাঙ্গড় প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় আদিম জাতিদিগের ভাষার অন্তর্গত, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

বাঙ্গালা অক্ষরমালা মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগিনী হওয়ার অর্থাৎ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় ৪০ খানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ ছিল। তন্মধ্যে প্রধান এই কয়খানি—

(১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্য চরিতামৃত—অন্যূন ৩৫১ বৎসরাধিক তাহা প্রস্তুত হইয়াছে। (২) ক্ষেমানন্দ প্রণীত মনসা মঙ্গল। (৩) লাউসেন রাজাক্রমত ধর্ম্মগান। (৪) কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ। (৫) কাশীদাসের মহাভারত। (৬) শুভঙ্করের শ্লোকাংশ। (৭) গুরুদক্ষিণা। (৮) কবিকঙ্কন চণ্ডী। (৯) ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল।

এই বিষয়ের কোন সুবিজ্ঞ প্রবন্ধরচক বঙ্গবিদ্যার অবস্থাকে চারিঅংশে বিভক্ত করিয়াছেন:

প্রথম বিভাগ—১৫০০ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য শিষ্যদিগের বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ বিরচন; দ্বিতীয় বিভাগ—১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপাধিপতির সভাসদ্ ভারতচন্দ্র কর্তৃক অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন। তৃতীয় বিভাগ—ডক্তর কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুরীয় মিশনারীদিগের দ্বারা নানা গ্রন্থ প্রস্তুত হওয়া। চতুর্থ বিভাগ—রামমোহন রায় কর্ত্তৃক নানা বিষয়ে নানা পুস্তক ও তদনন্তর তত্ত্বোধিনীর সৃষ্টি।

সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকল দেশে প্রচলিত ভাষার উন্নতি কল্পে অভিনব মত স্থাপকদিগের যত্নই প্রধান, যেহেতু তাহার অভাবে সাময়িক লোকদিগের নিকট তাঁহাদের মতের প্রচার এবং নিজ নিজ গৌরব জ্ঞাপনের উপায় নাই। চৈতন্য শিষ্যেরা বাঙ্গালা ভাষাতে গ্রন্থ নিচয় রচনা না করিয়া যদি কেবল সংস্কৃতে সেগুলিবিরচিত করিতেন তবে বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে চৈতন্য মতের বৈষ্ণব সংখ্যা এত বাহুল্য হইত না। অন্যদিকে মিশনারি এবং রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা রচনার প্রতি সম্যাক প্রয়াস-প্রযত্নও উক্ত সিদ্ধান্তের আর একটি দৃষ্টান্ত! মিশনারিদিগের বাঙ্গালা প্রণালী শুদ্ধ না হইলেও তাঁহারা যে বাঙ্গালা ভাষার পরিণতি কল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন—ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে।

বাঙ্গালাদেশ যেরূপ প্রাচীন দেশ, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি এতকাল পর্য্যন্ত পরিণত না হইবার দুই কারণ। প্রথম কারণ মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব কালে তাহার উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; তাহাদের অধিকারে কোন লোককে রাজদ্বারে কোন আবেদন বা আদ্দাস করিতে হইলে পারস্য ব্যতীত বাঙ্গালায় তাহা গ্রাহ্য হইত না। দ্বিতীয় কারণ, বাঙ্গালার প্রতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ঘোরতর বৈরতা। বাঙ্গালা ভাষা "রাক্ষসীভাষা"

আর "স্ত্রীলোকের ভাষা" বলিয়া পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাহার অত্যন্ত অনাদর করিতেন। কাশীদাসী মহাভারত প্রস্তুত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাহা অপাঠ্য বলিয়া তাহার প্রতি অভিসম্পাৎ করিয়াছিলেন। বৈদ্যনাথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোন অশ্লীল কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া ভূমিকা মধ্যে লেখেন, কেবল উদরান্নের নিমিত্ত তিনি ঐ ভাষায় কাব্য প্রণয়ন করিলেন, আর তদ্ভাষা সংস্কৃতসহ তুলনায় কোকিল কাকলী সমীপে কাকের কঠোর কর্কশ ধ্বনিবৎ নিতান্ত নিন্দনীয়।

[প্রকাশিত-এডুকেশন গেজেট—বাংলা ১২৬৬ জ্যৈষ্ঠ—ইং ১৮৫৯ মে। পৃষ্ঠা—১৮৫-১৮৬]

(২)

ত্রৈমাসিক ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার চতুর্থ খণ্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, সাধারণ জনগণের মূর্খতায় পুরোহিতদিগের লাভ সংস্থান থাকায় তাঁহাদের চলিত ভাষার প্রতি অবহেলা করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কোন পণ্ডিত সাধুভাষায় লিপিচর্য্যা করিলে অপমানিত হইতেন। পণ্ডিতেরা স্বীয় মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য কল্পে এ পর্য্যন্ত উদ্যোগী ছিলেন যে, ঘোরতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সংস্কৃত ভাষা আদায় করিতেন, কিন্তু চলিত ভাষা লিখিতে হইলে যদি অশুদ্ধি হইত, তবে তাহা তাঁহাদের পক্ষে নিন্দনীয় না হইয়া বরং গৌরবেরই স্থল হইত। সাধারণ জনমণ্ডলীতে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার অবনত করা এবং তাহার সংশোধন কল্পে অবাঙ্‌মুখ হওয়া তাঁহাদের কার্য্যই ছিল। ৬০ বৎসর হইল যখন কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেন, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বাক্যে এই শাসন করিয়া ছিলেন যে, "এই গ্রন্থ পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত না হওয়াতে অপাঠ্য।"

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার উপরিউক্ত উক্তি যুক্তি-যুক্ত হইলেও তন্মধ্যে একটি বিষম প্রমাদ দৃষ্ট হইতেছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে যে, কীর্ত্তিবাস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে রামায়ণ প্রণয়ন করেন। কিন্তু কীর্ত্তিবাস যে অতি প্রাচীন কবি তাহা সহজেই সপ্রমাণ হইতে পারে। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী যে সময়ে চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করেন, তখন বাঙ্গলা ভাষা যে কিছু পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কন অতি সতেজ ভাষায় অনেক মানসিক গূঢ় ভাব বিকশিত করিয়াছেন। কোন ভাষার পরিণতি না হইলে তাহা সংঘটনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উক্ত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী যে সময়ে রঘুরাজের সভায় চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন, সে সময়ে এদেশের শাসন কর্ত্তৃপদে রাজা মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং রাজমহল ছিল এদেশের রাজধানী। মানসিংহ যে জাঁহাগীরের সময়ে এ দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহা এখন বালবনিতাগণেরও অগোচর নয়—জাঁহাগীরের অধিকার কাল প্রায় ৩৫০ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে ছিল। আমাদের এক্ত সমস্ত লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, কীর্ত্তিবাস যে সময়ে জীবিত ছিলেন, সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার তেমন পরিপাট্য সম্পাদিত হয় নাই। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী যে কীর্ত্তিবাসের অনেক পরে জন্মিয়াছিলেন তাহা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে কীর্ত্তিবাসের অবন মনে করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। বঙ্গীয় কবি চতুষ্টয়ের প্রাচীনত্ব পর্য্যায় লিখিতে হইলে আমরা নিম্নলিখিত মত লিখিব :—

প্রথম—কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত। দ্বিতীয়—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। তৃতীয়—কাশীরাম দাস। চতুর্থ—ভারতচন্দ্র রায়।

ভারতচন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ। কৃষ্ণচন্দ্র ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ নগরে পিতৃত্যক্ত রাজোপাধি প্রাপ্ত হন কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভবানন্দ মজুমদারের সময়ে চণ্ডী কাব্যের জন্ম দেন। কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত যে তাহার অনেক আগে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাও অসিদ্ধ নয়।

আমাদের একটা বিশেষ অনুশোচনার বিষয় এই যে, বাঙ্গালা ভাষার পারিপাট্য সাধনে এক্ষণে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহ এবং প্রযত্ন স্পষ্ট হইলেও সেই ভাষার আদ্য লেখকদিগের জীবন-চরিত সংগ্রহ কল্পে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। মৃত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রকৃত হিতকর লিপিমধ্যে আমরা তাঁহার রচিত ভারতচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত সমাদৃত করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার লিপি চর্চ্চায় অনুরাগ লাভের আকাঙ্ক্ষিগণ যদি অপরাপর সামান্য সামান্য বিষয়ে লেখনী চালনা না করিয়া স্বদেশের যাবতীয় বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া গ্রন্থ লেখেন, তাহা হইলে বিহিত উপকার হইতে পারে। প্রত্যুত, বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদিগের জীবন চরিত সে দুষ্প্রাপ্য তাহা আমরা এইক্ষণেও বিশ্বাস করি না—ফলতঃ দুরনুসন্ধেয় সন্দেহ নাই। লেখকেরা অনুসন্ধান করুন—সমস্ত সন্ধান পাইবেন।

কবিকঙ্কন আপন পরিচয় এক প্রকার স্বীয় গ্রন্থারম্ভেই দিয়াছেন। কীর্ত্তিবাস মুরারী ওঝার নাতি এবং পশ্চিম বর্দ্ধমানের গ্রাম বিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র রায়ের প্রায় সমস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। কাশীরাম দাসের বিষয়ে আমরা একবার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহাতে এই মাত্র তত্ত্ব পাইয়াছিলাম যে ভাগিরথী তীরবর্ত্তী দেওয়ানগঞ্জের অদূরে সিঙ্গী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। সেখানে আজিও কাশীদাসের ভিটা আছে। তিনি নির্বংশ গতায়ু হন। বোধহয় ঐ স্থানে গমন করিলে অনেক সমাচার সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

গত খৃষ্টীয় শতাব্দির চরমাংশে বাঙ্গালা বর্ণাবলী মুদ্রা যন্ত্রের উপযোগিনী হয়। হালহেড সাহেব রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণই সর্ব্বাগ্রে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাহা হুগলীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। হালহেড সাহেব বাঙ্গালা ভাষা কথনে এরূপ সুপটু ছিলেন, এদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক হিন্দু সমাজে অভেদ হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতেন—তাঁহার ছদ্মবেশ ধরা পড়িত না। উক্ত ব্যাকরণ যে অক্ষরে মুদ্রিত হয়, তাহা স্যর চার্লস্ উল্‌কিন্স সাহেব স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমাদিগের অধিকাংশ পাঠক অনবগত নহেন যে, ইংলণ্ডীয় মুদ্রাক্ষরের জন্মদাতা ছিলেন কাক্সটন—অতএব স্যর চার্লস উল্‌কিন্সকে বাঙ্গালা দেশের কাক্সটন বলা যাইতে পারে। একটা ভিন্নদেশে ভিন্ন জাতির ভিন্ন প্রকার অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রের অধীন করা কত কঠিন কর্ম্ম তাহা চিন্তা করিলে অদ্ভুত রসাশ্রিত হইতে হয়। উল্‌কিন্স সাহেব পঞ্চানন নামক জনৈক মিস্ত্রিকে মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করিবার উপদেশ দেন। সেই পঞ্চাননের কল্যাণে অনেক লোক মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করিবার শিল্পকার্য্যে নিপুণ হয়। উল্‌কিন্স সর্ব্বাগ্রে ভগবদ্গীতা এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রাঙ্কিত করেন। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞ ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের আশীর্ব্বাদে অনেক এদেশীয় লোক সম্পন্ন হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের কি কর্ত্তব্য নহে, উক্ত পরহিতৈষি মহাত্মার উদ্দেশে কোন প্রকার সম্মান চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করেন?

[প্রকাশিত—এডুকেশন গেজেট—বাং ১২৬৬ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৫৯ জুন—পৃষ্ঠা—১৮৯—১৯০]

(৩)

বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের আদিতে যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে ডক্তর কেরী কৃত খৃষ্টীয় সুসমাচারের অনুবাদও ধর্ত্তব্য। ঐ গ্রন্থ ১৮০১ অব্দে মুদ্রিত হয়! যদিও ঐ পুস্তকের ভাষা ও লিখন প্রণালী আধুনিক পরিশুদ্ধ ও সালঙ্কৃত বাঙ্গালার সহিত তুলনায় জঘন্য বোধ হউক কিন্তু দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় অবশ্যই প্রশংসাপ্রদ। ডক্তর কেরি উক্ত অনুবাদ কল্পে রামরাম বসু নামক এক ব্যক্তির কাছে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। চেম্বার্স সাহেব রামরামকে কেরি সাহেবের নিকট সমর্পণ করেন। রামরাম পারশ্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ইনিই রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র লেখেন। কেরি সাহেব সুসমাচার ব্যতিত বাঙ্গালা ভাষায় এক ব্যাকরণ এবং ৮০,০০০ শব্দ যুক্ত তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ এক সুদীর্ঘ অভিধান প্রস্তুত করেন।

পঞ্চাশ বৎসর বা তৎপূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ বাঙ্গালা ভাষা অভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া কৃতকার্য্য হন, তন্মধ্যে মালদহ প্রবাসী মৃত জন্ এলার্টন সাহেবের নাম সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। ঐ মহাশয় যদিও একজন নীলকর ছিলেন, কিন্তু তিনি এখনকার অনেক নীলকরের ন্যায় এদেশীয় লোকদিগকে বনপশু বা ভারবাহী পশু জ্ঞান করিতেন না, তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতৃস্নেহে দৃষ্টি করিতেন। ঐ মহাশয় সুসমাচারের দ্বিতীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং তারপর ডক্তর ইয়েট্স কর্ত্তৃক অন্য এক অনুবাদ প্রস্তুত হইয়াছে। যদিও শেষে প্রস্তুত অনুবাদ অনেকাংশে উত্তম হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহা সংশুদ্ধকরণের অবশেষ আছে। এলার্টন সাহেব "গুরুশিষ্য" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আমরা শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা অপেক্ষা তাঁহার রচনা মনোজ্ঞ জ্ঞান করি। এলার্টন সাহেবের এই এক বিশেষ গুণ জন্মিয়াছিল যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় চিন্তা করিতে পারিতেন। যাঁহারা ভিন্ন দেশীয় ভাষায় লিখন বা কথনে পটুতা প্রদর্শনের আশা করেন; তাঁহাদের উচিত সেই ভাষায় চিন্তা করা।

যে সকল প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বিশিষ্টরূপে গণনীয়। ঐ কলেজ মার্কুইস্ ওয়েলেস্‌লি কর্ত্তৃক খৃঃ ১৮০০ অব্দের ৪ঠা মে দিবসে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মার্কুইস্ বাহাদুর সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চার জনৈক অগ্রগণ্য বন্ধু ছিলেন। তাঁহার লিখিত অভিমত মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন কল্পে এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সংস্কৃত ভাষা এদেশীয় ভাষা নিকরের জননীস্বরূপা সুতরাং এদেশীয় ভাষায় পাণ্ডিত্য রাখিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া উচিত। এ কারণ সেই সময়ে সুপণ্ডিত বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশিষ্ট সমাদরে নিযুক্ত হন। উক্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম বাঙ্গালা ভাষাভ্যাসিদিগের পরম পূজাস্পদ সন্দেহ কি? তাঁহার রচিত প্রবোধ-চন্দ্রিকা, রাজাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ শিক্ষা পদ্ধতিপক্ষে অতীব হিতকারী।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথমাবস্থায় এদেশীয় ভাষা নিকরের চর্চা বাহুল্য ছিল। পারশ্য উর্দ্দু, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে যুবা সিবিল সাহেবদিগকে প্রকাশ্য সভায় বাদানুবাদ করিতে এবং প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত। সুতরাং সে সময়ের সিবিল সাহেবেরা এদেশীয় ভাষাগুলিতে বিশেষ নৈপুণ্য রাখিতেন। খৃঃ ১৮০৩ অব্দে উক্ত কলেজের ছাত্র হাণ্টার সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় এ দেশের বর্ণভেদ বিষয়ে যে প্রবন্ধ লেখেন, আমরা তাহা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিতেছি। যদিও তাহা স্বরচিত এবং সংশুদ্ধ না হউক, কিন্তু ইংরাজের বাঙ্গালা রচনা হওয়ায় পাঠকদিগের অতীব শুশ্রবনীয় হইবে। যথা :—

"অন্যশাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জ্জমা করে, তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি-প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জ্জমা ভাষাতে কাশীদাস নামে এক শূদ্র করিয়াছিল, সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিল, সেই ভয়েতে অন্য কেহ সে কর্ম্ম করে না।

"হিন্দুলোকেরা যদিও আপন শাস্ত্রের নিশ্চয়েতে থাকে, তবে অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার যদি ভালও হয় তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, যদি অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার দেখে কিম্বা শুনে তথাপি তুচ্ছ করিয়া আদর করে না অতএব অন্য লোকের ব্যবহারেতে তাহারদের জ্ঞানলাভ হইতে পারিবে না। "অন্য দেশের গমন ও অন্য দেশের ব্যবহার বিদ্যাভ্যাসেতে লোকের বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, হিন্দুলোকেদের শাস্ত্রের মতে পশ্চিমে আটক নদী পার হইলে জাতি যায়, উত্তরে ভোটান্তর এবং ম্লেচ্ছদেশে সেই মত এবং ব্রহ্মপুত্র পার হইলে পূর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট হয়। দক্ষিণে সমুদ্র পথে জাহাজে থাকিয়া ভোজন পান করিলে জাতি যায়। হিন্দুশাস্ত্রের মতে গোখাদকের সংসর্গ করিলেও দোষ; হিন্দু ছাড়া যত লোক সকলেই গোমাংস খায়, সুতরাং হিন্দুরা তাহারদের সহিত সহবাস করিতে পারে না এবং যেমত নির্জ্জন উপদ্বীপে কোন ব্যক্তি একাকী থাকে সেইমত এই একাসাড়িয়া রীতিতে তাহাদের বুদ্ধি প্রতিভা জড়ীভূতা হইয়াছে এবং তাহারদের উদ্যোগ শিথিল হইয়া অবিনীততা ও স্তব্ধতা হইয়াছে; এই ইউরোপীয়দের মধ্যে দস্যু প্রভৃতি অধম লোক হইতেও অধম; কেননা ইহারা স্বস্থান ত্যাগ করিয়া সুক্রিয়ান্বিত হইলে তাহারদের সুখ্যাতি পুনর্ব্বার হইতে পারে; কিন্তু ইহারদের কখন ভাল হইতে পারে না। হিন্দুরা শাস্ত্র ব্যবস্থা কিম্বা মান্যলোকেরা যাদৃচ্ছিক আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেই অপার দুঃখসাগরে পড়ে।"

[প্রকাশিত—এডুকেশন গেজেট—বাং ১২৬৬—জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৫৯—জুন। পৃষ্ঠা ১৯৩]

(৪)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যেরূপ বঙ্গ বিদ্যার আলোচনা নিমিত্ত উদ্যোগ হইয়াছিল, তাহা যদি এখনকার সময়ে হইত তবে যে কত উপকার সাধনের সম্ভাবনা হইয়া উঠিত—তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। সে সময়ে যদিও কোন কোন সিবিল সাহেব বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষায় মনোযোগ দিতেন বটে কিন্তু অধিকাংশই পারস্য এবং উর্দ্দু ভাষা অভ্যাসে নিরত হইতেন। সেইজন্য অধুনা রাজকীয় বিচারাগার সমূহে আমলাদিগের মধ্যে একপ্রকার রাক্ষসী বাঙ্গালার চলন হইয়াছে—তাহাতে যে রাজদ্বারে সম্পাদিত লিপি অস্পষ্ট গূঢ়ধর্ম্মি রঙ্গভঙ্গে কতলোকের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। রাজদ্বারের বাঙ্গালা ভাষা সংশোধনের সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। আমলাদিগের চতুরালী খাটাইবার নানাপ্রকার অভিসন্ধির মধ্যে উপরিউক্ত "রাক্ষসী বাঙ্গালা"কেও গণনা করিতে হইবে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ অব্দ পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রসাদাৎ যে সকল গ্রন্থের প্রণয়ন এবং মুদ্রাঙ্কন হয়, তাহার তালিকা মধ্যে নিম্নলিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ধরা হইয়াছে:—

(১) কেরি কৃত— বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং অভিধান।

(২) রাম রাম বসু কৃত—প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

(৩) রাজীবলোচন কৃত—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চরিত্র।

(৪) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত—রাজাবলী।
(৫) গোলকনাথ কৃত—হিতোপদেশ অনুবাদ।
(৬) রামকিশোর তর্কালঙ্কার কৃত—হিতোপদেশ অনুবাদ।
(৭) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কৃত—বত্রিশ সিংহাসন।
(৮) চণ্ডীচরণ কৃত—তোতা ইতিহাস।
(৯) হরপ্রসাদ রায় কৃত—পুরুষ পরীক্ষা।
(১০) রাম রাম বসু কৃত—লিপিমালা।
(১১) কেরি কৃত—কথোপকথন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজের ছাত্র সার্জন্ট সাহেব 'ইলিয়াড' নামক লাটিন মহাকাব্যের চারি সর্গ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মক্টন নামক অপর একজন ছাত্র সেক্সপীয়রের "টেম্পেষ্ট" নামক নাটকের ভাষান্তর করেন। ১৮০২ অব্দে বাঙ্গালা মহাভারত এবং ১৮০১ অব্দে রামায়ণ মুদ্রাঙ্কিত হয়। এইরূপে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবর্দ্ধন কল্পে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এই সকল শুভ উদ্যম হওয়া সত্বেও এদেশীয় লোকের কুরুচি বর্দ্ধনের চেষ্টার অভাব ছিল না। সে সময়ে দিন দিন নানাস্থানে বাঙ্গালীদিগের দ্বারা যন্ত্রালয় সকল সংস্থাপিত হইতে লাগিল। সেই সকল যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে কুসংস্কার বৃদ্ধির যন্ত্র হইয়া উঠিল। যদিও সেই সকল যন্ত্র হইতে কোন কোন সুনীতি বর্দ্ধক সুলিখিত গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে নির্গত হউক কিন্তু সে সকল যন্ত্রের অধ্যক্ষদিগের লাভ সংস্থানের প্রধান উপায় আদিরস ঘটিত বা কুসংস্কার বর্দ্ধক কুগ্রন্থনিকরের বিক্রয় বাহুল্য। ১৮২১ অব্দের পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" পত্রে তাহার নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশিত হয়। যথা—

(১) গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী। (২) জয়দেব। (৩) অন্নদামঙ্গল। (৪) রসমঞ্জরী। (৫) রতিমঞ্জরী। (৬) করুণানিধান বিলাস। (৭) বিল্বমঙ্গল। (৮) চাণক্য! (৯) শব্দসিন্ধু অভিধান। (১০) ঔষধাবলী। (১১) রাগমালা। (১২) বত্রিশ সিংহাসন। (১৩) বেতাল পঁচিশ। (১৪) বৈদ্যনিন্দা। (১৫) ভগবদ্ গীতা। (১৬) মহিম্নস্তব। (১৭) গঙ্গাস্তব। (১৮) শুচিচরিত্র। (১৯) শান্তি শতক! (২০) শৃঙ্গারতিলক। (২১) অশুভপঞ্জী। (২২) আদিরস। (২৩) চণ্ডী। (২৪) চৈতন্য চরিতামৃত।

"ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া"র উক্ত তালিকা যে সম্পূর্ণ নহে, তাহা অনায়াসে সপ্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু উক্ত তালিকা পাঠে সে সময়ে সাধারণ বাঙ্গালীর অধ্যয়ন ব্যাপারে রুচির আভাস প্রকাশ পায়। ঐ সকল গ্রন্থ মধ্যে যদিও কোন কোনটি পাঠযোগ্য থাকুক কিন্তু সেগুলি তুষরাশি মধ্যে নিহিত শস্য কণার মত সুবিরল। ঐ সকল গ্রন্থ এখন কোন পুস্তকালয়ের শোভাবৃদ্ধিকর ব্যতিত জ্ঞানবুভুক্ষিত বালক বালিকাদিগের বুভুক্ষা তোষক না হইয়া অরুচি জননের নিমিত্ত হইবে।

[প্রকাশিত—এডুকেশন গেজেট—বাং ১২৬৬—আষাঢ়। ইং—১৮৫৯—জুন। পৃষ্ঠা—১৯৭]।

(৫)

বাঙ্গালা বিদ্যায় পবিত্রভাব প্রদানে স্কুল বুক সোসাইটির প্রযত্ন গণনীয় বটে। এই সমাজ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস হেষ্টিংস মহোদয়ের মহিলার বিশেষ সহায়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুশিক্ষা সাধনের উপযোগী কয়েকখানি গ্রন্থ উক্তা শ্রীমতী স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উক্ত সভার গ্রন্থ প্রণেতা সহকারীদিগের মধ্যে কাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট, "উপদেশ কথা" নামক পুস্তক রচনা করেন। ইনি বর্দ্ধমানস্থ মিশনরী প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা পাঠশালা সমূহে প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং ভূগোল প্রভৃতি প্রচলন আরম্ভ করিয়া উক্ত প্রদেশে বঙ্গবিদ্যার চর্চ্চা বাহুল্য করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে চুঁচুড়া প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ নগর গ্রামাদিতে মে সাহেবের যত্নে বাঙ্গালা বিদ্যা শিক্ষার রুচি প্রাদুর্ভূত হয়। উক্ত অঞ্চলে বর্ত্তমানে যে লোকের মনে প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যাতৃষ্ণার উদ্ভব হইয়াছে—এ সকলই মে সাহেবের উদ্যোগ এবং উৎসাহের ফল বলিতে হইবে। চুঁচুড়া প্রবাসী অপর এক বঙ্গ হিতৈষী পিয়ার্সন সাহেবও এই সময়ে বঙ্গবিদ্যায় ঔৎকর্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি সরল ভাষায় শব্দমালা এবং বাক্যাবলী প্রস্তুত করেন এবং মে সাহেব বাঙ্গালা অঙ্ক পুস্তক রচনা দ্বারা প্রসিদ্ধ হন।

স্কুল বুক সোসাইটির এদেশীয় অনুবলদিগের মধ্যে রামকমল সেনের নাম অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই। ইনি ইউরোপীয় বিদ্যা বিজ্ঞান বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে অত্যন্ত সমুৎসুক ছিলেন। বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া তিনি যে এক ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশিষ্ট বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা যে মহাশয়ের লিপি অনুসারে এই প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি লেখেন যে, রামকমল সেনকে বাঙ্গালা দেশের জনসন্ অনুপযুক্ত বিশেষণ হয় না। এই মহাশয় যে সময়ে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন, সে সময়ে তুতী নামা আর আর্বি-নাইট প্রধান পাঠ্য পুস্তক ছিল। ইনি ডক্তর হাণ্টার সাহেবের হিন্দুস্থানী যন্ত্রালয়ে মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে বর্ণ-সংযোজকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু পরিশেষে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ও টাঁকশালের ধনরক্ষক পদে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইয়া পুত্রগণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত লড ব্রূহামের ন্যায় ইনি কার্য্যোপযোগী বিদ্যাবিধানের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজ এবং পাঠশালার শিক্ষা প্রণালী প্রণয়ন করেন। অধিকন্তু বৈদ্য শাস্ত্রের চর্চ্চা বৃদ্ধির নিমিত্ত "ঔষধাবলী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। স্কুল বুক সোসাইটির তাৎকালিক এদেশীয় সহযোগীগণের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের নামও এখানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তিনি বর্ণমালা, নীতিকথার কিয়দংশ এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সুখ্যাত হন। সে সময়ে স্কুল বুক সোসাইটির গরিমার সীমা ছিল না। এদেশীয় লোকেরা তাহার গৌরব প্রতিপাদনে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২০০ শত অধ্যক্ষ মধ্যে ৮০ জন এদেশীয় ছিলেন। কিন্তু তারপর উক্ত সমাজের ক্রমশঃ শ্রীহীনতা দেখা যাইতেছে—ইহার কারণ অনুসন্ধানের যোগ্য।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী প্রকাশিত হয়।

(১) ষ্টুয়ার্টের বর্ণমালা প্রভৃতি দশ খণ্ডে প্রস্তুত এক এক প্রস্থ—৩,৮৫০ কপি
(২) পিয়ার্সনের বর্ণমালা প্রভৃতি এক এক প্রস্থ—৩,০০০ কপি
(৩) কীথের বাঙ্গালা ব্যাকরণ (প্রশ্নোত্তরে)—৫০০ কপি
(৪) পিয়ার্সনের পাঠশালার বিবরণ—৫০০ কপি
(৫) রামচন্দ্র শর্ম্মাকৃত অভিধান—৪,৩০০ কপি
(৬) পিয়ার্সনের পত্র কৌমুদী—১,০০০ কপি
(৭) মে রচিত গণিত—২,০০০ কপি
(৮) হার্লের গণিত (মিশ্র প্রকরণ)—১,০০০ কপি
(৯) নীতিকথা—প্রথমভাগ—৭,০০০ কপি
(১০) নীতিকথা—দ্বিতীয় ভাগ (পিয়ার্সন কৃত)—৪,০০০ কপি
(১১) নীতিকথা—তৃতীয় ভাগ (রামকমল সেন কৃত)—৫,০০০ কপি
(১২) তারাচাঁদ দত্তের মনোরঞ্জন ইতিহাস—২,০০০ কপি
(১৩) ষ্টুয়ার্টের উপদেশ কথা—২,০০০ কপি
(১৪) কেরি কর্ত্তৃক অনুবাদিত—গোল্ড স্মিথের ইংলণ্ড ইতিহাস—৫০০ কপি
(১৫) পিয়ার্সের ভূগোল বৃত্তান্ত—১০,০০০ কপি
(১৬) সিংহের বিবরণ—২,০০০ কপি

বঙ্গবিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে বঙ্গীয় কাব্য এবং বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকরের কিয়ং বৃত্তান্ত অবশ্যই মনোজ্ঞ। আমরা প্রথমোক্ত বিষয়ে লিপি বাহুল্য করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে, অতএব সে বিষয়ে "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" পাঠে উৎসাহিত হইতে অনুরোধ রহে। বাঙ্গালা সমাচার পত্রের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার মানস আছে।*

[প্রকাশিত এডুকেশন গেজেট—বাং ১২৬৯—আষাঢ। ইং ১৮৬৩—জুন। পৃষ্ঠা—২০১—২০২]

* বাঙ্গালা সমাচার পত্রের উপরে কোন প্রবন্ধ পাওয়া গেল না। আদৌ লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহের অবকাশ রাখে।—সম্পাদক

বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ

বিজ্ঞাপন

এই প্রবন্ধ বীটন সভায় পঠিত হয়; স্থতরাং বক্তৃতার নিয়মে লিখিত হইয়াছে। অপিচ বাঙ্গালা কবিতার প্রতি উক্ত সভার কতিপয় সভ্য অকারণ কটূক্তি করাতে তদুত্তরেই এতৎ প্রবন্ধের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে, অতএব বাঙ্গালা কবিতার স্বরূপ বর্ণন পুস্তকান্তরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা আছে।

এই পুস্তক সংবাদ সাগর পত্রের গ্রাহকগণ বিনামূল্যে এক এক খণ্ড পাইবেন।

খিদিরপুর
২ জ্যৈষ্ঠ
১২৫৯ বঙ্গাব্দা

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল
বাহাদুর শ্রীচরণাম্বুজেষু।

যথা বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং।—

এ অকিঞ্চনের প্রতি ভবদীয় অসীম করুণা ও স্নেহের যৎসামান্য স্বীকৃতিচ্ছলে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ শ্রীচরণ কমলান্তরালে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উৎসর্গ করিলাম, ইতি।

খিদিরপুর
২ জ্যৈষ্ঠ
১২৫৯ বঙ্গাব্দা

সেবক শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

যেরূপ মানস সরোবরস্থ সরোজবনবিহারি মরালমণ্ডলে বক যদ্যপি বক্তা হয়, তবে সেই ক্রৌঞ্চের কুৎসিত নিনাদ কলহংসকুলের উপহাসস্থল হইবেক সন্দেহ নাই, সেইরূপ প্রকৃত মানস সরোবরজ জ্ঞানরূপ রাজীবরাজীবিরাজি এই সভ্য সমূহ স্বরূপ রাজহংসসমাজে মাদৃশ ক্রৌঞ্চ জনের চীৎকার করা উপহাসজনকই হইবেক, কিন্তু হাস্যরসে অথবা নাট্যরসে জ্ঞানীরাও কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া থাকেন, অতএব আমি কৃতার্থ মানিব, যদ্যপি আমি এই গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন জ্ঞানিসমাজের রহস্যরসোদ্দীপন করিতে পারি। অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা কাব্যশাস্ত্র বিহিত চিত্তবিনোদের নিমিত্ত হইয়াছে, [২] সংস্কৃত ভাষায় ইহার নামই কাব্য, অতএব আমরা যখন সেই শাস্ত্রের প্রসঙ্গোত্থাপন করিয়াছি, তখন আমরা মিল্টনের সহিত অবশ্যই উক্তি করিব, "Hence loathed Melancholy" বিশেষতঃ আমারদিগের দেশের কবিতা, কোমল বনিতা, "রসেন মিলিতা" তাঁহার সহিত গাম্ভীর্য্যের কোন সম্পর্কই নাই, আমার এই কথা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় জ্ঞানিকর্ত্তৃক উল্লেখিত হইয়াছে যে দেশকালপাত্রভেদে কবিতাসতী ভিন্ন ২ বেশে উদিতা হইয়া থাকেন; অন্ধকারাবৃত শীতকটিবন্ধ নিবাসী কবিগণ কৃষ্ণবর্ণ শৈলশ্রেণী, উচ্চচূড়াবলিতে ধবলতুষাররাশি চুম্বিত এবং প্রবল জগদ্ভালের আবির্ভাব, ও সাগরতীরবর্ত্তী শেখরভৃগু ও গহ্বরে উত্তুঙ্গ তরঙ্গের প্রতিঘাত শব্দ, পাণ্ডুবর্ণ সূর্য্য, অনুজ্জ্বল চন্দ্রমা, সমীরণের অসুখকর চীৎকার, নাইট বার্ড নামক নক্তবিহঙ্গের কর্ণকুহরভেদকারী কুস্বর এবঞ্চ উত্তর দিগান্তরালে অবিরত বিজলীর চমক্ [৩] প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া থাকেন; কিন্তু ধরণীর সমকটিবন্ধ এবং উষ্ণকটিবন্ধ নিবাসী কবিগণ ঐ সকল ভয়ানক ভাবপরিবর্ত্তে হাস্যময় নিকুঞ্জকানন, বিবিধ বর্ণাক্ত সহস্র ২ প্রকার কুসুমাবলীকলিত রম্য কেলীস্থল সকল, সুনির্ম্মলজলপূর্ণ সরোবর, ও তাহাতে শত ২ শতচ্ছদ কোকনদ কমল কুমুদাদির প্রফুল্লতা, রাজহংস প্রভৃতি মনোহর জলচর বিহঙ্গদিগের ক্রীড়া, ও তত্তীরবর্ত্তী বিবিধ তরুলতার শোভা; যে শোভা পুনর্ব্বার সরোবরের মোহন মুকুরবৎ বক্ষস্থলে পতিত হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে, এবং প্রখর করবিশিষ্ট দিনকর, মার্জ্জিত রজতফলকনিভ নিশাকর, নানারঙ্গরঞ্জিত নয়নমনোরঞ্জন শক্রধনুঃ, মৃদুমন্দ মলয়জ মারুতের সৌরভ প্রভাব, তথা মধুকরনিকর ও কলকোকিলাদির মিষ্ট ধ্বনি ইত্যাদি সংগীত করিয়া থাকেন, সুতরাং পৃথিবীর উত্তরখণ্ডস্থ কবিতার সহিত দক্ষিণখণ্ডের কবিতার কিরূপ পার্থক্য সম্ভব, তাহা সুবোধবর্গের অবোধের বিষয় কি? ইউরোপখণ্ডে [৪] কবিতাসতী শুভ্রবর্ণ বস্ত্রাবৃতা সলজ্জ এবং গম্ভীর মুখভঙ্গীযুক্তা তথা আর্য্যভাবাপন্না প্রৌঢ়ারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু অস্মদ্দেশে তিনি চিরযুবতী, অবিরত হাস্যবতী, হাব ভাব লীলা হেলা প্রভৃতি বিবিধ রসশালিনী সুন্দরীরূপে বিরাজিতা হয়েন, আমার এতাবদুক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করিতে পারেন, আমি ইউরোপীয়া কবিতাকে ঘৃণা করিয়া এতৎখণ্ডের কবিতাকে সমাদর করিতেছি, মহাশয়দিগের মধ্যে এরূপ যদ্যপি কেহ বিবেচনা করেন, তবে তেঁহ ভ্রমের অনুবর্ত্তী হইতেছেন, ইউরোপীয়া কবিতাসতী আমারদিগের সম্ভ্রমের পাত্রী, সাধ্বী এবং লজ্জাশীলা স্ত্রীলোককে কদাচ ঘৃণা এবং উপহাস করা যায় না, কিন্তু আমারদিগের দেশীয়া কবিতাকে আমরা অবশ্যই প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আদর করিব।

আমারদিগের আবার কবিতা—তাহার আবার কথা। আমি নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সেই জন্যই এই সভ্য সমাজে [৫] উল্লেখ করিতেছি, বাঙ্গালাদেশে কবিতাসতী আবির্ভূতা আছেন, এ কথা শুনিলে ইংরাজীবিদ্যোজ্জ্বলবুদ্ধি নববাবুরা আমাকে উপহাস করিতে পারেন, অতএব ...ত হইল,

মধ্যে যে যে মহাশয় সে ভাবের ভাবী, তাঁহারা হাস্য করুন, আমি প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে আমি চরিতার্থ মানিব। সত্যবটে, আমারদিগের দেশে একজন মিল্টন অথবা শেক্ষপিয়র জন্মেন নাই, অহো, জন্মেন নাই কি জন্য বলিতেছি?

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air."

অস্যার্থ

সুনির্ম্মল নিভাধর রত্ন বহুতর।
তমোময় সিন্ধুগর্ব্বে গুপ্ত কলেবর॥
প্রফুল্ল কুসুম কত কে দেখে নয়নে।
সৌরভ বিনাশ করে বনের পবনে॥

অতএব জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু শস্য অঙ্কুরিত হইলে [৬] কি হইবেক? তাহার পরিপোষণকর্ত্তা কে? কৃষক কোথায়? যত্ন কোথায়? যে দেশে কৃষিবিদ্যার অভাব, সে দেশে শস্যবীজের প্রাচুর্য্যে কি হইবেক? যদি বলেন, বীজ আছে তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—না থাকিবার কারণ কি? কোন পরম জ্ঞানী গ্রন্থকার কহেন—

"In order that poetry may flourish in a country, its inhabitants must be gifted with a lively imagination, a delicate and correct ear," "poetry, he adds, requires a figurative, melodious, rich and abundant language; varied in its construction, and capable of expressing everything, a language whose various ways, enable the poet to blend his primitive colours, and to produce from the mixture, an infinity of new and appropriate shades." অর্থাৎ কোন দেশে কবিতা উন্নতাবস্থা প্রাপ্তা হয়, এজন্য তদ্দেশীয় লোকেরদের চিত্তবৃত্তির বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি আবশ্যক করে, ও তাহারদিগের শ্রুতিপথ সূক্ষ্মতররূপে স্বরের মাধুর্য্য ও সংমেলন বোধে সক্ষম হইবেক, তিনি আরো কহেন যে, যে ভাষা রূপকাল-[৭]ঙ্কারে ভূষিতা, অতি সুমধুরা, এবং প্রচুরতর শব্দধনশালিনী, ও পদসাধনে বিবিধাকারবিশিষ্টা তথা সকল বিষয় প্রকাশকরণে ক্ষমতাবতী হয়, অর্থাৎ যে ভাষায় নানাকার ভঙ্গীবশতঃ কবি স্বীয় অনুভূত ভাবাবলী মিশ্রিত করিয়া অনন্তপ্রকার নূতন ২ রঙ্গ নির্গত করিতে পারেন, সেই ভাষাতেই কবিতা উত্তমা হইয়া থাকে। এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমারদিগের দেশীয় লোকেরা এবং দেশীয় ভাষা কি উল্লেখিত গুণচয় ভূষণে বঞ্চিত আছেন? ইংরাজদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালিদিগের মানসপদ্ম উগ্রতর ভাবরসাশ্রিত, তাহা ইংরাজেরাই স্বীকার করিয়া থাকেন, স্বরবোধে ইংরাজেরা আমারদিগকে হাজার "Lovers of Tom-tom" অর্থাৎ ঢাকবাদ্যপ্রেমিক বলিয়া উপহাস করুন, কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বরানুমেলকতা ...র আমারদিগের দেশীয় লোকেরা অতিশয় ক্ষমতাবান্, তথাপিও যদ্যপি ইয়ংবেঙ্গল বাবুরা বেসুরা ও বেতালা হইতে চাহেন, হউন, তাহাতে ক্ষতি কি? পরন্তু বাঙ্গালা

ভাষা অত্যন্ত কোমল এবং সুমিষ্ট, যদি বলেন, ইহাতে শব্দপ্রাচুর্য্য কোথায়, অলঙ্কার কোথায়, ব্যাকরণ কোথায়? উত্তর, যেখানে সংস্কৃতরূপ বহু সন্ততিমতী ভাষা সতীকে আমারদিগের ভাষার মাতা বলিয়া স্বীকার করি, সেখানে স্বীয় জননীর অলঙ্কার প্রাপণে তাঁহার অবশ্যই অধিকার আছে, বালিকাকালে ধূলাখেলায় রত ছিলেন, এইক্ষণে বয়ঃস্থা হইয়া উত্তরোত্তর সভ্য পতির প্রিয়তমা হইতেছেন, অতএব অবশ্যই বৃদ্ধা জননীর আভরণাদি পরিধান করিতে পারেন। এতাবতা বাঙ্গালিদিগের অন্তঃকরণে এবং বাঙ্গালা ভাষায় কবিতার বীজ আছে তাহা সপ্রমাণ হইল। মদাত্মীয় বন্ধু বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু গত সভায় কহিয়াছিলেন, স্বাধীনতা-সুখবিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিরহ হয়, সুতরাং প্রমোদপরিচ্যুতচিত্ত জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোন রূপেই কেহ হইতে পারেন না, অতএব বাঙ্গালিরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায় তাহারদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং কোন কালে জন্মিবেন, এমত বোধ হয় না, তিনি আরো কহিয়াছিলেন যে, ভারত [৯] বর্ষে যখন স্বাধীনতা সম্পদ্ ছিল, তখন বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস জয়দেব প্রভৃতি বিরাজ করিয়াছিলেন। কৈলাস বাবুর দূরদর্শিতা এবং বিদ্যানুরাগিতার প্রতি নমস্কার প্রদান করি, কিন্তু তাঁহার এতাবদুক্তির সহিত যুক্তির সমন্বয় হয় না, তিনি আপনার ভ্রম আপনার উক্তিতেই সপ্রমাণ করিতেছেন; যেহেতু স্বাধীনতা সহচবাবিরহে যদ্যপি কবিতা সমুদিতা ও প্রমুদিতা না হন, তবে মোগল সাম্রাজ্যের সময় জয়দেব কবি অগ্রদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিতেন না। আমার প্রিয়বর বন্ধু তাঁহাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকালে প্রস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু জয়দেব কবি প্রাচীন কবি নহেন, ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ হইতে পারে; এতদ্ব্যতীত সুরদাস তুলসীদাস প্রভৃতি কবিগণ যাঁহারদিগের কবিত্ব ভিন্ন২ জাতীয় মনুষ্যগণ বিশিষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও মোসলমানদিগের রাজ্য-কালীন বিরাজমান ছিলেন। অপিচ স্বাধীনতা-বিহীনতা এবং অন্নদীনতা তথা মানসী মলিনতা-জন্য যদ্যপি প্রকৃত কবির অভাব হইত, তবে কোন দেশেই প্রসিদ্ধ২ কবি প্রভূত হইতেন [১০] না, যেহেতু প্রায় কোন যথার্থ কবিই স্বাধীন অথবা অন্নচিন্তাহীন তথা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন না; ইউরোপীয় আদিকবি হোমর এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত লালায়িত ছিলেন, অবিড দ্বীপান্তরে প্রেরিত রাজদণ্ডভোগী ছিলেন, কবি শিলটন ভর্ত্তৃহরি এবং লার্ড বইরণ সংসার সুখে বিরক্ত ও বিষণ্ণ-চিত্ত থাকিয়া কবিতারসের শেষ করিয়া গিয়াছেন, অতএব প্রসন্নমনা না হইলে কবিতাকমল বিকশিত হয় না, একথা কোন মতেই স্বীকার্য্য নহে, কৈলাস বাবু ইহাও কি বিজ্ঞাত নহেন, যে "The dying swan sings the sweeter" অযোধ্যাপতি উজির আলী কলিকাতার কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া অতি মনোহর কবিতার জন্ম দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালিদিগের হৃৎপদ্মাসনে কবিতাদেবী অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা সপ্রমাণ করণার্থ অধিক লেখা বাহুল্য, গীতগোবিন্দ, পদাঙ্কদূত এবং হংসদূত প্রভৃতি উপকাব্য, যাহারদিগের শব্দলালিত্যে এবং ভাবমাধুর্য্যে ভিন্নজাতীয় মনুষ্যেরাও মুগ্ধচিত্ত হইয়াছেন, [১১] সেই সকল কাব্য কলাপ বাঙ্গালিদিগের দ্বারাই রচিত হইয়াছে, যদি বলেন, সে সকল সংস্কৃত কাব্য; বাঙ্গালিরা স্বীয় ভাষায় কি কবিতা রচনা করেন নাই? উত্তর; বাঙ্গালা কবিতা ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার সহ বয়ঃক্রম তুলনায় জ্যেষ্ঠা না হউন, ফলে সমবয়স্কা বটেন। পেট্রার্কা এবং চসরের কিয়ৎকাল পরেই বাঙ্গালা কবিতা আবির্ভূতা হইয়াছেন; বাবু হরচন্দ্র দত্ত কবিকঙ্কণকে বাঙ্গালা ভাষার আদিম কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ফলে সার্দ্ধ চারিশত বৎসর গত হইল,

ত্রিপুরার রাজবংশবৃত্তান্ত বাঙ্গালা কবিতায় রচিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ রাজমালা গ্রন্থের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় অন্য কোন কাব্য প্রস্তুত হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না। তৎপরে বঙ্গীয় ৯৬৪ অব্দে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, তদনন্তর কৃত্তিবাস, কাশীদাস এবং কবিকঙ্কণাদি কবিগণ জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসের কবিতা আফ্রিকাদেশের মরুভূমিবৎ, অর্থাৎ তন্মধ্যে যেরূপ [১২] স্থানে২ শ্যামল তরলতা তৃণাচ্ছাদিত ওসিস্ নামক রম্যস্থল সকল আছে, কৃত্তিবাসের কবিতাও সেইরূপ, প্রায় অধিকাংশই বালুকাপূর্ণ অপ্রীতিকর মরুভূমি, তথাপি মধ্যে২ সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। কাশীদাস অতি শ্রেষ্ঠতর কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্য ভূষণে ভূষিত ছিলেন, বোধ হয় ইহাঁর ন্যায় শক্তি প্রকাশ করণে প্রায় অন্য কোন বাঙ্গালি কবি ক্ষমতাবান্ হয়েন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কাশীদাস স্বীয় কল্পিত ব্রত উদ্যাপন করণের অনেক পূর্ব্বে কৃতান্তের দন্তপংক্তির অন্তর্গত হয়েন, তিনি যদি মহাভারত সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারিতেন, তবে তাহা অতি মধুর হইত, "আদিসভা বিরাট বনের কত দূর, ইহা রচি কাশীদাস যান স্বর্গপুর" এই কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই আছে, কাশীদাসের কবিতাসতী বিবসনা নহেন, এবং তাঁহার কোমলাঙ্গের ললিত লাবণ্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইতে হয়। সভাপর্ব্বে দ্রুপদীর করণা পাঠ করিতে২ বোধ হয় যেন শরীর দ্রবীভূত হইতেছে। [১৩] অপিচ কাশীদাস মূল কাব্যরচক ছিলেন না, অনুবাদক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শক্তির প্রতি সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নহে, যেহেতু তেঁহ ব্যাসকৃত মহাভারতের প্রকৃত অনুবাদ করেন নাই ; অনুবাদ দুই প্রকার হয়, এক মর্ম্মানুবাদ, অপর ভাষানুবাদ। কিন্তু কাশীদাস ইহার কোন নিয়মেই রচনা করেন নাই। মর্ম্মানুবাদ হইলে জৈমিনী ভারতের ভিন্ন প্রকার বিবরণ সকল সংগ্রহ করিতেন না। অতএব কাশীদাস বিবিধ গ্রন্থ হইতে ভারতেতিহাস সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভাষায় তাহা গ্রন্থন করিয়াছেন। কাশীদাস যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সাময়িক দেশীয় লোকেরদের অন্তঃকরণের ভাব আশ্চর্য্য প্রকার ছিল। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা অতিশয় ঘৃণ্য হইত। এ সময়েও পল্লিগ্রামের অনেকানেক ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিবেচনা করেন, কাশীদাসের মহাভারত পাঠ করিলে পাতকসঞ্চয় হয় ; দেশীয় লোকের এই কুৎসিত সংস্কারবশতঃ, বাঙ্গালা ভাষা বিশেষতঃ [১৪] বাঙ্গালা কবিতার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় নাই। অতএব দত্তবাবু বাঙ্গালা ভাষালতা অবাধিতরূপে যে শাখাপল্লবিত হইয়াছে বলিয়াছিলেন, এ কথা যথার্থ হয় নাই। ফলে এজন্য ভারতচন্দ্র রায় যথার্থ কবি ছিলেন না, কৈলাসবাবুর সহিত আমরা এই সিদ্ধান্তে কখনই সম্মত হইতে পারি না। অপর এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় কাশীদাস কোন নূতন কাব্য রচনা করেন নাই যে, শাস্ত্র-সম্মত ইতিহাস ব্যতীত অন্য কোন নূতন কাব্য রচনা করিলে কেহই তাহা গ্রাহ্য করিবেক না। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ব্যক্তি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, প্রায় কেহই তাহাতে স্ব স্ব সাময়িক দেশের অবস্থা অথবা দেশীয় লোকের নীতি রীতি প্রভৃতি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া যান নাই। ইহাও এক মহা ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবেক ; কিন্তু সেই ক্ষোভ কথঞ্চিদ্রূপে কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠ করিলে নিবৃত্তি পায় ; অন্যূন দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে আমারদিগের দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে। [১৫] কবিকঙ্কণ প্রকৃত কবির অনেক গুণে মণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ তদ্গ্রন্থে নানা প্রকার অবস্থার মনুষ্যদিগের আন্তরিক ভাব এবং ভাষা অতি কৌশলে রক্ষিত তথা পরিপাটীরূপে বিভিন্ন প্রকার রস সকল বিকশিত হইয়াছে। আমরা গৌড়ীয় কবিতার প্রথমাবস্থার এইরূপ সংক্ষেপ বিবরণ সমাপন করিয়া তৎপরের

অবস্থা বিষয়ে কিঞ্চিদ্বাহুল্য উল্লেখ করিতেছি, অতএব শ্রোতৃবর্গের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যে সময়ে বর্গির হঙ্গামা, যে সময়ে ইংরাজের বিক্রম বৃদ্ধি, এবং যে সময়ে মুসলমানের ছত্রভঙ্গ, সেই সময়ে ক্ষুদ্র এক তটিনাতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র এক নগরীর ক্ষুদ্র এক রাজার সভা মনে করুন, সেই রাজা একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন না, একজন স্বাধীন রাজার ভৃত্যানুভৃত্য; সেই রাজার ধীরতার চিহ্নের মধ্যে এই মাত্র ছিল যে, তিনি "কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" এই প্রসিদ্ধ কথার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। অতএব স্বীয় সভাসং এবং আশ্রিত ভারতচন্দ্র রায়কে গুণাকর উপাধি পুরস্কার করিয়া [১৬] কবিতা কলা কলনে অনুমতি প্রদান করাতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্র রায় স্বয়ং জনেক ভাগ্যধর ব্রাহ্মণের বংশধর ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে সেই দেশে অত্যন্ত অরাজকতা বিধায় স্বীয় সম্পদ্ পরিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং এই জন্যই রায় গুণাকর কবিতার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিস্তর স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্তাবকতার কারণ দেদীপ্যমানই রহিয়াছে। যেখানে লাটীন কবি অবিড্ মহাত্মা স্বীয় প্রভু কর্ত্তৃক দ্বীপান্তরিত হইয়াও তোষামোদ করিতে ত্রুটি করেন নাই, সেখানে ভারতচন্দ্র "অন্নেন পুরুষো দাসঃ" ইতি নীতিবাক্যের মর্ম্ম রক্ষা করিবেন, ইহাতে দোষ কি? ভারতচন্দ্রের কবিতায় অসাধারণ কবিতাশক্তি আছে, একথা আশু অগ্রাহ্য হইবেক; সত্য বটে, ভারতচন্দ্র কোন মহাকবির ন্যায় উচ্চতর ভাব সকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু মহৎ ২ ভাব প্রকটন করণের উপযোগিতা সকল আবশ্যক রাখে। যে জাতি পরাধীনতা শৃঙ্খলে [১৭] চিরদিন জন্য বদ্ধ, যে জাতি আহার বিহার বার্ত্তা সভ্যতার উচ্চাভিপ্রেত সকল সিদ্ধিকরণে অজ্ঞাত, যে জাতি জন্মভূমিকে গরীয়সী মানিয়া কূপমণ্ডুকবৎ অবরুদ্ধ আছে, তাহার-দিগের মনোমধ্যে উচ্চতর ভাবোদয় হওনের বিষয় কি? সুতরাং দৈবশক্তি সত্তে তাহারদিগের চিত্তবৃত্তিসকল গিরিগহ্বরস্থ হীরকের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। সত্যবটে ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় নির্লজ্জতা-প্রতিপাদক আদিরস বর্ণনার আধিক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে দোষ ভারতচন্দ্রের নহে। যেখানে তিক্তরসাস্বাদনে লোকের অভিরুচি, সেখানে মিষ্টরসের মধুরত্ব অনুভূত না হওয়াতে তাহা আদৃত হয় না। যে জাতি গরিমামদোন্মত্ত, ধরাস্থিত সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদিগকে উন্নত করিতে ইচ্ছা রাখেন, তাঁহারাই ভয়ানক রস ও রৌদ্ররস প্রভৃতিকে প্রিয় করিয়া থাকেন, সত্য কথা কহিতে বাধা কি? ইংরাজী নাটকে বর্ণিত ওথেলো কর্ত্তৃক যে সময়ে নিরপরাধিনী ডেস্‌ডিমোনা নিহতা হয়েন, নাট্যশালায় সেই ব্যাপার [১৮] দর্শনে অথবা পুস্তকে পাঠ করণে একজন প্রকৃত বাঙ্গালির সহসা সাহস হয় না। সুতরাং শেক্সপিয়রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক ওথেলো ও হামলেট অপেক্ষা তাহার নিকট তদীয় অন্যান্য রঙ্গিল নাটক নাটিকা অধিকতর আদর প্রাপ্ত হয়, বাঙ্গালা কবিতা দূরে থাকুক, সংস্কৃত-নাটক শ্রেণীর মধ্যে যদ্যপিও স্থানে ২ করুণারস দীপ্তিমান্ আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজীতে যাহাকে "ট্রেজডি" কহে, তাহা সার উইলিয়ম জোন্স হইতে ডাক্তর ব্যালেন্টিন পর্য্যন্ত সংস্কৃত বিদ্যান্বেষী মহাশয়েরা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তবেই বলিতে হইল, কামকলাকলিতা কবিতা রচনা করাতে ভারতচন্দ্রের কিছুই দোষ নাই। দেশীয় লোকের প্রবৃত্তি এবং কবি যে অবস্থায় অবস্থিত থাকেন, অর্থাৎ যে সকল ভাব তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর এবং হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। রোমীয় সম্রাটের সভাতে টেরেন্স নামক কবির নির্লজ্জ নাটক সকল যে

সময়ে প্রদর্শিত হইত, সে সময়ে তত্তাবৎ ঘৃণাকর বোধ হইত না, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, [১৯] অদ্যাপি সুসভ্য ইংলণ্ডীয়দিগের ওয়েষ্ট মিনিষ্টর ডরমিটরি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সে সকল নাটক সম্ভ্রান্ত সমাজে দেখাইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এই ক্ষণে আমরা যাহাকে নির্লজ্জতা বলিয়া ঘৃণা করি, একসময়ে তাহাতে কিছুই দূষ্য ছিল না। যে সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকেরা উত্তমাবস্থায় ছিলেন, সেই সময়ে কথিত নির্লজ্জতা সকল বিশেষ দোষাবহ ছিল, সেই সময়ের মহাকবিগণ কহিয়া গিয়াছেন, রসের মূর্ত্তি বর্ণনা করিবেক না, এবং তাহাতে পাতক সঞ্চয় হয় বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, রসের মূর্ত্তি বর্ণন এই যে, যখন যে রস বর্ণনা করিবেক, তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অনাবৃত করণ, ইহা কখনই কর্ত্তব্য নহে, বিবসমা অঙ্গনা নয়নের প্রীতিকরী না হইয়া বরং বীভৎস রসে দর্শকদিগকে অভিভূত করিতে থাকেন, কিন্তু যে দেশের মনুষ্য উলঙ্গ, সে দেশের সকলই উলঙ্গ, অতএব আগে ডাক্তর চক্রবর্ত্তী সাহেবের পরামর্শ লইয়া তাঁহার ন্যায় এতদ্দেশীয় লোকেরা জাকেট পাণ্টালুন পরিধান করুন [২০] তাহা হইলে কাযে কাযেই আমাদিগের কবিতা সতী বিলাতীয়া বরাঙ্গনাদিগের ন্যায় সভ্যতার পেটিকোট পরিবৃতা হইয়া লজ্জার ঘোমটায় চারু চন্দ্রানন আবৃত করিয়া পিগাসস্ নামক ইউরোপীয় তুরঙ্গোপবে আরোহণ করত মনুষ্যের চিত্তরূপ গড়ের মাঠে বায়ু সেবন করিতে যাইবেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু কহেন, বাঙ্গালা ভাষার কবিতা কবিতাই নহে, তাহা লজ্জাহীনতা এবং কুভাব নিকরের জননীস্বরূপা, সুতরাং তৎসহবাসে মানবপ্রকৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসী হইতে পারে, আরো কহেন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এমত জঘন্য এবং নির্লজ্জ যে, তাহার সহিত ইংরাজদিগের ফেনী হিল নামক অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থ (যাহার নামোল্লেখ করিলে ব্রীড়ানম্রমুখ হওয়া যায়) সেই গ্রন্থের যথার্থ তুলনা হইতে পারে ইত্যাদি। কৈলাস বাবু হিন্দু কুলস্ত্রীদিগের চিত্তসংশোধনের বিশেষ প্রতিষেধক বিদ্যাসুন্দরকে চিতানলে সমর্পণ করিতে চাহেন, অর্থাৎ আর যেন তাহারদিগের রঙ্গরস দেখিয়া কুলকামিনী-কুল কুভাব জালে জড়িত না হয়, কিন্তু প্রিয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি, যদ্যপি ইংরাজী [২১] নিয়মে আমারদিগের কুলজাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে চাহেন, তবে যাহার সহিত অভাগা বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি দগ্ধ করিয়া শেষ করিবার কি উপায় দেখিতেছেন? বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার সংযুক্ত প্রজাপ্রভুত্ব রাজ্য নহে যে, তদধীন রাজ্যে এবম্প্রকার গ্রন্থসকল প্রকাশ করিলে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয়, অপিচ যে কুৎসিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে কৈলাস বাবু সলজ্জিত হইয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি কোন্ ভদ্র সাহেব বিবির কেলীকুটিরে রক্ষিত না হয়? কিন্তু শ্রোতৃবর্গ, আপনারা এরূপ কদাচই বিবেচনা করিবেন না, আমি কথিত কদর্য্য উপন্যাসের সহিত বিদ্যা-সুন্দরের তুলনা করিতেছি, ফলতঃ বিদ্যাসুন্দরের সহিত নির্লজ্জতা বিষয়ে সমতুল্য হইতে পারে, ইংরাজীতে এমত অনেক গ্রন্থ আছে, বরং কোন ২ বিলাতী কবির কাছে "কবি" গাহনায় ভারতচন্দ্রও পরাজয় স্বীকার করিতে পারেন। তাঁহারদিগের কবিতা সতীদিগের বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, যথা,—

[২২] "Their * modest stole to garish looser weed,"
"Deckt with love-favours, their late
whoredom's meed.".

* Muses'

"While the pellucid spring of Pyrene
is converted into a poisonous and muddy puddle.—
...........whose infectious, straine,
Corrupteth all the lowly fruitful plain."

অস্য মর্ম্মার্থ

গিয়াছে লজ্জার বাস বেশ্যা বেশ ধরা।
লম্পটের পুরস্কার অলঙ্কার পরা। * ॥
তথাহি পারীণ নামক কবিতা উৎস নির্ম্মল জলশূন্য হইয়া বিষাক্ত কর্দ্দমময় হইয়াছে,
যার পূতিগন্ধ পীড়াকর ঘোরতর।
নিকটস্থ ফলপ্রদ ভূমি নষ্টকর ॥

আমরা যেমন রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়কে সর্ব্ববিষয়ে অতি সুসময় করিয়া মানি, ইংরাজেরাও সেইরূপ মহারাণী এলিজিবেথের সময়কে অতি শ্রেষ্ঠতর (২৩) সময় বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, কিন্তু কৈলাস বাবু সেই কৌমারব্রতপালিনী রাজ্ঞীর রাজ্যকালীন কবিদিগের কি পরিচয় গ্রহণ করেন নাই? ইংরাজেরা যত্রতত্র যে শেক্সপিয়রের জ্ঞাতি বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মানেন, সেই শেকস্‌পিয়রের বীনস্‌ এবং এডোনিস্‌ নামক কাব্য সহ তুলনায় বিদ্যাসুন্দরে কি অধিক নিকৃষ্টতা আছে? আমি লক্‌, হড্‌সন্‌, মার্লো এবং মার্সডন প্রভৃতি ইতর কবিদের কথা বলিতে চাহি না, তাহা হইলে প্রস্তাববাহুল্য হইবেক, বিলাতী কাব্যপর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়াবলম্বী শেক্সপিয়রের নির্লজ্জতার সহিত বাঙ্গালি কবিদিগের অগ্রগণ্য ভারতচন্দ্রের নির্লজ্জতার তুলনা করি, বিজ্ঞবর সভাপতি মহোদয় আমার এই নির্লজ্জতা জন্য ক্ষমা করিবেন, যেখানে আমি লজ্জাবিহীনা বাঙ্গালা কবিতার পক্ষ, সেখানে লজ্জাহীনতাই আমার পতাকা হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরে বর্ণিত নায়ক, নায়িকার স্থানে বিহার ভিক্ষা করিয়াছেন, বীনস্‌ এবং এডোনিস্‌ কাব্যে তদ্বিপরীতে নায়িকা, নায়কের স্থানে রতি প্রার্থনা করিয়াছেন; (২৪) বিদ্যাসুন্দরের কেলির সময় বিভাবরী, বীনস্‌ এবং এডোনিসের সম্ভোগকাল দিবস, বিদ্যাসুন্দরের নায়ক নায়িকার মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় সন্দৃষ্ট হয়; এডোনিসের প্রতি বীনসের তদ্বিপরীতে কেবল বিলাসলালসামাত্র, কৈলাস বাবু এইস্থলে ফ্রিমানের এপিগ্রাম্‌ অর্থাৎ সরস রহস্য কবিতার উক্তি লইয়া কহিতে পারেন, ...Venus and Adnois, true model of a most lascivious letcher.

অর্থাৎ বীনস্‌ এবং এডোনিস্‌ কাব্য ঘোরতর কামাতুর লম্পটের যথার্থ আদর্শ; কিন্তু ইংরাজদিগের মধ্যে কোন ভদ্রলোক অথবা কুলাঙ্গনা তাহা স্পর্শ করেন না, এ কথা কোন মতেই স্বীকার্য্য হইতে পারে না, তৎ প্রমাণ

"Making lewd Venus with eternal lines,
To tye Adonis to her love's designes."
Fine wit is shown there-in but finer were.

---

* কবিতা

[২৫] If not attired in such bawdy geere ;
But be as it will, the coyest dames.
In private read it for closet-games.

অস্যার্থ

এডোনিসে প্রেমডোরে করিতে বন্ধন।
কামাতুরা রতি সুখে কবিতা রচন॥
কত রস আছে তাতে, অন্ত তার নাই।
নহিলে কুট্টনীপণা, আরো হতো তাই॥
তথাপি সকল সতী অতি লজ্জাশীলা।
গোপনেতে পাঠ করে হেতু কামলীলা॥

সে যাহা হউক, আমরা এই স্থলে উভয় কবির নির্লজ্জতার কিঞ্চিৎ ২ তুলনা করি, যথা

সুন্দরের উক্তি

"সুন্দরীর করে ধরি, সুন্দর বিনয় করি,
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিনে দুপ্রহরে, দেখিলাম সরোবরে,
কমলিনী বাঁধিয়াছে করী।
[২৬] গিরি অধোমুখে কাঁদে, এ কথা কহিতে চাঁদে,
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী, ভূতলে পড়িল খসি,
খঞ্জন চকোর মিলে হাসে॥"

অস্য মর্ম্ম।

"রায় বলে আমি করী, তুমি কমলিনীশ্বরী
বাঁধহ মৃণাল ভুজ পাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভূমি, ফুল্ল কুমুদিনী তুমি,
উঠ মোর হৃদয় আকাশে॥
নয়ন-খঞ্জন মোর, নয়ন চকোর তোর,
দুহে মিলে হাসিবে এখনি।
ঘাম ছলে কুচগিরি, কাঁদিবেক ধীরি ধীরি,
করি দেখ বুঝিবে তখনি॥"

বীনসের উক্তি।

"Fondling," she saith, "since I have hemm'd thee here
[২৭] Within the circuit of this ivory pale,
I'll be a park, and thou shalt be my deer;
Feed where thou wilt, on mountain or in dale:
Graze on my lips; and if those hills be dry,
Stray lower, where the pleasant fountains lie.

"Within this limit is relief enough,
Sweet bottom-grass, and high delightful plain,
Round rising hillocks, brakes obscure and rough,
To shelter thee from tempest and from rain:
Then be my deer, since I am such a park;
No dog shall rouse thee, though a thousand bark."

অন্যার্থ।

[২৮] গজদন্ত সম, ভাতি অনুপম, দুই বাহু বেড়া প্রায়।
আদরে তোমারে, চারু মৃগাগারে, বদ্ধ করিয়াছি তায়॥
আমি মৃগালয়, তুমি রসময়, কুরঙ্গ স্বরূপ ধর।
শেখরে গহ্বরে, যথা ইচ্ছা করে, ওষ্ঠ গিরিপরে চর॥
যদি ওষ্ঠাধর, যুগ্ম গিরিবর, রসশূন্য হয় তায়।
তবে অনুরাগে, গেলে নিম্নভাগে, পাবে সুখ ফুহারায়॥
এই সীমা মাজ, ওহে রসরাজ, বিশ্রামের দ্রব্য ভান।
আছয়ে প্রচুর, তৃণ সুমধুর, সুখপ্রদ উচ্চ স্থান॥
উন্নত বর্ত্তুল, গিরি স্থূল স্থূল, জঙ্গল তিমিরাবৃত।
ধারা বরিষণে, ঝড় প্রবহনে, রবে তথা লুক্কায়িত॥
প্রিয় বাক্য ধর, হও মৃগবর, আমা সম মৃগাগারে।
সহস্র কুকুরে, যদি বা ফুকুরে, তব কি করিতে পারে॥

রসতৃষ্ণাতুর মত্ত মাতঙ্গবৎ সুন্দরের আকর্ষণে অবিকচ পঙ্কজিনী বিদ্যা কহিয়াছিলেন,

"ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
[২৯] নব যৌবন বিক্রম * যোগ্য নহে॥
রসলাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥

* মূল গ্রন্থে "জোরের" ইতি শব্দ আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দপতন দোষ হয় এই জন্য আমি "বিক্রম" শব্দ প্রয়োগ করিলাম।

ইউরোপীয়দিগের কাম দেবতার জননী প্রফুল্ল চির যৌবনবতী লীলারসবিহ্বলা বীনসের দ্বারা অজ্ঞাত যৌবন এডোনিস্ আলিঙ্গিত হইয়া কহিতেছেন, যথা।

"Who wears a garment shapeless and unfinish'd ?
Who plucks the bud before one leaf put forth ?
If springing things be any jot diminish'd,
[৩০] They wither in their prime, prove nothing worth :
The colt that's back'd and burden'd being young,
Loseth his pride, and never waxeth strong."

And Again,—

"No fisher but the ungrown fry forbears :
The mellow plum doth fall, the green sticks fast,
Or being early pluck'd is sour to the taste."

অস্যার্থ

অঙ্গহীন অপ্রস্তুত বস্ত্র কেবা পরে।
অস্ফুট কুসুম কলী কে চয়ন করে ॥
কোন দ্রব্য পায় যদি অঙ্কুরে আঘাত।
শুখায় কোমল কালে, আশায় ব্যাঘাত ॥
শিশুকালে অশ্ব যদি বহে গুরুভার।
বল বীর্য্যবান কভু নাহি হয় আর ॥

অন্যচ্চ

[৩১] শিশু মীন ধরে নাকো ধীবর সকলে।
পাকা কুল আপনি খসিয়া পড়ে তলে ॥
দৃঢ়রূপে লগ্ন ডালে অপক্ক বদরী।
আস্বাদনে অম্ল লাগে যদি ছিন্ন করি ॥

আমারদিগের অসভ্য কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন।

ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে ॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে ॥

ইংরাজদিগের সুসভ্য কবি শেক্সপিয়র কহিতেছেন।

What wax so frozen but dissolves with tempering,
And yields at last to every light impression ?
Things out of hope are compass'd oft with venturing,
[৩২] Chiefly in love, whose leave exceeds commission :

অস্যার্থ

কঠিন জমাট মোম গলালে গলিবে।
ছোঁবামাত্র তাই হবে যেরূপ গঠিবে ॥
অসাধ্য সাধন হয় করিলে সাহস।
বিশেষতঃ প্রেমে, যার বিদায়েতে রস ॥

এইক্ষণে ভারতচন্দ্রের একটি প্রভাতী এবং শেক্সপিয়রের একটি সাঁজাই গাইয়া এই নির্লজ্জতার প্রস্তাব সাঙ্গ করি, যথা।

বিদ্যাসুন্দরের প্রভাতী

আসি বলি বাসায় বিদায় হৈল রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায় ॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান ॥
ও নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখে কেমনে রব এ চারি প্রহর ॥
[৩৩] বিরহ দহন দাহে যদি রহে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখ সুধাপান ॥

বীনস্ এবং এডোনিসের সাঁজাই।

এডোনিসের উক্তি

"Look, the world's comforter, with weary gait,
His day's hot task hath ended in the west ;
The owl, night's herald, shrieks, 't is very late ;
The sheep are gone to fold, birds to their nest ;
The coal-black clouds that shadow heaven's light
Do summon us to part, and bid good night,"

অস্যার্থ

দেখ, জগতের সুখদাতা দিনপতি।
শ্রান্ত হয়ে পশ্চিমেতে করিতেছে গতি ॥
[৩৪] নিশাচর নিশাচর ডাকে, দিবা শেষ।
বিহঙ্গ বাসায় যায়, গোষ্ঠে ভেজে মেষ ॥
আকাশের আলো ঢাকে ঘনাসিত ঘন।
বিদায় হইতে তারা কহিছে বচন ॥

বীনসের উক্তি।

"Sweet boy", she says, "this night I'll waste in sorrow,
For my sick heart commands mine eyes to watch.
Tell me, Love's master, shall we meet to-morrow?
Say, shall we? Shall we? wilt thou make the match?"

অস্যার্থ।

প্রিয় কিশোর, এ যামিনী মোর, যাতনায় গত হবে।
রোগী মম মন, প্রহরী নয়ন, কাযেই জাগিয়ে রবে॥
বল প্রাণনাথ, হইলে প্রভাত, দেখা হবে পুনরায়।
হবে সন্দর্শন, সুখদ মিলন, কিম্বা যাবে মৃগয়ায়॥

এইক্ষণে আমি, আপনারদিগের সম্মুখে এক বাক্স [৩৫] রিয়েল লণ্ডন বেকেড্ সুইটমীট্ এবং এক খুঞ্চে আসল কৃষ্ণনগরের সরভাজা উপস্থিত করিলাম, আপনারদিগের অভিরুচি, যাঁহার যাহাতে ইচ্ছা, তিনি তাহাই গ্রহণ করুন, কিন্তু এই কথা যেন মনে থাকে; বিলাতী মেঠাই হজম করিতে ভাল কাষ্টিলিয়ন লাল জলের আবশ্যক, সরভাজা পাকে নির্ম্মল গড়িয়া নদীর এক পাত্র জলই যথেষ্ট হইবেক।

প্রিয় প্রতিযোগী যদ্যপি কহেন, ইংলণ্ডীয় কবিতা বৃদ্ধাকালে তপস্বিনী অর্থাৎ সদাচার-শালিনী হইয়াছেন। কিন্তু এ কথা সপ্রমাণ হইবার নহে; আমরা যেমন ব্যাস বাল্মীকির পর কালিদাসকে মহাকবি বলিয়া মানি, ইংরাজেরাও সেইরূপ শেক্সপিয়র মিল্টনের পর লার্ড বাইরনকে মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু লার্ড বাহাদুরের লিখিত ডন্ জুয়ান্ কাব্যের কিয়দংশ পাঠ করিলেই ইংরাজী কবিতার বিলক্ষণ সাধ্বীত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—কৈলাসবাবু কহিতে পারেন, ইংরাজী কবিতায় যেমন অধমতা আছে, তেমন উত্তমতাও সমধিক আছে, সত্যকথা, এ কথা লঙ্ঘন [৩৬] করিতে কে পারে? ফলে বাঙ্গালা কবিতায় অপকৃষ্টতা ব্যতীত উৎকৃষ্টতার অভাব বলিয়াই কি তাহা কোন কালে উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইবেক না? যদি বালুকানির্ম্মিত সেতু দ্বারা স্রোতস্বতীর স্রোতঃ রুদ্ধ হয়, যদি নবীন নিবিড় নীরদ কর্ত্তৃক দিনকরের খরতর কর প্রচ্ছন্ন হয়, যদি মনিময় পেটিকায় বদ্ধ বিধায় মৃগনাভীর মনোহর সৌরভ স্থগিত হয়; তবেই জানিব এবং মানিব, দৈবানুগ্রহরূপ কবিতাশক্তি পরাধীনতা শৃঙ্খলে জড়িতা হইয়া স্বীয় প্রভা প্রকাশে অক্ষম হইবেক।

বসুবাবু বিদ্যার রূপ বর্ণনের কিয়দংশ পাঠ ও তদনুবাদ করিয়া গত সভায় অতীব রহস্য রসোদ্দীপন করিয়াছিলেন, অতএব এইস্থলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদুল্লেখ করা কর্ত্তব্য। প্রতিযোগী অঙ্গহীনা বঙ্গভাষার যথার্থ ভঙ্গী অবগত আছেন কি না, সন্দেহস্থল। কিন্তু অনায়াসে বীরসিংহবালা বিদ্যা বিনোদিনীর রূপ বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ভয়ঙ্করী নিশাচরী ভাবিয়া থর থর কম্পিত কলেবর হইয়াছিলেন,—এই [৩৭] ক্ষণে উক্ত নিন্দিত বর্ণনার আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা "নব নাগরী নাগর মোহিনী। রূপ নিরুপম সোহিনী॥ শারদ পার্ব্বণ, শীধু ধরানন, পঙ্কজ কানন মোদিনী। কুঞ্জরগামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী, লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী॥ কোকিলনাদিনী

গীঃপরিবাদিনী, দ্বীপরিবাদবিধায়িনী। ভারতমানস, মানসসারস, রাসবিনোদবিনোদিনী ॥"—কৈলাসবাবু এই কতিপয় পংক্তির দোষ ধরিবেন, যদি ধরিতে পারেন, তবে আমি তদপেক্ষা ইংরাজ কবিদিগের অধিক দোষ দেখাইয়া দিব। অপিচ "বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।" বিপক্ষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, কেশের সহিত সর্পের তুলনা অতি ভয়ানক, তবেই বলিতে হইল, তিনি বেনী শব্দের অর্থাবগত নহেন, হিন্দু কামিনীগণ কালসর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়া থাকেন, প্রিয় সখা কি তাহা দেখেন নাই। অহো দেখিয়াছেন বই কি? তবে বুঝি ইংরাজী [৩৮] বিদ্যাপ্রভাবে তেঁহ খাট খাট রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন। "কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা ॥" কৈলাসবাবু এই অত্যুক্তি ধরিয়া বিস্তর উপহাস করিয়াছিলেন, এবং শেক্সপিয়রের রোমীয় নায়কের জুলিয়েট্ নায়িকার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তি বিধানকল্পে কহিয়াছিলেন, প্রেমিকের মুখে প্রিয়তমার রূপ বর্ননায় অত্যুক্তি প্রয়োগ দোষাবহ না হইয়া গুনভাজন হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মহাকবি স্বীয় উক্তিতে লুক্রিশিয়ার পয়োধরের সহিত দন্তিদন্ত নির্ম্মিত যুগল ভূগোলের তুলনা করিয়া যদ্যপি নিস্তার পান, তবে অভাগা ভারতচন্দ্র কি জন্য এত গালাগালি খান? প্রেমিকের মুখে অত্যুক্তি রসদায়িকা বটে, কিন্তু নায়ক নায়িকাদিগের সহায়স্বরূপা দূতীর মুখে তদুভয়ের রূপ গুন বর্ণনায় অত্যুক্তি প্রয়োগ কোন মতেই অসঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, ধরাস্থিত বিবিধ জাতির রূপানুভাবকতা শক্তি বিভিন্ন প্রকার, ভারতবর্ষে কটা চক্ষু, কটা কেশ এবং বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ নিন্দনীয়, কিন্তু [৩৯] ইউরোপীয়দিগের নিকট তত্তাবৎ আদরণীয়, চীনদেশীয় লোকেরা অঙ্গুলের ন্যায় পদ এবং কুঁচের ন্যায় চক্ষু সুদৃশ্য জ্ঞান করে বলিয়া তাহারদিগের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি অপকৃষ্টতর বলা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বায়বেলের কবিত্ব অতি সুন্দর অলঙ্কার এবং যথার্থ মানসিক ভাবসমন্বিত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু তদ্গ্রন্থের উপমা সকল অধিকাংশই আমারদিগের নিকটে অতি জঘন্যতর বোধ হয়। সলোমন অর্থাৎ যাহাকে মুসলমানেরা সুলেমান কহে, সেই মহাপুরুষের টপ্পা গীতাবলী যাহাকে খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর পরস্পর প্রেম প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করেন, ফলে চোর কবি-রচিত পঞ্চাশৎ শ্লোকের মধ্যে যেরূপ দ্ব্যর্থ অর্থাৎ একার্থ কালী পক্ষে, অন্যার্থ বিদ্যা পক্ষে হয়, সুলেমানের টপ্পাতে তদ্রূপ দ্ব্যর্থ অন্বেষণ করা ব্যর্থ, এবং যদিও কোন২ স্থলে তাহা ঘটাইতে পারা যায়, তাহা কষ্টকল্পনা মাত্র; ইংরাজী উদ্ধৃত করা বাহুল্য হয়, এজন্য আমি বাঙ্গলা অনুবাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ [৪০] করিলাম, শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করুন, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে কিরূপ কবিতাশক্তি মূর্ত্তিমতী আছেন, যথা।—

"হে আমার প্রিয়ে, তুমি সুন্দরী ও তুমি পরম সুন্দরী, ঘোমটার মধ্যে তোমার চক্ষু কপোতের চক্ষুর ন্যায়, এবং গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ। এবং যে ২ মেষী পুষ্করিণী হইতে ধৌতা হইয়া আগতা ও যমজবৎস বিশিষ্টা হয় এবং যাহাদের মধ্যে একও বন্ধ্যা নাই, এমত ছিন্নলোম মেষপালের ন্যায় তোমার দন্ত, এবং সিন্দুরবর্ণ সূত্রের ন্যায় তোমার ওষ্ঠাধর, ও তোমার বাক্য অতি মনোহর, ও তোমার ঘোমটার মধ্যস্থিত গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়; এবং অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্ম্মিত এক সহস্র বলবানের ঢালবিশিষ্ট দায়ুদের দুর্গের ন্যায় তোমার গলদেশ। এবং শোশন্ পুষ্পের মধ্যে ভক্ষণকারী মৃগের দুই যমজ বৎসের ন্যায় তোমার দুই স্তন।.........

"হে রাজকন্যে, তোমার চরণপাদুকাদ্বারা কিবা শোভা [৪১] পাইতেছে! তোমার

কটিমণ্ডল নিপুণ কর্ম্মকার দ্বারা নির্ম্মিত মণিময় হার স্বরূপ। এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোল পাত্রের ন্যায়, এবং তোমার উদর শোশন্ পুষ্পবেষ্টিত গোধূমরাশির ন্যায়। এবং তোমার স্তনদ্বয় যুগলহরিণবৎসের ন্যায়। এবং তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার চক্ষু বৈৎরব্বীমের দ্বারের নিকটস্থ হিশ্‌বোণের সরোবরের ন্যায়। এবং তোমার নাসিকা দম্মেষকের সম্মুখস্থ লিবানোনের উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার মস্তক কম্মিল্ পর্বতের ন্যায়, ও তোমার মস্তকের বেণী বাগুণীয়া রঙ্গের কেশবন্ধনীর ন্যায়। তোমার কেশ-বেশেতে রাজা বদ্ধ আছে।"

"হে প্রিয়ে, তুমি প্রেমদ্বারা সন্তোষ দিবার জন্যে কেমন সুন্দরী ও মনোহারিনী! তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায়, ও তোমার স্তন তাহার ফলস্বরূপ। আমি কহিলাম, আমি তাল বৃক্ষে আরোহণ করিব ও তাহার বাগুড়া ধরিব; এখন তোমার স্তন দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ ও তোমার নাসিকার গন্ধ তপুহ [৪২] ফলের ন্যায়। যে উত্তম দ্রাক্ষারস পান করা প্রিয়ের সুখদায়ক হয় ও তন্দ্রাযুক্ত লোককে কথা কহায়, তাহার ন্যায় তোমার কথা"—এই পর্য্যন্তই ভাল আর কায নাই।

অনেকে কহেন, রায়গুণাকর অনেক স্থানে ভাব চুরি করিয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন ২ জাতীয় আদি কবিগণ ব্যতীত এই দোষ কোন কবিতে দৃশ্যমান না হয়, মহাকবি বারজিলের এবং মিণ্টনের কি এই দোষ নাই? ভারতচন্দ্র রায় মূর্খ কবি ছিলেন না, তিনি আপনিই স্থানে স্থানে পরিচয় দিয়াছেন, সংস্কৃত এবং পারস্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ফলতঃ সামান্য ধনচোরদিগের ন্যায় ভাবচোর-দিগেরও সতর্কতা এবং কৌশলের আবশ্যকতা আছে, অপিচ এমত সকল প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, মূল অপেক্ষা অনুবাদে অধিকতর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের প্রাবল্য হইয়াছে, অন্যে পরে কা কথা, ভারতচন্দ্র রায় কাশীদাসের মহাভারত হইতেও অনেক ললিত পদাবলী অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমি ভারত [৪০] চন্দ্রের দোষের কথাই কহিয়া যাইতেছি, কিন্তু তিনি যে প্রকৃত দৈবশক্তিমান্ কবি ছিলেন, তৎপ্রমাণে আমরা কিঁছুই কহিলাম না, অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে, যথার্থ কবির চিহ্ন যথার্থ বর্ণন অর্থাৎ কবি যে বিষয়ে বর্ণনা করিবেন, সে বিষয়ে পাঠ করিতে ২ বোধ হইবেক, যেন তাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে, "Thoughts that breathe and words that burn." ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় শ্বাস প্রবেশ এবং ভাবজালে অনল প্রভবন হইয়াছে কিনা, তাহা রতি বিলাপ এবং বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক, আমারদিগের ইয়ং বেঙ্গাল বাবুরা যদি বিলাতীয় বিজাতীয়কুসংস্কার এবং দ্বেষ মৎসরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করেন, তবে তত্তাবতে লার্ড বাইরণের ন্যায় প্রখর ভাবসমূহ দেখিতে পাইবেন। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ের প্রচলিত দেশাচার প্রভৃতি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়াগিয়াছেন, তাঁহার [৪৪] কাব্য সকলের বয়ঃক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অস্মদ্দেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মনে করিলে নয়নপথে অশ্রুধারার শেষ হয় না! ভারতের শব্দ সৌন্দর্য্য ভাবের মাধুর্য্য এবং রসের প্রাচুর্য্য ও প্রাথর্য্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্য পংক্তি পাঠকালীন বোধ হয়, যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে, রায় গুণাকর বাঙ্গালা ছন্দে সন্তুষ্ট না হইয়া স্থানে ২ ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূনক, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ ঋণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু অপার্য্যমানে স্থানে ২ ছন্দপতন দোষ হইয়াছে, সংস্কৃত ছন্দা-বলীর যদি অর্থাৎ বর্ণের লঘুত্ব গুরুত্ব রাখিয়া অন্য ভাষায় কবিতা রচনা করা অতি কঠিন কর্ম্ম,—

ভারতচন্দ্রের বিষয়ে এতন্মাত্র উক্তি করিয়া অন্যান্য কবিদিগের প্রতি কিয়দুক্তি করিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি।

উল্লেখিত প্রসিদ্ধ ২ বাঙ্গালি কবি ব্যতীত বাঙ্গালা [৪৫] দেশে শতাবধি ব্যক্তি কবিত্ব-প্রকাশে চেষ্টা করিয়াছেন, এতোন্মধ্যে রামপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, রামচন্দ্র, রামেশ্বর, এবং দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রাজা রামমোহন রায়, নিধুবাবু, রামবসু ও রাধামোহন সেন, তথা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুরাগ পাইয়াছেন, রামপ্রসাদ প্রকৃত কবির অনেক চিহ্ন দর্শাইয়াছেন, তৎকৃত গীতাবলীতে পৌত্তলিক তান্ত্রিক কল্পনা সকল কল্পিত হইয়াছে, তথাপি তাহা কবিত্বশূন্য নহে, যেহেতু কল্পনাই কবিতার জীবনরূপ হইয়াছে, তন্ত্রের কোন ২ কল্পনা সুচারুতর রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে, বিশেষতঃ রামপ্রসাদী পদের স্থানে ২ এরূপ বলবতী ভাষায় মনের কথা সকল কথিত হইয়াছে, কোথায় এ প্রকার সদুপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহার দৈবশক্তির প্রতি কোন সন্দেহই থাকে না। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর যদিও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় সুন্দরতর না হউক, ফলতঃ পঠনীয় বটে, তদ্ব্যতীত কালীকীর্ত্তনে তিনি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী কবিতারসের তরঙ্গিনী বটেন, কিন্তু সে [৪৬] তরঙ্গিনী সুরতরঙ্গিনীর ন্যায় প্রবলা না হইয়া ক্ষুদ্র এক নির্ঝরপ্রভূতা সুনির্ম্মল জলধারিণী কুলু ২ শব্দকারিণী কল্লোলিনীর ন্যায় প্রবাহিত আছে; রামচন্দ্র এবং রামেশ্বরের কবিতা তেজস্বী জাঙ্গল লতার ন্যায়। দেওয়ান রঘুনাথ রায় অর্থাৎ যিনি অকিঞ্চন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার গীতাবলীর মধ্যে কোন ২ গীত এরূপ অনুতাপ ভাবোদ্দীপক এবং ঔদাস্যজনক যে, কালী এবং তারা শব্দের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্ট কিম্বা খোদা শব্দ প্রয়োগ করিয়া খ্রীষ্টানেরা ও মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে গান করিতে পারেন। দেওয়ান মহাশয় স্বয়ং গায়ক এবং গীতশাস্ত্রে পরিপক্ক ছিলেন, সুতরাং স্বরানুমেলকতাগুণে সুনপুন ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কৃত কতিপয় পরমার্থ-সংগীতে কবিত্বলক্ষণ ঈক্ষণ করা যায়, রাজা মহাত্মা কবিতার প্রতি মনোযোগ করিলে বাঙ্গালা ভাষার অনেক গণ্য কবি হইতেন, কিন্তু তিনি পদ্যলেখক হইলে আমরা তাঁহার নিকটে যে উপকার প্রাপ্ত হইতাম, তিনি গৌড়ীয় ভাষার আদি গদ্যলেখক এবং স্বদেশীয় লোকের চরিত্র-সংশোধক হওয়াতে আমরা তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার প্রাপ্ত [৪৭] হইয়াছি। রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবুর প্রেমরসের সংগীত সকল অধিকাংশই অপদস্থভাবে সংকলিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যাকরণ দোষও আছে, কিন্তু কোন ২ টপ্পা এরূপ সুভাবপূর্ণ যে, তাহাতে বিশেষ কবিত্ব প্রকাশও পাইয়াছে, নিধুবাবুর ভাষা সহজ প্রকার হওয়াতে তিনি অধিকাংশ লোকের প্রিয় হইয়া-ছিলেন, কিন্তু বিদ্যা দেবী প্রকীর্ণ প্রভায় উদিতা হইলে তাঁহার আদর সমভাবে থাকা কঠিন হইয়া উঠিবেক; রামবসুর বিরহ কবিতায় এরূপ সুরস আছে যে, অনবরত শ্রবণপথে তাহা পান করিলেও তৃষা কৃশা হয় না। রাধামোহন সেন সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতা অথবা গীতে ছন্দ অলংকার অথবা ব্যাকরণের দোষ দৃষ্ট হয় না, তাঁহার সঙ্গীত সকল অধিকাংশই সংস্কৃত শ্লোক বা কবিতার অনুবাদ মাত্র। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবুবিলাস বিবিবিলাস দূতীবিলাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার লেখাও প্রাচীন হইয়া পড়িল, [৪৮] যেহেতু তাঁহার জীবদ্দশাতেই কলিকাতার ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, ধর্ম্মসভার গঙ্গালাভ হইয়াছে। সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পথ পরিমুক্ত হইয়া আসিতেছে, এইক্ষণে আর গোবর ভক্ষণ, হুঁকা বারণ, বিষ্ণু স্মরণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের প্রথা প্রসিদ্ধ নহে, হিন্দু সন্তানগণ এবং স্বধর্ম্মত্যাগী খ্রীষ্টানেরা একাসনে

উপবেশনপূর্ব্বক দেশের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় বিবেচনা করিতেছেন; অতএব কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! এরূপ কাহার মনে ছিল যে, কলিকাতার স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বান লোকেরা একত্রে বসিয়া বাঙ্গলা কবিতার বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন? অতএব হে সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারাআর কালবিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গলা কবিতা-হার যাহাতে সভ্যকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্ব্বরা আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহসলিল সেচন করুন, পরিশ্রমরূপ হল চালনা করুন, [৪৯] দ্বেষ প্রভৃতি জাঙ্গল কণ্টক-বৃক্ষ উৎপাটন করুন, তবে ত্বরায় সুশস্য-লাভ হইবেক, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনারাদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুলবৃক্ষে আম্রমুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ইংরাজী কবিতা অথবা ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙ্গলা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়, যদি বলেন—বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে সকল ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই? উত্তর—হইয়াছে, হইবেক না কেন, অশ্বতর শব্দের অগ্রে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরাজী কবিতা রচনা কল্পে যেরূপ আয়াস, যেরূপ পরিশ্রম এবং যেরূপ আবুঞ্চনের দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদ্যপি সেইরূপ আয়াস, সেইরূপ পরিশ্রম এবং সেইরূপ আবুঞ্চন অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্ত্তী হইতেন, তবে তাঁহারা গণ্যমান্য বাঙ্গালী কবি হইতে পারি [৫০] তেন, এবং তাহা হইলে কত বড় আস্পর্দ্ধার বিষয় হইত? অদ্যতনী সভায় আমার এই এক পরম ক্ষোভের বিষয় যে, প্রতিযোগীদিগের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রস্তাব বাহুল্য হইল, অতএব বাঙ্গালা কবিতার স্বরূপ বর্ণনা এবং ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে কোন উক্তি করিতে পারিলাম না, পুস্তকান্তরে এই ক্ষোভ নিবারণ করণের ইচ্ছা আছে। বাবু নবীনচন্দ্র পালিত গত সভায় বর্ত্তমান বাঙ্গালী কবিদিগের বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমার অধিক বক্তব্য নাই, যেহেতু যথার্থ কথা কহিলে বন্ধুবিচ্ছেদ হওনের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলিব, মনুষ্য বড় বিদ্বান হইলেই যদ্যপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপীয়র অপেক্ষা বেন্ জন্সন এবং কালিদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন; পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্যশাস্ত্রের পয়োধিবিশেষ এবং প্রকৃত কবির অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অস্মদ্ ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিত্বশক্তি ধারণ করেন, [৫১] বোধ করি ঈশ্বর বাবু বিদ্যা বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হইলে নবীন বাবু তাঁহাকেই অগ্রগণ্য করিতেন। অক্ষয় বাবুর কাব্যগ্রন্থ আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, তেঁহ উক্ত কাব্যের জনকত্ব স্বীকারে অধুনা লজ্জিত হয়েন।

আমরা অদ্য যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, সেই মহাত্মা বাঙ্গালা কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎমাস পূর্ব্বে এ অকিঞ্চনের প্রতি এবং অন্য এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ স্বতন্ত্র২ রূপে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এইক্ষণে কে আমারদিগকে উৎসাহ দিবেক? অতএব যে মহাশয় বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, সেই মহাত্মা জন, এলিয়েট, ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন ঈশ্বর সমীপে অনন্ত নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করুন, এবং তাঁহার নাম ঘোষক, তাহার মত পোষক, সজ্জনমনস্তোষক এই বীটন সমাজ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকুক, ইহাই আমারদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

উৎকল বর্ণন

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষে বিদ্যা-জ্যোতির পুনরুদ্দীপন হওনাবধি বহুতর প্রদেশের পূর্ব্বতন বা আধুনিক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে; বহু দূরস্থ ভারতবর্ষীয় জনপদ সকল ক্রমশঃ সদ্ভাব-সূত্রে গ্রথিত হইতেছে এবং পূর্ব্বতন অনেকানেক অপরিচিত স্থান এই ক্ষণে চিরপরিচিতের ন্যায় অনুভূত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানীর অদূরবর্ত্তী উৎকল দেশের আনুপূর্ব্বিক কোন বৃত্তান্ত অদ্যাপি সংগৃহীত হয় নাই। উৎকল দেশীয় লোক-দিগকে আমরা হটেণ্টটবৎ বিদেশীয় বা বিজাতীয় জ্ঞান করিয়া থাকি, অথচ ইহাদিগের সহিত আমাদিগের প্রকৃতি বা দেহগত তাদৃশ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত আর্য জাতির যে সকল শাখা ভারতবর্ষ মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে, উৎকল দেশীয়েরা তাহারই এক শাখা। দেশকাল পাত্র প্রভৃতি বিভেদ অনুসারে প্রকৃতির কিয়ৎ কিয়ৎ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে; এক বৃক্ষের একদিগের শাখাস্থ ফলনিকর সূর্য্য রশ্মিতে অধিকতর আরক্তিমা লাভ করে, অন্যদিগের ফলচয় পীত বা হরিত দশায় পরিণত হয়, কিন্তু তত্তাবতই একবৃক্ষের ফল। শূরসেন প্রদেশীয়, সারস্বত প্রদেশীয়, কান্যকুব্জ প্রদেশীয় মগধ প্রদেশীয় এবং বঙ্গ তথা উৎকল প্রদেশীয় হিন্দুদিগের মধ্যে আচার ব্যবহার ভাষা-শরীর এবং প্রকৃতির যে কিছু উৎকর্ষাপকর্ষ থাকুক, তাহারা সকলেই এক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ফল পুষ্পাদি স্বরূপ মাত্র। সত্য বটে, এরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইতে পারে যে আর্য শাখা সমূহের সহিত ভারতবর্ষীয় আদিম জাতিদিগের কিয়ৎ সংমিশ্রণ হইয়াছে; বোধ হয় নিঃসঙ্কর আর্য নামের অভিমান করিতে পারেন, ভারতবর্ষে এমত কোন লোকই বর্ত্তমান নাই; অনুলোম স্থলে পিতৃ-লক্ষণের প্রচুরতা দেদীপ্যমান হয়, এই জন্যই অদ্যাপি ভারতবর্ষীয় নানা দেশীয় লোকের অঙ্গভঙ্গী এবং ভাষা প্রভৃতিতে আর্যলক্ষনের বহুলতা লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু উৎকল দেশীয় মনুষ্যে তল্লক্ষণের প্রাচুর্য্য নাই বলিয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় আদিম জাতিদিগের ন্যায় জ্ঞান করা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উপযুক্ত নহে; এরূপ অপ্রাচুর্য্যের কারণ আছে।

আর্যজাতির স্বভাবই এই যে তাঁহারা যখন যে দেশে গমন করিয়া থাকেন তখন তদ্দেশের উত্তমাংশেই নিবাস স্থাপন করেন। বংশ বাহুল্য হইয়া উঠিলে সুতরাং উত্তমাংশে আর স্থান হয় না; তখন তদিবর অংশে যাইয়া নিবাস করিতেই হয়। তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত এই নিয়ম সমাশ্রয় করিয়া ছিলেন, এই ভারতবর্ষের উত্তমাংশ অর্থাৎ উত্তর এবং মধ্যখণ্ডের কিয়দ্ভাগ আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হয়। সে সময় বঙ্গ এবং উৎকল প্রভৃতি দেশ ম্লেচ্ছভূমি মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকলস্থান বহুকাল পর্য্যন্ত অসভ্য আদিম জাতিতে পরিপূর্ণ বিধায় অদ্যাপি তত্তৎ প্রদেশীয় লোকেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় হিন্দুদিগের অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং সাহস ও সাধুতা প্রভৃতি আর্যজাতির প্রধান প্রধান লক্ষণাভরণে ভূষিত হইতে পারে নাই। যেরূপ হিমাচল প্রদেশেই কস্তূরিকা এবং কুঙ্কুম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের অতিশয়তা লাভ করে, কিন্তু প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে তাপিত দেশে ম্রিয়মাণ হইয়া যায়, সেইরূপ সুশীতল আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের মধ্য দেশে আগমন করণানন্তর বাস করাতে আর্য্যজাতির প্রতিভার যথাবৎ অপচয়

থাকিবেক; পশ্চাৎ তদপেক্ষা অপকৃষ্ট প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গ বা উৎকল দেশে তাঁহাদিগের বংশধরেরা যে সমধিক নিষ্প্রভ হইবেক তাহা আশ্চর্য্য নহে।

আমরা উৎকল দেশের লঘিমা উল্লেখ করিতেছি, কিন্তু পুরাণ, উপপুরাণাদিতে তাহার গরিমা ব্যাখ্যার অবশেষ নাই। উৎকলশব্দের প্রকৃত, ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা দুরূহ। কটক নিবাসী কতিপয় পণ্ডিত এরূপ অর্থ করিয়াছিলেন, যে কলিকালে প্রধানস্থান রূপে গণনীয় বিধায় ওড্রদেশের উৎকলসংজ্ঞা হইয়াছে। পরন্তু উৎকল শব্দের অর্থান্তর "ব্যাধ" এবং 'ভারবাহক'। যদিও ওড্রদেশীয় লোকদিগের আদিম এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এতদর্থ সুপ্রযুজ্য হউক, ফলতঃ ইহা গৌণার্থ মাত্র। উৎকলীয় লোকের অবস্থার প্রতিই এরূপ অর্থসঙ্গতি হইয়া থাকিবেক, উৎকল শব্দের তাহা প্রকৃত ব্যুৎপত্তি হইতে পারে না। অপিতু "কল" শব্দে মধুবাস্ফুট ধ্বনি, কিন্তু তাহার সহিত উৎকলশব্দের কোন সম্বন্ধ আছে এমত বোধ্য নহে, যেহেতু ভারতবর্ষীয় যাবতীয় লোকের মধ্যে উড়িষ্যা দেশীয়েরা কর্কশ বাদে কোন-রূপেই হীনকল্প নহে। বস্তুগত্যা উৎকল শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপন করা দুষ্কর। এক 'কল' ধাতুর অশেষ বিধ অর্থ হইয়া থাকে। শাব্দিকেরা এই ধাতুকে কামধেনুর সহিত তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু কপিল-সংহিতায় ভরদ্বাজ মুনি এই দেশের যেরূপ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উৎকলশব্দে প্রতিভাম্বিত অর্থ সমন্বয় হইতে পারে। উক্ত ঋষি শিষ্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহেন, "পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশ ভারত খণ্ড এবং ভারত খণ্ডের মধ্যে উৎকল প্রদেশই সর্ব্বোপরি গরিমাস্পদ। ইহার নিখিল পরিসর এক নিরবচ্ছিন্ন তীর্থ বিশেষ। এই দেশীয় মনুষ্যেরা নিঃসংশয়ে দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়। প্রত্যুত যে সকল অন্য দেশীয় মনুষ্যেরা ইহা দর্শনার্থ গমন করত এই দেশের পুণ্য পয়স্বিনী পুঞ্জে স্নানাবগাহন করে, তাহারা পর্ব্বত প্রমাণ পাপরাশি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। উৎকল খণ্ডের পুণ্যতীর্থ দেবমণ্ডপ, ক্ষেত্র সৌরভান্বিত কুসুম এবং অমৃতময় ফল, তথা তদ্দেশে যাত্রা করণের অশেষবিধ পুণ্য প্রভৃতি যথাবৎ বর্ণনে কাহার সাধ্য হইবেক? যে দেশে দেবতাগণ অবস্থান পূর্ব্বক আনন্দিত হন, সে দেশের গুণানুবাদে বাক্য বাহুল্য করণের প্রয়োজন বিরহ।

এইরূপ উৎকল দেশের প্রশংসাবাদে পুরাণ-উপপুরাণাদিতে যদিও অত্যুক্তির পরিসীমা না থাকুক, তথাপি বস্তুতঃ বাঙ্গালাদেশের তীর্থযাত্রী যাঁহারা সহস্র সহস্র দলবদ্ধ হইয়া বর্ষে বর্ষে জগন্নাথ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন বা যাঁহারা রাজকার্য্য বা অপর অনুরোধে উড়িষ্যা দেশে বসতি করেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে উক্ত দেশ সাধারণতঃ দরিদ্র, তাহার ভূমি অধিকাংশই বন্ধ্যাবৎ উষর ও ফল পুষ্পাদি নিকৃষ্টকল্প; এবং উৎকল দেশীয় লোকেরা ভারত বর্ষীয় অন্যান্য প্রদেশীয় মনুষ্যাপেক্ষা শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক তথা ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে নিতান্ত হীনতর। মুনিদিগের এরূপ প্রশংসাবাদের অন্য কোন কারণ থাকিবেক, তাহা দুরনুমেয় নহে।

কোন দ্বীপান্তরে বা দুর্গম দেশান্তরে যখন কোন উপনিবাস স্থাপিত হয়, তখন তদুদ্যোগকারিগণ সেই নব-প্রকাশিত দেশ-অরণ্য এবং ভয়াবহ হইলেও তদ্দেশে বা উপনিবাসে স্বজাতীয় লোকের চিত্তাকর্ষণ নিমিত্ত বাহুল্যোক্তির আশ্রয় লইয়া থাকেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পর কলম্বস এবং তাহার সহচরবর্গ নবভূখণ্ডের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য কল্পনার ত্রুটি করেন নাই। কলম্বস প্রথম সংযাত্রার পর স্বদেশে আসিয়া স্পেনীয় রাজ দম্পতীর সম্মুখে যেরূপ চাতুরীর সহিত আমেরিকার স্বর্ণ প্রাচুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকালে রহস্য রসোদয় হইতে থাকে। অতএব বোধ হয় ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিপুঙ্গব দরিদ্র ভূমি উৎকল দেশের যে

এতাদৃশ অসম্ভব শোভা প্রতিভা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার নিদান উপরিউক্ত অভিপ্রায় মূলক হইবেক। এতদ্রূপ চিত্তাকর্ষণ বর্ণন বিরহে উপনিবাসের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্যগণ ওড্রদেশে আসিয়া প্রবসতি করিবেন, তাহার সম্ভাবনাও থাকিত না।

পরন্তু এইক্ষণে যেরূপ অষ্ট্রেলিয়া এবং বান্দিমান প্রভৃতি দ্বীপচয় বৃটনীয় বন্দীদিগের উপনিবাসে শ্রীশালী হইয়াছে, পুরাকালে ওড্র প্রভৃতি দেশও কর্ম্মদোষে দূষিত আচারভ্রষ্ট আর্য জাতীয় লোকের নির্বাসন ভূমি ছিল। মনুব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমুদায়ে যে সকল জাতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পৌণ্ড্রক এবং ওড্র শব্দ দৃষ্ট হয়; অদ্যাপি উৎকল দেশে তদুভয় জাতি বর্ত্তমান আছে। ওড্র শব্দের অপভ্রংশ "অড" এবং পৌণ্ড্রক হইতে "পান" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। শেষোক্ত জাতি কলিকাতার পূর্ববিভাগে শিবিকা-বহন জীবিকায় অবস্থান করিতেছে। এইরূপ অতিপুরাকালে যে প্রকার ব্রাত্যক্ষত্রিয়গণ উৎকলে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, সেই রূপ ব্রাত্যব্রাহ্মণেরা ও তদ্দেশে গমন করিয়া বসতি করেন। ওড্র বা উৎকলীয় ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রায় শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ। শাকদ্বীপ এবং শাকশাখা ম্লেচ্ছ মধ্যে পরিগণিত। অপর উক্ত দেশে মহাস্থান ব্রাহ্মণ নামক আর এক জাতীয় অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ আছে, ইহারা যে নিতান্ত ব্রাত্য তাহা 'মহাস্থান' সংজ্ঞাতেই সপ্রমাণ হইতেছে। ইহারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বিহিত ধর্ম, এককালে পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে দিনপাত করে; ও স্বহস্তে হলসঞ্চালন করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত ইহারা 'হালিয়া ব্রাহ্মণ' নামে বিখ্যাত। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা যোত্রাপন্ন, তাহারা গ্রামাধিকারী পদবীস্থ, মোকদ্দমা এবং সববরাকর নামে ভূম্যধিকারীদিগের অধীনে কারাদায় করিয়া থাকে। তদ্বিশেষ দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখিত হইবেক। ফলতঃ এই মহাস্থান ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, উৎকল-দেশীয় গ্রাম্য-যাজক ভিক্ষাজীবি ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা ইহারা শতগুণে প্রশংসাস্পদ।

আমরা উপস্থিত প্রবন্ধে উৎকলদেশের প্রাচীনত্ব সংস্থাপনার্থ পুরাবৃত্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না। উৎকলের বিশ্বাসভাজন পুরাবৃত্তের কাল নিতান্ত পুরাতন নহে, সুতরাং তাহার সহায়তা এস্থলে প্রয়োজনীয় নহে। আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সে সময়ের সহিত ভুবনেশ্বর, জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি উৎকলের মহিমাবীর মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা পরশ্ব দিবসের বার্ত্তা বোধ হইবেক। প্রত্যুত আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সেই সময়কে চতুরাংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আদিম জাতিদিগের স্বাধীনাবস্থা; দ্বিতীয়তঃ মনু মহাত্মার সময়ে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির উৎকলে প্রবেশ, তৃতীয়তঃ ভরদ্বাজ ঋষির সময়ে ভদ্র আর্যাশাখার সমাগম তথা তীর্থাদি সংস্থাপন এবং চতুর্থতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার। আদিম জাতিদিগের সময়ে উৎকলের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা অদ্যাপি নয়নগোচর হইতে পারে, যাঁহারা গুমশূরের খন্দ প্রভৃতি নৃশংস হিংসক জাতির বিবরণ পাঠ করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের নিকট তদ্বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। বস্তুতঃ উৎকলদেশ অতি পূর্বতন কালাবধি ভারতবর্ষীয় আদিমজাতিদিগের একটা প্রধান বাসভূমি। প্রাচীন পুরাণাদিতে তাহারা 'পুলিন্দ' নামে খ্যাত। এই পুলিন্দ জাতি দেশভেদে নানা বিভাগে বিভক্ত। উৎকলদেশে তাহাদিগের শাখাত্রয় বর্ত্তমান আছে, যথা, কোল, খন্দ এবং শৌর। পুনশ্চ কোল শাখা বহুপল্লবে বিস্তৃত, যথা কোল, লকা কোল, চৌয়াং সারবস্তী, ধরোয়া, বাহুরী, ভূঞা, খণ্ডয়াল, সাঁওতাল, ভূমিজ বাথোলী এবং

অমাবত। ইহাদিগের পূর্ব্বনিবাস কোলাও দেশ। এই কোলাও দেশ ময়ুরভঞ্জ, সিংহভূম, জয়ন্ত, বনাই কিয়ঞ্জর এবং ধলভূমের মধ্যগতস্থান। কিন্তু লোকেরা এইক্ষণে ছোট নাগপুর যশপুর, তৈমার, পাটকরা এবং সিংহভূম প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহারা ময়ূরভঞ্জ, নীলগিরি, এবং কিয়ঞ্জর প্রভৃতি রাজগণের অধিকারে সর্ব্বদা উৎপাত করিত, সুতরাং অদ্যাপি উক্তরাজগণ তাহাদিগের প্রতি সংশয় নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। কোলেরা সুদৃঢ় দেহ, বিকটবদন, পিশাচবৎ ঘোরতর জঘন্যাচারী। তাহারা কাষ্ঠময় কুঠিরে বসতি করে, তন্নিম্মানে তাহাদিগের বিশিষ্ট নির্ম্মিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র শর, ধনু, এবং কুঠার। কুঠারকে টাঙ্গী কহে। এই সকল অস্ত্রচালনায় তাহারা বিলক্ষণ পটু। তাহারা হিন্দুদিগের কোন দেবতাই স্বীকার করেনা, সজনা বৃক্ষ, তণ্ডুল, তৈল এবং কুক্কুর এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য তাহাদিগের নিকট পরম মাননীয়। সন্ধি এবং অঙ্গীকার কালে শোভাঞ্জন পত্র আনীত হয়, এবং পরস্পর তৈলাভ্যঙ্গ না করিয়া দান করিলে তাহা সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে তাহা নিষ্পত্তিকালে উভয়পক্ষ একগাছি তৃণ ভঙ্গ করিয়া থাকে, তাহাদের বিবাদ মীমাংসা নিষ্পন্ন হয়। তাহারা অত্যন্ত মদ্যপ্রিয়। সর্ব্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। শূকরমাংস তাহাদিগের পরমাদরনীয় উপাদেয় মধ্যে গণ্য। তাহারা অরণ্য-জাত নানাপ্রকার শস্য এবং শাক মূলাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক কালযাপন করে। তাহারা একএক জন গ্রামাধিপতির শাসনাধীন; সেই ব্যক্তি 'মানকী' বা 'মুণ্ডা' নামে প্রসিদ্ধ।

কন্দ ও শৌর জাতির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রকৃতি এবং অঙ্গভঙ্গী কোলজাতির অনুতর নহে, তবে দেশভেদে ও কালভেদে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য জন্মিয়াছে। মহানদীর দক্ষিণ দিগবর্ত্তি পার্ব্বতীয় প্রদেশে তাহারা সুবিস্তর বসতি করে। রাণপুরে তাহাদিগের সংখ্যাধিক্য বিধায় ঐ প্রদেশ 'কন্দরা দণ্ডপাট' নামে খ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দশপালা, বোয়াদ, এবং গুমশূরের মধ্যগত একস্থানে তাহারা বাহুল্যরূপে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ গঞ্জাম ও বিজয়াগাপত্তন হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যে সকল ঘোরতর বন্য মনুষ্য বসতি করে তাহা কন্দ (খন্দ) জাতির অন্তর্গত। এই অরণ্যের অন্তরালে গোল্ড নামক যে এক অপর অসভ্য জাতি আছে, তাহারা ও কন্দ (খন্দ) জাতির এক শাখা বোধ হয়।

শৌরেরা রাণপুর হইতে কটক পর্য্যন্ত খুদার অন্তঃপাতি জঙ্গল সমূহে এবং মহানদীর উত্তর সীমা পর্য্যন্ত আটগড় ডাল জোতা প্রভৃতি যে সকল উপত্যকাবর্ত্তী অটবী আছে তথায় বসতি করে। তাহারা অনেক হিন্দুবৎ আচার, ব্যবহার পরিগ্রহ করিয়াছে; নগরীয় পথবীথিকা এবং হট্ট প্রভৃতি স্থানে গন্ধৌষধ এবং ফল বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহারা ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, শৈলখণ্ড বা গিরি গহ্বর তাহাদিগের উপাস্য। হিন্দুরা কহেন, তাহারা ঐ সকল নৈসর্গিক পদার্থে মহাদেব এবং দেবীর প্রতিমা কল্পনা করিয়া থাকে, ফলতঃ উক্ত কাষ্ঠ লোষ্ট এবং গুহাদি স্ত্রী পুং চিহ্নাকারে চিহ্নিত হয়, এই ধর্ম আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে আসিয়া আদিম জাতিদিগের নিকট শিক্ষা করিয়া থাকিবেন, সুতরাং শৌর প্রভৃতি বন্য জাতিরা যে লিঙ্গোপাসনা করিয়া থাকে তাহা হিন্দুদিগের নিকট পরিগৃহীত না হইয়া হিন্দুরাই তাহাদিগের স্থানে ঐ সকল পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাই সম্ভব; যেহেতু আর্য্যজাতির প্রথমাবস্থায় পৌত্তলিক ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক ছিল।

অনেকে অনুমান করেন, রামচন্দ্রের বানরীসেনা উৎকল দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল;

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব শব্দ কল্পদ্রুমে উৎকল দেশে কিষ্কিন্ধার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। আমাদিগের বোধ হয় বানরীসেনা আধুনিক উৎকলীয় লোকদ্বারা সংরচিত না হইয়া থাকিবেক, যেহেতু সে সময়ে উৎকলে ব্রাত্যক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণাদির বাহুল্যরূপ উপনিবাস হয় নাই। এই প্রযুক্ত ইহাই স্থির হয়, যে লঙ্কাবিজয়ে আদিম জাতিরাই দাশরথির সহচর হইয়াছিল। আর যদ্যপী কিষ্কিন্ধা ভারতবর্ষের পূর্ব্বপাশ্ববর্ত্তী, এমত নির্ণয় হয়, তবে তাহা উৎকলে না হইয়া গোণ্ডবান দেশেই ছিল, যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণারণ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তাঞ্চল হইয়া ক্রমশঃ সেতু রক্ষাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন এমত অনুমান হইতেছে।

আমরা উৎকলের প্রচীনতর নির্ণয়ে অদ্য এতাবৎ লিখিলাম, কিন্তু এতদ্বিষয়ের আনুষঙ্গিক কথা উৎকল-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধে বিন্যস্ত থাকিবেক। এইক্ষণে প্রার্থনা করি. পাঠক মহাশয়েরা উড়িয়া দেশের কথা বলিয়া এই প্রস্তাবকে অবহেলা না করেন, শৈলগহ্বরে মাণিক্য থাকে এমত নহে, বল্মীক-স্তূপে ও তাহা কখনও কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে।

ইতি উৎকল দেশের প্রাচীনত্ব নির্ণয় প্রথম প্রবন্ধ।

[রহস্য-সন্দর্ভ—১ম পর্ব্ব—১৯১৯-২০ সংবৎ। ৫ম খণ্ড পৃঃ ৬৬—৭১]

দ্বিতীয় অধ্যায়

[উৎকলদেশীয় ভূমি এবং তদুৎপন্ন সামগ্রী সমূহ। এই প্রস্তাবের মূলভাগ ষ্টালিং রচিত গ্রন্থ সাহায্যে লিখিত হইল।]

উৎকল দেশের পশ্চিমভাগ অদ্যাপি সুন্দর রূপে আবিষ্কৃত হয় নাই; তৎপ্রদেশে প্রায়শঃ পর্ব্বত এবং নিবিড় জঙ্গলময়; মধ্যে মধ্যে উর্ব্বর ক্ষেত্র এবং উপত্যকাবলী বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বভাগ কেদার বা সমতলভূমি বিশিষ্ট; তাহা উপরিউক্ত গিরি-বন সমন্বিত দেশ হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই প্রদেশ নদীমাতৃক; ইহার কোনস্থানে শৈলাদি উন্নত ভূমির চিহ্নমাত্র নাই, এবং ঘুটিং নামক কঙ্কর ব্যতীত অপর কোন প্রকার প্রস্তর বা ধাতু দৃষ্ট হয় না।

উৎকল দেশ নৈসর্গিক এবং রাজকীয় নিয়মাধীনে খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত, যেহেতু এই তিনখণ্ডের জল-বায়ু স্বাভাবিক শোভা, উৎপন্ন সামগ্রী এবং ব্যবহার প্রভৃতি একরূপ নহে। প্রথম খণ্ড সুবর্ণরেখা হইতে কর্ণারক বা পদ্মক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা সজলভূমি এবং ক্ষুপ জঙ্গলাবৃত। ইহার পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রসার ৩ (তিন) ক্রোশ হইতে ১০ (দশ) ক্রোশের অধিক নহে। দ্বিতীয় খণ্ড উক্ত সিন্ধু তটস্থ প্রথম খণ্ড এবং পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পাট-বা সবল ভূমি। ইহার প্রসার উত্তর ভাগে ৩ (তিন) ক্রোশ হইতে ৮ (আট) ক্রোশ অধিক নহে; কিন্তু দক্ষিণদিকে কোন কোন স্থলে ২০ (কুড়ি) বা ২৫ (পঁচিশ) ক্রোশ পর্য্যন্ত আছে। তৃতীয় খণ্ড পর্বত প্রদেশ। প্রথম এবং তৃতীয় খণ্ডকে উৎকলীয় লোকেরা পূর্ব্ব এবং পশ্চিম "রাজবারা" পদে বাচ্য করে, অর্থাৎ তদুভয় দেশ রাজা, খণ্ডায়িত, জমিদার প্রভৃতির অধিকৃত। দ্বিতীয় খণ্ড 'মোগলবন্দী' বা 'খলিসা' নামে বিখ্যাত। এই খণ্ড হইতে উৎকল দেশের প্রাচীন হিন্দুরাজগণ এবং মোগল শাসন কর্ত্তারা ভৌমিক রাজস্বের বাহুল্যাংশ প্রাপ্ত হইতেন। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা ও অধুনা এই

খণ্ড হইতে ২০,০০,০০০ টাকা উক্ত কর স্বরূপ লাভ করিতেছেন। অপর গড় জাত রাজগণের স্থানে "পেশকষ" নামে ১২০৪১১ টাকা মাত্র লইয়া থাকেন। এই অধিনতার স্বীকৃতি-বং সামান্য উপহার চিরকালের নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন রূপে অবধারিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত বিভাগ মতে ভূমি, উৎপন্ন সামগ্রী এবং ভুস্তর রচনার বিবরণ করাই সুগম বোধ হইতেছে, অতএব তদনুসারেই লিপি করা গেল।

প্রথমখণ্ডে যেরূপ বহুল সজল বিল, কুম্ভীরপূর্ণ অসংখ্য বক্রগামিনী নদী, নিবিড় জঙ্গল এবং বিষবিদূষিত বায়ু প্রবাহিত, তাহাতে তাহার প্রকৃতি অনেকাংশে সুন্দরবনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু সুন্দরবনের মধ্যে স্থানে স্থানে যেরূপ বিচিত্র অটবী শোভায় চিত্ত প্রফুল্লিত হয়, তদ্রূপ শোভার কিঞ্চিন্মাত্র উক্তখণ্ডে পরিলক্ষিত, হয় না। এই খণ্ডের সুপরিসর অংশ কঙ্কা ও কুজঙ্গের রাজা, তথা হরিশপুর, মরীচপুর, বিষ্ণুপুর, গলরা ও আর আর অপ্রসিদ্ধ খণ্ডায়িতদিগের মধ্যে বিভাজিত আছে। আল নামক কিল্লার অধিকারী রাজা ও ইহার কিয়দ্ভাগে স্বামিত্ব রক্ষা করেন। কঙ্কার উত্তরে বালেশ্বর পর্য্যন্ত জঙ্গলের লাঘব দৃষ্ট হয়, এই প্রদেশ অসংখ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী পরিপূর্ণ, তাহাতে চোরাবালী বা দলদলের প্রাদুর্ভাব; অনভিজ্ঞ বা অসাবধান পথিকদের পক্ষে তত্তাবৎ অতীব সঙ্ঘাতক। ভূমির উপরিভাগ গুল্ম এবং নলতৃণে আচ্ছন্ন, তৎসমুদায় লবণ প্রস্তুত করণীয় বিহিত ইন্ধনের কার্য্য করে। তদ্ব্যতীত ঝুড়িঝাউ এবং হিন্তাল বৃক্ষের প্রাচুর্য্য আছে। যে স্থলে কেবলমাত্র বালুকার সংস্থান, বিশেষতঃ কর্ণারকের নিকটবর্ত্তী স্থানে নিবিড় জালবৎ একজাতীয় এক প্রকার কলম্বীলতার প্রবলতা; ইহার পুষ্পাবলি সমুজ্জল নীল লোহিত-বর্ণ। তদ্দেশীয় লোকেরা ইহাকে "কাঁইসারিলতা" কহে। তথায় একজাতীয় উদ্ভিদ আছে, তাহার পত্রচয় ঘোর হরিদ্বর্ণ, এবং ললিত রস প্রধান বোধ হয়। বালুকাস্তূপ শিখরে "গোক-কাঁটা", নামক কণ্টকাকীর্ণ গুল্মাদি শোভিত দেখা যায়। কাষ্ঠদাবী বৃক্ষের মধ্যে সুন্দরীর প্রচুরতা আছে বিশেষতঃ একজাতীয় কণ্টকময় ক্ষুদ্রবংশ (বেউড় বাঁশ) বৃক্ষের জঙ্গল প্রধানতা হেতু কুজঙ্গ (কুজঙ্গল) এবং হরিশপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জলপথ ব্যতীত স্থলপথে গতিবিধি করা দুরূহ। এইসকল জঙ্গলে চিত্রব্যাঘ্র এবং মহিষের যেরূপ বহুলতা, নদী নিকরে আবার জলবৃদ্ধি কালে সেইরূপ অতি ভয়ানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুম্ভীরের ঘোরঘটা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রদেশের বা ব বায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে কম্পজ্বরাদি ব্যতীত দুইটি রোগের অর্থাৎ শিলীপদ বা গোদ এবং উদরাময়ের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। বিশেষতঃ শল নামক একপ্রকার সাংঘাতিক উদরাময়ের সঞ্চারে বিস্তর লোক গতায়ু হয়।

এই অরণ্য অস্বাস্থ্যকর ভূমিতে ভারতবর্ষের সর্বদেশাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার বাণিজ্যবলে রাজকোষে বর্ষে বর্ষে ১৮।১৯ লক্ষ টাকা ন্যস্ত হইয়া আসিতেছিল। এইক্ষণে লবণ পোক্তান্ বাধ হইল, সুতরাং উৎকল দেশের এক প্রধান রাজকীয় আয়ের লোপ-সহ অনেক লোকের সৌভাগ্যের পথ নিরুদ্ধ হইতেছে, মহাজনদিগের হস্তগত হওনের পূর্ব্বে ঐ লবণ অত্যন্ত শুভ্র এবং নির্ম্মল থাকে। "পাঙ্গ" ইহা প্রসিদ্ধ; জলপাকদ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়, মলঙ্গীরা যে প্রণালীতে লবণোৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত সহজ। প্রথমতঃ 'খালাড়ী' অর্থাৎ লবণ প্রস্তুত করণের স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল যোগে সমুদ্রের জল আনীত হয়। ঐ জল ভাটার সময় বিগত হইলে তাহার লবণাংশ বিশিষ্ট রূপে মৃত্তিকাতে নিবেশিত হইয়া যায়, এই রূপে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার কটালের প্রথমাংশে ৪।৫ দিবস জুয়ার জল উক্ত ভূমিতে সঞ্চারিত হইলে পর

জুয়ারের মান্দ্যসময়ে আর ততদূর পর্য্যন্ত জলোত্থিত হয় না। সেই সময় উক্ত সলবণ ক্ষেত্র যাহাকে 'পাছাল' কহে, তাহা আতপতাপে শুষ্ক হইতে থাকে। তাহা শুষ্ক হইলে পর খুর্পাযোগে উপরি ভাগের মৃত্তিকা চাঁচিয়া রাশীকৃত করে, তদনন্তর চূনের ভাটির সদৃশ আধার বিশেষের নিম্নভাগে পালাল আস্তরিত করিয়া তদুপরি ঐ মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত করে। উক্ত আধারকে "বাড়ী" কহে। মৃত্তিকা নিক্ষেপ পরে তাহা পদদ্বারা চাপিয়া তদুপরি লবণাম্বু ঢালিয়া দেয়। ভাটির নিম্নভাগে এক ছিদ্র আছে; ঐ ছিদ্র পথে জল চ্যুইয়া প্রণালী যোগে এক কুণ্ড মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ঐ ক্ষরিত জল 'দহ' নামে খ্যাত; ইংরাজীতে ইহাকেই 'ব্রাইন' কহে। তৃণান্তর হইয়া ঐ জল আসিবাতে তাহার বর্ণ গোমূত্রের ন্যায় হয়। কিঞ্চিৎ দূরে চুল্লী প্রস্তুত থাকে, ঐ চুল্লীর চতুর্দিকে বায়ু নিবারণার্থে তৃণ নলাদি দ্বারা বৃতি রচিত হয়। চুল্লীর উপরিভাগ ডিম্বাকার বর্ত্তুল, তাহাতে অন্যূন দুইশত ভাণ্ড স্থাপিত থাকে, সেই সকল পাত্রে উক্ত প্রস্তুতীকৃত জল দেওয়া যায়। পরে তীক্ষ্ণজালে পাক করিবার সময়ে বাষ্পযোগে ভাণ্ডস্থ বারি যত হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে ততই বারংবার সেই জল প্রদত্ত হয়। সমনন্তর করকাকারে ভাণ্ড মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ সঞ্চার হইলে লৌহ চমস দ্বারা তাহা লইয়া ঝুড়িতে রাখা যায়। তদবস্থায় লবণ আর্দ্র বিধায় ঐ ঝুড়ি বহিয়া জলীয় ভাগ নির্গমন করিতে থাকে। এইরূপে লবণ প্রস্তুত হইলে পর স্তূপ স্তূপে তাহা রক্ষিত হয় ও তদুপরি নলতৃণের আচ্ছাদন দেওয়া যায়; পাশ্চাৎ গোলাজাত হয়।

রাজবারার উক্ত অংশে মধ্যে মধ্যে ধান্যের কৃষিও আছে। উৎপন্ন তণ্ডুলে স্থানীয় লোকের, উদর পূর্ত্তির সঙ্কুলান হয়। তদ্ব্যতীত কঙ্কার রাজা কলিকাতা এবং কটকে বিক্রয়ার্থ সুবিস্তর ধান্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। সমুদ্রের উপকূলে বহুবিধ মৎস্য পাওয়া যায়, দেশীয় লোকেরা তন্মধ্যে ষষ্টি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৎস্য ভক্ষণ করে। ইউরোপীয়েরা নিম্নলিখিত মীন সমূহকে সমাদরে লইয়া থাকেন; যথা, শকুল, বাঁশপাতি, তপস্যা, খরকা, গজকূর্ম্ম। ইল্লিশ, খড়ঙ্গণ বিজয়রাম এবং শাল। চিল্কা হ্রদে অত্যুৎকৃষ্ট ভাদুটমৎস্য আছে। ফল্‌স-পইণ্ট নামক স্থানে উপাদেয় কূর্ম্ম, কস্তুরা, কর্কট এবং চিঙ্গট প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইংরাজ অধিকার পূর্ব্বে এ সকল জলচরের মূল্য উৎকলীয় লোকেরা অবগত ছিল না; এইক্ষণে বালেশ্বর, কটক এবং জগন্নাথপুরী নিবাসী ইংরাজ-মণ্ডলে তত্তাবৎ মহার্ঘ্য মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। সমুদ্র কূলে মৎস্য ধারনের উপযুক্ত সময় শরতের শেষ হইতে বসন্তের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, কারণ তৎকালে বায়ু এবং তরঙ্গের ভাব অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে। এই সময়ে উত্তরাঞ্চল নিবাসী জালকেরা ২০।৩০ জন করিয়া একত্রেক দলবদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জালযোগে মৎস্য ধারণারম্ভ করে। ভাটার সময় ঐ সকল জাল বংশদণ্ড সাহায্যে ত্রিকোণাকারে বিস্তৃত করা হয়, সেই ত্রিকোণের মূলভাগ তটাভিমুখে উদঘাটিত থাকে। জুয়ারের জল প্রস্থান করিবার সময়ে নিকটস্থ জালসমূহ সঙ্কোচ করিলে মৎস্য সকল তাড়া পাইয়া ত্রিকোণের শৃঙ্গাভিমুখে দৌড়িয়া যায় এবং তথায় বৃহৎ ঝুলীর ন্যায় একজাল বিস্তার থাকাতে তন্মধ্যে বদ্ধ হয়। এক এক ক্ষেপের মৎস্য সঙখ্যা (সংখ্যা) অতি বহুল। তাহার কিয়দংশ সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্ত রক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট সমুদায় অতি দূরস্থ বা নিকটস্থ হট্ট প্রভৃতিতে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়। দূরস্থ পণ্যবীথিকায় ঐ সকল মৎস্য অত্যন্ত দুরিত এবং দুর্গন্ধীভূত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু উৎকলীয় লোকদের সমীপে তত্তাবৎ অতি প্রিয়।

এই অস্বাস্থ্যকর নিরানন্দময় প্রদেশ পরিহার-পূর্ব্বক উৎকলের দ্বিতীয় অথচ প্রধান বিভাগের বর্ণনা করা যাউক। এই বিভাগের নাম 'মোগল বন্দী' অথবা 'খালিসা'। ইহাতে ১৫০টি পরগণা আছে। ঐ সকল পরগণা পুনর্ব্বার ২৩৬১টি মহালে বিভক্ত এবং তত্তাবৎ রাজকীয় দেশ নির্ণয় পত্রে অর্থাৎ তৌজি প্রভৃতিতে বিন্যস্ত আছে। ঐ সকল মহাল অধুনা বাটয়ারা সূত্রে বহুধা বিভাজিত হইয়াছে। যদিও এই প্রদেশ বিশিষ্টরূপে কথিত বটে, এবং তথায় বাঙ্গালা দেশের সাধারণ শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার মৃত্তিকা অবশ্য নিস্তেজ এবং বন্ধ্যা পদের বাচ্য। মহানদীর দক্ষিণে ভূমির ভাব সাধারণতঃ বালুকাময়। ঐ নদী অতিক্রম পরে বিশেষতঃ পর্ব্বত সমূহের সন্নিকটে মৃত্তিকা অচিন ধাতুময়ী এবং প্রায়শঃ অতি শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট। তদ্ব্যতীত বহুক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমির উপরিভাগ লঘুতর কঙ্কর বা ঘুঁটি নামক পদার্থে আচ্ছন্ন। এইরূপ ভূমি প্রায় মেদিনীপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহা সামান্যতঃ দুর্ব্বল এবং অনুর্ব্বর; পর্ব্বত-সমূহের নিকটে এই রূপ দৌর্ব্বল্য বিশিষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ গোচর হয়। অপর ধামনগর এবং ভদ্রক প্রভৃতি অঞ্চলে এমত সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র সকল নয়নগোচর হইয়া থাকে, যথায় জঙ্গলীয় করঞ্জ এবং বেনাবঞ্জর ব্যতীত আর কোন প্রকার বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয় না। কৃষ্যুৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে ধান্যই প্রধান পদবীতে গণনীয়, যেহেতু তাহাই উৎকলের প্রধান খাদ্য। বৈতরণীর উত্তরস্থ পরগণা সমূহে কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্যই ধান্যমাত্র। তত্রত্য ধান্য প্রায় স্থূলতর কিন্তু ধাতু প্রদায়ক; ফলতঃ বাঙ্গালা এবং বিহার দেশের সহিত তুলনায় উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ নিকৃষ্টতর। কটকের ধান্য ঋতুদ্বয়ে বহুল পরিমাণে জন্মে, তদুভয়বিধ 'শারদ এবং 'বিয়ালী' নামে বিখ্যাত। শারদ ধান্যের বীজ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে উপ্ত হইয়া কার্ত্তিক এবং পৌষের শেষ পর্য্যন্ত গৃহাগত হয়। এই ধান্যের ভূমিতে প্রায় অন্য প্রকার শস্য জন্মে না। দ্বিতীয় প্রকার ধান্য অর্থাৎ বিয়ালী এক সঙ্গেই উপ্ত হয়; কিন্তু তাহার স্থান উচ্চভূমি এবং ঐ শস্য ভাদ্রের প্রথম ভাগ হইতে আশ্বিন মাস মধ্যে পরিণতি লাভ করে। তদনন্তর ঐ ভূমিতেই রবি অথবা হৈমন্তিক শস্য প্রচুর রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাদ্র আশ্বিন আর এক প্রকার ধান্য উপ্ত হয়, তাহা যথেষ্টরূপ জন্মে না। ঐ ধান্য 'শঠিয়া' নামে প্রসিদ্ধ, এবং অগ্রহায়ণ মাসে পরিপক্ক হয়। তদ্ব্যতীত আর এক প্রকার ধান্য শীতকালের প্রারম্ভে নিম্ন সজল ভূমিতে উপ্ত ও প্রতিরোপিত হইয়া সেচন গুণে পরিপাক লভনান্তর বৈশাখে কর্ত্তনের উপযুক্ত হয়। এই প্রকার ধান্য 'ডালা' নামে খ্যাত। খুর্দ্দা প্রদেশে এবং চিল্কাহ্রদের ধারে তথা সমুদ্রকূলে এই ধান্য জমিয়া থাকে। উত্তরস্থ পরগণা-সমূহে শারদধান্য ব্যতীত স্থল বিশেষে ইক্ষু, তামাকু এবং এরণ্ডের কৃষি আছে। মধ্য এবং দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশে ঘিদল মধ্যে মুদ্গ মাস, মসুর, কুলথ, বরবটী, ভুট্টা, কাঙ্গনী, বাজরা, মড়ুয়া, তিল, সর্ষপ এবং অতসী অর্থাৎ তিসী জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশে ধান্য ব্যতীত অন্য শস্যাপেক্ষ এরণ্ডের কৃষি অতি প্রচুর। দেশীয় লোকেরা ব্যঞ্জনাদি পাকে সর্ষপ-তৈল-সহ এরণ্ড তৈল বহুল পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া থাকে; সর্ষপতৈল দেহে মর্দনাদি সুখসেব্য কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। কার্পাস, ইক্ষু এবং তামাকু বৈতরণীর দক্ষিণে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার উৎপত্তি যে নিতান্ত নিকৃষ্ট তাহা অবশ্যই স্বীকার করা যায়; যেহেতু দেশীয় লোকেরা স্বদেশজাত তামাকু ব্যবহারে অনুরাগী নহে। পরন্তু পূর্ব্বে দেশ মধ্যে যে সূক্ষ্মতর বস্ত্র সমূহ উপ্ত হইত, তদুপযোগী কার্পাস চিরার দেশ হইতেই আনীত হইত। এই নিমিত্ত এই দুই পদার্থের উৎকর্ষ লাভ হয় নাই। সাইবীর এবং আশিরেশ্বর পরগণায় উৎকৃষ্ট গোধূম এবং কিয়ৎ পরিমাণ যব উৎপন্ন

হইয়া থাকে। অপর রঞ্জন ও ডোরী প্রভৃতি প্রস্তুত করণীয় উদ্ভিদ যৎসামান্যরূপে প্রাপ্ত হয়। এই উভয়বিধ প্রয়োজন সিদ্ধ করনার্থে কুসুম্ভ অথবা কুসুম ফুল, পাট এবং কাশ্মীরা অথবা শণ। দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। উৎকল দেশে পোস্ত বা আফিম বৃক্ষ নীল এবং তৃণের কৃষি হয় না। আর আশ্চর্যের বিষয় এইযে উৎকলীয় লোকেরা অত্যন্ত তাম্বূলভক্ত হইলেও কিরূপে তাহা জন্মাইতে হয় তাহা পূর্বে জানিত না; বাঙ্গালীরা উৎকলে বাস করা পর্য্যন্ত পর্ণলতা প্রস্তুত করণীয় প্রণালী প্রচারিত হইয়াছে। এইক্ষণে পুরীর চতুর্দ্দিগে এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ শাসন গ্রামে পানের বরজ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যে পরিমাণে জন্মে তাহা সাধারণরূপে ভুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। আঈন (আইন) আকবরীতে উৎকলে বহুপ্রকার তাম্বূল জননের যে বর্ণনা আছে, তাহা অমূলক মাত্র। পর্ণলতা, হরিদ্রা এবং ইক্ষু প্রভৃতির চাষ করণ বিশিষ্ট রূপ পরিশ্রম সাধ্য। মৃত্তিকা উত্তমরূপে প্রস্তুত না করিলে ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভাবিত নহে। মসীনা এবং সর্ষপ প্রভৃতির কল্কদ্বারা ঐ মৃত্তিকাতে সুন্দররূপে সার দিতে হয়। উৎকলীয় ভাষায় ঐ কল্ক বা খলাকে 'পীড়ি' কহে। অন্যান্য প্রকার শস্যক্ষেত্রে পচাখড়, গোময় এবং ভস্ম সার প্রয়োজন মতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদ্যাদ শোভাকর উদ্ভিদে উৎকল দেশের তাদৃশ গরিমার কারণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ শাক, লঙ্কা, মরিচ. ফুট, কুমড়া, চুবড়ী, আলু এবং বার্ত্তাকুর বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তদ্ব্যতীত কচু, মূলা, করলা, রামতরুই, কালশীম, কলম্বী, ডেঙ্গুয়া, কাঁকুড়, ধন্যা, যবানী, মেথী, এবং শর্ষ প্রভৃতি ও গ্রাম্য উদ্যানে ও ক্ষেত্রাদিতে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় নিম্নলিখিত ফল সমূহ উৎকলে লব্ধ হওয়া যায়, যথা, আম্র জম্বু, পেয়ারা, আতা, চালতা, কেন্দু, দাড়িম্ব, কাঁঠাল, বেল, কপিত্থ, করঞ্জ এবং তাল ও খর্জ্জুর, কিন্তু এই সকল ফল সর্ব্বত্র সুলভ নহে। ব্রাহ্মণ বসতি পূর্ণ গ্রাম ব্যতীত নারিকেল এবং গুবাক বৃক্ষ প্রায় আর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ কটকের সর্বত্র নারিকেল সুন্দররূপে জন্মিতে পারে এমত। সম্ভাবনা সর্ব্বকালেই উৎকল-দেশ কেতক কুসুমের প্রাদুর্ভাব বশতঃ বিখ্যাত। এই মনোহর বৃক্ষ তদ্দেশের সর্ব্বস্থানে জঙ্গলাকারে বিনা যত্নে জন্মিয়া থাকে; ক্ষেত্র এবং উদ্যানাদির বৃত্তি রচনা কেতকী গুল্মেই সম্পন্ন হয়; এই বৃক্ষের স্ত্রীজাতি অর্থাৎ কেতকী শাখায় আনারসের ন্যায় এক নয়নানন্দকর শোভনীয় ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তর কঠিন, সূত্রবৎ তন্তুল এবং স্বাদহীন। দরিদ্র লোকেরা তাহার শস্য সিদ্ধ করিয়া কখন কখন আহার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের নিকটেও উক্ত পদার্থ প্রিয় নহে। পুংপুষ্পে অর্থাৎ কেতকদ্বারা এক প্রকার তৈব্রদ্রব্য প্রস্তুত হয়, ইতর লোকেরা তাহা সমাদরে পান করে।

মোগলবন্দীর মধ্যে কাঁশ বাঁশের দক্ষিনবর্ত্তী অনেকস্থলে নিবিড় ছায়াকর শোভনীয় আম্র কানন ও ঘন বংশ বিপিন তথা প্রকৃষ্টতর বটবৃক্ষ শ্রেণী বিরাজিত আছে। তন্মধ্যে সুন্দরতর পুষ্পোদ্যান নিচয়ে মল্লিকা, মালতি, যূথী, ওড়, চম্পক এবং বকুল প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষ দেখা যায়। দরিদ্র লোকদিগের পর্ণকুটীর সমীপে নীম তথা কদম্ব প্রভৃতি শোভাঞ্জন এবং কদলীবন মধ্যে মধ্যে নয়নগোচর হয়। চিত্রতার বিষয় এই শোভাঞ্জন বৃক্ষ বৎসরের সমুদয়াংশে ফল পুষ্পে শোভিত থাকে। উৎকলের মৃত্তিকা এবং বারি যে কৃষি ও উদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে অনুকূল নহে, তাহা ইউরোপীয় প্রবসীদিগের যত্ন বৈফল্যে সপ্রমাণ হয়। ফলতঃ উক্ত দৈব বিড়ম্বনা ব্যতীত উৎকলীয় কৃষকদিগের দীনতা মূর্খতা এবং নিরুৎসাহিতা যে তাহাদিগের সৌষ্টব বিষয়ে বিঘ্নকর তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। সামান্য লোকেরা যে নিরুৎসুক তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উৎকল-দেশীয়

অন্য লোক পূর্ণ গ্রামের সহিত ব্রাহ্মণ শাসন সহ তুলনা করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু ইতর লোকের বাস ভূমিতে প্রায় কিছুই উত্তম বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ব্রাহ্মণ বসতি সকল নানা প্রকার শোভা এবং সম্ভোগাধান ফল পুষ্পাদিতে পরিপূর্ণ দেখা যায়। অতএব একথা বলা বাহুল্য, যে ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বর হইলেও যদ্যপি বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং স্বত্বের নিশ্চয়তা তথা আপেক্ষিপ স্বল্প কর প্রদানের নিয়ম থাকে তবে উপযুক্ত পরিশ্রমের কল্যাণে সুন্দররূপ কৃষি কার্য্যাদি হইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা প্রায় উচ্চতর ভূমিতে দেব মণ্ডপাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া বসতি করেন। তথায় ভারতবর্ষের গরিমা বিধায়ক নাগকেশর, কেশর, বকুল, রক্ত অশোক, চম্পক এবং জারুল প্রভৃতি পুষ্প নয়নপথে পতিত হয়; তদ্ব্যতীত নারিকেল, সুপারী, তাম্বুল, কদলী, হরিদ্রা, আর্দ্রক প্রভৃতির অভাব নাই। এতাবতা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মনেরাই উৎকল দেশের প্রধান শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদক। পশুবৎ কেবল উদরপূর্ত্তি ব্যতীত মানুষ্য যে ভোগানুরাগের বশবর্ত্তী তাহা উৎকল দেশে উক্ত জাতির কৃষি কর্য্যাদিতে স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

[রহস্য সন্দর্ভ—১ম পর্ব্ব—১৯১৯-২০ সংবৎ। ৬নং খণ্ড পৃঃ ৮৫-৯০]

তৃতীয় অধ্যায়

উৎকলের তৃতীয় বিভাগ অর্থাৎ পর্ব্বতাঞ্চল বর্ণনায় অতঃপর প্রবর্ত্ত হওয়া গেল। এই বিভাগ মোগল বন্দীর পশ্চিম সীমায় সুবর্ণরেখা হইতে আরব্ধ হইয়া চিল্কাহ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পর্ব্বতশ্রেনীর মধ্যে কোন কোন স্থলে যথাদর্পণ, আলমগীর, খুদা নিম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি আছে; বিশেষতঃ বালেশ্বরের নিকটে তত্তাবৎ এতদ্রূপ পূর্ব্বাভিমুখে সমাগত যে ঐ স্থানের পরিসর নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। প্রত্যুত সমুদ্র-হইতে পর্ব্বতাঞ্চলের দূরতা কোন স্থলেই ৩০-৪০ ক্রোশের অধিক নহে। বালেশ্বরের নিকটে যে পর্ব্বতশ্রেণী উন্নত ভাবে শিরোদ্ঘাটন করিয়া রহিয়াছে' তাহা সমুদ্র হইতে ৮-৯ ক্রোশের অন্তরে স্থাপিত। তত্তাবৎ প্রস্তর ময় ও সমাগ্রতঃ নীলগিরি নামে প্রসিদ্ধ। গাঞ্জাম ও চিল্কাহ্রদের মধ্যেও এই রূপ এক পর্ব্বত মালা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা তাদৃশ উন্নত নহে, এবং বোধ হয় যেন সমুদ্র গর্ভ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; ফলতঃ তদুভয়ের ব্যবধানে সুপরিসর বালুকাময় তট-প্রদেশ আছে। এই পর্ব্বতাঞ্চল অর্থাৎ শোনপুর গণ্ডয়ানা ও তদধীন দেশ সমূহ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৫০ ক্রোশ এবং মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী সিংহভূম হইতে গাঞ্জাম পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিনে অন্যূন ১০০ ক্রোশ হইবেক? এই সকলদেশ ষোড়শব্যক্তি ক্ষত্রিয় বা খণ্ডায়িত জমীদার দিগের অধিকারে বিভক্ত হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট ঐ সকল ব্যক্তিকে সামন্ত রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পর্ব্বত নিকরের তল প্রদেশে আরও দ্বাদশ জন খণ্ডায়িত জমিদার আছেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতি সামান্য কর প্রদান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই গবর্নমেণ্টের আজ্ঞা এবং ব্যবস্থার অধীন। রাজস্ব-সম্বন্ধীয় কাগজপত্রে তাঁহাদিগের অধিকার সমূহ 'কিল্লা' পদেবর্ণিত হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ সকল কিল্লার অধীন বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গড় আছে', তত্তাবতের অধিকারী খণ্ডায়িত গণ' 'বেড়ানামক' এইং 'ভূইঞা' নামে পুরুষানুক্রমে ভোগ ও স্বত্ব রাখিয়া আসিতেছেন।

ব্রাহ্মণী নদীর কূল হইতে গাঞ্জাম পর্য্যন্ত স্থানে নিম্ন প্রদেশ হইতে যে পর্ব্বত-সমূহ দৃষ্ট হয় তত্তাবতে অভ্র অনেক আছে। সাধারণতঃ এই সকল পর্ব্বত বিশৃঙ্খল ভাবে সংস্থিত। তাহার চূড়ার আকৃতি কোন স্থানে শরফলকাকার, কোথায় বা মঞ্জুষার সদৃশ বর্ত্তুল। সেই সকল শৃঙ্গ আবার সর্ব্ব দিক হইতে যেন সমাগত হইয়া পরস্পর উল্লঙ্ঘন-প্রলঙ্ঘন করিয়া রহিয়াছে; কোন কোন স্থলে বা স্বস্তিক বা কীলকাকারে পর্ব্বত মূল হইতে আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়াছে; দৃষ্টমাত্রে বোধ হয় যেন পদাতিকসৈন্য মণ্ডলে এক এক বীরবর সেনাপতি অশ্বারোহণে এবং স্বস্তিকাকার শিরস্ত্রাণ-ধারণে শোভা পাইতেছে। এই সকল অচলের আপাদমস্তক বৃক্ষ ও লতিকায় আচ্ছন্ন। মোগল বন্দী হইতে যে সকল পর্ব্বত নয়নগোচর হয়, তাহাদিগের সর্ব্বোচ্চতা ২০০০ পাদ পরিমিত হইবেক; পরন্তু সাধারণতঃ ৩০০ পাদ হইতে ১২০০ পাদ পর্য্যন্ত উচ্চতা হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ পর্ব্বতাপেক্ষা অতি দূরতর দেশমধ্যে সমধিক উচ্চ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্ব্বত বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু উৎকলের মধ্য ভাগের কোন স্থানে অভঙ্গভাবে পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্ট হয় না।

এই নিখিল পর্ব্বত-প্রদেশ নানাবিধ বিচিত্র ধাতুদ্রব্যে পরিপূরিত আছে, অতএব সুবিজ্ঞ ভূস্তরবিদ্যাবিৎ কোন মহোদয় কর্ত্তৃক তত্তাবৎ আবিষ্কৃত না হইলে এতাবদ্বিষয়ের সংশুদ্ধ আখ্যান লভ্য হইতে পারে না। অত্রত্য কলায়োপল রচিত শৈলসমূহ অত্যন্ত দৃঢ়ীভূত, সুতরাং বৃক্ষলতাদিবিহীন; মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্রশৃঙ্গাদিতে পরিশোভিত তাহাদিগের স্থানে স্থানে হরিন্নিভরেখাবলম্বিত দেখা যায়; ঐ সকল রেখা প্রায় মর্ম্মর প্রস্তরের প্রকৃতি ধারণ করে। এই সমুদায় শৈলসারাভ্যন্তরে তাম্রখনি এবং শ্বেতপ্রস্তর প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত আছে। উৎকলীয় লোকেরা শেষোক্ত প্রস্তর-সমূহকে সাধারণতঃ 'মুগলী' পদে বাচ্য করে। তদ্দ্বারা জলপাত্র, ভোজনপাত্র, দেবপ্রতিমা এবং পুষ্পাদি খচিত ফলকাবলী প্রস্তুত হয়। উক্ত খোদিত প্রস্তর-ফলক উৎকল-দেশীয় দেব-মণ্ডপ বা প্রাচীন রাজপ্রাসাদিতে সংলগ্ন থাকে। পরন্তু সুকঠিন প্রস্তর সকল ছেদনাদি করণে উৎকলীয় শিল্পীদিগের শস্ত্র সকল সক্ষম নহে, অতএব তাহারা তত্তাবৎ প্রস্তরকে 'অকর্ম্মা' পদে অখ্যাত করিয়া থাকে। উপরি-উক্ত প্রস্তর পরিকর ব্যতীত নীলগিরিতে আর এক প্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহাকে 'শিলাধার' কহে; তদ্দ্বারা উড়িয়ারা অস্ত্রাদি শাণিত করে। অপর কিয়দন্তরে সুনির্ম্মল এবং অতি শুভ্র এক প্রকার চূর্ণক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'তিলকমাটী' কহে। আমাদিগের বিজ্ঞতম পাঠক মহাশয়দিগকে বলা বাহুল্য, এই চূর্ণক ইয়ুরোপের এক প্রধান মূল্যবান পদার্থ, তথায় 'মীরশাম্' নামে ইহা খ্যাত; তদ্দ্বারা অনেক প্রকার চীনের বাসন নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উৎকলীয় লোকেরা তদ্দ্বারা ললাট ঘুড়িয়া তিলক করিতেই জানে; কিন্তু কলিকাতায় ঐ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত এক একটি নল ২০-২৫ টাকায় বিক্রীত হয়। প্রত্যুত, গড়জাতের রাজারা যদ্যপি বিদ্যানুরাগী হইতেন, তবে তাঁহাদিগের এতদিনে সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না।

উৎকল-দেশের পর্ব্বতমালা-মধ্যে সর্ব্বত্রই লৌহের প্রচুরতা আছে। ইহা প্রায়ঃ কলায়াকারে গৈরিক প্রস্তর সহ মিশ্রিত হইয়া লোহিতাকারে দৃষ্ট হয়। ঢেঙ্কানল, অঙ্গুল এবং ময়ূরভঞ্জে কিয়ৎ পরিমাণে লৌহ গালিত হইয়া থাকে। ঢেঙ্কানল এবং ময়ূরভঞ্জের কোন কোন নদীতে স্বর্ণরেণু আছে এমত প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু ইহার সত্যতা অদ্যাপি সংস্থাপিত হয় নাই।

চূর্ণ-প্রদায়ী প্রস্তর-মধ্যে উৎকলে ঘুটিং মাত্র প্রাপ্তব্য। তাহা বহুদূর ব্যাপিয়া এক এক স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃত রহিয়াছে। চূর্ণ-দায়ক পদার্থের উপরে হরিদ্রাভ এক এক সূক্ষ্মতর কঠিন মৃত্তিকার আবরণ আছে, এই নিমিত্ত ঘুটিঙের চূর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া থাকে।

পর্ব্বতাঞ্চলে কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত ভূমি সর্ব্বত্র সমান নহে। যে স্থলে তাহা বর্ত্তমান আছে, তথায় ধান্য এবং হৈমন্তিক শস্য প্রচুর-পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে অধুনাতন কালে জঙ্গল পরিষ্কৃত হইবাতে তথায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপত্যকা-নিকরে জুয়ার বাজরা এবং মাণ্ডিয়া নামক শস্য সতেজে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ময়ূরভঞ্জ, বীরাম্বা, ঢেঙ্কানল এবং কিয়ঞ্জরে স্বল্পপরিমাণে নীল জন্মে; শেষোক্ত প্রদেশে পোস্ত বৃক্ষও দেখা গিয়াছে। যে সময়ে কোলদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয় সেই সময়ে কিয়ঞ্জরের অবস্থা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহার আয়তন ৫০ ক্রোশ হইবে; সমুদয় স্থলই সুকৃষ্ট; কোন কোন স্থলে গিরিশ্রেণী এবং জঙ্গল বর্ত্তমান আছে। সাধারণতঃ ইহা কথিতব্য, যে এই তৃতীয় বিভাগে পর্ব্বত নদীগর্ভ এবং অটবীর অংশই বহুল, কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত ভূমির পরিমাণ স্বল্পমাত্র।

এই বিভাগের অভ্যন্তরস্থ, বন-নিচয়ে শাল-পিয়াশাল, গাম্ভার এবং কোন কোন স্থলে শিশু প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কাষ্ঠ দায়ক বৃক্ষ সমূহ আছে। দশ পালা অঞ্চলে 'শাক' অর্থাৎ শেগুন-বৃক্ষ স্বল্প-পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উক্ত মূল্যবান কাষ্ঠ প্রয়োজন মতে নিকটে প্রাপ্তব্য নহে। তেল নদীর তটে ঐ বৃক্ষের বন আছে। তেল নদী শোনপুরের নিকটে মহানদীতে সঙ্গত হইয়াছে। অঙ্গুল, ঢেঙ্কানল এবং ময়ূরভঞ্জের শাল বৃক্ষই বিশিষ্ট রূপে সমাদৃত হইয়া থাকে, যেহেতু তত্রত্য শাল বৃক্ষ বৃহদাকার। ময়ূরভঞ্জের শালবৃক্ষে অটবী-সমূহ অতি গভীর, এবং চমৎকার শোভা বিশিষ্ট। কোন কোন পার্ব্বতীয় অধিকারে উৎকৃষ্ট নারঙ্গী এবং আম্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। আম্র বৃক্ষসকল উদ্যান ব্যতীত জঙ্গলেও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উৎকলীয় লোকেরা কহে, দেবানুগ্রহে ঐ সকল রসাল বিজনে স্বয়ং উপ্ত রহিয়াছে।

উল্লিখিত প্রস্তর প্রধান পর্ব্বতের বিকৃত ভূমিতে অথবা তন্নিম্ন ভাগে শোভিত কানন-কলাপে বৃক্ষসমূহের তাদৃশ পরিপুষ্টতা নয়নগোচর হয় না; তরুগণ খর্ব্বাকার; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে এই সকল বনে নানা প্রকার ঔষধ এবং ফল ফলিত হইয়া থাকে। হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী, মদন বা ময়ান ফল, আরগ্বধ বা আমলতাস, কুচিয়া, খদির, ভল্লাতক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার কাননশ্রী দিগ্ উজ্জ্বল করিতেছে। তদ্ব্যতীত লোধ্র, পাটলী, তিন্তিড়ী, বংশ, বট, অশ্বত্থ এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষের অসম্ভাব নাই। জঙ্গলী মনুষ্যেরা উক্ত নানা জাতীয় বৃক্ষের ফল মূল কটকে আনিয়া বিক্রয় করে, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ পায়। বনমধ্যে এক সুদীর্ঘ লতিকা দৃষ্ট হয়, তৎস্থানীয় লোকেরা তাহাকে 'শিয়াড়ী' কহে। তাহার পত্রে দীনদিগের গৃহাচ্ছাদন হয়, এবং তাহার বল্কলে তদ্বল্কলী রজ্জুর ও মাদুর প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ফল প্রকাণ্ড শিম্বাকার শস্য ও কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন, কিন্তু তন্মধ্যে ৪।৫ টি বীজ আছে, তাহার আস্বাদন বাদামের ন্যায় মিষ্ট। পর্ব্বতীয় লোকেরা তাহা অতি প্রিয়জ্ঞান করে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা জাতীয় তরুলতা সর্ব্বত্রই দ্রষ্টব্য; বোধ হয় উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে অদ্যাপিও তত্তাবতের নাম সংগ্রহ হয় নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় প্রতি বিটপ এবং বল্লীর নাম সামান্য উৎকলীয় ভাষায় পাওয়া যায়। বোধ হয়, ফল মূলাদিতেই তত্রত্য লোকের উদর পূর্ত্তি হওনের সবিশেষ সাপেক্ষতা থাকায় এইরূপ বৃক্ষাদির প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। বেত্র ক্ষুদ্র জঙ্গলাকারে সর্ব্বত্র দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে বরুণ বৃক্ষের সমুজ্জ্বল পুষ্পাবলী তথা পলাশের অতি লোহিত কলিকাপুঞ্জ এবং শাল্মলি প্রভৃতির অগ্নিবর্ণ কুসুম-ছটায় দশ দিক্ দীপ্তিমতী হইয়া যায়। শীতকালে বৃহদ্বৃহৎ বৃক্ষোপরি ২-৩ বিধ লোহিত এবং পীত মুকুল মঞ্জরিত মুক্তলতা সুসজ্জিত হইতে থাকে। ঔষধি শ্রেণীতে বহুপ্রকার গুল্ম গণনা

করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বনহরিদ্রা বা শটী চক্ষুগোচর হয়। তড়াগ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে নানাবর্ণের পঙ্কজ প্রতিভাত আছে ; এক এক স্থানে পদ্মের প্রচুরতা অতি প্রমোদজনক।

পর্ব্বতাঞ্চল হইতে বকম, আচু এবং পলাশ এই তিনপ্রকার পুষ্প রঙ্গ প্রস্তুত করণার্থে আনীত হয়। আচু বৃক্ষ পটভূমিতে সুন্দর রূপ চাসদ্বারা উৎপন্ন করিলে বিহিত লাভের সম্ভাবনা আছে।

অপর লাক্ষা, কৌশেয়, মধু, মধুথ এবং ধূনা প্রভৃতি উৎকল-দেশীয়-পর্ব্বতাঞ্চলের প্রধান বন কর-পদবীতে গণনীয়। আর ঐ সকল পদার্থ তদঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে-প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত প্রকার-কৌশেয় তন্তুদায়ী কীট সকল অন্যস্থানীয় কীটাপেক্ষা বৃহৎ ; তাহারা 'আসিন' নামক বৃক্ষের পত্রে পরিপালিত হয়।

উৎকলের পশ্চিম সীমায় এবং অভ্যন্তর প্রদেশে যে সকল জঙ্গল আছে, তত্তাবতে হিংস্র জন্তুর অভাব নাই। ব্যাঘ্র, চিত্রক, ঋক্ষ, কৃষ্ণদ্বীপী, ভল্লুক, মহিষ, কৃষ্ণসার, অন্যবিধ হরিণ, বরাহ, বালিয়া বা সাটা, রোহিনী নামক বন্য কুক্কুর, নীলগাওর সদৃশ 'ঘোড়াঙ্গা' নামে খ্যাত পশু, গয়াল নামক ভয়াবহ জঙ্গলীয় গোরু প্রভৃতি পশু সর্ব্বত্র দেখা যায়। গয়ালের শৃঙ্গ অতি সুদৃশ্য বোধ হয় ; ইহাই প্রাচীন কবিদিগের ব্যাখ্যাত 'গবয়' হইতে পারে। ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে বন্যহস্তী যূথে যূথে বিচরণ করে। তাহারা পূর্ব্বে পূর্ব্বে বন সীমান্তরালবর্ত্তি গ্রামসমূহে অত্যন্ত উৎপাত করিত। এক সময়ে তাহাদিগের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে উৎকলের রাজা এক অবধূতের পরামর্শ মতে তাহাদিগের বিলক্ষণ শাসন করিয়াছিলেন। তদ্বিশেষ এই যে যেরূপ তণ্ডুলের গোলা পালিত হস্তিদিগকে দেওয়া যায়, তদ্রূপ পিণ্ড সকল প্রস্তত করিয়া তাহাতে বিষম্রক্ষিত-করণ-পূর্ব্বক যে সকল স্থানে হস্তিযূথ প্রতিনিয়ত বিচরণ করে, সেই সকল স্থলে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। করিকুল ঐ সকল পিণ্ডভক্ষণ করিয়া গতাসু হইতে থাকিল ; তাহাতে অন্যূন ৮০ টা হস্তিশব বন মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; অবশিষ্ট হস্তী সকল ভয়ার্ত্ত হইয়া ময়ূরভঞ্জ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটস্থ অধিকারান্তরে যাইয়া আশ্রয় লয়। ময়ূরভঞ্জে! এইক্ষণে যে সকল হস্তী দেখা যায়, তাহাদিগের আকৃতির খর্ব্বতাহেতু কোন কোন মহাশয় এরূপ অনুমান করেন যে, তাহারা তদ্দেশীয় অটবীর আদিম প্রজা নহে, পূর্ব্বতনকালের রাজাদিগের পালিত হস্তী সকল কোন সময়ে বনমধ্যে পলায়ন পূর্ব্বক বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকিবেক, সুকিন্দা প্রদেশে হস্তীর উপদ্রব অদ্যাপি আছে, তন্নিমিত্ত তত্রত্য রাজা সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকেন।

উৎকলের বিহঙ্গবর্গ বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রকার পক্ষী উৎকল-বিহারী। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন নায়ক নায়িকাদিগের প্রিয় সারস মরাল, ময়ূর শুক, মদন, শারিকা (ময়না) প্রভৃতি বিহঙ্গ গিরিজ-কানন-কলাপে এবং কেদার-মধ্যে অহরহ বিরাজ করিতেছে। তদ্ব্যতীত ধনেশ নামক এক পক্ষী, যাহাকে উৎকলীয় লোকেরা 'কুচিলাখায়ী' কহে, তাহা অতি চমৎকারজনক। তাহার চঞ্চুপুটের ঊর্দ্ধে এক শৃঙ্গ আছে। ঐ পক্ষী শূন্যমার্গে দলবদ্ধ হইয়া যে সময়ে গ্রীবা-বিস্তারকরণ পূর্ব্বক উড্ডয়ন করে, সেই সময় বহুদূর হইতে ঐ শৃঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কুচিলা ফল ভক্ষণে এই পক্ষী আসক্ত-বিধায় কুচিয়াখায়ী নাম পাইয়াছে। উৎকলীয় লোকেরা ইহার মাংস উপাদেয় জ্ঞান করে। বাতরোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী, এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্য যোগে এই মাংসে বাত তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা ৪-৫ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকে।

[রহস্য সন্দর্ভ—২য় পর্ব্ব—১৯২০-২১ সংবৎ। ১৫ খণ্ড পৃঃ ৪০-৪৩]

কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা—

"আমাকে এ সভার প্রধান আসনে আহূত করা শোভনীয় হয় নাই, যেহেতু আমি এ দেশীয় মনুষ্য নহি; বিশেষতঃ এ সভার উদ্দেশ্য উৎকল ভাষার উদ্দীপন, সুতরাং তদ্ভাষাতেই ইহার কার্য্যাদি নির্বাহ হওয়া বিধেয়; আমি বিদেশীয় লোক, উৎকল-ভাষা-কথনে আমার তাদৃশ পটুতা নাই, অতএব এরূপ স্থলে অযোগ্য-পাত্রে নিরতিশয় সম্মান প্রদত্ত হইতেছে। পরন্তু যদ্যপি আপনারা আমাকে আমার মাতৃভাষায় কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করণে অনুমতি দেন, তবেই আমি এ গৌরবাস্পদ-আসন-গ্রহণে সাহস করিতে পারি।"—

(উপস্থিত সভ্যেরা বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করণে অনুমতি দিলেন)

বক্তৃতা।

"উৎকল-ভাষা এবং বঙ্গভাষার মধ্যে তাদৃশ বিভিন্নতা নাই, একথা সকলেই অবগত আছেন। সকল ভাষারই ভিত্তি এবং পত্তন স্বরূপ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়া,—এই চতুর্বিধ ভাষামূল উৎকল এবং বঙ্গভাষায় প্রায় একই প্রকার, কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিগত প্রত্যয় সকল এক প্রকার না হইবাতে প্রভেদ বোধ হইয়া থাকে। অপর, বিশেষণ ও বিশেষ্য বাচক শব্দ সকলের উচ্চারণও প্রায় একপ্রকার, তবে এদেশে, অদন্ত শব্দাবলী যথাক্রমে উচ্চারিত হয়, আমাদের দেশে ঐ অদন্ত স্থলে হসন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর উৎকলে বহুতর শব্দের অন্তে বা মধ্যে 'ল' বর্ণ বিভিন্ন প্রকারে উচ্চারিত হয়। পরন্তু এই দ্বিতীয় প্রকার 'ল' কিছু উৎকল দেশে সৃষ্ট হয় নাই; দ্রাবিড়াদি দক্ষিণ দেশে তাহা প্রচলিত আছে, এবং ফ্রান্সীয় কোন মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, উক্ত বর্ণ বেদ-মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অধুনা আর্য্যাবর্ত্তে অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর ও মধ্যদেশের অনেকাংশে ইহার লোপ হইয়াছে, সুতরাং উৎকলীয় লোকের মুখে উক্ত বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া উত্তরস্থ লোকেরা 'উড়িয়া কড় মড়' বলিয়া উপহাস করেন। ফলতঃ উপহাসের কোন বিষয় দেখা যায় না। ললিত অর্থাৎ শ্রুতমধুর বর্ণ মধ্যে 'ল' বর্ণটী প্রধান, তাহার অন্যতর উচ্চারণ দেশভেদে বিলুপ্ত; সুতরাং ললিত বোধ হয় না। যে বর্ণ আমাদিগের কষ্ট শ্রেষ্ঠে উচ্চার্য্য তাহাই কঠোর বোধ হয়, বিশেষতঃ 'ল' বর্ণের আদ্যতালব্য, উচ্চারণ সুমধুর এবং অনায়াসে রসনা দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে; এই জন্যেই আমাদিগের শ্রুতি-বিবরে উৎকলে প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় প্রকার উচ্চারণ মিষ্ট বোধ হয় না, গীতগোবিন্দে বর্ণিত "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে," এই পদ আবৃত্তি-সময়ে কবির অভিপ্রেত অনুপ্রাস ভঙ্গ করিয়া উৎকলীয় পণ্ডিতেরা তিনটী ল একপ্রকার এবং অপর চারিটী ল অন্য প্রকারে উচ্চারণ করিবেন, ইহা বিশুদ্ধ হইলেও আমাদিগের নিকট ললিত বোধ হয় না।

পরন্তু উৎকলীয় সর্ব্বনাম-সমূহ যেরূপ সংস্কৃত-মূল হইতে উৎপন্ন, বঙ্গীয় সর্ব্বনাম সকলও তন্মূল-হইতেই প্রজাত; বরং উৎকলীয় 'আম্হ' 'তুম্হ' প্রভৃতি সর্ব্বনাম অবিকল প্রাকৃত; বঙ্গীয় সর্ব্বনাম 'আমি' 'তুমি' সবিশেষ অপভ্রংশ দশাপ্রাপ্ত। তৃতীয় পুরুষের একবচনে সংস্কৃত

'সঃ' হইতে 'সে' উৎপন্ন হয়; ইহা উৎকল এবং বঙ্গভাষায় একাকারেই বর্ত্তমান; কিন্তু বঙ্গভাষাতে ইতরাভিধান স্থলেই ব্যবহৃত, গৌরবো ক্তি স্থলে বাঙ্গালায় তৎ হইতে তিনি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

অপর, কৃ, ভূ, স্থা, এবং গম্ প্রভৃতি সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎকল ও বঙ্গভাষায় অশেষবিধ ক্রিয়ার বিশেষর্থ প্রকাশ করে; কিন্তু বঙ্গাপেক্ষা উৎকলে ক্রিয়ার বিভক্তি সকল অনেকাংশে অদ্যাপি পূর্ব্বরীতির অনুসারে সংযোজিত হইয়া থাকে, যথা সংস্কৃত 'ভবন্তি' প্রাকৃত 'হোন্তি' উৎকল 'হুঅন্তি'। বাঙ্গলা ভাষায় কেবল গৌরব সূচনার সময়ে 'তি' লুপ্ত হইয়া হন্ মাত্র অবশিষ্ট আছে। 'স্থা' ধাতু স এবং থ এই দুই বর্ণে সংযুক্ত, বাঙ্গলাতে স স্থলে 'ছ' হইয়াছে; যথা, ছিলা, উৎকলে 'থ' মাত্র ব্যবহৃত; সুতরাং 'ছিলা' স্থলে 'থিলা' হয়। এইস্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিগত প্রত্যয় বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাউক। আদৌ সংস্কৃত-জাত-ভাষা সমূহে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের একবচনে ক্রিয়া-সকল স্ব স্ব কর্ত্তার প্রকৃতির অনুসারে ই-কার উ-কার এবং এ-কার প্রত্যয়যুক্ত হইত এমত অনুভব হয়; কিন্তু কালক্রমে এ নিয়মে বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে; যথা, কৃ ধাতুর অন্তর্গত ক্রিয়ার প্রথমা বিভক্তিতে একবচন ও ভবিষ্যৎকালে কোন দেশে 'করিব' কোন দেশে 'করিমু' এবং দেশান্তরে করিমি হইতেছে। কিন্তু শেষোক্ত বিভক্তির আকারই প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ, যেহেতু সংস্কৃত করিষ্যামির অপভ্রংশে 'করিমি' বিহিত বোধ হইতেছে, বলা বাহুল্য উৎকলে এতদাকারেই উহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

এইক্ষণে ষট্‌কারক সম্বন্ধে উৎকলে এবং বঙ্গভাষায় যে সকলে বিভক্তি হয়, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ বক্তব্য। প্রথমার একবচনে সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অকার বিসর্গান্ত হয়; এ নিয়ম উৎকলে ও বঙ্গভাষায় বিলুপ্ত হইয়াছে। উৎকল ভাষায় কর্ত্তৃবাচ্যে শব্দ সকল অদন্ত, বঙ্গভাষায় সে স্থলে হসন্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীতে উৎকলে 'কু' এবং বাঙ্গলায় 'কে' প্রত্যয় হয়। তদ্রূপ তৃতীয়া এবং সপ্তমীতে উৎকলীয় 'রে' প্রত্যয়স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় 'তে' প্রত্যয় হয়। তদ্ভিন্ন উভয়ভাষাতেই 'এ' প্রত্যয় একাকারেই আছে। পঞ্চমীতে উৎকলের 'রু' ও বু স্থলে বাঙ্গলা ভাষায় 'হইতে' 'থেকে' ইত্যাদি প্রত্যয় হয়। ষষ্ঠীর চিহ্ন 'র' উভয় ভাষাতেই একপ্রকার, কোন ভেদ নাই। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত কহেন, এই সকল প্রত্যয় চিহ্ন কিছুই সংস্কৃত অনুযায়ী নহে। হিন্দুজাতি এই সকল প্রত্যয় বিশেষতঃ তৃতীয়া এবং সপ্তমীর চিহ্ন 'কু' এবং 'কে' ভারতবর্ষীয় আদিম জাতীয়দিগের স্থানে পরিগৃহীত করিয়াছেন, যেহেতু তাহাদের ভাষাতে 'কু' প্রত্যয় আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অপর এক সম্প্রদায় বিদ্যাবিশারদ দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে; তন্মধ্যে আমার সুবিখ্যাত শব্দশাস্ত্র-বিদ্ বন্ধু বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে আমি অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা করি। ইংলণ্ডীয় সুপ্রসিদ্ধ রএল আশিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য-পুস্তক-বিশেষে লিখিত হইয়াছিল, সংস্কৃত অধিকরণ কারক বিশেষে 'কৃতে' প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় প্রাকৃত ভাষায় 'কি তো' তদনন্তর অপভ্রংশে 'কে আে' এবং পরিশেষে 'কো' হইয়াছে, হিন্দী ভাষায় অদ্যাপি ইহা এতদাকারেই আছে। উৎকলে 'কু' এবং বাঙ্গালা ভাষাতে 'কে' হইয়াছে। এইরূপ সংস্কৃত 'ঋতে' স্থলে 'রে' ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার অনেচনক মিত্র এ সিদ্ধান্তে সন্তুপ্ত হন নাই। তাঁহার মতে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষার্থে বা স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হইবার রীতি আছে, তাহা হইতেই, হিন্দী 'কোং', উৎকলীয় 'কু' এবং বাঙ্গলা 'কে' সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অপরাপর প্রত্যয়ের প্রভিন্নতা ও স্বয়ীকৃত হইতে পারে, তদ্বিস্তার বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র। ফলে এই কতিপয় প্রত্যয়ের ভিন্নতায় বাঙ্গলা এবং উৎকল ভাষার মধ্যে ঔদাসীন্য প্রতিপন্ন করা অনভিজ্ঞতা মাত্র; তাহা হইলে

বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভাষাকে এক স্বতন্ত্র ভাষা বলা কর্ত্তব্য হয়; যেহেতু তথায় 'করিব' স্থলে 'করিমু' হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কলিকাতার বাঙ্গলা এবং চট্টগ্রামের বাঙ্গলার মধ্যে যত প্রভেদ দেখা যায়, তাহা বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা এবং উৎকলায় সাধুভাষার মধ্যে দ্রষ্টব্য নহে। আমি বাঙ্গলা এবং উৎকল ভাষার একজাতিত্ব এবং নিকট-সম্বন্ধ বিষয়ে এতাবন্মাত্র অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম; এবং উৎকলে সর্ব্ব-গৌরবাধান সংস্কৃত ভাষানুযায়িনা নিয়মাবলীর যে প্রাচুর্য্য আছে তাহাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বাঙ্গলা দেশ সার্দ্ধ ছয়শত বর্ষ যবনাক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু তদ্দেশীয় ভাষায় বিজাতীয় অর্থাৎ পারস্য আরব্য শব্দের যে পরিমাণে সংস্রব দেখা যায়, তদপেক্ষা উৎকল ভাষায় তাহা সমধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত এমত বোধ হয়, অথচ উৎকল দেশে মুসলমানদিগের সমাগম সার্দ্ধ তিনশত বৎসরও সম্পূর্ণ হয় নাই। সত্য বটে মুসলমানেরা যে সকল দেশ অধিকৃত করে, সে সকল দেশে আপনাদিগের ধর্ম্ম, ভাষা, রীতি, নীতি প্রভৃতি প্রচলিত করণে অতিমাত্র সোৎসুক, তথাপি পরাভূত দেশীয়দিগের তত্তাবৎ অবাধে অঙ্গীকার করা উচিত নহে। মুসলমানদিগের অধিকারের পূর্ব্বে উৎকল-প্রদেশে ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্য প্রণালী স্থাপিত ছিল। এখানে দেশের বিভাগ সকল "খণ্ড" এবং "বিচ্ছিত্তি" (অপভ্রংশ বিসী) নামে খ্যাত হইত। মুসলমানেরা তৎপরিবর্ত্তে 'পরগণা' ও 'চাকলা' শব্দ প্রচলিত করে, কিন্তু অদ্যাপি 'খণ্ড' এবং 'বিসী' শব্দ অনেকস্থলে অন্তর্হিত হয় নাই; যথা, কেরবাল খণ্ড, তপনখণ্ড, বালুবিসী, ভেরাবিসী ইত্যাদি। অপর এদেশে ভারতবর্ষের সনাতন নিয়মানুসারে দেশাধিকারী এবং গ্রামাধিকারী পদের প্রচলন ছিল; অদ্যাপি 'দেশপণ্ডা,' এবং 'গ্রামপণ্ডা' শব্দের তিরোধান হয় নাই। মুসলমানেরা তৎপরিবর্ত্তে "মোকদ্দম" এবং "সরবরাঃকার" প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করে। অদ্যাপি 'স্থানপতি' এবং 'পদপতি' এতদুভয় প্রকার প্রজার আখ্যা 'থানী' এবং 'পাহী' শব্দদ্বয়ে জাগরূক আছে। অনেকস্থলে এইক্ষণেও চৌকীদারকে 'দণ্ডবাসী' কহে। এইরূপ প্রীতিকর উপাদান সকল সত্ত্বেও উৎকল-ভাষায় মুসলমানী শব্দের প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করা অতীব পরিতাপের বিষয়, আমরা বিদেশীয় শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষ নহি, যে স্থলে কোন বিদেশীয়, শব্দ ব্যতীত মানসিক ভাব বিশেষ ব্যক্ত করণের উপায় নাই, সেই স্থলেই তাহা ব্যবহার করা বিধেয়, নতুবা দুই ছত্র উৎকল বা বাঙ্গলা লিখনে শতকরা ৫০-৬০ পারস্য শব্দের ব্যবহার নিতান্ত নিন্দনীয়। এইরূপ কুরীতি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশেও অবলম্বিত হইত। কিন্তু এইক্ষণে তাহা অপসারিত হইয়াছে। আর কেহ এক্ষণে মুসলমানী বাঙ্গলার প্রিয় নহেন। তবে বিচারালয়-সমূহে অদ্যাপি কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু স্বদেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত লোক সকল যত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন, ততই তাহা দিন দিন অশ্রদ্ধেয় হইয়া আসিতেছে। উৎকল দেশেও তদ্রূপ সঙ্ঘটনের বাধা কি? হালিডে সাহেবের সময় হইতে অদ্যাবধি গবর্ণমেণ্ট বারংবার অনুজ্ঞা করিতেছেন, সুশিক্ষিত লোক ব্যতীত অন্য কেহ তাইদ্ এবং আমলা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেক না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাপি এই রুচির রাজাদেশ ফলবান হইতেছে না। প্রধান পদস্থ আমলাগণ প্রকৃতপক্ষে রাজদ্বারে প্রবল; তাহারা আপনাদিগের নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে অধীন আমলা পদে সর্ব্বথা প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে, তৎ প্রযুক্ত এই কুরীতির উচ্ছেদ করা সুকঠিন হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই সভা সময়ে সময়ে ইহার নিরাকরণ-নিমিত্ত বিহিত চেষ্টা পাইবেন। আমলাদিগের মূর্খতম জ্ঞাতি গোষ্ঠীজ কোন ব্যক্তি রাজকার্য্যে যখন প্রবিষ্ট হইবেক, সভা তৎক্ষণাৎ তাহা রাজপুরুষদিগের সুগোচর করিবেন এবং যাহাতে সুশিক্ষিত

লোক প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহাতে যত্নশীল হইবেন। তবে ইহাও লজ্জার বিষয়, এদেশীয় লোকেরা বিশুদ্ধ নিয়মে শিক্ষা প্রাপণে তাদৃশ উদ্যোগ পরায়ণ নহেন, সুতরাং সুশিক্ষিত লোকের সঙ্খ্যা নিতান্ত অল্প। সভা এ বিষয়ের প্রতীকারপক্ষে প্রয়াস পাইবেন, যাহাতে দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব সন্তানগণকে রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তৎপক্ষে কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিবেন।

আমি অতঃপর ভাষার উৎকর্ষ-সাধন-বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের বাঙ্গলাভাষা নিতান্ত অল্পকাল মধ্যে কিরূপে শারদীয়-পদ্মবন-বৎ সৌষ্ঠবান্বিত হইয়াছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই স্থিরীকৃত হয়, যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এবং কোন কোন ধর্ম্ম-প্রচারক-সম্প্রদায়ের প্রযত্নেই তাহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ কর্ত্তৃক উক্তধর্ম্ম বিষয়ক সংকীর্ত্তনের পদাবলী সংরচিত হয়। তদনন্তর শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সময়ে তাহা বিপুলীকৃত হইয়া আইসে। অপর শ্রীরামপুরের মিশনরি এবং মহাত্মা রামমোহন রায় যে সকল সংবাদপত্র এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন, তৎসমুদায়ের মূলাভিপ্রায় স্ব স্ব ধর্ম্মের বা মতের প্রকৃষ্ট প্রচার মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রকৃত অভিসন্ধি যত সিদ্ধ হউক বা না হউক বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে তাহাদিগের প্রয়াস বিশেষ হিতকর হইয়াছে। বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা লিখনের তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা এক আদর্শ; ইহাও উক্ত ধর্ম্ম-প্রচার উদ্যোগের এক ফলমাত্র। ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ভাষার উৎকর্ষ সাধনের হেতু এই যে প্রচরণীয় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম যত সহজে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় ততই ফল লাভের সম্ভাবনা; সুতরাং সহজে আন্তরিক প্রগাঢ় ভাব সমূহের স্ফূর্ত্তি করিবার প্রয়াস হইলেই ভাষার প্রসাদ এবং ওজঃ গুণ প্রভৃতি বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে ধর্ম্মপ্রচার সঙ্কল্পে ভাষার শ্রী সাধিত হইলেও তাহা উপায়ান্তর দ্বারাও অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাতে গ্রন্থাদি রচনার রীতি নিতান্ত আধুনিক নহে। ৯০০ বৎসর হইল, ত্রিপুরার রাজবংশীয়দিগের বিবরণ 'রাজমালা' গ্রন্থে লিপি করণারম্ভ হয়। পরন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের বয়স ৪০০ বৎসরের ন্যূন নহে। তদনন্তর কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কাশীদাসী মহাভারত, প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হয়। এক শত বৎসর হইল ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক অন্নদামঙ্গল কাব্য প্রণীত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদাৎ এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইলে পর আমাদিগের দেশে গ্রন্থাধ্যয়নের পিপাসা প্রবল হইল। এই সকল গ্রন্থ প্রচারে শ্রীরামপুরের মিশনরি সাহেবেরা এবং রামমোহন রায়ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। উক্ত মিশনরিদল রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ আপনাদিগের যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের পিপাসা একবার প্রবল হইলে আর তাহা সহজে পরিতৃপ্ত হইবার নহে। যেরূপ প্রাকৃত পিপাসায় আতুর হইয়া মনুষ্য অতি কলঙ্কিত পঙ্কিল পয়ঃ-প্রণালীস্থ সলিলকেও সুধাজ্ঞানে পান করিতে থাকে, কিন্তু পানান্তে তৃপ্তি লাভ হয় না, সে তখন নির্ঝরস্থ স্ফটিক-সন্নিভ নির্ম্মল বারি অন্বেষণ করিতে থাকে, সেইরূপ বিদ্যাপিপাসাতুর মনুষ্য প্রথমতঃ যাহা সমক্ষে পাপ্ত হয়, তাহাই পরম মধুর জ্ঞানে আস্বাদন করিতে থাকে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তাহার পরিজ্ঞান জন্মিতে থাকে; তখন ঘৃণা সহকারে অতৃপ্তি আসিয়া সমুদিত হয়। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি তখন বিমলবিদ্যাবারি অনুসন্ধান করিতে থাকেন। উৎকল দেশে এক্ষণে কথঞ্চিদ্রূপে সেই পিপাসা জন্মিয়াছে। অতএব যে সকল পুরাতন কাব্য গ্রন্থাদি তালপত্রে বর্ত্তমান আছে, তত্তাবৎ মুদ্রিত করা আবশ্যক। এই সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে,

উৎকলে ভাষা রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতাদি গ্রন্থ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে; কিন্তু তত্তাবতের প্রণয়নের কাল স্থিরীকৃত হয় নাই। এই সকল গ্রন্থ প্রণেতাগণ কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে বর্ত্তমান ছিলেন, ইত্যাকার শুশ্রূষণীয় বিষয়সকলও এই সভার যত্নে নিরূপিত হইতে পারে। গ্রন্থসকল নিতান্ত অশুদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের পঙ্কোদ্ধার হইলে সমধিক প্রতিষ্ঠার কার্য্য হইবেক। অপর রাজা প্রতাপরুদ্রের সময়ে দীনকৃষ্ণদাস নামক এক কবি কর্ত্তৃক "রসকল্লোল" আদিকাব্য বিরচিত হয়। তদ্ব্যতীত অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, ভারতচন্দ্রের সমকালে ঘুমশরাধিপতি উপেন্দ্রভঞ্জ কর্ত্তৃক "বৈদেহীশ বিলাস", "সুভদ্রা পরিণয়", "কাঞ্চনলতা" এবং "প্রেমসুধানিধি" প্রভৃতি বহুতর কাব্যকলাপ বিকাশমান হয়। যদিও এই সকল কাব্যে ভাবালঙ্কার অপেক্ষা শব্দালঙ্কারের অতিশয় প্রাচুর্য্য, তথাপি তত্তাবৎপাঠে প্রণেতাগণের অসাধারণ ক্ষমতা প্রতিপন্ন হইতে থাকে। অতএব এই সকল গ্রন্থ অতি সুলভমূল্যে মুদ্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রদেশ মধ্যে প্রচারিত করা প্রয়োজন। যখন সর্ব্বসাধারণ সকল প্রকার শ্রেণীস্থ লোক তত্তাবৎ পাঠ করিতে করিতে ক্রমে তাহাদিগের মনে সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্য প্রভৃতির কথঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইতে থাকিবেক; তখন তাহারা তদাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ-করণার্থ উদ্যোগ পাইবেক। সেই সময়ে বিসদ-ভাবপূর্ণ ললিত ভাষায় ভাষিত গ্রন্থ সমূহ প্রণয়নের প্রয়োজন হইবেক। পরমেশ্বর কোন অভাব চিরদিন জন্য প্রাদুর্ভূত রাখেন না, সর্ব্বপ্রকার অভাব নিরাকরণ নিমিত্তে মনুষ্যের মনে সমুচিত বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন; অবশ্যই অকুলানে সঙ্কুলান হয়। অত্রত্য বিদ্যালয়-নিকরে অধুনা যে সকল বালক অধ্যয়ন করিতেছে, কালে তাহারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং সুকবি হইয়া উঠিতে পারে। কোন ইংলণ্ডীয় কবি কহেন, "কাননে অনেক মনোহর পুষ্প বিকসিত হইয়া জাঙ্গলীয় সমীরে আপনাপন মধুর সৌরভ-ভার বিধ্বংস করিতেছে, এবং কত কত সুবিমল জ্যোতির্ম্ময় রত্নাবলী রত্নাকরের নিয়ত-তিমিরপূর্ণ তরঙ্গমালামধ্যে নিহিত রহিয়াছে।" সেইরূপ আমাদিগের বিদ্যালয়-সমূহে অনেক ছাত্র থাকিতে পারে, যাহারা কালক্রমে বিদ্যা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক যশস্বান হইবে, এবং তাহাদিক দ্বারাই অনাদৃত উৎকলভাষা বিমল-বিভায় সন্দীপিত হইবেক। কিন্তু যেরূপ কোন পুত্তলিকা গঠন করিতে হইলে প্রথমে তৃণ মৃত্তিকা প্রভৃতির আবশ্যকতা আছে, সেইরূপ সদ্ভাষার সৃষ্টি কল্পে তাহার প্রধান উপাদান পূর্ব্ববিরচিত গ্রন্থাদির আবিষ্কার। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে এই সভা উৎকল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থসকল সংগ্রহকরণপূর্ব্বক যথাক্রমে এবং যথানিয়মে মুদ্রিত ও প্রচারিত করুন।"

দীনকৃষ্ণদাস

আমাদিগের পাঠকেরা পাছে 'উড়িয়া কবিতা' এই শিরোভূষণ দৃষ্টে বিরক্ত হন, এজন্য আমরা উপস্থিত প্রস্তাবের শিরোভাগে 'দীনকৃষ্ণদাস' ইতি নামাক্ষর প্রদান করিলাম। একথা বলা বাহুল্য, উড়িয়া দেশের কোন কথা এইক্ষণে জনসমাজে উপস্থিত করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়; উড়িয়া শব্দ বীভৎস-রসের উদ্দীপক হইয়াছে! ফলে বাঙ্গলাদেশের অপেক্ষা উৎকল দেশের এক সময়ে প্রভূত পরাক্রম ছিল, এক সময়ে উৎকলীয় লোকেরা বাঙ্গলাদেশের উত্তমাংশকে স্বকরতলে আনিয়াছিল, এবং বাঙ্গলা দেশের সহিত তুলনায় উৎকল দেশ স্বল্পকাল মাত্র পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে।

নীতিবেত্তাগণ নির্ণয় করিয়াছেন, যে জাতি যে সময়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে সেই সময়ে তদ্দেশে শরীর ও মানসের সুখ বিধানকারি কলাকলাপ উৎকর্ষলব্ধ হইতে থাকে। পরাধীনতায় শরীর এবং মনের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে, সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহে কোন সুখকর বিষয়ের উন্নতি সাধন হইতে পারে না। অতএব উৎকল দেশে স্বাধীনতার সংস্থাপন যদ্যপি বহুকাল ব্যাপি এমত সপ্রমাণ হয়, তবে তদ্দেশে কলাকলাপের সমুন্নতি হওয়া অবশ্যই প্রতীক্ষণীয়। ফলতঃ উক্ত দেশের বিবরণ প্রতিদিন যত সুগোচর হইতেছে, ততই তদ্দেশের পূর্ব্বতন প্রতিভা প্রকাশ পাইতেছে। বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা উৎকল দেশে পরিভ্রমণ করিলে বহুতর প্রাচীনকীর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। উৎকলে অদ্যাপি যে সকল পর্ব্বত প্রমাণ দেবমন্দিরাদি আছে, তাহাতে তদ্দেশীয় লোকের স্থাপত্যবিদ্যা-সম্বন্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। পুরুষার্থ-বর্দ্ধায়ক কলাকলাপের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ বিদ্যা যেরূপ গরিমাভাজন কবিতা তদিতর নহে, বরং কোন কোন মহাশয়ের মতে তদপেক্ষা উচ্চতর পদবীতে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে পূর্ব্বতন কালের উৎকলীয়েরা যদ্যপি স্থাপত্য বিদ্যায় বিচক্ষণতা লাভ করিয়া থাকে, তবে কবিতা কলায় যে নিতান্ত অপটু ছিল ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। আমরা এই বিষয়ের অনুসন্ধানে এইক্ষণে প্রবৃত্ত আছি। তন্মধ্যে যতদূর প্রবিষ্ট হইতেছি, ততই ইহা নিঃসন্দেহে প্রতীত হইতেছে যে বাঙ্গলা-কবিতা-জননের অনেক পূর্ব্বে উৎকলীয় ভাষায় কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং বাঙ্গালি পূর্ব্বতন কাব্যকারদিগের অপেক্ষা উৎকলীয় কবিরা হীনকল্প নহেন, বরং কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের প্রাধান্য দেখা দেয়। উৎকল কবিদের মধ্যে কেহ কেহ ৩০—৪০ খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত মহাভারত, রামায়ণ এবং ভাগবতাদি গ্রন্থ বহুকাল পূর্ব্বে উৎকলীয় গদ্যে বিন্যস্ত হইয়াছে। আমরা উৎকলীয়-কবিতা-বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া দীনকৃষ্ণদাসের চরিত এবং কবিতা-শক্তি-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি।

প্রবাদ আছে, দীনকৃষ্ণদাস রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অসাধারণ ক্ষমতা-বিশিষ্ট পূর্ব্বতন ব্যক্তিদিগের জন্মপ্রকরণ কস্মিন্ কালেই প্রায় যথাবৎ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লোক সকল তাঁহাদিগের দৈবশক্তির অর্চ্চনাছলে তাঁহাদিগের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতিও দৈবী সঙ্ঘটিত করিয়া দেয়। দীনকৃষ্ণদাসের জন্মকাণ্ডও অলৌকিক ঘটনায় আচ্ছন্ন। ইঁনি কুলস্ত্রীর গর্ত্তজাত নহেন। অপ্রকাশ নাই, ভারতবর্ষে পুরাকালে দেবমন্দিরাদিতে এক জাতি বারাঙ্গনা নাট্যক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিত। এইক্ষণেও দক্ষিণদেশে এই রীতি প্রবাহিত আছে; পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরে নিযুক্ত নর্ত্তকীরা 'মাহারী' আখ্যায় বিখ্যাত। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, তাহারা কৌমারাবস্থায় প্রত্যহ যামিনীযোগে জগন্নাথের সেবা পরিচর্য্যায় যথা পর্য্যায়ে নিবেশিত হইত। কেহ জগন্নাথের অঙ্গে চন্দন লেপন করিত, কেহ চামর-ব্যজনে, কেহ বাদ্য-

বাদনে, কেহ কেহ জগন্নাথের সুখনিদ্রা-কর্ষণার্থ গীত গাথনি নৃত্য-রঙ্গে নিশীথ অতিবাহিত করিত। উক্ত কর্ম্মে অদ্যাপি মাহারীগণ নিযুক্ত আছে, কিন্তু উল্লিখিত কৌমারাবস্থার নিয়ম নাই। বলা বাহুল্য, দীনকৃষ্ণদাস এবম্প্রকার এক দুর্ভাগার পুত্র। কথিত আছে, দীনকৃষ্ণদাসের মাতার নাম রত্নকলা। রত্নকলা কৌমার-বিগতে নিশাযোগে জগন্নাথ সেবায় প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইলে দিবা-যামিনী জগন্নাথের চরণে চিত্তার্পণ করিয়া কালযাপন করিতে থাকিল; কহিল, "যে স্থলে তচ্চরণে কৌমার সমর্পণ করিয়াছি, সে স্থলে আমার যৌবনে তদ্ভিন্ন অন্যের স্বামিত্ব অর্হিতে পারে না।" এইরূপে কিছুকাল গত হইলে তাহার গর্ভে দীনকৃষ্ণদাসের জন্ম হয়; এই নিমিত্ত দীনকৃষ্ণ দাসকে জগন্নাথের পুত্র বলিয়া প্রবাদ হয়। তিনি স্বীয় বামনমূর্ত্তি পিতার ন্যায় হস্তপদাদি কুণ্ঠিত এবং মূক ছিলেন। রত্নকলা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া জগন্নাথ মন্দিরে লইয়া গিয়া একপার্শ্বে বসাইয়া দিয়া স্বয়ং সজলনয়নে জগন্নাথের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত এবং সন্তানের দুরদৃষ্ট জন্য আর্ত্তনাদ করিত। একদা জগন্নাথ যোগীরূপে সহসা তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বালকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিবামাত্র তাহার হস্তপাদাদির বিকলতা একেবারে দূরীভূত হইল, এবং তাহার রসনায় জগন্নাথের স্তোত্র সুমধুর স্বরে প্রস্ফুটিত হইতে থাকিল। রত্নকলা যোগিবরের চরণে পড়িয়া কৃতজ্ঞতাশ্রুসেচন করিতে লাগিল এবং প্রার্থনা করিল "হে দেব, যেন এই দীন দীনকৃষ্ণ তোমার চরিত্রগানে কৃতার্থ হয়।" যোগী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দীনকৃষ্ণ সেই অবধি শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত কাব্যসাগর মন্থন করিয়া জনসমাজে তাহার সার বিতরণ করিতে থাকিলেন। তাঁহার সেই কাব্যের নাম 'রসকল্লোল', তদ্বিরচিত আরও কতিপয় গ্রন্থ আছে, কিন্তু রসকল্লোল সর্ব্বোপরিস্থ। জনশ্রুতি আছে, প্রতাপরুদ্রদেব জারজ দীনকৃষ্ণের কবিত্ব-কথা শুনিয়া একদা তাঁহাকে সন্নিধানে ডাকাইয়া উপহাসচ্ছলে কহিয়াছিলেন, "কেমন, তোমার রসকল্লোল দ্বারা প্রস্তরে রস নিঃসৃত হইতে পারে কি না?" তাহাতে দীনকৃষ্ণদাস উত্তর করিয়াছিলেন, "যদ্যপি আমার ভক্তি থাকে, তবে পাষাণ হইতে রস নির্গত হওয়া আশ্চর্য নহে।" এই কথা বলিয়া খণ্ডৈক উপলোপরি স্বীয় গ্রন্থ স্থাপন করিবামাত্র ঐ প্রস্তরের কিয়দংশ তৎক্ষণাৎ দ্রবীভূত হইতে থাকিল। লোকে কহে ঐ শিলাখণ্ড অদ্যাপি খুর্দ্দার রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে।

আমরা দীনকৃষ্ণদাসের অলৌকিক জন্ম-বিবরণাদি বিষয়ে এতন্মাত্র লিখিয়া তাঁহার কবিতাশক্তির কিঞ্চিৎ অনুমোদন করিতেছি।

দীনকৃষ্ণদাসের কবিত্বের অসাধারণ-শক্তি বিষয়ে আমাদিগের তাদৃশ বিশ্বাস সংস্থিত হয় নাই। রসকল্লোল-কাব্যে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ এবং প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনে যথেষ্ট শক্তির স্ফূর্ত্তি দেখা যায়; পরন্তু আদি রসের প্রাধান্যে মার্জ্জিত রুচি সহৃদয়বর্গের মধ্যে মধ্যে চিত্ত বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। উৎকলীয়েরা বাঙ্গলা কবিদিগের অপেক্ষা বহু প্রকার ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদিগের সাহিত্যে সাহসের প্রচুরতা লক্ষিত হয়। বাঙালী কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র পারস্য ভাষায় সুপ্রবিষ্ট থাকাতে প্রসাদগুণ এবং যমক বা মিত্রাক্ষরের পারিপাট্য লাভ করিয়াছিলেন। উৎকল কবিরা তদ্বিষয়ে নিকৃষ্ট, তাঁহাদিগের মিল-সকল প্রায় একাক্ষরী, এ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখনের বাসনা আছে। আমাদিগের পাঠকেরা দীনকৃষ্ণদাসের কবিতা রচনার আদর্শ প্রতীক্ষা করিতে পারেন, অতএব তাঁহাদিগের কৌতূহল-প্রশমনার্থ আমরা রসকল্লোল হইতে বর্ষাবর্ণনার কিয়ৎ অংশ নিম্নভাগে প্রকটিত করিলাম। উৎকলীয় অক্ষরে সকলের পরিচয় না থাকিতে পারে, অতএব আমরা বঙ্গভাষায় তত্তৎপদের মর্ম্মানুবাদও দিতেছি। যথা,

পাহাড়িয়া কেদার

ক্রমে গ্রীষ্ম হলো শেষ, আষাঢ়ের সুপ্রবেশ,
করাল কালিকা* কাল ছাইল গগনে।
গরজিয়া সুগভীর, গ্রাসিল গিরির শির,
প্রলয় তিমিরে লুপ্ত করে দিক্‌গণে ॥
প্রকাশিয়া নিজবল, ভাসাইল ধরাতল,
হরষিত কৃষিদল পাইয়ে বরষা।
যাহার যে অভিলাষ, মনোমত করে চাস
কেদারে কেদারে ভরে গীতিকা সরসা ॥
কমলে কমল বংশ, ডুবিয়া হইল ধ্বংস,
মানস-সরসে হংস করিল গমন।
কূর্ম্ম মীন ভেকদল, প্রেমানন্দে, ঢল ঢল,
সরস সারদ ক্রৌঞ্চ আর বকগণ ॥
ভূধর কানন শোভা, জনগণ-মনো-লোভা,
নির্ব্বাণ পাইল বনে দাবানল-প্রভা।
কদম্ব কেতকী জাতি, মল্লিকা মালতী ভাতি,
কুটজ চম্পক যুই মোহে অলি-সভা ॥
বিয়োগী নীরদে কয়, এ যে মেঘ মেঘ নয়,
কাল নাগ প্রকাশিছে রসনা বিজলী।
কাল জাঙ্গলীরা করে, খেলে ভীম বেশ ধরে,
বৃষ্টি রূপে গরল পড়িছে তায় জ্বলি ॥
কেহ কয় তাহা নয়, ও যে বনমালী হয়,
কিবা অপরূপ রূপ কাল কলেবর।
শিরে শিখি পুচ্ছদাম, কিবা শোভে অভিরাম,
উঠিয়াছে ইন্দ্রধনু জন মনোহর ॥
সৌদামিনী পীত ধড়া, বলাকা মুকুতা ছড়া,
মন্দ, মন্দ মধু ধ্বনি [illegible]লী-নির্ঘোষ।
করুণা অমৃত বৃষ্টি, তাহে রক্ষা পায় সৃষ্টি,
কোন্ ভক্ত জন চিত্তে না দেয় সন্তোষ ॥

* শ্রীকৃষ্ণ, পক্ষান্তরে জলমালা বিশিষ্ট অর্থাৎ মেঘ।

† নবমেঘ।

উপেন্দ্রভঞ্জ

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় উৎকলদেশীয় প্রসিদ্ধকবি দীনকৃষ্ণদাসের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত এবং তদীয় কবিত্ব-শক্তির কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় তদ্দেশীয় দ্বিতীয় সুবিখ্যাত কাব্যকার উপেন্দ্রভঞ্জের বিষয়ে কথঞ্চিৎ লিপি করিতেছি; পাঠক মহাশয়েরা তৎপাঠে বুঝিতে পারিবেন উৎকল-ভাষায় কবিত্বের সবিশেষ চর্চ্চা হইয়াছিল। উৎকল-দেশের বিবরণ-মধ্যে আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উৎকলে যাইয়া উপনিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জ হইতে ঘুমশর পর্য্যন্ত যে সকল রাজন্য বিরাজমান আছেন, তাঁহারা সেই সকল ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান। এই সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ভঞ্জবংশ অতি প্রসিদ্ধ: ইহাদিগের সহিত অদ্যাপি ছোটনাগপুর প্রভৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশীয় রাজাদিগের করণকারণ সম্বন্ধ আছে। ঘুমশর উৎকলের বায়ুকোণাভিমুখে স্থিত, তদ্দেশ পর্ব্বত এবং জঙ্গল শোভায় শোভিত, প্রজাগণের সমধিকভাগ কন্দ * প্রভৃতি ভারতবর্ষের আদিম জাতির অন্তর্গত। তাহাদিগের বিষয়ে ১৪ খণ্ডে কিয়দ্বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কন্দ ভাষার সহিত উৎকলীয় ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। স্ত্রীলোকেরা নিশাচরীবৎ কুদৃশ্যা; পুরুষ সকল সবল এবং সুচতুর; ধটীমাত্র পরিধেয়, ললাটোর্দ্ধে চূড়াকারে কেশবিন্যাস করে। লোহিত ক্ষৌম অথবা অন্য প্রকার চেলখণ্ডে কেশপাশ অলঙ্কৃত, মনুষ্য-মাত্রেই এক একটি পরশু অর্থাৎ টাঙ্গী বহন করে, তদ্ব্যতীত ধনু এবং শর সকলেরই নিকটে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে তাহারা বিভক্ত, প্রত্যেক সমাজে একজন প্রধান নিয়োজিত হয়। এই পদ পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত নহে, যে ব্যক্তি অস্ত্রচালনা এবং বাক্ পটুতায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, সেই ব্যক্তিই তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অপরাপর অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় তাহারা সর্ব্বদাই প্রতিবাসিগণ সহ বিবাদে প্রবৃত্ত। এই ভয়ানক দেশে পূর্ব্বে নরবলির কুকাণ্ড সবিশেষ নির্দ্দয়তায় নির্ব্বাহিত হইত, কন্দদিগের প্রধান দেবতা পৃথিবী, তাহার প্রীত্যর্থে নরবলি প্রদানের প্রয়োজন। ভূমিজ দ্রব্যের মধ্যে হরিদ্রাই প্রধান পদার্থ। তাহারা কহে, নরবলি দ্বারা পৃথিবীকে সন্তুষ্ট না করিলে হরিদ্রার উত্তম বর্ণ হয় না। ইং ১৮৩৬ অব্দে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই নিদারুণ নর-হত্যা নিবারণ-নিমিত্ত উদ্যোগী হন। পর বৎসর বাঙ্গালা দেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঘুমশর-প্রদেশের পার্শ্ববর্ত্তী স্বীয় অধিকারভুক্ত দশপালা প্রভৃতি স্থানে বলির উদ্দিষ্ট মেরাইয়া-নামক অভাগাদিগকে বিমুক্তকরণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে দক্ষিণ এবং উত্তরভাগস্থ উভয় গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ পরিশ্রম এবং কৌশলে তথা অপর্য্যাপ্ত ব্যয় দ্বারা বিংশতি বৎসরের পর উক্ত ঘোরতম নৃশংস নরবলির কুকীর্ত্তি প্রশমিত হইয়াছে।

কবিবর উপেন্দ্রভঞ্জ এই গভীর গহন ও গিরিগহ্বর-পরিষ্ঠ দেশে উক্ত ভীষণমূর্ত্তি নরবলি-প্রিয় অসভ্য-সমাজৈক-বিভাগের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রকৃত কাল নির্ণীত হয় নাই, তাঁহার প্রপৌত্র এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র এই ক্ষণে কেহ কেহ বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং উপেন্দ্র ভঞ্জকে ভারতচন্দ্র রায়ের সমকালবর্ত্তী বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেহেতু ভারত চন্দ্র রায়ের বংশে যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারাও প্রপৌত্র এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্রাদি পর্য্যায়ে পরিগণিত। ফলতঃ এ বিষয়ের স্থির মিমাংসা হওয়া দুর্ঘট। এরূপও সম্ভাবনা আছে, উপেন্দ্রভঞ্জ ভারতচন্দ্রের কিয়ৎ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; উৎকল ভাষার অবস্থার সহ তুলনায় উপেন্দ্রভঞ্জের রচনা প্রণালী

---

* চতুর্দ্দশ খণ্ডে যে খোন্দ জাতির কথা লেখা গিয়াছে, তাহার প্রকৃত উচ্চারণ কন্দ।

তাদৃশ পুরাতনী বোধ হয় না ; বিশেষতঃ শব্দালঙ্কারের প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক শ্রদ্ধা। পুরাতন কবিগণ শব্দালঙ্কারের অনুরক্ত ভক্ত নহেন—তাঁহারা ভাবালঙ্কারের দাস। দীনকৃষ্ণদাসের রচনার সহিত উপেন্দ্রভঞ্জের রচনার তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে ; দীনকৃষ্ণদাসের কবিত্বে ভাবমাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য আছে, অথচ শব্দাড়ম্বরের প্রতি তাদৃশ অনুরক্তি নাই। উপেন্দ্রভঞ্জের প্রধান প্রধান কাব্য যে নামে বিখ্যাত, সেই নামের প্রথমাক্ষরে প্রত্যেক পদের আরম্ভ হইয়াছে, যথা বৈদেহীশ-বিলাসের প্রতি পংক্তির প্রথমাক্ষর বকার, সুভদ্রা পরিণয়ের প্রতি পদের আদ্য অক্ষর সকার ইত্যাদি। তাঁহার রচনা মধ্যে অনুপ্রাস এবং যমকের ছটা নিতান্ত বিরক্তিজনক, পদে পদে চিত্রকাব্য, মালযমক, শৃঙ্খলা, সিংহাবলোকন, ব্যাঘ্রগতি, মহাযমক, সর্ব্বযমক এবং গোমূত্র প্রভৃতি অগণিত শব্দচাতুর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ শব্দালঙ্কারের উদ্দেশে কুটার্থ এবং অপ্রসিদ্ধ বহুতর শব্দের সাহায্য লইতে হইয়াছে। বোধ হয় এই বনপ্রধান প্রদেশের রাজকবি শব্দশাস্ত্র আলোচনায় সমধিককাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রভঞ্জ সুবিস্তর কাব্য প্রনয়ণ করেন, তাঁহার ভ্রাতৃ প্রপৌত্র প্রমুখাৎ অবগতি হইল, তদ্বিরচিত গ্রন্থ নিকর মধ্যে ৫২ খানা উৎকৃষ্ট মধ্যে গণ্য। নিম্নলিখিত কাব্য নিকরে এই প্রস্তাব লেখক কিয়ৎ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। যথা ১ বৈদেহীশবিলাস, ২ লাবণ্যবতী, ৩ কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-সুন্দরী, ৪ সুভদ্রা পরিণয়, ৫ রসমঞ্জরী, ৬ রসপঞ্চক ৭ প্রেম-সুধা-নিধি, ৮ রসিকহারাবলী, ৯ স্বর্ণরেখা, ১০ শোভাবতী, ১১ চিত্রকাব্য, ১২ কামকৌতুক, ১৩ চুম্বে, ১৪ যম্বে, ১৫ ধনিমঞ্জরী, ১৬ শব্দমালা, ১৭ ষড়্-ঋতু।

বর্ণিত-গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে 'বৈদেহীশবিলাস' সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উৎকলীয়দিগের নিকট সমাদৃত আছে। এই গ্রন্থে রামচরিত বিন্যস্ত। আমাদিগের পাঠক মহাশয়গণের গোচরার্থ তাহার কিঞ্চিদংশ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। তাঁহারা তৎপাঠে উপেন্দ্রভঞ্জের কাব্যশক্তির কিয়ৎ পরিজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন। যথা,—

অনুবাদ

অরণ্যেতে একদিন, হয়ে অতিশয় দীন,
কহে সীতা শীতাংশু বদনী।
বিধি দিলা বনবাস, বিগত সকল আশ,
আর কি হইবে নৃপমণি॥
সেই বিধি সুনিষ্ঠুর, ছাড়ায়ে অলকাপুর,
ঈশানে শ্মশানে স্থান দিল।
মণিময় সিংহাসনে, প্রবঞ্চিয়ে নারায়ণে,
ভুজঙ্গ শয়নে নিয়োজিল॥
যে বিধি অবিধিচয়, বিসরিতে ক্ষম নয়,
তারে কেন লোকে কয় বিধি।
বসাইয়ে নিজ কোলে, রাম কন প্রেম ভোলে,
বসাইয়ে লাবণ্যের নিধি॥
কেন নিন্দ চতুর্মুখে, নিরন্তর কেলি সুখে,
ভুঞ্জাইতে লক্ষ্মীনারায়ণে।

বাছিয়া নির্জন স্থান, তোমায় আমায় প্রাণ,
প্রেরণ করিলা এই বনে ॥
বিচার করহ সতি, হেথা দম্পতির প্রতি,
কি অভাব করিতে উৎসব।
তেজিয়ে অমরাবতী, মলয় পর্ব্বতে গতি,
মধুমাসে করেন বাসব ॥
বসন্তের আগমনে, ব্রহ্মলোক বিসর্জ্জনে,
ব্রহ্মা যান গন্ধমাদনেতে।
সুরস প্রবীণে ধনি, সব ধনে আমি ধনী,
কি অভাব এই কাননেতে ॥
সৌধ সদনেতে বসি, বিহরিতে হে প্রেয়সি,
এখানেও সে সৌধ *১ সদন।
সেখানে কঞ্চুকীগন, বেড়ি রহে অনুক্ষণ,
এখানে কঞ্চুকী *২ বিলক্ষণ ॥
তথা চন্দ্রাতপতলে, বিহরিতে প্রতিপলে,
এখানেও চন্দ্রাতপ *৩ তলে।
সেথা সব সহচরী, থাকিত বেষ্টন করি,
হেথা আছ সহচরী *৪ দলে ॥
তথায় জগতী ভূমি, ভ্রমণ করিতে তুমি,
জগতীতে *৫ ভ্রমিছ এখানে।
চিত্রলেখা কতশত, নিরখিতে অবিরত,
হেথা হের চিত্রলেখা *৬ পানে ॥
তথায় পালঙ্কোপর, রঞ্জিত রজনী *৭ কর,
হেথাও রজ নিকর শোভা।
বোধক সুকবি কথা, শ্রবণ করিতে তথা,
হেথা শুক কথা মনোলোভা ॥
তথা ভদ্র মহোৎসব, দেখিতে পাইতে সব,
হেথা ভদ্র *৮ উৎসব দেখহ।
তথা প্রেমার্ণবে ভাসি, খদির *৯ উদিত আসি,
হেথা অই খদির নিবহ ॥
বিঘ্নহীন অক্ষলীলা তাহে প্রমুদিত ছিলা,
হেথা বিঘ্নহীন অক্ষ *১০ লীলা।
বিনোদ বিহারকালে, থাকিতে সুশীলা জালে,
এখানেও আছে সে সুশিলা ॥

*১ প্রস্তর। *২ চন্দন বৃক্ষ, সর্প। *৩ আকাশ। *৪ ঝিণ্টীপুষ্প বৃক্ষ। *৫ জম্বু কানন। *৬ মদন শারিকা। *৭ হরিদ্রা কিরণ। *৮ হরিদ্রা কিরণ। *৯ দেবদারু বৃক্ষ। *১০ ইন্দ্র প্রসিদ্ধ আছে। ইন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের সাহায্য গ্রহণার্থ অযোধ্যায় উদয় হইতেন।

ক্ষীর পানে চিত্ত বশ, এখানেও সেই রস,
হরিণাক্ষি হের ক্ষীর পাণ।*১১
আনকের *১২ স্বন ঘন, শুনিতে হে সর্ব্বক্ষণ,
আনকের *১৩ স্বন বিদ্যমান ॥
সব আছে সমাশ্রিয়ে, একমাত্র নাহি প্রিয়ে,
নৃত্য হেতু নর্ত্তকী নিকর।
তাই হে রমণীমণি, বেণীসহ নাসামণি,
দোলাইয়ে দিয়ে দয়া কর ॥
নাসা করি উত্তোলন, চতুরা জানকী কন,
শির চালি গুরু অভিমানে।
নর্ত্তক অভাব কই, তালে তালে নাচে অই,
মেঘনাদ কলাপ বিতানে ॥

উপেন্দ্রভঞ্জের বহুসঙ্খ্যক দয়িতা ছিলেন। তিনি কোন কোন লাবণ্যবতী ললনার নামে স্বরচিত কাব্য-নিকরের নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। রাজ্ঞীগণমধ্যে কেহ কেহ সুপণ্ডিতা ছিলেন। উপেন্দ্রভঞ্জ তাঁহাদিগের সহিত রসগর্ভ প্রশ্নকাব্য করিতেন। তাঁহারাও কবিতা-কলায় তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কবিতাময়ী-লিপি-লিখনের নিয়ম ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে এতাদৃশ-দাম্পত্য-প্রণয়ানুরাগ সত্ত্বে উপেন্দ্রভঞ্জ পুত্র সন্তানের মুখচন্দ্রদর্শনে কৃতার্থ হইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশ পরিচয় যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অবিকল নিম্নভাগে প্রকটিত হইল। যথা,—
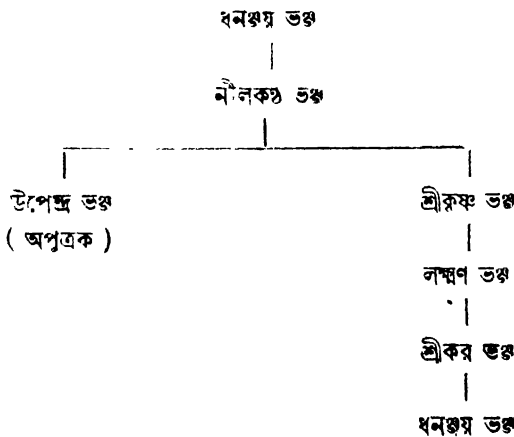
শ্রীকর ভঞ্জের পুত্র ধনঞ্জয় বিদ্রোহিতা উপস্থিত করাতে বৃটনীয় রাজপুরুষদিগদ্বারা প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হন।

*১১ বিভীতক বৃক্ষ। *১২ ক্ষারপর্ণীবৃক্ষ। *১৩ দুন্দুভি বিশেষ।

শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন

আমি এই প্রবন্ধ চারিঅংশে বিভক্ত করিয়া লিখিলাম, প্রথম পরিচ্ছেদে শারীরিক বলপ্রাচুর্য্যের প্রায়োজন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রাচীন সাময়িক হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে তদ্বিষয়ের প্রাদুর্ভাব, এবং অবশিষ্ট পরিচ্ছেদে উক্ত শিক্ষার সদুপায়ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হেতু অশেষপ্রকার দোষোদ্ভাব তথা রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাহা প্রচলিত করণের আবশ্যকতা, ইত্যাদি বর্ণিত হইল।

১। দৈহিক বলপ্রাচুর্য্যের প্রয়োজন।

এতদ্দেশীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থকার কহেন, "বলং বলং বাহুবলং নচ অন্যবলং বলং"—যদিও অধুনা এবাক্য বাহুবল প্রশংসার অত্যুক্তি বলিয়া গণনীয়, ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবেক যে মনুষ্যমণ্ডলীর সভ্যতা, ভব্যতা, আচার, ব্যবহার, পৌরুষ, পরাক্রম প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় সম্বন্ধে বাহুবলেরই অতিমাত্র প্রাধান্য সপ্রমাণ হয়। ধরাতলে যে সকল জাতি প্রভুত্ব-প্রতিভা লব্ধ হইয়াছিলেন বা হইয়াছেন, তাঁহারা মানসিক বলাধান পূর্ব্বে বাহুবলের নিমিত্তই প্রসিদ্ধ ছিলেন;—বাহুবলের ফলোৎপত্তিরূপ রাজ্যবৃদ্ধি প্রভৃতি সৌষ্ঠব লাভ, পরে শান্তি সূচক কার্য্যের প্রয়োজন মতে মানসিক বলের ক্রমশঃ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে কালে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্ষত্রিয়কুলজ বিপুল বলবিক্রম সম্পন্ন কৌরব বাহুবলে দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভয়ানক অসভ্যজাতিপূর্ণ দেশসমূহ স্বকরতলে আনয়ন করিয়াছিলেন,—এবং গ্রীস্ দেশে যৎকালে প্রবল পরাক্রান্ত পিলাস্গিও হোলিনিক জাতিরা নানা দেশাধিকার পূর্ব্বক বসতি করিয়াছিলেন,—তথা জগদ্বিজয়ি রোমানদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যৎকালে মৃন্ময় প্রাকার পরিবেষ্টিত নগরী আশ্রয় পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তি রাজ্যনিকরের প্রতি যথেষ্টাচার প্রচার করিয়াছিলেন,—সে সময়ে তাঁহাদিগের একমাত্র বাহুবলেরই প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়, সে সময়ে মানসিক পরাক্রম-প্রাচুর্য্যের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।—তদনন্তর দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার বলের সহকারিতায় তাঁহারা এককালে ধরাধামে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে ধন্য মান্য রূপে গণনীয় হইয়াছিলেন। কিন্তু স্মরণ করিতে অন্তর্ব্বাষ্পে কণ্ঠাবরোধ করে, এই দৈহিক বল-প্রাধান্যে মানসিক বলের অনেক হানি সম্ভাবিত হয়। ফলত দৈহিক এবং মানসিক বলের সমতা থাকিলেই শুভোৎপত্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; রাম লক্ষণের সময়ে বশিষ্ঠ, ভীমার্জ্জুনের সময়ে ব্যাস, ফিলিপের সময়ে অরিস্ততল এবং কৈসরের * সময়ে সিসিরো প্রভৃতি মহাত্মাগণ স্ব স্ব জন্মভূমির পরম গৌরবের নিমিত্তই জন্মিয়াছিলেন। যখন যেজাতির মধ্যে মানসিক বলের অপ্রধান্য হইয়াছে, তখন যদ্যপি শারীরিক বলের প্রাধান্য হয় তবে আর অমঙ্গলের অবশেষ থাকে না; বহুকালগর্ব্বিত দুষ্টেরা জন্মভূমির মুখোজ্জলকারি মহানুভবদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত লইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। যদিও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সর্ব্বদেশের পুরাবৃত্তে প্রাপ্তব্য, তথাপি আথিনী দেশে ত্রিংশৎ সংখ্যকনির্দ্দয় রাজপুরুষদিগের অত্যাচার কালে মহাত্মা সক্রেতিসের প্রাণদণ্ডই এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ; উক্ত জ্ঞানিবরের দোষ এই যে তিনি মনুষ্যকে মানসিক বলে বলী করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তথাহি;—

* Caesar শব্দের আরব্য উচ্চারণ

"Thy Godlike crime was to be kind
To render with thy precepts less
The sum of human wretchedness,
And Strengthen man with his own mind."

—*Byron's Prometheus.*

তব দেববৎ দোষ দয়া আচরণ।
মানুষের তাপ তম হরণ কারন॥
আর তারে চিত্তবলে করিবারে বলী।
বলিতে বিজ্ঞানময়ী বচন আবলী॥

পক্ষান্তরে যে জাতি শারীরিক বলে অপটু এবং কোন কোন মানসিক বলের প্রাচুর্য্য জন্য প্রসিদ্ধ, সে জাতি জাতিমধ্যেই গণনীয় নহে,—তাহাদিগের মধ্যে একতা সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই,—দেশানুরাগব্রতে তাহাদিগের কোনরূপেই আন্তরিক প্রগাঢ় স্পৃহা জন্মে না,—দৈহিক বল বিহীনতা ও ভীরুতা বশতঃ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি কণ্টকজালে তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র সমাকীর্ণ হয়। একটা প্রধান জাতির লক্ষণ এই সকল;—তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রকৃতি প্রভৃতির একতা,—স্বদেশ হিতব্রতে একাগ্রতা,—পরজাতি কর্ত্তৃক অপমান প্রাপ্তে অসহিষ্ণুতা এবং সেই অপমান প্রতিশোধনার্থ প্রাণপণে প্রযত্নপরতা।—কিন্তু দৈহিক বলের অসদ্ভাবে এসকল পুরুষার্থ লাভের সম্ভাবনা কি? সুতরাং অনৈক্যপরায়ণ, ভীরুস্বভাব, পরাপমানগ্রস্ত, উদ্যোগবিহীন জাতিকে জাতিমধ্যে গণনা করাই অকর্ত্তব্য; যেখানে পশুপক্ষি প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ স্ব স্ব দলের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে একতা প্রদর্শন করিতেছে, সেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণি মনুষ্য মণ্ডলী মধ্যে যদ্যপি কোন জাতি দৈহিক বলহীনতা বশতঃ একতা-শূন্য হয় তবে তাহাদিগকে উক্ত ইতর প্রাণিদিগের অপেক্ষাও অধমকল্প জ্ঞান করিতে হইবেক।

অতএব এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে দৈহিক এবং মানসিক বলের সামঞ্জস্যই মনুষ্য-জাতির সুখ বৃদ্ধির নিদান হইয়াছে,—একের অভাব এবং অন্যের প্রাদুর্ভাব হইলে বিপরীত ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা। এতাবতা মনুষ্যজাতির পুরুষার্থ কল্পে দৈহিক এবং মানসিক বলের সমান সহকারিতাই আবশ্যক।

অপিচ বিগ্রহ বাণিজ্য, এবং কৃষি ... ... কার্য্য
মনুষ্যজাতির খ্যাতি প্রতিপত্তির ... ...
য়াছে এতাবৎকেই মনুষ্যের ... ...
পুরাকালে রোমানেরা বিগ্রহ ... ...
লোকেরা বাণিজ্য হেতু,—এবং ভারতবর্ষীয় তথা মিশরীয় লোকেরা কৃষিকার্য্য হেতু প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন,—কিন্তু এতাবৎ বৃত্তিতেই বাহুবলের বিশিষ্ট প্রয়োজন আছে। বিগ্রহপ্রিয় জাতিদিগের লক্ষণ; তাহারা সরলহৃদয়, উদার, ন্যায়পথাবলম্বী, গৌরবেচ্ছু, দুর্দ্ধর্ষ, স্বদেশহিতৈষী, প্রতিহিংসা-পরায়ণ এবং উগ্রমূর্ত্তি। বাণিজ্যপ্রিয় জাতিদিগের লক্ষণ; তাহারা দেশপ্রকাশাদি মহতী মহতী কীর্ত্তির সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী,—বিশিষ্ট রূপ সাহস ও উৎসাহ সম্পন্ন,—শিল্প বিজ্ঞানাদি নানা হিতকর

বিষয়ের উন্নতি বিধায়ক,—স্বদেশীয় বিধি ব্যবস্থাদির যথাবৎ মর্ম-পালনে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিতর্কপরায়ণ, —আচার ব্যবহারের বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক, এবং মিতাচারপ্রিয়। কৃষিকার্য্যাসক্ত জাতিদিগের লক্ষণ ; তাহারা শান্তি রসাভিষিক্ত, আতিথ্যাদি ধর্ম্মানুরক্ত, কাব্য সাহিত্য দর্শনাদি শাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্পাদক এবং বহ্বাশাবিহীন। যদিও উল্লেখিত প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে বিগ্রহ বাণিজ্য, এবং কৃষি কার্য্যাদি সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিরই ন্যূনাতিরেক প্রাদুর্ভাব থাকুক, কিন্তু তাঁহারা যে ... ... বৃত্তির নিমিত্ত ধরাতলে গণনীয় হইয়া- ... ... সেই বৃত্তিকেই তাঁহাদিগের প্রধান ... ... নির্দ্দিষ্ট করা গেল।

পুরাকালে উল্লেখিত নানা বৃত্তির মধ্যে একমাত্র বৃত্তির প্রাধান্য থাকিলেই সেই জাতি প্রধান পদবীতে গণনীয় হইতেন, কিন্তু এইক্ষণে আর সেকাল নাই, অধুনা কোন জাতি দুই তিন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা না রাখিতে পারিলে প্রাধান্যের অভিমান করিতে পারেন না;—ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ফ্রান্স প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ্য, বিগ্রহ বাণিজ্য কৃষিকার্য্যাদি সকল বিষয়েই প্রাদুর্ভাব রাখাতে মহতী গরিমার আস্পদ হইয়াছেন ;—ওলন্দাজ ও চীন প্রভৃতি দেশীয়েরা একমাত্র বাণিজ্য বৃত্তিতে গণণীয় হইলেও শ্রেষ্ঠজাতিদিগের সহিত সমানাস্পর্দ্ধা রাখিতে পারেন না। অতএব বাঙ্গালী জাতির হিতৈষিগণ বিবেচনা করুন,—যেখানে বাঙ্গালিরা উক্ত সমুদায় পুরুষার্থের প্রতিপাদক বাহুবল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিকৃষ্টকল্প, সেখানে তাঁহাদিগের পুনরুদ্ধার কল্পে শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার কতদূর পর্য্যন্ত আবশ্যকতা আছে।

পরন্তু ইহাও সত্য বটে, দেশকাল পাত্রের অবস্থা ভেদে বাহুবলের ন্যূনাতিশয্য হইয়া থাকে, যে সকল দেশে আতপতাপের নিরতিশয় প্রাখর্য্য, অশন বসনাদি জীবধারণোপযোগী দ্রব্যাদির সৌলভ্য,—ফল, মূল ওষধিতে ক্ষুধার নিবারণ ও কূপ, তড়াগ, নির্ঝরাদির নির্ম্মল রজতসন্নিভ বারিতে পিপাসার শান্তি হয়, সে সকল দেশে নৈসর্গিক ... ... বলবৃদ্ধির কথঞ্চিৎ বিঘ্ন আছে। কিন্তু যে সকল দেশে হেমন্তের ঘোরতর প্রাদুর্ভাব, জীবিকা সংস্থানে আয়াস ও পরিশ্রমের বিশিষ্ট আবশ্যকতা, এবং জঠরাগ্নির দাবদহনবৎ তীক্ষ্ণতা বশত মাংসাদন ও সমীরণের শৈত্য গুণাতিশয্যে মদিরা পানই ব্যবস্থা,—সে সকল দেশের লোকেরা স্বভাবতই শারীরিক বলবিশিষ্ট হইয়া থাকেন এবং সেই বলবৃদ্ধি করাই তাঁহাদিগের একটা প্রধান সংকল্প হইয়া পড়ে, সে সকল দেশীয় মনুষ্যেরা উষ্ণাতিশয় দেশবাসিদিগের ন্যায় ভোগ সুখানুরক্ত নহেন,—তথায় শরীর ক্ষয়কারী ইতরেন্দ্রিয় সমূহ তরুণ বয়সে তেজস্বি হয় না, সুতরাং যৌবনের নিতান্ত অচিরতা এবং জরার অকালাধিকার প্রায়ই নাই। জীবিকাসুলভ উষ্ণাতিশয় দেশে বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, প্রভৃতি দেহভঙ্গকর কুপ্রথা প্রাবল্যের অবধি নাই, কিন্তু জীবিকাদুর্লভ হিমাতিশয় দেশে তদ্বিপরীতে পরিপক্ক যৌবন অথবা প্রৌঢ়াবস্থায় একমাত্র বিবাহ করাই প্রসিদ্ধ, তথায় জীবিকা সংস্থানে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ পরিণয়পাশে বদ্ধ হন না। উষ্ণাতিশয় দেশবাসিরা নৃত্য, গীত, বাদ্য, ভাণ্ড প্রভৃতির আমোদেই আমোদিত হয়েন ; কিন্তু, হিমপ্রধান দেশে মৃগয়া, মল্লযুদ্ধ, জলক্রীড়া, অস্ত্র প্রদর্শনাদিই আমোদ মধ্যে পরিগণিত,—প্রত্যুত, উষ্ণাতিশয় দেশের লোকদিগের আমোদ প্রমোদ শ্রুতি নয়নাদি বহিরিন্দ্রিয়ের অনুরঞ্জনা মাত্র, হিমাতিশয় দেশীয় লোকেরা ঔৎসুক্য, উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, ধৈর্য্যাদির চরিতার্থতা জনিত মানসিক সুখকেই আমোদ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

কিন্তু উপরিউক্ত উক্তি পাঠে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে উষ্ণাতিশয় দেশবাসিরা

দৈহিকবলে প্রাধান্যলাভ করিবেন এমত সম্ভাবনা নাই, বরং তদ্বিপরীতে ইহাই বলা উচিত যে তাহা প্রাপনের পক্ষে কোন লৌকিক প্রতিবন্ধকতা নাই।—তাঁহাদিগের সন্তান প্রতিপালন প্রণালী পরিশোধিত হইলে সমূহ উপকার লাভের সম্ভাবনা,—ইহার এক প্রধান লক্ষ্যের স্থল এই ভারতবর্ষ, এই দেশে এক সময়ে লোকদিগের বাহুবলের প্রাধান্য বিষয়ে যে সকল কাব্য পুরাণাদির বর্ণন পাঠ করা যায়,—তত্তাবৎ সম্পূর্ণরূপে অলীক নহে।—তৎকালীন বলপ্রাচূর্য্যের হেতু অন্বেষণ করিয়া দেখিলেই সপ্রমাণ হইবেক যে তাঁহাদিগের সন্তানপালন প্রণালী এক্ষণকার হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সংশুদ্ধ ছিল, অতএব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ অনুমোদন করা যাইতেছে।

২। প্রাচীন সাময়িক হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা।

পুরাকালে উষ্ণাতিশয় দেশবাসিদিগের বাহুবল বিস্তরণের সম্যগ্ প্রস্পৃহা না থাকার এক বিশিষ্ট কারণ এই যে সেসময়ে তাঁহাদিগের উপর হিমপ্রধান দেশবাসীদিগের পরাক্রম প্রচার ছিল না। স্নিগ্ধ দেশবাসীরা উষ্ণ দেশাক্রমণ কল্পে সঙ্কুচিত হইতেন, তাঁহারা আতপতাপ-শঙ্কায় উষ্ণদেশকে যমপুরী স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। পূর্ব্বতনকালে ইয়ুরোপীয়েরা পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত * অতিক্রম করিলে সূর্য্যকিরণে দগ্ধ দেহ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিতে হয়, এরূপ অযৌক্তিক ভাবে বিশ্বাস রাখিতেন,—গ্রীক্ অর্থাৎ যবন মহান্পদ বিখ্যাত ভূপালসেকন্দরশাহ শতদ্রুতীরে সমাগত হইলে তাঁহার সৈন্যদল বিকল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন অভিলাসে উক্ত বীরচূড়ামণির অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এইক্ষণে আর সেকাল নাই, সেই স্নিগ্ধদেশীয় ঘোরতর বলবীর্য্যসাহস সম্পন্ন বজ্রদেহি বীরপুরুষেরা উক্ত প্রকার অযৌক্তিক ভাণ পরিহার পূর্ব্বক উষ্ণাতিশয় দেশাধিকারে অতিমাত্র লোলুপ হইয়া উঠিয়াছেন,—ভোগাশক্তির প্রাবল্য এবং প্রজা সংখ্যার বাহুল্য বশতঃ তাঁহারা স্বল্পশস্য শালিনী জন্মভূমিতে বদ্ধ না থাকিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া নানা দেশ করতলে আনিতেছেন। ভারতবর্ষে সেকন্দরশাহ, জঙ্গিজ খাঁ এবং তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি বীরদিগের আগমন,—কলম্বস কর্ত্তৃক নব ভূখণ্ড আবিষ্করণ,—বাস্কো-ডি-গামার নিরক্ষ অতিক্রমণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঘটনা সকল সেই অধিকার বৃদ্ধি সংকল্পের সুসিদ্ধতা মাত্র। যেরূপ দাড়িম্ব বীজ নিকরের পুষ্টিবৃদ্ধি হইলে বীজকোষ বিদারণ পূর্ব্বক স্বতই তত্তাবৎ বিনির্গত হইয়া পড়ে, সেইরূপ স্নিগ্ধ দেশীয় লোকেদের পরিপুষ্ট বল বীর্য্য তাহাদিগের জন্মভূমি স্বরূপ নেমী মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া নানা দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল।

কোন কোন স্থলে কারণান্তর হেতুও এই অধিকার বৃদ্ধির লালসা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে,—যে সকল জাতি পূর্ব্বে সভ্য জাতিদিগের নিকট অসভ্যপদে বাচ্য থাকিয়া ঘৃণাস্পদ ছিল, কালক্রমে তাহারা সেই ঘৃণাস্ত্রের শাণিত ধারানুভব করিয়া একেবারে উগ্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়া উঠিল,—তখন সেই সুপ্তোত্থিত ব্যাঘ্র স্বরূপ দোর্দণ্ড জাতির প্রচণ্ড কোপে পতিত হইয়া শৃগালবৃত্তি সভ্য নামাভিমানিদিগের নিস্তার পাইবার আর উপায়মাত্র থাকিল না। এই সকল কারণেই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষীয় প্রজাপূর্ণ প্রদেশ সমূহ এককালে স্বাধীন······ যাছে।

পরন্ত আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি হিন্দুরা স্বভাবতঃ সমরাসক্ত জাতি নহেন,—যেহেতু সংগ্রামে অনুরক্তি হইবার যে সকল হেতু আছে সেই সকল হেতুচক্রে তাঁহারা বদ্ধ ছিলেন না। রত্নগর্ভা শস্যপ্রসূ ভারতভূমির কল্যাণে তাঁহাদিগের পরদেশাধিকারের প্রয়োজন মাত্র ছিল না;

* কল্পিত মধ্যরেখার নাম।

তাঁহাদিগের মধ্যে যে সকল বিগ্রহ উপস্থিত হইত, তত্তাবৎকে এক প্রকার গৃহবিচ্ছেদ বলিলেই হয়, মহাভারতে বর্ণিত মহাযুদ্ধের ব্যাপার জ্ঞাতি বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সংগ্রামানুরক্তির দ্বিতীয় হেতু পরজাতি কর্তৃক পীড়াপ্রাপ্তি,—প্রত্যুত, অতি পুরাকালে অন্য কোন জাতি সিন্ধুনদ পারে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করণে সাহসী হন নাই, সুতরাং তৎকালের হিন্দুদিগকেও বিশিষ্টরূপে সমরানুরক্ত হইতে হয় নাই। যে সময়ে মুসলমানেরা আর্য্যাবর্ত্তে প্রবিষ্ট হয়, সে সময়ে ভোগাশক্তি বশতঃ হিন্দুরা তেজোবিহীন হইয়াছিলেন। সুতরাং সহজেই চিরসঞ্চিত স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত হয়েন। সংগ্রামানুরক্তির অপর কারণ স্বদেশহিতৈষিতা; ইয়ুরোপীয় লোকেরা দেশহিতৈষিতা পদের যে অর্থ করেন, প্রাচীন হিন্দুরা তদর্থের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন না, ইয়ুরোপীয়েরা যেরূপ রাজার প্রতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ… … স্বাধীন আপনাদিগের নিমিত্তও অনেকানেক ক্ষমতা রক্ষা করেন, সেই স্বতন্ত্রতা রক্ষণার্থ একতার প্রয়োজন হয়, সুতরাং প্রজায় প্রজায় ভ্রাতৃ সম্বন্ধ নির্বন্ধ থাকিবাতে জন্মভূমির প্রতি মাতৃভক্তিবৎ প্রগাঢ় প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া উঠে, সেই প্রীতির এমনি ক্রম, যে তৎপালনের কালোপস্থিত হইলে স্বার্থপরতা প্রভৃতি ইতর বৃত্তি কোনরূপেই মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু, প্রাচীন কালের হিন্দুদিগের স্বদেশহিতৈষিতা-ধর্ম্ম ভিন্ন প্রকার ছিল,—তাঁহাদিগের যে কিছু প্রীতি, তাহা, যে গ্রামে বা যে বাটীতে জন্মগ্রহণ করিতেন এবং যে ক্ষেত্র হইতে জীবিকানির্ব্বাহ হইত, তন্মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত, তাঁহারা স্বর্গাপেক্ষা জন্মভূমির যে গরিমা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা কিন্তু নিখিল ভারতবর্ষ বা তদন্তঃপাতি দেশবিশেষের প্রতি লক্ষিত নহে,—স্বীয় স্বীয় পিতৃপরিত্যক্ত ভূমির প্রতিই তাহার প্রয়োগ প্রসিদ্ধি মাত্র। রাজকীয় বিষয়ে ভূপতির স্বেচ্ছাচারের দাসত্ব করাই তাঁহাদিগের একমাত্র সম্বন্ধ ছিল, এ নিমিত্তে তাঁহাদিগের দেশে পূর্ব্বে যত যত যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত, তাহাতে দেশীয় লোকেরা স্বদেশ হিতার্থে অথবা আপনাদিগের স্বাধীনতা সুখ রক্ষণার্থে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রভুর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন মানসে বা বিলুণ্ঠিত ধনাদির প্রত্যাশায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইজন্য ভারতবর্ষ অধিকারকালে মুসলমানদিগকে অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয় নাই। বিপক্ষ-পক্ষের জয়লাভ হইলেই সাধারণ প্রজামণ্ডলী তদ্বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান না করিয়া অনায়াসে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিধান করিতেন। যেরূপ ভূমিকম্প বা ঘূর্ণাবায়ুর বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চালন করা ব্যর্থ বিবেচ্য হয়, তাঁহারা সংগ্রাম বিজেতাদিগকেও তদ্রূপ অদম্য এবং দুর্ব্বিজেয় বিবেচনা করিতেন, এবং মনুষ্যের সমুদায় পুরুষার্থ ভ্রষ্টকারী একাধিপত্যেরই সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠতা মান্য করিতেন। প্রত্যুত, পূর্ব্বতন কালের হিন্দুদিগের এবম্প্রকার ভাব প্রভাব তাঁহাদিগের আচরিত ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। আদৌ, তাঁহাদিগের উপাসনার লক্ষ্যই অশমনীয় শক্তি,—সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, বায়ু, জল প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থনিকরের এক এক প্রকার অতুল্য শক্তি প্রত্যক্ষ-গোচর হইবাতে সেই সকলই তাঁহাদিগের উপাস্য হইয়াছিল, অতএব রাজ্যাধিপতি বা যুদ্ধজেতার শক্তির নিকট তাঁহারা অন্ধবৎ অধীনতা স্বীকার করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহাদিগের আদি ধর্ম্ম প্রযোজক মনুমহাত্মা রাজশক্তির গৌরব প্রতিপাদনার্থে স্তাবকতার কিঞ্চিৎমাত্র অবশেষ রাখিয়া যান নাই,—তিনি রাজশক্তিকে ইন্দ্র অর্থাৎ আকাশ, অনিল অর্থাৎ পবন, যম অর্থাৎ মৃত্যু, বরুণ অর্থাৎ জল, তথা চন্দ্র এবং ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মাত্রানিকরে *১ সৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

*১ ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতী ॥ ৪ ॥

পরন্তু, পূর্ব্বতনকালে হিন্দুজাতি, প্রাচীন বা আধুনিক ইয়ুরোপীয়দের ন্যায় বিগ্রহ রসানুরক্ত না থাকিলেও তাঁহারা যে শৈশব কালাবধি সন্তানদিগকে সুবীর্য্যবন্ত ও সাহসসম্পন্ন করণার্থে সুশিক্ষা প্রদান করিতেন,—এবং তাঁহারা তদ্বিষয়ে যে আধুনিক হিন্দুদিগের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন,—তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণপুঞ্জ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও "ক্ষত্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং ক্ষমা বলং" প্রভৃতি বাক্য হিন্দুদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে. কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক যখন বিদ্যাশিক্ষা করিতেন তখন তাঁহারা কার্য্যত যেরূপ ব্যায়ামচর্চ্চার অধীন হইয়া বলবিশিষ্ট ও ক্লেশসহিষ্ণু তথা সাহসপরায়ণ হইতেন, এইক্ষণকার কলেজ প্রভৃতি প্রধান পদবীস্থ বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রেরা তদ্রূপ নিয়মাধীনে বিদ্যাভ্যাস করিলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। ব্রাহ্মণ নন্দনেরা অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নান ও গাত্র মার্জ্জনাদি দ্বারা পবিত্র দেহ হইতেন*২, সর্ব্বদা আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন,—স্থূলবাস পরিধান এবং ফলমূল শস্যাদি আহরণপূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া সন্তোষচিত্তে কালহরণ করিতেন, তাঁহাদিগের পবিত্রমানসাকাশ কুপ্রবৃত্তিরূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। অপিচ ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ি না হইলেও তাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বীরাগ্রগণ্য রাজন্যবর্গের ব্যায়াম বিদ্যা ও ধনুর্ব্বেদের শিক্ষাগুরু ছিলেন, বশিষ্ঠ রাম লক্ষ্মণের, এবং দ্রোণাচার্য্য কৌরব কুমারদিগের, অস্ত্র ও মল্ল মৃগয়াদি বিবিধ বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন।

শিক্ষারম্ভে তাঁহারা মৃগয়া*৩, মল্লযুদ্ধ, জলক্রীড়া *৪ এবং অস্ত্রপ্রদর্শন প্রভৃতি ব্যায়ামে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া বাহুবল বৃদ্ধি করিতেন। সে সমুদায়, তাঁহাদিগের বাল্যক্রীড়ার মধ্যে গণনীয় ছিল এবং তদ্দ্বারা যে বিশিষ্টরূপ তেজের উৎপত্তি হইত তাহা বিলক্ষণরূপেই জানিতেন, যথা—"বালক্রীড়াসু সর্ব্বাসু বিশিষ্টাস্তেজসাহভবন্"। —ক্ষত্রিয় সন্তানেরা ষড়্বর্ষ বয়ঃক্রমেই এই সকল শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেন, যথা—"ব্রহ্মবর্চ্চস কামস্য কার্য্যং

যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাম্ মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥ ৫ ॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনম্ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥ ৬ ॥
সোহগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৭ ॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে—প্রথম অধ্যায়ে॥

---

*২ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥ ৯২ ॥
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বাচৈবাবশকৃথিকম্।
নাধীয়ীতা মিষং জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেবচ ॥ ১১২ ॥

ইত্যাদি মানবে ধর্মশাস্ত্রে—চতুর্থাধ্যায়ে॥

*৩ রামশ্চাপধরো নিত্যং তূণীরে নান্বিতঃ প্রভুঃ
অশ্বারূঢো বনং যাতি মৃগয়ায়ৈ সলক্ষ্মণঃ॥

বিপ্রস্য পঞ্চমে। রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে"। ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকঃ। রাজপুত্রেরা উক্ত প্রকার ব্যায়াম ব্যতীত রথে, গজে, অশ্বে, বা ভূমিতলে যেরূপ নিয়মে যুদ্ধ করিতে হয় তাহা এবং গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, তোমর প্রাস শক্তি প্রভৃতি অশেষ প্রকার অস্ত্র সঞ্চালন শিক্ষা করিতেন*৫। তাঁহাদিগের ব্যায়াম বিদ্যা শিক্ষাকালে দিগদিগন্তর হইতে রাজা ও রাজপুত্রগণ তদ্দর্শনার্থ সমাগত হইতেন *৬। তদনন্তর সুন্দররূপে শিক্ষিত হইলে প্রত্যেক রাজকুমারের বলবীর্য সাহসাদির পরীক্ষা নিমিত্ত বৃক্ষ গুল্মাদি বর্জ্জিত একটা প্রকাশ্যস্থলে রঙ্গভূমি প্রস্তুত হইত। তন্মধ্যস্থিত বলিচক্র

হত্বা দুষ্টমৃগান্ বহূন্ পিত্রে সর্ব্বং ন্যবেদযৎ।
বন্ধুভিঃ সহিতো নিত্যং ভুক্ত্বা মুনিভিরন্বহং॥

ইতি অধ্যাত্ম রামায়ণে বালকাণ্ডে—তৃতীয় সর্গে।

অপিতু।

অথ দ্রোণাভ্যনুজ্ঞাতাঃ কদাচিৎ কুরুপাণ্ডবাঃ।
রথৈর্বিনির্যযুঃ সর্ব্বে মৃগয়ামরিমর্দন॥
তত্রোপকরণং গৃহ্য নরঃ কশ্চিদ্যদৃচ্ছয়া।
রাজন্ননুজগামৈকঃ শ্বানমাদায় পাণ্ডবান্॥

ইতি মহাভারতে আদিপর্ব্বে—সম্ভবপর্ব্বে।

*৪ কস্যচিৎ ত্বথকালস্য সশিষ্যোঽঙ্গিরসাংবরঃ।
জগাম গঙ্গামভিতো মজ্জিতুং ভরতর্ষভ॥
দশ বালান্ জলে ক্রীড়ন্ ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্য তৎ।
আস্তেস্ম সলিলে মগ্নো মৃতকল্পান্ বিমুঞ্চতি॥

ততো জলবিহারার্থং কারয়ামাস ভারত।
চৈলকম্বলবেশ্মানি বিচিত্রানি মহান্তিচ॥
সর্ব্বকামৈঃ সুপূর্ণানি পতাকোচ্ছ্রায়বন্তিচ।
তত্র সঞ্জনয়ামাস নানাগারানমেকশঃ॥
উদকক্রীড়নং নাম কারয়ামাস ভারত।
প্রমাণকোট্যাং তং দেশং স্থলং কিঞ্চিদুপেত্য হ॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ চোষ্যং লেহ্যমথাপিচ।
উৎপাদিতং নরৈস্তত্র কুশলৈঃ সূদকর্ম্মণি।···
গঙ্গাঞ্চৈবানুযাস্যাম উদ্যানবনশোভিতাং।
সহিতা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে জলক্রীড়ামবাপ্নুমঃ॥···

ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে জলক্রীড়ামকুর্ব্বত।
পাণ্ডবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ তদা মুদিতমানসাঃ॥
ক্রীড়াবসানে তে সর্ব্বে শুচিবস্ত্রাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
দিবসান্তে পরিশ্রান্তা বিহৃত্যচ কুরূদ্বহাঃ॥

ইতি মহাভারতে আদিপর্ব্বে—সম্ভবপর্ব্বে।

ক্ষত্রিয় সন্তানেরা স্বীয় স্বীয় বিক্রম ও বিবিধ প্রকার রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতেন, সেই সময়ে চতুর্দ্দিগে সুশোভিত প্রেক্ষাগার সমূহে রাজন্যবর্গ ও দর্শকশ্রেণী উপবিষ্ট হইয়া দর্শনসুখে সুখী হইতেন*৭। অপিচ তৎকালের কুলস্ত্রীগণ এক্ষণকার হিন্দুকামিনীদিগের ন্যায় কারারুদ্ধাবস্থায় বদ্ধ থাকিতেন না,—এপ্রকার উৎসাহপূর্ণ প্রদর্শন সময়ে তাঁহারা রথ অথবা মঞ্চোপরি পতির বামভাগে কিম্বা বয়স্যাদিগের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক পরীক্ষা প্রদায়িদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন*৮। মহাভারতাদি গ্রন্থে উক্ত প্রকার বর্ণন পাঠ কালে বোধ হয় যেন ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বের ইয়ুরোপীয় বীরপুরুষদিগের টিল্‌ট ও তুর্ণেমেণ্ট নামক অস্ত্র-প্রদর্শন বিবরণ নয়ন-গোচর করিতেছি। হায়! ভারতবর্ষের এইক্ষণে আর সেদিন কোথায়? এ দুরবস্থার সময়ে এই প্রশ্ন করিলে তাহার প্রতিধ্বনিমাত্র শ্রুতিকুহরে পুনঃ প্রবিষ্ট হয়!—সে সময়ে বাহুবলের এরূপ গৌরব ছিল যে অনুপমা রূপলাবণ্যবতী গুণবতী রাজনন্দিনীরা শৌর্য্য বীর্য্য গুণোপেত পুরুষদিগকেই মাল্যপ্রদান করিতেন, জানকী ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বিবরণ পাঠে মনোমধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইতে থাকে।

অনন্তর ক্ষত্রিয়সন্তানেরা দেশান্তরে বা তীর্থ দর্শনে প্রেরিত হইয়া বিশিষ্টরূপে শ্রম এবং ক্লেশ সহিষ্ণু হইতেন, রাম লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্র সহ দেশভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কি অপূর্ব্ব ভাবে চিত্ত প্রফুল্ল হইতে থাকে। সেইকালে রাজন্যপুত্রেরা দেশমধ্যে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাহাতে স্ব স্ব রণপাণ্ডিত্য এবং সাহস প্রদর্শনের বিলক্ষণ উপযোগিতা প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতেও তাঁহাদিগের শারীরিক ও মানসিক তেজের প্রভূত পরাক্রম বৃদ্ধি পাইত।—হিন্দু অথবা আর্য্য* জাতির প্রাদুর্ভাব হইলে পর ভারতবর্ষের আদিনিবাসি ভীল কোল প্রভৃতি অসভ্য নরেরা অত্যন্ত উৎপাত করিত। তাহারা সেসময়ে নরমাংসাশি ছিল, তজ্জন্যই তাহারা সেকালে রাক্ষসরূপে বর্ণিত হইয়াছে;—সেই সকল পিঙ্গলাক্ষ দারুণাকৃতি, দন্তবিকট করাল বদন অসভ্যের

*৫ ততো দ্রোণোঽর্জ্জুনং ভূয়ো হয়েষু চ গজেষু চ।
রথেষু ভূমাবপিচ রণশিক্ষামশিক্ষয়ৎ॥
গদাযুদ্ধেঽসিচর্য্যায়াং তোমরপ্রাসশক্তিষু।
দ্রোণঃ সঙ্কীর্ণযুদ্ধে চ শিক্ষয়ামাস কৌরবান্॥ ইত্যাদি।

*৬ তস্য তৎকৌশলং শ্রুত্বা ধনুর্ব্বেদং জিঘৃক্ষবঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ॥ ইত্যাদি।

*৭ সমানবৃক্ষাং নির্গুল্মামুদকপ্রস্রবণান্বিতাং।
তস্যাং ভূমৌ বলিং চক্রে তিথৌ নক্ষত্রপূজিতৈঃ॥
প্রেক্ষাগারং সুবিহিতং চক্রুস্তে তস্য শিল্পিনঃ।
রাজ্ঞঃ সর্ব্বায়ুধোপেতং স্ত্রীণাঞ্চৈব নরর্ষভ॥ ইত্যাদি।

*৮ গান্ধারীচ মহাভাগা কুন্তীচ জয়তাংবর।
স্ত্রিয়শ্চ রাজ্ঞ সর্ব্বাস্তাঃ স প্রেষ্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥
হর্ষাদারুরুহুর্ম্মঞ্চান্মেরুং দেবস্ত্রিয়ো যথা ইত্যাদি। ইতি
মহাভারতে আদিপর্ব্বে সম্ভবপর্ব্বে।

* Arian

পিশিতেপ্সায় লোলুপ হইয়া নগরান্তরালে বা ঋষ্যাশ্রম সমূহে মহাউৎপাত করিত, তাহারা যজ্ঞাদিতে ঘোরতর বিঘ্নোপস্থিত করিয়া তাহাদিগের মাতৃভূমির হরণকারি হিন্দুদিগের প্রতি প্রতিহিংসা ঋণ পরিশোধ করিত,—ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণে অক্ষম বিধায় ক্ষত্রিয়দিগের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন, এ নিমিত্ত রাজাদিগের অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে রাক্ষস অর্থাৎ মানুষ-মাংসাশি অসভ্যদিগের উৎপাত হইতে তপোবন সমূহ রক্ষা করাও এক প্রধান কার্য্য ছিল*৯। তাঁহারা মহা মহা যুদ্ধ বিগ্রহ পূর্ব্বে স্বীয় স্বীয় পরাক্রমের পরীক্ষা প্রদান স্বরূপ যৌবন প্রারম্ভেই রাক্ষস দমনে নিযুক্ত হইতেন। বোধ হয় পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমেই তাঁহারা স্বীয় ব্যবসায়ের ভার গ্রহণ করিতেন। বিশ্বামিত্র ঋষি দশরথের স্থানে রাক্ষস হননার্থ রামচন্দ্রকে প্রার্থনা করিলে দশরথ কহিয়াছিলেন,—

"ঊনষোড়শ বর্ষোহয়ং রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি রাক্ষসৈঃ সহ॥

অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষমাত্র বয়স্ক পদ্মনেত্র রাম অদ্যাপি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে ক্ষমতা রাখেন এমত দর্শন করি নাই।

উপরিউক্ত বিবিধ ব্যায়াম শিক্ষার পদ্ধতি ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশেই প্রচলিত ছিল,—মনু কহেন বিনসনের পূর্ব্ব, প্রয়াগের পশ্চিম, এবং হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম মধ্যদেশ। অপর সিন্ধুকলবর্ত্তী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল প্রভৃতি দেশীয় মনুষ্যেরা অবহমান কাল পর্য্যন্ত যে দুর্ব্বল দেহি তাহাও এক মনুবচনের আভাসে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, মনু রাজাদিগকেযোদ্ধ নির্ব্বাচন কল্পে কহেন ;—

"কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালাঞ্চুরসেনজান্।
দীর্ঘাল্লঘুংশ্চৈব নরানগ্রাণীকেষু যোযয়েৎ॥" ১৯২ শ্লোকঃ
ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমাধ্যায়ে।

অর্থাৎ যুদ্ধস্থলের অগ্রভাগে কুরুক্ষেত্র১, মৎস্য২, পঞ্চাল৩, সুরসেন৪ ও অন্যান্য দেশীয় দীর্ঘ অথচ লঘু দেহধারি মনুষ্যদিগকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

অপিচ তাঁহারা অপরাপর বিবিধ প্রকার যুদ্ধ কৌশল মধ্যে নানামত ব্যূহরচনা শিক্ষা করিতেন, মনু কহেন ;—

"দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যাবা গরুড়েন বা॥"

৯* "কে আবাং পরিত্রাতুং, দুষ্মন্তম্ আক্রন্দ, রাজরক্ষিতানি তপোবনানি নাম॥
শকুন্তলা।

১। আধুনিক দিল্লী প্রদেশ।
২। আধুনিক বিরার প্রদেশ।
৩। আধুনিক অযোধ্যা ও বেরেলী প্রদেশ।
৪। আধুনিক আগরা প্রদেশ।

অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রাকালে দণ্ড[৫], শকট[৬], বরাহ[৭], মকর[৮] এবং গরুড়াকারে[৯] ব্যূহরচনা করিয়া গমন করিবেন।

কিন্তু দৈহিক বলের অসদ্ভাবে উপরি উক্ত পুরুষার্থ সমূহ লাভের সম্ভাবনা কি? হে অনৈক্য পরায়ণ, ভীরুস্বভাব, পরাপমানগ্রস্থ, উদ্যোগবিহীন স্বদেশীয় লোকেরা! তোমরা আর কত দিন ঐশিক এবং মানুষিক বিধির বিপর্য্যয়ে দৈহিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যে কালহরণ করিবে? তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলা কি কিছুই তোমাদিগের তিমিরাবৃত অন্তঃকরণে পতিত হয় না? হা! তোমাদিগের অপেক্ষা তোমাদের জন্মভূমির পশু-পক্ষ্যাদি মধ্যে সমধিক সন্তান পালনের সুনিয়ম পরিদৃষ্ট হয়। তোমরা মানসিক বল বৃদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্ববিজ্ঞানাদি শাস্ত্র উপদেশের অনুসন্ধান করহ,—কিন্তু ইহা কি অবগত নহ? যে, যেরূপ প্রাবৃটকালীন সুপঙ্কিল ও বাতাভিপাতে চপলীভূত জলাশয় গর্ব্বে নিশাকরের নির্ম্মল ছায়া পতিত হইলে প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ, রুগ্ন, ভগ্ন, দুর্ব্বল দেহিদিগের অস্থির চিত্তে জ্ঞানচন্দ্রের পরিপূর্ণ পরিষ্কৃত প্রতিবিম্ব বিভাসিত হইতে পারে না।

আমরা উপরিভাগে পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার বিবরণ শেষ করিয়া এইক্ষণে প্রাচীন ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তদ্বিষয়ের কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল তাহা পুরাবৃত্তের আশ্রয় লইয়া কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, আমাদিগের এতাবৎ বিবরণ করণের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে পৃথিবীতে সভ্যতা ভব্যতা প্রভৃতি হিতকর নানা বিষয়ের উন্নতি এবং অবনতি বাহুবলের ন্যনাতিশয্যেই বহুলাংশের নির্ভরিত ছিল।

৩। প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের ব্যায়াম চর্চ্চার বিবরণ।

ইয়ুরোপীয় প্রাচীন জাতিদিগের কোন বিষয় বিবরণ করিতে হইলে গ্রীক অর্থাৎ যবন*১০ জাতিরই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাঁহারাই ইয়ুরোপের আদি সভ্যজাতি। তাঁহারা সভ্যতা ভব্যতা কল্পে প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না, বরং শিল্পাদি বিদ্যায় ভারতবর্ষীয়দিগের অপেক্ষা সমীচীন ব্যুৎপত্তি বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য রাখিতেন তাহা মহাভারতের লিখন প্রমাণেও জানা যাইতেছে।—পাণ্ডবদিগকে নিহত করণ মানসে বারণাবতে পুরোচন নামক যবন শিল্পিদ্বারাই দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরন্তু কোন প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত কহেন "অস্মদ্দেশের দেবতারা অমর্ত্ত্য-মনুষ্য এবং মনুষ্যেরা মর্ত্ত্য-দেবতা হয়েন" ফলতঃ তাঁহাদিগের কায়া সকল দেবতুল্যই ছিল বটে।

৫। অর্থাৎ স্তম্ভাকারে, ইংরাজিতে যাহাকে কলম কহে।

৬। অর্থাৎ ত্রিকোণাকারে।

৭। অর্থাৎ যুগ্ম ধনুর উভয়াগ্রভাগ স্পৃষ্ট হইলে যেরূপ।

৮। অর্থাৎ ডমরুর ন্যায়।

৯। অর্থাৎ দুই পার্শ্বে দুই আকার হয়, তদ্রূপে পক্ষ এবং অগ্রভাগে চঞ্চুরাকারে সেনা রচনা করিয়া ব্যূহ সাজাইতে হইবেক।

১০* পৃন্সেপ সাহেবের প্রসাদাৎ প্রসিদ্ধ অশোক রাজারকীর্ত্তি বিন্যস্ত প্রস্তর ফলকের পদাবলীর অর্থ সঙ্গতি হওনাবধি যবন শব্দ যে প্রাচীন গ্রীকদিগের প্রতি লক্ষিত হইত, তদ্বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই।

গ্রীকজাতির মধ্যে স্পার্টাদেশীয় লোকেরা সুপ্রাচীন অথচ সর্ব্বাপেক্ষা ব্যায়াম চর্চ্চায় অতিমাত্র সুনিপুণ ছিলেন,—অতএব আমরা তাঁহাদিগের বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে কিয়দুক্তি করিতেছি। স্পার্টা-দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মপ্রযোজক লাইকর্গস্ মহাত্মাকৃত ব্যবস্থাশাস্ত্রের মর্ম্মই তদ্দেশীয় লোকদিগের শরীর ও মন বীর রসাসক্ত করণ মাত্র। এ নিমিত্ত যে সকল সন্তান রুগ্ন বা অঙ্গহীন হইয়া জন্মিত, তাহাদিগের ভূমিষ্ঠ হওন পরেই তাহাদিগকে বিনষ্ট করণের বিধি ছিল; যাহারা বলিষ্ঠ ও পুষ্টদেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিত তাহারা অক্রবাণ অবস্থাতেই রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত, তথায় এরূপ গুরুতর ব্যায়াম শিক্ষার নিয়ম ছিল যে অতিদৃঢ় বালশরীর ব্যতীত তদ্রূপ শারীরিক শিক্ষা সহনীয় নহে। উক্ত প্রকার শিক্ষার মূলাভিপ্রেত বল, বীর্য্য, সাহস, ধৈর্য্য প্রভৃতি পুরুষার্থ লাভ মাত্র, এই ঘোরতর ব্যায়াম শিক্ষায় কি বালক কি বালিকা সকলেই নিযুক্ত হইত।

তাহাদিগের পর্ব্বাহোৎসবে মল্লযুদ্ধাদিই আমোদপ্রমোদ রূপে নির্ণীত ছিল,—উল্লম্ফন ধাবন ভল্ল শূল চক্র প্রভৃতি নিক্ষেপণ, বাহুযুদ্ধ এবং মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ব্যসনে যুবকেরা আপনাদিগের বল বিক্রমাদি প্রদর্শন করিত। তদ্ব্যতীত অশ্ব ও রথ সঞ্চালন প্রভৃতি বহুবিধ ব্যায়াম ছিল,— ফলতঃ উক্তপ্রকার ব্যসনে এইক্ষণে যেরূপ ঘোটকের শক্তি এবং গতির দ্রুততা বিচার করণ পূর্ব্বক জয় পরাজয় নির্দ্দেশ হয়, স্পার্টান মধ্যস্থেরা তদ্বিপরীতে তুরঙ্গারোহি অথবা রথিদিগের কৌশল ও বল বিক্রমের ন্যূনাতিশয্য বিবেচনা করিয়াই পুরস্কার বিধান করিতেন।

পরন্তু গৃহসজ্জা ও বেশভূষা বিষয়ে উক্ত জাতি এরূপ সামান্যপদ্ধতির অনুবর্ত্তী ছিলেন, যে যদিও কোন কোন বিষয়ে উক্ত প্রকার অনাড়ম্বর শোভার নিমিত্ত হউক কিন্তু সমধিকস্থলে তদ্দ্বারা তাহাদিগের বিমূঢ় জাল্মবৎ ব্যবহার প্রকাশ পাইত। স্ত্রীলোকের পরম ভূষণস্বরূপ শ্রী স্নেহাদি মৃদুতাচরণ উক্ত দেশ হইতে এককালে প্রস্থান করিয়াছিল,—লাইকর্গস্ নারীদিগকে বীরপ্রসূ করণার্থ সমুদায় ললিত ব্যবহারের স্রোতরুদ্ধ করিয়াছিলেন, ফলতঃ ঐ সকল ব্যবস্থা অসভ্য অবস্থাপন্ন প্রাচীন জাতি বিশেষের মধ্যে কতিপয় শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্তই উপযোগিনী ছিল, আধুনিক সভ্যজাতিদিগের নিকট তত্তাবতের অধিকাংশই ঘৃণার্হ সন্দেহ কি? কিন্তু দেশ কাল পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করিলে পুরাকালে প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত ঐ সকল ব্যবস্থা বিশেষ হিতকর হইয়াছিল। আর স্পার্টানদিগের চরিত্র পাঠে ইহাও দ্রষ্টব্য, যে মানসিকবলে তাহারা প্রাধান্য দেখাইতে অশক্ত হইলেও শারীরিকবলে প্রধান প্রধান গ্রীক জাতির মধ্যে প্রায় অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

গ্রীকদিগের প্রাদুর্ভাব পশ্চাৎ রোমাণজাতির গরিমাবৃদ্ধি হয়, অতএব তজ্জাতিরমধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার যেরূপ প্রচার ছিল, তদাভাস কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা যাইতেছে।

রোমাণ ভদ্রকুলজ যুবাদিগের ব্যায়াম শিক্ষার্থ কাম্পস্ মার্শ্যস্ নামক এক সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি ছিল,—তথায় উক্তপ্রকার শিক্ষা ব্যতীত সৈন্য প্রদর্শন প্রভৃতি সাধারণ কার্য্যকদম্ব সম্পাদিত হইত। অপর, উক্ত রাজ্যের অন্তঃপাতি অনেক স্থানে মল্লযুদ্ধাদির শিক্ষার্থ বহুতর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে লানিষ্টা নামধারী এক এক জন ব্যায়াম বিদ্যার উপদেশক কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ঐ সকল মল্ল শিক্ষার্থিদিগের সংখ্যা সময়ে সময়ে এরূপ বর্দ্ধিত হইত যে তাহাতে রাজ্যপ্রণালী অবরুদ্ধ হওনের উপক্রম হইয়া উঠিত, স্পার্টেকস নামক একজন মল্ল, বিদ্যালয় হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সপ্ততিসহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজপ্রতিকূলাচারী হইয়াছিল। জুলিয়স কৈসর তদ্বিদ্যা শিক্ষাকালে ৬৪০ জন মল্লের সহচর ছিলেন। উক্ত মল্লদিগের শিক্ষার পরীক্ষা নিমিত্ত তার্কুনিয়স্

প্রিস্কস নামক নৃপতি সর্কস মাক্‌সিমস্ নামক চক্রাকার এক প্রেক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উক্ত বৃহদট্টালিকা ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রাজার সময়ে বৃদ্ধিযুক্ত হয়, প্লিনি নামক পণ্ডিতের সময়ে তন্মধ্যে দুই লক্ষ দৃদিক্ষ সমাবেশিত হইত। উক্ত প্রেক্ষাগার অপেক্ষা অতি প্রকাণ্ড অন্য এক চক্রশালা বেস্পিশিয়ান নামক সম্রাট্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাগার সমূহের মধ্যবর্ত্তী বলিচক্রে বাহুযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, হিংস্র জন্তুর সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ, রথ সঞ্চালন প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যসন প্রদর্শন হইত। মল্লদিগের মধ্যে কেহ গুরুতররূপে আহত হইলে সে বলিচক্রের অন্তঃসমীয় পলায়নপূর্ব্বক দর্শকদিগের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিত, তাহাতে দর্শকেরা যদ্যপি তাহার বলবীর্য্য ও সাহসাদির কোনরূপ ত্রুটি দৃষ্টি না করিতেন, তবেই তাঁহারা তাহাকে অভয় প্রদান বিজ্ঞাপন করণার্থ নিম্নদিগে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রসারণ করিতেন, নতুবা তাহার ভীরুতা ও নৈপুণ্য বিহীনতা প্রকাশ পাইলে তাহা প্রসারণ করিতেন না, তদ্দর্শন মাত্রে ঐ দুভাগার প্রতিযোগী আসিয়া তাহাকে নিহত করিত।

রোমানেরা এবম্প্রকার নিদারুণ রীত্যবলম্বন পূর্ব্বক বাহুবল সাধন করিতেন, বস্তুত এ প্রকার রীতি সভ্যতা এবং মনুষ্য ধর্ম্মের বিগর্হিত হইলেও যদবধি সেই সকল রীতির প্রবলতা সূত্রে বাহুবলের বহুলতা ছিল, তদবধিই তাহাদিগের পরাক্রম এবং স্বাধীনতা প্রাদুর্ভূত থাকে। পরে উষ্ণাতিশয় দেশসমূহে অধিকার বৃদ্ধিসহ তদ্দেশীয়দিগের রীত্যনুকরণ দ্বারা বিলাসবিহ্বলতায় ক্ষীণ-কল্প হইতে লাগিলেন, সুতরাং সেই সময়ে বিবিধ অসভ্য জাতি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগের সাম্রাজ্য ছারখার করিয়া ইয়ুরোপীয় প্রাচীন সভ্যতা ভব্যতা বিদ্যা বিজ্ঞানাদি একেবারে বিধ্বংস করিল। ভোগাসক্তি সমুদায় পুরুষার্থের ক্ষয়কারিণী, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রতির নিকট মদনের আস্পর্দ্ধাপূর্ণ উক্তি অতি যথার্থ কহিতে হইবেক। পৃথিবীর নানা দেশের পুরাবৃত্ত পাঠে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে জাতির মধ্যে ভোগাশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে সেই জাতিই অধঃপাতে গিয়াছেন, নাদেরশাহ তুরাণী যেদিবস দিল্লী নগরাধিকার পূর্ব্বক মোগলাধিপের ন্যায় সম্ভোগরসে যামিনী-যাপন করেন, সেই দিবসের পর-প্রভাতে অধিক বেলা বর্ত্তিলে নিদ্রাভঙ্গ হইবাতে প্রথমতঃ অনুশোচনা করত পশ্চাৎ তন্নিদান স্থির করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন "অহো! এইজন্যই দিল্লীশ্বর তেজোহীন হইয়াছেন, বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য নহে তাঁহারা এবপ বিহ্বলতাকর ভোগানুরাগের অনুরাগী হন।"

অতঃপর আমরা প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে স্কিদীয় * অর্থাৎ শক জাতির বিবরণ বিবৃত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম,—যেহেতু ঐ জাতির বাসস্থান আশিয়া খণ্ডের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইলেও বস্তুত সেই জাতি আধুনিক ইয়ুরোপ খণ্ডের বহুতর বলবীর্য্যবন্ত জাতির বীজাধার স্বরূপ ছিলেন।

হিমবৎ পর্ব্বতের বায়ুকোণ হইতে রুশিয়ার অন্তঃপাতি যুরাল পর্ব্বতের তটবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত অতিপ্রাচীন কালে যে সকল জাতি বসতি করিতেন, তাঁহারা ভোগাসক্তি বিহীনতা বশত দৈহিক বলবীর্য্যে ধরাতলস্থ প্রায় সকল জাতিকে স্বকরতলে আনিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ, সুরিয়া ** কাল-দিয়া, পারস্য, রোম প্রভৃতি প্রাচীনতম সাম্রাজ্য সমূহ উক্ত দেশীয় অসভ্যদিগের দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বস্তুত ভারতবর্ষীয় পৌরাণিকদিগের দ্বারা যাহারা শক, পারদ ও হুন নামে প্রসিদ্ধ

* গ্রীক গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে সকী (saci) নাম খ্যাত করেন।

** Assyria

তাহারাই ইয়ুরোপে স্কিদীয়, পারসীয়, ও হুন নামে খ্যাত ছিল। উক্ত শকজাতি হইতে গথিক জাতির উৎপত্তি, তাহারাই রোমরাজ্যের উচ্ছেদকর্ত্তা। তাহাদিগের সগ-নামক জনৈক নৃপতি ইয়ুরোপের উত্তরখণ্ড অর্থাৎ স্কন্দিনিবিয়াদেশে যাইয়া এক পরাক্রান্ত রাজ্যস্থাপন করেন। উক্ত সগরাজা বিক্রমাদিত্যের সাময়িক শক রাজা কিনা তাহাও পুরাবৃত্তবেত্তাদিগের অনুসন্ধেয় বটে। সে যাহাই হউক, এইক্ষণে ইয়ুরোপে যেসকল জাতি বাহুবল জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই উক্ত জাতির বংশধর হয়েন। যদিও প্রাচীন শক ভাষা বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি সাক্‌সন প্রভৃতি ভাষাতে তাহার অনেক শব্দ পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় শকভাষা সংস্কৃত ভাষারই এক শাখা হইবেক। অপর (এই শক শব্দ) স্কিদীয়,—সাক্‌সন ও স্কন্দিনিবিয়া প্রভৃতি বহুতর শব্দের মূল তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। শক জাতির যুদ্ধই ব্যবসায়, শারীরিক বলপ্রাচুর্য্যেই পুরুষার্থ, এবং বিগ্রহ রসই একমাত্র আমোদ জননের কারণ ছিল। তাহাদিগের প্রধান দেবতার নাম বোদিন *—এই দেবতা আশঙ্কা এবং বিক্রমের অধিষ্ঠাতা ;—করুণা অথবা স্নেহাদি মৃদুতাচরণ এই দেবতার গুণাবলী মধ্যে গণনীয় নহে। শকদিগের য়েদা (Edda) ** নামক ধর্মগ্রন্থে তিনি "ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিমান" "সংগ্রামের জনক" "হননার্হদিগের বিধাতা" ইত্যাদি বহুল ভয়াল বিশেষণে আহুত হইয়াছেন।

তাহাদিগের স্বর্গলোকের নাম বলহালা (Valhalla) এবং সমরক্ষেত্রে শূরত্বপ্রকাশ পূর্ব্বক প্রাণোৎসর্গ ব্যতীত সেই দিব্যলোকে গমনের দ্বিতীয় পথ নাই, তথায় বলকরী (Valkirii) নাম্নী দেবকন্যাগণ ঐ বীরধর্ম্মি পুরুষদিগের ভোজন পানাদি পরিবেশন করেন। এইস্থলে উক্তোভয় শব্দ যে সংস্কৃত "বল" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমত সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। অপিচ হালা শব্দ সংস্কৃত শালা শব্দের সহিত বিলক্ষণ ঐক্য রাখে, অতএব বলহালা যে বলবিক্রম বীরত্বের চরমস্থান, তৎসিদ্ধান্ত পক্ষে সংশয় মাত্র নাই। উক্ত স্বর্গের সুখসম্ভোগ মধ্যে বিলাস-বিহ্বলতার লেশ মাত্র নাই। উক্তলোক প্রাপ্ত বীরগণ প্রত্যহ সমর সজ্জা ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যহ পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে সকলেই নিহত হন। পরে দিবাবসানে ভোজনের সময়াগমে ঐ সকল ছিন্নভিন্ন দেহ পুনর্ব্বার সংযোজিত হইলে পর বীরগণ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব ঘোটকারোহণ পূর্ব্বক ভোজমন্দিরে উপনীত হন। তথায় বলকরী নামিকা নিরুপমা রূপসী দেবকন্যারা তাঁহাদিগকে বরাহমাংস ও যবসারে প্রস্তুত মদিরায় পরিতৃপ্ত করেন। বীরগণ স্ব স্ব শত্রুর কপালফলকরূপ চষকে সুরাপান করত প্রমত্ত হইতে থাকেন। কিন্তু এই অসাধারণ দিব্যলোকে প্রেমামোদের কোন সম্পর্ক নাই,—যে সকল বীর স্বহস্তে সমধিক শত্রুমুণ্ডচ্ছেদন করিয়াছেন অমরবালাগণ তাঁহাদিগকে ভোজ্য পান প্রদান দ্বারাই সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেন।

উল্লেখিত প্রকার ধর্ম্মে আস্থা থাকাতে শক জাতীয়েরা স্বভাবত উগ্রচণ্ড ভাবাবলম্বি ছিল ; তাহাদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, চরিত্র, প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ে রৌদ্ররসেরই প্রাধান্য ছিল, তাহারা সমরোল্লাসকেই পরম সুখজ্ঞান করিত ;—বিপদাশঙ্কা অথবা শারীরিক ক্লেশকে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিত ;—তাহারা দুর্দ্ধর্ষভাবে ঘোরতর আপদ কান্তারে প্রবেশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত এমত নহে, প্রত্যুত তাহারা মৃত্যুকে আত্ম সমীপে আহ্বান করিয়া আনিত, তাহাদিগের ভয়ানক বলবীর্য্য বৃত্তান্ত পাঠ কালে হৃৎকম্পিত হইতে থাকে।

---

* এই শব্দের সহিত বুধ শব্দের একতা আছে। ইয়ুরোপে প্রচলিত বুধবারের নামও ঐ বোদিন হইতে সমুৎপন্ন।

** এই শব্দের সহিত বেদ শব্দের একতা আছে।

এইক্ষণে, সেই সকল অসভ্য পরাক্রান্ত জাতির সুসভ্য বংশধরেরা ধরাধামে সর্ব্ববিধায়ে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা অধুনা পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন,—মানসিক বা দৈহিক বলে ইংলণ্ডীয় ফ্রান্সীয় এবং জর্মানীয় প্রভৃতি লোকেরা এরূপ প্রাধান্য রাখেন যে তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শনে অন্য কোন জাতি পারগ নহেন। ইয়ুরোপে এবং আমেরিকাতে ঐ সকল জাতি এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ে ব্যায়াম চর্চ্চার অতিমাত্র আবশ্যকতাজানিয়া শিক্ষিতদিগের মানসিক শক্তির সহিত শারীরিক শক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত অশেষ বিধ উপায়ের সৃষ্টি করিতেছেন, আমাদিগের দেশে সেই সকল উপায় অবলম্বিত না হইলে বিদ্যাধ্যাপন প্রণালী কোনরূপেই সংশুদ্ধ বা সম্পূর্ণ পদে বাচ্য হইতে পারিবেক না,—বস্তুতঃ তদ্রূপ শিক্ষা বিরহে এতদ্দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন হইবেক না,—বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা এতদ্দেশীয় বালকদিগের মনে কেবল কল্পনা এবং বিভাবনা পরিপূর্ণ হওনেরই সম্ভাবনা, তাহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যতে স্বদেশের উৎকর্ষ সম্পাদিত হইবার প্রত্যাশা নাই,—যেরূপ অতি তেজস্বিনী সজলভূমিতে ওষধি ও শস্য বৃক্ষাদির পত্রপ্রাচুর্য্যমাত্রই হয়, ফলবাহুল্য লাভ হয় না, —সেইরূপ দুর্ব্বলশরীর তেজস্বি বুদ্ধি-জীবিদিগের দ্বারা মনুষ্যত্বের সাফল্য হওয়া দুর্ঘট! এতদ্বিষয় শেষ পরিচ্ছেদে বাহুল্যরূপে অনুমোদিত হইতেছে :—

৪। ব্যায়াম চর্চ্চার সদুপায় ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হেতু অশেষ দোষোদ্ভাব—তথা রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাহা প্রচলিত করণের আবশ্যকতা *।

দৈহিক বলবীর্য্য প্রভৃতির প্রাচুর্য্য থাকিলে কোন জাতি স্বাধীনতার সুখাস্বাদ করিতে পারেন না, ধরাতলে গণনীয় হইতে পারে না, তাহাদিগের দ্বারা শিল্প বিজ্ঞানাদির উৎকর্ষ হওয়া সম্ভবপর নহে। এতাবৎ সপ্রমাণ করণার্থ আমরা কয়েক পরিচ্ছেদে প্রাচীন প্রাচীন পরাক্রান্ত জাতিদিগের মধ্যে দৈহিক বলবৃদ্ধির নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ শিক্ষাপদ্ধতি থাকার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাঁহারা ভীরুস্বভাবি দুর্ব্বলদিগকে কাপুরুষ জ্ঞান করিতেন। এইক্ষণে উপস্থিত পরিচ্ছেদে দৈহিক বলপ্রাচুর্য্যের আরো কতিপয় প্রত্যক্ষ উপকার বর্ণন পূর্ব্বক প্রস্তাব সমাপন করিতেছি।

এই বিষম বিষয়ারণ্যে মানসিক স্বচ্ছন্দতাই পরমসুখ, ইহা সর্ব্বদেশীয় জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের দেহের সহিত মানসের এরূপ সম্বন্ধ, যে একের অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বে অন্যের স্বাচ্ছন্দ্য কদাপি সম্ভূত হইতে পারে না,—যেরূপ ঘটিকাযন্ত্র বহির্ভাগে আঘাত প্রাপ্ত হইলে তাহার অভ্যন্তরস্থ কল পর্য্যন্ত বিকল হইয়া যায়,—সেইরূপ মানুষের শরীর যদ্যপি অসুস্থতা বা দুর্ব্বলতা কর্ত্তৃক আহত হয় তবে মানসরূপ যন্ত্রের স্বচ্ছন্দতা বা সুশৃঙ্খলা থাকার সম্ভাবনা নাই। স্বাস্থ্যবিরহে শরীর ধারণ ব্যর্থ,—মনুষ্য তদ্বিরহে কোন সুখে সুখী হইতে পারে না, সুস্থতা দেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয় কোন প্রসিদ্ধ কবি কহেন :—

> "Without thy cheerful active energy,
> No rapture swells the breast, no poet sings."—*Armstrong.*

* এই পরিচ্ছেদ ডক্তর কালড্‌ওয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞ বিজ্ঞ গ্রন্থকারের উক্তি সাহায্যে লিখিত হইল।

অস্বাস্থ্য

তোমার আনন্দময়, নিরলস নিরাময়,
প্রাদুর্ভাব বিরহে সর্ব্বথা।
কোন সুখোল্লাসে চিত, নাহি হয় প্রফুল্লিত,
কবি কণ্ঠে নাহি সরে কথা।

অতএব সুস্থতাই যদ্যপি ইহ জগতমণ্ডলে প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ মানসিক সুখের একমাত্র জনয়িত্রী হইলেন, তবে সেই দুরারাধ্যা দেবীকে দেহমণ্ডপে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনা করা মনুষ্য জাতির কর্ত্তব্য হইয়াছে,—যেহেতু তদভাবে সর্ব্ব পুরুষার্থের নিদান দৈহিক বা মানসিক বল প্রাপনের উপায়ান্তর নাই।

অধুনা ইয়রোপীয় এবং আমেরিকান অনেকানেক জ্ঞানী কর্ত্তৃক ইহাই নির্ণীত হইয়াছে, যে মনুষ্যের মস্তক মধ্যেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রস্থাপিত আছে,—সুতরাং মস্তককে সর্ব্বদা সুস্থ না রাখিলে সেই সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। এইক্ষণে, সেই সুস্থতালাভের প্রধান উপায় দেহমধ্যে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহের প্রাচুর্য্য,—কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রসূতির গর্ভাধান অবধি সন্তানের যৌবন পরিপাক পর্য্যন্ত বিহিত তত্ত্বাবধারণ না থাকিলে পরিচ্ছিন্ন রক্তপ্রাচুর্য্য লাভ হওয়া সুদূর পরাহত। অতএব উক্ত জ্ঞানিগণ সন্তান জনয়িতা দম্পতির পরিণয়পাশে বদ্ধ হওনাবধি সন্তান গর্ভস্থ, ভূমিষ্ঠ, প্রতিপালিত, ও শিক্ষিত করণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যে সকল সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে দৈহিক সুস্থতা ও শক্ততা সহকারে মানসিক সুস্থতা ও তেজস্বিতা লাভ হয়। আমাদিগের দুর্ভাগাদেশে তদ্রূপ সুনিয়মাবলীর সম্পূর্ণ বিপর্য্যয়ে কার্য্যকৃত হইবাতেই ধরাতলে বাঙ্গালিজাতি সর্ব্ববিধায়ে প্রায় অধমকল্প হইয়াছেন। অতএব সেই সকল দোষোদ্ঘাটন পূর্ব্বক যাহাতে সুশিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হয়, তৎপক্ষে যত্ন করা দেশহিতৈষি মনুষ্য মাত্রের অতিকর্ত্তব্য হইয়াছে।

যেরূপ সুবীজ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কৃষিগণ সুশস্য উৎপত্তির আয়োজন করে, ও বলীষ্ঠ বলীবর্দ প্রভৃতির ঔরষ যোগে উত্তমোত্তম গোমহিষাদি লাভ করে,—সেইরূপ সুবলীষ্ঠ প্রবৃদ্ধ-যৌবন-প্রাপ্ত পুরুষদিগের সহিত সুস্থদেহ সুন্দরীদিগের পরিণয়ে উত্তম সন্তানরত্ন উৎপন্ন হয়। আমাদিগের দেশে তদ্বিপরীতে জরাগ্রস্থ, পলিতকেশ, স্থবির ও শ্বাসকাশ, কুষ্ঠ, উদরী, প্রভৃতি ভয়ানক রোগগ্রস্থ ধনবানেরা এদেশের উত্তমা বালাবলীর পাণিগ্রহণ করত বলবীর্য্যবিহীন ক্ষীণবুদ্ধি পুত্রকন্যাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি করণ পূর্ব্বক বাঙ্গালিজাতির হীনতার এক মূলীভূত কারণ হইতেছেন। অপিচ, এদেশে অতি তরুণ বয়সে বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্বল্প দৌর্ভাগ্যের কারণ হয় নাই; নিতান্ত নবযৌবনে যাঁহারা সন্তান সন্ততির জনক জননী হইয়া বসেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং অপক্কদেহি, সুতরাং সেই দৌর্ব্বল্য এবং অপক্কতা তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরা অবরোহিত হইতে থাকে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীরের তেজ ও বল পরিপাক হয়, সুতরাং প্রবৃদ্ধ যৌবন এবং প্রৌঢ় অবস্থায় যাঁহারা সন্তানবান হন, তাঁহাদিগের সন্তানগণ প্রায় বলীষ্ঠ এবং পুষ্টদেহ হইয়া থাকে, প্রাচীন স্পার্টা এবং আধুনিক ইয়ুরোপ খণ্ডে উক্ত দোষোদ্ঘাটনার্থই বাল্যবিবাহের কুপ্রথা রহিত হইয়াছে।—এইক্ষণে, বাঙ্গলাদেশে এই রুচির নিয়ম কোন্‌কালে প্রচলিত বা প্রস্থাপিত হইবেক? কোন্ কালেই বা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ পাতকিদিগের করে সুকুমারী কুমারীদিগকে

বিসর্জ্জন করণে ধনলোভি দুষ্টাশয় জনক জননীরা ক্ষান্ত হইবেক ? দেশের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া এমত ইচ্ছা হয় রাজপুরুষেরা এই মহানিষ্টকর কুপ্রথা সকল বিধি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক নিবারণ করত বাঙ্গালিজাতির ভাবীমঙ্গল সংকল্পের দিবস সন্নিকট করুন।

ব্যায়াম বিদ্যার উপকারিতা বর্ণন-কুশল কোন মহাশয় কহেন, যুদ্ধ বিগ্রহাদি প্রাদুর্ভাব কালে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, সেই সকল সন্তান স্বভাবতঃ সাহস সম্পন্ন হয়, ইহার কারণ সেই সময়ে তাহাদিগের জনকেরা স্বদেশ হিতার্থে বা আত্মরক্ষার নিমিত্ত অথবা কারণান্তর বশতঃ শত্রুবিমর্দ্দন কালে ঘোরতর জিগীষা পরবশ হয়, সুতরাং সেই বিগ্রহ রসে তাহাদিগের শরীর ও মন পরিপুত থাকাতে পুত্রগণও সেই ভাব লাভ করে। এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থলে তিনি ইয়ুরোপে সংঘটিত বহুবিধ ঘটনার উল্লেখ করেন। অপিচ, আরব ও তাতর দেশীয়দের সন্তানেরা বালক কালাবধি চৌর্য্যাদি কুক্রিয়ায় অনুরত হয়, ইহা যে কেবল তাহাদিগের জনক জননীদিগের দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষা অনুসারেই হইয়া থাকে এমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে, প্রত্যুত. তাহারা গর্ভ মধ্যে অবস্থান কালাবধি সেই দুষ্প্রবৃত্তি প্রধান পিতৃ মাতৃর তেজে পরিণত হয়। অতএব যে সকল পিতা মাতা অতি দূষণাবহ শারীরিক বা মানসিক রোগে আক্রান্ত, তাঁহাদের সন্তানদিগের শরীর ও মানস মধ্যে সেই সকল দোষ পুরুষানুক্রমে প্রাদুর্ভূত হইবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? কুষ্ঠির পুত্র কুষ্ঠী এবং ক্ষিপ্তের পুত্র প্রায় ক্ষিপ্তই হইয়া থাকে, অতএব এমত সকল ব্যক্তির সুসন্তান প্রত্যাশা বৃথা, এমত সকল দুর্ভাগ্যদের বিবাহপাশে বদ্ধ হওয়াই অন্যায়। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর করিতেছি, ধনবান লোকেরা সর্ব্বদাই এবম্প্রকার দোষাশ্রিত দেহ ও মন বিশিষ্ট সন্তানদিগকে পরিণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

ধরাতলে তুরস্ক এবং পারস্য দেশীয় প্রধান লোকেরা সর্ব্বজাতির অপেক্ষা সুপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, তদ্ধেতু এই যে তদ্দেশীয় উচ্চপদবীস্থ জনগণ জর্জিয়া এবং সর্কেশিয়া দেশজাত সুপ্রসিদ্ধ রূপসীদিগকে অর্থদ্বারা ক্রয় করিয়া বিবাহ করে, কিন্তু যদ্যপি ইয়ুরোপ খণ্ডের প্রথানুসারে ঐ ললনাগণের স্বাধীনতা সুখ থাকিত, তবে উক্ত দেশীয় প্রধান বংশীয়েরা যেরূপ রূপবান বলিয়া বিখ্যাত ; সেইরূপ বলবান ও বুদ্ধিমান রূপে অগ্রগণ্য হইত সন্দেহ নাই।

অতএব এস্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে বাঙ্গলাদেশে সুশ্রীশালিনী কামিনীমাত্র পরিগ্রহ করিলেই যে কোন ব্যক্তির সুসন্তান লাভ হইবেক এমত প্রত্যাশা করা উচিত নহে। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দিগের কারাবরোধ বিমোচন না হইলে এবং তাহারা সীতা, সাবিত্রী, রুক্মিণী এবং দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় সমাদৃত ও সুশিক্ষিত না হইলে তাহাদিগের গর্ভে সাহসসম্পন্ন বলবান সন্তানগণের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব। দেখুন, আমাদিগের নগর-নিবাসিনী ভদ্রকামিনী মণ্ডলী নির্ম্মল বায়ু-প্রবাহিত স্থানে অঙ্গসঞ্চালন করিতে পান না, শারীরিক শ্রমমাত্র করেন না, তাসক্রীড়া বা আদিরস-প্রধান কাব্যপাঠ প্রভৃতি ইতর ব্যসনে কালাতিপাত করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সন্তানেরা প্রায় ক্ষীণজীবি এবং ভোগানুরাগি হইয়া থাকে, পল্লীগ্রামে ভদ্রপত্নীরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রমানুরাগিনী, এবং স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত সমীরণ সেবন ও প্রকাশ্য জলাশয় যাইয়া স্নানাদিক্রিয়া পরায়ণ বিধায় তাঁহাদিগের তনয়েরা নগরীয় বালকদিগের অপেক্ষা সমধিক শ্রমসহিষ্ণু ও প্রখর ক্ষুৎশক্তি বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের বাল্যকালাবধি সুশিক্ষা হইলে অনেকে পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে সন্দেহ কি ?

অপরন্তু, সংসার মধ্যে ইহাও সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয়, অতি পবিত্র বংশে অবতীর্ণ সুনীতিদর্শি

পরিবারে প্রতিপালিত ও বাল্যকালাবধি ধর্ম্মশিক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ মিথ্যাবাদিত্ব, বিশ্বাসঘাতিত্ব চৌর্য্য ও হত্যা প্রভৃতি প্রকট মহাপাতক পুঞ্জে ঘোরতর আবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকে, ইহার কারণ কেবল জননী বা জনকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সমুদায় গুণের আধার যে শিরোদেশ, তাহার কোন কোন স্থানের কদর্য্য বা অসম্পূর্ণ গঠন মাত্র। কুপ্রবৃত্তি কালসর্প হৃদ্‌কন্দরে লুক্কায়িত অথচ রূপলাবণ্যে বহির্ভাগ প্রভান্বিত দেখিয়া বিমুগ্ধচিত্তে বিবাহ করিলেই এই প্রকার কুসন্তান জন্মিয়া থাকে, অতএব বর কন্যাগণের পরিণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ হওনের পূর্বে পরস্পরের চরিত্র পরীক্ষা করা অতিশয় ভদ্রনীতি সন্দেহ কি ? এতদ্দেশে এই সুপ্রথা প্রচলনের গৌণকাল আছে, স্ত্রীশিক্ষা বাহুল্যরূপে প্রচলিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত সুনীতি স্থাপন হইবার সম্ভাবনা।

এদেশে ক্ষীণাঙ্গ সন্তান জন্মিবার আর এক কারণ, নির্দ্দিষ্ট জাতি বা বংশ মধ্যে পরিণয় বদ্ধ থাকার কুপ্রথা। এই কুপ্রথার নিদান কেবল বংশমর্য্যাদার বৃথাভিমান মাত্র। এই অভিমান বশতঃ ইয়ুরোপের কোন কোন রাজকুলের এক কালে বিধ্বস ঘটিয়া গিয়াছে,—এই কুপ্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া রাজপুতনা দেশীয় ঠাকুর বংশীয়েরা বালিকা হত্যারূপ নিদারুন পশ্বাচারে অদ্যাপি প্রবৃত্ত রহিয়াছে,—এবং এই কুসংস্কারের দাসত্ব হেতুই বাঙ্গলাদেশের কুলীনেরা ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতেছেন ! বিবেচনা করুন, গৃহপালিত কপোত কুক্কুটাদি বিহঙ্গেরা বহুকাল যাবৎ এক কুলায়জাত সহচরী সহকারে দাম্পত্য স্বীকার করিয়া কেবল বিকলাঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকই জন্মাইয়া থাকে,—মনুষ্য দম্পতির পক্ষেও এই স্বাভাবিক নিয়ম অতিমাত্র অপকর্ষের কারণ সন্দেহ কি ? যদিও এদেশে স্ববর্ণা বা স্বগোত্রা কন্যা গ্রহণের নিয়ম নাই,—কিন্তু ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে অধুনা মাতামহের মাতৃকুল বা পিতার মাতৃকুল প্রভৃতি সন্নিকট বংশ হইতে কন্যা গ্রহণের ব্যবহার বাহুল্যরূপে চলিয়াছে। বিশেষতঃ দেবীবর কৃত মেলবন্ধ হইবার পর নির্দ্দিষ্ট কুলীনকুলের মধ্যে আদান প্রদান রীতি বদ্ধ থাকিবাতে অশেষ দোষোৎপত্তির কারণ হইয়াছে, ইহাতে অপাত্রে সুপাত্রী বিসর্জ্জন হইতেছে। এই কুকাণ্ডের প্রচণ্ড প্রভাব এস্থলে বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র।

এতদ্দেশে ক্ষীণদেহ সন্তান বৃদ্ধির আর এক কারণ, নিতান্ত নির্ধনদিগের দারপরিগ্রহ। পিতা মাতা স্বয়ং কান্তি পুষ্টিকর ভোজ্য পানাদিতে বঞ্চিত, তাহাদিগের কোনরূপে উদরান্নের সংস্থান হয়,—এমত স্থলে সন্তানদিগের বলাধান হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। এদেশে পরমেশ্বরের কৃপায় অন্নের অসম্ভাব নাই, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিলেই দিনযাপন হইতে পারে, অতএব সুদীন মূর্খ লোকেরা তজ্জন্য নিশ্চিন্ত বিধায় সহসা বিবাহ-পাশে বদ্ধ হইয়া কেবল আপনাদিগেরই ক্লেষাকর্ষণ করে এমত নহে, কিন্তু পরমেশ্বর প্রণীত সুধাময় দাম্পত্যপ্রণয়ে বিষোৎপাদন করিয়া বহুতর নিরপরাধি শিশু সন্তানের মহা ক্লেশের কারণ হয়, অতএব এতদ্দেশে উপার্জ্জনক্ষম অথবা বিভবশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাহবদ্ধ হইলেই বলীষ্ঠ সন্তান উৎপাদনের এক উদ্দেশ সফল হয়।

অপর সন্তান গর্ভস্থ হওনাবধি তাহার জ্ঞানোদ্রেক কাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশে যে প্রকার তৎপ্রতিপালনের নিয়ম আছে তাহা অতীব দূষণাবহ, তাহাতে শিশুদিগের অকালে কালপ্রাপ্তি হওনের অথবা ভগ্ন শরীর লইয়া দুঃখে কাল যাপন করণেরই সম্পূর্ণ আয়োজন দৃষ্ট হয়। অন্তর্বত্নী গণের পক্ষে (সহজাবস্থা অপেক্ষা) অধিকতর ব্যায়াম পরায়ণ হওয়া উচিত,—অবিরত ভূমিশয্যা ও ঘোরতর নিদ্রায় কালহরণ করা কদাচ সুপন্থা নহে। এদেশের সমস্তা কুলমহিলাগণ অধিকতর অম্বলাদি কুপথ্য সেবা দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানদিগের পুষ্টি বর্দ্ধনের পক্ষে সম্যক্ ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকেন,

লঘুপাক অথচ পুষ্টিবৃদ্ধিকর স্বাস্থ্যদায়ক খাদ্য সমূহ গর্ব্ভিনীদিগের পক্ষে অতি হিতকর, তাহা ক্ষুধার ধার অনুসারে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করাই বিহিত। আর অন্তরাপত্য অবস্থায় কামিনীকুল সুস্থির ও সানন্দচিত্তে কালহরণ করিতে পারেন এমত উপায় সর্ব্বদা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের মনে উৎকট ভয়, শোক, ক্রোধাদি উদয় না হয় এমত দৃষ্টি রাখাও উচিত, যেহেতু সেই সকল রসের আধিক্যে সন্তানগণের অকালমৃত্যু বা উন্মাদ প্রভৃতি ভয়ানক রোগাদি জননের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

এইরূপ শিশুদিগের খাদ্য, পরিচ্ছদ, গাত্রমার্জন, বায়ু সেবন, হিম রৌদ্রাদি হইতে পরিরক্ষণ, ব্যায়াম, ও নিদ্রা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য তাহা এদেশে কিছুই নাই, সুতরাং তাহাতে বিস্তর অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে। এদেশের গৃহিণীরা সন্তানদিগকে ইসপ বর্ণিত হংসীবৎ শীঘ্র শীঘ্র পুষ্টদেহ করণার্থ এরূপ অনিয়মিত রূপে গাভীদুগ্ধ দ্বারা পোষণ করেন, যে তাহাতে সন্তানদিগের অশেষ প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়,—এতদ্দেশীয় দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক শিশু উদরাময়ের ভয়ালগ্রাস হইতে বিমুক্ত আছে। সন্তানদিগের পক্ষে ঘৃতাক্ত বা তৈলাক্ত দ্রব্য বা মিষ্টান্ন অথবা অপক্ব ফলাদি বিষভোজন রূপে গণনীয়,—কিন্তু বিদ্যাবিহীন গৃহিণীগণ দাস্বালদিগকে উক্ত প্রকার অহিত ভোজনদানে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না, ত দ্বিষয়ে নিষেধ করিলে কহেন "এক রত্তি" দিয়াছি, ফলে সেই একরত্তিতে যে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। পরন্তু সন্তানদিগকে পরিষ্কৃত রাখার অপরিসীম উপকার এতদ্দেশীয় জনক জননীদিগের কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবেক না, হা! ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ হয়, এদেশের পিতা মাতারা কহিয়া থাকেন, ধুলা কাদা না মাখিলে শিশুগণ বৃদ্ধিযুক্ত হয় না। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন মহাশয় অনাবৃত নির্ম্মল বাতাসে শিশুদিগকে ধাবমান বা ব্যায়ামযুক্ত ক্রীড়া কৌতুকান্বিত দেখিলে ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত লোচনে কর্কশ বচনে তাড়না করেন, কিন্তু তাঁহারা অবগত নহেন, যে তাহাতে তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। করুণাময় বিশ্বপিতা শিশুদিগের কোমল চিত্তক্ষেত্রে উক্ত প্রকার ক্রীড়ারসের স্পৃহারূপ বীজবপন করিয়া তাহাদিগের ভাবী বহুধা-সুখের আয়োজন করিয়া দিয়াছেন।

সন্তান পালন সম্বন্ধে এদেশে এবম্প্রকার মহানিষ্টকর যে সকল কুনিয়ম আছে, তত্তাবতের উল্লেখ ও তন্নিবারণের উপায় প্রভৃতি বিবৃত করিলে এই প্রবন্ধ দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবেক, বিশেষতঃ তদ্বাহুল্য বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া এই পরিচ্ছেদের অপরাংশ লেখা যাইতেছে।

হা! আমাদিগের মেদমাংস পিণ্ড ধনিদিগের কবে এমত পরিজ্ঞান লাভ হইবেক যে শরীর সঞ্চালন ও প্রসারণ ব্যতীত দুর্ব্বল শিরাসমূহ তেজস্বি ও দৃঢ়ীভূত হইতে পারে না?—প্রত্যুত, কুপিত পিত্তাদি ক্রূর রসের আধিক্য হইয়া উঠে, সুতরাং রক্তের অপরিচ্ছিন্নতা বশত নানা রোগের আতিশয্য হয়। ব্যায়াম দ্বারা সেই সকল ক্রূরস দমন-প্রাপ্ত হইয়া কুভাব বর্জন ও সুভাব ধারণ পূর্ব্বক শরীর পোষণ করিতে থাকে, তাহাতে রোগরূপ বিবিধ হিংস্র জন্তু দেহকান্তার হইতে দূরে পলায়িত হয়, এবং বিলাস বিহ্বলতা রাক্ষসী স্বীয় পতি আলস্যের সহিত এই কমনীয় মনুষ্যদেহে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ব্যায়ামশীল লোকেরা যে রূপ তৃপ্তি ও রুচি সহকারে ভোজন পান ও নিদ্রার সুখানুভব করেন, আলস্যের দাস, সম্ভোগাসক্ত মনুষ্যেরা কখনই সেই সুখানুভব করিতে পারে না, ভোজনপানাদির আতিশয্যে শরীরের মেদবৃদ্ধি অথবা রোগবৃদ্ধিই হইয়া থাকে,

তাহাতে ক্ষুৎপিপাসার তীক্ষ্ণধার বিনষ্ট হয়,—প্রত্যুত অগ্নি প্রজ্জ্বলনাভিমুখে সমধিক ইন্ধন দিলে তাহা অবশ্যই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবেক। বিবেচনা করুন,—কিঞ্চিৎ অপরিমিত পান ভোজনান্তে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইলে পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ দ্বারা শ্রমোদয় হওন মাত্রেই সেই ক্লেশ একেবারে বিগত হইয়া পুনর্ব্বার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হয়,—অতএব এতদপেক্ষা ব্যায়ামের আর প্রত্যক্ষ উপকার কি বর্ণন করা যাইতে পারে? সমধিক ভোজন পান করিলে ভোজ্য পেয়াদিতে স্থিত হাইড্রোজন ও কার্ব্বন দ্বারা শরীর পরিপ্লুত হয়, ব্যায়াম দ্বারা লোমকূপ পথে স্বেদাকারে সেই অতিরিক্ত গ্যাসদ্বয়ের নির্গমন না হইলেই দেহগেহে বিবিধ রোগের ভদ্রাসন হইয়া উঠে। দেখুন, কৃষকেরা এই ব্যায়াম গুণে কিরূপ অরোগি ও দীর্ঘজীবি হয়, তাহারা প্রায় উদরাময় ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয় না, তাহাদিগের দেহে গুরুতর শ্রমজন্য বা ঘোরতর বৃষ্টিপাতে অথবা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের অসহনীয় রশ্মি প্রভাবে জ্বরাদি রোগের সঞ্চার হয় না, ফলতঃ যে পরিমাণে তাহারা হিম, শিশির, কুজ্ঝটিকা, বৃষ্টি, পঙ্ক, রৌদ্র, গ্রীষ্ম, ঝটিকা প্রভৃতি সহ্য করিতে পারে এমত অন্যকোন ব্যবসায়িদিগের সহ্য নহে। কৃষকেরা বাল্যকালাবধি ব্যায়াম বলে বজ্রদেহ হইয়া ঐসকল নৈসর্গিক বিড়ম্বনাকে শঙ্কামাত্র করে না।

এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকদিগের উল্লেখিত শিবকর পরিবর্ত্তনের অধুনা একমাত্র উপায় রাজপুরুষদিগের হস্তগত রহিয়াছে,—হিন্দুজাতির বর্ত্তমান সামাজিক বিধানে বিবাহ, গর্ভাধান, শিশুপালনাদি নানাবিষয়ে যে কিছু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন তাহা কাল সাপেক্ষ,—বদ্ধমূল মহা মহীরুহ সহসা উৎপাটন করা সাধ্যাতীত কার্য্য। সুতরাং রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ব্যায়াম শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হইলে কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে, আমাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষিতেরা ব্যায়ামচর্চার অমৃতময় ফলানুভব করিয়া তাঁহাদিগের সন্তানগণকে অতি শৈশব কালাবধি সুশিক্ষার সাহায্যে সুন্দর সবল ও সুস্থ শরীর করিতে পারেন। আমাদিগের অর্থভপ্রায় এই যে ভদ্রকুলজদিগকে সুশিক্ষিত করণার্থ সম্যগনুষ্ঠান অভিনবরূপে বিরচন করাই কর্ত্তব্য,— অপ্রাপ্তব্যবহার পিতৃহীন ভূম্যাধিকারিগণ যে নিয়মে অধুনা ওয়ার্ড শিক্ষাশ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, এদেশীয় ভদ্রসন্তানমাত্রকে তন্নিয়মাধীনে শিক্ষা দেয়া কর্ত্তব্য। বালকেরা বাটী হইতে যত অন্তরে থাকেন ততই উত্তম। বিদ্যাবিমূঢ় কুচরিত্র বহুজনপূর্ণ হিন্দু পরিবারে সুকুমারমতি বালকদিগের সুনীতি শিক্ষা হওয়া দুরূহ, বিশেষতঃ তাহাদিগের শরীরভঙ্গ করণের কুদৃষ্টান্ত এবং অনিষ্টকর রীতির অভাবই নাই, বিষবৃক্ষারণ্যে রসালতরুর বৃদ্ধি প্রত্যাশা করা ব্যর্থ, অতএব রাজপুরুষেরা এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই,—এস্থলে এমত আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকেরা এবম্প্রকার নিয়মাধীনে সন্তানসমর্পণ করিবেন না, কিন্তু আমরা বলি এরূপ আপত্তির সময় বিগত হইয়াছে,—অনেক ব্যক্তি এক্ষণে আহ্লাদ-পূর্ব্বক স্ব স্ব বালককে ইয়ুরোপীয় নিয়মে সুশিক্ষিত করণার্থ ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন,—তাঁহাদিগের সদৃষ্টান্ত বসন্তকালের পদ্মবনবৎ অতিশীঘ্র দেশব্যাপ্ত হইবেক সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ উক্তপ্রকার শিক্ষা প্রণালীর দোষইবা কি? ইহাতে জাতি, ধর্ম্ম, প্রভৃতি কোন বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অভিভাবকেরা স্ব স্ব বালকদিগের নিমিত্ত পাচক ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন, বালকেরা পর্ব্বাহোপলক্ষে গৃহে যাইয়া জনকজননী ও আত্মীয় স্বজনের সহিত কিয়ৎকাল পুনর্মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করত পুনর্ব্বার পর্ব্বাহাবসানে পাঠমন্দিরে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিশ্রমে অধ্যয়ন পরায়ণ হইতে পারেন, যেরূপ গুরুতর শ্রান্তির পর

কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম সুখভোগ হইলে পুনর্ব্বার দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ উত্তেজিত হয়, প্রস্তাবিত বিশ্রামকালও বিদ্যার্থিদিগের পক্ষে তদ্রূপ উপকারী। আমাদিগের মতে উক্ত প্রকার রাজকীয় বিদ্যালয় সমূহ রাজধানী বা নগরমধ্যে স্থাপিত না হইয়া পারশনাথ পর্ব্বত বা বীরভূম অঞ্চলীয় শৈল বিশেষে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়,—ইহাতে অশেষবিধ উপকার আছে,—আদৌ, ছাত্রেরা নগরীয় কুপ্রবৃত্তি এবং কুসংস্কার কণ্টকবনের দুস্তরণীয় আকর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবেক। দ্বিতীয়তঃ উক্ত প্রদেশীয় শৈত্য মান্দ্য মধুর গুণযুক্ত সমীর নীর প্রবাহে শরীর অতি সুস্থ এবং স্বচ্ছন্দ থাকিবেক,—তৃতীয়তঃ তৎপ্রদেশে মৃগয়া মল্লাদি ব্যায়ামের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে,—এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় উপকার আছে তাহা বর্ণন করিলে প্রস্তাব বাহুল্য হইবেক। বিশেষতঃ উক্ত প্রদেশ সমীপ হইয়া রেলওয়ে গিয়াছে, সুতরাং শিক্ষিতেরা ছুটী উপলক্ষে অত্যল্পকালমধ্যে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবেন।

পরন্তু, এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকের সুশিক্ষাভিলাষি অনেক ইয়ুরোপীয় মহাশয় ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ হইয়াছে, শ্রীযুত হজ্‌সন প্রাট সাহেব যৎকালে বাঙ্গলা দেশের দক্ষিণ বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন, সেই সময়ে তিনি এতদ্বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তিনি একদা স্বীয় রিপোর্ট মধ্যে লেখেন "একি সামান্য আহ্লাদের বিষয় হইবেক যে আমাদিগের জমীদার পুত্রেরা উৎসাহ পূর্ব্বক ভুঁড়িমোটা না করিয়া তুরঙ্গারোহণে স্ব স্ব অধিকার পরিদর্শনকরণ কালে ডাকাইৎ ও কাদাখোঁচা শিকার করিয়া বেড়াইবেক।" অতএব বাঙ্গালি যুবকদিগের প্রকৃত শিক্ষার সময় সমুপাগত হইয়াছে,—এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরা উদ্যোগ পরায়ণ হইয়া রাজপুরুষদিগকে এতদ্বিষয়ে উত্তেজিত করিলেই কার্য্যসফল হইবেক।

ভদ্রপদবীস্থ যুবাদিগের জন্য ধাবন, পদচারণ, অশ্বারোহণ, মৃগয়া, মল্লক্রীড়া, জলক্রীড়া, গুটিকা চালন*, শরশিক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ**, উদ্যান রচনাদি অশেষ প্রকার ব্যায়াম শিক্ষার নিয়ম আছে। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম সকল ব্যক্তির প্রিয় নহে; কেহ মৃগয়ানুরক্ত, কেহ শরশিক্ষা ভক্ত,—কেহ ভ্রমণপ্রিয়, কেহ বা মল্লক্রীড়াসক্ত। এবম্প্রকার প্রভেদ, শরীর এবং মনের ভাব অনুসারেই হইয়া থাকে, অতএব যে যুবা যে প্রকার ব্যায়াম ভালবাসেন, সুবিজ্ঞ শিক্ষকদিগের উচিত, তাঁহাকে সেইপ্রকার ব্যায়ামে নিযুক্ত করেন, যেহেতু যাহাতে যাহার স্পৃহা না থাকে, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিলে অচিরাৎ ক্লান্তি আসিয়া তাহার শরীর আক্রমণ করে, সুতরাং তদ্দ্বারা ধাতুপুষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অপিচ, প্রথম শিক্ষার্থিদিগকে এককালেই গুরুতর পরিশ্রমপূর্ণ ব্যায়াম শিক্ষা দেয়া কর্ত্তব্য নহে; অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতায় সুবিজ্ঞ তুরঙ্গারোহী প্রথমতঃ প্রস্থানকালে খরতরবেগ প্রার্থনা করেন না, ক্রমে লক্ষ্যস্থানের যত নিকটস্থ হইতে থাকেন, ততই তাঁহার উত্তেজনা বৃদ্ধি হইতে থাকে। নিশ্চেষ্ট অবস্থা হইতে এককালে ঘোরতর ব্যায়াম পরায়ণ হইলে রক্তের বেগ অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসাধারকে আহত করিতে পারে, তাহাতে যক্ষ্মা ও শ্বাসকাশ তথা রক্তপিত্তাদি প্রাণসংহারক রোগ সমূহের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

*Tennis and Cricket.

**Fencing.

ব্যায়াম শিক্ষার নিমিত্ত প্রভাতকাল অতি শ্রেয় কল্প,—প্রাতরুত্থান, প্রাতঃ সমীর সেবন, প্রাতর্ভ্রমণ, এবং প্রাতে তুরঙ্গারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়াবৃত্তি চিরকালই সর্ব্বদেশে প্রশংসাস্পদ আছে। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলা নাটকে সেনাপতির মুখে মৃগয়ার প্রকৃতগুণ ব্যাখ্যা কল্লে কি অনুপম কবিত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :—

"মেদশ্ছেদ কৃশোদরং লঘুভবত্যুৎথান যোগ্যং বপুঃ।
সত্ত্বানামপি লক্ষতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ॥
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদ্ ইষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষে চলে।
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়াম্ ঈদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ॥"

অন্তার্থ

শ্রমভরে নিরন্তর, মেদহীন কলেবর,
কৃশোদর ধনুর্দ্ধর, সাহস সম্পন্ন অতিশয়।
পশুচয় ক্রোধে ডরে, বিকল হইলে পরে,
সে রঙ্গ সম্ভোগ করে, মৃগয়া কুশল যারা হয়॥
যেইক্ষণে ধানুকীর, ছুটে খরতর তীর,
লক্ষোপরে পড়ে স্থির, কত সুখোদয় সে সময়।
মৃগয়া পরম সুখ, যে কহে ব্যসন দুঃখ,
মিথ্যাবাদী সে দুর্ম্মুখ, হেন সুখ আর নাকি হয়॥

অপর উষ্ণাতিশয় দেশে জলক্রীড়া অতি উপাদেয় ব্যায়াম মধ্যে গণনীয়, এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরুষেরা ইহাতে কিরূপ আসক্ত ছিলেন তদ্বিশেষ আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছি। হিমাতিশয় দেশে তাহার তাদৃশ প্রয়োজনাভাব, তত্রত্য মনুষ্যের রক্তের প্রকৃতি স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, বহ্নিসেবন ও সুরা পানাদি দ্বারা তাহার উষ্ণতা উৎপাদন হইয়া থাকে, তথায় লোমকূপ সকল পরিষ্কৃত রক্ষণার্থ গাত্র মার্জ্জনাই যথেষ্ট, কিন্তু উষ্ণাতিশয় দেশে মনুষ্যের রক্ত অতি বেগবান এবং প্রতপ্ত, সুতরাং ত্বকের পারুষ্য বশতঃ লোমকূপ দ্বারা শরীরস্থ কুরসসমূহ বিনির্গত হয় না, এজন্য স্নানাবগাহন দ্বারা ত্বকের কোমলত্ব সম্পাদন অতি প্রয়োজনীয়, এতদ্দেশে সুস্থ শরীরে নিদাঘসময়ে ২/৩ বার অবগাহন সহ্য হয়,—অতএব ভারতবর্ষে যে সকল ইয়ুরোপীয় আগত হইয়া দেশীয়দিগের প্রথাবলম্বন না করিয়া বিলাতের ন্যায় স্নানবিরহে কালপাত করেন, তাঁহারা প্রায় ঘোরতর জ্বররোগগ্রস্থ হইয়া অকালে কাল প্রাপ্ত হয়েন,—কোন ইংলণ্ডীয় কবি যথার্থই কহিয়াছেন :—

"Let those who from the frozen Arctos reach
Parched Mauritainia or the sultry West,
Or the wide flood that laves rich Indostan.
Plunge thrice a day and in the tepid wave
Untwist their stubborn pores, that full and free
Th' evaporation thro' the soften'd skin
May bear proportion to the swelling blood,

So may they scape the fever's rapid flame,
So feel untained the hot breath of hell.

—*Pleasures of health.*

পরিহরি জন্মভূমি হিমার্ত্ত উত্তর।
দক্ষিণে, পশ্চিমে, যাঁরা যান দেশান্তর॥
দিনকর করে দগ্ধ মরক্কোর দেশ।
অথবা মার্কিন যথা ঘোর গ্রীষ্ম ক্লেশ॥
কিম্বা যথা পয়স্বিনী প্রসর পয়ান।
নানা ধন পূর্ণ হিন্দুদের জন্মস্থান॥
তাঁহারা করুন স্নান দিনে তিনবার।
খলুন চর্ম্মের গ্রন্থি দিয়ে জলধার॥
মনুষ্যকে উষ্ণভাব নির্গত হইবে।
প্রখর রক্তের বেগ স্বপেতে বহিবে॥
না আসিবে জর জ্বালা কভু সন্নিধান।
নরকাগ্নি শিখা থেকে পাইবেন ত্রাণ॥

এইপ্রকার বিবিধ ব্যায়ামের উপকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন করা বাহুল্য মাত্র,—বস্তুতঃ তত্তাবৎ যথা পরিমাণে অবলম্বিত হইলে মনুষ্য শরীরের পক্ষে নিরতিশয় সুখের কারণ হয়। এইক্ষণে প্রস্তাব সাঙ্গ সময়ে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার আর একটা বিশেষ গুণ এই যে তাহা যথা নিয়মে আচরিত হইলে শিরোদেশস্থ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্থান সমূহ এবং শারীরিক সমুদায় প্রত্যঙ্গ যথাবিহিত রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে,—মনে করুন, পল্লববিহীন স্থাণু এবং বহুপত্র ক্ষীণস্কন্ধ তরু কিরূপ অশোভার নিমিত্ত হয়—কেবল অশোভার নিমিত্ত হয় এমত নহে, তাহাতে উক্ত প্রকার উদ্ভিৎ শরীরের স্বাস্থ্যবিরহতা এবং অসারতা সপ্রমাণ হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকৃত পরিমাণে সংযোজিত হইলেই ভাল হয়,—তদ্রূপ সন্নিবেশিত সুন্দর সুমিত দেহলাভ সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নহে, এতদ্রূপ কলেবর লইয়া এদেশে অতি অল্পলোক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের গঠন প্রণালীতেও শক্তি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আছে, তদনুগত অন্য অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় যদি ক্ষীণ এবং ক্ষুদ্র হয় তবে অনেক রোগাকর্ষণ হওনের সম্ভাবনা থাকে, সেই অসৌভাগ্য নিবারণের উপায়, শরীর-সাধনী বিদ্যা-সঙ্গত ব্যায়ামচর্চ্চা ব্যতীত আর কুত্রাপি প্রাপ্তব্য নহে। ইহা সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য যে, যে সকল অঙ্গের দৌর্ব্বল্য এবং খর্ব্বতা আছে তাহা উপযুক্তমত কার্য্য প্রয়োগাদিতে বিনিযুক্ত হইলেই বলিষ্ঠ এবং কর্ম্মিষ্ঠ হইতে থাকিবেক।

যদি কোন শিশুর বক্ষঃস্থল অপ্রশস্ত এবং তাহার শ্বাসাধার সঙ্কুচিত ও ক্ষীণতর হয় তবে এই বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য আরচিত হইলেই উক্ত সঙ্কীর্ণতা সঙ্কোচ এবং ক্ষীণতা বিগত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল ও শ্বাসাধার এরূপ বৃদ্ধি পাইবেক যে তাহাতে বহুতর রোগের আশঙ্কা নিবারিত হইবেক। এতদ্দেশীয় জালিয়া মালা ও বাঙ্গালিরা ডিঙ্গীর মাল্লাদিগের ব্যবসায় গুণে তাহাদিগের বক্ষঃস্থলের সঙ্কোচ বা সঙ্কীর্ণতা প্রায় দৃষ্ট হয় না, তাহাদিগের বাহু, স্কন্ধ এবং হৃদয় দেশ

সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে তদ্ব্যবসায়িদিগকে যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্রূর রোগের গ্রাসে পতিত হইতে হয় না, তাহারা ভাগীরথীর শীতল সজল সমীর অনবরত সেবন করিলেও বক্ষঃঘটিত কোন পীড়া নিশাচরীর বলি রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। এইরূপে সুশিক্ষা দ্বারা শরীরস্থ সর্ব্বপ্রকার বৈকল্য বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, এমন কি যে সকল রোগ পৈতৃক অর্থাৎ পুরুষ পরম্পরা অবরোহিত হইয়া থাকে তাহাও ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হওয়া সম্ভব।

সর্ব্বশেষে স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন এই যে, হে দেশীয় মহাশয়েরা! আপনারা আর কত কাল ভ্রমনিদ্রাঘোরে কালক্ষেপ করিবেন? সুখময় বিজ্ঞান প্রভাকর করে প্রাচীদেশ আলোকময় হইতেছে,—দুর্ভাগ্য তিমির খণ্ড বিখণ্ড হইয়া দিগ্ দিগন্তরে ধাবমান হইতেছে, উপদেশ তাম্রচূড়ের সুগভীর প্লুতরবে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে, ঐ দেখ! ক্ষোভরূপ নিশাকর নিরাশা নীরধিনীরে নিমজ্জিত হইতেছে! অতএব আর কালবিলম্ব কেন? গাত্রোত্থান কর, সুখময় বুঝিয়া সৌভাগ্য ক্ষেত্রে সুখ শস্য উৎপাদনার্থ উদ্যোগি হও; যাহাতে শ্রান্তি আসিয়া সহসা তোমাদিগের দেহ গেহ আক্রান্ত করিতে না পারে,—যাহাতে পীড়া পিশাচী তোমাদিগের প্রতি অহরহ কটু কটাক্ষ সম্পাত দ্বারা আতঙ্ক উদয় করিতে না পারে, এবং যাহাতে হতাশাস হস্তী তোমাদিগের উদ্যোগ রূপ উৎপলবন দলন করিতে না পারে, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হও, আর নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নাই,—ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, একাগ্রতা, উৎসুকতা, শ্রম-পরতা প্রভৃতি পুরুষার্থ সমূহ শরীর-সাধন ব্যতীত কিরূপে লাভ করিবে? হা! তোমরা যখন বীরদর্প অন্যদেশীয় লোকদিগের সমাজে স্বজাতীয় লোকের শারীরিক লাবণ্য এবং ক্ষুদ্রতা দর্শন করহ, তখন কি তোমাদিগের মনে লজ্জার উদয় হয় না?—তখন কি অনুতাপানলে তোমাদিগের চিত্ত দগ্ধ হয় না? তখন কি স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি জননের বাসনা আবির্ভূত হয় না। আমরা যে মৃত মহাত্মার স্মরণোদ্দেশে অদ্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি,—সেই মহাশয় সদৃশ ইয়ুরোপীয় সদাশয়গণ অস্মজ্জাতিকে মসীজীবি শ্বাবৃত্তি পদারূঢ় করণার্থই পরিশ্রম পথে প্রাণাবশেষ করিয়া যান নাই, তাঁহাদিগের সংকল্প সিদ্ধি পক্ষে তোমরা কিজন্য উদ্যোগ পরায়ণ না হও? জগতীতলে প্রধান জাতি পদবী আরোহণের আশা কিছু স্বপ্নবৎ অসার নহে, অন্বেষণ করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইবে ইতি।

সম্পূর্ণম্

পদ্মিনী-উপাখ্যান

(রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ)

(পাঠ – তৃতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২)

বিজ্ঞাপন

পদ্মিনী উপাখ্যান তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল। বহু দিবস হইল, পুনর্মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন-সত্বেও রাজকার্য্য দেশান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত যথাসময়ে উক্ত সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারি নাই। এবারে মানস ছিল কিয়দধিক সংস্কারে প্রয়াস পাইব। কিন্তু যে বিশিষ্ট প্রয়োজনে পদ্মিনী পুনঃ প্রকটিত হইল। তাহার ব্যতিক্রম আশঙ্কায় তন্মানস পূর্ণ করিতে পারিলাম না। ইতি।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ।

—*—

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল

বাহাদুর মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং

মহাশয় আমার প্রতি বাল্যকালাবধি অকৃত্রিম স্নেহসহকারে যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই উৎসাহতরু সমাশ্রিত শ্রদ্ধালতাজাত সামান্য উপহারস্বরূপ এই কাব্যকুসুম ভবদীয় শ্রীচরণকমলান্তরালে সমর্পিত করিলাম।

খিদিরপুর। ১৯শে আষাঢ়
১২৬৫ বঙ্গাব্দাঃ

অনুগৃহীত ভৃত্য
শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মিনী উপাখ্যান

ভূমিকা

এই অভিনয় কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহসপূর্ব্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।" প্রত্যুত্তে স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহ হয়, সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারেন না। আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের পরমবন্ধু রঙ্গপুরের অন্তপাতী কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই অক্ষপোক্তি করিয়াছিলেন, যথা—

"আধুনিক যুবাজনে স্বদেশীয় কবিগণে,
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃ-পদ্ম, কবিতা-সুধার সদ্ম,
এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে॥"

কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবদ্য পদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রতি সর্ব্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন। পরন্তু কিয়দ্বর্ষাতীত হইল, মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিত তৎপর সুনির্ম্মল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সত্ত্বে সত্তাবৎপাঠে এতদ্দেশীয় বালক, বৃদ্ধ, বনিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় লোকদিগের প্রগাঢ় আসক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন। আমি উক্তোভয় মাহাত্মার অনুরোধে কর্ণেল টড্ স্বরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ-পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্ব্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম। তদনন্তর উক্ত উভয় মহাশয় অকালে পরলোকপ্রাপ্ত বিধায় শোকাভিভূত মনে তৎসঙ্কল্প পরিত্যাগ করি। কিন্তু কালসহকারে ইহজগতে সকল বিষয়েরই হ্রাস ও পরিবর্ত্তন আছে, অতএব প্রবোধচন্দ্রের নির্ম্মল প্রতিভায় সভাপতিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়ন্মাসাতীত হইল, পুনর্ব্বার পদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত কাব্য সমাপ্ত করিলাম। সমাপ্তির পরে শ্রীযুক্ত রেবরণ্ড ডবল্যু ওব্রাএন স্মিথ, তথা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কতিপয় মার্জ্জিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহা প্রেরণ করি—তাহাতে তাঁহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের অনুজ শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, তথা বর্ণাকুলর লিটরেচর সোসাইটী নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু যে মহদভিপ্রায়ে এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনায় প্রথমোদ্যোগ-পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধিপক্ষে কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ। বিশেষতঃ এবম্প্রকার বিষয়ে দোষ-গুণ প্রভৃতির পর্য্যবসান সুভাবুক পাঠকদিগের বিচারাধীন। তথাহি—

"কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎ কবিঃ।
ভবানীভ্রুকুটীভঙ্গীং ভবো বেত্তি নভূধরঃ॥"

এ স্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম, ইহার কারণ কি?—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ, ঐ সকল উপাখ্যান-মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যা বুদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভূত রসাশ্রিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানকালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবিশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধী এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপুর্ব্বক রচিত করিলাম।

অপিচ, কিশোরকালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষার কবিতাকলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য-প্রকটন করিতে আরম্ভ করি। তত্তাবৎ যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্তু সেই আদর তাঁহাদিগের মহত্ত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতাপ্রভূত নহে। আমার এ স্থলে এ কথা লিখনের তাৎপর্য্য এই যে, কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবচোর জ্ঞান না করেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ-করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন—তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই; সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতাকলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবেক এবং তত্তাবতের প্রেমিক দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবেক। পরন্তু এই উপলক্ষে ইহাও নিবেদ্য, আমি সকল স্থলেই যে ইংলণ্ডীয় মহাকবিদিগের ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এমত নহে; অনেক ভাব স্বতই আসিয়া অনেকের মনে একেবারে সমুদিত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগের অগ্র-পশ্চাৎ প্রকাশমতে কাব্যকারের প্রতি চৌর্য্যাভিযোগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ইংলণ্ডীয় সুকবি কহেন—"আমাদিগের মধ্যে এক দল বিদূষক আছেন, তাঁহারা সম্ভাবিত সকল ভাবকেই পুরাতন জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এমন জ্ঞান নাই যে, পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বাভাবিক উৎসসমূহ আছে তাঁহারা কোন প্রবাহ দৃষ্টিমাত্রে বোধ করে, তাহা কোন মনুষ্যের পুষ্করিণী হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।'

এইক্ষণে কাব্য কি ?—এবং তদালোচনার ফল কি ?—এই দুই সুকঠিন প্রশ্নের মীমাংসা-কল্পে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে, যেহেতু তদুভয় বিষয়ে এতদ্দেশীয় অনেক লোকের ভ্রম আছে। মিত্রাক্ষরে এবং মিতাক্ষরে রচিত, যতি-সমন্বিত, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে ভূষিত পদবিন্যাস করিলেই তাহা কাব্য হয় না। সুবিখ্যাত সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থে ইহার যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। যথা,—"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।" এই স্বল্প বাক্যে কবিতা-কলার গুণাব্যাখ্যাত ও বৃহদ্গ্রন্থবিশেষের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যুত, কাব্য মানসিক ধ্যানধৃতিরূপ পুষ্পবাটিকাস্থ অশেষবিধ ভাবকুসুমের সৌরভ মাত্র, সেই সুগন্ধভার-প্রবহণে কবিদিগের মলয়ানিলবৎ রচনাশক্তিই পটুতর। কবিতার অসাধারণ শক্তি, মনুষ্যের মনে সর্ব্বপ্রকার রসোদ্দীপনে ইহার মহীয়সী ক্ষমতা. শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক রসোৎপত্তির এক একটা নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কবিতাকে সকল রসের নিদান কহা যাইতে পারে, মোহের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত মনুষ্যের অশ্রুপাত হইতেছে ;—হাস্যের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত জনসমাজে হাস্যার্ণব তরঙ্গিত হইতেছে,—বীভৎসের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কাব্যপাঠক বা শ্রোতার মুখভঙ্গীতে তাহা প্রকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

কবিতার আর এক গুণ এই, তাহা সুষুপ্ত-প্রায় মানসিক বৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করিতে পারে। প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে এই এক রীতি ছিল, তাহারা বিগ্রহ-ব্যসনাদি সমুদায় উৎসাহকর ব্যাপারে কবিদিগের সাহচর্য্য রাখিতেন। কবিগণ উক্ত জাতিদিগের শৌর্য্য-বীর্য্য-গুণসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ গান করিতেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের মানসে বীর, শান্তি, রৌদ্র প্রভৃতি ভাব সকলের সমুদ্ভাবে বিশেষোপকার হইত। প্রকৃত কবিদিগের অন্তঃকরণ সহস্রধারা নামক বিচিত্র উৎস স্বরূপ, তাহাতে যেরূপ সামান্যরূপ স্পর্শ করিলেই ধারা নির্গত হয়, কবিদিগের অন্তঃকরণ হইতে সেইরূপ সামান্য ঘটনাতে ভাবধারা নিঃসৃত হইতে থাকে।

কবিতার * আর এক শক্তি, তাহা আমাদিগের স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্মতর ভাবসমূহকে সচেতন করিতে পারে। তদ্দ্বারা দয়া, করুণা, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্মসকল বৃদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা প্রভৃতি পরিকল্পনার বিশুদ্ধতা জন্মে। প্রকৃত কবি ব্যক্তি কোন ইতর বা গর্হিত কার্য্যা-করণে অগত্যা বাধিত হইলে তাঁহার আর মর্ম্মপীড়ার সীমা থাকে না। কবিতার অপর এক গুণ এই, তাহা সাংসারিক সামান্য চিন্তাজাল ও ইন্দ্রিয়ভোগাশক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে সর্ব্বদা বিমুক্ত রাখিতে পারে এবং অন্তঃকরণে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সংস্থান করে যে, জগতীয় সামান্য প্রকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত এক সুনির্ম্মল নিত্যসুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে। কবিতা একপ্রকার ধর্ম্মবিশেষ। কবিরা নিসর্গরূপে ধর্ম্মের পুরোহিত। তাঁহারা জগতীস্বরূপ কার্য্যের ক্রম প্রদর্শন-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তার সত্তা সংস্থাপন করেন, তাঁহারা মানুষের নিকট ঐশিক ক্রিয়া-প্রণালীর, যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া দেন। কবিরা নীরস অস্থিসার তত্ত্বশাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার করত তাহাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোভিত করেন। তাঁহাদিগের উপদেশে আমরা অচেতন পদার্থ সকলকে সচেতনস্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। তথাহি :—

"তরু-লতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় গ্রন্থভাব ধরে ॥

* এতদ্দেশীয় লোকের শ্রীবর্দ্ধনেচ্ছু কোন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় মহাশয়ের উক্তি অনুসারে এই পরিচ্ছেদের কিয়দংশ লিখিত হইল।

উপদেশ দান করে পাষাণ সকল।
সকলি প্রতীত হয় সুন্দর নিষ্কল ॥"

অপিতু, মনোজ্ঞ ভাবাভরণে মনুষ্য মনোভূষণকারিণী ও হৃদয়পদ্মে ঔদার্য্যাদি সত্ত্বগণরূপ মধু-সঞ্চারিণী এই চমৎকারিণী বিদ্যা মনুষ্যকে ইতর এবং স্বার্থপর চিন্তাচক্র হইতে যেরূপ দূরান্তরিত রাখে, এমত আর কিছুতেই রাখিতে পারে না। কোন জ্ঞানিপ্রবর কহেন,—"কবিদিগের মর্য্যাদা-কল্পে বক্তব্য এই যে, আমি তাঁহাদিগকে কস্মিন্‌কালে অতিশয় লালসাপরবশ বা জঘন্যরূপ কার্পণ্য দোষাশ্রিত দেখি নাই। অন্যান্য শ্রেণীর লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ এমত সুপ্রশস্ত যে, তাহার সহিত পরমেশ্বর এবং দিব্যলোকের বিশেষ সম্পর্ক আছে, এমত বলা যাইতে পারে।"

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, তাহারা মানসিক শক্তি-সমূহের পরিচালনা-জনিত সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত বিধায় তুচ্ছতর ইতর আমোদে অবকাশকাল অতিপাত করিয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়ের ভোগে যবে অরুচি উদয়।
দুর্ব্বল নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ বয়।
যেই চারু সুখে পুনঃ পূর্ণ তাহা হয়।
যেই মনোহর সুখ অবগত নয়।"

অপিচ, কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিদ্যায় বুদ্ধির তীক্ষ্নতা সম্পাদন-করণের শিক্ষা-প্রণালীকে সম্পূর্ণ বা সংশুদ্ধ রীতি বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞানবিদ্যা স্বভাবতঃ কঠিন এবং ঔৎসুক্যবিহীন, অতএব চিন্তাকিরণ-করণক ভাবকুসুম-প্রফুল্লকারী পরম-গৌরবভাজন কলা-কলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা প্রিয়ঙ্কর হয় না। বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদনার্থ যেরূপ বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রয়োজন, অন্তঃকরণের উৎকর্ষ সম্পাদনার্থ সেইরূপ কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কলা আবশ্যকতা। প্রত্যুত, উভয়বিধ পদার্থেরই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন অতি কর্ত্তব্য। বিজ্ঞানঁদ্বারা আকাশ-বিহারী জ্যোতির্গণের যেরূপ পরিধি, পরিমাণ ও সংখ্যাদি নিরূপণ করা যাইতে পারে, কবিতা দ্বারা সেইরূপ তাহাদিগের অনির্ব্বচনীয় শোভা-সৌন্দর্য্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি এই দৃশ্যমান বিশ্বকে অপরূপ শোভা-সৌদৃশ্যে আবৃত করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে তত্তাবতের পরিমাণ ও সংখ্যা নিরূপণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়া সেই অপূর্ব্ব প্রতিভাপুঞ্জের রসজ্ঞ হইতে যে নিষেধ করিয়াছেন, এমত কথা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব জগদীশ্বর কিরূপ নিয়মে ইহজগৎকে সৌন্দর্য্যরসে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংলণ্ডীয় এবং সংস্কৃত মহাকবিদিগের গ্রন্থাধ্যয়নপূর্ব্বক অনুভব করুন! যাঁহারা তদ্রূপ অধ্যয়ন দ্বারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক সুখের পরিসীমা নাই, এমত সকল ব্যক্তি সংসারের ইতর চিন্তা ও ব্যতিব্যস্ত জনমণ্ডলীর সহবাস পরিত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক সামান্য শোভাবলোকনে অত্যন্ত পুলকিত হন।—

"সামান্য কুসুম-কলি কন্দরে কলিত।
সামান্য বিহঙ্গনাদ পবনে চলিত।
সাধারণ সূর্য্য আর সমীর, আকাশ।
তাঁহার নিকটে যেন স্বর্গের প্রকাশ ॥"

এইরূপ কবি এবং কবিতার প্রশংসা বিশেষমতে করিলে তাহা গ্রন্থপ্রমাণ হইয়া উঠে, অতএব আর বাহুল্যোক্তি না করিয়া এ স্থলে এতাবন্মাত্র বলিয়া শেষ করি যে, হে স্বদেশীয় মহাশয়বর্গ, আপনারা ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের কবিতার প্রেম পরিহারপূর্ব্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হউন। ইতি।

সূচনা

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ।
ভারতের নানা দেশে করি পর্য্যটন ॥

অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়।
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায় ॥

দেখিলেন অজামীল-পুরী আজমীর।
যশল্মীর যোধপুর আর বিকানীর ॥

কোটা বুঁদি শিকাবতী নীমচ সারয়ে।
উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল-হৃদয়ে ॥

জয়সিংহ-পুরী জয়পুর চারুদেশ।
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠ বিশেষ ॥

ভ্রমি বহু রাজপুরী সানন্দ অন্তরে।
প্রবেশেন একদিন চিতোর নগরে ॥

দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর।
তার নিম্নে শোভাকর সুন্দর নগর ॥

গিরি-পরে শোভে গড় প্রাচীরে-বেষ্টিত।
রাজচক্রবর্ত্তী হিন্দুসূর্য্য * প্রতিষ্ঠিত ॥

ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নের প্রীতিকর শ্যামল বিস্তর ॥

কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর ॥

তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে ॥

কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম-অঙ্গে চারু শোভা করে ॥

যেন রত্নপতি-হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানু-করে করে অনিবার ॥

বিবিধ বিহঙ্গে নানা স্বরে গান করে।
নানা জাতি বিহগে সুরঙ্গে গান করে ॥

আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ
উথলয় ভাবুকের বিভাবনা-কূপ ॥

সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুন্দর।
গগন গহ্বর বন নির্ঝর-নিকর।

দিনকর নিশাকর নক্ষত্রমণ্ডল।
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল ॥

ইহ খলু নিসর্গের শোভা অনুপম।
যাহে জন্মে ভাবুকের বিলাসবিভ্রম ॥

সে সুখের তুলা সুখ আর কিবা হয়?
দৈব-অনুগ্রহ ভিন্ন অনুভূত নয় ॥

দেখ দেখি ভবভূতি আর কালিদাস।
কাব্যে সেই রস কিবা করিলা প্রকাশ ॥

মহামহীপালগণ সভার ভিতর।
মহারত্নরূপে খ্যাত দেশ-দেশান্তর ॥

কিন্তু তারা সেই সব সভার বর্ণনে।
কটা কথা লিখেছেন ভাব আকর্ণনে।

প্রকৃতি-রূপের ছটা করি দরশন।
করেছেন কাব্যসুধা-সার বরষণ ॥

পাঠমাত্রে লোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
ধন্য ধন্য কাব্যশক্তি রসের সাগর ॥

আয় মন! চল যাই সেই সব দেশে।
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে ॥

দেখিবে বিচিত্র শোভা শৈল আর জলে।
শ্রবণ জুড়াবে তটিনীর কলকলে ॥

---

* উদয়পুরের রাণাদিগের আদি-পুরুষ বাপ্পারাও অন্যান্য উপাধি মধ্যে এই গৌরবাত্মক উপাধি গ্রহণ করেন।

কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ।
শরীর জুড়াবে, যাবে সমুদায় ক্লেশ ॥
এইরূপ নানা শোভা দেখিতে দেখিতে।
পথিক উঠেন দুর্গে পুলকিত চিতে ॥
বিশেষ দুর্গম পথ পাষাণে রচিত।
ভুজঙ্গের গতি সম ক্রোশ পরিমিত ॥
ক্রমে ক্রমে পরিহার করি ছয় দ্বার।
উপনীত যথা সিংহদ্বার সুবিস্তার ॥
অতিশয় পুরাতন কীর্ত্তির প্রকাশ।
হইয়াছে কত তরু লতার নিবাস ॥
খচিত বিবিধ কার্য্য দ্বার-দেহময়।
মূর্ত্তিমান্ কত শত দেবী-দেবচয় ॥
যবনের কার্য্য তাহে নহে দৃশ্যমান।
দ্বার যেন কৃতান্তের ফাটক সমান ॥
তদন্তে শোভিত দেবালয় দুই ভিতে।
পণ্যবীথি পূর্ণ সারি সারি পশারিতে ॥
বৃহত্তর মনোহর প্রাসাদ প্রচুর।
কালদন্তে প্রতি ক্ষণ হইতেছে চূর ॥
নগরাধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী হর্ত্রী মহাদেবী।
চিতোরের সর্বনাশ যার পদ সেবি ॥
রয়েছে তাঁহার মঠ পর্ব্বতপ্রমাণ।
অষ্টভুজা কেশরী-আসনে অধিষ্ঠান ॥
মহাকাল এক-লিঙ্গ * শিব অনুপম।
মন্দির-সমীপে কত দণ্ডীর আশ্রম ॥
এ সকল নিরখিয়ে পথিকের চিত।
মলিনতা-মেঘজালে হইল জড়িত ॥
মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন:
যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন।
অসংখ্য বীরের যিনি জন্মপ্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ-বিধিবিধায়িনী ॥
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী ॥
কোথা সে বীরত্ব আর বিক্রম বিশাল।
সকলি করেছে গ্রাস সর্ব্বভুক্ কাল ॥

এই যে ভীষণ দুর্গ না জানি কাহার?
কত বীর করেছেন ইহাতে বিহার ॥
এখন দরিদ্র-দশা দৃশ্য সর্ব্বস্থানে।
মলিনতা প্রবলতা যেখানে সেখানে ॥
কোথায় উৎসাহ রঙ্গ হাস্য মহোৎসব?
তেজোহীন জনগণ যেন সব শব।
এইরূপ ব্যাকুল হইয়া চিন্তাকুলে।
আইলেন শেষে এক সরোবর-কূলে ॥
ঢল ঢল করে জল বিমল উজ্জ্বল।
সন্তরে বিহরে তাহে রাজহংসদল ॥
চারি ধার বাঁধা তার প্রস্তর-সংযোগে।
অদ্যাবধি পতিত নহে কালের কবলে ॥
তার মাঝে চারু দ্বীপ রচিত পাষাণে।
হেন মনোলোভা শোভা নাহি কোন স্থানে ॥
তাহে রম্য হর্ম্ম্য এক অতি পুরাতন।
হুতাশনে দগ্ধ-প্রায় হয় দরশন।
দেখিয়ে পথিক মনে ভাবেন তখন।
কি হেতু হইল ইথে ধূমের বরণ?
এমন সময়ে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
স্নানাশয়ে জলাশয়ে দিলেন দর্শন ॥
করপুটে পথিক করেন প্রশ্ন তাঁরে।
"কহ দ্বিজ, এই পুরী-বৃত্তান্ত আমারে।"
বিপ্র কন, "শুন ওহে পথিক সুজন।
করুণা-রসের সিন্ধু স্থান-বিবরণ ॥
শ্রবণেতে দ্রব হয় পাষাণ-হৃদয়।
অভাবুক হৃদে হয় ভাবের উদয় ॥
রাজ-পুত্র-ইতিহাস সমুদ্র সমান।
এই সে চিতোরপুরী তার আদ্য স্থান ॥
ত্রেতায় ছিলেন সূর্য্যবংশ দণ্ডধর।
দ্বাপরেতে চন্দ্রবংশ ধরার ঈশ্বর ॥
কলির প্রারম্ভে পুনঃ ভানুকুল-ভূপ।
যাহাদের বীরত্বের নাহি অনুরূপ ॥
দেববংশী শীলাদিত্য বিখ্যাত ধরায়।
যার বংশজাত বাপ্পারাও মহাকায় ॥
একলিঙ্গ শিব পূজি বীরত্ব ভরিল।
মোরী-বংশ্য মাতুলের সাম্রাজ্য হরিল ॥
করিল অশেষ কীর্ত্তি কি কব বিশেষ।
হরিল বিক্রমবলে যবনের দেশ ॥

* বাপ্পারাওর ইষ্টদেবতা এই শিবলিঙ্গের প্রকৃত মন্দির নাগীন্দ্রনামক স্থানে আছে, ঐ নাগীন্দ্র উদয়পুর হইতে পঞ্চ ক্রোশ অন্তরে স্থিত। একলিঙ্গের পূজকেরা হারীত ঋষির বংশধর।

একচ্ছত্রা অবনী করিল মহাবীর।
দুরন্ত দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছ ভয়েতে অস্থির॥
ইরাণ তুরান আদি কত শত স্থান।
কাবল কাশ্মীর কান্দহার কাফ্রিস্তান॥
ইত্যাদি অনেক দেশে হইলে বিজয়।
করিলেন কত রাজকন্যা পরিণয়॥
জন্মিল অসংখ্য বংশ হিন্দু মুসলমান।
হিন্দু সূর্য্যবংশী খ্যাত যবন পাঠান॥
শত বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তে সেই মহাশয়।
সশরীরে স্বর্গগত কবিচন্দ্র * কয়॥
সুখাসনে শয়নে নিষন্ন নৃপবর।
চারু উপবসনে বৃত কলেবর॥
চারি ধারে অমাত্য আত্মীয়গণ বসি।
নক্ষত্রমণ্ডলে যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী॥
আবরণ মোচন করি তার পর।
অদ্ভুত নিরখি সবে বিস্মিত অন্তর॥
না দেখে পর্য্যঙ্কে মহীপতি-মৃত-কায়।
কেবল প্রফুল্ল পদ্ম-জাল+শোভা পায়॥
সুরেন্দ্র-লোকের প্রায় সুরভি বহিল।
নন্দনকানন সুখে সকলে মোহিল॥
ধন্য ধন্য বাপ্পারাও কীর্ত্তি-কলাধর।
ধন্য বীর্য্যবিভূষণ ধন্য বীরবর॥
সেই বংশে কত শত নৃপতি প্রভৃত।
চিতোরের অধীশ্বর নানা গুণযুত॥
তের শত একত্রিংশ সংবৎ বৎসরে।
বরিত লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনোপরে॥
শিশুরাজ লক্ষ্মণ নঅপ্রাপ্ত ব্যবহার।
রাজ্য করে ভীমসিংহ পিতৃব্য তাঁহার॥
যাঁর প্রিয়তমা সে পদ্মিনী মনোরমা।
রূপে, গুণে, জ্ঞানে, অবনীতে অনুপমা॥
যাঁহার রূপের কথা শুনি দিল্লীপতি।
চিতোর ঘেরিল আসি হয়ে ক্ষিপ্তমতি

রাজ্যলোপ, বংশলোপ প্রাপ্ত হয় তায়।
ব্যান মাতা * রাক্ষসীর ক্ষুধার জ্বালায়॥
তথাপি পদ্মিনী সতী, সতীত্ব-রতন।
না দিলেন যবনেরে করি প্রাণপণ॥
অতুলিত রূপ, গুণ, সতীত্ব সহিত॥
অর্পিলেন অগ্নিগ্রাসে রাখিতে স্বহিত॥
হের ওহে পথিক গহ্বর **ভয়ঙ্কর।
এই স্থানে দগ্ধ পদ্মিনীর কলেবর॥
দেবস্থলীরূপে গণ্য করে যত নর।
রক্ষকস্বরূপ আছে কাল বিষধর॥"
চকিত স্তম্ভিত নেত্রে পথিক তখন।
কৃতাঞ্জলি করে করিলেন নিবেদন॥
"কহ দ্বিজ মম প্রতি হয়ে কৃপাবান্।"
বিবরিয়া পদ্মিনীর চারু উপাখ্যান॥

পদ্মিনী-বর্ণন।

দ্বিজ কন, হে "সুজন, কর মন সমর্পণ,
পদ্মিনীর বিচিত্র কথায়।
চৌহান কুলের দীপ, সিংহল-দ্বীপের নৃপ,
বিখ্যাত হামির শঙ্খ রায়॥
তাঁর কন্যা মনোরমা, তিলোত্তমা কিবা রমা,
পদ্মিনী-সৌন্দর্য্য-সার ভাগ।
ভীমসিংহে দুহিতায়, দিলেন হামির রায়,
সহ যথাযোগ্য অনুরাগ॥
যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমনি পতি,
রাজকুলচক্রবর্ত্তী ভীম।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্য্যে পার্থ বিক্রমেতে ভীম॥
যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।

* ইনি পৃথ্বিরাজের সময়ে রাজপুত্রাদিগের প্রধান কুলকবি ছিলেন।

† সেই পদ্মপুষ্পসমূহ সরোবর মধ্যে রোপিত হইলে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। এইরূপ উপন্যাস নৌশেরয়া ভূপতির মৃত্যুবিষয়ে কথিত হয়।

* ইনি রাজপুতনার শ্রেয়সী কুলদেবতা। বাপ্পা ইহাঁকে স্বীয় শ্বশুরালয় বন্দর দ্বীপ হইতে আনয়নপূর্ব্বক চিতোরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

** রাজপুতনার কোন কবি কহেন, ঐ গহ্বরের গর্ভে এক অট্টালিকা আছে।

বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেকভাগ্যে কেবল চীৎকার ॥
মাধবী আকন্দ কায়, প্রকাশিত প্রতিভায়
বল তাহে কি শোভা অতুল।
আকন্দের দেহোপরে, যদ্যপি বিরাজ করে,
দেখিলে নয়নে বিঁধে শূল ॥
সর্ব্বসুলক্ষণবতী, ধরাধামে যে যুবতী,
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তার,
কত গুণ কে কহিতে পারে,
পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃদি পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা
মৃত-প্রায় পর পরশনে ॥
থাকুক সে পরশন, পরপরমুখ দরশন,
সহনীয় না হয় সতীর।
দৃষ্টিমাত্র সেই ক্ষণে, সবমের হুতাশনে,
দগ্ধ হয় কোমল শরীর ॥
পদ্মিনীর পদ্মনেত্র, বিনোদ বিহার-ক্ষেত্র
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পলকেতে প্রতিপলে, বঙ্কিম কটাক্ষছলে
চারিদিকে অমৃত সঞ্চরে ॥
সতীর শুভদ দৃষ্টি, করে নানা সুখ সৃষ্টি
অনলের বৃষ্টি পাপীজনে।
সতীরে হরিতে আশ, যে করে তাহার নাশ,
ভাব কি দুর্দ্দশা দশাননে ॥
পদ্মিনী রূপের নিধি, বিরলে গড়িল বিধি,
নীর-নিধি নন্দিনী সমান।
কি ছার পদ্মিনীচয়, সহ বিস-কিসলয়
পুষ্করে প্রকাশে অভিমান ॥
অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভামিনী ধন্যা,
অগ্রগণ্যা রূপসী-সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে ॥
কোন্ মূঢ় চিত্রকরে, পদ্মদেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিংবা সেই কোকনদে, মাখাদলে মৃগমদে
অতি সুখ লভে মধুলোভা ?

কষিত-কাঞ্চন-কায়, কিবা কার্য্য সোহাগায়ঃ
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কেহে দিবে ইন্দ্রধনু-দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গঘটা ?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর ভাতি,
বৃদ্ধি করা দূরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দুরে মাজি গজমুক্তাফলরাজী
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?
সেইরূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার,
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন।
মৃগপতি যূথপতি, দ্বিজপতি গজমতি,
তিলফুল কোকিল খঞ্জন ॥
এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আর,
নব-কবি-জনের বাঞ্ছিত।
কহিলাম যতগুলা, পদ্মিনী-রূপের তুলা,
কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত ॥
এই শ্রুতি পূর্ব্বাপর, যুবতীর মনোহর,
রূপ দৃষ্টে মুগ্ধ মুনি নরে।
কহ কোন নৃপ মুনি, রূপের বাখান শুনি,
মজিয়াছে পঞ্চশরশরে
পদ্মিনী রূপের যশ, পরিপূর্ণ দিক দশ,
শ্রুত মাত্র দুরন্ত যবনী
না শুনিল কারো মানা, সিংহপুরে দিল হানা,
সঙ্গে লয়ে সেনা আগণন ॥

চিতোর আক্রমণ

সাজিল সঘন, সেনা অগণন,
করিবারে রণ চলিল।
শিরোপরে তাজ যত তীরন্দাজ,
সাজ সাজ সাজ বলিল ॥
ধূলায় গগন, ধূসর বরণ,
অদৃশ্য তপন হইল।
কলবতীচয়, মনে পেয়ে ভয়,
নিভৃতে আশ্রয় লইল ॥
বিষম বিশাল, মদে মাতোয়াল,
করিযূথ কাল ছুটিল।
পিঠেতে আমারি শোভে সারি সারি
তাহে ধনুর্দ্ধারী উঠিল ॥

মণি মুক্তা কাজ, ঝুলেতে বিরাজ,
রবি-ছবি লাজ পাইল।
কোমল কমল, সম মখমল,
শোভা নিরমল ছাইল॥
অগণিত বাজী, কিবা তাজি রাজী,
আসোয়ার সাজি ধাইল।
করে করবাল, পিঠে বাঁধি ঢাল,
যত সেনাপাল যাইল॥
হলো হুলস্থূল, করে করি শূল,
কত সেনাকুল সাজিল।
শূন্য রাজপুরী, বিগত মাধুরী,
ভোঁ ভোঁ রবে তূরী বাজিল॥
চলে সেনাদল, তৃণহীন স্থল,
জলাশয়-জল শুকাল।
হেরিতে করাল, চলে পালে পাল,
নাহিক সকাল বিকাল॥
উঠে ডাক হাঁক, বাজে জয়ঢাক,
কত শত শাঁক ফুঁকিল।
স্থখী কত মতে, যবন যাবতে,
হিন্দু-বধ-ব্রতে ঝুঁকিল।
দিল্লীর সম্রাট, সহ সেনা ঠাট্,
ত্যজি রাজ্যপাট মাতিল।
স্থির নহে মন, তাহাতে মদন,
নিজ সিংহাসন পাতিল॥
পদ্মিনী-স্মরণ, পদ্মিনী-মনন,
পদ্মিনী জীবন দহিল।
পদ্মিনী দর্শন, পদ্মিনী শ্রবণ,
পদ্মিনী মন মোহিল॥
পদ্মিনী শয়নে, পদ্মিনী স্বপনে,
পদ্মিনী বচনে রাখিল।
সেই রূপ ধ্যান, কার রহে প্রাণ,
সেই রূপে জ্ঞান ঢাকিল॥
পদ্মিনী-উদ্দেশে, সমরের বেশে,
রাজপুত-দেশে আইল।
হয়ে কুতূহল, যত কবিদল,
ভূপতি মঙ্গল গাহিল॥
বাজে নওবৎ, সুধাবৃষ্টিবৎ,
সেনানী তাবৎ টলিল।
এমতি বাজনা, মত্ত ভীরু জনা,
সমরাগ্নিকণা জ্বলিল॥
রাজপুতনায়, কেবা কারে চায়
প্রলয়ের প্রায় করিল।
যে যাহারে পায়, লুটে নিয়ে যায়,
কত লোক তায় মরিল॥
আসি অবশেষ, চিতোরের দেশ,
সংগ্রামের বেশ যুড়িল।
নভঃস্থল ঢাকা, সহস্র পতাকা,
যেমন বলাকা উড়িল॥
বিষম কাওয়াজ, গোলার আওয়াজ,
যত গোলন্দাজ দাগিল।
মনে পেয়ে ভয়, নর নারীচয়,
ত্যজিয়ে আলয় ভাগিল॥
যবনে উল্লাস, খল খল হাস,
দুর্গ চারি পাশ ঘেরিল।
ভীমসিংহ রায়, অধোভাগে চায়,
পাঠান-সেনায় হেরিল॥
ক্ষাত্রয়-নিকর, ক্রোধে গরগর,
প্রাচীর উপর চড়িল।
মারে মারসাট, যবনের ঠাট,
দুর্গের কবাট পড়িল॥

বিগ্রহ ও সন্ধির মন্ত্রণা

শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।
বুরুজ হইতে পড়ে গোলা * একধার॥
যেন ঘোরতর শিলাবৃষ্টির পতনে।
ফুল ফল দলে দলে দলিত সঘনে॥
অথবা কর্ত্তনী-মুখে শস্যের ছেদন।
অথবা হেমন্ত-শেষে পাতার ঝরণ॥

* যদিও মোগলসম্রাট বাবরের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তোপ-ব্যবহার প্রচলিত হয়, কিন্তু সুপ্রাচীন কবি চান্দের গ্রন্থে 'নল গোলা' প্রভৃতি অগ্ন্যস্ত্রের উল্লেখ আছে; সুতরাং বোধ হইতেছে, ভারতবর্ষে অতি পুরাকালে গোলা গুলির ব্যবহার ছিল।

সেইরূপ দলে দলে পড়ে শত্রুঠাট।
শুধু এই শব্দ, "মার, মার, কাট, কাট ॥"
পলায় পাঠানসেনা শ্বাসগত প্রাণ।
দলভঙ্গ চতুরঙ্গ হারাইল জ্ঞান ॥
থাকে থাকে ঘিরেছিল দুর্গের প্রাচীর।
ব্যূহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে ধেড়ে বীর ॥
শত্রুর প্রস্থান দেখি রাজপুত্রগণ।
সিংহনাদে জয়নাদে পুরিল গগন ॥
বুরুজে বুরুজে ফেরে পদাতি সকল।
মাঝে মাঝে তোপশব্দে কম্পিত অচল ॥
পুনর্ব্বার পাঠানের সেনাপতিচয়।
বিপক্ষে দেখিয়া শ্রান্ত রজনীসময়।
দলে দলে আসি করে নগর বেষ্টন।
পাতিল তোপের শ্রেণী তুড়িতে তোরণ ॥
গুড়ুম্ গুড়ুম গুম বজ্রের আওয়াজ।
শুনে সচেতন হয় ভীম মহারাজ ॥
"সাজ সাজ" বলি আজ্ঞা দিলেন তখন।
পুনঃ প্রাচীরেতে উঠে যত সেনাগণ ॥
দুই পক্ষে ঘোরতর অস্ত্রের চালনা।
মরিল অনেক সেনা কে করে গণনা ॥
কালানলসম অগ্নি জ্বলে ধূ ধূ ধূ ধূ।
যবনের যুদ্ধনাদ আল্লা হু আল্লা হু* ॥
রুধির-প্রবাহ বহে বনাশ† প্রবাহে।
ভয়ানক ভাবের প্রভাব হয় তাহে ॥
ধূমেতে ধূসরবর্ণ ধরিল আকাশ।
স্থানে স্থানে তোপমুখে বিজলী প্রকাশ ॥
নীচে থেকে উঠে গোলা শূন্যে গিয়া ফুটে।
চিতোরের কত শত ঘর দ্বার টুটে ॥
বাজারে লাগিল অগ্নি দগ্ধ দ্রব্যরাশি।
ত্রাহি! ত্রাহি! শব্দ করে যত দুর্গবাসী ॥
ফাটক-সমীপে কোন যোদ্ধা যুদ্ধ করে।
পুত্র পরিবার তার গৃহে পুড়ে মরে ॥
হাহাকার-রব-পূর্ণ চিতোর নগর।
বালক বনিতা বৃদ্ধ অস্থির অন্তর ॥

বিক্রমে কেশরী প্রায় রাজপুত্রগণ।
পরম সাহসে সবে করে ঘোর রণ ॥
পরাক্রমে ন্যূন নহে দুরন্ত পাঠান।
হিন্দুর বিনাশে পুণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান ॥
শজারুর প্রায় শস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে শোভিত।
ঝক্ মক্ চক্ মক্ পঞ্জা চারি ভিত ॥
উড়িছে নিশান নীল অর্দ্ধচন্দ্রতলে।
প্রকট বিকট মূর্ত্তি দৃষ্ট সর্ব্বস্থলে ॥
হেন কালে এক দিকে উঠে হাহাকার।
সমরে পড়িল এক আলার কুমার ॥
শ্রুতমাত্র বাদশার শিহরিল দেহ।
এমনি আশ্চর্য্য শক্তি ধরে পুত্রস্নেহ ॥
কঠোর কুলিশ সম যাহার হৃদয়।
বালক-বনিতা-দুঃখে কাতর যে নয় ॥
আহবে মাতিলে নাহি থাকে কিছু বোধ।
সদুদয় নাশে, মানেনা-কো উপরোধ ॥
এমন হৃদয় যার নিপট নিদয়।
পুত্রের বিয়োগ শুনে সেই দ্রব হয় ॥
কিন্তু শাহ নিরুৎসাহ না হইল তায়।
মার মার শব্দ মুখে যথা তথা ধায় ॥
প্রভাত হইল নিশা, উদিত তপন।
দুই দলে শ্রান্ত হেতু ক্ষান্ত তাহে রণ ॥
সে সময় স্বভাবের কিবা ভাব উদয়।
চারিদিকে লোহিত বরণ দৃষ্ট হয় ॥
পূর্ব্বদিকে আরক্তিম অরুণ প্রকাশে।
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে ॥
সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র-সভায়।
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ সরমের দায়।
অথবা অগ্রজ-মুখ নিরখি অম্বরে।
লজ্জাভরে শশধর পাংশুরাগ ধরে ॥
উদয়ে উদিত খরতর দিনকর।
মানিনীর মুখ প্রায় ক্রোধে গরগর।
আজি কেন দিনকর প্রখর এমন।
কবি কহে বুঝিয়াছি ইহার কারণ ॥
ভানু-বংশ-অবতংশ রাজপুত্রগণ।
সেই কুলে কালি দিতে উদ্যত যবন ॥
এই হেতু উষ্ণ-ছবি রবি মহাশয়।
অলক্ত আরক্ত প্রভা প্রভাত সময় ॥

---

* লর্ড বায়রন কহেন, মুসলমানেরা এই যুদ্ধ-নাদকালে হু শব্দটা এরূপভাবে উচ্চারণ করে যে, তাহাতে একপ্রকার ভয়ানক ভাবোদয় হয়।

† রাজপুতনা প্রদেশে প্রবাহিতা নদী।

আকাশে শোণিত ছটা শোণিত ভূতলে।
শোণিত তটিনী-নীরে শোণিত অচলে॥
ভয়ানক ভাবের হইল আবির্ভাব।
রৌদ্ররস সহযোগে প্রবল প্রভাব॥
এইরূপে কত দিন হইল সমর।
দিবা বিভাবরী রণে নাহি অবসর॥
তথাপিও যবনের না হইল জয়।
অভেদ্য দুর্গম দুর্গ, কার সাধ্য লয়?
অয়ন হইল গত সমরে সমরে।
সন্ধিস্থাপনের সন্ধি কেহ নাহি করে॥
দুর্গমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইল অতিশয়।
খাদ্য দ্রব্য ক্রমে ক্রমে শেষ সমুদয়॥
অনাহারে প্রাণ ত্যজে কত নর নারী।
ঘোড়াশালে ঘোটক মরিল সারি সারি॥
মাতঙ্গ মরিল কত আহার অভাবে।
জন্মিল মারক তার দুর্গন্ধ প্রভাবে॥
কিলি বিলি করে কীট যেখানে-সেখানে।
অস্থি-চর্ম্ম-সার সবে পতিত শ্মশানে॥
পূতিগন্ধে মহানন্দে ফেরুপাল ফিরে।
অগণন গৃধ্রগণ রহে শব ঘিরে॥
পাখার সাপট মারি শকুনিরা ধায়।
কুকুরে তাড়ায়ে দিয়ে মেদ মাংস খায়॥
হইল নরের খাদ্য তৃণ পত্র মূল।
শ্মশান হইল সব সরোবর-কূল॥
ভীমসিংহ মহীপতি হেরি এ সকল।
প্রজার দুঃখেতে মন হইল বিকল॥
সন্ধির উদ্দেশে কত করেন কল্পনা।
সহিত সচিবদল বিবিধ মন্ত্রণা॥
ওদিকে যবন-সৈন্যে হৈল মহামারী।
কেহ নহে কারো বশ্য সব স্বেচ্ছাচারী॥
পঙ্গপাল মত সৈন্য পালে পালে গিয়ে।
শস্যক্ষেত্র গ্রাম আদি আসে বিনাশিয়ে॥
যাহা পায় তাহা খায়, লুটে সব লয়।
পলায় সকল লোক ত্যজিয়ে আলয়॥
ছয় মাসাবধি কৃষিকার্য্য নাহি হয়।
মরুভূমি প্রায় হইল যত ক্ষেত্রচয়॥

ঘাট বাট, জঙ্গলে পূরিল একেবারে।
না মিলে তণ্ডুল-কণা হাটে কি বাজারে॥
যথা তথা মরে সেনা হাজার হাজার।
নিরখি অস্থির চিত্ত যবন-রাজার॥
মনে ভাবে দূর হৌক মিছে করি রণ।
বিপদ্ ঘটিল এক নারীর কারণ॥
ম জলাম কামরূপে রূপ শুনে যার।
এক বার দেখা চাই সে রূপ তাহার॥
আসার আশায় ফল লাভ হলে বাঁচি।
ইহার অধিক মিছে মনে মনে আঁচি॥
নাহি চাহি রত্নভার, চিতোরের দেশ।
দেখিব সে মোহিনীরে, এই ধার্য্য শেষ॥
এত ভাবি পত্র লিখি দূত পাঠাইল।
সন্ধির পতাকা শুভ্র, শূন্যে উড়াইল॥
দূত আগমনে দ্বারী রাজারে জানায়।
পত্র লয়ে বিদায় দিলেন তারে রায়॥
পত্রপাঠে ক্ষত্রপতি দ্বিগুণ জ্বলিত।
ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস চিত্ত চপলিত॥
ভাবিছেন হায় প্রাণ থাকিতে শরীরে।
যবনেরে কেমনে দেখাব পদ্মিনীরে?
ধিক্ মম বাহুবলে! ধিক্ এ জীবনে।
ধিক্ ক্ষত্রকুলে জন্ম! ধিক্ রাজ্য-ধনে॥
অনাহারে দুর্গমধ্যে যায় যাক্ প্রাণ।
মরুক সকল সৈন্য ক্ষত্রিয়-সন্তান॥
এত অপমান সহ্য না হবে কখন।
না দেখাব পদ্মিনীরে থাকিতে জীবন॥
সাধ্বী সতী পতিব্রতা অতি গুণবতী।
এ কথা তাহারে কবে কোন্ মূঢ়মতি?
এত ভাবি ম্লানমুখে সজল-নয়নে।
ধীরে ধীরে যান রাজা পদ্মিনী-সদনে॥
এক বার অগ্রসর, পুনঃ যান ফিরে।
করাঘাত কাতরে করেন কভু শিরে॥
হেন কালে পদ্মিনীর প্রিয় সহচরী।
চিত্ররেখা নাম তার শ্রেয়সী কিঙ্করী॥
দূরে থেকে নৃপতিরে করি নিরীক্ষণ।
কহিলেক মহিষীরে সেই বিবরণ॥

শুনি সতী চলিলেন চঞ্চল-চরণে।
কুরঙ্গিণী ধায় যথা কুরঙ্গদর্শনে॥

রাজ-দম্পতির কথোপকথন

আসি ধীরে ধীরে, নিরখি পতিরে,
নেত্রনীর পদ্মিনীর।
ক্ষরে বিন্দু বিন্দু, সুধাসিক্ত ইন্দু,
হইল মুখ রুচির।
গদ গদ স্বরে, কন নৃপবরে,
"আজ কেন প্রাণেশ্বর।
হেরি হেন ভাব, স্বভাব অভাব,
অশ্রুপাত দর দর?
অধর মধুর বরণ সিন্দূর,
আজ হে পাণ্ডুর কেন?
সুধার সদন, সুধাংশু-বদন,
রাহুর গ্রাসেতে যেন॥
কেন হে উদাসী, আমি তব দাসী,
কও হে মনের কথা?
আমার কারণ, বুঝি হে রাজন্!
পেয়েছ প্রাণেতে ব্যথা?
আমারি কারণ, হয় এই রণ,
দেশে এত অমঙ্গল।
আমি অভাগিনী, তব সোহাগিনী
তাই হে দুঃখ প্রবল॥
যদি ওহে প্রিয়, সামান্য ক্ষত্রিয়,
ঘরণী হতো এ দাসী।
তবে হেন রণ, দুরাত্মা যবন,
করিত কি হেথা আসি?
পরিপূর্ণ খনি, কত শত মণি,
কে তার সন্ধান লয়?
ধনি-কণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে,
চোরের লালসা হয়॥
কি কব অধিক, ধিক্ প্রাণে ধিক্,
শুন ওহে প্রাণাধিক।
ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ সে যৌবনে,
রূপে গুণে ধিক্ ধিক্॥
ধিক্ বিধাতায়, কেন বা আমায়,
করিল লাবণ্যবতী?
দরিদ্রের দারা, কুরূপা যাহারা,
আমা চেয়ে সুখী অতি॥"
এইরূপে রাণী, খেদে কন বাণী,
পদ্মপাণি হানি শিরে।
শুনি নৃপমণি, অধৈর্য্য অমনি,
অভিষিক্ত অশ্রুনীরে॥
বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গন দিয়া,
রাণীরে লইয়া কোলে।
অধর ধরিয়া, আদর করিয়া,
কহেন মধুর বোলে॥
"কেন হে প্রেয়সি, রূপসী শ্রেয়সি,
আপনায় অনুযোগ।
কিবা দোষ তব, কথা অসম্ভব,
মম ভাগ্যে কর্ম্মভোগ॥
পাইলে রতন, করিয়ে যতন,
কেহ সুখে কাল হরে।
কেহ পদে পদে, মজিয়ে বিপদে,
দস্যু-করে প্রাণে মরে॥
তুমি হে আমার, প্রাণেরি আধার,
প্রাণ দিব তব লাগি।
যাক্ রাজ্য ধন, নাহি প্রয়োজন,
হই হব দুঃখভাগী॥
সব দিব ডালি, তব কুলে কালি,
প্রাণ-সত্ত্বে না হইবে।
হাজার রাজার, রাজ্য কোন্ ছার,
তব মূল্য কেবা দিবে?
কি কব বচন, ক্রোধ-হুতাশন,
কহিতে জ্বলিত হয়?
তাই হে আমার, আজ এ প্রকার,
হইয়াছে ভাবোদয়॥
শত্রু দুরাশয়, সান্ধর আশয়,
ফেঁদেছে এ লিপি-ফাঁদ।
তবে ফিরে যায়, দেখিবারে পায়,
যদি তব মুখ-চাঁদ॥
রাজ্য নাহি চায়, ধন-পিপাসায়,
না করে এ ঘোর রণ।

শুধু স্থলোচনে, তব চন্দ্রাননে,
নিরখিবে আকিঞ্চন ॥
এ পণ তাহার, কেমনে স্বীকার,
করিব থাকিতে প্রাণ।
গরল ভখিব, জলনে পশিব,
না সহিব অপমান ॥
শুনিয়ে উত্তরে, রাণী নরেশ্বরে,
কহিছেন মৃদুস্বরে।
"কেন হে উদাস, এরূপ নৈরাশ,
সর্ব্বনাশ মোর তরে ॥
দুষ্টের দমন, শিষ্টের-পালন,
এই তো রাজার নীতি।
দুষ্ট নিসূদন, না হলো সাধন,
সাধুর পালন রীতি ॥
যদ্যপি যবনে, পরাভূত রণে,
করিবারে না পারিলে।
প্রখর প্রবল, সমর-অনল,
নিবাও সন্ধি-সলিলে ॥
পাল প্রজাকুল, হয়েছে আকুল,
অনাহারে নষ্ট হয়।
একের কারণ, মরে অগণন,
এ দুঃখ কি প্রাণে সয় ?
নিরখি আমায়, শত্রু যদি যায়,
সব দিক্ রক্ষা পায়।
তবে হে আমারে, দেখাও তাহারে,
নিরুপায়ে সদুপায় ॥
সাক্ষাৎ আমায়, যদি দেখে রায়,
হবে তবে কুলে কালি।
দেখুক দর্পণে, ছায়া দরশনে,
বংশেতে না রবে গালি ॥"
এ কথা সতীর, শুনি ভূপতির,
আনন্দের নাহি পার .
অতি কুতুহলী, ধন্য ধন্য বলি,
প্রশংসা করেন তাঁর ॥
"তুমি বুদ্ধিমতী, অতি সাধ্বী সতী,
রমণীর শিরোমণি।
তোমার স্থযুক্তি, স্থমধুর উক্তি
শ্রবণে সৌভাগ্য গণি ॥
ধিক্ মন্ত্রিদল, কি করে কৌশল ?
অসার গণনা করি।
তুমি দেবী-অংশ ধন্য ক্ষত্র-বংশ,
যাহে তব অবতরি ॥
কিন্তু স্থবদনে, এই ভয় মনে,
হইতেছে হে আমার।
মুকুরে আকৃতি, হেরিতে স্বীকৃতি,
পাবে কি সে দুরাচার ?"
কহেন মহিষী "ভাবনা ঈদৃশী,
করা হে উচিত নয়।
পরাস্ত যে জন, সন্ধি-সংস্থাপন,
তাহারি বাসনা হয় ॥
রাবণ সোসর, দিল্লীর ঈশ্বর,
যদিও পরাস্ত নহে।
তার সেনাকুল, হয়েছে আকুল,
তাহারি লিপিতে কহে ॥
অতএব রায়, দর্পণে আমায়,
হেরিতে সম্মত হবে।
শক্র-হস্তে শেষ, মুক্ত হবে দেশ,
কুরব না রবে ভবে ॥"
শুনিয়ে ভূপতি, স্থযুক্তি ভারতী,
মানস প্রফুল্ল অতি।
পত্র লিখি রায়, পাঠান যথায়,
পাঠান চঞ্চলমতি ॥

পদ্মিনী-প্রদর্শন

দিল্লীপতি যবন ভূপাল,
আজ তার প্রসন্ন কপাল !
স্থপ্রভাত শুভ ক্ষণে, সহিত অমাত্যগণে,
পত্রপাঠে আনন্দ বিশাল ॥
মোহিবারে মোহিনীর মন,
কত মত সজ্জা স্থশোভন।
করিতেছে নানা অঙ্গে, কত রূপ রাগ রঙ্গে,
ভাবভঙ্গে রমণীমোহন ॥
চারু শেরপেচ শিরোপর,
ঊর্দ্ধে তার দুলিতেছে পর।

নানারূপ রত্ন তায়, নিরমল প্রতিভায়,
ঝলমল করে নিরন্তর ॥
গজমুক্তা ফলে কোন স্থলে,
সূর্য্যকান্ত-মণি শ্রেণী জ্বলে।
কোথায় বৈদূর্য্য-ভাতি, কোথা হীরকের পাঁতি,
ভানু প্রভা হরে প্রভা ছলে ॥
কষিত কাঞ্চনে সুরচিত,
নানা রত্নরাজীতে খচিত।
কবচ শরীরে আঁটা, কটিবন্ধ হীরা কাটা,
কটিতটে কিবা বিরচিত ॥
জঘন্য নগণ্য বামা-কুলে,
মণির ছটায় যায় ভুলে।
নী সুশীলা সতী, পতিব্রতা পুণ্যবতী,
অকলঙ্ক শশী ক্ষত্রকুলে ॥
অতি ধন মনে মনে গণি,
পতিরূপ ধনে ধনা ধনী।
অন্যধনে তুচ্ছ ভাব, পতিরূপ আবির্ভাব,
হৃদয়-গগনে দিনমণি ॥
জ্ঞানহীন যবন-কুমার,
এমন অবোধ কোথা আর?
দেখাইয়ে রত্নাবলী, পদ্মিনীর মন টলি,
হরিবারে বাসনা সঞ্চার ॥
হেথা ভীমসিংহ মহারাজ,
বার দিয়ে অমাত্য সমাজ।
মন্ত্রণা এরূপ ভাবে, কিরূপে যন্ত্রণা যাবে,
কিরূপেতে রক্ষা পাবে লাজ ॥
কোন্ স্থানে গিয়ে কি প্রকারে,
শত্রুর শিবিরে কি আগারে।
সহ সব সহচরে, দেখাবেন দিল্লীশ্বরে,
সঙ্গে লয়ে নিজ বানতারে ॥
অবশেষে এই স্থির হয়,
প্রকাশ্যে দেখান যোগ্য নয়।
বিহিত নিভৃত স্থল, না থাকিবে সৈন্যদল
থাকিবেন নরপতিদ্বয় ॥
নয়নেতে না হইবে লক্ষ্য,
উভয় দলের সেনাপক্ষ।
আয়ুধ-বিহীন রবে, না লঙ্ঘিবে সীমা সবে
পদাতিক কিবা সেনাধ্যক্ষ ॥

চিতোর গড়ের ছয় দ্বার,
মধ্যে মধ্যে পরিখা বিস্তার।
তারমধ্যে মধ্য গড়ে, বস্ত্রের কাণ্ডার পড়ে,
কি বর্ণিব তাহার বাহার ॥
স্থানে স্থানে হীরক ঝলকে,
ভাস্করে পলকে পলকে।
মণিময় চন্দ্রাতপ, জ্বলে রত্ন দপ দপ,
যেন মেঘে দামিনী দমকে ॥
চারি ধারে গজমুকুতার,
ঝালরেতে শোভা চমৎকার।
ভিতরেতে দুই খণ্ড, সুবর্ণ-মণ্ডিত দণ্ড,
স্থানে স্থানে সুশোভিত তার ॥
যে স্থানে পদ্মিনী পৌর্ণমাসী,
প্রকাশিতা হইবেন আসি।
সেই স্থানে এইরূপ, রচনা করেন ভূপ,
বিহিত গোপন অভিলাষী ॥
গুপ্ত রবে কামিনীর কায়া।
দৃষ্ট মাত্র হবে তাঁর ছায়া।
সহচরী-তারা-মাঝে, অকুলঙ্ক শশী সাজে,
উদিতা হবেন নৃপজায়া ॥
সমাগত হইলে সময়,
দিল্লীপতি হইল উদয়।
অগ্রসর হয়ে রায়, আলিঙ্গিয়ে বাদশায়,
লয়ে যান করিয়া বিনয় ॥
অনন্তর যবন-ঈশ্বর,
প্রবেশিয়ে কাণ্ডার ভিতর।
করিলেক নিরীক্ষণ, তিন দিগে আচ্ছাদন,
একদিকে মুকুর সুন্দর ॥
দর্পণের চারু আবরণ,
ভীমসিংহ করেন মোচন।
হইল মাহেন্দ্রক্ষণ, অস্থির শাহার মন,
সচকিত হইল লোচন ॥
করিতেছে ছায়া দরশন,
যেন সব মায়ার রচন,
কাচেতে কাঞ্চন-কান্তি, চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনী মুরতি বিমোহন ॥
কভু ভাবে এমন কি হয়,
চিত্র চক্ষে পলক উদয়?

নয়নে চাঞ্চল্য আছে, কমলে খঞ্জন নাচে,
বিম্বাধর অশন আশয়।
সরোরুহে হেরিলে খঞ্জন,
অধিপতি হয় সেই জন।
নৃপ হয়ে দেখে যেই, কিলাভ করিবে সেই,
ভেবে দেখ হে ভাবুকগণ ॥
কটূতর কটাক্ষের জোর,
গরিমা-মাদক রসে ভোর।
যেন আহুতির গাত্র, সন্নিধান পাবা মাত্র,
অনল জ্বলিয়ে উঠে ঘোর।
পরক্ষণে হেন জ্ঞান হয়,
যেন চক্ষে ঘৃণার উদয়।
বিষম অধর ভঙ্গে, যেন যবনের অঙ্গে,
কালসর্প বিষ বরিষয় ॥
করি হেন রূপ দরশন,
যবন হইল অচেতন।
ছায়াতে হরিল জ্ঞান, উড়ু উড়ু করে প্রাণ,
স্বেদবিন্দু ঝরে ঘন ঘন ॥
একেবারে চকিত স্থগিত,
মহীপতি হইল মোহিত।
নিপতিত মহী পরে, রাণী যান গৃহান্তরে,
সহচরীগণের সহিত ॥
বলিহারি মদনের বাণ,
কোথা হেন অব্যর্থ সন্ধান।
যোগেশের যোগ ভঙ্গ, দ্বিজরাজ ক্ষত অঙ্গ
তৃণতুলা হয় বলবান ॥
দেখ কি আশ্চর্য্য পঞ্চশর,
ত্রিলোক-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর।
এই শরে জ্ঞানহীন, বীর দর্প সব ক্ষীণ,
না রহিল বংশে বংশধর ॥
আর দেখ দেব পুরন্দর,
অস্ত্র যার বজ্র ভয়ঙ্কর।
সে বাসব বজ্রধরে, অতনুর ফুলশরে,
করেছিল পশুর সোসর।
এই যে দিল্লীর অধিপতি,
বিক্রম-কেশরী মহামতি।
হেরি রূপ প্রতিরূপ, মোহিত হইল ভূপ,
ধন্য ধন্য ধন্য রতিপতি।

না জানি কি হইত তাহার,
নিরখিলে প্রকৃত আকার।
মুগ্ধহয়ে রূপ-রসে, পঞ্চশর-পরবশে,
করিত জীবন পরিহার ॥
ভীমসিংহ দুই করে ধরি,
শাহরে তোলেন শীঘ্র করি।
জ্ঞানলাভে অচিরাৎ, পুনরায় দৃষ্টিপাত,
করিলেক মুকুর উপরি ॥
শূন্য হেরি মোহন মুকুর,
উদাসে পূরিল চিত্তপুর।
বলে "হায় কোথা গেলে? বিরহ-অনল জ্বেলে,
দহিলে হে মানস বিধুর ॥"
এইরূপে হস্তিনার পতি,
বিহ্বল অতনু-শরে অতি।
ভীমসিংহে লয়ে সঙ্গে, শিবিরেতে মোহভঙ্গে,
ধীরে ধীরে করিলেক গতি ॥
সরল সুশীলমতি রায়,
অবিশ্বাস নাহি মাত্র তায়।
হৃদয়েতে নাহি ভীতি, রক্ষা হেতু রাজনীতি,
চলিলেন শত্রুর সভায় ॥

ভীমসিংহের বন্ধন-দশা

দারুণ দুর্নীত দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ।
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ।
অধার্ম্মিক বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।
সকল জাতির প্রতি ঘোর অহঙ্কার ॥
কপট লম্পট শঠ পাতকে পুলক।
ন্যায়ান্যায় বোধহীন বিষম বঞ্চক ॥
সরল সুধীর হিন্দু নৃপ চূড়ামণি।
শান্তি হেতু দেখালেন আপন রমণী।
রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সঙ্গে।
সন্ধি অভিলাষে ভাসে আহ্লাদ-তরঙ্গে ॥
দুরন্ত পাঠানপতি পেয়ে তাঁরে করে।
সেইক্ষণে কারাগারে লয়ে বন্ধ করে ॥
ব্যঙ্গচ্ছলে ঢলে ঢলে কহিছে বচন।
"এখনো পদ্মিনী আনি দাও হে রাজন ॥

যদি তারে নাহি পাই করিলাম পণ।
সকলের আগে তব বধিব জীবন ॥
পরে বিনাশিব সব কাল-বেশ ধরি।
চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃষ্টি করি ॥
ভৃগুরাম-কৃত যথা ক্ষত্রিয়-নিধন।
রাজপুত্র-কুলে না রাখিব এক জন ॥
পশ্চাতে পদ্মিনী হরি করিব প্রস্থান।
দেখিব তখন কেটা করিবেক ত্রাণ?
ছাড়াইব হিন্দুয়ানি ব্রত পূজা যাগ।
ইমানে আনিয়া তার বাড়াব সোহাগ ॥
তার ছায়া হরিয়াছে মম প্রাণ মন।
প্রণয়-শৃঙ্খলে তার বাঁধিব চরণ ॥
হৃদয়-মাঝারে যারে সতত ধেয়াই।
হৃদয় উপরে তারে বসাইতে চাই ॥
কে আছে আমার সম ভুবন-ভিতর?
আমি তার প্রজা হয়ে যোগাইব কর ॥
দিবানিশি পূজিব প্রণয় উপহারে।
দেখি কে আমার এই প্রতিজ্ঞা নিবারে?
অতএব বৃথা কেন বাড়াইবে গোল।
পদ্মিনীরে এনে দাও রাখ মম বোল ॥
সব দিক্ রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল।
একেবারে নিবে যাবে সমর-অনল ॥
তোমার সহায় আমি রব চিরকাল।
ক্ষত্রিমাঝে তব তেজ বাড়িবে বিশাল ॥
যদি তব জাতি মারে কোন রাজপুত।
আমি তারে তখনি করিব জাতিচ্যুত ॥
যদি কেহ তুচ্ছভাবে ভাবে হে তোমায়।
ছারেখারে দিব তারে রাজপুতনায় ॥"
যবনের বাক্য শুনি ভীমসিংহ রায়।
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, খেদে থর থর কায় ॥
অভিমানে অশ্রু আসি প্রকাশিতে চায়।
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে রুদ্ধ করে তায় ॥
রাগের লোহিত-রাগ উদিত নয়নে।
অনল প্রভাবে জল থাকিবে কেমনে?
অশ্রুপথ অবরুদ্ধ, স্বেদধারা বয়।
অশ্রু যেন স্বেদরূপে হইল উদয় ॥
শীতার্ত্তের প্রায় ঘন কাঁপে কলেবর।
নয়নেতে জ্বলে কিন্তু কৃশানু প্রখর ॥

যথা উচ্চ গিরিবরে শোভা মনোহর।
নীচে হয় হিমবৃষ্টি ঊর্দ্ধে ভানুকর ॥
অথবা আগ্নেয়গিরি স্বরূপ লক্ষণ।
উপরে পাবক নিম্নে হিম-বরিষণ ॥
ক্রমে ক্রমে সে অনল হইলে প্রবল।
সঘনে চঞ্চল করে অচল অচল ॥
উগরয় অবশেষে অগ্নি রাশি রাশি।
একেবারে সমুদায় যায় তায় নাশি ॥
সেরূপে নৃপতি বর্ষে বাক্য হুতাশন।
স্তব্ধপ্রায় হইল সভাস্থ সর্ব্বজন ॥
ক্ষত্রিয়ের ক্রোধানল অতি খরতর।
বলে, "ধিক্ ওরে দুষ্ট যবন পামর ॥
এই কি যোদ্ধার ধর্ম্ম রে রে দুরাচার?
এই কি রে রাজনীতি, ভদ্র ব্যবহার?
এই কি পৌরুষ তোর পুরুষ হইয়া?
বাদশাহী অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া?
এই কি কোরাণে তোর লিখেছে ঈশ্বর?
নিপট লম্পট রীতি কুনীতি আকর ॥
যায় যাক্ ছার প্রাণ, নাহি তাহে ভয়।
দেখি কোন্ সাচ্চা বাচ্চা পদ্মিনীরে লয়?
যায় যাক্ রাজ্য ধন, যায় যাক্ দেশ।
যায় যাক্ বংশ ক্ষত্রিকুল হোক্ শেষ ॥
কোন মতে পদ্মিনীরে না পারিবি নিতে
কার সাধ্য অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে?
আর কি কহিব তোরে ওরে দুষ্টমতি।
তোর চেয়ে ক্ষত্রিনারী হয় বীর্য্যবতী ॥
আমি যদি মরি তবে দেখিস তখন।
ভাল শিক্ষা দিবে তারা করি ঘোর রণ।
সমরে ত্যজিয়ে প্রাণ যাবে স্বর্গপুর।
তাহাতে হইবে তোর ঘোর দর্প চুর ॥
কুকুর হইয়া কর যজ্ঞঘৃতে আশা?
অসুরকুলেতে জন্মি সুধার পিপাসা?
খদ্যোত উদ্যত হয়ে ভানুপ্রভা ধরে?
গোষ্পদ আস্পদ কভু হয় রত্নাকরে?
দৈত্যদল-দলনার্থ দেবীর ছলনা।
বিন্ধ্যাচলে হইলেন নবীনা ললনা ॥
দূতমুখে শুনি তার রূপের ব্যাখ্যান।
হরিবারে দৈত্যনাথ হইল অজ্ঞান ॥

মরিল সবংশে শেষে চামুণ্ডার করে।
সেইরূপ রে দুরাত্মা যাবি যমঘরে॥
দেবী-অংশে অবতীর্ণ পদ্মিনী আমার।
যবন দানবকুল করিতে সংহার॥"
এইরূপে ভীমসিংহ করিলে উত্তর,
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীর ঈশ্বর॥
সহস্র ভুজঙ্গ যেন শরীরে দংশিল।
কিংবা কোটি করবাল হৃদে প্রবেশিল॥
দাবানল প্রজ্বলিত নয়ন-কাননে
ভয়ানক ভাবোদয় হইল আননে॥
বদনে না স্ফুরে বাক্য ওষ্ঠাধর কাঁপে।
রসনা অনল-শিখা ক্রোধানল তাপে॥
নীরস হইল কণ্ঠ স্বর নাহি সরে।
কটমট বিকট দশনে শব্দ করে॥
ক্ষণ পরে কহে ঘোর গর্ব্বিত বচনে।
"ওরে রাজপুত ভূত বাসনা মরণে॥
তোর কটূত্তরে মোর নাহি কিছু ক্ষতি।
কিন্তু তোর কোনরূপে নাহি অব্যাহতি॥
ভাল কহিলাম দুষ্ট বুঝিলি বিরূপ।
তার ফল হাতে হাতে ফলিবে স্বরূপ॥
আমারে করিলি নিন্দা তাহে নাহি খেদ।
কোরাণের নিন্দা শুনি হয় বক্ষোভেদ॥
সয়তানি বেদমন্ত্র বিনাশিব তূর্ণ।
তোর একলিঙ্গ শিবে করিব রে চূর্ণ॥
গুঁড়া করি ছড়াইব মসজিদের দ্বারে।
দেখিব সয়তানবাচ্ছা কি করিতে পারে?
এই ক্ষণে মম বাক্য শুন সর্ব্বজন।
এখনি দুষ্টেরে লয়ে করহ বন্ধন॥
পদ্মিনী না আসে যদি সপ্তাহ ভিতরে।
নিশ্চয় ইহার প্রাণ লব তার পরে॥
সত্য সত্য কোরাণ পরশি দিব্য করি।
ভূমিসাৎ ক'রে যাব চিতোর নগরী॥
হিন্দু দেব দেবী আর হিন্দু নারীগণ।
ভ্রষ্ট করিবেক মম ক্রোধ-হুতাশন॥"
আজ্ঞামাত্র প্রহরী পবনবেগে ধায়।
লৌহ-নিগড়েতে বদ্ধ করিল রাজায়॥
বেঁধে লয়ে কারাগারে করিল আটক।
শূকর-শালায় যথা পতিত হাটক॥
দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডধর করে দণ্ডাঘাত।
বহিয়া কোমল তনু হয় রক্তপাত॥
ধূলায় ধূসর দেহ রুধিরাক্ত তায়।
ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নি সম শোভা পায়॥
মধ্যে মধ্যে ভস্ম ভেদি প্রকাশিত ছটা।
ভস্মে কি ঢাকিতে পারে অনলের ঘটা?
এখানে সংবাদ যায় চিতোরের গড়ে।
শুনি কথা স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পড়ে॥

রাণীর আর্ত্তনাদ

"কোথা হে প্রাণের পতি, রহিলে এখন?
কি হবে আমার গতি, কে করে রক্ষণ?
কি হেতু বিপক্ষ-পুরে, করিলে গমন।
কেন দেখালে মুকুরে, দাসীর বদন?
তোমার কি দোষ নাথ, ছিল না মনন।
আমা হ'তে এ উৎপাত, হইল ঘটন॥
কেন কহিলাম হায়! এমন বচন?
দর্পণে আমায় রায়, দেখুক দুর্জ্জন॥
ধর্ম্মভয়হীন হেন, পাপিষ্ঠ যবন।
তাহারে বিশ্বাস কেন, করিলে রাজন॥
ভাল গেলে করিবারে, শিষ্ট আলাপন।
বদ্ধ হলে কারাগারে, ওহে প্রাণধন॥
মনে হয় চিত্তানলে, ত্যজিতে জীবন।
নিবাইতে চিত্তানলে, পারে কি দহন?
প্রাণ ত্যজিয়াছে দাসী, করিলে শ্রবণ।
তখনি হয়ে উদাসী, ত্যজিবে জীবন॥
তোমার এ দুঃখ ভাবি, স্থির নহে মন।
মরণে অনিচ্ছা ভাবি, করিয়ে স্মরণ॥
কি করিব কোথা যাব, চিন্তা অনুক্ষণ।
কেমনে নিস্তার পাব, না দেখি লক্ষণ॥
তোমা ভিন্ন শূন্যময়, নিরখি ভুবন।
তমোপূর্ণ সমুদয়, তুমি হে তপন॥
এসো নাথ অন্ধকার, করহে মোচন।
দীপ্তিহীন হে আমার, হয়েছে লোচন॥"
এইরূপে রাজদারা, করেন রোদন।
অবিরত অশ্রুধারা, বরিষে নয়ন॥

দীর্ঘশ্বাস সমীরণ, ঘন প্রবহণ।
শিরে করাঘাত স্বন, বজ্র নির্ঘোষণ॥
ললাটেতে বার বার, প্রহারে কঙ্কণ।
রণৎকার ধ্বনি তার, শব্দ ঝন্ ঝন্॥
তাহে রুধিরের ধার, হতেছে পতন।
যেন বিজলীর হার, দেয় দরশন॥
আলুয়িত চারু বেণী, কবরী-বন্ধন।
কিবা ঘন ঘন শ্রেণী, ছাইল গগন॥
কভু যেন পাগলিনী, করেন ভ্রমণ।
যথা ভ্রমে কুরঙ্গিণী, দাবদগ্ধ বন॥
ধূলায় ধূসর তনু, নিন্দিয়া কাঞ্চন।
প্রভাতকালের ভানু, মেঘে আচ্ছাদন॥
পরিপূর্ণ শোক-স্বরে, নৃপ নিকেতন।
চারিদিকে খেদ করে, সহচরীগণ॥

ধৈর্য্যধারণ

ধীরা ধর্ম্মবতী যেই, তাহার লক্ষণ এই,
ধৈর্য্য ধরে বিপদসময়।
পদ্মিনী সুধীরা সতী, নিরুপমা গুণবতী,
হইলেন সুস্থির-হৃদয়॥
রাজার বিপদ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গণি,
কিছু কাল শোকাচ্ছন্নমনা।
নীরদ বিগতে রবি, যেরূপ প্রখর ছবি,
সেইরূপ নৃপতি-ললনা॥
বিষাদ-বারিদরাশি, হৃদয় ঘেরিল আসি,
ঘনাচ্ছন্ন মানস তপন।
অশ্রুপথে হ'লে বৃষ্টি, হৃদয়ে সাহস-সৃষ্টি,
আর ভানু থাকে কি গোপন?
ক্ষত্রিয়কুলজা বালা, মানমদে মাতোয়ালা,
উগ্রতর মনোবৃত্তিচয়॥
বারেক ভাবেন মনে, "সঙ্গে লয়ে সেনাগণে,
রণক্ষেত্রে হইব উদয়॥
করি শত্রুজীবনান্ত, উদ্ধারিব প্রাণকান্ত,
ক্ষত্রকুলে রাখিব মহিমা।
যথা রঘুপতি-প্রিয়া, শতস্কন্ধে বিনাশিয়া,
প্রকাশিলা অসীম গরিমা॥"

আবার ভাবেন রাণী, "কিবা হয় নাহি জানি,
কপালেতে কি আছে লিখন?
যবনে বিশ্বাস নাই, যাহা ভাবি ঘটে তাই,
পাছে ভূপ হারান জীবন॥
পরিহরি কুল লজ্জা, ধরিব সমরসজ্জা,
ইহা শুনি শত্রু দুরাশয়।
ক্রোধভরে মত্ত হয়ে, যদি প্রাণনাথে লয়ে,
বধে প্রাণ নিদয়-হৃদয়॥
সে সংবাদে হয়ে ক্ষুণ্ণ, আমি হব শক্তি-শূন্য,
ভয়ে পলাইবে সেনাকুল।
পড়িব যবন হাতে, দুই কুল যাবে তাতে,
কুরব রৌরবে রবে কুল।
অতএব ছলক্রমে, উদ্ধারিয়ে প্রিয়তমে,
পরে বৈরিবিনাশ মন্ত্রণা।
যেমন দেখিছে রঙ্গ, হয় শত্রু ছত্রভঙ্গ,
তবে ঘুচে মনের যন্ত্রণা॥"
এরূপে প্রবোধ ধরি, বার দিয়ে কৃশোদরী,
বসিলেন বাহির দেওয়ানে।
উদ্দেশিয়া দিল্লীশ্বরে, লিপিকরে লিপি করে,
মন্ত্রিগণ আদেশ প্রমাণে॥
"পতি বিনা হীনগতি, শ্রীমতী পদ্মিনী সতী,
হইলেন আজ্ঞাধীন তব।
যাবেন তোমার কাছে, একমাত্র পণ আছে,
যেন তাঁর থাকে হে গৌরব॥
ক্ষত্রিমাঝে শ্রেষ্ঠকুল, সম্মানেতে নাহি তুল
হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তী পতি।
রূপসীর অগ্রগণ্য, তাঁর সম নাহি অন্য,
সবে কহে নিরুপমা সতী॥
অতএব হে তাঁহার, মান ভিন্ন ভিক্ষা আর,
নাহি কিছু তোমার নিকটে।
যাইবেন তব ঘরে, যথাযোগ্য আড়ম্বরে,
হীন বলি কলঙ্ক না রটে॥
তাঁহার সহস্র দাসী, সঙ্গে যেতে অভিলাষী,
যাবে সবে শিবিকারোহণে।

আগে যথা নরপতি, তথা করিবেন গতি,
প্রণতি করিতে শ্রীচরণে॥

একেবারে ত্যজি পতি, বিদায় লবেন সতী,
দেখা শুনা জনমের মত।
এইমাত্র নিবেদন, রাখ যদি হে রাজন,
হইবেন তব অনুগত।''

শিবিরে গমন

পদ্মীনীর পত্র পড়ি দিল্লীর ঈশ্বর।
মহাসুখ মানি মনে অস্থির অন্তর॥
ভাবে "নাকি হেন দিন হইবে আমার।
অতুলনা ললনার হব প্রেমাধার?
মম প্রেম-সরোবরে পদ্মিনী ভাসিবে।
নয়ন-তপন-করে হাস্ত প্রকাশিবে॥
জীবন সাথক হয় হেরিলে যাহারে।
রাজপাটে পাটরাণী করিব তাহারে॥
দর্পণে হেরিয়ে যারে অস্থির হৃদয়।
প্রত্যক্ষ করিব তারে এ কি ভাগ্যোদয়॥
ভীমসিংহে বাড়াইব ভারত ভিতর।
প্রধান হইবে সে সবার উপর॥''
এত ভাবি চলে শাহ হেরিতে রাজারে।
যথা ভীম বন্দী প্রায় বদ্ধ কারাগারে॥
শাহ বলে, "ওহে রায়, বৃথা ভাব আর।
ক্ষমা কর, পরিহরি মনোদুঃখভার॥
যে পদ্মিনী হেতু আমি ত্যজি দিল্লীপুর।
আপনি সংগ্রামে রত আসি এত দূর॥
যে পদ্মিনী হেতু কত শত জীব হত।
যে পদ্মিনী হেতু তুমি দুঃখ পাও কত॥
যে পদ্মিনী রূপে গুণে ধন্যা মহীতলে।
যে পদ্মিনী পতিব্রতা সতী সবে বলে॥
সেই সে পদ্মিনী দেখ লিখেছে আমায়।
ভজিবে আমায়, রায় ত্যজিবে তোমায়॥
অতএব কেন সহ যাতনা কঠোর?
যার জন্যে চুরি কর সেই বলে চোর॥
অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায়।
যে দিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধায়॥
এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর সুন্দর।
এই দেখ পত্র পৃষ্ঠে রঞ্জিত মোহর॥''

প্রথমতঃ হেঁট মুখে ছিলেন ভূপতি।
উপহাস ভাবি মুখে না ছিল ভারতী॥
কিন্তু শেষ শুনি শব্দ স্বাক্ষর মোহর।
পত্র প্রতি কটাক্ষ করেন নৃপবর॥
দেখামাত্র স্বাক্ষর হলেন জ্ঞানহত।
নয়নে বিঁধিল যেন শূল শত শত॥
ধরাপতি ধরাশায়ী ছটপট প্রাণ।
হাস্যমুখে বাদশাহ করিল প্রস্থান॥
যথা মায়া-জায়া হত্যা দেখি রঘুবর।
মায়ামুগ্ধ হয়ে পড়িলেন ধরাপর॥
নিরখিয়া নিশাচরে আনন্দ অপার।
আনন্দ মঙ্গল বাদ্য করে বার বার॥
সেইরূপ আলাদ্দীন আহ্লাদে অস্থির।
ললিতাঙ্গী-লাভ-ভাবে লোমাঞ্চ শরীর॥
নিজ হস্তে পদ্মিনী লিখে পত্রোত্তর।
"ধরণী-ঈশ্বরী পদে প্রণাম বিস্তর॥
দয়া দানে দাস প্রতি দিয়াছ যে আশা।
তাহে মাত্র মম প্রাণ বিহঙ্গের বাসা॥
আমি তব আজ্ঞাধীন জান হে নিশ্চয়।
কি সাধ্য করিব তব আজ্ঞা বিপর্য্যয়॥
এ দীন সেবক তব তুমি হে ঈশ্বরী।
তব মান বাড়াইব কি সাধ্য সুন্দরী?
এইরূপে পত্র লিখি পাঠাইল শাহ।
পাঠ করি পদ্মিনীর বাড়িল উৎসাহ॥
প্রাণনাথে উদ্ধার করিব শত্রু হাতে।
আর না বিচ্ছেদ হবে এবার সাক্ষাতে॥
এত ভাবি পুনর্ব্বার বার দিয়ে রাণী।
ডাক দিয়ে আনিলেন প্রধান সেনানী॥
গোপনেতে পরামর্শ করিলেন স্থির।
দাসী-রূপে সাজিবেক যত সব বীর॥
শিবিকারোহণে যাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া।
পদাতিকগণে যাবে শিবিকা লইয়া॥
প্রতি যানে অস্ত্র শস্ত্র থাকিবে প্রচুর।
সময়েতে শূরত্ব দেখাবে যত শূর॥

ভীম সিংহের পরিত্রাণ

হেথা ভীমসিংহ রায় দেখিয়া স্বাক্ষর।
কিছুকাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর॥

মোহভঙ্গে পুনর্ব্বার বাড়িল যাতনা।
চক্ষে অশ্রু সহ শোভে ক্রোধ-অগ্নিকণা॥
এ কি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘদলে॥
মোহ-মেঘে ক্রোধ-সৌদামিনী দেয় দেখা।
সেই হেতু জলে জ্বলে অনলের রেখা॥
ভাবে রায় "হায় হায় কি করি উপায়।
পদ্মিনী অসতী হয়ে বঞ্চিল আমায়॥
এত দিনে শাস্ত্র মিথ্যা হইল নিশ্চয়।
অবলা সরলা জাতি কোন্ মূঢ় কয়?
প্রতারিতে আমারে তাহার ছিল মনে।
সেই হেতু বলেছিল দেখাতে দর্পণে॥
ধিক্ ধিক্ পদ্মিনী ধরিলি মিছে নাম।
কামচরী নিশাচরী সম তোর কাম॥
কঠিন হৃদয় তোর কঠোর পাষাণ।
তোর মায়া, রাক্ষসীর মায়ার সমান॥
তোর চেয়ে নিশাচরী রাখে ধর্ম্মভয়।
হিড়িম্বার পতিভক্তি কথা সুধাময়॥
তুই লো নিদয়া অতি সূর্পণখা সমা।
মায়ায় মোহিয়ে মন ছিলে মনোরমা॥"
পুনর্ব্বার ভাবে মনে "এমন কি হয়।
আমারে বঞ্চিয়া যাবে যবন-নিলয়?
কোন্ দোষে দোষী আমি তাহার নিকটে?
কভু নহি অপরাধী প্রকাশ্য কপটে?
লিখেছে প্রথমে আসি দেখিবে আমায়।
জনমের মত তাহে লইবে বিদায়॥
এ কথার ভাব কিছু বুঝিতে না পারি।
কেন বা আসিবে আর, যদি হবে তারি?
বুঝি মম মনোব্যথা বাড়াইয়ে তায়।
একেবারে জ্ঞানশূন্য করিবারে চায়॥
আমারে করিয়া ক্ষিপ্ত, লিপ্ত হবে সুখে।
ক্ষণমাত্র সন্তাপিত না হইবে দুঃখে॥
এমন কি হবে কভু তার অভিপ্রায়।
তবে কেন লিখিয়াছে লইবে বিদায়॥
বিশেষতঃ লিখিয়াছে করি আবিষ্কার।
সঙ্গেতে সহস্র দাসী আসিবে তাহার॥
অনেক কি সাধু নাই তাহার ভিতর?
একেবারে ধর্ম্ম কি হয়েছে দেশান্তর?
অবশ্য ইহার আছে গূঢ় অভিপ্রায়।
মম ত্রাণ হেতু কোন করেছে উপায়॥
যে হোক্ রহিল প্রাণ এই প্রতিজ্ঞায়।
পদ্মিনী আসিবে যবে লইতে বিদায়॥
ধরিয়ে রাখিব দিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন।
কোন মতে ছাড়িব না থাকিতে জীবন॥
তাহে যদি প্রাণ যায় কিবা দুঃখ তায়?
জীবন ত্যজিব নিজ রমণীর দায়?
করিব আপন কর্ম্ম যথাধর্ম্ম-নীতি।
সে ভুগিবে যোগ্য ফল যার যে প্রকৃতি॥"

এখানে পদ্মিনী সতী অন্তরে বিচারি।
ধরিলেন সামরিক বেশ মনোহারী॥
দুই স্কন্ধে প্রবম্বিত যুগ্ম শরাসন।
কটিতটে খর করবাল সুশোভন॥
করে ধরিলেন শূল অতি খরশান।
পৃষ্ঠে বাঁধা অসি চর্ম্ম, বর্ম্ম পরিধান॥
ধরণী-চুম্বিত চারু বেণী চিকণিয়া।
বিচিত্র কিরীটে বদ্ধ করে বিনাইয়া॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কব বিশেষ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ॥
ধন্য রাজাপুত্র-দেশ বীরত্ব আশ্রম।
ধন্য ধন্য রাজপুত্র-বংশ পরাক্রম।
যেই বংশে অবতীর্ণ বীর-প্রসূ সবে।
ধর্ম্ম অনুরাগে মাতে সমর-আসবে॥
দূরে ফেলি বেশভূষা গন্ধ বিলেপন।
দূরে ফেলি বীণার বাদন-বিনোদন॥
লাজ-ভয় পরিহরি ধরি প্রহরণ।
আরোহি তুরঙ্গোপরি করে ঘোর রণ॥
বীণার বাদন চেয়ে তাদের নিকটে।
রণবাদ্য সে সময় আনন্দ প্রকটে॥
স্বভাবতঃ যাহাদের সদা ভীত মন।
ভীরু কুরঙ্গের তুল্য যুগল নয়ন।
কুসুম-চয়নে যারা শ্রান্তিমতী হয়।
কোমলা অবলা বলি যাহাদের কয়॥
হেন সুকুমারী নারী রণ-রঙ্গে ধায়।
অক্ষয় বংশের ধর্ম্ম, কিছুতে কি যায়॥
ধন্য রাজপুত্র-দারা সাহস সুন্দর।
কত পুরাবৃত্তে তার ব্যাখ্যা মনোহর॥

দেখে যদি সেনাপতি স্বীয় প্রাণেশ্বর।
সমরে শত্রুর করে ত্যজে কলেবর॥
সে সময় অশ্রুজল না করে মোক্ষণ।
পতি-পদ ধরি করে সেনার চালন॥
যদি কেহ পলায় নিস্তার নাহি তার।
দলে দলে গিয়া করে শত্রুর সংহার॥
পতি-ঋণ পরিশোধ-করণতৎপর।
রাজপুতনারী তুল্য কে আছে অপর।

এইরূপে পদ্মিনী প্রাণেশ-পরিত্রাণে
চলিলেন শত্রুর শিবির-সন্নিধানে॥
আজ্ঞা পেয়ে নারীবেশ ধরে সেনাগণ।
পুষ্প-কোলে লুকাইল বরটা যেমন॥
ভিতরে কবচ আঁটা উপরে ঘাগরা।
উড়ানিতে ঢাকে মুখ বীর-চিহ্ন ভরা॥
রমণী পুরুষ সাজে, পুরুষ রমণী।
যাহার কৌশল, ধন্য ধন্য সেই ধনী॥
শুভক্ষণে করে রাণী শিবিকারোহণ।
চারি দিকে ছদ্মবেশে যত সেনাগণ॥
পদ্মিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া।
অতি সুখী দিল্লীপতি হুরু হুরু হিয়া॥
শিবিরে দিতেছে ঢেঁড়ি, যত সৈন্যদলে।
"আজি সবে রত হও আনন্দ-মঙ্গলে॥
পাঠাও নিশান ডঙ্কা পদ্মিনীর সম্ভ্রমে।
ত্রুটি মাত্র যেন নাহি হয় কোন ক্রমে॥
রচহ বিবিধ ফুলে ফটক সুন্দর।
ছিটাও সকল পথে গোলাব আতর॥
করহ আতসবাজী অশেষ প্রকার।
নৃত্য গীত বাদ্যভাণ্ড যা ইচ্ছা যাহার।
এরূপে পদ্মিনী-মন মোহিবারে শাহ।
সেনার সাগরে তোলে আনন্দ-প্রবাহ॥
হেন কালে মহিষী আসিয়ে উপনীত।
চারি দিকে সহস্র শিবিকা সুবেষ্টিত॥
প্রহরী সকলে গেল নৃপে পরিহরি।
পতি-কারাগারে ধীরে প্রবেশে সুন্দরী॥
দেখি ভীম, ভীমবেশে ভামিনী রমণী।
হইলেন একেবারে বিস্মিত অমনি॥
ভাবিছেন কি ভাব প্রভাব পদ্মিনীর।
বীরবেশে ঢাকি কেন কোমল শরীর?

নিশ্চয় এসেছে মম উদ্ধার কারণ।
আমি তারে বৃথা নিন্দিলাম এত ক্ষণ॥
এইরূপ নব ভাব মানসে উদয়।
পূর্ব্ব-প্রতিকূল ভাব পাইল বিলয়॥
প্রণত পদ্মিনী সতী পতির চরণে।
গলিত সহস্র ধারা রাজার নয়নে॥
সাদরে লইয়া কোলে মৃগলোচনায়।
তুষিছেন কত মত মধুর কথায়।
রাণী কন "হে রাজন্, নাই হে সময়।
এ স্থানে তিলেক আর বিলম্ব না সয়॥
অনুরাগ সোহাগ সময়ে ভাল লাগে।
চল নাথ শত্রু-হস্তে মুক্ত করি আগে॥"
এত বলি চারুনেত্রা পতি-কর ধরি।
বেগে ধান শত্রুর শিবির পরিহরি॥
অদূরেতে সুসজ্জিত ছিল দুই হয়।
দম্পতি উঠেন তায় অভয় হৃদয়॥
খরতর তুরঙ্গ ছুটিল তীরপ্রায়।
পবনেরে উপহাস করি কিবা ধায়॥
যেই অশ্বে ছিলেন ভূপতি গুণধাম।
বিখ্যাত কেশর-কোল সে অশ্বের নাম॥
পলকেতে পয়স্বিনী-পারে যেতে পারে।
কলিত কেশর চারু চামর আকারে॥
পদ্মিনীর প্রিয় হয় শ্রীপঞ্চ-কল্যাণ*।
বাজীর সমাজে সেই প্রধান শ্রীমান্॥
অসিত বরণ যেন দলিত অঞ্জন।
কিবা অপরূপ গতি নয়ন-রঞ্জন॥
চলিল যুগল অশ্ব, দম্পতি লইয়া।
প্রভু-পরিত্রাণ হেতু প্রফুল্ল হইয়া॥
মধ্য দিয়া যায় ঘোড়া, দুই পাশে যান।
শত্রুর শিবিরে কেহ না পায় সন্ধান॥
চপলার প্রায় তেজে প্রবেশে নগরী।
পতিসহ পুরী-প্রাপ্ত পদ্মিনী সুন্দরী॥

* যে অশ্বের পাদ-চতুষ্টয় এবং নাসিকোর্দ্ধভাগ শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার নাম পঞ্চ-কল্যাণ; সেই অশ্ব এতদ্দেশীয় তুরঙ্গ-পরীক্ষকদিগের কমতে অতি সুলক্ষণাক্রান্ত।

রাজগৃহে হয় নানা মঙ্গলাচরণ।
প্রেরিত প্রমথনাথে পূজা আয়োজন ॥
"হর হর হর" * শব্দে পূরিল গগন।
গোধন কাঞ্চন দান লভে দ্বিজগণ ॥
সজ্জিত সকল সৈন্য কত মত সাজে।
ত্রিপোলিয়া দ্বারোপরি নওবত বাজে ॥
হেথা পাঠানের পতি কাল গৌণ পরে।
সন্দেহ উদয়ে, হয়ে অস্থির অন্তরে ॥
চঞ্চল চরণে চলে রাজা ছিল যথা।
দেখে শূন্যময় গেহ কেহ নাই তথা ॥
একেবারে উন্মত্ত হইল নরবর।
ফেন-লালাবৃত মুখ চক্ষে বৈশ্বানর ॥
যথা অহি-বিবরে করিলে দণ্ডাঘাত।
গরজিয়ে বিষধর উঠে তৎক্ষণাৎ ॥
অথবা মৃগেন্দ্র, মৃগে করিয়া নিপাত।
আহারের কালে যদি হারায় দৈবাৎ ॥
সেইরূপ ক্রুদ্ধ চিত্ত দিল্লীর ঈশ্বর।
থর থর কাঁপিতে লাগিল কলেবর ॥
ঘোর নাদে কহিতেছে, "শুন সৈন্যগণ।
আসিয়াছে পদ্মিনীর দাসী যত জন।
সকলের জাতি মার যথা স্বেচ্ছাচার।
পিছে সমুচিত ফল লইব ইহার ॥"
আজ্ঞামাত্র সেনাকুলে আনন্দ বিপুল।
সঙ্গনা-দুলের কুল পাইতে আকুল ॥
কবি কহে এত নহে নারিকেল ফুল।
ফুলের পাতায় ঢাকা কণ্টকের কুল ॥
যেমন যবন খুলে শিবিকার দ্বার।
অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাজার ॥
মুখ-মধু আশে কেহ শিবিকায় ঢুকে।
ছদ্মবেশী দাসী তার গুলি মারে বুকে ॥
কেহ আলিঙ্গন-সুখ অন্বেষণ করে।
খর তরবার-চোটে নিমিষেকে মরে ॥
কেহ বা ঘোমটা খুলে নিরখিতে মুখ।
যেমন ফিরিয়া যায় হইয়া বিমুখ ॥
অমনি পড়িল গাঁথা বল্লমের ফলে।
বাধিল বিষম যুদ্ধ দুই শত্রুদলে ॥

ঘোরতর যুদ্ধ

রণভূমে মহাধূমে উড়ল পতাকা।
লোহিত ফলকে তার ভানু-মূর্ত্তি আঁকা ॥
নিরন্তর প্রিয়তর রাজন্যের ঠাঁই।
প্রাণপণে সযতনে রক্ষা করে তাই ॥
অকাতরে শত্রু-করে দিবে প্রাণদান।
তথাপি না ছাড়ে কভু বংশের নিশান।
ঘেরি তায় দাঁড়াইল যত বীরবর।
কল্পতরু বেড়ি যথা অমর-নিকর ॥
দাড়িম্বী-কুসুম-নিভ অতি সুমধুরা।
এক পাত্রে, পাত্রভেদে ফিরিতেছে সুরা ॥
পানমাত্র ফুল্লগাত্র নবভাবে টলে।
এমনি আশ্চর্য্য ফল সুধাস্বাদে ফলে ॥
মানসে ধিয়ায় সবে রণ-ক্ষেত্রে মরি।
পাইবে আনন্দধাম অমর-নগরী ॥
সুরনারী-বিদ্যাধরী অপ্সরা-নিকর।
স্বর্গদ্বারে প্রতীক্ষা করিছে নিরন্তর ॥
প্রতাপী-পুঞ্জের প্রেম প্রাপণ-কারণ।
পরিতেছে চারু অঙ্গে নানা আভরণ ॥
এ দিকে সমর-সজ্জা হয় মহীতলে।
ওদিকে বাসক-সজ্জা অমরামণ্ডলে ॥

একাবলী

মুকুট মুড়িছে বণুক নারী।
বেণী বিনাইছে সুরকুমারী ॥
বাজে বীরঘণ্টা কিরীট-মূলে।
কবরী কলিত কণিকা ফুলে ॥
লৌহময় জালে মুকুট টেড়া।
মুকুতার হারে কুন্তল বেড়া ॥
তরবার শাণে ক্ষত্রিয়গণ।
অমরা নয়নে পরে অঞ্জন।
গরল বিরাট শর-ফলকে।
তিলক ভাবিনী-ভালে ঝলকে ॥
সাঁজোয়া শোভিছে যতেক শূরে।
কাঁচলী-কবচ অমরপুরে ॥
হেথা রাজপুত ঝাঁপিছে ঢাল।
হোথায় উন্নত কুচবিশাল ॥

---

* রাজপুতদিগের যুদ্ধনাদ।

হেথা বাঘ-নখে অঙ্গুলী সাজে।
হোথা মণিময় কঙ্কণ বাজে॥
বীরগণ করে বল্লম ভাঁজে।
বরমালা দেবী-করে বিরাজে॥
রাজন্যের গলে রুদ্রাক্ষ-মালা।
রত্ন-হার পরে অমরবালা॥
ক্ষত্রিয় দিতেছে ধনুকে গুণ।
কামিনী কটাক্ষ-শরে নিপুণ॥
তুরঙ্গ সাজায় ক্ষত্রিয়গণ।
অপ্সরী করিছে রথ শোভন॥
আসিবে তাহাতে সুরেন্দ্রদল।
সুরেন্দ্র-ভবন হবে উজ্জ্বল॥
এইরূপ ধ্যান ধরি মানসে।
সমরে সকলে যায় সাহসে॥
ধন্য রে ধরমে রতি অপার।
তা ভিন্ন এ ভবে আছে কি আর?

ভুজঙ্গ প্রয়াত

মহা ঘোর যুদ্ধে মুসল্মান মাতে।
দিবা-রাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে॥
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরেশ-পক্ষে।
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষ লক্ষে॥
বহে রক্তধারা বুঁদেলা-শরীরে।
হয় স্নাত সেনা ঘন স্বেদনীরে॥
গুড়ুম গুম্ গুড়ুম গুম্ মহাশব্দ তোপে
পড়ে সৈন্যঠাটে তরবার কোপে॥
গুলি-পূর্ণ বন্দুক সঙ্গীন জাকে।
দুড় দ্দুড় দুড় দ্দুড় হুড়্ মুড় হাঁকে॥
করে বাদ্য নানা শিঙ্গা ঢোল ঢাকে।
রণক্ষেত্র-ধূলা রবিলোক ঢাকে॥
শনন্ শন্ শনন্ শন্ গুলিবৃন্দ ছোটে।
সিপাহীর বক্ষে শিলাবৃষ্টি ফোটে॥
মহা চণ্ড গোলা সদা ধায় বেগে।
প্রহারের চোটে সব যায় ভেগে॥
ছুটে মাতোয়ালা করিযূথ রেগে।
চলে তার ঊর্দ্ধে বৃহত্তোপ দেগে॥
তুরঙ্গে তুরঙ্গী করে ঘোর যুদ্ধ।
সহাস্বামি ধুমে হলো দৃষ্টি রুদ্ধ॥

ধরা স্তব্ধে শব্দে মরে জীব তাহে।
নদী-বেগ বর্দ্ধিষ্ণু রক্ত-প্রবাহে॥
শবস্তূপ পার্শ্বে শবাহারি-সঙ্ঘ।
মহানন্দ লাভে করে রঙ্গভঙ্গ॥
কৃতঃ ফেরুপালে পিয়ে রক্ত-ধারা।
অপর্য্যাপ্ত ভোজ্যে মনস্তৃপ্ত তারা॥
চিতোরের সেনা যুঝে বিক্রমেতে।
জনাভাব হেতু প্রভীত ক্রমেতে॥

বাদশাহের সমর-বিজয়

বল বল বলে ধরাতলে,
লোকবল বল মাত্র ফলে।
সেই বলে যেই বলী, বলবান্ তারে বলি
যদি বল প্রকাশে কৌশলে॥
ধৈর্য্য বীর্য্য সাহস সম্বল,
কি করিবে শুদ্ধ এ সকল?
কত ক্ষণ থাকে ধৈর্য্য, কতক্ষণ বীর্য্য স্থৈর্য্য,
কতক্ষণ শরীরের বল?
বলাধান প্রধান মাতঙ্গ,
তৃণদল বাঁধে তার অঙ্গ।
সুরাসুর একমতে, মন্দরে সাগর মথে,
রজ্জু যাহে বাসুকি ভুজঙ্গ॥
একতায় হিন্দু-রাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সে ভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন?
এখানেতে দিল্লীর সম্রাট,
সঙ্গে অগণিত সৈন্যঠাট।
যেন পঙ্গপালদল, ছাইল সকল স্থল,
কিবা মাঠ কিবা ঘাট বাট॥
রাজপুত-সেনানী হাজার,
পদাতিক চারিগুণ তার।
শত্রুসংখ্যা অগণন, তাহাতে সম্মুখ-রণ,
কতক্ষণ করিবেক আর?
অরুণ-উদয়ে তারাগণ,
একে একে অদৃশ্য যেমন।
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন॥

বিক্রমেতে এক এক বীর,
কত শত কাটি শত্রুশির।
শরাঘাতে জরজর, শক্তিশূন্য কলেবর,
পরিশেষে ত্যজিল শরীর ॥
চিতোরের সেনানী প্রধান,
গোরা নামে খ্যাত মতিমান্।
বিনাশি সহস্র অরি, খর শর-শয্যা করি,
ভীষ্ম প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গুণধর,
দ্বাদশবর্ষীয় বীরবর।
বাদল তাহার নাম, বীরত্ব ধীরত্ব ধাম,
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ॥
চপলার প্রায় যথা তথা,
অতি বেগে ধায় মহারথা।
যেন প্রলয়ের ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা ?
সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর,
সমর করিছে একেশ্বর।
নাহি স্থান নিরূপণ, বরিষয়ে প্রহরণ,
যথা দেখে যবন-নিকর।
নব অনুরাগের অনল,
প্রজ্বলিত মানস-কমল।
তুরঙ্গে ত্বরিত ছোটে, খর শর অঙ্গে ফোটে,
নহে মাত্র তাহাতে বিকল ॥
হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জ্বলে,
উপনীত হয়ে রণস্থলে।
মুখে শব্দ "মার মার" বাদলের চারিধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্যদলে ॥
যথা ব্যূহ রচি সপ্ত রথী,
অভিমন্যে বদ্ধ করে স্বথি।
সেইরূপ বাদলেরে, ঘেরিলেক কত ফেরে,
রাজপুত্রসেনা সিন্ধু মথি ॥
বাদলের বারিধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বান, হয়ে শত শত খান,
অবিরত পড়িছে ধরায় ॥
হেন কালে নিশা আগমন,
অস্তাচলে চলিল তপন।

তিমিরে পূরিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল সেনাগণ ॥
একে শরাঘাতে হতবল,
তাহে ক্ষুধা তৃষায় চঞ্চল।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে, ললাটেতে স্বেদ ক্ষরে
কাতর হইল সৈন্যদল ॥
বীর শিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া।
জীবনাশা পরিহরি, এক দিক্ লক্ষ্য করি,
আক্রমণ করিল গর্জ্জিয়া ॥
ব্যূহভেদ করি শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তার কায়।
অতিশয় ক্লান্ত-দেহে, যেমন প্রবেশে গেহে,
মূর্চ্ছাগত অমনি ধরায় ॥
হেরি পুরবাসিনী সকলে,
"হায় কি হইল" সবে বলে।
বাদলের মাতা আসি, নয়নের জলে ভাসি,
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে ॥
কতক্ষণ গতে এ প্রকারে,
মোহ ত্যাগ করায় তাহারে।
প্রকাশি নয়নাম্বুজ, প্রসারিল দুই ভুজ,
জননীর কোলে যাইবারে ॥
জননী অমনি তায়, মণি প্রাপ্ত ফণী প্রায়,
কোলে লয় চুম্বিয়ে বদনে।
বলে "ওরে বাছাধন, হেরিব ও চন্দ্রানন,
এমন ছিল না আর মনে ॥
হাঁ রে এ কি অসম্ভব, কাল-প্রায় শত্রু সব,
তুই অতি বয়সে শৈশব।
কেমনে করিলি রণ ? দুরন্ত যবনগণ,
কালানল প্রায় সে আহব ॥
করি প্রায় তারা বলী, তুই রে কমলকলি
সুকোমল ননীর পুতলী।
ভাবিয়াছি এতক্ষণ বুঝি ওরে বাছাধন,
ফাঁকি দিয়ে গিয়াছ রে চলি ॥
শর বিদ্ধ দেহময়, ইহা কি রে প্রাণে সয় ?
রুধির বহিছে ধীরে ধীরে।
বিধি কি পাষাণ দিয়ে, গঠিল যবন-হিয়ে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ যত বীরে ॥"

প্রবোধিয়ে জননীরে, কহিছে বালক ধীরে,
"তব গর্ভে জন্মেছি যখন।
বিধাতা আমার ভালে, লিখিয়াছে সেই কালে,
আমার ব্যবসা হবে রণ॥
ধরাধামে ক্ষত্রিবংশ, শৌর্য্য-বীর্য্য অবতংস,
তাই প্রিয় জ্ঞান করি তারে।
শত্রু-হস্তে মুক্ত দেশ, যশোলাভ হয় শেষ,
কত গুণ কে কহিতে পারে?
রণে যেই তাজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান,
কেবল কৈবল্য তার স্থান।
জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগ্‌দশ,
কভু তার নাহি অবসান॥"
এইরূপ আলাপনে, প্রসূতি পুত্রের সনে,
সুখে কাল করেন হরণ।
হেন কালে দ্রুত-গতি, গোরার প্রেয়সী সতী,
তথাআসি দিল দরশন॥
শ্রাবণের ধারাকারা, নয়নে বহিছে ধারা,
পতির সংবাদ জানিবারে।
বাদলে লইয়ে কোলে, কহিছে মধুর বোলে,
বিম্বাধর চুম্বি বারে বারে॥
"কহ ওরে বাছাধন, কেমন হইল রণ,
কোথা তোর পিতৃব্য এখন?
একত্রে দুজনে গেলি, একা ঘরে ফিরে এলি,
তিনি কি রে হলেন নিধন?"
বাদল কহেন "মাতা" আজ নিদারুণ ধাতা,
চিতোরের সর্ব্বনাশ হেতু।
হরিল সকল গর্ব্ব, ক্ষত্রকুল হলো খর্ব্ব,
ভাঙ্গিয়াছে বীরত্বের সেতু॥
কিন্তু খুল্লতাত মোর, যেরূপ সংগ্রাম ঘোর,
করিলেন কহিতে ভয়াল।
সেরূপ বীরত্ব আর, ধরাধামে হওয়া ভার,
খ্যাতি তাঁর রবে চিরকাল॥
আমি শিশু ক্ষুদ্রমতি, রণ-রীতে অজ্ঞ অতি,
কিছু কাল ছিলাম দোসর।
আমার বিপদ দেখি, যুঝিলেন যে একাএকা,
প্রবেশিয়ে শত্রুর ভিতর॥
সংগ্রাম হইল ভারী, অসংখ্য বিপক্ষ মারি,
সহস্র আঘাতে জরজর।
শত্রু-শবে শির রাখি, শরজালে অঙ্গ ঢাকি,
কালনিদ্রাগত বীরবর॥"
পতির নিধনবাক্যে, অশ্রুধারা সরোজাক্ষে
স্থগিত হইল সেই ক্ষণ।
কাতরা না হয়ে সতী, হৃদয় প্রফুল্ল অতি,
বাদলেরে কহিছে বচন॥
"কি হেতু বিলম্ব আর? রাখ ধর্ম্ম ব্যবহার,
শুন ওরে প্রাণের নন্দন।
আমার বিলম্বে পতি, হবেন চঞ্চলমতি,
কর শীঘ্র চিতা আয়োজন॥
কিরূপে রে যাদুমণি! সেই বীর চূড়ামণি
শত্রু সহ করিলেন রণ।
এই কথা শুনিবারে, এতক্ষণ দেহাগারে,
ওরে বাছা রেখেছি জীবন॥"
এত বলি গৃহে গিয়া, চিতা-সজ্জা সাজাইয়া
দিবাকরে করিয়ে প্রণতি।
প্রদক্ষিণ করি চিতা, অনলে যেমন সীতা,
সাহসে প্রবেশে পুণ্যবতী॥

পুনর্যুদ্ধ ও দৈববাণী

যুঝে যুঝে বহুতর, গতপ্রাণ বীরবর,
অগণিত সেনার নিধন।
ক্ষীণবল দিল্লীপতি, স্বস্থানে করিয়া গতি,
করে পূর্ব্ববৎ আয়োজন॥
পরিগতে সংবৎসর, করি পূর্ব্ব আড়ম্বর
পুনঃ প্রবেশিল রাজস্থানে।
রাজপুত্র বীর যত, সমধিক ভাগ হত,
যুদ্ধ করি বিহিত বিধানে॥
সে ক্ষতি না হতে পূর্ণ পুনর্ব্বার আসি তূর্ণ
শত্রু ঘোর ঘিরিল প্রাচীর।
হের হে পথিকবর! দক্ষিণ শৈলোপর,
যথায় পরিখা সুগভীর॥
তত্রায় বুরুজ ভাঙ্গি, যবন উঠায়ে চাঙ্গী,*
নগরেতে করিল প্রবেশ।

* স্বর্ণ নির্ম্মিত চক্রাকার রাজসজ্জাবিশেষ।

শুনি ভীমসিংহ রায়, দাবদগ্ধ-মৃগ-প্রায়,
নিরাশায় পূর্ণ বক্ষঃদেশ ।।
শত্রু-সেনা সিন্ধু মথি, হত যত মহারথী,
মরিল সাহসী সেনাগণ ।
অস্থির হলেন নৃপ, অন্তরেতে শোক-দীপ,
খরতর জ্বলে অনুক্ষণ ।।
অবিরত চিন্তানলে, হৃদয়-কানন জ্বলে,
দগ্ধ তাহে মানস-কুরঙ্গ ।
দিবানিশি সমভাব, প্রসন্নতা তিরোভাব,
দিন দিন বিমলিন অঙ্গ ।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শান্তি, গত সব কত ভ্রান্তি,
হৃদয়ে উদয় প্রতি ক্ষণ ।
বসিয়ে বিজন স্থলে, সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে,
হেঁট-মুখে করেন রোদন ।।
একদা ক্ষণদা গতে, আলস্য নয়নপথে,
করিলে পলক দ্বার রোধ,
দেখিলেন কালীমূর্ত্তি, শুন্য হতে পেয়ে স্ফূর্ত্তি,
কহিতেছে বচন সক্রোধ ।।
"শুন ভীম বাক্য মোর, মঙ্গল হইবে তোর,
যদি ক্ষুধা নিবার আমার ।
ক্ষুধায় জ্বলিয়া মার, দে রে খাদ্য ত্বরা করি,
নর-মেদ-রক্ত উপহার ।।"
রাজা কন, "হে চামুণ্ডে অগণিত সৈন্যমুণ্ডে,
ক্ষুধা-শান্তি না হলো তোমার !
আর কি খাইবে কালি ? সকলি দিয়াছি ডালি,
রক্ষ রাজ্য, হয় ছারখার ।।"
দেবী কন, "মহাযশ, আছে পুত্র একাদশ,
মম গ্রাসে কর সমর্পণ ।
পরিতৃপ্ত হব তায়, তোমার ঘুচিবে দায়,
যদি রাখ আমার বচন ।।
তিন দিন পুত্রগণে, বসাইয়া সিংহাসনে,
রাজ্যাস্পদে করিবে বরণ ।
ক্রমে একাদশ জন, প্রাণপণে করি রণ,
মম গ্রাসে হইবে পতন ।।"
এত বলি অন্তর্হিতা, হইলা অপরাজিতা,
মোহ যায় ভীমসিংহ রায় ।
মূর্চ্ছাভঙ্গে ভাবে ভূপ, "এ কি ভয়ঙ্কর রূপ,
এখনো শঙ্কায় কাঁপে কায় ।।
এ কি মম কর্ম্মভোগ, জাগ্রতে স্বপন-যোগ
নয়নেতে নাহি নিদ্রালেশ ।
মম দুর্গ-অধিষ্ঠাত্রী, সকল মঙ্গলদাত্রী,
দেখা দিল ধরি ভীম বেশ ।।
করেছি কি অপরাধ, পদে পদে কি প্রমাদ,
হায় হায় কি করি উপায় ?
দেবী নিশাচরী প্রায়, পুত্রগণে খেতে চায়,
হায় দুঃখ কহিব কাহায় !
যেই নন্দনের লাগি সংসারেতে অনুরাগী,
হয়ে লোক চাহে ধন জন ।
এমন নন্দনগণে, কালীগ্রাসে সমর্পণে,
রাজ্যে মোর কিবা প্রয়োজন ?"
চিন্তা করি এইরূপ, বাহির দেওয়ানে ভূপ,
বাব দিয়ে বসিলেন গিয়া ।
পাত্র মিত্র সন্নিধান, কহিলেন মতিমান,
কালিকার বাক্য বিবরিয়া ।।
শুনিয়ে অমাত্যগণ, করিতেছে নিবেদন,
মনে মনে মানিয়া বিস্ময় ।
"হয় হেন অনুভাব, চণ্ডিকার আবির্ভাব,
প্রকৃত ঘটনা কভু নয় ।।
বিষম বিপদকালে, চিন্তারূপ মেঘজালে,
জড়িত বিজ্ঞান-বিভাকর ।
অনাহারে অনিদ্রায়, শরীরের বল যায়,
অচেতন ইন্দ্রিয়-নিকর ।।
জাগ্রতে স্বপ্নের ভোগ, চক্ষে মিথ্যা দৃষ্টি যোগ,
শ্রুতিপথে মিথ্যা স্বর বাদে ।
মিথ্যা ভয়ে চিন্তাকুল, বাতুলের সমতুল,
হয়ে লোক কভু হাসে কাঁদে ।।
এই হেতু বোধ হয়, বিভীষিকা সত্য নয়,
কালী কেন হইয়া নিদয়া ।
কহিবেন হেন বাণী ? যেই বরাভয়পাণি,
তব রাজ্য-পদ্মে পদ্মালয়া ।।
তবে সে বিশ্বাস হয়, সভাজন সমুদয়,
সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ যদি হন ।
থাকিব সকলে সাক্ষ্য, কহিলে দারুণ বাক্য,
তবে যথা কর্ত্তব্য সাধন ।।

পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ

অমাত্যগণের এই বাক্য-পরিশেষে।
দৈববাণী অমনি হইল শূন্যদেশে ॥
"ওরে রে পাষণ্ডগণ কর অবিশ্বাস।
এই পাপে চিতোরের হবে সর্ব্বনাশ ॥"
শুনিয়ে হইল সবে স্তম্ভিতের প্রায়।
চিত্রপুত্তলিকামত অচেতনকায় ॥
চকিত-স্থগিত নেত্রে ঊর্দ্ধ দিকে চায়।
বিনা মেঘে ঘোর শব্দ শুনিবারে পায় ॥
দিবস তিমিরে পূর্ণ, রক্তছটা রবি।
ঘন ঘন দেখা দেয় বিজলীর ছবি ॥
ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, চঞ্চল সকল।
যেন ধরা চূর্ণ হয়ে যাবে রসাতল ॥
হইল শোণিতবৃষ্টি কাঁদে শিবাগণ।
ভাঙ্গিল বিষম ঝড়ে বন উপবন ॥
ভয়ে ভীমসিংহ ভূপ ভাবিয়ে ভবানী।
কাতরে কুমারগণে কহিছেন বাণী ॥
"আর কেন বিলম্ব সকলে অস্ত্র ধর।
এ নব বয়সে সব মায়া পরিহর ॥
ধন জন যৌবন জীবন পরিবার।
সকলের আশা-সুখ কর পরিহার ॥
চল সবে সমর করিব প্রাণপণে।
রাখিব জাতিয় ধর্ম্ম রুধির-তর্পণে ॥
কুল-ধর্ম রাখিতে জীবন যদি যায়।
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়?
কুলের কলঙ্ক কে দেখিবে ক্ষত্রি হয়ে?
রাজপুত-সুতা যাবে যবন আলয়ে?
বিশেষে পদ্মিনী সতী প্রেয়সী আমার।
যদিও তোমরা নহ গর্ভস্থ তাঁহার ॥
তথাপি সবার প্রতি মাতৃভাব ধরি।
সদাকাল সমস্নেহে পালিল সুন্দরী ॥
প্রসূতি সমান ভক্তি করিয়াছ সবে।
এখন করিলে রক্ষা ধন্য বলি তবে ॥"
শুনিয়ে পিতার বাক্য নির্ভয়-হৃদয়।
ধরিল সমর সজ্জা রাজপুত্রচয় ॥
হায় একি পরিতাপ? একি মনঃ ক্লেশ?
মৃত্যু-মুখে পুত্রে যেতে পিতার আদেশ।
যৌবন-সাহস-বীর্য-রূপ-গুণধর।
এক নহে যেন একাদশ দিনকর ॥
এ হেন কুমার-চয় মরিবে অকালে।
হায় হায় কি দুর্ভাগ্য তাঁদের কপালে ॥
দুষ্টের অনিষ্ট-চেষ্টা-পূরণ কারণ।
হেন বীররত্নচয় পাবে কি নিধন?
পরম পৌরুষ ধর্ম্ম দেশ-হিতৈষিতা।
ক্ষত্রিয়ের বীর-বৃত্তি চির-প্রশংসিতা ॥
এ সকল সাধু ধর্ম্ম ব্যর্থ যদি হবে।
বিধাতার বিধানেতে ন্যায় কোথা তবে?
দুষ্ট যবনের পক্ষে অধর্ম্ম কেবল।
মহাপাপ-মেঘমালা মানসে প্রবল ॥
কি কদাশে চিতোরেতে আইল পামর?
হত যাহে সহস্র সহস্র নারী নর ॥
স্মরিলে সহসা হয় এই প্রশ্নোদয়।
এমন দুরাত্মা লব্ধ হবে কি বিজয়?
তবে সেই শাস্ত্রবাক্য রহিবে কোথায়?
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" গীতার গাথায় ॥

অরিসিংহের যুদ্ধ

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার।
বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগার কুমার ॥
সেইদিন রাজা তথা পরিহরি ছত্র-সিংহাসনে।
রাজ্য-পাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে ॥
অরিসিংহ নাম তাঁর, অরিপক্ষে সিংহের সমান।
তিন দিন পরে শূর সসৈন্যেতে রণভূমে যান ॥
ঘোরতর রাগ-নাগ গরলে অন্তর জরজর।
অদ্ভুত বীরত্ব বীর দেখালেন শত্রুর ভিতর ॥
কোটি কোটি তারা-মাঝে মৃগাঙ্কের প্রভাব যেমন।
অস্থির শত্রুর দল চারিদিকে করে পলায়ন ॥
কিন্তু সে পাঠান-সেনা সীমাহীন সিন্ধুর সমান।
সহস্র সোয়ার মাত্র কুমারের সহ হত যোগান ॥
যেন কোটি ক্রৌঞ্চ সহ সহস্র মরাল যুদ্ধ করে।
বিশেষে যবন-সৈন্য উঠিয়াছে গড়ের উপরে ॥

যথা শেফালিকা ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর।
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে ঝরি পড়ে ধরণী উপর॥
সেইরূপ অরিসিংহ যুদ্ধে যুদ্ধে হয়ে বল-হত।
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে অবশেষে জীবন-বিগত॥

শেষ সমরে ভীমসিংহের প্রবেশ

সমরে মরিল জ্যেষ্ঠ কুমার সুন্দর।
শুনি নৃপমণি হন অত্যন্ত কাতর॥
কিন্তু বজ্রঘাত-প্রায় ক্ষণিক সে শোক।
হৃদয়ে উদয় ধৈর্য্যসূর্য্যের আলোক॥
একে ইস্‌লামের প্রতি দ্বেষ ঘোরতর।
তাহাতে স্বদেশ-প্রীতি-পূর্ণিত অন্তর॥
তাহে কুল-লজ্জা-রক্ষা রাজকুল-ব্রত।
কোন ক্রমে সে কলঙ্ক না হয় সঙ্গত॥
তাহে ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম্ম চিরন্তন।
সাক্ষাৎ কৈবল্য-দাতা সমরে মরণ॥
বিশেষে আশ্বাস-বারি ত্যক্ত মনোমীন।
একেবারে জীবনের প্রতি মায়াহীন॥
যেরূপ দীপের আলো ম্লান দিবাভাগে।
সেইরূপ শোক-তাপ মনে নাহি লাগে॥
পরদিন পুনঃ রাজা বিহিত আচারে।
রাজ্য-পাটে বসিলেন দ্বিতীয় কুমারে॥
তিন দিন অবসানে পাঠালেন রণে।
মরিল কুমার যুদ্ধ করি প্রাণপণে॥
এইরূপে একে একে দশ পুত্র হত।
ঘোরতর বিগ্রহেতে মাসাধিক গত॥
শ্রীহীন চিতোরপুরে দিনে অন্ধকার।
কেবল বিশ্রুত রমণীর হাহাকার॥
যে ছিল পুরুষ মাত্র রাজ-সন্নিধান।
চিতোর হইল নারী-রাজ্যের সমান॥
একদা বসিয়া ভীমসিংহ দরবারে।
কহিছেন সম্বোধিয়া যত সরদারে॥
"মরিল সকল পুত্র বাকী মাত্র এক।
করিব তাহারে অদ্য রাজ্যে অভিষেক॥
তারে রাখি রাজ্য-পাটে আমি যাব রণে।
লভিব অক্ষয়-স্বর্গ জীবন অর্পণে॥
শত্রু-হস্তে পরিত্রাণ হেতু নারীগণ।
প্রাণত্যাগ করিবেক প্রবেশি দহন॥"

শুনিয়ে অজয়সিংহ পিতার বচন।
করপুটে ভূপতিরে করে নিবেদন॥
"অনুচিত কথা কেন কন মহারাজ।
এবার সমর সজ্জা সেবকের কাজ॥
এই তো কালীর বাণী আপনার প্রতি।
না দিলে এবার পুত্র নাহি অব্যাহতি॥
আপনি যাবেন যদি সাজিয়ে সমরে।
কহ তাত মঙ্গল হইবে কার তরে?
কি ছার আমার এই অসার জীবন?
তব নাশে রাজ্য-আশে করিব বন্ধন?
অনুমতি দেহ পিতা রণে যাই আমি।
তব কার্য্যে প্রাণ ত্যজি, হই স্বর্গগামী॥"
শুনিয়ে পুত্রের কথা সজল নয়নে।
কহিলেন ভীমসিংহ অমিয়-বচনে॥
"কেন বাপ অযুক্ত কথায় আস্থা রাখ।
প্রবোধ-চন্দনে স্বীয় মন-পুষ্প মাখ॥
দেখ দেখি বিচারিয়ে মনের ভিতর।
কি আছে মঙ্গল মম ইহার অন্তর?
মরিল সকল লোক জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
পুত্র হত পত্নী হত, চ্যুত সিংহাসন॥
প্রবল বিজয়ী বৈরী ঘোর অত্যাচারী।
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তার কি করিতে পারি?
অতএব আমার মঙ্গল কোথা আর?
মরণ মঙ্গল মম এই জ্ঞান সার॥"
এইরূপে পিতা-পুত্রে বাদ অনুবাদ।
উভয়ের মনে প্রাণ প্রতি অবসাদ॥
শেষেতে রাজার বাক্য হইল প্রবল।
"সাজ সাজ" শব্দে পূর্ণ আকাশ-মণ্ডল॥

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায় !
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয় ।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয় তনয় ॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয় ।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয় ?
অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ।।
চল চল চল সবে, সমর সমাজ হে,
সমর-সমাজ ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ ।।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে,
রাজপুতানার ।
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার ॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার ।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান ।
এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান ।।
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান ?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম * বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান ।।
স্মরহ-ইক্ষ্বাকু বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরণ !
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে ?
ক্ষত্রিয়-নন্দন হে ?
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই ।
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই ।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এস সব ভাই হে,
এস সব ভাই ॥"

শুনিয়ে সাজিল লোক কিবা যুবা শিশু ।
যে ছিল নিপুণ চাপে যুড়িবারে ইষু ॥
"মার মার" শব্দ করি সকলে চলিল ।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
পাবকে পতঙ্গ যথা পড়ে বেগভরে ।
ছুটিল তুরঙ্গি-সেনা করবাল করে ॥
যেন উৎস বদ্ধ ছিল শেখরগহ্বরে ।
পর্ব্বতের বক্ষঃ ভেদি ধাইল সত্বরে ॥
উড়ে পর শুভ্রতর টোপর উপর ।
স্রোত মুখে ফেনরাশি যেন অগ্রসর ॥
কভু উর্দ্ধে কভু নীচে হয়-চয় ধায় ।
তরল তরঙ্গ-রঙ্গ শোভা হইল তায় ॥
কোষমুক্ত অসি-পুঞ্জ ধক্ ধক্ জ্বলে ।
দিনকর-কর যেন জাহ্নবীর জলে ॥
ওদিকে যবন উঠে একেবারে রেগে ।
ধাইল বিপক্ষ প্রতি ঘোরতর বেগে ॥
যেন দুই প্লাবিত পয়োধি অঙ্গ ঢালে ।
মিলিল ভয়াল শব্দে প্রলয়ের কালে ॥

পদ্মিনী-স্থানে রাজার বিদায় গ্রহণ

হেথা ভীমসিংহ রায়, কদম্ব-কুসুম প্রায়
লোমাঞ্চ-শরীর বীরবর ।

* যম সূর্য্যের পুত্র এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি যমও সূর্য্যপুত্র ।

প্রবেশিয়ে অন্তঃপুরে, নয়ন-নীরদ ঝুরে,
নিরস হইল বিম্বাধর ॥
উপনীত হন তথা, পদ্মিনী রূপসী যথা,
সখী সহ করেন রোদন।
বিমুক্ত কুন্তল-জাল, অশ্রু-ধারা-মুক্তামাল-
সুশোভিত পূর্ণেন্দু-বদন ॥
নিরখিয়ে নৃপতিরে, উঠে রাণী ধীরে ধীরে,
বসাইয়ে বিচিত্র আসনে।
জিজ্ঞাসেন মৃদু ভাষে, বসিয়ে রাজার পাশে,
"আজি হে উদয় কি কারণে ?
দশ নন্দনের মায়া, কেমনে সহিল কায়া,
ছায়া-প্রায় ছিল হে তোমার।
রণশায়ী পুত্রগণ, আছে মাত্র একজন,
প্রিয় শিশু অজয়কুমার ॥
আর কেন হে রাজন্, বলি দিবে সেই ধন,
ব্যান মাতা বাক্ষসীর পায় ?
পানীয় পিণ্ডের স্থল, কে আর রহিল বল,
বাপ্পা-রাও বংশ লোপ প্রায় ॥
ক্ষমা দেহ নরপতি, সমরে করহ গতি,
আর পাঠায়ো না সে সন্তানে।
তুমি যাও রণস্থলে, আমি স্বীয় দলে বলে,
অনলে প্রবেশি ত্যজি প্রাণে ॥"
রাণীর বচনে রায়, চিত্রপুত্তলিকা প্রায়,
মৌনী হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া।
কহিছেন মৃদু স্বরে, বিকচ কমলোপরে,
মলয়জ অনিল জিনিয়া ॥
"শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে, জুড়াল তাপিত হিয়ে,
সুধাসিক্ত তোমার কথায়।
যা কহিলে কৃশোদরি, সেই কথা স্থির করি,
আসিয়াছি লইতে বিদায় ॥
এ বিদায় জন্ম-শোধ, প্রণয়-পঙ্কজ-রোধ,
ইহলোকে তোমার আমার।
যদি পূরে মনস্কাম, প্রাপ্ত হয়ে যোগ্যধাম,
মিলন হইবে পুনর্ব্বার ॥
হের অই প্রাণপ্রিয়ে ! দিনকরে আবরিয়ে,
প্রকাশিছে যথা জলধর।
সেইরূপ মম সঙ্গ, তোমার ললিত অঙ্গ,
মলিন করিল নিরন্তর ॥
প্রথম মিলন কালে, প্রমোদ-প্রসূন-মালে,
বিভূষিত ছিল তব মন।
সে ভাব কোথায় হায় ? অশ্রুজলে ভেসে যায়,
কপোল কমল বিমোহন ॥
আর না যাতনা ঘোরে, মলিন করিব তোরে,
যাই প্রিয়ে দেহ লো বিদায়।
অই দেখ জলধর, পরিহরি দিনকর,
দিগ্ দিগন্তরে দ্রুত ধায় ॥"
এত বলি মহাবাহু, শশধরে যথা রাহু,
মহিষীরে লইলেন কোলে।
চারি চক্ষে ঝরে জল, প্রজ্বলিত দুঃখানল,
বাড়ব যেরূপ বারি তোলে ॥
যথা দিবা অবসানে, বিদায় প্রেয়সীস্থানে,
কাতরেতে চাহে চক্রবাক্।
সেইরূপে মতিমান্, বিদায় লইয়া যান,
রাজপুরে রোদনের জাঁক ॥
পদ্মিনী অস্থিরা নন, ডাক দিয়া দাসগণ,
আজ্ঞা দেন সাজাইতে চিতা।
ক্ষত্রিয় রমণীগণে, সুমধুর সম্বোধনে,
ডাকিলেন হয়ে প্রফুল্লিতা ॥

অগ্নি প্রবেশ

দেখ, পথিক সুজন।
যেই স্থানে পদ্মিনীর, কলেবর সুরুচির,
দাহ করিল হুতাশন ॥
গিরি, গুহার ভিতর।
না চলে ভাস্কর ভাতি, তমোময় দিবা রাতি,
আছে পুরী অতি ভয়ঙ্কর ॥
তাহে করিছে নিবাস।
মোরী-কুল * প্রসবিনী, ভীম-রূপা ভুজঙ্গিনী,
সহ স্বীয় সঙ্গিনী সংকাশ ॥

* বাপ্পা রাওর মাতুল-কুল নাগ বংশ, নাগমাতার শরীরের একার্দ্ধ মনুষ্যাকার এবং অপরার্দ্ধ ভুজঙ্গাকার, এইরূপ বর্ণিত আছে।

হেন, সাহসী কে হয় ?
অতিক্রম করি দ্বার, প্রবেশে ভিতরে তার,
সদা বহে বায়ু বিষময় ॥*
এই, গুহার নিকট ।
হলো চিতা-আয়োজন আবির্ভূত হুতাশন,
কালানলস্বরূপ বিকট ॥
পরি, বসন-ভূষণ ।
হইলেন উপনীত, রাখিতে কুলের হিত,
সহস্র সহস্র বামাগণ ॥
আগে, পদ্মিনী আসিয়া ।
সকলেরে সম্বোধিয়া, সুসাহস সংবর্দ্ধিয়া,
কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া ॥

সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহ বাক্য

এসো এসো সহচরীগণ,
এসো সহচরীগণ ।
হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়ে কেশ ।
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥
ওরে সখি আজ রে সুদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন ।
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম-ঋণ ॥
আজ অতি সুখের দিবস,
পাব সুখ-মোক্ষ যশ ॥
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস ।
পরিণয় প্রমোদ-উৎসবে,
ভেবে দেখ দেখি সবে ।
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে ?
সবে তবে ছিলে লো বালিকা,
যথা মুদিতা মালিকা ।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা ?
সকলেতে জেনেছ এখন,
পতি অতি প্রাণধন ।
যার জন্যে যুবতীর জীবন যৌবন ॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,
এই ছার কলেবরে ।
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে ?
বিশেষতঃ যবনের ঠাঁই,
কোনরূপে রক্ষা নাই ।
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই ॥
সতীত্ব সকল ধর্ম্ম সার,
যার পর নাই আর ।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার ॥
অতএব এসো লো সকলে,
গিয়ে প্রবেশি অনলে ।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে ॥
স্বর্গগত রাজপুত্র সবে,
প্রাণ ত্যজিয়া আহবে ।
বিহরিছে নিত্যধামে আনন্দ উৎসবে ॥
তোমাদের আসার আশায়
আছে চাতকের প্রায় ।
তোমরা জগতে রবে কার ভরসায় ?
সকলের পরীক্ষা হইবে,
ভাল ঘোষণা রহিবে ।
কে কেমন পতিব্রতা লোকেতে কহিবে ॥
এসো যাই অমর-নগরে
সবে আনন্দ অন্তরে ।
বিলম্ব উচিত নহে এসো লো সত্বরে ॥
এত বলি নৃপতিললনা,
পতিভক্তি পরায়ণা ।
দিবাকরে করে স্তব কুরঙ্গনয়না ॥

স্তোত্র

"জয় সুরপতি ভাস্কর !
সমুদয় সুখ-পুষ্কর !
ধরম-করম-রক্ষক !
সকল-চরিত-লক্ষক !

---

* বোধ হয়, গুহা-গুপ্ত গৃহমধ্যে কার্ব্বনিক এ্যাসিড গ্যাস নামক ক্ষারাম্ল প্রধান বাষ্প-বায়ুর আবির্ভাব থাকিবেক, তাহা প্রাণিমাত্রের প্রাণহারক, ইহা প্রসিদ্ধই আছে । টড কর্ণেল এতাবৎ আশঙ্কাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করেন নাই ।

কলুষ-কলস-ভেদক !
ভব-ভয়-চয়-ছেদক !
সুমতি-সুরক্তি-চালক !
সুবিনত জন-পালক !
তিমির-তুহিন-মোচন !
জয় জয় বিভুলোচন !
ফুল-ফল-দল-জীবন !
জলধর-তনু-সীবন !
খরতর-কর-বর্ত্তন !
জয়দ জয় বিকর্ত্তন !
উদয়-অচল-শোভন !
কমল-নলদ-লোভন !
নৃপকুল-চয়-আকর !
প্রণত পতিত, যা কর !
মুহি তুহ কুল কামিনী ।
হর মম দুখ-যামিনী ।"
পরে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করি,
পতি-পদাম্বুজ হৃদয়ে স্মরি ।
প্রবেশে প্রোজ্জল চিতা সাহসে নির্ভরি ॥
অস্তাচলে করিলে গমন,
যথা রোহিণী-রমণ ।
একে একে প্রভাতে অদৃশ্য তারাগণ ॥
সেইরূপ পদ্মিনীর পর
পুরবাসি-ললনানিকর ।
অনলে প্রবেশ করি ত্যজে কলেবর ॥
হলো অতি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
ভাবে শিহরে অন্তর ।
প্রচণ্ড দহন-শিখা পরশে অম্বর ॥
চট্ চট্ মহাশব্দময়,
ধূমপূর্ণ পুরীময় হয় ।
চন্দন-গুগ্‌গুলু-গন্ধে সমীরণ বয় ॥
রণস্থলে ভীমসিংহ রায়,
অগ্নি দেখিবারে পায় ।
জানিল পদ্মিনী সতী ত্যজিলেন কায় ॥
যেন নিষাদের খর শরে,
জরজর কলেবরে ।
মৃত্যুকালে কুরঙ্গ গরজে ঘোর-স্বরে ॥
তাহে যদি করে দরশন,
কুরঙ্গিনীর নিধন ।
বিষম বিক্রম মৃগ প্রকাশে তখন ॥
সেইরূপ মহারাণা ভীম,
হৃদে সন্তাপ অসীম ।
চরম সময়ে যুদ্ধ করে অতি-ভীম ॥
কত শত শত শত্রু পড়ে,
যেন প্রলয়ের ঝড়ে ।
পতিত অসংখ্য তরু স্খলিত শিকড়ে
অবশেষে শক্তিশূন্য কায়,
সিন্ধুছাড়া তিমি প্রায় ।
পড়িল বীরের চূড়া ভীমসিংহ রায় ।

চিতোরাধিকার

মুসলমান, বেগবান হয় যান, চাপে ।
অনুক্ষণ, নিয়োজন, প্রহরণ, চাপে ॥
কি উজ্জ্বল, ঝলমল, মুক্তাফল, তাজে ॥
কত ঝল্ল *, বীর মল্ল, হাতে ভল্ল, ভাঁজে ।
ফলকের, ঝলকের, আলোকের, ছাঁদ ॥
যেন জলে, সিন্ধুজলে, তারাদলে, চাঁদ ॥
কটাকট্, চট্‌চট্, পট্‌পট্ শব্দ ।
মার মার, শোর সার, চারি ধার, স্তব্ধ ॥
কাটিয়ারা, আসোয়ার, তরবার, হস্তে ।
টানিতেছে, হানিতেছে, আনিতেছে, দস্তে ॥
কেবাড়ের, ধারে ফের, দেওড়ের, ঝাঁক ।
তুড়্‌তুড়্, হুড়্ মুড়্, গুড়গুড়, ডাক ॥

* ইহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, রাজপুতনায় অদ্যাপি ঝালা নামে প্রসিদ্ধ। আলাউদ্দীন চিতোরাধিকার সময়ে সর্ব্বাগ্রে সেই ঝল্ল-বংশীয় ঝালোর-প্রদেশীয় রাজা মল্লদেবকে হস্তগত করিয়া চিতোরের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া যায় ।

† রাজপুতনার অন্তঃপাতী প্রদেশবিশেষ। উক্ত প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ ঘোটকগণ তন্নামেই খ্যাত হয় ॥

এক দিকে, মগুনিকে *, মারে ঝিঁকে, ধেয়ে।
দুড় দাড়, হুড় মাড়, পড়ে চাড়, পেয়ে ॥
চউচির, দেহড়ীর, খিড়কির, পাল্লা।
যত বলী, কুতূহলী, মুখে বলি, আল্লা ॥
ঢোকে গড় যেন ঝড়, দড় বড়, কোরে।
আঁখি লাল, সুবিশাল, কি কুলাল, ঘোরে ॥
সমুদয়, দেবালয়, করে লয়, রাগে।
ছাড়ে দেহ, ছাড়ি গেহ, নাহি কেহ, ভাগে ॥

নিহত নিকর শূর, পুড়িল চিতোর পুর,
হিন্দু-সূর্য্য অস্তগিরি-গত।
দাসত্ব দুর্জ্জয় ক্লেশ, রাজস্থানে † সমাবেশ,
তাপ-তমস্বিনী পরিণত ॥
যখন যবন আসি, সমর-তরঙ্গে ভাসি
পৃথুরাজে পরাভূত করে।
হিন্দুর প্রতাপ-লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে ॥
যথা ঘোর অমানিশা, তমঃপূর্ণ দশ দিশা,
আকাশে জলদ-আড়ম্বর।
মেঘহীন একদেশে, বিমল উজ্জ্বল বেশে,
দীপ্তি দেয় তারক সুন্দর ॥
অথবা তরঙ্গ-রঙ্গ, জলধির অঙ্গ-সঙ্গ,
স্রোতে হয় তৃণ তিনখান।
তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্টি হয়,
পরিক্লান্ত পোতপতি-প্রাণ ॥
বিপদ-বারণ-হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
প্রদীপ্ত আলোক শোভা পায়।
সেরূপ ভারতদেশে, স্বাধীনতা-সুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতানায় ॥
কি হইল হায় হায়! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিভিল সে আলোক উজ্জ্বল।

যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কতবার,
এই বার হইল সফল* ॥
চিতোরের অনুগত, সামন্ত ভূপতি যত,
একে একে স্বাধীনতা-চ্যুত।
সোলাঙ্কি প্রমরা হার, পুরীহর আদি আর,
শুদ্ধ বংশ কত রাজপুত ॥
কোথায় অবন্তী আর? কোথা দেব-গিরি ধার?
কোথায় মন্দোর হারাবতী?
আলাউদ্দীনের দণ্ড, করে সব লণ্ড-ভণ্ড,
কি বর্ণিব যে হলো দুর্গতি ॥
ভাঙ্গিয়া পাড়িল যত, দেবালয় শত শত,
শিল্প-চাতুরীর একশেষ।
লুটে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন,
ছত্র দণ্ড অস্ত্র রাজবেশ ॥
পোড়াইয়ে ছারখার, করিলেক ঘর দ্বার,
বাদশার আদেশে কেবল।
পদ্মিনীর মনোহর, অট্টালিকা পরিকর,
নষ্ট না করিল দুষ্টদল ॥
হের হে পথিক জন! অদ্যাপি সে সুশোভন,
অট্টালিকা আছে বর্ত্তমান।
সরসীর গর্ভ থেকে, নীরদে' মস্তক ঢেকে,
উঠিয়াছে পর্ব্বত প্রমাণ ॥

---

* দুর্গের প্রাচীর বা দ্বারাদি ভঞ্জন করণার্থ ঢেঁকি-কলের সদৃশ যন্ত্রবিশেষ, ইহাকে ইংরাজীতে 'ব্যাটেরিংরাম' কহে।

† রাজপুতানা দেশের নামান্তর।

* ইতিপূর্ব্বে মুসলমানেরা চিতোর অধিকার-করণার্থ বার বার উদ্যোগ পাইয়াও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে নাই।

† রাজপুতনা প্রদেশে রাজাট্টালিকার নাম 'বাদলমহল'। যেহেতু ঐ সকল প্রাসাদ পর্ব্বত শেখরোপরি নির্ম্মিত। বিশেষতঃ মেওয়ার অর্থাৎ মেরুদেশের পূর্ব্বরাজধানী চিতোর এবং আধুনিক রাজধানী উদয়পুরের রাজবাটী অত্যুচ্চ গিরি-চূড়ায় স্থাপিত। উদয়পুরের ভূপনিলয় দুই সহস্র পাদ উচ্চ শৈলোপরি প্রস্তুত, সুতরাং এই সকল নৃপনিকেতনকে "বাদল মহল" অর্থাৎ মেঘ মন্দির পদে বাচ্য করা অযথা নহে। সেই সকল মন্দির চূড়ায় সর্ব্বদাই মেঘাবিভাব হয়। ভারতবর্ষে এইরূপ শৈলশিখে রাজগৃহ নির্ম্মাণ করণের রীতি অতি পুরাতনী। মাহাত্মা মনু উক্ত প্রকারনিয়মে পুরী

কি হইল হায় হায়! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপূত রাজপুতগণ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন॥
কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম? ঘোর কালানল ধুম,
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার।
মুদিয়াছে হৃদপদ্ম, বীরত্ব মধুর সদ্ম,
নাহি তাহে শ্বাসের সঞ্চার॥
ধরাতলে লোটাইয়ে, নাসারন্ধ্র প্রসারিয়ে,
তুরঙ্গ পতিত শত শত।
বিস্ফারিত তবু তায়, শ্বাস নাহি আসে যায়,
চিবুকেতে রসনা নির্গত॥
ধুনিত কার্পাসপ্রায়, ফেনলালে শোভা পায়,
নবীন শ্যামল দূর্ব্বাদল।
মরকত বিজটায়, কিবা শোভে প্রতিভায়,
গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুক্তাফল॥
অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ-বিমুদিত নেত্রে পড়ি।
সে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া-প্রিয়তম,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি॥
যে অধর সুধাকর, হে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেয়সীর প্রিয়ধন।
সেই অধরেতে আসি, বায়সী স্বপেতে ভাসি,
চঞ্চে চঞ্চু করিছে যাতন॥
হত হিন্দু-নৃপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি,
যবনের শিবির-ভিতর।

নির্ম্মাণার্থ রাজাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন এবং শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে এইরূপ মেঘমন্দিরের নির্দ্দেশ আছে। প্রত্যুত, নির্ব্বিঘ্নতা এবং সুস্থতা কল্পে এবম্প্রকার স্থানে বাস করা যে অতি হিতকর তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এতদ্দেশে ইউরোপীয়েরা অসুস্থ হইলেই দার্জ্জিলিং বা সিমলা অথবা নীলগিরিতে প্রবাস করিতে যান। পদ্মিনীর প্রাসাদের প্রতিরূপ টড সাহেবের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, আমাদিগের নিতান্ত মানস ছিল, তাহা এই গ্রন্থে প্রদান করি, কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে সেই মানস পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

আনন্দজলধিপর, ভাসিলেক দিল্লীশ্বর,
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশে নগর॥
এই ভাবে গদগদ, "ধরি পদ্মিনীর পদ,
পরিহার লইব মাগিয়া।
যাতনা হইল দূর, লয়ে যাব দিল্লীপুর,
কত দুঃখ তাহার লাগিয়া॥
রূপসী পঙ্কজহ্রদ, এ পদ্মিনী কোকনদ,
তথায় মহিষীপদ লবে।
সর্ব্বোপরি যার স্থান, কমলা দেবীর * মান
এইবার লঘু কল্প হবে॥"
এইরূপ করি কল্প, প্রবেশি প্রধান তল্প,
পদ্মিনীর অন্বেষণ করে।
মহলে মহলে ধায়, কিছু না দেখিতে পায়,
গৃহ-সজ্জা আছে থরে থরে॥
জানি শেষ সমাচার, হতাশ হুতাশ সার,
ললাটেতে প্রহারয় পাণি।
বাষ্প বহে দুনয়নে, আত্ম-নিন্দা মনে মনে,
গুরু পাপে গুরুতর গ্লানি॥
যে মত দুর্ম্মতি হোক, পরদুঃখে গত শোক
কিন্তু কুকর্ম্মেতে নাহি পার।
কুকীর্ত্তি হইলে শেষ, মানসে উদয় ক্লেশ,
অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিধাতার॥
কহিল আমীরগণে, "জান দেখি সযতনে,
কে আছে ভীমের বংশে আর।
হইয়াছে যা হবার, অন্বেষণ কর তার।
সমুচিত শেষ প্রতীকার॥
করি তাহে লাল-বন্দী, পাতিয়ে প্রণয়-সন্ধি,
দিল্লীপুরে করিব প্রয়াণ।"
শাহের আদেশ পেয়ে, দূতচয় যায় ধেয়ে।
বিজয়ের করিতে সন্ধান॥

* ইনি গুজরাট-অধিপতির মহিষী ছিলেন। আলাউদ্দীন নেহারওয়ালা অধিকারপূর্ব্বক উক্ত ভূপতির অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে কুলকামিনীগণকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে। কমলা দেবী অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন, তজ্জন্য আলা তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করে এবং তদবধি হিন্দু নৃপ-ললনাগণ হরণে লোলুপ হয়।

খুঁজিল সকল স্থল, গিরি-গুহা শিলাতল,
ঝুরি ঝোপ বন উপবন।
না পাইল তত্ত্ব তার, শূন্যময় নৃপাগার,
ফিরে গেল সম্রাট-সদন॥
ওখানে বিজয় শূর, ত্যজিয়ে চিতোরপুর,
পিতৃ-শব সংগ্রহ করিয়া।
পুষ্করে সংকার করি, হৈল বীর দেশান্তরী,
ভীলবারা প্রদেশে যাইয়া॥
রাহুগ্রস্ত শশিপ্রায়, ম্লান মনে ফেরে রায়,
সঙ্গে লয়ে যত পরিবার।
কি বর্ণিব সে সকল, বাহুল্য বর্ণন ফল,
সিন্ধুসম সীমা নাই তার॥
যত সব রাজপুত্র, বীবত্ব ধীরত্ব সূত্র,
নৃপবংশ সমাজে প্রধান।
বলবীর্য্যে নাহি ভুল, যার ভয়ে অরিকুল,
চিরদিন ছিল কম্পমান॥
পরম পৌরুষ বল, সাহস স্থখের স্থল,
স্বাধীনতা আনন্দ আকর।
অগণিত অসম্ভব, গুণরত্নরাজি সব,
বিভূষিত যত বীরবর॥
তাহাদের কীর্ত্তিভাণ্ড, দিন দিন পরমাণু,
প্রায় হয় কালের দশনে।
বিনাশে নিস্তার পায়, আছে মাত্র সদুপায়,
কবিতার অমৃত-সিঞ্চনে॥
করাল কালের কাণ্ড, যেন সদা ক্রীড়া-ভাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার॥
সিংহাসন-অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেম-ছাতা,
ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহার।
তাহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ছন্নমতি,
মরণেতে তারো সে প্রকার॥
যে পথে মান্ধাতা গত, কোটি কোটি কত শত,
সেই পথে যায় দীনগণ।
মান্ধাতা, মনুর জন্য, নাহি আর পথ অন্য,
এক পথ আছে 'চিরন্তন॥
থাকে কিছু কীর্ত্তি-লেশ, নাম মাত্র থাকে শেষ,
সেহ শুদ্ধ কবির কল্যাণে।

কে জানিত যুধিষ্ঠিরে, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে॥
কোথায় মাহিষমতী, কোথা বা সে দ্বারাবতী
কোথায় হস্তিনা শৌরসেনী?
কোথায় কৌশাম্বী আর? কিবা চিহ্ন আছে তার?
বহে যথা তটিনীর শ্রেণী *॥
যেই পথে তারা গত, সেই পথে অবনত,
ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম।
পাতার কুটীর বলি, কভু কাল মহাবলী,
করে নাই স্বতন্ত্র নিয়ম॥
মধু মাসে মনোহর, সৌরভেতে ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা।
কিন্তু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে,
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মধুলোভা॥
কালের নাহিক বোধ, নাহি মানে উপরোধ,
বড় সুখে, বড় রূপে, বাদী।
সুখ-পুষ্প যথা ফুটে, অতি বেগে তথা ছুটে,
কটমট বিকট-নিনাদী॥
কিবা চারু রূপধর, কিবা বহু ধনেশ্বর,
কিবা যুবা নানা গুণধর।
কালের সুভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব,
পেলে হেন খাদ্য পরিকর॥
শোকে তাপে জরা যেই, তাহার বিপক্ষ নেই,
কাল তারে চিবায় সঘনে।
এমন নির্দয় আর, ত্রিজগতে মেলা ভার,
শিহরিত শরীর, স্মরণে॥
হারে রে নিসাদ কাল! এ কি তোর কর্ম্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভববনে?
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণকাল,
জালে বদ্ধ কর সেই ক্ষণে॥
ওরে ও কৃষক কাল! কি কর্ষিছে তব হাল,
জঞ্জাল-জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যত গাছ,
অনায়াসে উপাড়িয়ে যায়॥

* সম্প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, কৌশাম্বী পুরী প্রয়াগের নিকট 'করা' নামক স্থানে স্থাপিত ছিল।

সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ক শস্যচয়,
সে করে ছেদন সুসময় ।
তুই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্যচয় ॥
ধিক্ কাল কালামুখ ! ভারতের কোন সুখ,
না রাখিলে ভুবন-ভিতর ।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর,
সব খেয়ে ভরিলি উদর ॥
কি আছে এখন আর, দাসত্ব-শৃঙ্খল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে ।
দুর্ব্বল শরীর মন, ম্রিয়মাণ হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষ-মদে ॥
ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ তমঃ,
সদাচ্ছন্ন মানব-নয়নে ।
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ-বারিদদল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥
যশোরূপ ইন্দ্রধনু, অসার তাহায় জনু,
তনু তনু হয় প্রতি পলে ।
কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বাসা,
অচিরাৎ ভস্ম কালানলে ॥
সুখ দুঃখ বলাবল, প্রভুত্ব দাসত্ব বল,
কালচক্রে ঘুরিতেছে সদা ।
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে, কভু আগে কভু পিছে,
এই ভাব দেখ যদা তদা ॥
ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥
শান্তির সরসী-মাঝে, সুখ-সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে ॥
হে বিভো করুণাময় ! বিদ্রোহ বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে ॥
শুন হে পথিকবর ! সাঙ্গ হলো অতঃপর,
মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান ।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্য-সুধা,
এইরূপ হৃদে ধরি ধ্যান ॥

———

কর্ম্মদেবী

[রাজস্থানীয় সতী বিশেষের চরিত্র
বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুকীর্ত্তিত]

(পাঠ—প্রথম সংস্করণ—১৮৬২)

মঙ্গলাচরণ

পরম-প্রেমাস্পদ-বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মদনুকূলবরেষু—

প্রিয় মিত্র !

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার উপায়ন-স্বরূপ পদ্মিনী-উপাখ্যান এক সদাশয়ের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এইক্ষণে প্রণয়-ঋণের কুসীদবৃদ্ধি-স্বরূপে কর্ম্মদেবীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিলাম ; আপনি সাধু উত্তমর্ণ, সুতরাং অবশ্যই প্রসন্নচিত্তে এই কুসীদবৃদ্ধি স্বীকার করিবেন এমন ভরসা হইতেছে।

দামুরহুদা
৩০শে আষাঢ়,
১২৬৯ বঙ্গাব্দা

ভবদেকপ্রণয়ানুরাগী
শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

পদ্মিনী-উপাখ্যানের শেষ এই প্রতিজ্ঞা ছিল ;

"শুন হে পথিকবর, সাঙ্গ হলো অতঃপর, মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্যসুধা, এইরূপ হৃদে ধরি ধ্যান ॥"

এক্ষণে পরম আহ্লাদ-সহকারে বক্তব্য এই যে, যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্য-কুসুম বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি পদ্মিনী-প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয়-মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভামিতা বিমলানন্দর দায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে ; কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু, যাঁহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ণ করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে। ভাষা সালঙ্কৃত এবং বহুলীকৃত-করণার্থ কবিতার ন্যায় গদ্যের উপযোগিতা নাই ; অতএব সম্প্রতি বিশুদ্ধ গদ্যগ্রন্থ লিখনের যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে, সেইরূপ সৎ-কবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরন্তু কাব্যোপযুক্ত বিষয় কবিতাতেই গ্রথিত করা বিধেয়, পুরাবৃত্ত এবং ধর্ম্মনীতি তথা বিজ্ঞান-বিদ্যা ঘটিত পুস্তক সকল গদ্যে লিখনের প্রয়োজন ; কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের কখন কখন ব্যত্যয় জন্মিতেছে, এতদ্দর্শনের সহৃদয়বর্গ সন্তুষ্ট নহেন ; তথাপি সৎকাব্যের যে দিন দিন সমাদর-বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, অতএব কর্ম্মদেবী স্বীয় অগ্রজা পদ্মিনীর ন্যায় সাধারণের কিয়ৎ অনুগ্রহের পাত্রী হইবেন এমত বিশ্বাস হইতেছে।

প্রস্তাবাবসানে ইহাও বক্তব্য, আমি রাজকার্য্যে দূরস্থানে নিযুক্ত থাকাতে মুদ্রাঙ্কন-কালে স্থানে স্থানে লিপি-প্রমাদ হইয়াছে, তদ্দোষ-উপশমনার্থ পাঠকগণের করুণা-গুণের শরণ লইলাম, ইতি।

সূচনা

পদ্মিনী প্রবন্ধ-সুধা, পথিক সুজন,
শ্রুতিপথে পান কার পরিতৃপ্ত মন।
গুণ-গরীয়ান্ গণ্য গায়ক যেমন,
গাইলে বীণার তানে মধুর গাথন,
ফুরায়ে গিয়াছে গীত- তবু জ্ঞান হয়,
শ্রবণ-বিবরে বাজে গান সুধাময়,
সেইমত পথিকের হইল বিভ্রম,
শ্রুতিভরা পদ্মিনীর কথা মনোরম।
পদ্মিনী-সতীত্ব-কথা অপূর্ব্ব আখ্যান,
ভাবুক রহিল হৃদে ধরি সেই ধ্যান।
পদ্মিনীর শেষদশা করিয়া স্মরণ,
পথিকের বাহ্যজ্ঞান হইল হরণ।
ভাবভরে কেঁপে উঠে মানসকমল,
প্রভাত-সমীরে যথা ফুল্ল-শতদল!
নয়ন-যুগলে অশ্রু বিন্দু বিন্দু ক্ষরে,
নিশির শিশির কণা যেন ইন্দীবরে।
নিরখি সাত্ত্বিক ভাব, কথক ব্রাহ্মণ,
কহিছেন পথিকেরে করি সম্বোধন—
"উঠ হে পথিকবর ভাবুক-প্রবর,
ভাব-নিদ্রা হর, বেলা তৃতীয় প্রহর।
অই দেখ গোধন-মাহিষ-মেষদলে।
ছায়া হেতু দলে দলে তরুতলে চলে।
গোষ্ঠত্যজি হাম্বারবে উচ্চে পুচ্ছ তুলে,
সমাকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষ-মূলে।
প্রখর ভাস্বর করে প্রবল পিপাসা,
পাণি পাতি প্রবাহের পয় পিয়ে চাষা।
মেদিনীর মৌনব্রত স্তব্ধ সমুদয়,
কেবল সমীর ধীর, ধীরে ধীরে বয়;—
কেবল মরালদল করি মন্দকল,
সন্তরে বিহরে যথা বিকচ কমল;—
কেবল বিটপী-বটে বসন্ত-বিহগ
আলাপিছে মৃদুতান সহ নানা খগ;—
কেবল নির্ঝরে ধ্বনি কল কল কল,
উগরিছে কত শত কোটি মুক্তাফল।
অই দেখ ঘাই মেরে সরসী-হৃদয়ে,
মীনচয় মগ্ন হয় নিজ দল লয়ে।
বিগত তৃতীয় যাম পদ্মিনী কথনে,
এস এস হে সুজন মম নিকেতনে।
আতিথ্য গ্রহণ আর বিশ্রাম অন্তরে,
পরিচয় আদান-প্রদান পরস্পরে।"
স্নান করি সরসীতে স্নিগ্ধতনুমন,
আশ্রমেতে চলিলেন বন্ধু দুই জন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লশা বিশ্রামেতে বিলসিত,
নানাবিধ ইষ্টালাপে হয়ে হরষিত,
জিজ্ঞাসেন পথিক—"বল হে, কৃপাকর!
মরুদেশে* আছে এক রম্য সরোবর,
কর্ম্ম-সরোবর নাম পুণ্যতীর্থ স্থল,—
অদূরে মণ্ডপ এক ধবল উজ্জ্বল,—
অপূর্ব্ব উপলময়ী প্রমদা-প্রতিমা,
মণ্ডপ-মাঝারে শোভে, রূপে নাহি সীমা।
শুনিলাম কর্ম্মদেবী নৃপনন্দিনীর
পাষাণ-প্রতিমা সেই, শোভিত রুচির;
কেবা সেই কর্ম্মদেবী কিবা কথা তাঁর?
কেন সে স্থাপিতা মূর্ত্তি অপ্সরা-আকার?
কেন কর্ম্ম-সরোবর সরসীর নাম?
বিশেষিয়া পূর্ব্বকথা কহ গুণধাম।"
শুনি কর্ম্মদেবী নাম, ভূদেব-নয়নে,
গজমুক্তাকার অশ্রু উদয় সঘনে,—

* আধুনিক নাম মারবার

উদয় হইবামাত্র ঘনীভূত হয়,
যথা নীহারের বিন্দু হেমন্ত সময়।
মানস সরসী-জলে জলজের দলে
হিমানী আকার ধরে পতি পলে পলে।
চকিত স্থগিত নেত্রে গদগদ স্বরে
কহিছেন সম্বোধিয়া ভাবুক প্রবরে।
"শুনিবে কি হে সুজন, কর্ম্মদেবী কথা?
বিবরিব অনুপূর্ব্ব শ্রুত আছে যথা।
সতীত্ব-সাধ্বীত্ব গুণে বরণীয় অতি,
পদ্মিনীর সমতুল্য হন সেই সতী।
অদ্যাপি তাঁহার গুণ এই রাজস্থানে,
গৃহে গৃহে গীত হয়, শারঙ্গীর তানে।
আন রে মধুর যন্ত্র শারঙ্গী আমার,
বহুদিন করি নাই আলাপ তাহার।
বহু দিন নাগদন্তে ঝুলান রয়েছে,
যন্ত্রি-অনাদরে যন্ত্র অতন্ত্র হয়েছে।"
আজ্ঞামাত্র শারঙ্গ যোগায় পরিচর,
মিলায়ে মূর্চ্ছনা মার্গ, দ্বিজ গুণাকর
আরম্ভিলা সন্ধ্যারাগে কর্ম্মদেবী-কথা।
প্রদোষেতে পদ্মকোলে ভৃঙ্গনাদ যথা॥

প্রথম সর্গ

যশল্মীর-অন্তঃপাতী, দেশেছিল ভট্টিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তার।
পুগল দেশের নাম, তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধুনামা, বিক্রম-আধার॥
মহা পরাক্রান্ত বীর, কভু নহে নতশির,
প্রতাপেতে প্রখর তপন।
সঙ্গে সব সহচর, শূরবীর পরিকর,
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ॥
হঠ-ধর্ম্মে হর্ষ অতি, হঠ্ হঠ্ সদাগতি,
সদাগতি পরাভূত তায়।
দড় বড় দড় বড়, অশ্বচালনায় দড়,
ছোট বড় জানা নাহি যায়॥
হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ,
পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয়।
ধনিক বণিকগণ, ভীত-চিত অনুক্ষণ,
কখন আসিয়া লুটে লয়॥
বাল বৃদ্ধ-বনিতারে, সদা তোষে সদাচারে,
যথা সমাদরে রক্ষা করে।
কিন্তু মিলে সমযোগ্য, সমররসের ভোগ্য,
একেবারে ভীমবেশ ধরে॥
বিশেষ যবন প্রতি, সরোষ আক্রোশ অতি,
জ্বলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে।
লাফ দিয়ে চড়ে ঘাড়ে ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শতখণ্ড করে তরবারে॥
পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুপদী, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী,
সাধুর শূরত্ব অধিকার।
বিনশন * মহাটবী, যথা খর রবি-ছবি,
মরীচিকা করে আবিষ্কার॥
ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ,
নাহি ছায়া নাহি তরু লতা।
দূর থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সঙ্গতা॥
তটে পুষ্প-উপবন, শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে দান।
শ্রান্ত-পান্থ চিত্তহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভাস্কর এ ভাণ॥
ধন্য সে নন্দিনী তাঁর, মরীচিকা নাম যার,
মিথ্যায় সত্যের দেয় বোধ।
এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, এ জগতে করি সৃষ্টি,
মহামোহ জ্ঞান করে রোধ॥
সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ।

* কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমান্তরাল।

মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন ॥
পাঁচ হাতিয়ার ধরা, আপাদ মস্তকপরা,
অয়স রচিত পরিচ্ছদ।
সুশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় ঝন্-ঝন্,
ঝক্ মক্ ঝলক বিশদ ॥
শীতল কঠোর ধর্ম্ম, অসিচর্ম্ম আর বর্ম্ম,
সাজ সজ্জা তাহাই সকল।
ঢালেতে রাখিয়ে শির, নিদ্রা যেত যত বীর,
কিছুমাত্র না হয়ে বিকল ॥
সেই ঢালে পিত জল, সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢালে ভোজন-ভাজন।
কটিতটে চন্দ্রহাস, * চন্দ্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন ॥
দিবানিশি এক সাজ, খড়্গপ্রেত এক কায,
অস্ত্র শস্ত্র তিলেক না ছাড়ে।
বীর-রসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন,
উগ্রতা অনল হাড়ে হাড়ে ॥
এত যে উগ্রতা রস, কিন্তু কামিনীর বশ,
শিব যথা শৈলজার প্রতি।
অবলার অনুরাগ, অন্তরে সোহাগ যাগ,
সতীর সেবায় রতি মতি ॥
যথা শিলা-সন্নিধান, বিতরে মধুর ঘ্রাণ,
বিকশিয়ে কাশ্মীরী কুসুম।
কঠোর শিলার ধর্ম্ম, কঠোর তাহার মর্ম্ম,
কিন্তু তাহে জনমে কুঙ্কুম ॥
সতীর সেবায় মন, প্রাণপণ আকিঞ্চন,
সতীর সম্মান রক্ষা হেতু।
অপবিত্র ভাবহীন, কুরস-বাসনা লীন,
সভয়ে পালায় মীনকেতু ॥
সরল অখল সবে, ভাসমান প্রেমার্ণবে,
সখ্যভাবে সুখে কাল হরে।
মৃগয়া আখেট বনে, দ্বন্দ্বে মন্দ লোক সনে,
কালান্তের কালমূর্ত্তি ধরে ॥
কারু প্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে।

* তরবারি বিশেষ।

অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে ॥
হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্য হীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম ॥
সব পুরুষার্থ শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত ॥
নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণধনে ঘোর অভিমানী ॥
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন প্রসূন!
কবে পুনঃ বীর-রসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ?
আর কি সে দিন হবে, একতার সূত্রে সবে,
বদ্ধ রবে মননে বচনে?
পূজিবে সত্যের মূর্ত্তি, প্রণয় পাইবে স্ফূর্ত্তি,
সুখদ সরল আচরণে?

কিবা অপরূপ, নিরখি অনুপ,
সাধুর সদলে গতি।
প্রসারিত বুক, প্রমোদ কৌতুক,
সকলে প্রসন্নমতি ॥
কিবা তড়-বড়, বহে যেন ঝড়,
তুরগের পদধ্বনি।
ঝক্ মক্ ঝক্, আয়ুধ ঝলক,
জ্বলে যেন দিনমণি ॥
ঝম্ ঝন্ ঝন্, ঝনন্ ঝনন্,
ঘুঁঘুঁর ঘোড়ার গলে।
হয় চয় সাজে, নানা নিধি সাজে,
কিবা শোভা শিরনলে ॥
হেলিছে টোপর, মাথার উপর,
শ্বেত-মেঘমালা যেন।

কিবা নদী-কোলে, পবন হিল্লোলে,
খেলিয়া বেড়ায় যেন ॥
সব শির উচ্চ, গালে গাল-মুচ্ছ,
যেন দুই মেঘ পশি।
ললাট-ফলকে অগুরু তিলকে,
বিলেখিত আধ শশী ॥
লোহিত কমল, নয়ন-যুগল,
অলি তাহে দুটি তারা।
চপল ভ্রূভঙ্গী, হয়ে অঙ্গ-অঙ্গি,
যুগল খঞ্জন-ধারা ॥
লুকিতেছে ভল্ল, যত সব মল্ল,
নিরখিতে ভয়ঙ্কর।
ঝাঁপানিয়া ঢাল, বিষম করাল,
পিঠে ঝুলে নিরন্তর ॥
পাদুকায় আঁটা, খরধার কাঁটা,
অশ্বের পঞ্জরে মারে।
বেগে বাড়ে তায়, বায়ু সম ধায়,
শ্রবণ-যুগল সারে ॥
এইরূপ সাজে, অরণ্যের মাঝে,
সাধুর সদলে গতি।
শিহরিত কায়, পলাইয়ে যায়,
মৃগপতি যূথপতি ॥
শুনিতে পাইল, যবন আইল,
বিপাশা-তটিনী-তটে।
কাফিলা কাফিলা, ছাউনী ছাইলা,
জালন্ধর সন্নিকটে ॥
কত উপহার, প্রকার প্রকার,
সাজান হাজার উটে।
মেবা নানা জাতি, বস্ত্র ভাতি ভাতি,
সুরভি স্বর্ণ পুটে ॥
কিবা মধুরিম, বেদানা দাড়িম,
দেবের দুর্লভ ফল।
নয়ন-রঞ্জন, বীজের বরণ,
পদ্মরাগ অবিকল ॥
তনু বিদারিত, ঈষৎ স্ফারিত,
বীজের বিমল রেখা।
যেন কামিনীর, দশন রুচির,
মৃদু হাসে দেয় দেখা ॥

কিবা অপরূপ, নাহিক স্বরূপ,
মধুর আঙ্গুর ফল।
অতি মনোহরা, সুধা দেহভরা,
দেখা যায় সুবিমল ॥
ছার গজমতি, নাহি তাহে রতি,
দ্রাক্ষা গুণে বলিহারি।
পারসে কি রস, বেড়ি দিগ্‌দশ,
শোভা পায় সারি সারি ॥
কিবা বারি-ধারা, মুকুতার ঝারা,
কানন ছাইয়ে রয়।
মুখে তুলে লয়, যদি মনে হয়,
ক্ষুধিত কৃষক-চয় ॥
ধন্য দ্রাক্ষালতা, তব মধুরতা,
মধুরা সুরা জননী।
প্রসবিয়া কত, মধু নানা মত,
মাতাইলে এ অবনী ॥
কিবা সেই ফল, অমৃতে বিহ্বল,
অমৃতাহ্ব * যার নাম।
সেব পারসীক, রসে সুরসিক,
পরম পুলক-ধাম ॥
দেখিতে সুন্দর, ফুল্ল কলেবর,
কাঞ্চনে সিন্দুর-শোভা।
যেন মনোহর, চারু পয়োধর,
যুবাজন-মনোলোভা ॥
কিবা সে বাদাম, তার কিবা দাম,
রূপসী নখর দাম।
শ্বেত সমুজ্জ্বল, শস্য সুবিমল,
বল আর বীর্য্য ধাম ॥
খুবানী খর্জ্জুর, আঞ্জীর মধুর,
চেল্‌গোজা আখরোট।
এইরূপ কত, মেবা নানামত,
আনিয়াছে মোট মোট ॥
চোগা জেগা টোপ, জরীকষ খোপ,
পায়তাবা দশতানা।
জুব্বা গলুবন্দ, শাল মস্‌নন্দ,
শালের বিছানা নানা ॥

* সেব ফলের সংস্কৃত নাম।

ধন্য সেই পশু, জন্মে যাহে বস্ত্র,
লোম যার হেম-প্রসূ।
গিরি হিমবতে, ভোটান্ত তিব্বতে,
অনেক লোকের অসু॥
ধন্য সেই ছাগ, কাশ্মীরেস্বরাগ,
তথা সুখে কাল হরে।
এ দেশের অজা, যত ধর্ম্মধ্বজা,
বলিতে নিয়োগ করে॥
ধোসা খেস পটু, শীতনাশে পটু,
বনাৎ বিবিধ মত।
দুঃখীর সম্বল, সুলভ কম্বল,
খোদাবন্দ নিয়ামৎ॥
আনিয়াছে বাজী, তুর্কী আর তাজী,
সিরাজী সৈন্ধব * সেরা।
বিপাশার ধারে, হাজারে হাজারে,
আসিয়ে পড়িল ডেরা॥
সাধু সহ গণে, সংবাদ শ্রবণে,
হরষিত মনে অতি।
চলিল সত্বর, পবন-সোসর,
দিবানিশি করে গতি॥
পহুছিয়া আর, সময়-বিচার,
তিলেক নাহিক করে।
দাবানল-প্রায়, ঘেরে কাফিলায়,
রজনী দুই প্রহরে॥
হল্যো হতভম্ব, ভেবে নিরালম্ব,
মোগল বণিক্-চয়।
করে আঁকু বাঁকু, "গেরা গেরা ডাকু,"
আর আল্লা আল্লা কয়॥
আছিল গোঁয়ার, কতক সোয়ার,
উঠে তারা তেড়ে ফুঁড়ে।
হয়ে ক্রোধান্বিত, সাধুর সহিত,
রণ-রঙ্গ দিল যুড়ে॥
ভয়াল আহব, করে কলরব,
যত সব সরদার।
"মার মার মার, হোঁ হুঁসিয়ার,
খবর্দার্ খবর্দার্॥"

চোপ চোপ চোপ, তরবার কোপ,
ঝপ্ ঝপ্ ঝাঁপে ঢাল।
কাটিলে গর্দ্দানী, কোথায় মর্দ্দানী,
দেখিতে অতি করাল॥
জ্ঞান-শূন্য ধড়ে, কেহ ভূমে পড়ে,
কর পদ কারু কাটা।
কেহ ঊর্দ্ধ-নেত্রে, পড়ে রণ-ক্ষেত্রে,
কাটা ললাটের পাটা॥
কারু মুখ খোলা চক্ষু দুই ঘোলা,
প্রকাশিত দন্তপাঁতি।
দেখা যায় মাড়ি, রুধিরাক্ত দাড়ি,
ছাইয়ে পড়িছে ছাতি॥
দেউটী রোসন, দেখিতে ভীষণ,
জ্বালায় কানাৎ তাঁবু।
কিছুক্ষণ পরে, অন্যায় সমরে,
যবন হইল কাবু॥
কঠিন রসায়, বন্ধন দশায়,
পড়িল কএকজন।
সাধুর সদনে, প্রণত-বদনে,
করিতেছে নিবেদন॥

"কেন হে এমন কাজ কর যুবরাজ?
অযশ ঘুষিবে তব ধরণী-সমাজ॥
আমরা বণিক্ জাতি বাণিজ্য ব্যবসা।
জগতের হিত-ব্রতে ভাগ্যের ভরসা॥
যথায় বিরাজে শান্তি সুখ-সিংহাসনে।
তথায় বণিক্ যায় ধন-অন্বেষণে॥
সেই দেশে কমলার শুভদৃষ্টি হয়।
মান কিনা এই কথা হিন্দু মহাশয়?
হিন্দুস্থান শান্তি-স্থান সংবাদ-শ্রবণে।
এস্যেছি তোমার দেশে বাণিজ্য কারণে॥
সুখে বাণিজ্যে হয় দেশের উন্নতি।
বণিকের ধনবৃদ্ধি তাহার সংহতি॥
দেখিতেছ আনিয়াছি ঘোড়া আর উট।
এ সকল নহে দেশ করিবারে লুট॥
মানসেতে নাই কিছু অনিষ্টের আশা।
দ্রব্য দিব, অর্থ লব, এই জন্য আসা॥

* সিন্ধুদেশ-জাত ঘোড়া

ইথে অপরাধ কিবা কহ রাজসুত।
ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি নানা গুণযুত ॥
বিবেচনা কর সাধু, সাধু নাম ধর।
কেন হে গর্হিত হেন আচরণ কর ?"
উত্তরে কহিছে সাধু, "শুন হে পাঠান!
মানিলাম যা বলিলে সব সপ্রমাণ ॥
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী শাস্ত্রের লিখন।
সকল দেশের তায় উন্নতি সাধন ॥
ক্রেতা-বিক্রেতার সুখ, বাণিজ্যের ফল।
বাণিজ্য রাজ্যের শক্তি, সাধ্য আর বল ॥
কি কারণে এ হেন বাণিজ্য-সুখ সেতু।
অবরোধ করি আমি, শুন তার-হেতু ॥
পূর্ব্বে এই পুণ্যভূমি বাণিজ্যের ধনে।
ধনবতী হয়েছিল, বিখ্যাত ভুবনে ॥
দিগ্ দিগন্তর হতে বাহিয়া সাগর।
এ দেশে আসিত কত বণিক-নিকর ॥
বাণিজ্য-সামগ্রী নানা ল'য়ে যেত দেশে।
ভারতের ধনবৃদ্ধি হ'ত্যো সবিশেষে ॥
এক এক নগরের কত ছিল ধন।
অদ্যাপি না নয় তার সংখ্যা নিরূপণ ॥
একা কান্যকুব্জপুরে, অপূর্ব্ব আখ্যান।
বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান ॥
সুবর্ণ-কলস-পাত্র আগারে আগারে।
দেবালয়ে রত্নরাশি ছিল স্তূপাকারে ॥
সোমনাথ মধুপুরী আর কালিঞ্জরে।
নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঞ্জরে পঞ্জরে ॥
কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন ?
কে হরিল সে সকল কুবেরের ধন ?
কে করিল পুণ্য ভূমি দুঃখেতে নিক্ষেপ ?
কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ ?
অনুপমা ভারতের পতিব্রতাগণ।
কে করিল তাহাদের মর্য্যাদা হরণ ?
কে করিল নগর নিকর শোভা নাশ ?
তোমরা জান না কি হে সেই ইতিহাস ?
যেই দুষ্ট দুরাশয় হরিল এ সব।
তোমরা তাহার জাতি, জ্ঞাতি, গোত্রভব ॥
হাজার মঙ্গলাব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি ॥

এরূপ বাণিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
করিলেক প্রভুত্ব-স্থাপন নানাদেশে ॥
অতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি ?
দুর্গতির প্রতিফল, স্বরূপ দুর্গতি ॥
কি ছার বাণিজ্য-দ্রব্য এ দেশে এনেছ ?
তোমাদের দেশ বড় উর্ব্বর জেনেছ ?
জান না ভারত-ভূমি লক্ষ্মীর আবাস ?
কত শস্য জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস ?
কোন্ 'মেবা' নাহি জন্মে ইহার ভিতর ?
কয়্যে এস্যো হিমালয়ে নয়নগোচর ॥
ঈরাণেতে যত 'মেবা' জনমিয়া থাকে।
এ দেশের কত স্থানে কত বৃক্ষে পাকে ॥
তা ভিন্ন অনেক 'মেবা' হেনরূপ আছে।
এ দেশ ব্যতীত আর কোথা নাহি বাঁচে ॥
রসাল রসাল ফল, কিবা তুল্য তার ?
সিন্ধু-মথা সুধা চেয়ে মিষ্ট তার তার ॥
আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
কারণ সলিলে পূর্ণ তাহার উদর ॥
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর ?
পান মাত্র তৃষিতের যুড়ায় শরীর ॥
কিবা শস্য সুমধুর আহ্লাদে উল্লাস।
পথিকের শ্রান্তি ক্লান্তি-ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ ॥
আর এক ফল আছে, নাম আনারস।
নন্দন-কানন থেকে বুঝি আনা রস * ॥
নন্দনপতির ন্যায় সহস্রলোচন।
উদ্যান উজ্জ্বল করে কাঞ্চন-বরণ ॥
শিরেতে পল্লব-গুচ্ছ পুচ্ছের আকার।
হেমময় কিরীট কাননে অবতার ॥
অপূর্ব্ব সৌরভামোদে মেতে উঠে মন।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যুটে মধুকরগণ ॥
বিফলে ছুটিয়ে আসা, বিফল সে যোটা।
অলির অসাধ্য খেতে রস এক ফোঁটা ॥
যথা কৃপণের ধনে, যাচক বঞ্চিত।
গতায়াত সার, লাভ না হয় কিঞ্চিৎ ॥
এই রূপ, কত রূপ, এ দেশের ফল।
বিশেষিয়া বাহুল্য বর্ণন সে সকল ॥
আনিয়াছ রঞ্জন, সুগন্ধ, সঙ্গে যাহা।
এ দেশের দুর্ল্লভ কিছুই নহে তাহা ॥

* বিনা চেষ্টায়। দ্র. তুলনীয়—ঈশ্বর গুপ্ত।

ঢাকা কাশ্মীরের তন্ত্রে, কি শিল্প-চাতুরী।
অপরূপ শোভাগুণে মন করে চুরি॥
এই দেশে কুঙ্কুম, কস্তুরী মৃগমদ!
এই দেশে কালাগুরু, চন্দন বিষদ॥
এই দেশে মল্লিকা, যূথিকা, আর জাতি।
এই দেশে মালতী, শ্বেবতী নানা ভাতি।
এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল।
জয়িত্রী, কর্পূর, চুয়া, পুগ আদি ফল॥
এরূপ অনেক দ্রব্য জনমে এ দেশে।
পূর্ব্ব-পয়োধির দ্বীপমালায় বিশেষে॥
আমোদে আমোদ পেয়ে প্রভাত-পবনে।
হাস্যোদয় হয় বৃদ্ধ-বারিধি-বদনে॥
সেই সব অপূর্ব্ব সুগন্ধ দ্রব্য চয়।
ভারতের নানা হাটে স্তূপে স্তূপে রয়॥
ভারতে না জন্মে যাহা, না জন্মে জগতে।
জগতে সর্ব্বত্র ইহা খ্যাত ভালমতে॥
এই দেশে এত বিধ দ্রব্যের প্রকাশ।
এই দেশে এতবিধ লোকের নিবাস॥
অন্য দেশে গতি বিধি প্রয়োজন নাই।
স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই॥
লয়ে যাও যত পার পেস্তা আখ্‌রোট।
লয়ে যাও বেদানা দাড়িম মোট মোট॥
পেয়েছি উত্তম অশ্ব, উষ্ট্র সারি সারি।
ইহারা আমার পক্ষে হবে উপকারী॥
এ চেয়ে অনেক ধন অমূল্য রতন।
তোমরা দেশ থেকে করেছ হরণ॥
লহ এক এক অশ্ব এক এক জন।
দ্রুতবেগে সিন্ধু পারে কর পলায়ন॥
ধন আশে পুনঃ আর এস না এ দেশে।
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে॥"
এত বলি অশ্ব দিয়ে করিল বিদায়।
সেলাম করিয়ে পদে পাঠান পলায়॥
রজনী প্রভাত হৈল বিপাশার তীরে।
রাজপুত্র স্নান পূজা করে তার নীরে॥
হর হর বম্ বম্ শব্দ সুগভীর।
অন্তরে বহন করে প্রভাত সমীর॥
স্নান পরে ক্ষুধা তৃষ্ণা করি নিবারণ।
তুরঙ্গে উঠিয়ে সবে করিল গমন॥

মধ্যাহ্নের উপযোগ আতিথ্যে নির্ভর।
গৃহস্থ পরম যত্নে করে সমাদর॥
একদা ঔরিণ্ট-পুরে করিল প্রবেশ।
যথায় নিবসে ক্ষত্রি-কেশরী-বিশেষ॥
বলবন্ত সুধীর মাণিক-দেব রায়।
বহু-জনাশ্রয়, খ্যাতি রাজ-পুতনায়॥
গোহিল-কুলের পতি, কুলধর্ম্মে রতি।
প্রকৃতি প্রশান্ত, দান্ত, সুনির্ম্মল মতি॥
শুনামাত্র স্বীয়পুরে সাধুর আগতি।
আনিতে তাঁহাকে যান স্বদল সংহতি॥
বাজিল মঙ্গল বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে।
মঙ্গলাচরণ গীত হয় বামা-স্বরে॥
বাঁধিল বন্দনবার ত্রিপোলিয়া দ্বারে।
রচিল রচনা তাহে নানা ফুলহারে॥
আরোপিল আম্র-শাখা সুবর্ণ কলসে।
মারিল পথের ধূলা চন্দনের রসে॥
প্রতি গৃহশিখরে পতাকা বিরাজিত।
সিতাসিত লোহিত হরিত নীল পীত॥
যেমনি ঢুকিল সাধু নগর ভিতরে।
অমনি রমণীগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
আগ-বাড়াইয়া গিয়া ঔরিণ্ট-ঈশ্বর।
সমাদরে স্নেহভরে লয়ে যান ঘর॥
প্রণাম করিল সাধু তাঁহার চরণে।
মাণিক্য তোষেণ তাঁরে প্রেম-আলিঙ্গনে॥
শিরোঘ্রাণ লয়ে মুখ চুম্বন অন্তরে।
দেহ-গেহ-কুশল জিজ্ঞাসা পরস্পরে॥
হায় কোথা সে সকল সরল আচার!
এখন এ দেশে নাই সে সব ব্যাভার॥
প্রেম, ভক্তি, স্নেহ আর শীলতা, ভব্যতা।
এ জগতে এই সব প্রকৃত সভ্যতা॥
কর পরশন, আলিঙ্গন, সুসম্ভাষ।
ইহাতেই হৃদয়ের স্বভাব প্রকাশ॥
ইথে নাহি প্রত্যবায়, নাই কিছু ব্যয়।
এ সকল শিষ্টাচার কি হেতু বিলয়?
একে বারে সদ্ভাব অভাব হিন্দুস্থানে।
জাতি, জ্ঞাতি, বন্ধু বলি কে কাহারে মানে?
স্বল্প-ধন-অভিমানে ফুলে উঠে কায়।
কেবা ছোট কেবা বড় জানা নাহি যায়॥

"আর সবে ছোট হোক, আমি হই বড়।"
এই মিথ্যা মান-মন্ত্র পানে সবে দড় ॥
রসনা রসের স্থান অতি সুকোমল।
নাহি তাহে অস্থি, এ কি সামান্য কৌশল?
ঈশ্বরের অভিপ্রেত ইহাতে প্রকাশ।
অস্থিশূন্য জিহ্বা অতি-লালিত্য-নিবাস ॥
সে রসনা হইয়াছে পারুষ্য আলয়।
বিবেকের অনুবর্ত্তী রসনা না হয় ॥
কিবা মিত্র, কিবা ভৃত্য, বন্ধু, পরিজন।
ধন-সত্ত্বে কিছুতেই না পায় চেতন'।
জ্ঞান ধনে ধনী যেই সে হয় পাগল।
সেই লোক যে বকে অনর্থ অনর্গল ॥
সেই প্রিয় মিথ্যা-স্তবে তুষিতে যে পারে।
সেই দুষ্ট, যেই তাহা সহিবারে হারে ॥
সেই ঘৃণ্য, যে কহে বচন সাদা সিধা।
সেই পূজ্য, যার মনে শঠতা বিবিধা ॥
যার আছে টাকা, তার আগে পূজা কর।
আতর গোলাবে তার কলেবর ভর ॥
যার নাই টাকা, জ্ঞান-ধনে যেই ধনী।
স্মরণ যাহার বুদ্ধি, বল, রত্নমণি।
সে অতি অগ্রাহ্য, কিবা তার উপরোধ?
তার ভাগ্যে কেবল ভর্ৎসনা আর ক্রোধ ॥
তার উক্তি তার যুক্তি মূল্য যার নাই।
দম্ভবলে বলে বলী "কিছু নাই চাই ॥
নাহি বিভু বিশ্বেশ্বর, নাহি পাপ-পুণ্য।
এ জগতে মজা সার, আর সব শূন্য ॥
রাজা রুজি বাৎ চিৎ সেই মাত্র ধন্য।
ধ্যান জ্ঞান, মিথ্যা সব, যে যা কর অন্য ॥
জ্ঞানী নাই, সাধু নাই, নাহিক বিবেক।
ধনে মানে যেই বড় সেই বড় এক ॥
জ্ঞান মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, জ্ঞানী কেহ নাই।
ধর্ম্মী কোথা? কেন দেয় ধর্ম্মের দোহাই?
এ জগৎ আছে শুদ্ধ সুখের কারণ।
যার আছে ধন তার কি আছে বারণ?
মজা কর নানামত যাহা ইচ্ছা হয়।
জন্মেছ কেবল শুদ্ধ সুখের আশয় ॥
অস্থি মাংস যাহা চায়, কর তাহা আগে।
এর পর আছে কিছু মনে নাহি লাগে ॥
কিছু না দেখিতে পাই কারে বলে মন।
ভোজ্য পান চাই তনু পোষণ-কারণ ॥
আর যাহা, ধন বিনা পূরণ কে করে।
সে মর্ম্ম কি বুঝিবেক বিদ্যাবান্ নরে?
কিবা ছার গ্রন্থপাঠ, তত্ত্বের সন্ধান?
কিবা পর উপকার, হিতকার্য্যে দান" ॥
হায় কেন হেন দশা হইল এ দেশে!
প্রাণ যায়, প্রাণ যায় মর্ম্মান্তিক ক্লেশে ॥
সে কালের শিষ্টাচার গিয়াছে সকল।
স্মরিলে কেবল হয় হৃদয় বিকল ॥
এইরূপ আক্ষেপ করেন দ্বিজবর।
বিগত হইল নিশা দ্বিতীয় প্রহর ॥
করিল সঙ্গীত স্থির জানিয়া সময়।
নিদ্রায় নীহারে রুদ্ধ নয়ন নিচয় ॥
মুদিয়ে পলকদ্বার সুষুপ্ত সকলে।
সুখদ স্বপন উঠে হৃদয়-কমলে ॥
পরদিন প্রদোষে সকলে আসি বসে।
দ্বিজেন্দ্র তোষেণ কর্ম্ম-দেবী-কথা-রসে?

ইতি প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ

শুন শুন অপরূপ, সুরস সলিল-কূপ,
কর্ম্মদেবী-কথা তার পর।
ছিল প্রথা পুরাকালে, অন্তঃপুর অন্তরালে,
থাকিত উদ্যান মনোহর ॥
দিবা-অবসান-কালে, কুসুমিত কুঞ্জ-জালে,
খেলিত যতেক কুলবালা।
তুলি ফুল চারু করে, পত্তির সোহাগ-ভরে,
কেহ বা রচিত গুচ্ছ মালা ॥
কেহ বসি তরুমূলে, রঞ্জিত তুলিকা তুলে,
লিখিত বিচিত্র চিত্র, পটে।
নায়কের ভগ্ন স্নেহ, কবিতা রচিত কেহ,
বসিয়ে নির্ঝর-সন্নিকটে ॥

নির্ঝরের ঝরে জল, সেইরূপ অবিকল,
নায়িকা-নয়ন-উৎস ঝরে।
উভয়ের এক দশা, তাই বুঝি মদালসা,
নির্ঝর-সন্নিধি খেদ করে ॥
কেহ বা ললিত স্বরে, প্রেমময় গান করে,
তান ধরে আর এক জন।
এমনি মধুর তান, বিহঙ্গ ত্যজিয়ে গান,
স্তব্ধ হয়ে করয়ে শ্রবণ ॥
কেহ জলে কেলি করে, যেন শোভে সরোবরে,
অভিনব প্রফুল্ল কমল।
মুখ মাত্র দেখা হয়, কুঞ্চিত কবরী তায়,
যেন মধুমত্ত ভৃঙ্গ-দল ॥
কেহ বা বাজায় বীণা, তাধীনা তাধীনা ধীনা,
মৃদঙ্গে দিতেছে কেহ সঙ্গ।
সুরস বীণার ধ্বনি, অন্তরে উল্লাস গণি,
স্থির-নেত্রে শুনিছে কুরঙ্গ ॥
চাঁচর চিকুর খোলা, কেহ বা দোলায় দোলা,
ধাবা-ধাবি বকুলের তলে।
কেহ বা দুলিছে তায়, মরি কিবা শোভা হায়,
তড়িৎ চমকে মেঘ-দলে ॥
বিনোদ-ব্যায়াম-ছলে, কপোলেতে রঙ্গ ফলে
আরক্তিম বিম্ব-ফল জিনি।
ঘন ঘন বহে শ্বাস, হৃদয়ে উল্লাস-ত্রাস,
কঙ্কণ বাজিছে রিণি ঝিনি ॥
উড়িছে ওড়না বাস, পক্ষ প্রায় পরকাশ,
পরী যেন হেলিছে অম্বরে।
থেকে থেকে কহে কেহ, "ধীরে সই দোল দেহ,"
লাজ-ভরে অম্বর, সম্বরে ॥
এইরূপে সখীসনে, বিলসে বিহার বনে,
প্রদোষেতে মাণিক্য-দুহিতা।
কর্ম্মদেবী নাম তাঁর, রূপে লক্ষ্মী-অবতার,
চৌষট্টি কলায় প্রকাশিতা ॥
ষোড়শী রূপসী বালা, লাবণ্য পুষ্পের ডালা,
অনূঢ়া সরলা চারুশীলা।
তরুণ বসন্ত সম, যৌবনের উপক্রম,
দেহে তার আসি দেখা দিলা ॥
এই ছিল মুকুলিত, মঞ্জরীতে আকুলিত,
কবে হল্যো ললিত ফলিত ?

দিন দিন চারু রেখা, ঈষৎ যেতেছে দেখা,
পূর্ব্বভাব হইল স্খলিত ॥
বয়স্থা দেখিয়া তায়, চিন্তিত মাণিক্য রায়,
নানারূপ প্রস্তাব প্রবন্ধ।
অবশেষে হল্যো স্থির, মন্দোরের ভূপতির,
নন্দন সহিত সুসম্বন্ধ ॥
অরণ্য-কমল নাম, কুলের গৌরবগ্রাম,
রাঠোর প্রসিদ্ধ রাজস্থানে।
কর্ম্মদেবী-সহ বিভা, প্রেম-পদ্মরাগ-নিভা,
দিবা-নিশি জ্বলে তার প্রাণে ॥
হেথা শুন সমাচার, মাণিক্যের সদাচার,
বশীভূত করিল সাধুরে।
দলবল লয়ে সঙ্গে, বিবিধ-বিনোদ-রঙ্গে,
প্রবাস করিল তার ঘরে ॥
নিত্য নব নব খেলা, মল্ল-ভূমে হয় মেলা,
কত লোক আসে দেখিবারে।
অপরূপ মল্লযুদ্ধ, চমকিত সভা শুদ্ধ,
নিরখি বিক্রম বারে বারে ॥
গদাযুদ্ধে গুণধাম, কিবা দেব বলরাম,
কিবা ভীম কিবা দুর্য্যোধন।
কিবা-দ্রোণ-কৃত দীক্ষা, অপরূপ শর-শিক্ষা,
লক্ষ্য-ভেদে নরনারায়ণ ॥
অসিচর্য্যা পরিপাটী, বিপক্ষের অসি কাটি,
তিল তিল ধরাতলে পাড়ে।
এ সকল প্রকরণ, দেখেন পুরস্ত্রীগণ,
বসি বস্ত্র-কাণ্ডারের আড়ে ॥
দেব-সেনাপতি প্রায়, সাধুর সুন্দর কায়,
তাহে বীর বীর-চূড়ামণি।
সুখী মাত্র শৌর্য্যসুখে, কীর্ত্তি-কথা মুখে মুখে,
যশোরসে ভরিল ধরণী ॥
রূপে গুণে অদ্বিতীয়, এ ছাড়া নারীর প্রিয়,
বল আর হয় কোন্ জন ?
ভুলিল মাণিক্য-সুতা প্রেম-অনুরাগযুতা,
সাধুবর-প্রাপণ মনন ॥
সেই দিন ফুলবনে, কহিল সঙ্গিনীগণে,
আপনার মন অভিলাষ।
নিরখিয়ে নীরধরে, চাতকীর মনোহরে
গুপ্ত কভু রাখে কি উল্লাস ?

ফুল্ল ফুল দৃষ্টি করি, কতক্ষণ মধুকরী,
গুঞ্জরণে থাকে বা বিরত।
নিজ-দলে চারুস্বরে, মধুময় গান করে,
প্রকাশ করিয়ে মনোগত ॥
কহে "সই, শুন কই, মানস হরিল ঐ,
দিবা-দস্যু অনঙ্গ-কুমার।
যেইরূপ গোত্র রটে, সেরূপ প্রকৃতি বটে,
মোহিল রে মানস আমার ॥
দেখি নাই হেন নীতি, সাধু হয়ে চোর-রীতি,
নাম সাধু কার্য্যকালে চোর।
শুনিয়াছি কত শত, যবনেরে করি হত,
বীর-রসে হয়েছে বিভোর ॥
হোক তাহে নাই ক্ষতি, রাজপুত্র যোগ্য রতি,
নারী-চিত চুরি ধর্ম্ম কিবা ?
ধন-চোর ভারি ভুরি, রজনীতে করে চুরি,
এর চুরি বিদ্যমানে দিবা ॥"
শুনি বাক্য সুধাময়, কোন সহচরী কয়,
"সে কি গো ঠাকুর-কন্যা সতি ?
হয়েছে সম্বন্ধ তব, রাঠোরের বংশোদ্ভব,
সেই ত তোমার ধর্ম্মপতি ॥
অন্য-পূর্ব্বা হবে বালা, জান না কতই জ্বালা,
কুলে চড়ে কলঙ্কের দাগ।
ধৈর্য্য ধর ধীরা ধীরে, মনেরে আন গো ফিরে,
হর পর-বর-অনুরাগ ॥"
কর্ম্মদেবী কন রোষে, "কে আমার কথা দোষে,
কিবা ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার।
জন্ম মৃত্যু পরিণয়, এ সব সামান্য নয়,
ইহা লয়ে চলিছে সংসার ॥
ইচ্ছামত মুনিগণ, কত মত বিরচণ,
করিলেন প্রাণপণ করি।
যুগে যুগে নিরন্তর, কেন তবে মতান্তর.
হয়ে থাকে কহ সহচরি ?
এই বা কেমন বিধি, পরিণয়-সুখ-নিধি,
জাত প্রেম-পয়োধি-মন্থনে।
নাহি দেখা পরস্পর, পর-পরিচিত বর,
উপজিবে প্রণয় কেমনে ?
দৈবাধীন সংমিলন, হয় বটে সংঘটন,
কোথাও না মেলে এক রতি।

কেবল ধর্ম্মের ভয়ে, কুলবালা থাকে স'য়ে,
কিন্তু দুঃখে দহে তার মতি ॥
রাহু-সহ শশি-কলা, করে কভু কেলি-কলা,
ভয়গ্রস্ত গ্রস্ত তার মুখে।
মত্ত মাতঙ্গের প্রতি, কোমলা নলিনী সতী,
দেহ-দানে নাহি থাকে সুখে ॥
এ কুবিধি যদি সার, এইরূপ ব্যবহার,
অবাধে চলিত অবিরত।
অন্যথা হইলে পর, অন্য-পূর্ব্বা ঘর ঘর,
অসতী হইত কত শত ॥
ভীষ্মক-নন্দিনী সতী, চারু-মতি গুণবতী,
রামারত্ন রুক্মিণী রূপসী।
শিশুপালে বরিবার, সম্বন্ধ হইল তাঁর,
দৈত্যে দান সুধার কলসী ॥
কৃষ্ণগত তাঁর প্রাণ, কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান,
কৃষ্ণে লিপি পাঠান গোপনে।
বিবাহের দিনে হরি, আসি লয়ে যান হরি,
দুষ্ট দল পরাভূত রণে ॥
শুন কই প্রাণ-সই, তাঁর চেয়ে সতী কই,
দ্বাপরেতে ছিল বিদ্যমান।
সাবিত্রী সীতার প্রায়, লোকে যার যশ গায়,
রমা-রূপে যাঁহারি সম্মান ॥
শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গান, শুনিয়ে হরিল জ্ঞান,
মানসে বরিলা যদুলাল।
সেরূপ আমার প্রাণ, সাধুর সুযশ গান,
শুনে শুনে মুগ্ধ বহুকাল ॥
আগে বরিয়াছি তাঁয়, লাজ ভয়ে বাপ মায়,
মর্ম্ম-কথা প্রকাশ না করি।
পিছে রাঠোরের সনে, কি ছার অশুভক্ষণে,
সম্বন্ধ হয়েছে সহচরি ॥
রুক্মিণীর কৃষ্ণপ্রতি, গুণ শুনে মজে মতি,
শ্রুতি-পথে প্রণয় তাঁহার।
আমি শুধু শুনি নাই, নয়নে দেখেছি ভাই,
রূপ-সিন্ধু গুণের আধার ॥
যে হোক্ সে হোক্ সই, মনে ধ্রুব জ্ঞান অই,
সাধু মাত্র মম প্রাণপতি।
সাধু ভিন্ন অন্য জনে, পতি-শব্দে সম্বোধনে,
না করিব আপনা অসতী ॥

যদি অন্যে হয় স্বামী, জীবন ত্যজিব আমি,
অথবা ত্যজিব নিকেতন।
বিজন-বিপিন-মাঝে ভ্রমিব যোগিনী-সাজে,
ভবব্রত করি উদ্‌যাপন॥
আত্মহিত-যজ্ঞ ভাঙ্গি, সাধুর মঙ্গল মাঙ্গি,
দিবানিশি করিব যাপন।
বনচারী মৃগদল, নাহি জানে কোন ছল,
তারা হবে সহচরগণ॥
অপার এ দুঃখ-নদী, এর পারে নিতে যদি,
তোমাদের থাকে অভিলাষ।
কহিলাম যেইরূপ, কহ গিয়ে যথা ভূপ,
কহ গিয়ে জননীর পাশ॥
বলিতে বলিতে কথা, বাড়িল মনের ব্যথা,
মূর্চ্ছাগতা, পতিতা ধরায়।
নিরখিয়ে সখীগণ, হইল চঞ্চল মন,
ভয়ার্ত্ত হরিণীদল প্রায়॥
কেহ গিয়ে সরোবরে, অঞ্জলি বাঁধিয়ে করে,
আনিয়ে সলিল সুশীতল।
ললাটে সিঞ্চন করে, কেহ ঘ্রাণপথে ধরে,
অভিনব বিকচ কমল॥
কেহ যত্নে কোলে লয়, কেহ আনি কিশলয়,
ব্যজন করিছে ঘনঘন।
কেহ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, উঠ সখি, চল ঘরে,
এ নহে তোমার সুশোভন॥"
দেখহ দৈবের কর্ম্ম, ধ্যেয় নহে ধাতাধর্ম্ম,
ধরণী তাঁহার নর্ম্মস্থলী।
ভাব বুঝা বড় দায়, কেবা তার তত্ত্ব পায়,
দুরারোহ দুর্জ্ঞেয় সকলি॥
নব-প্রেমানল জ্বালা, দহে নাহি সহে বালা,
মূর্চ্ছিতা হইলা উপবনে।
সাধু সেই সুসময়, আরোহণ করি হয়,
ভ্রমে বায়ু-সেবন-কারণে॥
দিবসের অবসান, সন্ধ্যাকাল মূর্ত্তিমান্,
অস্তগত হন দিনমণি।
ফুলবন-সন্নিধান, শুনিলেন মতিমান্,
কামিনীর কলকণ্ঠ-ধ্বনি॥
চপল যুবক মন, হেরিবারে আকিঞ্চন,
প্রাচীরের পাশে রাখে হয়।
করে তথা দরশন, নিপতিত ধরাসন,
স্বর্ণলতা মূর্চ্ছাগতা হয়॥
চারি পাশে নববালা, যেন নক্ষত্রের মালা,
বেড়িয়াছে পূর্ণ-শশধরে।
এ উহার মুখ চায়, কেহ করে হায় হায়,
কেহ শিরে করাঘাত করে॥
নিরখি অনঙ্গ-সুত, দয়ারসে দ্রবীভূত,
ঘোড়া ত্যজি উঠে সেইক্ষণে।
প্রাচীর লঙ্ঘন করি, যায় রায় ত্বরাত্বরি
যথা কর্ম্মদেবী ধরাসনে॥
তুরঙ্গ-রক্ষকে কয়, "যথাস্থানে লহ হয়,
বিলম্ব হইবে এইখানে।"
হেথা পুষ্প উপবনে, কুমার কুমারী সনে,
যা হইল শুন সাবধানে॥

সাধুরে সহসা নিরখি তথা।
কাহারো মুখেতে না সরে কথা॥
স্থগিত চকিত হইল তারা।
লাজেতে মুদিত নয়ন তারা॥
কেহ বা সঘনে ঘোমটা টানে।
কেহ অধোমুখে কটাক্ষ হানে॥
কেহ আধ আঁখি মেলিয়া চায়।
আধ-ফোটা নীল নলিনী প্রায়॥
যেন হংসীদল মানস-সরে।
প্রদোষ সময়ে নিনাদ করে॥
চতুরাননের বাহন-বরে।
সহসা নিরখি সে সরোবরে॥
সকলে যেমন নীরব হয়।
সেরূপ হইল ললনা চয়॥
দেখ দৈবাধীন সেই সে ক্ষণে।
চেতনা উদয় হইল মনে॥
মাণিক্য-নন্দিনী মেলিয়া আঁখি।
যুগল চঞ্চল খঞ্জন পাখী॥
চাহিতে সাধুরে হেরিয়া তথা।
আঁখি মুদি মনে কহিছে কথা॥
এ কি হ'ল্যো মোরে স্বপন-যোগ।
বিরাম বিরহ নিয়ত ভোগ॥

নয়ন মুদিলে নিরখি যারে।
প্রকাশিলে পুন নেহারি তারে॥
অনঙ্গ-নন্দন অনঙ্গ-সম।
ক্ষণেক না ছাড়ে মানস মম॥
আতিথ্যের ফল ফলিল ভাল।
অতিথি হইল আমার কাল॥
আমার এ দশা জানিত যদি।
ত্বরিত তরিত এ দুঃখ নদী॥
কি ছার আমি বা কেন বা লবে?
আমার কপালে এমন হবে?
তার রূপ গুণ সাগর-প্রায়।
আমি ক্ষুদ্র নদী-স্বরূপ তায়॥
কিন্তু তটিনীর সাগর পতি।
সিন্ধু বিনা নাহি তাহার গতি॥
এমন হবে কি আমার ভালে?
সাধনা সফল হবে কি কালে?
কিছুতেই প্রতীতি না হয় হেন।
পর-করে আমি মরিব যেন॥
যাহারে মানস কভু না চায়।
কেমনে জীবন সঁপিব তায়॥
কেমনে তাহারে বলিব স্বামী?
সাধু-পরিণীতা বনিতা আমি॥
এত ভাবি অতি কাতর তরা।
নয়নের জলে ভাসায় ধরা॥
ধৈরয-বন্ধন যাইল দূরে।
"সাধু সাধু" নাম বদনে স্ফুরে॥
শুনিয়ে বিস্ময় যুবকরাজে।
বলে "আজি এ কি কানন-মাঝে॥
মোহিতা মহিলা ধরণী-তলে।
নয়ন-নিরোধ নিদালী-ছলে॥
যেন ধরাসনে নলিনী-দাম।
কেন বা লইছে আমার নাম?
আহা মরি একি মাধুরী-ছটা।
রূপের বাণিজ্য-বহিত্র-ঘটা॥
মাণিক-মণ্ডিত চরণ, লাল।
অধরে জ্বলিছে মাণিক-মাল॥
দ্বিকর শোভিত লোহিত রাগে।
পদ্মরাগ শোভে যুগল ভাগে॥
দশন বিমল-মুকুতা-পাঁতি।
কিবা সমুজ্জ্বল তাহার ভাতি॥
অধর-অন্তরে শোভিত কিবা।
মৃদু মৃদু মুক্ত মোতির ডিবা॥
নিমীলিত আঁখি রতন নীল।
পলকের দ্বারে দিয়াছে খিল॥
চাঁচর চিকুর চামর জাল।
চরণ অবধি শোভিছে ভাল॥
তনুর সুরভি অগুরু-প্রায়।
মধুপ মধুর মানসে ধায়॥
বাহুতে গজেন্দ্র দশন বিভা।
চন্দ্রকান্ত-মণি হাসির নিভা॥
প্রবালের চুড়ি অঙ্গুলী-দলে।
কম্বুর কলনা নিরখি গলে॥
কনক বরণী তরুণী চারু।
কোন খানে দৃশ্য না হয় দারু॥
অপরূপ এই প্রমদা তরী।
যৌবন-সাগরে লোকন করি॥
ইহার ধনিক্ বণিক্ কই।
কহ না আমায় যতেক সই॥
বিভ্রম ভ্রমিতে পতিত তরী।
নাবিক-বিহীনা বিচার করি॥"
শুনি লাজ তেজি জনেক আলী
কহিছে বচন মধুর ঢালি॥
"ওহে সুরসিক পথিক-বর।
এ তরীর কথা শ্রবণ কর॥
নানাবিধ নিধি লইয়ে ভরা।
ত্যজি বাল্য-লীলা তটিনী ত্বরা॥
প্রবেশে যৌবন-জলধি-জলে।
প্রথমেই তাহে অশুভ ফলে॥
চিত্ত নাম-ধর নাবিক-বর।
বহুবিধ গুণে নিপুণ-তর॥
ধৈর্য্য-হালি করে ধরি কষিয়া।
সুস্থির-হৃদয়ে ছিল বসিয়া॥
এমন সময় তস্কর এক।
সাধুর স্বরূপ ধরিয়া ভেক॥
নাবিকেরে বেঁধে গিয়াছে লয়ে।
ভাসিছে তরণী অধীরা হয়ে॥

সাধু নাম ধরে, প্রকৃতি চুরি।
মুখে মধুক্ষরে হৃদয়ে ছুরি ?
তুমি কি তাহারে জান হে ধীর ?
কিঞ্চিৎ কর না উপায় স্থির।।
অথবা নাবিক-বিজ্ঞান জান।
বিপথ-বহিত্র কূলেতে আন।।
তব প্রতি দিয়ে এ গুরু ভার।
"আমাদের হেথা কি কাজ আর ।।"
যেমন বচন অমনি কাজ।
অবাক্ হইল যুবক রাজ।।
গৃহ প্রতি সবে করিল গতি।
নূপুরের স্বরে জাগিল সতী।।
আথিবিথি তথা উঠিল বসি।
রাহু-মুখ-মুক্ত যেমন শশী।।
দেখিয়ে সঙ্গিনী সকলে ধায়।
নিকটে দাঁড়ায়ে নাগর-রায় ?
নাগরে নিরখি শিহরে হিয়া।
সহচরীদলে প্রবেশে গিয়া।।
নিরখি নায়ক যুড়িয়ে পাণি।
কহিছে মধুর রসাল বাণী।।
"কোথা যাও মধুরা বিধুরা হয়ে ভ্রমে ?
শ্রম-জল ললাটে উদয় পরিশ্রমে।।
শিশির-শীকরে সিক্ত সরসিজ প্রায়।
জলে স্থলে আজ এ কি শোভা হায় হায় !
উভয়ের এক দশা প্রদোষ-সময়ে।
হের হের হরিণাক্ষি সরসি-হৃদয়ে।।
হের তোমা নিরখিতে কুসুম সকলে।
একে একে নয়ন মেলিল জলে স্থলে।।
অই দেখ নিরখিতে তব মুখ-শশি।
কুমুদ ঘোমটা খুলে সলিলে, প্রেয়সি।।
অই দেখ মল্লিকা যূথিকা থরে থরে।
হাসিতেছে ভাসিতেছে সুখের সাগরে।।
অই শুন মন্দ মন্দ মলয়জ বহে।
মৃদুস্বরে মনের উল্লাস বুঝি কহে।।
অথবা সুরভি তব হরণ-কারণ।
চোর-প্রায় চুপি চুপি চলিছে পবন।।
এ সকলে পরিহরি যাইবে কোথায়।
উচিত না হয় তব, শোভা পাহি পায়।।

যার প্রসন্নতা লাভে লুব্ধ এত জন।
প্রত্যাহার তার পক্ষে না হয় শোভন।।
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর বসি এই স্থলে।
তোমার সেবায় তৃপ্ত হউক সকলে।।
আর শুন চারুশীলে মম নিবেদন।
তব প্রসন্নতা-লুব্ধ আর এক জন।।
বীরতা বণিতা তার ছিল এত কাল।
সেই রস তার কাছে পরম রসাল।।
সেই মাত্র বরণীয়া শরণীয়া তার।
কিবা দিবা-বিভাবরী বিনোদ বিহার।।
আজ এই শুভক্ষণে সে ভাব বিগত।
নবভাব আবির্ভাব সুখী তাহে কত।।
তোমারে নিরখি ধন্য মানিলেক মনে।
বীরতার প্রেমডোর ছিন্ন এইক্ষণে।।
এ জগতে যত কিছু আছে মধুরতা।
তুমি তার সারময়ী ওহে স্বর্ণলতা।।
সে মাধুরী-সুধা তব নয়নে অশেষ।
কটাক্ষে তাহার হৃদে করিল প্রবেশ।।
তেমন অমিয় নহে কভু আস্বাদিত।
একেবারে মানস হইল উন্মাদিত।।
মাতাইয়ে কোথা যাও, কেমন এ দয়া।
কর ঘোর নিবারণ ভূপতি-তনয়া।।"
শুনি কথা নম্রমুখী অধিক লজ্জিতা।
বিবাহ-বাসরে যথা বাসকসজ্জিতা।।
সহচরীগণ-মাঝে করিল প্রয়াণ।
শ্যেন-ভয়ে ভীতা কপোতিনীর সমান।।
সাবাস্ চতুরা ধারা, সাবাস্ চাতুরী !
সাবাস্ সময় গুণ, সাবাস মাধুরী !
মানস-মাঝারে প্রেম-নির্ঝর উথলে।
কি সাধ্য নয়ন-পথে প্রবাহ নিকলে।।
লজ্জা তার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে বটে।
ফিরে যায় প্রেম-স্রোত মনের নিকটে।।
লুকাইতে লাজ ভয়ে নয়নের জ্বালা।
তাই বুঝি অধোমুখে রহে কুলবালা ?
হায় রে বয়স-সন্ধি সুখের সময়।
আর কি সময় আছে হেন রসময় ?
লজ্জাসহ প্রণয়ের হয় হাতাহাতি।
যথা প্রাতে তমঃসহ তপনের ভাতি।।

ক্রমে যত তেজবৃদ্ধি হয় ভানু-করে।
ততই তিমির-চয় বিগত অন্তরে॥
পরিশেষে পরিপূর্ণ প্রভার বিজয়।
সেইরূপ লজ্জা গতে প্রেমের উদয়॥
ফলে যথা তিমির মিহির ছাড়া নয়।
লজ্জা-সহ প্রণয়ের সেই ভাব হয়॥
উভয়ের রাজধানী সতীর হৃদয়।
হায় রে বয়স্-সন্ধি সুখের সময়!
স্মরিলে সে সুখময় রসের যৌবন।
নেচে উঠে যুবাপ্রায় প্রাচীনের মন॥
ক্ষণেক জড়িম-শূন্য জরতীর দশা।
স্থবিরা যৌবনমদে হয় মদালসা॥
কিন্তু সে অসার সুখ স্বপনের প্রায়।
চেতনায় কেবল যাতনা বৃদ্ধি পায়॥
হায় বিভাবনা যেন নীহারের হার!
দেখিতে দেখিতে ভানু-কিরণে সংহার॥
হেথা শুন সমাচার সঙ্গিনী-সদনে।
কর্ম্মদেবী দাঁড়াইলে বিনতবদনে॥
সাধু সম্বোধনে কহে এক সহচরী।
শারিকা তাহার নাম প্রগল্ভা সুন্দরী॥
"কেমন এ বীর-ধর্ম্ম বুঝিতে না পারি।
কোথা শৌর্য্য? শূর হয়ে চৌর্য্য-অধিকারী॥
অবলা সরলা বালা ঠাকুর-দুহিতা।
চিত চুরি করিলে হে, করিলে মোহিতা॥
পিছে এ কি চমৎকার বীরের লক্ষণ।
কি সাহসে করিলে হে প্রাচীর লঙ্ঘন॥
কুলবালা-প্রমোদ-কানন-স্থল এই।
ইথে যে পুরুষ আসে, অবিনয়ী সেই॥
ভূপজার ভাবান্তর করিলে লোকন।
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করহ শ্রবণ॥
এইক্ষণে ভূপতি সমীপে কর গতি।
আতিথ্য-দক্ষিণা চাও করিয়া বিনতি॥
এমন দক্ষিণা আর কে পায় কোথায়?
কুবেরের সর্ব্বস্বে সমতা নাহি পায়॥
যাও যাও যুবরাজ ত্যজ এ সমাজ।
ত্যজ লাজ, যদি চাও সাধিতে স্বকাজ॥"
সাধু কন, "বীর-ধর্ম্ম আছে কি না আছে
রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে॥
শুনি নাই হেন রীতি অতিথি যে জন।
প্রার্থনা করিয়া করে দক্ষিণা গ্রহণ॥
গৃহী যেই করে সেই দক্ষিণা প্রদান।
সর্ব্বত্র সুনীতি এই, বেদের বিধান॥
তোমাদের এ দেশে সকলি বিপরীত।
প্রার্থনা বিরহে নহে দক্ষিণা বিহিত॥
পতঙ্গ মাতঙ্গ মীন কুরঙ্গ প্রভৃতি।
রূপ গন্ধ রস রবে প্রমত্ত প্রকৃতি॥
কুরঙ্গ স্বরূপ আমি ভ্রমি সুখবনে।
সহসা বিনোদ-ধ্বনি প্রবেশে শ্রবণে॥
মোহিত করিল মন মনোহর স্বরে।
মত্ত হয়ে আইলাম কুঞ্জের ভিতরে॥
সুধাস্বরে ছিল সুধু প্রমত্ত শ্রবণ।
হেরি অপরূপ রূপ মাতিল নয়ন॥
যথা সরসীর জল কম্পন-সময়।
পদ্মবন-প্রকম্পন ঘন ঘন হয়॥
শ্রুতি আঁখি মাতিল, মাতিল তাহে মন।
করিলাম ভিক্ষু-প্রায় প্রাচীর লঙ্ঘন॥
দাতা-দ্বারে দাঁড়াইয়া দীন দীর্ঘাশয়।
ভিক্ষা করি আশা যদি পূর্ণ নাহি হয়॥
তবে আর কি কার্য এ স্থানে অবস্থান?"
বিমুখ অতিথি করে স্বস্থানে প্রস্থান॥
এত বলি করে সাধু পূর্ব্ব পথে গতি।
নিরখি নৃপতি-বালা সচঞ্চলা অতি॥
শারিকারে সম্বোধিয়ে কহেন বচন।
"আলো আলি কি করিলি কহ না এখন॥
অবিনয়ে নাথের করিলি ভাবান্তর।
হায় হায় ভাবনায় অস্থির অন্তর॥
অঙ্কুরিত প্রেম-তরু এমন সময়।
আঘাত করিল প্রভঞ্জন অবিনয়॥
অঙ্কুরে আঘাত পেয়ে বুঝি হয় নাশ।
কি হবে নাহিক আর আশ্বাসে বিশ্বাস॥"
মদালসা কহে "শুন ঠাকুর-কুমারি।
কুমারের এক বাক্যে আশা আছে ভারি॥
কহিলেন বীর-বৃত্তি আছে কি না আছে।
রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে॥
শুনিয়াছি কল্য-প্রাতে হবে ঘটাঘোর।
দেখাবেন নানা শিক্ষা তব মনোচোর॥

কয় দিন মহাধূম হয় এ নগরে।
সুসজ্জিত রঙ্গ-ভূমি হয়েছে প্রান্তরে ॥
দেশ দেশ থেকে কত আসিতেছে বীর।
বনাশ বিপাশা কিবা নর্ম্মদার তীর ॥
সবে বলে এই কথা, রঙ্গভূমি-স্থলে।
জয়লব্ধ হবে সাধু শিক্ষার কৌশলে ॥
শুনিয়াছি অন্তঃপুরে আছে নিমন্ত্রণ।
মহিষী যাবেন তথা সহ স্বীয়গণ ॥
সাধু প্রতি যদি তব একান্ত হৃদয়।
সেই স্থলে সে ভাব প্রকাশ যোগ্য হয় ॥
বিজয় লভিলে বীর ওগো বীরবালা।
সভা সাক্ষী করি তাঁরে দিও বরমালা ॥
ইথে অসদৃশ কিছু না হবে ঘটন।
বীরত্বের পুরস্কার মাল্য সমর্পণ ॥”
শুনি “ভাল ভাল” বলি সবে দিল সায়
চলিলেন চারুশীলা বিশ্রাম-শালায় ॥
“হে পথিক! বিভাবরী অর্দ্ধগত হয়
হইয়াছে বিশ্রামের সুখদ সময় ॥”
এত বলি যন্ত্র পরিহরে কবিবর।
শ্রোতৃগণ নিদ্রাদেবী-পূজায় তৎপর ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

অপূর্ব্ব হইল শোভা প্রভাত সময়।
বলিচক্রে উপনীত বহু লোকচয় ॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথোপরে।
সমধিক অবস্থিত চরণ নির্ভরে ॥
একধারে মঞ্চোপরে পুরনারীগণ।
জিনিয়ে কুসুম-কুঞ্জ অপূর্ব্ব শোভন ॥
বিকচ-কমল-দল-গর্ব্ব খর্ব্ব করি।
হাস্য মুখে সুখে বসি সকল সুন্দরী ॥
বিকশিত ইন্দীবর নয়নে নয়নে।
মদ-ভরে ঢল ঢল প্রভাত-পবনে ॥
বাড়াইতে তার রাগ কি কাজ কজ্জলে।
অভিমানে দলিত অঞ্জন তাইগণে ॥
বাঁধুলী ফুটিছে কত অধরে অধরে।
তাম্বুলের সাধ্য তাহে রক্তিমা বিতরে?
কোথা বা প্রফুল্ল মুখ মন্দ হাস্যমান।
শুচিস্মিত বিকশিত কিংশুক সমান ॥
কত কুন্দ কুটজ কোরক-বিমোহন।
বিমল দশন রুচি রুচির দর্শন ॥
কাহারো কপোল-প্রভা জিনি নব জবা।
অর্ঘ্যলোভে লুব্ধ মনোভব মনোভবা ॥
কঞ্চুক-কষণে ঢাকা কুচ-সরোরুহ।
হরিত পল্লবে বদ্ধ পদ্মকলি-ব্যূহ ॥
কিবা অঙ্গ-আভা মরি কি সৌরভ তার।
কে আর গৌরব করে কেয়ার পাতার?
নিরমল সে আভায় আঁখি মনোভায়।
চেলিকার কিবা সাধ্য ঢেকে রাখে তায় ॥
লঘু নীরধরে কভু ইন্দু থাকে ঢাকা।
জলদে করিয়া ভেদ অবতীর্ণ রাকা ॥
সবে অবগুণ্ঠবতী কিবা শোভা তায়।
নীরধির নীলজলে ইন্দুছায়-প্রায় ॥
পবন হিল্লোলে দোলে বসনের ফাঁদ।
ঝলমল ঢলঢল নিরমল চাঁদ ॥
নানা ভঙ্গিযুতা যত অনঙ্গ-ভঙ্গিনী।
রহস্য-কৌতুক-কলা-রসেতে রঙ্গিনী ॥
কেহ বেণীহস্তা কেহ ব্যজনী হেলায়।
কেহ শিশুসহ মত্ত বিনোদ খেলায় ॥
কোন ধীরা অতি-ধীর বিরলে বসিয়া।
একদৃষ্টে দেখে সভা শিরে হাত দিয়া ॥
আসিবে নায়কবর আছে সমাচার।
ধিয়ায় চাতকী সম আগমন তার ॥
জাতী যূথী মল্লিকা মালতী গাঁথি হার।
বিজড়িত তাহে চারু কবরীর ভার ॥
প্রিয়-চিতে বাড়াইতে উৎসাহ লহরী।
আনিয়াছে ফুল-হার যত্নে শিরে ধরি ॥

বলীচক্রে বীরের বীরত্ব প্রদর্শন।
করিবে নায়ক-শিরে কুসুম-বর্ষণ॥
অন্তধারে বার দিয়ে ঔরিণ্ট-ঈশ্বর।

দলে দলে উপবিষ্ট যেন পুরন্দর॥
কুলদেব ভানুর গরিমা অভিজ্ঞান!
উঠেছে কনক চাঙ্গী তপন সমান॥
ধরেছে আড়ানী যার 'কিরণীয়া' নাম।
প্রভাত-কিরণে জ্বলে কত রত্নদাম॥
ব্যজনী হেলায় পাশে কোন অনুচর।
কবি কহে কবিতা বানায়ে বহুতর॥
বন্দী করে স্তুতিবাদ বংশ বাখানিয়া।
বিনোদক কহে কথা সময় জানিয়া॥
ভাঁড়ে করে ভাঁড়ামী বাক্যের কত ছটা।
থেকে থেকে জেঁকে উঠে হাস্যরস-ঘটা॥
বসিয়াছে মন্ত্রিগণ নিজ নিজ স্থানে।
গম্ভীর সুধীর ভাব চিত্ত একতানে॥
প্রসন্ন প্রকৃষ্ট নেত্র মৃদু হাস্যাধর।
লোলিত শ্মশ্রুর ভার বক্ষের উপর॥
উন্নত বিপুল মৌলি, বীরবৌলী কানে।
ধ্যান দেখি বোধ হয় পরিণত জ্ঞানে॥
আর আর পারিষদ বসিয়া সকলে।
তার অন্তে পদাতিক খাড়া দলে দলে॥
আসা অসি খঞ্জর পরশু ভল্ল শূল।
শির টেড়া তাহে বেড়া লোহিত দুকূল॥
অদূরে দাঁড়ায়ে শত মত্ত করিবর।
শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে করে ঘোর স্বর॥
মহাতেজী তাজী বাজী, সাজি নানা সাজে।
ঘন ঘন হ্রেষা রব করে সভামাঝে॥
থাকি থাকি মারে ঝাঁকি কর্ণ করি খাড়া।
ঘাড় তুলে উঠে ফুলে বুকে দিয়ে চাড়া॥
মৃগয়া আখেট-রণে অতি হৃষ্ট কায়।
স্থির ভাবে থাকিতে ক্ষণেক নাহি চায়॥
কুব্জ-পৃষ্ঠ ন্যুব্জ-দেহ সারি সারি উট।
চালকের ইঙ্গিত মাত্রেই দেয় ছুট॥
কদাকার রূপ বটে গুণে নাহি ত্রুটি।
দূরগতি তুলনায় নাহি যার যুটি॥
প্রচণ্ড প্রতপ্ত পয়োবিহীন প্রদেশ।
ভানুতেজে রেণু-ক্ষেত্র কৃশানু বিশেষ॥

বহে তাহে ঘোর বায়ু কালান্তের কাল।
জগতে পদার্থ হেন কি আছে ভয়াল?
পরশনে তনু জ্বলে ইন্ধন সমান।
ক্ষণমাত্রে ওষ্ঠাগত ছটফট প্রাণ॥
কোথায় "সিরক্কো" কোথা 'লুহ্' নামধর।
মহাতেজে মরুদেশ শাসনে তৎপর॥
হায় যেই ভূতশ্রেষ্ঠ জগতের প্রাণ।
যে হয় সুরভি-ঘ্রাণ প্রদান-নিদান॥
জীবগণ জরজ্বালা শ্রান্তি ক্লান্তি হর।
মলয় অচলে যেই রহে নিরন্তর॥
তার পুনঃ এ কি ভাব, স্মরণেতে ভয়।
পরশনে জ্ঞান সহ প্রাণের বিলয়॥
হেন ভীম-প্রভঞ্জন প্রভাব প্রদেশ।
ছায়া জল, তৃণদল নাহি, মাত্র লেশ॥
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালা মৃত্যুর কিঙ্করী।
মায়াবিনী মরীচিকা যার সহচরী॥
হেন দেশে অনায়াসে ভ্রমণে নিপুণ।
পশুমধ্যে উট তুল্য কার আছে গুণ॥
নিরাহারে নিরলস গমনে নিবেশ।
তিন দিন নিরম্বু উপাসে নাহি ক্লেশ॥
অতি দূরে প্রান্তরের থাকে জলাশয়।
সেই দিকে ধায় যদি পান ইচ্ছা হয়॥
ন্যায়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত উষ্ট্রের নিকটে।
দূরে থেকে বারিগন্ধ নাসাতে প্রকটে॥
আর এক অনুজ্ঞান অতি চমৎকার।
না হইতে সিরক্কোর প্রভাব ইহার॥
জানিয়া আগত তায় মুদিয়া নয়ন।
চরণ প্রসারি করে ধরায় শয়ন॥
যতক্ষণ প্রভঞ্জন শান্ত নাহি হয়।
ততক্ষণ শুদ্ধভাবে ধরাসনে রয়॥
বহিয়া যাইলে বায়ু জানিয়া সময়।
পূর্ব্বমত প্রয়াণে প্রবৃত্ত পুনঃ হয়॥
হায় হেন কুৎসিত আকারে এই মত।
অপ্রতিম অসীম সদ্গুণ থাকে কত॥
এইরূপ কতরূপ করি আড়ম্বর।
বার দিয়ে বসিয়াছে ঔরিণ্ট-ঈশ্বর॥
করিপৃষ্ঠে নৌবৎ বাজিছে সুধাময়।
গুড় গুড় গরজিত নাকারা-নিচয়॥

সানায়ের কিবা ধ্বনি কিবা তান তায়।
করিছে ভৈরবী টোড়ী প্রভৃতি আদায় ॥
হৃদয় উদাস করে মধুর আলাপে।
সন্তান-শোকার্ত্ত ক্ষান্ত ক্ষণেক বিলাপে ॥
বাজিছে তাহার সাজ, ঝাঁজ সাতে সাতে।
বিরামের ছেদ্ ভেদ্, মন মাতে তাতে ॥
অন্যধারে জনতার নাহি পরিশেষ।
মানবী অটবী প্রায়, নাহি শূন্যলেশ ॥
সুশোভিত শিরস্ত্রাণ প্রকার প্রকার।
উর্দ্ধ থেকে দৃষ্ট হয় যেন একাকার ॥
মাঝে মাঝে রথচয় পতাকা-ভূষিত।
চড়োপরি রতন বল্লরী বিলসিত ॥
লোহিত উষ্ণীষ শিরে, অঙ্গে অঙ্গরাখা।
দু'দিকে উড়ানী প্রান্ত, যেন দুই পাখা ॥
বসিয়াছে রথিগণ, গোঁফে দিয়ে চাড়া।
আশে পাশে তাম্বুলী, তাম্বুল লয়ে খাড়া ॥
মদক মোদক লয়ে ফেরে ফিরি ঘুরি।
বরফি, অমৃতী, পেঁড়া, ঘিওর, কচুরী ॥
কৌড়ীর রূপ রেউড়ি পিউরি সুন্দর।
সফরীর ঝাঁক যেন শোভে স্তরে স্তর ॥
খেলনা বিক্রেতা, লয়ে বিবিধ খেলনা।
কুটুম্বিনী-সমাজে করিছে আনাগোনা ॥
মাটিতে রচিত মল্ল, মল্ল-সহ খেলে।
সমাদরে ক্রয় করে ক্ষত্রিয়ের ছেলে ॥
কোথা বা আসিক-সহ আসিকে লড়াই।
ভঙ্গি দেখে বোধ হয়, করিছে বড়াই ॥
যে দেশে যেরূপ বৃত্তি, সেইরূপ মতি।
সেইরূপ ক্রীড়ারস, সেইরূপ রতি ॥
শৈশব হইতে সেই দিগে চিত ধায়।
অন্যরস, অন্যরূপ ক্রীড়া, নাহি চায় ॥
যথা, বাঙ্গালার লোক নহেক সাহসী।
নারীপ্রিয় কেলিকলা-কৌতুক-বিলাসী ॥
শিশুর পুতুলে, দেখ আভাস তাহার।
কামকলা, ছলা, তাহে প্রত্যক্ষ-প্রচার ॥
পুতুলে পুতুলে বিয়া, বহু বহু কেলি।
নিতান্ত কৈশোরে যত বাল বালা মেলি
কিরূপে পৌরুষ পথে যাইবে বালক।
তামাক-খাকুয়া বুড়া, প্রিয় খেলনক!

পশ্চিমের প্রজাপুঞ্জ পুরুষার্থ চায়।
সেইমত দেখহ শিশুর খেলনায় ॥
ধারে ধারে বসিয়াছে শস্ত্রের আপণ।
স্তূপে স্তূপে সুসজ্জিত নানা প্রহরণ ॥
যুবাগণ ক্রয় করে করি নির্ব্বাচন।
কেহ লয় লৌহ-জাল-ময় সন্নহন ॥
কেহ লয় শিরোহী, ভুজালি ভয়ঙ্কর।
চকমক্ ঝকমক্ করে নিরন্তর ॥
কেহ লয় ক্ষিপ্র খাঁড়া অতি খরতর।
কেহ লয় খঞ্জর পঞ্জর বিদ্ধকর ॥
কেহ লয় কৃষ্ণাজিন পটুকা কবচ।
খড়্গী চর্ম্মে রচা ঢাল বেচিছে শ্বপচ ॥
তদুপরে শোভে স্বর্ণ-বল্ল অনুপম।
রতনে রচিত কত ছবি মনোরম ॥
শার্দ্দূলের কৃত্তি বিনির্ম্মিত উপানহ।
দংশিলে দশনভ্রষ্ট ভীষণ বরাহ ॥
আর আর কত দ্রব্য, কত লব নাম।
রাজপুত-প্রিয় অস্ত্র শূলপী বল্লাম ॥
এইমত কত শত যুদ্ধ আয়োজন।
রাজস্থানে ক্রয় করে যত যুবা-জন ॥
আসিয়াছে বলিচক্রে দেখিতে তামাসা।
মুখে মুখে বীরত্বের ব্যাখ্যান সম্ভাষা ॥
সাধুর চরিত্র-কথা কহে কত জনে।
কেহ বলে হেন বীর না দেখি নয়নে ॥
আসিয়াছে দলে দলে যত রাজপুত।
বীর-মদে মাতয়ালা নানাগুণযুত ॥
করিবারে সাধুসনে বলের পরীক্ষা।
দেখাইবে নিজ নিজ সামরিক দীক্ষা ॥
দূরতর দেশ থেকে আসিয়াছে সবে।
আরোহণ করি তুরঙ্গম মনোজবে ॥
বীকানের আজমের মের্তা মাড়বার।
হারাবতী যদুবতী আর নীরবার ॥
অ[illegible]নিক মাছেরী প্রাচীন মৎস্য দেশ।
জন্মে যাহে রত্নশিলা বিশেষ বিশেষ ॥
কৃষ্ণগড় কেরলী মিবার মিষ্টবাদী।
ঢোলপুর জয়পুর যোধপুর আদি ॥
মাণিক্য তোষেণ সবে যোগ্য সমাদরে।
বিন্দুমাত্র স্থান নাই ঔরিণ্ট-নগরে ॥

পড়িয়াছে ডেরা ডাণ্ডা যেখানে সেখানে।
গীত বাদ্য মহোল্লাস সারঙ্গের তানে ॥
আসিয়াছে কত মল্ল কত লব নাম।
মালসাট কত নাট করে অষ্ট যাম ॥
বীরধটী কটিতটে গায়ে রঙ্গ-রজ।
স্থূলতনু কিবা স্থাণু, কিবা মত্ত গজ ॥
স্থলপদ্মাকার আঁখি ঈষৎ লোহিত।
অরুণ উদয়-কালে যেরূপ শোভিত ॥
এক ভাগ লাল, অন্য ভাগ শ্বেতোজ্জ্বল।
শারদী উষার কিবা শোভা নিরমল ॥
চটাপট পটপট বাহুর আস্ফোটে।
কেঁপে উঠে বসুমতী পতনের চোটে ॥
ঘুরায়ে মুগুর মারে বক্ষের উপর।
দেখিলে ভীরুর হয় সভয় অন্তর ॥
এইরূপ মল্ল সব আসিয়াছে সেজে।
আছে খাড়া, শির টেড়া, বিক্রমের ত্যজে ॥
আসিয়াছে মল্ল-যোদ্ধা নিজ নিজ দলে।
বন্ বন্ ভাঁজে ভল্ল ভীম্ম ভুজবলে ॥
ঘুরায়ে ছুড়িয়ে ফেলে অম্বর-উপরে।
চকিতে লখিতে পুনঃ লুফে লয় করে ॥
আসিয়াছে শর-যোদ্ধা বিচিত্র সন্ধায়ী।
হেন ভঙ্গী যেন অতি শৌর্য্য-রসপায়ী ॥
সবে সব্যসাচী সম সন্ধানে নিপুণ।
উভয় কন্ধরে প্রলম্বিত দুই তূণ ॥
নানা রূপে বিরচিত শরের ফলক।
কোন শরে যেন অর্দ্ধ-চন্দ্রের ঝলক ॥
কোন শর-মুখ যেন ভুজঙ্গ-রসনা।
গরলে মণ্ডিত তনু বিষম ভীষণা ॥
কোন শর-মুখ হর-ত্রিশূল-আকার।
কোন শর ইন্দ্রের আয়ুধ-অবতার ॥
মহিষ-বিষাণে বিনির্ম্মিত ধনুচয়।
গুণ দেয়া, বহুগুণ ভিন্ন সাধ্য নয় ॥
আসিয়াছে আসিক, আসন তুরঙ্গমে।
লক্ষ্যভ্রম, কোন কালে, নহে কোন ক্রমে ॥
প্রমথেশ প্রমদা-পূজিত প্রহরণ।
দিনকর-দ্যুতি প্রায় অতি সুশোভন ॥
যত খড়্গী পৃষ্ঠে, ঝুলে খড়্গ চর্ম্ম ঢাল।
অভেদ্য অচ্ছেদ্য সেই বিষম করাল ॥

বীরবৃন্দ দাঁড়াইল নিজ নিজ গণে।
অপূর্ব্ব হইল শোভা পরীক্ষা-সদনে ॥
সেই স্থানে অন্যের গমনে বিধি নাই।
প্রভু পাশে পণ্ডুগণ * প্রস্থিত সদাই ॥
এমন সময়ে দুই রণ-বাদ্যকর।
করে করি দুই তূরী হৈল অগ্রসর ॥
ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধানে সঙ্কেত করে তায়।
অতিদূরে তূরীর নিনাদ দ্রুত ধায় ॥
কোলাহল কল্লোল হইল তাহে স্থির।
শুনি শব্দ স্তব্ধপ্রায় সকল শরীর ॥
হয়-চয় শুনে তাহা কর্ণ করি খাড়া।
আর কি স্থগিত থাকে পেলে পরে সাড়া ॥
প্রথমতঃ মল্লযুদ্ধ প্রদর্শিত হয়।
মল্ল-ভূমে দুই বীর হইল উদয় ॥
এক দিকে সাধু, অন্যদিকে যোধা-মল।
গরজিয়ে এলো যেন কেশরী-যুগল ॥

মাল-ঝাঁপ

ঠুকে তাল, আঁখি লাল, কি করাল মূর্ত্তি।
মহাকায়, হরি প্রায়, যেন পায় স্ফূর্ত্তি ॥
চল্যে যায়, পদ ঘায়, বসুধায় কম্প।
কভু ধায়, ঠায় ঠায়, মেরে যায় ঝম্প ॥
টিট্‌কার, চীৎকার, শীৎকার ক্রোধে।
গর্ গর্, কলেবর, পরস্পর-রোধে ॥
জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, পড়াপড়ি ক্ষেত্রে।
লুটপুটু দেয় ছুট, কালকূট নেত্রে ॥
মাতামাতি, হাতাহাতি, যেন হাতি-দ্বন্দ্ব।
করে জোর মহা শোর, হয় ঘোর স্পন্দ ॥
যথালক্ত, কি আরক্ত, চলে রক্ত গণ্ডে।
নাহি ত্যক্ত, ঘেরি মক্ত, যুদ্ধে পক্ত দণ্ডে ॥

* ইয়ুরোপীয় নাইট-নামধেয় বীর-পুরুষদিগের সেবা-পরিচর্য্যায় যেরূপ ভদ্র সন্তানেরা বীর-বিহিত কার্য্যাদির শিক্ষা করিতেন, ভারতবর্ষে রাজন্য-কুলেও এইরূপ প্রথা ছিল। শিক্ষিতাবস্থায় বিরাট সন্তানেরা পণ্ডু নামে বিখ্যাত হইতেন।

নাহি ছেদ, নাহি খেদ, ঘন স্বেদ অঙ্গ।
দুই মাল, যেন কাল, নাহি তাল-ভঙ্গ ॥
হাঁস ফাঁস, বহে শ্বাস, শুনি ত্রাস লাগে।
দুই জন, পরায়ণ, বাহুরণ-রাগে ॥
দুজনায়, এই চায়, এ উহায় জিতে।
করে জারি, ভুরি ভারি, ধেয়ে চারি ভিতে ॥
কত রোক, বড় ঝোঁক, দেখে লোকবৃন্দে।
সবে চায়, হয় সায়, কেহ কায় নিন্দে ॥
এই মত, নানা মত, প্রতিহত কালে।
সাধু ধরি, নিজ অরি, ধরাপরি টালে ॥
যেন ঝড়ে, নড়ে চড়ে, জোরে পড়ে শাল।
তার প্রায়, লম্বকায়, পড়ে যায় মাল ॥
যোধাশূর, দর্পচূর, যত ভুরভঙ্গ।
হরি হরি! ধ্বনি করি, সভা ভরি রঙ্গ ॥
হুহুঙ্কার, চীৎকার, শব্দ বার লক্ষে।
সিংহাকার, অবতার, সাধু তার বক্ষে ॥
ধরে ঘাড়, দেয় চাড়, বুঝি হাড় ভাঙ্গে।
ছল ছল, চক্ষে জল, নাহি বল অঙ্গে ॥
ধড়ফড়, করে ধড়, মারে চড় ভারী।
নাসিকায়, রক্ত ধায়, বহুধায় হারি ॥
হারিলেক যোধামল, দেখিল সকলে।
জয় জয় জয় শব্দ হয় সভাস্থলে ॥
দণ্ডবৎ নাকে খৎ দিয়ে সাধু-পদে।
হেট-মুখে যায় মল্ল, হীন বীর-মদে ॥
যেন করী কর্দ্দমে পড়িয়া নত শিরে।
মন্থর-গমনে বনে যায় ধীরে ধীরে ॥
নাহি চায় পশ্চাতে না চায় অগ্রভাগে।
আপনার অপমান মনে মনে জাগে।
মল্লযুদ্ধ পরে সাধু গিয়ে নিজ দলে।
কিছুকাল বিশ্রাম করিম যথাস্থলে ॥
পুনরায় সাজিয়ে আইল অশ্বোপরে।
সুশোভন শরাসন, ধনু ধরি করে ॥
হেম-তন্তু-বিনির্ম্মিত কবচ পিধান।
ভানুকরে জ্বলে যেন অনল সমান ॥
কিবা শিরে শিরস্ত্রাণ ইন্দ্রধনুচ্ছটা।
পৃষ্ঠে অসিচর্ম্ম যেন জলধরঘটা ॥
পুনরায় তূরী-শব্দ হয় রঙ্গ-ভূমে।
উন্দধুন্দ ধুন্দমারী মহা ধামধুমে ॥

মনে হয়, এই বলে "কে আছ এস্থলে।
সাধুসহ শরশিক্ষা দেখাও সকলে ॥"
তূরীনাদ-শেষে, এলো এক বলবান্।
নামেতে অর্জ্জুন সিংহ, অর্জ্জুন সমান ॥
প্রথমতঃ শর কাটাকাটি ঝাঁকে ঝাঁকে।
দুই বীর ঘোরে তথা শত শত পাকে ॥
এ মারে উহারে শর স্থির লক্ষ্য করি।
প্রতিপক্ষ কাটে তাহা অম্বর-উপরি ॥
অমনি সন্ধান পুনঃ করি সেই জন।
বরিষণ করিতেছে কত প্রহরণ ॥
কটাকট, কাটাকাটি অগ্নি উঠে তায়।
জয়াজয় কিছুই না স্থির বুঝা যায় ॥
পরিশেষ, লক্ষ্য এক হল্যো নিরূপিত ॥
স্তম্ভোপরি জলপূর্ণ ভৃঙ্গারে স্থাপিত ॥
সলিলে ভাসিছে এক প্রফুল্ল কমল।
নয়নে না দৃশ্য হয় সেই শতদল ॥
শত হস্ত অন্তরেতে সন্ধান লইবে।
পাত্র ভেদি পরে লক্ষ্য বিন্ধিতে হইবে ॥
প্রথমে অর্জ্জুন সিংহ করিল উদ্যম।
ভৃঙ্গার হইল ভঙ্গ, লক্ষ্যে হলো ভ্রম ॥
স্তম্ভ বেয়ে কমল কমলসহ ছুটে।
হো হো করি জনারণ্যে হাস্যরস ফুটে ॥
লজ্জা-নম্র মুখ, বীর হৈল সভাস্থলে।
অর্জ্জুনের নামের কলঙ্ক সবে বলে ॥
পুনরায়, পূর্ণ পয়ঃপাত্র প্রস্থাপিত।
পুনরায় পদ্মপুষ্প তাহে আরোপিত ॥
শত হস্ত, দূরে, সাধু মারিলেক তীর।
বিধিল বারিজ ছেঁদি ভৃঙ্গার-শরীর ॥
না ভাঙ্গিল ভাজন না পড়ে বিন্দু নীর।
"ধন্য ধন্য ধন্য সাধু" কহে যত বীর ॥
হেন মতে হৈল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
প্রখর হৈল আসি দিনকর-কর ॥
তপনের তাপনে তাতিল বসুমতী।
ক্রমে ক্রমে মন্দগতি-প্রাপ্ত সদাগতি ॥
মুমূর্ষুর প্রাণবায়ু সদৃশ লক্ষণ।
মন্দীভূত মাত্রাকৃত হয় প্রতিক্ষণ ॥
হইল বিক্লব ভাব রমণী সদনে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু উদয় বদনে ॥

প্রভাতের পদ্মপাতে নীহারের হার।
আহা মরি মরি কিবা মাধুরী তাহার॥
শুখায়েছে সুধাধর লোহিত অধর।
ভানু-করে যথা ভূচম্পক পুষ্পবর॥
তথাপি কিঞ্চিৎ শ্রান্ত অনুভূত নয়।
বলিচক্র-প্রতি সবে স্থিরনেত্রে রয়॥
মহাকৌতূহল মনে, একাগ্র অন্তর।
বীরত্ব বিক্রম, করে নয়ন-গোচর॥
সেই রসে সুরসিকা সকল মহিলা।
পরাক্রমে এক এক প্রমদা প্রমীলা॥
বীরত্ব-বিহীন রূপে রতিপতি প্রায়।
হেন জনে কটাক্ষে কদাচ নাহি চায়॥
অপূর্ব্ব সাধুর শিক্ষা দেখিছে সকলে।
শোভিছে কুমার সম রঙ্গভূমি স্থলে॥
তারকা অসুর প্রায় পরাক্রমযুত।
কত কত প্রতিযোগী হৈল পরাভূত॥
চাচিক চৌহান সঙ্গে অপূর্ব্ব কৌশল।
দুই বীর ঊর্দ্ধশির প্রচণ্ড প্রবল॥
অসি-হস্ত দুই মত্ত অশ্বে আরোহণ।
ঘনপাকে বলিচক্রে করিছে ভ্রমণ॥
মাথায় ঘুরিছে অসি কত শত পাকে।
কভু বা তর্জ্জন করি ফেরে তাকে তাকে॥
কভু চারিভিতে ঘুরাইছে তরবার।
কিছুমাত্র দৃষ্ট নাহি হয় দেহ কার॥
কভু তরবারে তরবারে ঘোর রণ।
খচাখচ, ঝনঝন ভীষণ নিঃস্বন॥
হেন স্থির লক্ষ্য করি চালাইছে অসি।
অতি বেগবতী, যেন তারা পড়ে খসি॥
বোধ হয় কাটা গেল সাধুর শরীর।
হের কিবা ব্যর্থ তারে করিতেছে বীর।
চকিতে ঘুরায়ে ঢাল ঢাকি নিজ শির।
লাঞ্ছনা করিল প্রতিযোগীর অসির॥
ঘুরায়ে আপন অস্ত্র হানে হান্ হান্।
খান্ খান্ ভেঙ্গে পড়ে তরবারখান॥
মারিতে উদ্যত পুনঃ খঞ্জর পসারি।
চৌহান বিহতজ্ঞান সহিতে না পারি॥
মধ্যস্থ সময় বুঝি মধ্যে খাড়া হয়।
নিবর্ত্তিয়া যায় সাধু শব্দ জয় জয়॥

লোকারণ্য অগণ্য সুধন্য ধ্বনি করে।
"সাধু সাধু, সাধু সাধু", কহে যত নরে॥
মাণিক্য আসন থেকে করি গাত্রোত্থান।
ইঙ্গিতে আপন স্থানে করেন আহ্বান॥
মঞ্চোপরি বসি যথা সীমন্তিনীগণ।
সেই দিক্ হতে সাধু করিছে গমন॥
রঙ্গে ভঙ্গে তুরঙ্গ যাইছে ধীরে ধীরে।
আপাদ-মস্তক স্নাত পরিশ্রম-নীরে॥
মেঘনাদ নাম তার, মেঘবর্ণ-ধর।
মদগর্ব্বে মত্তগতি, ফুল্ল কলেবর॥
নিজ প্রভু জয়-লব্ধ সমর-শিক্ষায়।
মহানন্দে হ্রেষা শব্দ করে উভরায়॥
সাধুরে নিকটে হেরি বরারোহাগণ।
ধারাকারে করিছে কুসুম-বরিষণ॥
গোলাব, সেবতী, নাগকেশর, কেশর।
ভূচম্পক, চম্পক, অশোক শোভাকর॥
কুরুবক নানাজাত সিতাসিত পীত।
পলাশ, পুন্নাগ, পরা, পদ্ম প্রোন্মীলিত॥
মল্লিকা মালতী-মধু-মাধবী মঞ্জরী।
আর আর কত মত কুসুম-বল্লরী॥
সুশীতল মলয়জে মাখা সব ফুল।
ধরিল ধবল বর্ণ সাধুর দুকূল॥
এমন সময়ে দেখ অপূর্ব্ব ঘটনা।
হেমথাল করে, এক নবীনা ললনা॥
কুসুমের মালা তাহে শোভে মনোহর।
ধীরে ধীরে গতি করে যথা বীরবর॥
তুরঙ্গ রাখিল সাধু প্রমদা নিরখি।
কহিতে লাগিল কথা কুমারীর সখী॥
"ধর, ধর রাজপুত্র, এ কুসুম-হার।
কুমারী শ্রীকর্ম্মদেবী-কৃত পুরস্কার॥
দেখাইলে রঙ্গভূমে শিক্ষা চমৎকার।
তব যোগ্য পুরস্কার আছে কি বা আর?
করিলেন সমর্পণ পাণি সহ প্রাণ।
এই কুসুমের হার তার অভিজ্ঞান॥"
এত বলি সীমন্তিনী মালা দেয় করে।
উচ্চৈঃস্বরে কহে সাধু অশ্বের উপরে॥
"শুন শুন সভাস্থ সমস্ত জনগণ।
কর্ম্মদেবী দত্ত এই মাল্য সুশোভন॥

সরলা ভূপতিবালা আমারে বরিলা।
অযাচিত ধন-দানে কৃতার্থ করিলা॥
কিন্তু এই পূর্ব্বাপর আছে ধর্ম্মনীতি।
এই শ্রুতি, স্মৃতি, এই সর্ব্বদেশে রীতি॥
পিতা-সত্বে দুহিতার স্বতন্ত্রতা নাই।
যার ধন তার কৃত সম্প্রদান চাই॥
ঐরিণ্ট-ঈশ্বর যদি দেন এই নিধি।
গ্রহণ করিতে পারি যথা শাস্ত্র-বিধি॥
নতুবা এ কার্য্যে মম অভিমত নয়।
পরিণয়ে পাণিদান উপযুক্ত হয়॥
মানময়ী মনোলোভা মহীপ-কুমারী।
মান ভঙ্গ করিতে তাঁর নাহি পারি॥
অতএব মালামাত্র শিরে ধরি পরি।
এই নিবেদন মম, শুন সহচরি॥
যথাবিধি বিবাহের বাদে নাহি টীকা।
তবে সে বরিতে পারি ভূপতি-বালিকা॥
এত বলি সমাদরে মালা তুলে লয়ে।
ভূষিলেক শিরস্থানে স্মিত-মুখ হয়ে॥
বলিচক্র হৈতে বীর হইল বাহির।
তিমির কবিয়া ভেদ যেমন মিহির॥
লোকারণ্য মাঝে উঠে মহা কোলাহল।
কত কথা কহে যত দিদৃক্ষ সকল॥
কেহ বলে কি বলিল সব শুনি নাই।
কেহ বলে এমন না দেখি কভু ভাই॥
কেহ বলে "কেমনে এমন হবে বল?
কি ভাবিবে রাজপুত্র অরণ্য-কমল॥
কি বলিবে তার পিতা চণ্ডদেব রায়।
হইবে সমর ঘোর বুঝি অভিপ্রায়॥
হেন অপমান কভু সহিতে নারিবে।
কার সহ এ বিবাদে সাধ কি পারিবে?"
কেহ বলে, "কর্ম্মদেবী করিল কি কাজ
হাসাইল রাজস্থান, রাজন্য-সমাজ॥
প্রাচীন, কুলীন, ধনী, পরাক্রান্ত অতি।
প্রধান পদবী কার রাঠোর সংহতি?
এমন বংশের বংশধর যেই জন।
কর্ম্মদেবী সহ তার সম্বন্ধ ঘটন॥
অনায়াসে সেই সন্ধি করিয়া ছেদন।
অন্যেরে বরিলা বালা এ রঙ্গ কেমন?"

এইরূপ নানা কথা লয়ে নানা জন।
দলে দলে করে সবে স্বালয়ে গমন॥
এখানে সংবাদ শুন, শ্রীমাণিক্য ভূপ।
উথলিত চিন্তাজালে চিত্ররূপ কূপ॥
বিষণ্ণবদনে পুরে করয়ে প্রবেশ।
নন্দিনীরে ডেকে আনি জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
"একি কহ গো কুমারি", একি কহ গো কুমারী?
কেমন তোমার কথা বুঝিতে না পারি॥
কহ বাগদত্তা যেই, কহ বাগদত্তা যেই।
কেমনে অপরে আর বরিবেক সেই?
তাহে চণ্ডদেব রায়, তাহে চণ্ডদেব রায়।
দ্বিতীয় প্রচণ্ড চণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রায়॥
একে অযশ সমূহ, একে অযশ সমূহ।
প্রবল প্রচণ্ড তাহে, তার সেনাব্যূহ॥
হবে অন্যায় সমর, হবে অন্যায় সমর।
বিগ্রহ তাহার সহ, নহে শোভাকর॥
মনে দেখহ বিচারি, মনে দেখহ বিচারি
রাজপুত মাত্রে হবে তার সহকারী॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
বুধ, বিধি, বেদবর্গ, এক বাক্যে কয়॥"
শুনি পিতার বচন, শুনি পিতার বচন।
কর্ম্মদেবী মৌন-মুখে রন কিছুক্ষণ॥
যথা ধারাপাতকালে, যথা ধারাপাতকালে।
কেতকী কলিকা মুগ্ধ থাকে পুষ্পজালে॥
হলে মেঘের অত্যয়, হলে মেঘের অত্যয়।
তখন প্রকাশ করে আপন হৃদয়॥
তার সৌরভ-সুধায়, তার সৌরভ-সুধায়।
মত্ত হয়ে মারুত অন্তরে দ্রুত ধায়॥
সেইরূপ ভূপসুতা, সেইরূপ ভূপসুতা।
ক্ষণ পরে, কহিছেন কথা সুধাযুতা॥
"নিবেদন শ্রীচরণে, নিবেদন শ্রীচরণে।
মাগুণে শ্রুতিং দেহি, দাসীর বচনে॥
কথা বেদের বিহিতা, কথা বেদের বিহিতা।
অন্য বরে অবিহিতা ধরিতা দুহিতা॥
কিন্তু এই বিধি কাল, কিন্তু এই বিধি কাল।
অবাধে চলিত কভু নহে সর্ব্বকাল॥
কত পতিব্রতা সতী, কত পতিব্রতা সতী।
একে দত্তা পরে, পরে বরে অন্য পতি॥

বাগদান মন্দ রীতি, বাগ্দান মন্দ রীতি।
ইহাতে হতেছে কত কুকীর্ত্তি কুনীতি॥
পিতৃস্বত্ব দুহিতায়, পিতৃস্বত্ব দুহিতায়।
কিন্তু অন্য স্বত্ব সহ শ্রেষ্ঠ তুলনায়॥
নহে ধেনু ধান্য ধন, নহে ধেনু ধান্য ধন।
নহে ভূমি, নহে ভূষা, রজত কাঞ্চন॥
যার ধর্ম্মে অধিকার, যার ধর্ম্মে অধিকার॥
ইহকাল, পরকাল, আচার বিচার॥
সুখদুঃখ ভোগাভোগ, সুখদুঃখ ভোগাভোগ।
চিন্তনীয় কিসে দূর হবে ভব-রোগ॥
তারে যতনে লালন, স্নেহে করিয়া পালন,
বহুদিন করি যোগ্য নহে বিসর্জন॥
দেখ অন্য ধন দিলে, দেখ অন্য ধন দিলে।
দাতা স্বত্ব গতে, নাহি উপস্বত্ব মিলে॥
কন্যাদানে ভিন্ন মত, কন্যাদানে ভিন্ন মত।
দাতা গ্রহীতার স্বত্ব কভু নহে গত॥
বিশেষতঃ অপুত্রকে, বিশেষতঃ অপুত্রকে।
সর্ব্বথা পুত্রত্ব অর্হে দুহিতা সুতকে॥
যেই জননে মরণে, যেই জননে মরণে,।
কল্যাণদায়িনী হয় খ্যাত ত্রিভুবনে॥
যারে বলহ নন্দিনী, যারে বলহ নন্দিনী।
সুরভিনন্দিনী প্রায় আনন্দবর্দ্ধিনী॥
কহ তারে না জিজ্ঞাসি, কহ তারে না জিজ্ঞাসি।
পরে সমর্পণে কত দুঃখ রাশি রাশি॥
কুল শীল রূপ গুণ, কুল শীল রূপ গুণ।
সর্ব্বমতে যদি কেহ হয় সুনিপুণ॥
তবু নহে ত শোভন, তবু নহে ত শোভন।
কন্যার অমতে তারে অপরে অর্পণ॥
বীরভোগ্যা এ মেদিনী, বীরভোগ্যা এ মেদিনী।
সেইরূপ বীরভোগ্যা বীরের নন্দিনী॥
দেখ সীতা গুণবতী, দেখ সীতা গুণবতী
মানসেতে বরিলেন রাম রঘুপতি॥
ধনুর্ভঙ্গ সুকৌশল, ধনুর্ভঙ্গ সুকৌশল।
রঘুবীর ভিন্ন ভাঙ্গে কার হেন বল?
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে।
সেইরূপ পুরস্কার পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
দময়ন্তী সেইরূপ, দময়ন্তী সেইরূপ।
দেব তুচ্ছ করি বরলেন নল ভূপ॥

এই নীতি অনুপম এই নীতি অনুপম।
দম্পতি-সুখের এই বীজ মনোরম॥
যথা এ রীতি না চলে, যথা এ নীতি না চলে।
নানা বিড়ম্বনা প্রায় ঘটে সেই স্থলে॥
আর কহিলে আপনি আর কহিলে আপনি।
প্রতাপে মার্ত্তণ্ড চণ্ডদেব নৃপমণি॥
সাধু কভু নন ন্যূন, সাধু কভু নন ন্যূন।
রাজস্থানে তাঁর সহ কেবা সমগুণ?
দেখিলেন সাক্ষ্য তার, দেখিলেন সাক্ষ্য তার।
বড় বড় বলবান্ হত অহঙ্কার॥
কেহ বাকী নাহি ছিল, কেহ বাকী নাহি ছিল।
কত দূর থেকে কত ক্ষত্রিয় আইল॥
সভে মানিলেক হারি, সভে মানিলেক হারি।
সভায় সাধুর জয় দিল নরনারী॥
ধর্ম্মপক্ষ কিবা হয়, ধর্ম্মপক্ষ কিবা হয়?
বিচারিয়ে দেখুন জনক মহাশয়॥
লোকে এই পরিজ্ঞান, লোকে এই পরিজ্ঞান।
ধর্ম্ম তারি পক্ষে যারে করে বাগ্দান॥
যদি ইহাই প্রমাণ, যদি ইহাই প্রমাণ।
কি হেতু অন্যথা বৃদ্ধ প্রকাশে পুরাণ?
দেখ রুক্মিণী-হরণে, দেখ রুক্মিণী-হরণে।
সুতাবান্ধা শিশুপাল পরাভূত রণে॥
আর সুভদ্রা-হরণে, আর সুভদ্রা-হরণে।
অপমান হৈল সার মানী দুর্য্যোধনে॥
অতএব নিবেদন, অতএব নিবেদন।
অধর্ম্মের উত্থাপনে নাহি প্রয়োজন॥
এই শাস্ত্র সুশোভন, এই শাস্ত্র সুশোভন।
যার প্রীতি রতি, মতি, পতি সেই জন॥
হ'লে অন্যথাচরণ, হ'লে অন্যথাচরণ।
"নিশ্চয় তোমার পদে ত্যাজিব জীবন॥"
শুনিয়ে কন্যার কথা, ওঁরণ্ট-ঈশ্বর তথা,
মনে মনে করেন বিচার।
"যথাযুক্ত কথা সব, হইয়াছি হতরব,
ইথে কথা কহিব কি আর?
বিশেষে যেরূপ মন, করিতেছি নিরীক্ষণ,
না জানি, কি করিতে কি হয়।
সাধু-প্রতি স্বয়ম্বরা, ইথে আশা ভঙ্গ করা,
কোন মতে উপযুক্ত নয়॥

নাহি আর পুত্র-কন্যা, এক কন্যা ধরা-ধন্যা,
যদি এর আশাভঙ্গ করি।
ধর্ম্মের ব্যত্যয় হবে, লোকে নিদারুণ কবে,
অপযশ রবে ভবে ভরি॥
পাত্র কেবা সাধু সম, যা থাকে কপালে মম,
হিত মানি তারে কন্যাদানে।"
এত ভাবি মতিমান্, তথা হৈতে গাত্রোত্থান,
করি যান বাহিরে দেবানে॥
ডাকিয়া অমাত্যবরে, কহিছেন মৃদুস্বরে,
কর্ম্মদেবী-বিবাহ-সম্বাদ।
"সাধুসহ পরিণয়, হইবেক সুনিশ্চয়,
অন্যথায় বিষম প্রমাদ॥
ডাক দিয়ে আন ভাটে, টীকা লয়ে স্বর্ণ টাটে,
সাধুর নিকটে যাক্ সেই।
"কর সব আযোজন, বিলম্বেতে প্রয়োজন,
নাহি আর সাধোক্কার এই॥"
আজ্ঞা শুনি মন্ত্রিবর, ডাকি সব পরিচর,
উদ্‌যোগ করিছে নানারূপ।
পুরমধ্যে বাজে শাঁক, রমণীমণ্ডলে র্জাক,
উথলিত আনন্দের কূপ॥
ভাট গুণ বাখানিয়া, উত্তরিল টীকা নিয়া,
সাধু সুখে করেন গ্রহণ।
অক্ষত কুসুম-চয়, সুগন্ধ চন্দন-ময়,
ধান্য দূর্ব্বা, শ্রীফল কাঞ্চন॥
টীকা পেয়ে বীরবর, প্রেমোৎফুল্ল কলেবর,
ঈষৎ হাসিত বিম্বাধর।
স্ফুটপ্রায় পদ্মকলি, প্রভাতে প্রফুল্ল অলি,
সুখের নাহিক অবান্তর॥
সুখী সহচরচয়, হাস্য-কথা কত কয়,
রহস্যের পরিসীমা নাই।
কেহ বলে শুভযাত্রা, সুখের নাহিক মাত্রা,
শুভক্ষণে করেছিলে ভাই॥
কেহ বলে এ যাত্রায়, তব ভাগ্য-লতিকায়,
ধরিল বিবাহ পুষ্পকলি।
এক যাত্রা ভিন্ন ফল, প্রজাপতি কার্য্য-বল,
দুরারোহ দুর্জ্ঞেয় সকলি॥
এইরূপ হাস্যরসে, দিনকর পাটে বসে,
আইল ক্ষণদা সুখ-প্রদা।

ঘন ঘন বাড়ে ঘোর, ফুটিল কুমুদ-কোর,
হাস্যমতী চন্দ্রিকা প্রমদা॥
বহে মন্দ সমীরণ, সমুদিত শুভক্ষণ,
সাধু চারু বর-বেশ ধ'রে।
সহিত বয়স্যগণ, করি যানে আরোহণ,
করি যায় বিবাহ-আসরে॥
বাজে বাদ্য মনোহর, নৃত্য-গীত ঘর ঘর,
হাস্য-রস কৌতুক-কলাপ।
বাঁধিয়া তন্ত্রীর তান, কলাবিৎ করে গান,
কত মত রাগের আলাপ॥
ভাটে পড়ে রায়বার, অন্তঃপুরে কুলাচার,
বাধাই বাধায় বরাঙ্গনা।
সভায় পণ্ডিতগণ, করে বেদ-উচ্চারণ,
কুল-দেবতার সমার্চ্চনা॥
মঙ্গল মুখীর গীত, মোহিত করয়ে চিত,
দুন্দুভির সহিত গাহনা।
সকল সুখের সৃষ্টি, বিবাহের শুভদৃষ্টি,
বর-কন্যা চাহনী-চাহনা॥
লজ্জা-নম্রমুখী বালা, মনে পড়ে পুষ্পশালা,
মনে পড়ে তথাকার কথা।
ঈষৎ হাস্যের রেখা, সুধাধরে যায় দেখা,
আধ ফোটা বন্ধুজীবে যথা॥
কভু বা বিশ্রম্ভ-রসে নেত্র নীল-তামরসে,
বিলসে মাধুরী মনোহরা।
আনন্দে প্রমত্তমতি, আশালতা পুষ্পবতী,
হৃদ্-কোষ নব-ভাব ভরা॥
পতি-বামভাগে বসি, হেরে প্রিয়মুখ-শশী,
বদ্ধাঞ্চল বসনে তাহার।
বাঁধা যথা মনে মন, কিবা তথা প্রয়োজন,
বসন-বন্ধন কোন্ ছার?
শুভলগ্ন শুভক্ষণ, কন্যা করে সমর্পণ,
মহীপ মাণিক্যদেব রায়।
প্রাজাপত্য সমাধান, দীন দ্বিজদলে দান,
সবে সুখে হইল বিদায়॥
প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশিত দশ দিশা,
ললিত পঞ্চম পিক গায়।
কেশর সুরভি সহ, প্রবাহিত গন্ধ-বহ,
তর তর স্বর সরে তায়॥

ভ্রমর কমল-কোলে, সরসী হিল্লোলে দোলে,
প্রবাহেতে পতিত পরাগ।
অরুণিত তাহে জল, টল টল ঢল ঢল,
কিবা জলে জলে ভানু রাগ॥

সচেতন সর্ব্বজন, নানামত আয়োজন,
বর-কন্যা বিদায় কারণ।
যৌতুকে কৌতুক মানি, কত রত্ন দিল আনি,
চতুরঙ্গ, তুরঙ্গ বারণ॥

দ্রব্যজাত কত মত, দাস দাসী শত শত,
কত কব বিশেষ তাহার।
রূপ গুণে বিদ্যাধরী, হেন রূপ সহচরী,
সঙ্গে সঙ্গে চলিল হাজার॥

দীয়াধারী * নাম ধরা, বুদ্ধিবৃত্তি বরতরা,
কেশ বনাইতে সুনিপুণা॥
কত ছলা কলা জানে, জ্ঞানবতী নানা জ্ঞানে,
যন্ত্রে, মন্ত্রে, তন্ত্রে বহুগুণা॥

মৃদাঙ্গ মোর্চ্চঙ্গ বীণা, বাদনেতে সুপ্রবীণা,
বয়সেতে কেবল নবীনা।
কটাক্ষে কামের শর, কলকণ্ঠে পিকস্বর,
পীন পয়োধরা মধ্যক্ষীণা॥

বিপুল কুন্তলভার, নবীন নীরদাকার,
নিবিড় নীলোৎপল-ভাতি।
যে হেরে তাদের পানে, মাধুরী মাদক-পানে,
হতজ্ঞান করে মাতামাতি॥

সঙ্গিনীগণেতে যার, এত রূপ অবতার,
তার রূপ বর্ণিব কেমনে।
চলিল রঙ্গিণী রঙ্গে, প্রিয় প্রাণপতি সঙ্গে,
রতি যথা স্বীয় পতি সনে॥

ঐরিণ্টের অন্তঃপুরে, প্রসন্নতা গেল দূরে,
মহিষীর চক্ষে বারি-ধারা।
সঙ্গিনী রহিল যারা, কাতরা হইল তারা,
বিগলিত অশ্রু হারাকারা॥

মাণিক্যের পদতলে, লোটায়ে ধরণীতলে,
বর কন্যা করিল প্রণাম।
জামাতার কর ধরি, বিহিত বিনয় করি,
কহিতেছে বচন ললাম॥

"শুন বাপা মহাশয়, যদিও উচিত নয়,
তব প্রতি উপদেশ-বাণী।
নিখিল কল্যাণ ভূমি, গুণের নিলয় তুমি,
জানি আমি তুমি অতি জ্ঞানী॥

তথাপি কহিতে হয়, শুন হে মঙ্গলময়,
এই মম কন্যা কর্ম্মদেবী।
জন্মান্তর পুণ্যবলে, প্রসন্ন ললাট-ফলে,
পাইয়াছি দেব-দেবী সেবি॥

জন্মিয়াছে যত দিন, হইয়াছে দুঃখহীন,
আনন্দে ভরিল এই দেশ।
বিবিধ বিনোদ সৃষ্টি, সময়েতে হয় বৃষ্টি
কোন গৃহে নাহি ক্লেশ-লেশ॥

নাহি আর সুত সুতা, এই সর্ব্বশুভযুতা,
গৃহানন্দ দায়িনী নন্দিনী।
যথা জনকেরে সদা, রত্ন-পরিকরপ্রদা,
জলধিজা জগৎ-বন্দিনী॥

পয়োধি মন্থন পরে, ধরি পদ্মালয়া করে,
লইলেন পুরুষ-উত্তম।
তদবধি পুণ্য লোক, গোলোকে পুলকালোক,
সদাকাল সুখ সমাগম॥

এখন সলিল-নিধি, পরিপূর্ণ নানা নিধি,
কিন্তু নিধি কমলা কোথায়?
কর্ম্মদেবী বিনে মোর, এ ঘর হইবে ঘোর,
হায় দুঃখ ভেবে প্রাণ যায়॥

আর কিছু ভিক্ষা নাই, তব স্থানে এই চাই,
যথাযত্নে রাখিবা ইহারে।"
এত বলি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি,
দৃষ্টি-পথ রোধ অশ্রুধারে॥

হেরিয়া পিতার গতি, মোহমুগ্ধ গুণবতী,
কর্ম্মদেবী মৌনমুখে রন।
ললিত লালন-স্নেহ, বাল্য-বিলসিত গেহ,
স্মরি স্মরি বিচলিত মন॥

আঁখি মুদি চারুশীলা, রথোপরি আরোহিলা,
স্রোতোমুখে নলিনী যেরূপ।
মুহূর্ত্তেক বৃষ্টি পরে, ভানু-প্রভা পরিকরে,
প্রতিপত্রে শোভা অপরূপ॥

কত ভাব সমুদিত, তাহে চিত সুমুদিত,
যেন নব ঝুমকা-কুসুম।

* দীয়াধরাণ অর্থাৎ দীপধারিণী, প্রত্যুত বিবিধ কলায় প্রভাম্বিতা।

মোহন সুরভি তার, সমীরণ সহকার,
আমোদিত করে পুষ্পভূম।।
চলিল রমণী রঙ্গে, প্রাণপ্রিয় পতি সঙ্গে,
কত রস সরস সন্তোষ।
ফুলবনে ফুলবাণে, বিমোহিত ধ্যানে জ্ঞানে,
যে হইল বিশদ বিলাস।।
তথা প্রেম-সরসিজ, হলো অঙ্কুরিত বীজ,
মুকলিত ললিত এখন।
হইয়াছে ফুল্লমুখ, হবে তায় কত সুখ,
আমোদ হিল্লোলে সন্তরণ।।
এমন সময় শুন, তূরীনাদ পুনঃ পুনঃ,
অদূরেতে নিনাদিত হয়।
তুরঙ্গের হ্রেষা রব, প্রান্তরের পশু সব,
দলে দলে পলায় সভয়।।
আসিতেছে এক দূত, রজোগুণী রাজপুত,
দশার্ণ দেশের অশ্বে চড়ি।
যথা সাধু বীরবর, তথা সেই অনুচর,
উপনীত হৈল দড়-বড়ি।।
শির নোয়াইয়া কয়, "শুন শুন মহাশয়,
রাজপুত্র অরণ্য-কমল।
এই পত্র আপনারে, সমর্পণ করিবারে,
আমারে দিলেন দূত-বল।।
যথাবিধি তদুত্তর, সত্বরে হে গুণধর,
পত্রযোগে করুন প্রদান।"
এত বলি পত্র দিয়া, রহে ঘোড়া থামাইয়া,
ভানু-অগ্রে যেমন অরুণ।।
মুদ্রা মুক্ত করি পরে, পত্র পড়ে কন্যাবরে,
উভয়ের চঞ্চল নয়ন।
দুই ভাব দুজনায়, দুই মুখ ভঙ্গিমায়,
বিভাসিত হইল তখন।।

পত্র

"শুন হে পুগল পতি মোহিল-কুমার।
কেমন আচার তব, কেমন ব্যভার?
মৃগেন্দ্র নন্দন যারে করিল বরণ।
ফেরু হয়ে তারে চাহ, করিতে হরণ।।
ফণি-মণি ধারণে ডুণ্ডুভ করে আশা?
কূপ-ভেক চাহে মন্দাকিনী-জলে বাসা?
মানাইতে চাহ যদি ক্ষত্রিয় ঔরস।
দেখাও পৌরুষ-বল রাখ কুল-যশ।।
পথ বন্ধ করি আমি রহিলাম এই।
রণে মুক্ত করি যাবে বীর-বংশ যেই।।
নতুবা কাতর * বলি করিব ঘোষণ।
ক্ষত্রিয় সমাজে আর না পাবে আসন।।
সূর্য্য, শশী, শর সাক্ষী, সাক্ষী তরবার।
রণং দেহি রণং দেহি, মোহিল-কুমার।।"
পত্র পাঠ করি বীর গর্জ্জিয়া উঠিল।
সিংহের হৃদয়ে যেন নারাচ ফুটিল।
প্রচণ্ড নয়ন যেন হোম-হুতাশন।
কিবা দিবা দ্বিপ্রহরে নিদাঘ-তপন।
থেকে থেকে ঘন ঘন কম্পিত শরীর।
পত্র প্রতি-উত্তর লিখিছে মহাবীর।।

প্রত্যুত্তর-পত্র।

"কি সাহস! কারে কটূ কহ কুলচ্যুত?
ইথে মানাইতে চাহ ক্ষত্রিয়ের সুত।।
ন্যায় ছেড়ে কটূ কহে যেই কুলাঙ্গার।
ধিক্ ধিক্ নহে সেই ক্ষত্রিয়কুমার।।
যে নিয়মে লয়েছি মাণিকা তনয়ায়।
গুপ্ত কিছু নহে তাহা রাজপুতনায়।
সকল দেশের লোক ছিল বর্ত্তমান।
ইহাতে কাতর আমি তুমি মতিমান্।।
অবশ্য করিব যুদ্ধ, প্রতিযোদ্ধা কই?
দেখা শুনা দুজনায় দণ্ড দুই বই।
মম তরবার জান অগ্নি-অবতার।
পড়িয়ে পতঙ্গ-প্রায় হবে ছারখার।।
এইরূপ পত্র লিখি দূতে দিল বীর।
বাহুড়িল অনুচর নোয়াইয়া শির।।
হেথা শুন সমাচার পত্র পাঠান্তরে।
যে ভাব উদয় হইল সতীর অন্তরে।।
হাস্যরসে ছিল বালা পতির সহিত।
একেবারে বিষণ্নতা ছিল বিরহিত।।
অকস্মাৎ পত্র পড়ি সে ভাব বিগত।
চারুবিম্ব সুধাধর আরক্তিমা-হত।।

* প্রতিযোগিতায় প্রাণভয়ে ভীরু ব্যক্তির নাম কাতর।

যেন মধুমাসে মন্দ মলয় মরুতে।
বিহসিত বন্ধুজীব বিনোদ তরতে॥
সহসা বায়ুর ভাব হইল বাত্যয়।
আবার উত্তর থেকে শীত বায়ু বয়॥
মুদিল মুকুল মুখ লাবণ্য যাইল।
ললিত ললাম লাল রঙ্গ শুখাইল॥
নিরখি সে ভাব সাধু অধর ধরিয়া।
প্রবোধ প্রদান করে আদর করিয়া॥
"কেন কেন কেন প্রিয়ে,
এমন হইল তব ভাব হে?
বীরবালা বীরে মালা দান করি
অভাব কি ভাব হে?
সাধ্য কার সমরে আমার
কেহ করে অপমান হে?
তব প্রসাদাৎ আমি সবে ভাবি
কীটের সমান হে॥
তব হাস্যমুখ হেরি মম হৃদে
কত তেজ বাড়ে হে।
অনুপম সুখ পাই সব দুঃখ
অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়ে হে॥
তাই বলি পরিহার কর সব
মন-মলিনতা হে।
মম চিত্ত-সরোবরে যাহে
হেলে দোলে প্রেমলতা হে॥
তোমার বচন সুধা যত
শ্রুতি বিবরে প্রবেশে হে।
ততই হৃদয় দেশে মন নাচে
মদমত্ত বেশে হে।
কি ছার সাহস করে ক্ষোভ দগ্ধ
অরণ্য-কমল হে?
অরণ্যকমলে সাধু ভাসে যথা
স্বর্ণ-শতদল হে॥
স্বর্ণ-শতদল পতি ভাঙ্গিবে
তাহার অহঙ্কার হে।
সুখে বসি হে প্রেয়সি দেখিহ
প্রতাপ কত কার হে॥"
এইরূপ প্রবোধ প্রদানি প্রেয়সিরে।
মুখাম্বুজে চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে॥
শুন হে পথিকবর, এমন কি হবে?
শাপভ্রষ্ট হয়ে তারা এসেছিল ভবে॥
এ অসুখভরা ধরা বাসযোগ্য নয়।
এই হেতু অল্পকালে তারা গত হয়॥
কহিতে মিলন-কথা বাড়িল শর্ব্বরী,
আজিকার মত কথা হেথা সাঙ্গ করি॥
কল্য অবশেষ সব কহিব তোমারে।
নিদ্রা আসি উপনীত হৈল নেত্রদ্বারে॥
এত বলি সারঙ্গের তান শ্লথ করে।
অমৃতের শেষ ধারা শ্রবণে নিঃসরে॥

ইতি তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত

চতুর্থ সর্গ

দিবা অবসান হয়, নভোলোক তমোময়,
ধূসরবরণা দিগঙ্গনা।
স্থির-নেত্রে দেখা যায়, শোভা পায় দীপ প্রায়,
দুই এক তারা খভূষণা॥
যেন নায়িকার আশে, প্রেমিকের হৃদাকাশে,
দুই এক ভরসার ভাতি।
একবার একবার, ভাবপথে অবতার,
হয়ে পুনঃ নিভায়ে সে বাতী॥
পরে প্রিয়া আগমনে, দীপ্ত হয় সেইক্ষণে,
আর তারে মলিন কে করে?
অস্ত ক্ষোভ দিনপতি, আশা তারা দীপ্তিমতী,
সুখশশী উদয় অন্তরে॥

তপনের তাপ মরে, হিমকর হিম করে,
সুশীতল করিছে সকলে।
বহে স্নিগ্ধ সমীরণ, দিনে ছিল হুতাশন,
সঙ্গগুণে দোষ গুণ ফলে॥
নিরখিয়ে কান্তমুখ, হৃদয়েতে কত সুখ,
হাস্যমুখী কুমুদিনী সতী।
তুষিবারে শশধরে, সৌরভ বিস্তার করে,
দিগ্ দিগন্তরে সদা গতি॥
ফুটিছে রসাল ফুল, কুহরিছে পিককুল,
প্রমোদেতে মকরন্দ পিয়ে।
বন বিনোদিনী লতা, শশী করে প্রফুল্লতা,
পাইয়ে প্রকাশ করে হিয়ে॥
গন্ধ বিতরণ করে, পথিকের মনোহরে,
এমন সুরভি চমৎকার।
অতি ক্ষুদ্র কলেবর, নাহি হয় সুগোচর,
কিন্তু গুণে সম কেবা তার?
লয়ে নব দম্পতীরে, চন্দনা তটিনী-তীরে,
রথ আসি উপনীত হয়।
সারাদিন শ্রমে অতি, হইল মন্থরগতি,
রথ-সংযোজিত হয়-চয়॥
ঘনীভূত স্বেদধারা, অঙ্গে বহে ফেনাকারা,
নত ভাব কেশর লাঙ্গুল।
আর আর যত জন, বাহক বাহনগণ,
সবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল॥
কহিছেন সাধু বীর, "সুখদ চন্দনা-তীর,
কর সবে হেথায় বিশ্রাম॥
পর-পারে রাঠোরেরা, পেতেছে আপন ডেরা,
এই মাত্র আমি শুনিলাম॥"
আজ্ঞা পেয়ে সবে যায়, স্থান লয় যে যেথায়,
বিভাবরী করিতে যাপন।
পর দিন হবে রণ, পর-পারে শত্রুগণ,
সাজি আসিয়াছে অগণন॥
এমত সময়ে শুন, দড় বড় পুনঃ পুনঃ,
অদূরেতে অশ্বপদ ক্ষেপ।
ওরিণ্টের অনুচর, আসিতেছে দ্রুততর,
লয়ে তাঁর বচন সংক্ষেপ॥
শুন বাপা মহাশয়, যা হবার তাই হয়,
যা ভেবেছি তাহাই ঘটিল।
ভবিতব্য ছিল যাহা, অবশ্য হইল তাহা,
কালগতি কেবল কুটিল॥
এখন উপায় চাই, আর ত বিলম্ব নাই,
শুনিয়াছি সব সমাচার।
মন্দ-গিরি * পরিহরি, ঘোর রণ বেশ ধরি,
অরণ্য-কমল আগুসার॥
সমরের সজ্জা ভারী, রাঠোর হাজার চারি,
আসিয়াছে রণমদে মেতে।
তার যোগ্য অনুবল, এনেছে প্রবল দল,
মিহিরজ নাগরিয়া জেতে॥
অতএব যোগ্য হয়, যথা তেন শত্রুচয়,
উপযুক্ত সেনা আয়োজন।
হবে তব অনুকারি, মোহিল হাজার চারি,
সত্বরেতে করিব প্রেরণ॥"
শ্বশুরের পত্রোত্তরে, কালব্যাজ নাহি করে,
লিখে সাধু স্বীয় নিবেদন।
"অবগতি মহোদয়, শত্রু প্রতি কিবা ভয়,
ধ্যান করি তব শ্রীচরণ॥
আসুক হাজার শত, করুক বিক্রম যত,
শৃগালস্বরূপ জ্ঞান করি।
যে আছে আমার বল, ভট্ট-কুল ভানু-দল
সপ্ত-শত বিক্রম-কেশরী॥
ইহাই যথেষ্ট হবে, রাঠোর এ ভীমাহবে,
ত্রাণ না পাইবে একজন।
অত্যাজ্য প্রসাদ তব, পঞ্চাশ মোহিল লব,
এইমাত্র মম নিবেদন॥"
পত্র লয়ে ধায় দূত, তারা প্রায় গতি দ্রুত,
অতি দূরে নিমেষে যাইল।
হইল যামিনী ঘোরা, বিগত অষ্টম হোরা,
সব নেত্রে সুষুপ্তি ছাইল॥
শশী অস্তাচলে চলে, যেন দিনে দীপ জ্বলে,
অরুন্ধতী উদয় বিমল।
শীতল সুগন্ধ বায়, চন্দনার কূলে ধায়,
তরল তরঙ্গ ঢল ঢল॥

* আধুনিক মন্দোরের প্রাচীন নাম। কোন গ্রন্থকার লেখেন, এই স্থানে ময় দানবের বসতি ছিল।

সেই সুমধুর স্বরে, ঘুম-ঘোর বৃদ্ধি করে,
একেবারে স্তব্ধ বসুমতী।
কিবা পশু পক্ষী নর, মৃত-কল্প কলেবর,
সকল জীবের এক গতি।।
পরিশ্রমে দুই দিন, কাতর নয়ন-মীন,
কর্ম্মদেবী কোলে রাখি শির।
যেন দময়ন্তী কোলে, নল মুগ্ধ নিদ্রা ভোলে,
সুখে নিদ্রা যায় সাধুবীর।।
কত সুখ স্বপ্নোদয়, হৃদয় মাঝারে হয়,
কভু হাস্য ছটা বিম্বাধরে।
বোধ হয় প্রিয়া সঙ্গ, বিলসিত অহরহ,
সন্তরিত সুখসরোবরে।।
আবার সে ভঙ্গি গত, যেন রৌদ্র-রসে রত,
উগ্রভঙ্গী অপাঙ্গ যুগলে।
কপোলে অনল জ্বলে, মধ্যাহ্ন ময়ূখ ছলে,
রক্ত ছটা স্থল-শতদলে।।
যেন লক্ষ্য করি অরি, ভয়ানক ভাব ধরি,
ভাসিতেছে সমর তরঙ্গে।
আবার সে ভাব গত, বিগ্রহ বিজয়ী মত,
অপরূপ শোভা ভুরু ভঙ্গে।।
মদ গর্ব্বে মত্ত মন, যেন করি আগমন,
প্রিয়া সন্নিধানে মহোল্লাস।
অরণ্য-কমল রণে, হত গত সেনা সনে,
একেবারে বিরোধ বিনাশ।।
এইরূপ কত ভাব; ক্ষণে ক্ষণে আবিভাব,
হইতেছে সাধুর হৃদয়ে
হায় রে স্বপন-মায়া, মিথ্যা-দৃষ্টি তোর জায়া,
কত ভ্রান্তি দেখাও উভয়ে।।
সবে সুখে নিদ্রা যায়, শিথিল শীতল কায়,
শুধু জাগরিত একজন।
কর্ম্মদেবী-নেত্রদ্বয়, তিলেক মুদিত নয়,
নিদ্রাবশ নহে একক্ষণ।।
হেরিয়ে নাথের মুখ, মনে মনে কত সুখ,
কভু দুঃখ সঞ্চারিত হয়।
একবার ভাবে মনে, "অনায়াসে এই রণে,
প্রাণপতি পাবেন বিজয়।।
নিত্য নিত্য নব নব, অনুরাগ মহোৎসব,
মাতিবে তাহাতে মন প্রাণ।

মন-আশা পূর্ণ হবে পতি-প্রেম সুধাসবে
প্রেম-তৃষ্ণা হবে অবসান।।
কপোত-দম্পতি মত, সোহাগ বাড়িবে কত
তিল আধ ছাড়াছাড়ি নয়।
হইবে চন্দনচয়, সাধুসম সদাশয়,
ধীরে ধীরে প্রসন্ন হৃদয়।।
বীরের নন্দিনী আমি, বীরবর মম স্বামী,
বীরপ্রসবিনী হব শেষ।
বাহুবলে পুত্রগণ, করিবেক সুশাসন,
বাড়িবেক পুগলের দেশ।।"
পুনঃ ভাবে অন্য মত, "রণে যদি হন হত,
আমার হৃদয় অধিকারী।
কি হবে আমার দশা, কোথা রবে এ ভরসা,
কোথা রবে আশা মনোহারী?
রাঠোরের বন্দী হব, দাসীব্রত লয়ে রব,
ভাবিলে তা হৃদয় বিদরে।
হায় হায় হরি হরি, আর কি উপায় করি,
কারে কব যে ভাব অন্তরে!
হায় কেন গুণ শুনে, বাঁধা গেল প্রেমগুণে,
অথল সরল মম মন?
হায় কেন এর সনে, দেখা হলো ফুল বনে,
প্রেম দীপ তাহে সন্দীপন?
হায় কেন সঙ্গোপনে, প্রেম ব্রত উদ্‌যাপনে
না করিনু কানন গমন?
সাধুর মঙ্গলোদ্দেশে, ধ্যানে ধরি পরমেশে
করিতাম জীবন যাপন।।
হায় কেন সভাস্থলে, বরমালা বরগলে,
দিতে পাঠালাম সহচরী?
যে কিছু আমার দোষ, ভেবে হয় হৃদ-শোষ
হায় হায় কি উপায় করি?
হায় প্রেম-কিশলয় সুখ-জলে উপজয়,
মম দুঃখ-জলে উপাজিয়া।
অকালেতে বুঝি তার, বিনাশ হইল সার,
প্রেম হৃদ যায় বা মজিয়া।।"
এইরূপ নানারূপ, চিন্তাজলে চিত্ত-কূপ,
প্লাবিত হতেছে মহিলার।
কভু আশা, কভু খেদ, হৃদে করে রাজ্যভেদ,
কভু করুণার অধিকার।।

নানারূপ তার রাগ, শোভিছে বদন-ভাগ,
কিরূপে তা করিব বর্ণন।
কত বর্ণ ফলাইতে, আছে কেবা এ জগতে,
চিত্র করে কেবা হেন জন ॥

যদি হেন থাকে কেহ, যথা ইন্দ্রধনু দেহ,
তুলী তুলি ডুবাইয়ে তলায়।
লেখে প্রতিকৃতি তার, তবে বুঝি সে শোভার,
কিঞ্চিৎ প্রকাশ প্রতিভায় ॥
সেইরূপ কিবা আর, বর্ণিব সে ভাব তার,
কত ভাব কত রাগ ধরে।
বাড়িল হৃদয়ে ব্যথা, প্রাতে ইন্দীবরে যথা,
বিন্দু বিন্দু নীহার নিঃসরে ॥
সেইরূপ অশ্রুধার, বিগলিত মুক্তাকার,
নিপতিত সাধুর বদনে।
জাগিয়ে উঠিল বীর, দেখি ভাব প্রেয়সীর,
"কেন কেন?" জিজ্ঞাসে সঘনে ॥
"কেন কেন কেন পুনঃ বিষণ্ণ বদনাম্বুজ তব হে।
হায় হায়, প্রাণ যায়,
জাগিয়ে পোহালে নিশি সব হে ॥
অতি আদরের তুমি যতন-বিরহে বুঝি মম হে।
নিদ্রা না যাইলে প্রাণ,
আজ রাত্রি কাল-রাত্রি সম হে ॥
গত দিন নরপতি যে কহিল বিদায়ের কালে হে
যতন করিতে তোমা,
যথা উপযুক্ত ভূপ বালে হে ॥
কি ছার দুর্নীতি মম,
যে দিন পাইনু সেই ভার হে।
সেই দিন অনাহারে
হেলন করিনু আমি তার হে ॥
ক্ষম অপরাধ মম, প্রিয় তমে, প্রাণের আধার হে।
আর হেন দোষ কভু
না হইবে, প্রেয়সি, আমার হে ॥
এসো এসো মম কোলে,
শ্রান্তি দূর কর কিছুক্ষণ হে।
জাগরণে ঢুলুঢুলু, ছল ছল যুগল নয়ন হে।
তাহে মম অনাদরে,
ধারাকারে সলিল বলিছে হে।
সহে না সহে না, সেই জলে মম হৃদয় দহিছে হে ॥
দেখিহ দিবসে আজি,
তব দাস-বিক্রম-প্রতাপ হে!
শুভ যাত্রা হয় যাহে তাই
কর প্রিয়ে ত্যজিয়ে বিলাপ হে ॥"
এত বলি কোলে সাধু লয়ে প্রমদায়।
কর্ম্মদেবী কন, "নাথ এ কি ব্যবহার।
কেন মিছে অনুযোগ কর আপনার ॥
তুমি যথা আছ, মম রোদনে কি কাজ।
সত্য কথা কহি নাথ পরিহরি লাজ ॥
তুমি নিদ্রা গেলে সবে মম নিদ্রা নাই।
তাহে শত্রু নিকটেতে মনে ভয় পাই ॥
কি জানি নিশীথকালে বুঝিয়ে সময়।
ছলে কলে আসি যদি তব প্রাণ লয় ॥
প্রহরী হইয়ে গেল তৃতীয় প্রহর।
নিদ্রা আসি নেত্রদ্বারে হলো অগ্রসর ॥
তেঁই সে অলসে আঁখি অশ্রুভারে নত।
মিছে আত্ম অনুযোগ কর নাথ কত ॥
নিদ্রা না হইবে গতপ্রায় বিভাবরী।
যাই গিয়ে জাগাই হে যত সহচরী ॥
চন্দনার চারু জলে করিব হে স্নান।
পূজিব তাহার তীরে দেব ভগবান ॥
তোমার মঙ্গল নাথ, লইব মাগিয়ে।
বিধিমতে ইষ্টলাভ এ নিশি জাগিয়ে ॥
করিব মঙ্গলাচার মঙ্গল স্মরিয়ে।
দেখাব হে পূর্ণঘট নয়ন ভরিয়ে ॥
আমারে আদর কর মৃগাক্ষী বলিয়ে।
দেখিব সে মৃগ যবে যাবে হে চলিয়ে ॥
বামে শব চাই প্রভু, বব শবাকার।
যদবধি চাঁদমুখ না দেখিব আর ॥"
এত শুনি সাধুর নয়নে অশ্রুহার।
চুম্বই চন্দ্রমামুখে অমৃতের ধার ॥
উঠিলা হসিতমুখী হিরণা-বরণী।
উষাতে উষার প্রায় প্রকাশে ধরণী ॥
যায় যথা সখীকুল নিদ্রায় আকুল।
নিশায় মুদিত যেন দিবসের ফুল ॥
কারু চারু কবরী লোটায় ধরাতলে।
নামিল নিবিড় মেঘ বুঝি ভূমণ্ডলে ॥
নিদ্রাযোগে মুখে হাসি সৌদামিনী প্রায়।
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় ক্ষণে লোপ পায় ॥

ঈষৎ বিভিন্ন কারু বিম্ব ওষ্ঠাধর।
দেখা দেয় মুক্তা-পাঁতি শোভার আকর॥
বাহুরে বালিশ করি রাখিয়াছে শির।
আহা মরি মৃণালে কি রাতুল রুচির॥
কেহ বা সুষুপ্তি ভোগ করে উভরায়।
নাসিকায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ধায়।
যথা দাব-দগ্ধ মৃগী মৃতকল্প হয়ে।
ঘন ঘন নিশ্বাস বিহায় রয়ে রয়ে॥
কর্ম্মদেবী সকলের শিরে হাত দিয়ে।
মধুস্বরে নাম ধরে দেন জাগাইয়ে॥
যেন ভানুকর-পরশনে পদ্মকুল।
জাগিল সঙ্গিনীগণ হাস্য-সমাকুল॥
চলিল চন্দনা-স্নানে চঞ্চলচরণে।
মরালীমণ্ডলী যথা যমুনা-জীবনে॥
লাফাইয়া পড়ি জলে দিতেছে সাঁতার।
জল-কেলি-কলাযুতা অপ্সরা আকার॥
কেহ স্রোতে অঙ্গ ঢালে পৃষ্ঠে রাখি ভর।
হেমলতা ভাসে যেন জলের উপর॥
হায় রে জগৎ-লীলা বুঝে উঠা ভার।
এক পারে হাস্য-লীলা কৌতুক অপার॥
অন্য পারে সমরের সাজ ভয়ঙ্কর।
ছাড়িয়ে বিশাল দীপ্তি মশাল-নিকর॥
দূরে থেকে দেখা যায় উড়ছে নিশান।
সংগ্রাম-পুঙ্গব-শিরে ভীষণ বিষাণ॥
বাজিতেছে রণতূরী ভেরী ঢাক ঢোল।
মাঝে মাঝে হর হর শব্দে মহাগোল॥
কিন্তু রাজপুত-পুত্রীগণে কিবা ভয়?
আর পারে কেলি-কলা-রসে মগ্ন রয়॥
প্রভাতের প্রভাকরে প্রাচী হাস্যবতী।
জল ত্যজি স্থলে উঠে যতেক যুবতী॥
সেই দিন সবে কর্ম্মদেবীরে সাজায়।
যার যত নিপুণতা প্রকাশিছে তায়॥
চমরীর দর্পহরা চাঁচর কবরী।
বিনাইয়া দেয় চন্দ্রচূড়া সহচরী॥
তরুণী তরলা সখী পূর্ণিত পুলকে।
ভাল ভূষিতেছে ভাল অগুরু-তিলকে॥
অঞ্জনা নামেতে আলী লইয়ে অঞ্জন।
সাজাইছে সুরঞ্জন নয়ন-খঞ্জন॥

মুক্তালতা নামে সখী লয়ে মুক্তামালা।
সমাদরে সাজাইছে ভূপতির বালা॥
কি ছার সে মোতিহার, কিবা জ্যোতি তার?
সে অঙ্গ-সমীপে হলো মলিন আকার॥
বাহুযুগে দিল সখী বলয়, বিজটা।
করকান্তি কাছে তার হারি মানে ছটা॥
হীরকের কর্ণ ফুল শোভে কর্ণমূলে।
পাইয়ে উত্তম স্থান বুঝি হেলে দুলে॥
কনক-কিঙ্কিণী পেয়ে কটিতটে স্থান।
আনন্দে মাতিয়ে করে মধুস্বরে-গান॥
আইলা সুচেলা সখী লইয়ে বসন।
ঘাঘরা ওড়না চেলী কাঁচলী-কষণ॥
ঘন নীল চারু পট্ট-বসন-ফলক।
মাঝে মাঝে স্বর্ণ-পট্টি দিতেছে ঝলক॥
কত বা কৌশল সব পিন্ধন-পিধানে।
যে চতুরা হয় তাহে, সেই ভাল জানে॥
অঙ্গের বলনা ছাঁদ লুকাতে প্রয়াস।
অথচ সকল ভঙ্গী হইবে প্রকাশ॥
যথা কবিতায় রস-ভূষণ প্রদান।
কখন না হয় যেন রস মূর্ত্তিমান॥
ঢাকিবে উপরে কিন্তু রাখিবে এরূপ।
যাহে প্রকটিত প্রতি রূপ প্রতিরূপ।
হইল বিন্যাস-বেশ বিনোদ-বিশেষ।
যেন লক্ষ্মী ধরাধামে করিলা প্রবেশ॥
বসিলেন বরারোহা পূজার আসনে।
ধ্যানে ধবিলেন ধনী ধ্বান্ত-বিনাশনে॥
মহাধ্বান্তহারী তেজ যেই ধ্বান্ত হরে।
প্রতিদিন চলাচল সুপ্রকাশ করে॥
যাঁর শৈত্য-সুধায় কৃতার্থ সুধাকর।
যাঁর শ্বাসে সমীরণ বহে নিরন্তর॥
যাঁর তাপে হুতাশনে তাপন-সঞ্চার।
যাঁর কৃপা-বারিগুণে তুষার সুধার॥
সর্ব্বত্র সমান তিনি সর্ব্বত্র মঙ্গল।
বিদ্যমান সর্ব্বস্থলে নিখিল নিষ্কল॥
হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম এই সর্ব্বভূতে যিনি।
যত্র তত্র কর পূজা জানিবেন তিনি॥
জল, স্থল, আকাশ, সমীর, বৈশ্বানর।
দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্র-নিকর॥

তরু-লতা, পাষাণ, প্রতিমা নানামত।
দৃশ্যমান এ জগতে পঞ্চীকৃত যত ॥
উপাস্য না হয় তারা, উপাস্য ঈশ্বর।
যিনি যেই সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত নিরন্তর ॥
রাজপুত্র পূজে তাঁরে দিনকর-করে।
প্রভাত প্রদোষে হেরে ভাব-ভক্তি-ভরে ॥
পূজা অন্তে পদ্মমুখী প্রণমিলা পদে।
স্তব করে মৃদু-মধুস্বরে ধ্রুবপদে ॥

গীত

রাগ-ভৈরব

দিনকর, দয়া কর তমোহর,
হর মম তাপ তমোনিকর।
তুমি হে প্রভু সবিতা, জীব-শিব-প্রদায়িতা।
সর্ব্বসুখ-প্রেরয়িতা, পোষয়িতা পরাৎপর ॥
তরুণ-অরুণাশ্রয়, করুণা বরুণালয়,
দেহি মে করুণাময়, করুণা-বারি-শীকর।
তুমি হে কাল-জনক, মূরতি তপ্ত কনক,
সকল ক্ষণ-গণক, ত্বং হি ত্রিকাল ঈশ্বর।
মনোমত প্রিয়বরে, পেয়েছি তোমার বরে,
অরুন্তুদ অরিকরে, রক্ষ প্রভো প্রভাকর ॥

স্তব অন্তে প্রমদা প্রণত পূর্ব্বমুখে।
চাহিতে দেখেন পতি দাঁড়ায়ে সম্মুখে ॥
গললগ্নীকৃতবাস, মুখে মৃদু চারু হাস।
ভক্তিরসে অপরূপ-রূপের প্রকাশ ॥
নাথে হেরি বিনোদিনী কন ধীরে ধীরে।
"কি আজ্ঞা আছে হে প্রিয় কহ এ দাসীরে
এত যে পুরুষ ভাব পুরুষের মন।
দ্রবীভূত অভিভূত শুনিয়ে বচন ॥
প্রেয়সীর কাছে সাধু লইতে বিদায়।
আশা-মাত্র বচন-বিকাশ বড় দায় ॥
মনেরে ধৈরয-ডোরে বাঁধিয়ে যতনে।
কহিতেছে কথা বীর অমিয় বর্ষণে ॥

"আইলাম বিধুমুখি,
বিদায় লইতে তব কাছে হে।
নিবেদন তব প্রতি
আমার আর কি বল আছে হে ?
জয়াজয় রণে পণে
নিশ্চয় কখন কিছু নয় হে।
গ্রহ-দোষে যদি প্রিয়ে
হয় মম রণে পরাজয় হে ॥
যদি আমি প্রাণে মরি ;
শুন সতি প্রিয়ে, পতিপ্রাণা হে।
এই করো প্রাণেশ্বরী
কৃশোদরী সুশীলা-প্রধানা হে ॥
হের দেখ হরিণাক্ষি,
ঈশানে অচল শোভা পায় হে।
তব ভ্রাতা মেঘরাজ
স্বসেনায় আছেন তথায় হে ॥
সমরান্তে তথা গিয়া
লবে প্রিয়ে তাঁহার শরণ হে।
শত্রুহস্তে কোন মতে
না হইবে তোমার পতন হে ॥
অনন্তর সাবিত্রী-শেখরে গতি
করি পতিব্রতা হে।
সুপবিত্র যতি-ধর্ম্ম
ধারণ করিহ স্বর্ণলতা হে ॥
দেহত্যাগে পুনরায়
মিলন হইবে সূর্য্যলোকে হে।
আর না ভূগতে কভু হইবে
বিরহ ঘোর শোকে হে।
নিরন্তর জুড়াইবে,
জুড়াইব, প্রেমামৃত-পানে হে।
না হবে বিভিন্ন ভাব
চিত্ত রবে সদা একতানে হে ॥
নাহি তথা জন্ম জরা
জব জ্বালা যন্ত্রণা জড়িমা হে।
অন্তহীন যৌবনের
অধিকা অসীমা মহিমা হে ॥
নাহি তথা পাপ পঙ্ক,
নাহি তথা ত্রিতাপ-তিমির হে

সদাকাল পুণ্যের প্রতাপে
দীপ্ত বিমল মিহির হে ॥
যদি আমি তোমা ত্যজি
আগে যাই সেই সুখধামে হে।
ভেব না ত্বরায় সুখী
হবে তুমি সিদ্ধমনস্কাম হে ॥”
শুনিয়ে পতির কথা কহিছেন সতী।
“কেমনে কহিলে নাথ এমন ভারতী ॥
তুমি যাবে পরপারে হেথা রব আমি।
এমন কি হয়? আমি হব অনুগামী ॥
নিকটে থাকিব আমি না থাকিব দূরে।
হেরিব ঐ মুখ-শশী মন-সাধ পূরে ॥
যদি শ্রান্ত হও নাথ তুষিব সেবায়।
শ্রম নিবারিব তব অঞ্চলের বায় ॥
যদি হে আহত রণে হও গুণধাম।
বিশল্য ঔষধে ক্ষত করিব আরাম ॥
ধুইব অসৃক্-ধারা নয়নের জলে।
মুছাইয়ে দিব অঙ্গ বিমুক্ত কুন্তলে ॥
রণস্থলে বাড়াই উৎসাহ-প্রবাহ।
পরাইব মন-সাধে পদে উপানহ ॥
পরাইব শিরস্ত্রাণ সন্নাহ সুন্দর।
বেঁধে দিব সরাসন সিরোহী খঞ্জর ॥
কি ভয় আমার নাথ সংগ্রামের স্থলে?
রাজপুত্র-তেজ-অগ্নিময় দেহে জ্বলে ॥
যদি মম ভাগ্যদোষে ঘটে অমঙ্গল।
তা ভাবিয়ে নহি আমি ক্ষণেক বিকল ॥
তব অনুগামী আমি জীবনে মরণে ॥
চল নাথ এ দাসীরে সঙ্গে লয়ে রণে ॥”
শুনি প্রেয়সীর বাণী সাধু নিরুত্তর।
নদী পারে যেতে সবে কহিল সত্বর ॥
এমন সময়ে আসি অনুচর কয়।
“রাঠোরের দূত এক শিবিরে উদয় ॥
এই পত্র আনিয়াছে শুন গুণাকর।”
পত্র লয়ে করে, পাঠ করে, বীরবর ॥

পত্র

“শুন ওহে ভট্টি-কুল ভূপাল-নন্দন।
তব সহ সম্মুখ-সংগ্রাম অশোভন ॥
মম সহ সহস্র সহস্র দলবল।
অনুবল মিহিরজ যেন আখণ্ডল ॥
তব সঙ্গে আছে ভট্টি কতিপয় শত
ইহাতে সম্মুখ-রণ নহে ন্যায়মত ॥
ইথে অপযশ মম ঘুষিবে সকলে।
অতএব দ্বন্দ্বযুদ্ধ * উচিত এ স্থলে ॥
জানিতে বাসনা তব কিবা অভিলাষ।
বিলম্ব না হয়, তাহে কার্য্যের বিনাশ ॥”
পত্র পাঠ করি সাধু হসিত অধর।
অমনি পাঠায় লিখি তাহার উত্তর ॥

প্রত্যুত্তর

“শুন হে মন্দোর-পতি রাঠোর-কুমার।
যাহা অভিরুচি তব, তাহাই আমার ॥
ফলে পূর্ব্বকল্পে নাহি দ্বিধাভাব মম।
সহস্র রাঠোর সহ শত ভট্টি সম ॥
তবু তব লোক-লজ্জা-রক্ষণ আশয়।
তব মতে মত মম অন্যমত নয়।
আমার বিলম্ব নাই জানিহ বিশেষ।
নদী-পারে যাইবারে দিয়াছি আদেশ ॥
চন্দনার পুলিনে নেমেছে সেনা সবে।
অবিলম্বে পর-পারে উপনীত হবে ॥”

ভাঙ্গি কুশ কাশ বেণা, পুলিনে নামিল সেনা,
কিবা শোভা হেরি চন্দনায়।
প্রভাত-ভানুর করে, কিবা ঝক্‌মক্ করে,
আয়স-কবচ সব কায় ॥
সকলের আগে আগে, বিমল অম্বরভাগে,
উড়িতেছে ভট্টির নিশান।
প্রভাত পবনে রঙ্গে, উড়িছে এমন ভঙ্গে,
বিপক্ষে কি করিছে আহ্বান?
বাহিনীর মধ্যখানে, আরোহী তুরঙ্গ-যানে,
সাধু যান লয়ে বনিতারে।
ঊর্দ্ধে কিছু দৃষ্ট নয়, কেবল বল্লমচয়,
শোভা পায় কানন-আকারে ॥

---

* উভয়পক্ষের সম্মুখে উভয়পক্ষীয় দুইজন নির্ব্বাচিত প্রতিযোগীর যুদ্ধের নাম দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

অগ্রভাগে জয়তঙ্গ, নয়নে লোহিত রঙ্গ,
বীরমদে মত্ত অবিরত।
পাহু-বংশে অবতার, সিংহ সম মহামার,
শিরোদেশ বিশেষ আয়ত॥
ব্যাঘ্রসম ভয়ঙ্কর, সঙ্গে শত ধনুর্দ্ধর,
স্বল্প বটে, যুদ্ধে যমদূত।
মরণে নাহিক ভয়, আরোহিয়ে হয়চয়,
নদী পার হয়ে যায় দ্রুত॥
তুরঙ্গের পদাঘাতে, ধ্বনি হয় তরঙ্গেতে,
গভীর মধুর সেই ধ্বনি।
চপর্ চপর্ চপ, ঝপ ঝপ ঝপ ঝপ,
শ্রবণে শ্রবণে স্বপ্ন গণি॥
আবর্ত্তে পড়েছে কেহ, অস্থির তুরঙ্গ-দেহ,
ঘুরিয়া বেড়ায় পাকে পাকে।
কিন্তু সে সৈন্ধব হয়, তথাপি ব্যাকুল নয়,
গরজিয়া উঠে ঘোর ডাকে॥
তুলিয়া বিপুল পুচ্ছ, আবর্ত্ত করিয়া তুচ্ছ,
তেজে উঠে ধায় তুরঙ্গম।
লূতাতন্তু-জালিকায়, বরটা কি ধরা যায়,
বিষম তাহার পরাক্রম॥
অবিলম্বে সেনাচয়, পারে অবতীর্ণ হয়,
বাছিয়া লইল নিজ স্থান।
পড়িল ছাউনী ঠাট, সমর-পশরাহাট,
ক্ষণমাত্রে হয় শোভমান॥
এই হলো নিরূপণ, পরাহ্নে হইবে রণ,
পূর্ব্বাহ্নে ভোজন-পান কাল।
বিশ্রাম-বিলাস-ভরে, সবে পরিশ্রম হরে,
যথাকালে উদয় বিকাল॥
শ্রমেতে অবশ অঙ্গ, নিদ্রা যায় জয়তঙ্গ,
যেন সুপ্ত ভুজঙ্গ ভীষণ।
কাছে অশ্ব অভিরাম, শ্রীপঞ্চকল্যাণ নাম,
প্রভুর প্রহরী অনুক্ষণ॥
হেনভাবে খাড়া আছে, মক্ষিকা না যায় কাছে,
কি সাধ্য শত্রুর সমাগম।
দূর থেকে নাগরিয়া, জয়তঙ্গে নিরখিয়া,
আরোহিয়া নিজ তুরঙ্গম॥
উপহাস করণাশে, ধেয়ে যায় তার পার্শে,
অমনি পাহুর অশ্ববর।

চরণ উন্নত করি, উগ্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরি,
বিঘোষণ করে ঘোরতর॥
জাগিয়া উঠিল পাহু, প্রসারণ করি বাহু,
দেখে শত্রু অদূরে উদয়।
জিজ্ঞাসিছে হাস্য করি, "কি বাসনা অনুসরি,
হেথায় আইলে মহাশয়?
হেরি মোর নিদ্রাঘোর, গুপ্তচর কিবা চোর,
সেইরূপ দেখি তব ধারা।
ছি ছি এ কি ক্ষাত্রধর্ম্ম, ধিক্ ধিক্ হীনকর্ম্ম,
হইয়াছ বুদ্ধি-শুদ্ধি হারা॥"
শুনি মিহিরজ কয়, "এ রহস্য মন্দ নয়,
রণ-ব্রতে ব্রতী যেই জন।
নাহিক তাহার দায়, যুদ্ধকালে নিদ্রা যায়,
ন-ভূত ন-ভাবি এ ঘটন॥
নিকটে আইলে দোষ, দেখাও আক্রোশ রোষ,
মিছে ঘুম ঘুমাইবে কত।
সুখদ সংগ্রামক্ষেত্রে, চির-নিমীলিত নেত্রে,
সুখে নিদ্রা যাবে অবিরত॥"
জয়তঙ্গ তদুত্তরে, কহিতেছে হাস্যাধরে,
"দেখা যাবে কত শক্তি কার।
কে কারে পাড়ায় ঘুম, মিছে কেন ধাম-ধূম,
সে ঘুমের মন্ত্র তরবার॥
আমার বিলম্ব নাই, এই সজ্জা ধরি ভাই,
একমাত্র প্রার্থনা আমার।
ফুরায়েছে পান-পাত্র, অলস অবশ গাত্র,
চাহি কিছু সুধার উধার॥"
বলামাত্র মিহিরজ, যথা রক্ত-সলিলজ,
বর্ণ ধর মদিরা মোহন।
আপনি আনিয়ে দিল, অন্য পাত্র করে নিল,
উভয়েতে করিল গ্রহণ॥
পানান্তে উভয় বীর বাহুড়িয়া যায়।
আপন আপন দলে প্রকাশে প্রভায়॥
দুই দল হৈতে আসি রণবাদ্য কর।
বাজাইল ঘোর বাদ্য ঝাঁঝরা ঝাঁজর॥
বাদ্যঅন্তে প্রতিহারী করিল ঘোষণ।
বিদ্রোহের হেতুবাদ করিয়া বর্ণন॥

অরণ্য-কমলের প্রতিহারী

"নাগর পতির পুত্র মিহিরজ নাম।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শৌর্য্য-বীর্য্য-ধাম ॥
মন্দোরের যুবরাজ তাঁর বন্ধুবর।
বন্ধু অপমান শোধ হেতু অগ্রসর ॥
এই হয় ক্ষাত্রধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মযুদ্ধে রিপুকুল পাইবেক ক্ষয় ॥"

সাধুর প্রতিহারী

"পাহুকুলদীপ এই জয়তঙ্গ বীর।
পরাক্রমে প্রভঞ্জন প্রতাপে মিহির ॥
বীর-চূড়ামণি সাধু সাধুর প্রধান।
মানীর সম্মান তাঁর প্রাণের সমান ॥
কারো মান নাশে তাঁর নাহি কভু মতি।
যেই দেয় হেন দোষ সেই দুষ্টঅতি ॥
ন্যায়ের বিপক্ষে যেই রণে মত্ত হয়।
সেই রণে পরাজয় তাহারি নিশ্চয় ॥
এই জয়তঙ্গ বীর জয়ের নিশান।
কে আছ হে শত্রুদলে তাঁহার সমান ?"

মিহিরজের উক্তি

"সাজ হে সাজ হে যত সাজ বারগণ।
নিজ নিজ সমযোগ্য সহ কর রণ ॥"

জয়তঙ্গের উক্তি

"ন্যায় ধর্ম্মে সকলে রাখিয়ে নিজ চিত।"
প্রতিকুল প্রতি দেহ শাস্তি সমুচিত ॥
আদেশ পাইল, অমনি ধাইল,
বাজিল সমর তুরী রে।
ভাগে ভয়াতুর, হিয়া দুরু দুর,
ঝঞ্জরী ঝলরী ভূরি রে ॥
বাধিছে ঝগড়া, নাদিছে দগড়া,
কড়া কড়া কড়া করি রে।
বাজিছে ঝম্প, সহিত ডম্ফ,
লম্ফ দম্ভ ভরি রে ॥

বাজনের তাল, পরম রসাল,
সেই তালে তাল রাখি রে।
কাঁপাইয়ে ঢাল, যায় সেনাপাল,
শিরোদেশ সব ঢাকি রে ॥
গোমুখে যেমতি, ভাগীরথী গতি,
বাঁধা ছিল কিছু কাল রে।
করিবল বলে, ভেদিল অচলে,
ধাইল স্রোত বিশাল রে ॥
বাজনের বলে, সেইরূপ চলে,
উভয় দলের সেনা রে।
শিরোপরে পর, উড়ে ফর ফর,
তরঙ্গে উঠিল যেনা রে ॥
দুই খর নদী, মিলে আসে যদি,
ভাবহ ভাবুক দল রে।
ভাঙ্গি ঝক্কা ঝোড় ভয়ানক তোড়,
শত পাকে ফেরে জল রে ॥
হয় কাটাকাটি, না হ কারো ঘাটি,
সমরে উভয় সম রে।
সবে সমগুণ, কেহ নহে উন,
কেহ নহে কিছু কম রে।
আপন আপন, বাদী যেই জন,
তারি সহ সেই লড়ে রে ॥
রণে প্রাণ যায়, চিত্তে এই চায়,
সুখে রণভূমে পড়ে রে ॥
সে রণ বিস্তার, কি বলিব আর,
শুনহ ভ্রমণকারী রে।
আমি হীনমতি, বিহীন ভারতী,
স্বরূপ রচনে নারি রে ॥
যুঝে দুই বীর, রুধিরে শরীর,
প্লাবিত হইল অতি রে।
খর তরবার দামিনী আকার,
অম্বরে করিছে গতি রে ॥
পরাক্রমে পাহু, খ্যাত মহাবাহু,
মিহিরজ মিহিরজ রে।
তুল্য দুই জন, করিতেছে রণ,
যেন দুই দিগ্‌গজ রে ॥
কিবা মনোহর, দুই হয়বর,
তীর তারা সম ধায় রে।

মুখে ফেন লাল, খাড়া কেশজাল,
স্বেদ বহে সব কায় রে ॥
আখেটক প্রায়, ছুটে ছুটে যায়,
প্রভুর মানস বুঝে রে।
খুলে খাঁড়া খাপ, মারে কোপকাপ,
সহিত প্রতাপ যুঝে রে ॥
শির ঘাড় ভাঙ্গি, মারিতেছে টাঙ্গি,
লোহে যায় রাঙ্গ শরীরে।
উচ্চ স্বর কারি, কেহ কহে হরি,
কেহ কেহ মরি মরি রে।
কাটা কারো শির, কাহার শরীর,
বেঁধা শত তীর-ফলে রে।
কেহ গাঁথা শূলে, দুই আঁখি তুলে,
পড়িয়ে ধরণীতলে রে ॥
এইরূপে সমর হইল ঘোরতর।
রুধিরের স্রোত বহে ধরণী-উপর ॥
কেউ রবে ফেরুপাল ফেরে পালে পাল।
নর-মেদ-মাংস খায় আনন্দে বিশাল ॥
রণস্থলে শকুন গৃধিনী দলে দলে।
পাকে পাকে ফেরে কোলাহল কতূহলে ॥
জয়তঙ্গে মিহিরজে যুদ্ধ অনুপম।
কারু মাত্র কোনক্রমে নাহিক বিভ্রম ॥
ধূলায় ধূসর তনু যেন ধূমময়।
তাহে রুধিরের ধার স্বেদসহ বয় ॥
হয় ত্যজি দুই বীর ধরণী-উপর।
অতি ঘোর অসি-যুদ্ধে হলো অগ্রসর ॥
ক্ষণে ক্ষণে সামালিয়া লইতেছে চোট।
ক্ষণে বসে জানু পাতি ক্ষণে দেয় ঘোট ॥
ঢালেতে লাগিছে চোট পট পট্ রবে।
পটহ বাজিছে যেন আনন্দ উৎসবে ॥
কি চিকণ চালাকী, চতুর-চূড়ামণি।
চপল চরণ কিবা চপলা-চলনী ॥
চকিতে পড়িছে ধবা, চকিতে উঠিছে।
চকিতে যুটিছে, পুনঃ চকিতে ছুটিছে।
কতক্ষণ পরে কর্ম্ম দেখহ বিধির।
স্খলিত-চরণ হৈল মিহিরজ বীর ॥
অমনি ক্ষণেক পাছু বিলম্ব না করি।
প্রহারিল কণ্ঠে তার অসি ভয়ঙ্করী ॥

পড়িল বীরের চূড়া মিহিরজ নাম।
জয়নাদ ভট্টির শিবিরে অবিশ্রাম ॥
রাঠোর-শিবিরে সবে হলো বিষাদিত।
অরণ্য-কমল-মুখ কমল মুদিত ॥
তবু রণে নাহি ভঙ্গ দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ভিড়ি।
সম্মুখ-সংগ্রামে সবে খুঁজে স্বর্গ-সিঁড়ি ॥
কিবা চমৎকার ব্রত, কিবা চমৎকার।
পরদ্বন্দ্বে দেহ-দানে, পরহিত সার ॥
শেষ প্রায় সমুদায় বীরের প্রধান।
হইল সমর ক্ষেত্র শ্মশান সমান ॥
অনন্তর সাধু সদাশয়।
অরণ্য-কমল সহ সমরে প্রবিষ্ট হয় ॥
কর্ম্মদেবী দুই করে, সজ্জা লয়ে যত্ন-ভরে,
সাজাইতে সমাদরে, স্বীয় প্রিয় রসময় ॥
রূপ হেরি রতি পায় লাজ।
বিধাতার আদ্য সৃষ্টি যুবতীগণ সমাজ।
চকিত মৃগ-লোচনা, অমৃত-মিত-বচনা,
কিবা ভুরুর রচনা, বাহিরে অলি বিরাজ ॥
কল্যাণী কমলা-অবতার।
কুল-কমল-আকরে ফুল্ল পদ্মিনী আকার।
গুণময়ী চারুশীলা, লীলা হেতু জনমিলা,
প্রিয়বরে সাজাইলা, কিবা শোভা চমৎকার।
কুরুবক-নিভ দুটি কর।
বিচিত্র কবচ-দানে ঢাকে নাথ-কলেবর।
শিরে দিল শিরস্ত্রাণ, কৃপাণ করিয়ে দান,
অশ্রুজলে করে স্নান, নয়ন নীলেন্দীবর ॥
হেরি বীর হইল ব্যাকুল।
কোলে লয়ে প্রেয়সীরে চুম্বয়ে-মুখ রাতুল।
শিরে দিয়ে পদ্মপাণি, কহিছে আশ্বাস-বাণী
"ধৈর্য্য ধর হে কল্যাণি, কালী রাখিবেন কুল ॥
রণে মারি রাঠোর দুর্জ্জয়।
জয় জয় রবে আমি ফিরিব সন্ধ্যাসময়।"
এত বলি পুনরায়, চুম্বি প্রাণপ্রমদায়,
রণস্থলে ধায় বায়, আরোহণ করি হয় ॥
ও দিগেতে অরণ্য-কমল।
বীরমদে ক্রোধমদে আরক্ত আঁখি-যুগল ॥
আরোহি তুরঙ্গবর, হইলেক অগ্রসর,
হরি সহ যুঝিবারে যেন আখণ্ডল ॥

মিলিল আসিয়ে দুই বীর।
বঙ্কিম ভাবেতে চূড়া উন্নত আয়ত শির।
যেন এক সিংহী তরে, দুই সিংহ রণ করে,
গরজিত ঘোর স্বরে, কম্পিত দুই শরীর॥
কিরূপে বর্ণিব সেই রণ।
বর্ণনায় বর্ণ হারে, কে পারে করিতে বর্ণন?
কোন বীর নহে ঘাটি চটাপটি কাটাকাটি,
ফুটি সম ফোটে মাটি, তুরগ-খুর-ঘাতন॥
ভীষণ গর্জ্জন ঘন ঘন।
যেন দুই দ্বিপ-দ্বন্দ্বে দিগন্তে করে ঘোষণ।
কিবা জহ্নু মুনি-কন্যা, ধারা-পাতে ধরা ধন্যা,
আইলে প্রবল বন্যা, গরজে অ.ত ভীষণ॥
জ্বলে চারি চঞ্চল নয়ন।
যেন আসি চারিখণ্ডে উদয় হলো তপন।
চারি চক্ষে রক্তচ্ছবি, অনল লম্ভিত হবি,
কিবা কালান্তের রবি, প্রকাশ করে গগন॥
হতচিত যত সেনাগণ।
দুই বীর পরাক্রম দূরে করে নিরীক্ষণ।
বচাবচ দুই দলে, ধন্য সাধু কেহ বলে,
কেহ অরণ্যকমলে দেয় জয়-সম্বোধন॥
তরবার ঘোরে বন্ বন্।
সিন্ধুতটে শত পাকে আবর্ত্ত ফেরে যেমন।
এই সোজা এই বঙ্ক, কটিতটে ঝুলে টঙ্ক,
টুটে তরবার অঙ্ক, বরিষয়ে হুতাশন॥
টপাটপ টপকে টাঙ্গন।
নিজ নিজ প্রভু-প্রাণ রক্ষণেতে সযতন।
বিপক্ষের অসি লক্ষ্যে, স্থাপন করিয়া চক্ষে,
বাঁচাইছে নিজ পক্ষে, চালনা করি চরণ॥
অস্ত্রাঘাতে অরণ্যকমল।
যেন দিবা দ্বিপ্রহরে লোহিত সহস্র দল।
প্রায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু রণে জ্ঞানহত,
বিষম বিক্রমে রত, হৃদে জ্বলে ক্রোধানল॥
হের দেখ এমন সময়।
হয় ছেড়ে সাধুবীর ধরায় পতিত হয়।
পুনঃ না উঠিতে বসি, অরণ্যকমল পশি,
হৃদয় উপরে রুষি, মারিল অসি দুর্জ্জয়॥
যেন যজ্ঞোপবীতের প্রায়
মুহূর্ত্তেকে কাটিলেক সাধুর কাঞ্চনকায়।

রণভূমে ডাকে শিবা, বিগত হইল দিবা
ভানু অস্ত শোভা কিবা, সিন্ধুর জলে লুকায়॥
ভট্টির শিবিরে হাহাকার।
কি হইল কি হইল মুখে মাত্র সবাকার।
আমাদের সবে ফেলে কোথা সাধু কোথা গেলে
বিষম শোকাগ্নি জ্বেলে করিলে হে ছারখার!
কর্ম্মদেবী কনক-লতার।
শুখাইল চারুমুখ প্রদোষ-কমলাকার।
ছিন্নমূলা যেন লতা, নিপতিতা পতিব্রতা,
ক্ষণেক চৈতন্যহতা, নয়নে সহস্রাধার॥
ক্ষণেকে হইয়ে সচেতন।
প্রহারিয়ে পুনঃ পুনঃ কপালে কর-কঙ্কণ।
পূর্ব্বকথা সকাতরে, শোকমগ্ন ভগ্নস্বরে,
কহিছেন সহোদরে, পরিহরি রোদন॥
"আর মম জীবনে কি ফল ভাই,
আর বল বাঁচিয়ে কি ফল?
নাথ-শোকে হৃদয় বিকল ভাই,
জ্বলে যেন প্রবল অনল॥
এ অনল জুড়াইতে আছে ভাই,
কেবল সে চিতার অনল।
দেহ তার আয়োজন,
এই শেষ ভিক্ষা ভাই করহ সফল॥
পতিব্রতা পত্নী যেই,
পতিব্রতে রতি তার, জীবনে মরণে।
হারাইয়ে পতিধন,
যতি-ব্রতে ব্রতী সেই হইবে কেমনে?
একান্ত যাহার রতি মতি
সেই পতিপদ-পঙ্কজ-পূজনে।
কেমনে যাইবে বিভু বিশ্ব-পতিধ্যানে,
নিদিধ্যাসনে মননে?
কপোতিনী কপোত ধিয়ায়,
হায়! বিধি আনি মিলাইল তায়।
হইতে না হইতে মিলন-সুখ,
ঘটিল বিরহ ঘোর দায়॥
কোথা থেকে আইল নিষাদ ক্রূর,
কপোতে মারিল বিষবাণে।
কাতরা কপোত-বধূ বিরহের-বাণে।
কিবা আশ্বাস পরাণে?

উদয়-অচলে দিনকর,
হেরি হাস্যমুখী হয় কমলিনী।
হাসিতে না প্রকাশিতে মুখ,
মেঘরাশি আসি করিল মলিনী ॥
কোথা লুকাইল দিনকরে,
হায়! সরোজিনী বাঁচিবে কেমনে?
জীবনে জীবন-আশা ছাড়ে সেই,
তার মাত্র জীবন তপনে ॥
তাই ভাই যাই সেই লোকে
যথা মম হৃদয়ের ধন।
আর মিছা প্রবোধে কি কাজ হায়!
বিহনে সে জীবন-জীবন ॥
নন সাধু সামান্য মানুষ ভাই!
শাপভ্রষ্ট জনমিলা কাম।
কিছু দিন করি খেলা চলি গেলা নিজস্থান,
যথাযোগ্য ধাম ॥
এত বলি শারদ সরোজ-মুখী,
অভিষিক্ত অশ্রু-হিম-হারে।
পতি-খর-কৃপাণ লইয়ে করে,
স্বীয় বাম বাহুতে প্রহারে ॥
ছিন্ন কর ভূষণ সহিত,
সহোদর হস্তে করি সমর্পণ।
কহে, "শুন শুন ভাই,
করিহ পালন মম চরম বচন ॥
আমাদের কুল-কবিবরে,
দিও এই হস্ত রতনমণ্ডিত।
সতীত্বের সঙ্গীত আখ্যানে ভাই,
গান যেন দাসীর চরিত ॥"
অনন্তর ভ্রাতারে কৃপাণ দিয়ে
কহিতেছে বিনত বচন।
"করবালে ছেদহ দক্ষিণ বাহু,
হোক মম সুখেতে মরণ ॥
এই হস্ত পাঠাইও আমার।
হৃদয়-নাথ-পিতার নিকটে।
জানিবেন এই কথা তিনি ভাই,
বধূ তাঁর সুতযোগ্য বটে ॥
পিতা-স্থানে দাসীর এ শেষ ভিক্ষা,
সাধু সহ দহি কলেবর,
এই স্থানে সরসী খনন করি,
নাম দেন কর্ম্ম-সরোবর ॥"
বাণী-শেষে ধরাসনে বরাননা,
পতি-পাশে পতিতা হইলা।
সেনা মাঝে উঠিল রোদন-ধ্বনি,
সবে কহে, ধন্য পুন্যশীলা ॥
দ্রবীভূত ক্ষত্রিয়-হৃদয় সব,
যাহাদের ব্যবসা সমর।
যাহাদের রুধিরে পুলক,
বহে তাহাদের নয়ন-নির্ঝর ॥
শোকস্বর উঠে, উভয় সেনায়,
নিরাশ্বাস অরণ্যকমল!
কর্ম্মদেবী জীবন ত্যজিলা শুনি,
হলো অতি হৃদয়ে বিকল ॥
শত শত আঘাত শরীরে,
তবু তাহে কিছু না ভাবে যাতনা।
কর্ম্মদেবী-শোকে দহে প্রাণ,
কোনমতে আর না মানে সান্ত্বনা ॥
ভাবে আমি পাপী নরাধম,
পতিপ্রাণা সতী প্রাণনাশ-হেতু।
রতিপতি অনর্থের মূল,
ধিক্! ধিক্ রে ধিক্ রে মীনকেতু ॥
এ রমণী-রতন-অযোগ্য আমি,
বীরবর সাধু যোগ্য বর।
এ প্রেম পঙ্কজ-বনে আমি দুরাচার,
ছার দ্বিরদ-সোসর ॥
হেথা মেঘরাজ মতিমান,
চিতা সাজাইল মহা আড়ম্বরে।
স্তূপে স্তূপে চন্দনের সার,
চন্দনার তীরে, শোভে স্তরে স্তরে ॥
সর্জ্জরস গুগ্‌গুলু প্রভৃতি,
নবনীত ঘৃত শত শত ভার।
পুণ্য-পয়স্বিনীর সলিল,
বিস্মিত যত, প্রয়োজন আর ॥
সাজাইল নেতের বসন চারু,
রজতের পালঙ্ক সুন্দর।
শোয়াইল তাহাতে যুগল তনু,
প্রাণগতে দৃশ্য মনোহর!

বিহসিত উভয় শবের মুখ
মরণেতে এত রূপ ঘটে !
সেই ভাব বর্ণিব কি আর আমি,
ভাবহ ভাবুক চিত্তপটে ।
সাধু, সাধু-প্রিয়া মগ্ন প্রেমহ্রদে ।
ভাব রে ভাবুক জনগণ !

সে ভাবের ভাবুক কোথায় !
কে ভাবে সে ভাবের কারণ ?
জ্বলিল বিষম হুতাশন,
কালানল সম সেই বৈশ্বানর ।
দহিল কাঞ্চন-তনুদ্বয় চারু,
কোথা বা সে মাধুরী নিকর ?

এই দেহে মিছা অভিমান হায় !
ইথে লোক যত্ন কেন করে ?
মাটির শরীর এই, মাটি হবে পরে,
কথা জানে সব নরে ॥
বিচেতন শোকে মন প্রাণ
কর্ম্মদেবী-প্রিয়-সহচরীগণ

ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রমে, জ্ঞানহারা,
দাবা-দগ্ধ মৃগীস্বরূপ লক্ষণ ॥
বেড়ে চিতানল, মুখে রব,
কোথা গেলে দেবি ! দেখা দেহ সতি !
তোমা ভিন্ন কি কাজ জীবনে,
হায় ! আমাদের কি হইবে গতি ?

সহচরীদিগের উক্তি-গীত

"হায় ! এ সময়ে সতি, রহিলে কোথায় ? হায় !
তোমা ভিন্ন চারুশীলে, কি কাজ এ শূন্য কায় ?
ধন্য ধন্য পুণ্যবতী, দেবী-অংশ তুমি সতী,
পবিত্র এ বসুমতী, তোমার কৃপায় হায় ।
তুমি নিজ পুণ্যবলে, দিব্য লোকে গেলে চ'লে,
দাসীদের স্নেহচ্ছলে, আর কে সুধায় ? হায় !
আমাদের প্রীতি জন্য, নাহি ছিল ভাব অন্য,
সবে সহোদরা গণ্য, করিতে মায়ায় ! হায় !
চারি মাস অন্তে, হয়ে অন্তরে বিকল ।
প্রাণত্যাগ করিলেন অরণ্য-কমল ॥
সাধুর হইল যেই দিনেতে পতন ।
সেই দিনে কমলের চৌমাসী ঘটন ॥
সেই বৈর শোধনার্থ পুরুষানুক্রমে ।
ভট্টিসহ রাঠোর যুঝিল পরাক্রমে ॥
অবশেষে ভট্টিদের হইল বিজয় ।
গ্রাম্য গীতে সে সকল ব্যক্ত দেশময় ॥
যেই সরোবর-কথা কহিলে ধীমান্ ।
সেই কর্ম্ম-সরোবর পুণ্যতীর্থ স্থান ॥
রত্নশিলা বিরচিত সতীর আকৃতি ।
ধরাধামে অবতীর্ণা যেন দেবী ধৃতি ॥
সতীত্ব সাধ্বীত্ব গুণে বরণীয়া অতি ।
অধুনা তাহার তুল্য আছে কে বা সতী ?
এ হেন অমূল্য নিধি ধরায় কি ধরে ?
দিব্যলোকে পতি সহ সুখে কাল হরে ॥
এত বলি নিবারিলা সারঙ্গের তান ।
শ্রোতৃগণ যেন মুগ্ধ মধুপ সমান ॥

শূরসুন্দরী

[রাজস্থানীয় বীরবালা বিশেষের চরিত্র]

(পাঠ—প্রথম সংস্করণ : ১২৭৫ বঙ্গাব্দ)

মঙ্গলাচরণ ॥ কবিতাশক্তির প্রতি

কোথা গো কবিতা সতি সুধাস্বরূপিণী।
কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিনী ॥
তুয়াপদ-সরসিজ পরিহরি আমি।
হইয়াছি বিফল চিন্তার অনুগামী।
সে চিন্তাগরলে মম মন জর জর।
স্থির নহি ঠাকুরাণি! কাঁপি থর থর ॥
বহুদিন দেখি নাই শান্তিমুখশশী।
দিবানিশি ঘেরিয়াছে মলিনতা মসী ॥
অনুতাপে অনুদিন কাঁদি উভরায়।
ভাবি আমি কি কর্ম্ম করিনু হায় হায় ॥
তুমি মম কিশোর কালের সহচরী।
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা বিভাবরী ॥
বিজনে তটিনীতটে শষ্পশয্যা করি।
তরুচ্ছায়ে মৃতবায়ে সুখে শ্রম হরি ॥
তুমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি।
দেখাইতে নিসর্গের যত রূপরাশি।
স্থলজ জলজ পুষ্প-প্রকাশ-মাধুরী ॥
বিধাতার তাহে কত চিকণ চাতুরী ॥
তুমি চারু মন্ত্রবলে মোহিতে নয়ন।
অতি পুরাতন বস্তু হইত নতন ॥
দিনকর নিত্য নিত্য নব ভাব ধরি।
বিস্তারিত দিগন্তরে লাবণ্য লহরী ॥
এই যেন নব জবা কুসুম-সঙ্কাশ।
এই তপ্ত কাঞ্চনের প্রতিভা প্রকাশ ॥
সে কাঞ্চনে তুমি দিতে অপূর্ব্ব রসান।
নিরখিয়া হইতাম আনন্দে অজ্ঞান ॥
প্রদোষে পশ্চিম দিকে সিন্দূরের রাগ।
যেন সোম করে তথা অগ্নিষ্টোম যাগ ॥
বিন্দু বিন্দু হিম-পাতে স্নিগ্ধ দিক্ দশ।
সোম-মুখ হতে কিবা চ্যুত সোমরস ॥
উদয়ে তারকাবলী, তব সহোদরা।
শিয়রেতে বসি প্রজ্ঞা, দেবীরূপধরা ॥
কহিতেন কত কথা সীমা নাহি তার।
ভ্রান্তি-অপগমে মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বার ॥
স্তম্ভিত হইত তনু অভিভূত মন।
সে ভাব কি কেহ ব্যক্ত করেছে কখন ॥
শেখর সাগর-শোভা প্রথমে যখন।
নয়ন ভরিয়া আমি করি দরশন ॥
দর দর প্রপতিত পুলকাশ্রুবারি।
সে ভাবের কণামাত্র বর্ণিতে কি পারি ॥
ফিরাইতে নারিলাম যুগল নয়ন।
নিরমল নীলনিভা নিমজ্জিত মন ॥
বেলাকূলে অপরূপ শোভার সঞ্চার।
উপজিত অপণিত হীরকের হার ॥
ইন্দ্রনীল হিল্লোলেতে বিষদ ঝলকে।
অমনি অদৃশ্য হয় পলকে পলকে ॥
তমোময় মানুষের মানসে যেমন।
বিজ্ঞান-বিমল-বিভা দেয় দরশন ॥
এখন সে সব ভাব বল গো কোথায়
ইতর ধাতুর লোভে ক্ষোভে প্রাণ যায় ॥
কোথায় আছ গো দেবি দেহ দরশন।
আর আমি পাব নাকি শান্তি-সংমিলন ॥
কভু কভু স্বপ্নাবেশে হইয়া উদয়।
অপ্সরার বেশে মুগ্ধ কর গো হৃদয় ॥
জাগ্রতে ছায়ার প্রায় কভু দেহ দেখা।
শূন্যে জাত যথা মন্দাকিনী ফেনলেখা।
ধরি পায় কৃপা করি হৃদি সিংহাসনে।
বসো গো বিনোদদাত্রি লয়ে স্বীয়গণে ॥
ভাবামৃতে মুগ্ধমন কর একবার।
রচিব পুরাণকথা সুধার ভাণ্ডার ॥
করিয়াছ মম প্রতি কৃপা বারদ্বয়।
এবারেও যেন মম লজ্জারক্ষা হয় ॥
তোমা বিনা জ্ঞান হয় সব অন্ধকূপা।
ছেড়ো না গো মম সঙ্গ থাকিতে অরূপা ॥
দেহ ভাবরূপিণি গো! লেখনীতে বল।
এইমাত্র আশা মম কর গো সফল ॥
স্বদেশীয় সতীগণ অবলা অখলা।
জ্ঞানবলে বুদ্ধিবলে কর গো সবলা ॥
ছল বল কৌশলের কতই বিস্তার।
দুরন্তের হাতে নাহি তাদের নিস্তার ॥
এইমাত্র কর, শূরসুন্দরীর মত।
দুষ্টদল অভিসন্ধি করিয়া বিহত ॥
গৃহমেধি ফলদাত্রী হউন সকলে।
ভারতে ভাবিনী ধন্যা লোকে যেন বলে ॥

কটক
১লা আশ্বিন ১২৭৫ বঙ্গাব্দ।

সূচনা

একদিন কর্ম্মদেবীকথা সাঙ্গ পরে।
কহেন দ্বিজেন্দ্র-কবি, পথিক-প্রবরে ॥
"মহারাণা লিখেছেন, শুন মহাশয়।
যাইতে উদয়পুরে যদি ইচ্ছা হয় ॥
তব আগমন আর বিনোদ উদ্দেশ।
লোকমুখে হইলেন বিদিত বিশেষ ॥
দেখিবে সে রাজধানী অতি মনোহর।
পেশলা নামেতে যথা রম্য সরোবর ॥
গিরিকূটে উচ্চতর প্রাসাদনিকর।
চারু শ্বেত উপলেতে গ্রথিত বিস্তর ॥
কি বর্ণিব ত্রিপোলিয়া শোভন তোরণ।
বাদল-মহলপুরী পরশে গগন ॥
যত্র শাহ্‌জাঁহা খ্যাতি লভি মহাবীর।
ধরাধীশ-পদপ্রাপ্ত গতে * জাঁহাগীর ॥
শ্রীসূর্য্য-মহলে বার দেন মহারাণা।
বিচিত্র বিভব তথা নিরখিবে নানা ॥
অপরূপ কেলিগৃহ জগৎ মন্দির।
চারি ধারে বহে চারু সরসীর নীর ॥
প্রস্ফুটিত সহস্র সহস্র শতদল।
কনকপরাগে জল বহে ঢল ঢল ॥
পবন-মোদিত হয়ে তার পরিমলে।
ধীরে ধীরে ফিরে সেই বিচিত্র মহলে ॥
যথা নির্ব্বাসনে ছিল আক্‌বর সুত।
মহারাণা প্রেম-গুণে হয়ে হর্ষযুত।
চল চল চল হে পথিক গুণাকর।
দেখিবে উদয়পুর নগর সুন্দর ॥

* কথিত আছে, উদয়পুরে মহারাণার বাদল-মহলে আতিথ্য-গ্রহণ-করণ-কালে যুবরাজ খুরম পিতৃ-বিয়োগ-সমাচার প্রাপ্ত হওনান্তে শাহাজাঁহা নাম ধারণপূর্ব্বক প্রথমাভিষিক্ত হন।

আর তব উদ্দেশ ফলিবে বহুমত।
শুনিতে পাইবে সত্য ইতিহাস কত ॥"
পথিক কহেন, "যদি এইরূপ ঘটে।
অবশ্য উদয়পুরে যাবা যোগ্য বটে ॥
আপনি যদ্যপি যান তবে করি গতি।
নয়ন সার্থক করি হেরি হিন্দুপতি ॥
জানিলাম এইবারে সিদ্ধ মনোরথ।
কৃতার্থ হইবে আসা এই দূরপথ ॥"
এইরূপে দুইজন কথা স্থির করি।
প্রফুল্ল হৃদয়ে চলে উদয়নগরী ॥
বিগত পথের শ্রম বিবিধ কথায়।
কত দিনে উপনীত হইল তথায় ॥
বিহিত আদরে রাণা তুষিলা দোঁহারে।
নিত্য নিত্য নব কথা হয় দরবারে ॥
রাণাকুলকাণ্ড কথা গাথা গ্রন্থ কত।
গ্রন্থাগারে পথিক দেখেন শত শত ॥
হেমন্তে একদা এক পত্র পাঠ করে।
জিজ্ঞাসা করেন প্রিয় বন্ধু দ্বিজবরে ॥
"কহ কবি এ পত্রের মর্ম্ম সবিস্তার।
কেবা এই পৃথ্বী সিংহ কবি গুণাধার ॥
লিখেছেন মহারাণা প্রতাপ নিকটে।
'কাহারও নিস্তার নাই নৌরোজা-সঙ্কটে ॥'
কিবা এ নৌরোজাকাণ্ড বুঝিতে না পারি।
কহ কহ অনুগ্রহে বিশেষ বিস্তারি ॥
অচিরপ্রভার প্রায় দীর্ঘ বিভাবরী।
বিগত হইবে সুখে দীপ্তি দান করি ॥"
শুনিয়ে কবীন্দ্র আরম্ভিলা ইতিহাস।
শারঙ্গে শারদা আসি হইলা প্রকাশ ॥
নাচিতে লাগিলা যত রাগিণীর সঙ্গে।
সৃজিল সুরস-রঙ্গ গানের প্রসঙ্গে ॥

প্রথম সর্গ

ভ্রমভরা এই ভবে মানুষের মন।
কবে কোন্ ভাবে থাকে নহে নিরূপণ॥
এই শান্ত দান্ত, ক্ষান্ত ভ্রান্তির প্রলোভে॥
এই পাপপঙ্কে মগ্ন ভগ্ন চিত্ত ক্ষোভে।
এই ঋষি বিবেকের ভক্তদাস অতি।
এই মোহমাদকে প্রমত্ত ঘোর মতি॥
এই ছিল বিদ্যারসে রসিক সুজন।
এই অবিদ্যার বশ মূর্খ অভাজন॥
এই প্রিয়া পরিণীতা বনিতার বশ।
এই পরকীয়া-প্রেমে পিয়ে সুধারস।
এই মত্ত মাতঙ্গের মত বলবান্।
এই ক্ষীণ ক্ষুধাতুর কিশোর সমান॥
তড়িৎ জড়িত যথা জলদঘটায়।
শশলেখা দেয় দেখা শশীর ছটায়॥
কমলে কণ্টক যথা সাগরে লবণ।
স্থান বিবেচনা যথা না করে পবন॥
সেইরূপ মানুষের গতি স্থির নয়।
এই এক রূপ, এই অন্য রূপ হয়।
এক ক্ষণে পাপজ্ঞানে যার প্রতি রোষ।
পরক্ষণে সেই পাপে চিত্ত পরিতোষ॥
কে বুঝিতে পারে এই ভবের মরম।
কিছুই নহেক স্থির ইহার চরম॥
এ সুধায় কেন বিস-সঞ্চার ঘটিল।
এ ক্ষীর কলস কেন কুরসে নটিল॥
বিমল হইবে কবে কেহ না জিজ্ঞাসে।
ঘনঘটা মোহ-মেঘ হৃদয় আকাশে॥
ভেবে ভেবে পরিহার করিয়া আশ্রম।
কেহ যায় বনে, সেও ব্যর্থ পরিশ্রম॥
মনে ভাবে ত্যজিয়াছি প্রবৃত্তিসঙ্গম।
সঙ্গী সব পাপহীন স্থাবর জঙ্গম॥
কিন্তু হায় এ কথার মীমাংসা কোথায়।
বনে কেন বিবেকী পাতক-পথে যায়।
সুরগুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি মহাবশ।
এমন নিষ্কামী কেন কামেতে বিবশ॥
ধর্ম্ম ধ্যান ধৃত পরাশর বীতরাগ।
মীনগন্ধা-প্রতি কেন তাহার সোহাগ॥
বৃন্দা-বিলোকনে কেন ধর্ম্ম ধর্ম্মহীন।
সতীশাপে কলিকালে হইলেন ক্ষীণ॥
কামিনী-কুহকে নারদের নানা গতি।
হরিল হরিণনেত্রা হরিপদে রতি॥
কিছুই না থাকে বোধ সম্বন্ধ-বিচার।
ভ্রাতৃপ্রেম বন্ধুপ্রেম হয় ছার খার॥
অশ্বিনীকুমার সম এক-তনু মন।
সুন্দ উপসুন্দ নামে দনুজ দুজন;
তন্বী তিলোত্তমা তরুণার তন্ত্রবলে।
ভ্রাতৃভেদ গৃহচ্ছেদ বিলীন বিপলে॥
কোথায় সুমেরুচূড়া স্বর্ণপত্তন।
রম্ভাশাপে রাবণের সবংশে নিধন॥
কোথা গেল হস্তিনার বিপুল বিভূতি।
যাজ্ঞসেনী-রোষানল-যজ্ঞের আহুতি॥
যতদিন মানুষের ধর্ম্মে থাকে মতি।
ততদিন সব দিগে উদিত উন্নতি॥
অধর্ম্মে ধাইলে রতি অমনি সংহার।
ক্ষীরপূর্ণ কুম্ভে যথা অম্লসঞ্চার॥
ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায় যত কিছু সার।
বিনাশের হাতে আর না থাকে নিস্তার॥
যথা ফল ফুল দল পল্লব শোভন।
বনের ভূষণ তরু নয়ন লোভন॥
অন্তরে লাগিলে কীট ক্রমশঃ শুখায়।
সহসা বাহিরে কিছু দেখা নাহি যায়॥
দিল্লীর দোর্দ্দণ্ড দর্প দীপ্ত দশ দিশি।
মোগলমার্ত্তণ্ডে নষ্ট নৃপনিন্দা নিশি॥
বিচার বিজ্ঞান-বীজ করিয়া বিস্তার।
করিল হিতের সৃষ্টি অশেষ প্রকার॥
তৈল যথা তোয় সহ সংমিলিত নহে।
হবি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে॥
ভুজঙ্গের প্রতি যথা বিরাগী নকুল।
হিন্দু-মুসল্মানে হেন ভাব প্রতিকূল॥
এমন বিষম বৈর করি সংহরণ।
হুমায়ুন-বংশ-যশে ভরিল ভুবন॥
কত কীর্ত্তিকলাধর কহিতে কে পারে।
বিবিধ বিবুধ রত্ন দিল্লীরূপ হারে॥
মহাকবি দহলবী আমীর-প্রধান।
অদ্যাপি যাহার গান রসের নিধান॥

অদ্যাপি যাহার পুণ্য-প্রবাহ কৃপায়।
স্নান পান করি লোক দেহে প্রাণ পায়॥
গোপালনায়ক গুণী কলিতে তুম্বুরু।
খোসরুকে মানিল বলিয়া গানগুরু॥
আর সেই দুই ভাই গুণের সাগর।
বিদ্যাব্রতে পতন করিল কলেবর॥
প্রবেশিল বারাণসী বিপ্রবেশ ধরি।
অসাধ্য সাধিল শ্রুতি স্মৃতি শিক্ষা করি॥
যথা ভীমার্জ্জুন ধরি ব্রাহ্মণের বেশ।
দুর্গম মগধ-দুর্গে করিল প্রবেশ॥
আর সেই ধীর বীরবর বীরবর।
যার ঋণ শুধিতে নারিল আকবর॥
যার বুদ্ধিকৌশলের যাই বলিহারি।
যবন-দানবদল গর্ব্ব খর্ব্বকারী॥
হিন্দুর রাখিল মান বিবিধ বিধানে।
দুই দলে প্রতিপত্তি তুল্য পরিমাণে॥
দিয়ে দান হিন্দু রাজবালা দিল্লীশ্বরে।
রাজপুরে স্বদেশের বলবুদ্ধি করে॥
জয়পুর-অধিপতি করি কন্যাদান।
দিল্লীপতি-কৃত প্রাপ্ত অতুলসম্মান॥
তাঁর সুত মানসিংহ বিক্রমে বিশাল।
বাঙ্গালায় নবাবী করিল কত কাল॥
মোগলসেনার ছিল প্রধান সেনানী।
ভগিনীর প্রসাদাৎ মান হৈল মানী॥
সেই পথে পথিক মরুর অধিকারী।
অকলঙ্ক কুলে পঙ্কপ্রদ দুরাচারী॥
কেবল মেবার-পতি প্রতাপকেশরী।
বিশুদ্ধ রাখিল কুল প্রাণপণ করি॥
মোগলের ছলে বলে না হইল বশ।
প্রকাশিল অনুপম বীরত্ব ওজস্॥
প্রাচীতে রেকান, পশ্চিমেতে তুর্কীস্থান।
একচ্ছত্রা শাসন করিল সেই মান॥
যাইতে যবনদেশে মন নাহি সরে।
যবন প্রবাদ একে কুলশশধরে॥
আবার আটক-পারে রাজাদেশে যেতে।
কোনরূপে আশা আর না রহিল জেতে॥
মোগলপতির চারু উপদেশ-বাণী*।
লঙ্ঘিতে নারিল মান নিল মনে মানি॥
কিন্তু কুলকলঙ্কেতে দুঃখী সদা মান।
জাতি নাশে হত মান, সদা ম্রিয়মাণ॥
বল বল, বুদ্ধি বল, ধন যশ বল।
কুল গেলে কেন হয় মানুষ বিকল॥
কি কাণ্ড কুলের কাণ্ড জাতি-অভিমান।
ধরা পরিহরি কবে হবে অন্তর্দ্ধান॥
কবে সবে এক জাতি করিবে স্বীকার;
এক ভাবে জাতীশ্বরে দিবে নমস্কার॥
এই জাতি বহুতর অনর্থের মূল!
ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল॥
দাক্ষিণাত্য জয় করি মানসিংহ রায়।
উদয় উদয়পুরে জাতির আশায়॥
রাণার সহিত করি একত্রে ভোজন।
পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপন মনন॥
প্রতাপ পাঠায়ে দেন আপন কুমারে।
মানসিংহে যথা-সমাদরে আনিবারে॥
রাণারে না দেখি মান ভোজন-সময়ে।
কুমারে জিজ্ঞাসা করে ম্লানমুখ হয়ে॥
"কহ তাত মহারাণা কেন অনাগত।
তদভাবে ভোজন না হয় সুসঙ্গত॥"
কুমার কহেন, "পিতা অসুস্থশরীর।
আপনি বসুন ভোজে হইয়ে সুস্থির॥"
মান কহে, "বুঝিয়াছি অসুস্থ-কারণ।
কহ তাত ভবিতব্য কে করে বারণ॥
রাণার প্রসাদ ভিন্ন এবে গতি নাই।
তিনি যদি জাতি দেন তবে জাতি পাই॥"
শুনিয়ে সে কথা রাণা আসিয়ে নিকটে।
কহিলেন, "যা কহিলে সব সত্য বটে॥

* আকবর শাহের আদেশানুসারে মানসিংহ আটক পার হইয়া ম্লেচ্ছদেশে যাইতে অস্বীকার পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের নিম্নলিখিত জ্ঞানপূর্ণ বাক্যে তাঁহার আর আটক থাকিল না। যথা—
"সব হি ভূম্ গোপালকা, ইস্‌মে অটক কঁহা।
জিস্‌কা মন্‌মে অটক হৈ বহি অটক্ রহা॥"

কিন্তু কহ প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমনে।
তোমার ভগিনী গত যবনভবনে ॥
বিষ-বিসর্পণে হলে রুধিরে বিকার।
কেমনে ধরিবে পুনঃ কান্তি আপনার ॥"
সে কথায় শুখাইল মানের বদন।
পঞ্চগ্রাস অন্ন শিরে করিয়া ধারণ ॥
তুরঙ্গে উঠিয়ে কহে সরোষ বচন।
"আমাদের জাতিপাত তোমারি কারণ ॥
তনুজা অনুজাগণে দিয়ে বিসর্জ্জন।
করিয়াছি তব দেশে শান্তির স্থাপন ॥
এখন ক্ষত্রিয়গণে করি পরিহার।
দেখা যাবে কেমনে রাখিবা অধিকার ॥
তবে জেন মম নাম মানসিংহ নয়।
যদি সব সর্ব্বনাশ অচিরে না হয় ॥"
প্রতাপে প্রতাপ কন, "আচ্ছা দেখা যাবে।
আহবে আমায় কভু বিমুখ না পাবে ॥"
পারিষদ্ কহে এক দিয়ে টিট্‌কারী।
"সঙ্গে করি আনিও হে দিল্লী-অধিকারী ॥
তব বুনাইয়ের বল হইবে পরীক্ষা।
দেখা যাবে সমরে কে কারে দেয় দীক্ষা ॥"
ক্রোধে মান কম্পমান করিল প্রয়াণ।
ক্ষত্রিগণ নদীজলে করে গিয়া স্নান ॥
শুচি হেতু ধৌত বস্ত্র করিল পিধান।
উৎখাতিল ভূমি যথা বসেছিল মান ॥
সেই স্থল পবিত্র করিল গঙ্গাজলে।
ম্লেচ্ছবৎ জ্ঞানে মানে মানিল সকলে ॥
শ্যালকের দুর্দ্দশা শুনিয়ে দিল্লীপতি।
একেবারে ক্রোধানলে জলিতাঙ্গ অতি ॥
বল দেখি ভবলীলা এ কি চমৎকার।
যে আকবর করুণার সাগর অপার ॥
যে আকবর সুবিচারে ধর্ম্ম-অবতার।
যে আকবর বহুবিধ জ্ঞানের আধার ॥
যে আকবর ভেদজ্ঞান বিহীন সুজন।
সকল জাতির প্রতি সমান দর্শন ॥
সেই গুণসিন্ধু শাহ শ্যালকবচনে।
হিন্দুধর্ম্ম-সংহারে প্রতিজ্ঞা করে মনে ॥
না থাকিবে ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা।
অসতী হইবে পুণ্যভূমি পতিব্রতা ॥

বড় বড় রাজপুত কুলকন্যা ঘরে।
বড় বড় সরদার সেবা পরিচরে ॥
পরিণীতা নহে শুধু শশদীয়া বালা।
নহে পীত সে সিন্ধু নিঃসৃত চারু হালা ॥
নহে বশীভূত ভূপ উদয়-নন্দন *।
এই অনুতাপদাহে দহে তনু-মন ॥
শাস্ত্র এই, যুক্তি এই, যেই হয় বীর।
অধর্ম্মের পদে কভু না নোয়ায় শির ॥
সহস্র শত্রুতা থাক্ প্রতিযোগী সহ।
বিগ্রহ-ব্যসনে সদা অধর্ম্মবিরহ ॥
কিন্তু বীর আক্‌বরে সে ভাব কোথায়।
করিল কুকীর্ত্তি শেষ শ্যালার কথায় ॥
সাজিল উদয়পুর-দর্পচূর হেতু।
উড়িল আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রকেতু ॥

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

যৌবনে যুবতী যথা পতিহীনা হয়।
সকল সম্পদ হত ব্যাকুল হৃদয় ॥
বসন-ভূষণ ভোগ রাগে বীতরাগ।
দিবানিশি গত লয়ে ব্রত পূজা যাগ ॥
সেইরূপ তরুণী যতিনী প্রায় তুমি।
প্রতাপের রাজাকালে ছিলে মেরুভূমি † ॥
তব দুর্গ দেহে আর নাহি পূর্ব্বশোভা।
যেই শোভা শূর বীরগণ মনোলোভা ॥
উদয়ের ‡ সহ যবে যবনের রণ।
তাহে অস্তগত তব প্রতিভাতপন ॥
একবার আলার প্রবল কোপানলে।
কত কীর্ত্তিকলা তব গেল রসাতলে ॥
তার পর বেয়াজীদ করে আক্রমণ।
পুনঃ তাহে তোমার লাবণ্য সংহরণ ॥
অনন্তর আক্‌বর সাজিয়া আসিল।
যে কিছু বা ছিল বাকী সকলই নাশিল ॥
কে বলে জগদ্গুরু সে মোগলবরে।
কেন বা তাহার মুদ্রা লোকে সমাদরে ॥

* রাণা প্রতাপসিংহ।
† মিবারের প্রাচীন নাম।
‡ রাণা প্রতাপের পিতা উদয়সিংহ।

কোন রূপে নহে শান্ত অশান্ত মোগল।
শ্যালকের অপমানে হইল পাগল॥
বিশেষতঃ প্রতাপের প্রতাপ দুঃসহ।
পাঠাইয়ে দিল পুত্রে সেনাসিন্ধু সহ॥
সঙ্গেতে আইল মানসিংহ মহাবেত।
হায় ভিন্ন ধাতু প্রসবিল এক ক্ষেত॥
এই মহাবেত রাণাবংশেতে সম্ভূত।
প্রতাপের কনীয়ান সাগরের সুত॥
ধনলোভে ধর্ম্মচ্যুত হইল দিল্লীপুরে।
দ্বেষানল যথা কাশ্যপেয় সুরাসুরে॥
প্রতাপের অন্য ভাই শক্তিসিংহ নাম।
সেও স্বীয় জাতি জ্ঞাতি ভ্রাতৃ প্রতি বাম॥
মোগলের অনুগত, তারি সেবাকারী।
স্বদেশ-বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রহরণধারী॥
ধনহীন, উপায়বিহীন, ভ্রাতৃহীন।
মনে কর প্রতাপের কি রূপ দুর্দ্দিন॥
কিন্তু যথা সাগর-তরঙ্গ-প্রতিঘাতে।
মহেন্দ্র অচল কভু শরীর না পাতে॥
প্রতি প্রতিঘাতে তার মূলবন্ধ হয়।
সেরূপ সুদৃঢ়চেতা উদয়তনয়॥
এই পণ সভাস্থলে করে মহাবল।
"জননীর স্তন্য দুগ্ধ করিব উজ্জ্বল॥"
সেই পণ পালন করিল মহাশয়।
হেন কীর্ত্তি হয় নাই হইবার নয়॥
সকল সাম্রাজ্য স্কন্ধ বিরুদ্ধ তাহার।
একেশ্বর সহিল, রাখিল অধিকার॥
কত শত শত্রুভূমি দিল ছারখারে।
কভু বনে বাস, কভু পর্ব্বত মাঝারে॥
আহার বনের ফল, পেয় নদীজল।
সুখের শয়ন কাননের তৃণ দল॥
বন্য পশু বন্য নর সহিত বসতি।
এরূপে পালিল দারা-সুত মহামতি॥
মনে ভাবে, আমি শিলাদিত্য বংশধর।
নমস্য কে আছে মম ভুবন ভিতর॥
দূরে থাক্, যবনেরে সুতা সম্প্রদান।
প্রাণ সত্ত্বে না মানিল বলিয়া প্রধান॥
অদ্যাপি প্রতাপ-নাম শ্রুত মুখে মুখে।
কীর্ত্তিকলা লেখা যত রাজপুত্র-বুকে॥
কহিতে সে কথা কবি-নেত্রে বহে নীর।
সত্য সেই প্রদীপ্ত করিল মাতৃক্ষীর॥
কেবল ঠাকুর পক্ষ প্রতাপের বল।
প্রাণপণে প্রভুসেবা হৃদয় সরল॥
হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী-কীর্ত্তি হয় শেষ।
ভাবিয়া অস্থির কিসে রক্ষা পাবে দেশ॥
প্রভু পাশে সমরে জীবন যদি যায়।
সেও শ্রেয়ঃ মোগলদাসত্ব ঘোর দায়॥
প্রভুপাত্র-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ উপাদেয়*।
অমিয় তাহার সহ নহে উপমেয়॥

হেথা শুন সমাচার সমরসমিদে।
আইল সলিম † রৌদ্ররস-পূর্ণ হৃদে॥
আরাবলী-পর্ব্বত-পশ্চিম দিয়ে ধায়।
প্রবেশিল মেরুদেশে কালানল প্রায়॥
হলদীঘাটে প্রতাপ পাতিল নিজ থানা।
অমরের সাধ্য নহে তথা দিতে হানা॥
বাইশ হাজার মাত্র সেনার যোগান।
গিরিকূটে সুসজ্জিত রাখে মতিমান্॥
গিরিব্রজে রাজধানী ঘেরা অনুপম।
জরাসন্ধ-দুর্গসম বিষম দুর্গম॥
কিবা উপত্যকা কিবা অধিত্যকা স্থলে।
নিবিড়-কানন প্রায় শোভা সেনাদলে॥
অট্টালিকা-শিখরে কি পর্ব্বত-শিখরে।
কোষমুক্ত অসি, নির্ঝরের ভাতি ধরে॥
কৃতান্তকিঙ্কর সম দেখিতে করাল।
প্রহরণ প্রস্তর ধনুক শরজাল॥
প্রভুভক্ত অনুরক্ত ভীল নামা জাতি।
সকলের আগে ভাগে রহে থানা পাতি॥

মহারাণা নিজাধীন সামন্তদিগের সহিত ভোজনে উপবেশনানন্তর স্বীয় পাত্র হইতে কিয়দন্ন লইয়া তন্মধ্যে প্রধান মর্য্যাদাবান্ ব্যক্তির প্রতি প্রসাদ করেন. এই প্রসাদের নাম 'দুনা' বা 'দুন্না'। এই সম্ভ্রম-প্রাপনার্থ সামন্তগণ অতীব লোলুপ, মান-সিংহ এই পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত না হইবাতেই মিবারের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

† জাহাঁগীরের বাল্য নাম।

বনেবাস সভ্যতা ভব্যতা নাহি জানে।
কিন্তু প্রভুভক্তি যোগসার জ্ঞানে মানে॥
শশদীয়া-বিপদ্-সাগর-পার-সেতু।
কত শত হত, প্রভু-পরিত্রাণ হেতু॥
হইল বিষম যুদ্ধ, কি বলিব আর।
স্বধর্ম্মপালন-ব্রত, সর্ব্বব্রত সার॥
এক এক রাজপুত্র কুলের ঈশ্বর।
ক্রমে ক্রমে স্বদলে হইল অগ্রসর॥
নির্ভয়-হৃদয়ে ধায় কেশরীর প্রায়।
হুহুঙ্কার হর হর শব্দ উভরায়॥
মহাবীর্য্যবান্ সবে মদমত্ত হিয়া।
বরিষে বরশী ভল্ল অশ্বে আরোহিয়া॥
আপন সেনায় হেরি বিক্রম বিশাল।
আনন্দ-রসেতে ভোর হইল ভূপাল॥
সমরতরঙ্গে ভাসে সকলের আগে।
যথা যায় শত্রুভটা ভঙ্গ দিয়ে ভাগে॥
উড়ে বৈজয়ন্তী ভানু-ভাসিত লোহিত।
বাজীরাজ চাতকের * পৃষ্ঠে আরোহিত
বৈর-শোধ-গ্রহণার্থ ব্যাকুল অন্তরে।
কুলের কজ্জল মানসিংহে তত্ত্ব করে॥
সন্ধান না পেয়ে তার ঘন ঘন ফেরে।
সম্মুখে পাইল শাহ-সুত সলিমেরে॥
শত শত যবনেরে করিয়া সংহার।
মহাতেজে তথায় হইল আগুসার॥
যেমন দেবতা, যান ভূষণ তেমনি।
ঘন ঘন চাতক করিরা হ্রেষাধ্বনি॥
সলিমের করিশুণ্ডে করে খুরাঘাত।
ঝলকে ঝলকে হয় রুধির-সম্পাত॥
ভাগ্যবশে আয়সে হাউদা ছিল আঁটা।
তাই বাদশাহসুত নাহি গেল কাটা॥
তুরুকসোবারগণ দিয়েছিল হানা।
কদলীর বন প্রায় কাটিলেন রাণা॥
কাটা গেল মাহুত, মাতঙ্গ মাতোয়াল।
চাতকের পদাঘাতে ক্ষেপিল বিশাল॥
পলায় আপন সেনা শিবির সন্ধানে।
তাহে তৈমুরের বংশ রক্ষা প্রাণে প্রাণে

* রাণা প্রতাপের অশ্বের নাম।

ঘোরতর সমর হইল সেই স্থলে।
দুইদল সমতুল কেহ নাহি টলে॥
সলিমের রক্ষা হেতু যবনে যতন।
রাণা-রক্ষা-হেতু রাজপুতের পতন॥
মহামার-মদে মত্ত মেরুদেশপতি।
শরে শরে জরজর কলেবর অতি॥
খরতর করবালে বিক্ষত শরীর।
কিন্তু মনে কিঞ্চিৎ বিকল নহে বীর॥
তিলেক না ছাড়ে রাজচ্ছত্র শিরোপরে।
শত্রুসেনা তার প্রতি একলক্ষ্য করে॥
সেই দিগে ধেয়ে সবে বর্ষে প্রহরণ।
প্রাবৃটের মেঘমালে তপন যেমন॥
প্রতাপে প্রতাপ বার বার তিন বার।
শত্রুসেনা মথি করে আপন উদ্ধার॥
যেন ঘোর আখেটে ভীষণ সিংহবরে।
পাল পাল গৃধপাল ঘেরি শব্দ করে॥
ব্যূহভেদ করি হরি যত যায় দূরে।
ততই তাহারে বেড়ে আখেটী কুক্কুরে॥
সেইরূপ অবসন্ন হৈল মহোদয়।
পরিত্রাণপথ আর দৃশ্য নাহি হয়॥
হেন কালে ঝালবর দেশের ঈশ্বর।
প্রভুর উদ্ধার-হেতু হন অগ্রসর॥
ছত্র দণ্ড নিশান অন্যথা তথা করি।
ধরাইল হেমচাঙ্গী স্বীয় শিরোপরি॥
মোহিল মোগলসেনা দেখি ছত্র দণ্ড।
সেই দিকে প্রহরণ প্রহরে প্রচণ্ড॥
সেই অবকাশে রাণা অন্য পথে যান।
ধন্য ধন্য ঝালবরপতি মহাকায়॥
প্রভুরে বাঁচায়ে দিয়ে স্বীয়গণ সহ।
শত্রুদলে সমর করিল দুর্ব্বিসহ॥
অনন্তর আয়ুধ-আঘাতে হতবল।
প্রাণ পরিহরে ঝালী সহিত স্বদল॥
অনুপম প্রভুভক্তি, দেহ দিল ডালি।
রাখিল অপূর্ব্ব কীর্ত্তি নিজ ধর্ম্ম পালি॥
কীর্ত্তিকলা পুরস্কার থাকে মাত্র শেষ।
করিলা প্রতাপ এই নিয়ম নির্দ্দেশ॥
বংশ-অনুক্রমে ঝালবরপতিগণ।
রাজচ্ছত্র দণ্ড আর নিশান শোভন॥

নিজ ধামে ধরাইবে ধরাধীশ প্রায়।
রাণার দক্ষিণে স্থান পাইবে সভায় ॥
অদ্যাপি উদয়পুরে আছে এই রীতি।
ভক্তির তনয় স্নেহ কহে ধর্ম্মনীতি ॥
কিন্তু বল, একের বীরত্বে কি উপায়।
মোগলের সেনা সীমাহীন সিন্ধু প্রায় ॥
চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিলে হুতাশন।
ঘটপূর্ণ জলে কভু হয় নিবারণ?
লক্ষ লক্ষ মোগল করিল আক্রমণ।
অগণিত কামানে অনল-বরিষণ ॥
দলে দলে উটের উপরে বাঁধা তোপ।
যেই দিগে বর্ষে গোলা সেই দিকে লোপ
কি কহিব হল্দীঘাটে দুঃখের কাহিনী।
বাইশ হাজার ছিল রাণার বাহিনী ॥
থাকিল হাজার অষ্ট চ[illegible] প্রহরে।
বহিল রুধিরনদী কন্দরে কন্দরে ॥
প্রভুভক্তি-প্রস্রবণ-জাত তরঙ্গিণী।
বংশোরূপ জাম্বুনদ-রেণু প্রস্রবিণী ॥
শৌর্য্য-সুধাময় ফল ফলে যার জলে।
যে পায় আস্বাদ সেই ধন্য ধরাতলে ॥
প্রদোষে প্রতাপ পুরে করিলা প্রস্থান।
নিভয় চাতক-গতি পবনসমান ॥
পুরোভাগে পয়স্বিনী বহিছে ঝঙ্কারে।
এক লাফে তুরঙ্গ যাইল তার পারে ॥
অশ্বে ছুটে যুগল মোগল তার পাছে।
থমাকল তারা সেই তটিনীর কাছে ॥
প্রভু প্রায় চাতক আহত অতিশয়।
নিকট হইল শত্রু জানিল নিশ্চয় ॥
খুরের আঘাতে শৈলে উঠিছে অনল।
জলধরে যেন ক্ষণপ্রভা ঝলমল ॥
এমন সময়ে রাণা করেন শ্রবণ।
কহিতেছে স্বদেশ ভাষায় একজন ॥
কহে ঘন "হে নীল ঘোড়ার চালক।"
শুনি সম্বোধন রাণা ফিরান মস্তক ॥
দেখিলেন অশ্বারোহী আর কেহ নয়।
আপন অগ্রজ শক্তিসিংহ মহোদয় ॥

পিতা দিল অনুজেরে নিজ রাজ্যভার *।
ক্ষোভানলে স্বদেশ ত্যজিল গুণাধার ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে ধনাশা দুরাশয়।
ভ্রাতৃপ্রেম অমৃতে গরল উপজয় ॥
শাহের সেবায় শক্তি তদবধি রত।
স্বদেশের প্রতিকূলে সম্প্রতি আগত ॥
মোগলসেনায় থাকি করে বিলোকন।
একেশ্বর প্রতাপ করিছে পলায়ন ॥
সেই ক্ষণে দ্বেষানল নির্ব্বাণ পাইল।
পুনঃ আসি ভ্রাতৃস্নেহ হৃদয় ছাইল ॥
মনে ভাবে হায় ধিক্ আমি দুরাচার।
আমার স্বরূপ কেবা আছে কুলাঙ্গার ॥
ভ্রাতৃভেদে বিচ্ছেদে স্বদেশ পরিহার।
পরের প্রসাদ-লোভে প্রবৃত্তি আমার ॥
জন্মভূমি আর নিজ ভ্রাতৃপ্রতিকূলে।
আসিয়াছি মদে মেতে ধর্ম্মনীতি ভুলে ॥

---

* রাণা উদয়সিংহের ভোগ্যাজাত পুত্রনিকর ব্যতীত পঞ্চবিংশতি বিবাহিতাজাত পুত্র ছিল। মিবারদেশে জ্যেষ্ঠানুক্রমে সিংহাসন প্রাপণের নিয়ম সত্বেও রাণা উদয়সিংহ তাহা ভঙ্গ করিয়া স্বীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী-গর্ভজাত জগৎমল্লকে রাজ্যভার প্রদান করেন। অশৌচকাল মধ্যে জগৎমল্ল সিংহাসনোপবেশন করিলে শোণিতগড়ের অধিপতি আপন ভাগিনেয় প্রতাপসিংহকে রাণাপদস্থ করণমানসে চণ্ডাবৎ শ্রেণীর প্রধান ও মিবারের রাজমন্ত্রী কৃষ্ণসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া জগৎমল্লের অন্যায় রাজ্যগ্রহণের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাতে সচিববর কহিলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি দুগ্ধ পানেচ্ছা করে, তবে তাহাও প্রদান করা উচিত, ফলতঃ আমি প্রতাপের পক্ষ। এই কথা কথনানন্তর উভয় রাজন্য রাজসভায় যাইয়া জগৎমল্লকে সিংহাসন হইতে উঠাইয়া তন্নিম্নসংস্থিত এক আসনে বসাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনার ভ্রম হইয়াছে, সিংহাসন আপনার ভ্রাতা প্রতাপসিংহের অহে।" মাতুল এবং মন্ত্রীর প্রসাদেই প্রতাপ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। শক্তি বা শক্তা সিংহ প্রতাপের অগ্রজ বৈমাত্রেয় ছিলেন।

এই রূপ তিতিক্ষায় হয়ে দ্রবমনা।
সলিমে কহিল, "অবধান জাঁহাপনা॥
আর কারো কার্য্য নহে প্রতাপেরে ধরা।
আমি যাই তারে আনিয়া দিব ত্বরা॥
এইরূপ কৌশল করিয়া বীরবর।
যুগল যবন সহ ধাইল সত্বর॥
পথে সেই তুরঙ্ক তুরঙ্গীদ্বয়ে নাশি।
অনুজসমীপে শক্তি উত্তরিল আসি॥
দুই ভেয়ে দেখামাত্র কোথায় থাকে দ্বেষ।
পরস্পর আলিঙ্গন প্রণয় আবেশ॥
হায় হায় ভ্রাতৃভাব বুঝে উঠা ভার।
কখন কি ভাবে হয় আবির্ভাব তার॥
সদ্ভাবে শীতল যথা উষার তুষার।
অভাবেতে যেন কালানল অবতার॥
ধরাসনে চাতক পড়িল সেইখানে।
একদৃষ্টে নয়ন আরোপি প্রভুপানে॥
শক্তি স্বীয় তুরঙ্গ ওস্কার নামধর।
অনুজেরে অর্পণ করিল বীরবর॥
যেই স্থলে চাতক ছাড়িল নিজ প্রাণ।
সেই স্থলে হৈল এক মণ্ডপ নির্মাণ॥
অদ্যাপিও চাতকের চবুতরা নামে।
প্রতিষ্ঠিত আছে সেই হলদীঘাট গ্রামে॥
হাসি ভ্রাতৃপ্রতি শক্তি কহে, "এ কি রীতি।
রণভূমি ত্যাগ করা কোন্ ক্ষত্রনীতি॥
হেন কার্য্য যেন ভাই আর নাহি হয়।
কুলের অযশ তাহে হইবে নিশ্চয়॥
যা হবার হইয়াছে শুন মহোদয়।
এখানে বিলম্ব আর সুবিহিত নয়॥"
এত বলি হত তুরঙ্গীর অশ্বে চড়ি।
সলিম সমীপে ফিরে গেল দড়বড়ি॥
কহে "জাঁহাপনা পথে প্রতাপের করে।
মরিল সর্দ্দারদ্বয় তুমুল সমরে॥
মরিল তাহার করে তুরঙ্গ আমার।
একা আমি কি করিতে পারি বল তার।"
শুনি শাহসুত হৃদে করে অবিশ্বাস।
শক্তিসিংহ প্রতি কহে মুখে মন্দ হাস॥
"রাজপুত ধর্ম্ম নহে অসত্য কথন।
কেন রাণাবৎ হেন কর বিড়ম্বন॥
সত্য কথা কহ দোষ নির্ভয় হৃদয়।
বীর যেই কভু সেই ভীত নাহি হয়॥"
শুনি শক্তি কহে যথাযথ সমাচার।
"নিবেদন করি ওহে সম্রাট কুমার॥
রাজ্যভারে ভারাক্রান্ত অগ্রজ আমার।
গুরুভারে চঞ্চল চরণযুগ তাঁর॥
ভারাক্রান্ত ভাই যদি ভূমিশায়ী হয়।
কেমনে দেখিব আমি, কহ মহোদয়॥
ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখী নহে যেই নরাধম।
বিফল তাহার দেহ বিফল জনম॥
শুনি কথা সলিম কহেন তার প্রতি।
"কহ বীর কৃতঘ্নের কি হয় দুর্গতি॥
দেশ ত্যজি, ভ্রাতৃ ত্যজি, ত্যজি আত্মজন।
দিল্লীর আসনতলে লইলা শরণ॥
যে দিল আশ্রয়, কর অহিত তাহার।
কহ রাণাবৎ কোন্ ধর্ম্মের বিচার॥
অতএব এ স্থান তোমার যোগ্য নয়।
প্রস্থান করহ যথা অভিরুচি হয়॥"
কথামাত্র শক্তিসিংহ লইল বিদায়।
স্বীয় দলে বলে চলে ভেটিতে রাণায়॥
উপহার রূপ কিছু দান সমুচিত।
কি দিব অগ্রজে এই চিন্তায় চিন্তিত॥
চারিদিগে মোগল যুড়েছে অধিকার।
মিবারের পূর্ব্বরূপ নাহিক বিস্তার॥
ভইন্সোর নামে দেশ করিতে উদ্ধার।
পড়িল যবন সৈন্যে অনল আকার॥
দুই দিনে দেশোদ্ধার করি মহামার।
উদয় উদয়পুরে উদয়কুমার॥
উদার হৃদয় রাণা পেয়ে পরিতোষ।
অগ্রজে সে দেশ দিল সহ রত্নকোষ॥
অদ্যাপি শক্তির বংশ বিরাজিত তথা।
অমৃতের খনি রাজপুতনার কথা॥
"খোরাসানী, মুলতানী, আগল" * আখ্যান।
কুলকবি করিলেন শক্তিসিংহে দান॥

* এই উপাধি প্রদানের তাৎপর্য্য এই, যে দুই মুসলমান রাণা প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হন, তাঁহারা খোরাসান ও মুলতান দেশের আমীর ছিলেন।

শুনি শাহ দুই ভেয়ে সুখ-সংমিলন।
ক্রোধে জ্বলে যেন যুগান্তের হুতাশন॥
রাজ্য-অধিকার তত মনে নাহি লাগে।
শ্যালকের অপমান অন্তরেতে জাগে॥
কবে হবে মিবারের কুলগর্ব্বনাশ।
শশদীয় সীমন্তিনী সহিত বিলাস॥
কিরূপে হইবে ক্ষত্রকুলের কুন্তন।
অনুক্ষণ নানারূপ উপায় চিন্তন॥
দৈববশে একদা শুনিল আকবর।
ভিকানের রাজভ্রাতা পৃথ্বী কবিবর॥
শক্তিসিংহ-সুতা সতী বনিতা তাহার।
রূপে গুণে অনুপমা রমা-অবতার॥
মনে ভাবে পৃথ্বীসিংহ মম অনুগত।
দিল্লী-দরবারে কাব্যকলায় নিরত॥
আনিব অন্দরে আমি তার প্রমদারে।
দেখিব কেমনে রাণা রাখে এই বারে॥
সতী নাম ধরে সে রমণী রত্নকলা।
প্রতাপের ভ্রাতৃসুতা প্রবলা অবলা॥
প্রবলা হউক বালা জাতিতে অবলা।
কতক্ষণ সহিবেক পুরুষের ছলা॥
ধনের পিপাসা আর প্রভুত্বের আশা।
রমণীর ধর্ম্ম কর্ম্ম শর্ম্ম-মর্ম্ম-নাশা॥
প্রলোভের দাসী তারা স্তবের কিঙ্করী।
ইথে বশীভূত নহে কে আছে সুন্দরী॥
এত ভাবি ষড়যন্ত্র করে সম্রাট।
অন্তঃপুরে বসাইব যুবতীর হাট॥
দিল্লীপুরে আছে যত ধনীর গেহিনী।
কিবা মহারাজা রাজা মানস-মোহিনী॥
কিবা ওমরা আমীর বণিক কি সৈনিক
দরবারে নিয়োজিত যাহারা দৈনিক॥
সকলে পাঠাবে দারা বেগম-মহলে।
নানারূপ বাণিজ্য বসিবে সেই স্থলে॥
গোপনে ভ্রমিব তথা ছদ্মবেশ ধরি।
নিরখিব নানা নারীনিধি নেত্র ভরি॥
অবশ্য আসিবে তথা শক্তির নন্দিনী।
লীলা কল্পলতামূলে রূপ নিস্পন্দিনী॥
ভাঙ্গিলে রসের হাট রজনী সময়ে।
যখন যাইবে সবে আপন আলয়ে॥
কৌশলে করিব তারে নিজ করগত।
সাধিব সকল সাধ অভিমত যত॥
ইহা ভিন্ন কেমনে হইব চক্রেশ্বর।
এখনো ভারতে আছে এক নরবর॥
প্রভাতের তারা প্রায় এখনো এদেশে।
আছে রাণা হিন্দুপতি জয়-অবশেষে॥
বার বার কুটুম্বিতা-করণ-কারণ।
তাহার নিকটে কত দূতের প্রেরণ॥
করিলাম কতবার তন্ত্র মন্ত্র নানা।
কোন রূপে বশীভূত না হইল রাণা॥
এবার কি হবে গতি শুনিবে যখন।
বিক্রীত নৌরোজা-হাটে তনুজারতন॥
মানের থাকিবে মান নিষ্কণ্টক পথ।
এক কার্য্যে সিদ্ধ হবে সব মনোরথ॥
পরদিন দিল্লীপুরে ঘোষণা প্রকাশ।
হইবে "নৌরোজা" পর্ব্ব প্রতি মাস মাস।
ভাগ্যধর-ভামিনীর বসিবেক হাট।
মহলে মহলে হবে নানারূপ নাট॥
বিবিধ বিদেশী নারী বাক্য আলাপন।
তাহে হবে নবরূপ ভাষার সৃজন॥
সকল জাতির মধ্যে না থাকিবে দ্বেষ।
জানা যাবে রাজ্যের সংবাদ সবিশেষ॥
নারীমুখে কোন কথা গুপ্ত নাহি রবে।
সব কথা বাদশার সুগোচর হবে॥
শুনি দিল্লীপুরে বৃদ্ধি আনন্দ উৎসাহ।
অভূত নভাবী কীর্ত্তি করিলেন শাহ॥
কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাহি কোন ক্রমে।
স্বচ্ছন্দে সকলে যায় প্রথমে প্রথমে।
নৌরোজা আমোদমদে মত্ত অবিরত।
এইরূপে কতকাল হইল বিগত॥
একদা দিল্লীশ এই চিন্তা করে মনে।
হইয়াছে সুসময় সতী-আকর্ষণে॥
সতীর ভাসুর-জায়া ভিকানের রাণী।
অগ্রে তারে কোনরূপে করতলে আনি॥
প্রগল্‌ভা প্রমদা সেই প্রৌঢ়া প্রৌঢ়মতি।
অনায়াসে ভিকানেরী ভিক্ষা দিবে রতি॥
পরে কনীয়সী সেই রূপসী সতীরে।
সুযোগে আনিয়া দিবে বিলাস মন্দিরে॥

যথা গৃহপালিত মাতঙ্গ বিচক্ষণ।
প্রলোভে ভুলায়ে আনে বনের বারণ॥
যা ভাবিল তা ঘটিল রায়মল্ল * রাণী।
আক্‌বরে দেহ দিল মনে ধন্য মানি॥
নারীধর্ম্ম অমূল্য রতন বিনিময়ে।
লভিল অশেষ খনিজাত মণিচয়ে॥
একদিন সতীরে প্রলোভ দেয় ছলে।
কহে, "সই এমন দেখিনি ধরাতলে॥
অপরূপ হাট বসে না যায় বর্ণন।
দেখি শোভা যদি পাই সহস্র লোচন॥
কত রূপ রঙ্গ, কত ভাবার কথায়।
নাহি মাত্র পুরুষের সম্পর্ক তথায়॥
অতি প্রিয়বাদিনী মহিষী যোধাবাই+।
ভুবনে এমন বুঝি চারুশীলা নাই।
দিল্লীশ্বর দাস সম যাহার নিকটে।
পদানত হয় যার পেশোয়াজতটে॥
হেন রামা গুণধামা নাহি অহঙ্কার।
সরলতা শীলতার যেমন ভাণ্ডার॥
চল চল চল সই তথা লয়ে যাই।
চক্ষু-কর্ণ-বিবাদ মিটিবে তথা ভাই॥"
জায়ের কথায় সতী পাইল বিশ্বাস।
রজনীতে বিবরণ কহে পতিপাশ॥
সাধুশীল পৃথ্বীরায় দিল অনুমতি।
গুণবতী ভার্য্যাভক্ত নহে কোন্ পতি॥
সতীর সতীত্ব পরীক্ষিত বারে বারে।
কার সাধ্য সতীরে অসতী করিবারে॥
অভেদ্য অচ্ছেদ্য সেই সতীত্ব-কবচ।
পাপ-অস্ত্রে সাধ্য নাই স্পর্শে তার ত্বচ॥
হাসি হাসি কহে পৃথ্বি, "শুন প্রিয়ে সতী।
নৌরোজার হাটে যেতে হইয়াছে মতি॥
তোমার পসরা ভারী থেকো সাবধানে।
লুঠেরায় লুঠে পাছে তাই ভয় প্রাণে॥
জানি তব পসরা অমূল্য এ সংসারে।
কেবা পারে মূল্য দানে ক্রয় করিবারে॥

* ভিকানের দেশাধিপতির নাম।
+ মানসিংহের ভগিনী, আক্‌বরের প্রাধানা মহিষী।

কিন্তু লুঠেরার ভয়ে ভীত মহাজন।
নির্ঘাত বজ্রের প্রায় তার আক্রমণ॥"
শুনি স্মিতমুখী সতী নতমুখে কয়।
"হাটে বাটে যে দ্রব্যের মূল্য নাহি হয়॥
হেন দ্রব্য পুষে কেন রাখা চিরকাল।
লুঠেরায় লুঠে লয় সে বরং ভাল॥"
কথা শুনি কবি ফুল্ল মানস-সরোজে।
জায়ারে বিদায় দেন যাইতে নৌরোজে॥
ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

কিবা অপরূপ শোভা নাগরীর হাট।
অদ্ভুত নভাবী কীর্ত্তি করিল সম্রাট॥
বিবিধ কুসুম যেন কুসুম কাননে।
কুসুম-সময়ে হাসে প্রফুল্ল আননে॥
কোন পুষ্প প্রভায় প্রকাশে পরিপাটী।
শূন্য থেকে তারা কি আইল পুষ্পবাটী॥
কোন পুষ্প লালিত্য রসের চারুধাম।
ভানুকরে ম্লানমুখ হয় অবিশ্রাম॥
কোন পুষ্প কষিত-কাঞ্চন-কান্তিধর।
কারু বর্ণ যেন সুশীতল বৈশ্বানর॥
কেহ শোভে নবীন নীরদরেখা প্রায়।
কেহ বা তুষার-ছবি অমলিন কায়॥
নহে স্থির ছোট বড় রূপের বিচারে।
এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমারে॥
যার দিগে পড়ে দৃষ্টি, তারি দিকে রয়।
পালটিতে পলকেরে প্রমাদ নিশ্চয়॥
কাহার সৌরভে মন প্রাণ করে চুরি।
নয়নেরে দাস করে কাহার মাধুরী॥
এইরূপ নানাদেশজাত নানা নারী।
বসাইল মণিহারী মুনিমনোহারী॥
কোন নারী গারজিয়া * নাম দেশে জাতা।
জনমিয়া জানে নাই কেবা পিতা মাতা॥
কুমার কুমারকালে পরকরগত।
বিক্রিত শরীর পণ্য পুতুলের মত॥

* জর্জ্জিয়া দেশের পারস্য নাম।

ইস্তাম্বুলে ক্রয় করে যত বিলজ্জিত।
অনঙ্গ-যজ্ঞের বলি স্বরূপ সজ্জিত ॥
বড় রূপে বড় মূল্য হয় ডাকাডাকি।
দক্ষিণা দীনার দানে নাহি রাখে বাকী ॥
ধিক্ ধিক্ দ্রবিণাশা দুরন্ত এমনি।
অপত্যের স্নেহ ছাড়ে জনক জননী ॥
ধিক্ পুষ্পশরাহত পামরনিকরে।
যুবতী জাতিরে যারা পশু-জ্ঞান করে ॥
বসিয়াছে বিজাতীয় বরাঙ্গনাগণ।
শিশির-সময়ে যথা সরোজকানন ॥
রূপ বড় বটে কিন্তু লাবণ্যবিহীন।
পিঞ্জরে কোথায় সুখী বনের হরিণ ॥
নানা ভোগ-রাগ বটে দিল্লী-অন্তঃপুরে।
কিন্তু তাহে মনের মানস নাহি পুরে ॥
হীরকশৃঙ্খল পদে হেমদণ্ডে বাস।
সারিকা তাহাতে হৃদে লভে কি উল্লাস ॥
না বসিলে নয় তাই বসিয়াছে হাটে।
মনোদুঃখ আবরিয়া কাপট্য-কপাটে ॥
বসিয়াছে আরাগণ প্রদেশের নারী।
অপাঙ্গের পরে পঞ্চশর মানে হারি ॥
স্বর্ণ-বর্ণ চিকণ চিকুর কমনীয়া।
বসিয়াছে রোমক রমণী রমণীয়া ॥
আরক্ত কপোল কিবা প্রকাশে প্রভায়।
গোলাব ত্যজিয়ে অলি তার দিকে ধায় ॥
বিস্ফুরিত বিপুল বিনোদ কলেবর।
যুগল মরালবর চারু পয়োধর ॥
হৃদয় সুরস সরোবরে মোদমান।
লোহিত চুচুকপুট চঞ্চুর সমান ॥
বসিয়াছে আরমানী গত আরমান্।
মোগলমন্দিরে কোথা থাকে আর মান ॥
মস্তকে মুকুট ধরা অমরী-আকার।
অঙ্গের আভায় হারে রত্ন-অলঙ্কার ॥
বসিয়াছে য়িহুদী অবলা সুপ্রবলা।
রসিকা রসনা ছল-কলায় চঞ্চলা ॥
অলকে ঝলকে হেমমুদ্রা থরে থরে।
বিজড়িত মুক্তামাল স্তনপরিসরে ॥
বসিয়াছে ঈরাণী তুরাণী কত আর।
কি বর্ণিব বিশেষ বর্ণন করা ভার ॥

সহস্র সহস্র নারী অপ্সরী-আকার।
দেশে দেশে বাছিয়া এনেছে সার সার ॥
যথা নানা দেশীয় কুসুম বিমোহন।
শোভা করে বাদশার প্রমোদকানন ॥
কিন্তু কহ কেবা নাহি জানে এই কথা।
বিদেশীয় পুষ্প নহে হাস্যমান তথা ॥
কুঙ্কুম কিঞ্জল্ক কভু মালবে না হয়।
কাশ্মীরেতে দেব-পুষ্প কভু জাত নয় ॥
স্থানভ্রষ্ট হ'লে আর শোভা নাহি রয়।
বিদেশের বায়ু তার আয়ু করে ক্ষয় ॥
অতএব নিসর্গের বিপরীত এই।
যে করে এমন কাজ দুরাচারী সেই ॥
বসিয়াছে তার কাছে মোগলমোহিনী।
কামের কামিনী কিবা চাঁদের রোহিণী ॥
প্রফুল্ল দাড়িম্বী সম লোহিত অধর।
মাদকে ঘূর্ণিত-প্রায় আঁখি ইন্দীবর ॥
সুবর্ণ ঘুঙুর পদে বাজে পদে পদে।
বিন্দ মেহেদী রাগ করকোকনদে ॥
ঝলমল পেশোয়াজ টলমল কায়।
আতরেতে তর ক'রে যেখানেতে যায় ॥
জরীতে জড়িত বেণী বিনোদ-বন্ধন।
মেঘে যেন সৌদামিনী দেয় দরশন ॥
মানমদে মাতোয়ালা গুমান গরবে।
হীন হেন বোধ করে অন্য নারী সবে ॥
রাজ-রাজেশ্বর পতি পৃথিবী-প্রধান।
মোগলের পদানত সব হিন্দুস্থান ॥
যতেক আমীর-পত্নী অহঙ্কারে ভোর।
অন্যদেশী অবলারা যেন সবে চোর ॥
বিনোদ আরাম সেই শোভার ভাণ্ডার।
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে বস্ত্রের কাণ্ডার ॥
রেশমী পশমী থোপ মুকুতার ঝারা।
চন্দ্রাতপে শোভে কত সুবর্ণের তারা ॥
মাধবীমণ্ডপমাঝে কোন মনোরমা।
বসিয়াছে সাজায়ে পসরা অনুপমা ॥
কনকরঞ্জিত পত্রে লিপি মনোহর।
প্রেমময় কবিতা গীতিকা তর তর ॥
নস্তালিক প্রভৃতি হরফ হরবীজে।
বেড়া তার হীরক পল্লব-সরসিজে ॥

কোথা রত্ন-শিলাময় বহিছে ফুহারা।
উগরিছে গোলাব-বাসিত বারিধারা॥
তারতলে মণিময় কমলের দলে।
নানা রঙ্গে খেলে নানারঙ্গী মীনদলে॥
সফর হইতে আনা স্বর্ণ-সফর।
তার সহ খেলে মীন নীলনিভাধর॥
যেন ক্ষুদ্র মেঘমালা গগনে বিস্তার।
অস্তগত ভানুকরে শোভা চমৎকার॥
উঠিয়াছে সর্ব্ * তরু নির্ঝরের কাছে।
তার তলে কোন রামা পসরা দিয়াছে॥
বিহঙ্গ পসরা তার পিঞ্জরে পিঞ্জরে।
পড়িতেছে কাকাতুয়া সুগভীর স্বরে॥
ৰএদ্ বলিছে তোতা বিনাইয়ে কত।
শুনিতেছে হীরামন শির করি নত॥
ওমরা শুনিছে যেন মৌলবীর বাণী।
বিবি সাজে লোরী আসি করে কাণাকাণি॥
জলদে জলদে বলি ডাকে কপিঞ্জল।
হোসেন মরিল যেন করি জল জল॥
বুল বুল হাজার হাজার ছাড়ে তান।
একেবারে কেড়ে লয় মন আর প্রাণ॥
প্রমদে পাপিয়া পাখী পিউ পিউ রটে।
বিয়োগী বিয়োগ-ব্যথা বৃদ্ধি তাহে বটে॥
কুহুকুহু মুহুর্মুহুঃ ডাকে পিকবর।
ললিত পঞ্চম স্বরে সরে পঞ্চশর॥
বলিছে বিবিধ বোলি মদন-সারিকা।
ঘটকের মুখে যেন মিশ্রের কারিকা॥
পুষিয়াছে পারাবত নানারূপ সাজ।
সেরাজু লোটন লক্কা মুখ্‌খী গিরবাজ॥
প্রণয়ের দূত-কার্য্যে পটু বিলক্ষণ।
চঞ্চু পুটে লিপি লয়ে করয়ে বহন॥
আর সেই বিহঙ্গ চতুর-চূড়ামণি।
ইঙ্গিতে হরিয়ে আনে নায়িকার মণি॥
নিকটে দাঁড়ায়ে মেঘপ্রিয় মেঘনাদ।
পুচ্ছে যার শোভিত হাজার স্বর্ণ চাঁদ॥
আর এক নারী বসে বকুলের মূলে।
সাজাইয়ে আপন আপণ নানা ফুলে॥
ফুলের স্তবক-গুচ্ছ তোর্রা ভাতি ভাতি।
মল্লিকা মালতী যূথী নাগেশ্বর জাতি॥

কামের করাত তীক্ষ্ণ কুসুম-কেতকী।
কুরুবক ভূচম্পক পুন্নাগ ধাতকী॥
কুমুদ কহ্লার আর কেশর কস্তুরা।
কামিনী স্বরূপা সেই কামিনী ভঙ্গুরা॥
বসরার গর্ব্ব-পর্ব্ব গোলাব সুন্দর।
পুষ্পরাজ্যে কেবা আছে তাহার সোসর॥
মালিনীর প্রায় ধনী পুষ্পবিভূষণা।
দোনায় দোনায় ভাগা দেয় সুবদনা॥
গাঁথিয়াছে ফুলময় হার শতেশ্বরী।
ফুলচন্দ্রহার আর ফুল-সাত-নরী॥
ফুলময় বলয় বিজটা কর্ণফুল।
ফুলময় ভুজবন্ধ ফুলময় দুল॥
ফুলময়ী ব্যজনী ফুলের দণ্ড তার।
ফুলময় ঝালর শোভিত চারি ধার॥
ফুলময় আসন বসন বিভূষণ।
রচিয়াছে ফুলময় কাঁচলীকষণ॥
কি কল করিল ফুলে কুমার সুন্দর।
এ মালিনী পারে তারে শিখাতে সুন্দর॥
কাজ কি ফুলেতে লেখা কাব্য রসময়।
প্রতি পুষ্পে মনোভাব দেয় পরিচয়॥
জ্বলিতেছি বহু দিন প্রণয়-অনলে।
রঙ্গণ সে ভাব ব্যক্ত করে বন-স্থলে॥
অধীরা অবলা আমি চাহি হে আশ্রয়।
চুতে আলিঙ্গন দিয়ে মাধবিকা কয়॥
অন্তর অসার মুখে কথার করাত।
কুলটা কেতকী করে পুষ্পবন মাত॥
অশোক অশোক ভাব প্রকাশিছে কিবা।
মধুর মধুর মাসে হাসে নিশা দিবা॥
প্রখর প্রভাব নাহি সহে কলেবরে।
কুমুদিনী আমোদিনী হিমকর করে॥
পর পরশনে ম্লান, সলজ্জশীলতা।
আ মরি কি ভাব ব্যক্ত করে লজ্জালতা॥
এই রূপ প্রতি পুষ্পে প্রকৃতির লীলা।
মানুষের মনোভাব স্বভাব লিখিলা।
দম্পতীর প্রেমালাপ সাধন কারণ।
কত রূপ হার ধনী গাঁথিছে শোভন॥
কেলিশৈলে স্বরাগৃহে অপর তরুণী।
পসরা সাজায়ে বেচে বিবিধ বারুণী॥

* ইংরাজী সাইপ্রেস বৃক্ষ।

সুবর্ণ সুবর্ণধরা সিরাজী মদিরা।
পানমাত্র দোলে গাত্র সুধীরা অধীরা॥
গোস্তনীর গর্ত্তজাতা লোহিত বরণী।
রসাইল রসদানে নিখিল ধরণী॥
চষকে চষকে চারু শোভা চমৎকার।
মোহিনীর পুনঃ কি হইল অবতার॥
অসুরের ক্ষোভ শান্তি করিবার তরে।
সুধা বুঝি জনমিল দ্রাক্ষার উদরে॥
হেন অপরূপ শক্তি কে রাখে সংসারে।
দূর করে সকল সন্তাপ একেবারে॥
দুঃখভরা ধরা-দুঃখ বিপলে বিলয়।
নন্দন-কানন সুখ অনুভূত হয়॥
বসিয়াছে তার কাছে আর এক নারী।
নানামত সুমধুর ফলের পসারী॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ করে সৌরভে আকুল।
জামীর সভায় যার নবরঙ্গ কুল॥
আর সেই চারু ফল বীজপূর নাম।
ফুল্লপয়োধর তুল্য শোভা অভিরাম॥
এমনি প্রচুর রস ধরে কলেবরে।
সময় হইলে পরে আপনি বিদরে॥
রাখিয়াছে আর কত মত ফল মূল।
তুলে তুলে বিনিময় লয়ে বহু মূল॥
আর এক নারী বেচে গন্ধ মনোহর।
অগুরু চন্দন চুয়া কুন্দুরু কেশর॥
কালীয়ক কুঙ্কুম কর্পূর কস্তুরিকা।
মধুযষ্টি চন্দরুষ আর মধুরিকা॥
তর তর আতর অসীম শক্তি তার।
রতি তরঙ্গিনী তরণের সে আতার॥
পাদড়ী সন্দলী যূথী গোলাবী চামেলী।
মোতিয়ার আমোদে মদন করে কেলি॥
মজাভরা মজমুয়া মধুর রচনা।
তিলে তিলে যেন তিলোত্তমার সূচনা॥
কিছুই আপন নহে পরধনে ধনী।
অথচ সৌরভ আর গৌরবের খনি॥
বসিয়াছে বণিক্ বনিতা বরাননী।
সাজাইয়া বিধিমত নিধির বিপণি॥
সূর্য্যকান্ত, প্রভাকর প্রভা প্রতিযোগী।
চন্দ্রকান্ত, যারে ছুঁলে শীতল বিয়োগী॥

পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীলোপল।
মরকত, গোমেদক, হীরক উজ্জ্বল॥
বৈদূর্য্য বিখ্যাত মণি বিদর্ভে বিজাত।
পাকা বদরীর মত মুক্তা বিভাত॥
সর্ব্বরত্ন গর্ব্বখর্ব্ব বেণেনীর কাছে।
তার রূপ প্রতিভায়, হারি মানিয়াছে॥
পদ্মরাগ হতরাগ অধর নিকটে।
গণ্ডে হেরি প্রবালের প্রভা কি প্রকটে॥
নয়নের নীলিমায় হারে ইন্দ্রনীল।
দন্তদ্যুতি দেখি মুক্তা পরাস্ত মানিল॥
আর ধারে এক রামা নিবাস বসরা।
কৌষেয় রাঙ্কব বস্ত্রে দিয়াছে পসরা॥
মুকুতা জড়িত চোলী কাঁচলী কাফ্তান।
ঝক্‌মক্ তারকস্ অতি দীপ্তিমান্॥
রবি শশি ছবি আলোহিত মখমল।
চীনজাত সুচীন শাটিন নিরমল॥
বিশালা দোশালা জুব্বা জেগা জামেয়ার।
গলবন্ধ কটিবন্ধ প্রকার প্রকার॥
চিকণের চিকলীয়া চারু চন্দ্রিকায়।
নয়ন নিস্পন্দ অন্য দিকে নাহি ধায়॥
মথন মথন করে প্রকৃতির জারি।
ধন্য ধন্য সূচিকার যাই বলিহারি॥
ধন্য কাশ্মীরের তাঁত তোমার গৌরব।
অদ্যাবধি শ্বেতশিল্পী মানে পরাভব॥
আর এক নারী বেচে কার্পাসের বাস।
বেশে দেয় পরিচয় ঢাকায় নিবাস॥
বিমল বারির স্রোত নাম আবরোঁয়া॥
পুরাধান বংশবিলে সুখে যায় খোয়া।
অনুপম শব্‌নম সূক্ষ্ম অতিশয়।
নিশির শিশিরে যাহা দৃশ্য নাহি হয়॥
বিবিধ বিচিত্র পুষ্পদাম বিখচিত।
জাম্‌দান কাম্‌দান রমণী রচিত॥
মজায় বিলীন সেই বুক মজ্‌লিন।
সন্তানক কুসুম স্বরূপ অমলিন॥
সাবাস্ সাবাস্ তোরে ঢাকা জনপদ।
শিল্প চাতুরীতে তোর অতুল সম্পদ॥
পরাভূত সবে বটে কৈল বাষ্পকল।
কিন্তু জয়ী তব শিল্প-চাতুর্য্য-কৌশল॥

এই রূপ নানারূপ লইয়ে পসরা।
বসিয়াছে পুষ্পবনে যত মনোহরা॥
একধারে যত সব রাজপুতদারা।
অমরী কিন্নরী পরী অপ্সরী-আকারা॥
ইন্দু ভানু কৃশানু কুলেতে অবতার।
রূপের ছটায় সত্য সাক্ষ্য দেয় তার॥
মোগলের মন্ত্রে মজি হেঁট চন্দ্রানন।
ভাতিহীন ভস্মে যথা দৃশ্য হুতাশন॥
অথবা শ্যেনের করে কপোতিকা প্রায়।
সশঙ্কিত ভীতচিত শিহরিত কায়॥
কার ভাগ্যে কোন্ দিন কি হয় ঘটনা।
অবিরত অন্তরেতে ইহাই রটনা॥
ভিকানের ভাবিনীর সতীত্ব ভঞ্জন।
চৌহান কুলেতে কালী-গঞ্জন-অঞ্জন॥
অনেকেতে জানিয়াছে সেই সমাচার।
ভয়ক্রমে আলাপন নাহি করে তার॥
নিদাঘ-নীরদ মত নাহি বরিষণ।
মৃদু রব কভু শ্রুত, নহে গরজন॥
হেনকালে ভিকানের ভাবিনী যুগল।
উদয় হইল যেন জ্যোতির মণ্ডল॥
প্রগল্ভা প্রথমা যেন প্রফুল্ল কমল।
প্রকাশিত বিস্তারিত পল্লব সকল॥
বিতরিত মকরন্দ কৃপণতাহীন।
দানে দানে ভাণ্ডার হয়েছে কিছু ক্ষীণ॥
কিন্তু যাহা আছে শেষ তার লালসায়।
কলি ত্যজি অলিকুল সেই দিগে ধায়॥
দ্বিতীয়ার রূপ সহ কি দিব তুলনা।
যৌবনের উপক্রম ললিত ললনা॥
হাটেতে বসিয়েছিল হাজারে হাজার।
সাজাইয়ে নিজ নিজ রূপের ভাণ্ডার॥
সতীর উদয়ে সবে হইল মলিনী।
দ্বিজেশ দরশে যথা প্রদোষে নলিনী।
বিচিত্র ভাবিল রূপ করি দরশন।
নিজ নিজ রূপে ধিক্ মানে নারীগণ।
নানাদেশী রমণীর গর্ব্ব ছিল ভারী।
পূর্ব্ব চেয়ে পশ্চিমের রূপবতী নারী॥
সে গর্ব্ব হইল খর্ব্ব সতীরে নিরখি।
কহে কোন বরাননা সম্বোধিয়া সখী॥

আহা মরি এ কি হেরি রূপের মহিমা।
কি দিয়ে গড়িল বিধি এ চারু প্রতিমা॥
লাবণ্য বরষি যেন যাইছে রূপসী।
যত রূপ-গর্ব্বিতার মুখে দিয়ে মসী॥
হায় এরে হেরে শাহ হইবে পাগল।
হের দেখ ম্লানমুখী মহিষীমণ্ডল॥
যখন দেখিবে যোধা এই যুবতীরে।
তখনি তাহার বক্ষঃ ফাটিবে অচিরে॥
যে জানে সন্ধান সেই করে কানাকানি।
বলে কি রাক্ষসী এই ভিকানের রাণী॥
অবলা অপলা এই সরলা রূপসী।
শশদীয়া সিন্ধুজাত অকলঙ্ক শশী॥
ইহারে এনেছে ছলে নৌরোজার হাটে।
পরশিরে বাজ মারি ভুঞ্জিবে সম্রাটে॥
ডঙ্কিণী রঙ্কিণী এই শঙ্খিনী পামরী।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মায়াবিনী নিশাচরী॥
এইরূপ কাণাকাণি হয় নারীদলে।
হেনকালে তপন চলিল অস্তাচলে॥

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

কিবা শোভা অপরূপ হেরি দিল্লীপুরে।
নিরখি নয়ন-যুগ তমঃ যায় দূরে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী বিরাজে গগনে।
নরের অসাধ্য তাহা নিরখে নয়নে॥
বুঝি বিধি সেই ক্ষোভ হরণ কারণে।
ইন্দ্রসভা প্রতিকৃতি আনিল ভুবনে॥
এই হেতু পূর্ব্বে ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ নাম।
জগতে বিজয়ী পঞ্চ পাণ্ডবের ধাম॥
জগতের যত কীর্ত্তি সকলি ভঙ্গুরা।
তথাপি অদ্যাপি দৃশ্য দিল্লীর কঙ্গুরা॥
হিন্দু আর সারসেনী কীর্ত্তির প্রকাশ।
ভয়াল বিদ্রোহ-কালে না পাইল নাশ॥
গগনপরশী স্তম্ভ পাষাণে রচিত।
দেহে তার রত্নময় চিত্র বিখচিত॥
কোথা সেকেন্দর সহ দারার সমর।
বিলেখিত ইষ্টকার বিচিত্র নগর॥

কোথায় রুস্তম বীর প্রকাশে বিক্রম।
পুত্র সোহরাব সহ বিগ্রহ বিষম ॥
কোথায় তৈমুরলঙ্গ চতুরঙ্গ দলে।
অগণিত অরি-দেহোপরি দলে বলে ॥
কোথায় লিখিত রৌশ্‌নক গুণধামা।
হেন চিত্রভঙ্গী যেন কথা কহে রামা ॥
কোথায় জেলেখা যুসফের প্রেমলেখা।
কি ক্ষণে মিসরপুরে হয়েছিল দেখা ॥
কোথা লয়লার প্রেমে মজ্‌নু মগ্‌ণ।
কি লগণ্‌ আ মরি একি মনের লগণ্‌ ॥
আদিরস বীররস পৌরুষ প্রধান।
এ জগতে এই দুই সুখের আধান ॥
প্রেম ছাড়া বীর কোথা, বীর্য্য ছাড়া প্রেমী
ধুরা ছাড়া কভু স্থির নহে চক্রনেমি ॥
প্রবেশে নিগম-পথে * দৃশ্য মনোহর।
প্রকাণ্ড পাষাণময় যুগ্ম বীরবর ॥
যুগল তুরঙ্গোপরে সমর-ভঙ্গিম।
প্রফুল্ল নয়নপদ্ম ঈষৎ রক্তিম ॥
বিনয়ে পথিক জিজ্ঞাসেন সমাচার।
"কহ দ্বিজ সেই দুই প্রতিমা কাহার ॥"
শুনি বাণী কথকের লোমাঞ্চ শরীর।
কহিতে সে কথা নয়নেতে বহে নীর ॥
কহে, "হে পথিক, দেখ নাই কি এ দেশে।
ঘরে ঘরে লেখা সেই দুই বীর-বেশে ॥
জয়মল্ল নামধর তার এক বীর।
উজ্জ্বল করিল সেই জননীর ক্ষীর ॥
রাঠোর বংশীয় বীর বেদনোর-পতি।
কুলকুবলয়ে সুধাকর মহামতি ॥
চিতোরের তিজোশকে † বীরত্ব তাহার
স্বকরে ছেদিল শত্রু হাজারে হাজার ॥
অন্যায় সমরে তারে মারে আক্‌বর।
আগন্তুক গোলাঘাতে হত বীরবর ॥
যে বন্দুকে মরিল সুরেন্দ্র গুণধাম।
'সংগ্রাম' বলিয়ে শাহ রাখে তার নাম ॥
নিজ গ্রন্থে গুণ তার গায় বারে বারে।
প্রতিমূর্ত্তি আরোপিল দিল্লীপুরদ্বারে ॥
দ্বিতীয় প্রতাপ নামা চণ্ডবংশজাত।
ভগবৎ শ্রেণীর ঠাকুর সুবিখ্যাত ॥
ষোড়শবর্ষীয় শিশু সিংহের সোসর।
চিতোর দুর্গের দ্বারে ত্যজে কলেবর ॥
কতিপয় দিন পূর্ব্বে জনক তাহার।
রণক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধে পাইলে সংহার ॥
জননী কুমার প্রতি করিল আদেশ।
পিতৃবৈর-শোধে ধর অরুণিত * বেশ ॥
পত্রে পাঠাইয়ে সেই বীর প্রসবিনী।
কুঙ্কুম রঞ্জিত বর্ম্ম পরিল ভাবিনী ॥
সাজাইল বধূরে বিবিধ প্রহরণে।
সহচরী দলে বলে প্রবেশিল রণে ॥
প্রাণ প্রিয়তমা আর আপন জননী।
সমর-তরঙ্গে দেহ ঢালিল যখনি ॥
জীবনের আশা ছাড়ি প্রতাপ তখন।
মোগল সহিত আরম্ভিল ঘোর রণ ॥
সেই সেনা মত্ত মাতঙ্গিনীর সমান।
চালাইল শিশু বীর ধীমান্‌ শ্রীমান্‌ ॥
স্বপ্নে হইল হত রাণার কল্যাণে।
অদ্যাপি তাহার গুণ গীত নানা গানে ॥
সেই দুই বীরেন্দ্রের প্রতিমা ভীষণ।
অদ্যাপি দিল্লীর দ্বারে আছে সুশোভন ॥
বীরের সম্মান জানে বীর যেই জন।
আক্‌বরে ছিল এই উদার লক্ষণ ॥"
রবি শশী উপহাসে সিংহদ্বারচূড়া।
অদ্যাপি নহিল কাল-দশনেতে গুঁড়া ॥

* নিগম্বদ্‌ ইতি অপভ্রংশ।

† চিতোর-দুর্গ বারত্রয় মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ আলাউদ্দীন পাঠান ভীমসিংহের সহিত যুদ্ধোপস্থিত করে, তাহা মদ্বিরচিত পদ্মিনী উপাখ্যানে বিন্যস্ত আছে, দ্বিতীয়তঃ বেয়াজীদ নামক ঘোরতর পরাক্রান্ত বীর কর্ত্তৃক তাহা আক্রান্ত হয়, এই বেয়াজীদকে ইউরোপীয়রা বাজাজেট কহেন। তৃতীয়তঃ আক্‌বর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, এই তৃতীয় আক্রমণকে রাজপুতেরা 'চিতোর বা তিজোশক' কহেন।

* রাজপুতদিগের যুদ্ধবাস লোহিত-রঙ্গে রঞ্জিত।

কি ছার রাবণপুরী দিল্লী-তুলনায়।
প্রবেশিতে কেঁপে যায় কৃতান্তের কায় ॥
কত কাণ্ড কি বর্ণিব ব্যর্থ আকুঞ্চন।
কত দেশে কত কবি করিল বর্ণন ॥
তিন ধারে সুগভীর পরিখানিচয়।
কলিন্দ-নন্দিনী রঙ্গে এক ধারে বয় ॥
লোহিত উপলে বপ্রব্যূহ বিরচিত।
স্থানে স্থানে পুঞ্জ পুঞ্জ কুঞ্জ সুশোভিত ॥
নৌরোজার দিনে ঘোর ঘটা আড়ম্বর।
দেবানী-আমেতে * বার দিলা আকবর ॥
কিবা সেই সিংহাসন মণি বিরচন।
অলক্ষিত বাসব বিরিঞ্চি বিরোচন ॥
কুবেরের ধনে তার মূল্য নাহি হয়।
মহেন্দ্র স্বরূপ শাহ তাহাতে উদয় ॥
প্রসন্ন প্রসরতর উন্নত ললাট।
যেন তাহে লেখা পাঠ ধরা-রাজ্য-পাট ॥
হোমাপুচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ কিরীটে কলিত।
মুখে তার বিন্দু বিন্দু হীরক ফলিত ॥
ললিত লুলিত লোল পবন হিল্লোলে।
বারি-বিন্দু দোলে যেন তুষারের কোলে ॥
বসিয়াছে ওমরা আমীর মীরগণ।
রাজা মহারাজা বড় বড় মহাজন ॥
সুকবি সুধীর বক্তা পণ্ডিত গায়ক।
মিয়া তানসেন আদি বিবিধ নায়ক ॥
কোথায় সঙ্গীত-বাদ্য সুরস লহরী।
জনগণ মন প্রাণ জ্ঞান লয় হরি ॥
কোথায় তর্কের সিন্ধু তরঙ্গিত হয়।
ন্যায়েতে অন্যায় বটে, বিতণ্ডার জয় ॥
খ্রীষ্টিয়ানী হিন্দুয়ানী মুসল্মানী লয়ে।
মিছে বাদ বিবাদ সময় যায় বয়ে ॥
বালকের দ্বন্দ্ব মত নাহি আগা গোড়া।
জ্ঞানী হাসে বলে ধর্ম্মনাশে যত গোঁড়া ॥
এক দিকে মল্লযুদ্ধ মহা মালসাট।
আর দিকে হইতেছে ভেড়ুয়ার নাট ॥
আর দিকে মাতঙ্গে মাতঙ্গে ঠেলাঠেলি।
আর দিকে রণসজ্জা চমূচয় মেলি ॥

আর দিকে তুরঙ্গে তুরঙ্গী শোভমান।
দেখাইছে হয়শিক্ষা বিবিধ বিধান ॥
এত যে কৌতুক কাণ্ড একের কারণ।
কিন্তু তার অন্তরেতে জ্বলে হুতাশন ॥
কিছুতে না হয় স্থির, মানস অস্থির।
বুঝিতে না পারে ভাব খোস্রু আমীর ॥
পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে সুশোভন।
সেই দিকে আরোপিত শাহের নয়ন ॥
উচাটন অনুক্ষণ ঘন ঘন চায়।
ক্ষণ বোধ হয় যেন যুগান্তের প্রায় ॥
ভানু যায় অস্তগিরি প্রদোষ আগত।
বহে ধীর-বায়ু বিরহীর শ্বাসমত ॥
বিরহিবাসনা সম শশধর-রেখা।
প্রাচী-শিরে অচিরে আসিয়া দিল দেখা।
হেনকালে উদ্‌ঘাটিত হইল সে দ্বার।
বাহির হইল আসি খোজার সর্দ্দার ॥
পরিণত জম্বু প্রায় অসিত বরণ।
দীঘল ব্যাদান বক্ত্র, দীঘল চরণ ॥
শালুক-সমান শ্বেত নয়নযুগল।
হনুমত মত সমুন্নত গণ্ডস্থল ॥
মেষলোম সম কেশ কুঁটিল বিশেষ।
ওষ্ঠাধরে যুগল কদলী সমাবেশ ॥
কটমট বিকট দশন পরকাশ।
হিয়া কাঁপে হেরি সেই হবশীর হাস ॥
ইঙ্গিত করিল খোজা থাকিয়া অন্তরে।
দরবার ভাঙ্গি শাহ চলিল অন্দরে ॥
গুপ্তগৃহে কহে খোজা, "শুন জাঁহাপনা।
আসিয়াছে পুরী মাঝে সতী সুবদনা ॥
সেরূপ স্বরূপ কথা কি কহিব আমি।
হেন নারী দেখি নাই হে ধরণীস্বামি ॥
ক্লীব আমি নিরখি মোহিত মন মম।
সে রূপেতে মুগ্ধ হয় স্থাবর জঙ্গম ॥
তার সমতুল নাই তোমার আগারে।
চল জাঁহাপনা ত্বরা হেরিতে তাহারে ॥"
কি বেশে যাইবে তথা ভাবে দিল্লীপতি।
কোনরূপে সংশয় না করে মনে সতী ॥
সাত পাঁচ চিন্তা করি ধরে যোগিবেশ।
পরিহরে রাজবেশ ভুবন নরেশ ॥

* শাহজাঁহার নির্ম্মিত দেবানী আম স্বতন্ত্র। আকবরের সময়েতেও উক্ত নামধেয় প্রাসাদ ছিল।

শিরে ধরে জটাভার ধরণীচুম্বিত।
পরিহিত মৃগচর্ম্ম আজানুলম্বিত॥
ভস্ম বিভূষিত কায় তুষার-বরণ।
প্রচুর রুদ্রাক্ষমালা কণ্ঠে আভরণ॥
ললাটে ত্রিশূল-চিহ্ন লোহিতচন্দনে।
মুখে ধ্রুবপদ গীত ত্র্যম্বক বন্দনে॥
করেতে ত্রিতন্ত্রী বীণা বিনোদ ঝঙ্কার।
নানা সন্ধ্যা রাগিণীর হয় অবতার॥
অপরূপ ছদ্মবেশ বলিহারি যাই।
সাজিল মোগল ভাল গুণের গোঁসাই॥
কে বলিতে পারে তারে যবনাধিপতি।
মহেশ স্বরূপ মনোহর সে মূরতি॥
দেবানী-খাসেতে শাহ যায় ধীরে ধীরে।
মুখে শিব রব, হৃদে ধিয়ায় সতীরে॥
হেথা শুন সমাচার, প্রধানা মহিষী।
রূপে গুণে যোধাবাঈ কমলাসদৃশী॥
পিতা ভ্রাতা ধনলোভে মোগলে অর্পিতা।
কিন্তু রাজপুত্র-কুল-দর্পেতে দর্পিতা॥
বিবিধ সন্ধানে জানি শাহের ছলনা।
সতীর সতীত্ব রক্ষা চিন্তিল ললনা॥
বড় বড় ক্ষত্রিসুতা দিল্লীশ্বরে ডালী।
কোন রূপে রাণাকুলে নাহি পড়ে কালি॥
বিশেষে রমণী-মনে অভিমান রাজা।
রূপগর্ব্ব সিন্দূরেতে মন মণি মাজা॥
মনে ভাবে সতী পেয়ে মত্ত হবে শাহ।
তার প্রতি ধাইবেক প্রণয়প্রবাহ॥
আমার প্রভুত্ব আর থাকা হবে ভার।
জাতি দিয়ে লাভ মাত্র কুলের খাকার॥
এই বেলা করি তার উপায় চিন্তন।
বিষ বল্লী অঙ্কুরে উচিত নিকৃন্তন॥
শুনিতে পাইল শাহ যোগিবেশ ধরে।
আপনি যোগিনী-বেশ পরিধান করে॥
পরিহরি পেশোয়াজ রক্তপট্ট শাটী।
পরিল প্রমদা, তাহে শোভা পরিপাটী॥
ত্যজি মৃগমদমিশ্র-অগুরু চন্দন।
মুখেতে ধরিল ধনী বিভূতি-ভূষণ॥
আলুয়িল চারু বেণী লোটাইল ধরা।
মণিময় অলঙ্কার ত্যজে মনোহরা॥

এক করকমলেতে ত্রিশূল বিরাজে।
অন্য করে জপমালা অপরূপ সাজে॥
সহচরীগণ ধরে সেইরূপ বেশ।
দেবানা-খাসেতে আসি করিল প্রবেশ॥
দেখে শাহ বসিয়াছে এক তরুতলে।
ঘেরি তারে দাঁড়ায়েছে নারী দলে দলে॥
কোন রামা দেখাইছে আপনার কর।
কর ধরি ভূত ভাবী কহে যোগিবর॥
কারে বলে অচিরে হইবে পুত্রবতী।
কারে বলে প্রবাসে রহেছে তব পতি॥
ত্বরায় আসিতে পারে যদি ইচ্ছা করে।
কিন্তু পড়িয়াছে বাঁধা পরকীয়াকরে॥
কারে বলে পতির সোহাগ তুমি চাহ।
পরে হরে তব ধন, তাহে অঙ্গ-দাহ॥
পতিরে ফিরাতে যদি থাকে প্রয়োজন।
সন্ন্যাসীরে দেহ কিছু পূজা-আয়োজন॥
দিল্লীতে অধিক কাল আমি না রহিব।
আমার কুটীরে যেও ঔষধ কহিব॥
কারে কহে তোমার সতীনে বড় দোষ।
কিন্তু যদি কথা শুন খণ্ডিবেক দোষ॥
নিত্য নব নব বেশ করিয়া ধারণ।
করিবে প্রদোষে ছাদে চরণ-চারণ॥
সে ভাব দেখিয়া যদি কান্ত কাছে আসে।
দ্বাররোধ তখনি করিবে নিজবাসে॥
জনমিয়া দিবা দৈধী তাহার অন্তরে।
দেখিবে কদিন আর অবহেলা করে॥
নিকটে আইলে মুখে মানাম্বর ঢাকি।
না করিও ত্বরা তার সহ তাকাতাকি॥
হইলে বিহিত নম্র রোদন করিয়া।
আদায় লইবা বাকী শ্রবণে ধরিয়া॥
এই রূপ নানা রূপ গণন গাথন।
হাস্য-পরিহাসে রত যত নারীগণ॥
দূরেতে দাঁড়ায়ে সতী দেখেন কৌতুক।
ব্রীড়ানম্রমুখী প্রাণ করে ধুক ধুক॥
জায়ে কন, "চল দিদি গৃহে ফিরে যাই।
এখানে বিলম্বে আর কোন কার্য্য নাই॥
বলেছিলে পুরুষ-নিষিদ্ধ এই স্থান।
তবে কেন এ সন্ন্যাসী হেরি বিদ্যমান॥

না জানি সন্ন্যাসী এই হয় কোন্ জন।
চল দিদি এখানে নাহিক প্রয়োজন॥"
প্রথমা কহিছে, "সতি কারে ভয় কর।
সংসারবিরাগী এই মহা যোগীশ্বর॥
দেখ, যোগি-দেহ পুঞ্জ পুঞ্জ তেজোময়।
তুমি মুগ্ধা হেন সন্ন্যাসীরে কর ভয়॥
এই দেখ যাই আমি দেখাইতে কর।
এস্যো সঙ্গে কিছুই করো না মনে ডর॥"
এত বলি হাত ধরি করে টানাটানি।
হইল দ্বিগুণ রাঙ্গা সতী পদ্মপাণি॥
অশ্রুমুখী হয়ে সতী রোষে কন বাণী।
"কি দুঃখে ফেলিলে দিদি এখানেতে আনি॥
হাসাইতে চাহ না কি রমণীসমাজ।
'হায় আমি মাটী খেয়ে' করিনু কি কাজ॥
কেন মজিলাম আমি তব প্রলোভনে।
কি কবে দেবর তব এ কথা শ্রবণে॥
বিনয়েতে ধরি দুটি তোমার চরণে।
চল চল চল দিদি যাই নিকেতনে॥"
এমন সময়ে তথা আইল যোগিনী।
দেখে দ্বন্দ্বপরায়ণা দুই সীমন্তিনী॥
কহে, "এ আনন্দধামে কি হেতু বিবাদ।
শুনিলে দিল্লীর নাথ ঘটিবে প্রমাদ॥"
বিবরণ শুনি পরে কহিছে বচন।
"অনিচ্ছায় প্রবৃত্তি প্রদান অশোভন॥
বিশেষতঃ জানি আমি শুন সুবদনি।
এই যোগিবর হয় ভণ্ডচূড়ামণি॥
কেমনে আইল হেথা বুঝিতে না পারি।
প্রমোদা প্রমোদবনে কেন বামাচারী॥"
শুনি কথা সন্ন্যাসী উঠিল রোষভরে।
আরামের অন্য দিগে চলিল সত্বরে॥
যায় যথা মধুরিকা বেচিতেছে সুরা।
বিনিয়ে বীণায় গায় গীতিকা মধুরা॥

গীত

(কালাংড়া)

দেখ কমলিনী কলি প্রভাতে উদয়।
নব বধূ সম কিবা লালিত্য-নিলয়॥

অৰ্দ্ধ বিকসিত মুখ,
নয়নে বিতরে সুখ,
অস্ফুট কারণে দুঃখ
ভাবে অলিচয়॥ (১)
রাখে রূপ আবরণে,
তাহে ক্ষোভ পেয়ে মনে,
ফিরে যায় অলিগণে
ব্যাকুল-হৃদয়॥ (২)
পর দিন দেখে আসি,
নলিনী হয়েছে বাসী,
যামিনী গিয়াছে নাশি
রূপ রসময়। (৩)
অতএব বাক্য ধর,
কেন বৃথা কাল হর,
যৌবন সফল কর,
থাকিতে সময়॥ (৪)

গীত শুনি হাসে যত সুরত-রঙ্গিণী।
অরুণ-উদয়ে যথা সুর-তরঙ্গিণী॥
হেসে কহে কোন ধনী, "ভাল দেখি যোগী।
গীতে দেয় পরিচয় প্রকৃত সম্ভোগী॥
প্রণয় বিয়োগে বুঝি যোগে দিলা মন।
কহ হে নবীন যোগী শুনি বিবরণ॥"
উত্তরে সন্ন্যাসী ধরে দ্বিতীয় সঙ্গীত।
মোহিনীমণ্ডল মত্তা পাইল পীরিত॥

গীত

(বাহার)

প্রেম-যোগে আছি নিরন্তর।
ধ্যানে ধরি সদা প্রিয়া-মুখ-সুধাকর॥ (১)
সে মুখ সুধার স্থান,
তাহে সোমরস পান,
করিয়া পবিত্র করে হবে কলেবর॥
তার পদ-রজঃ অঙ্গে,
মাখিব পরম রঙ্গে,
এমন বিভূতি কোথা ভুবন ভিতর॥ (২)
বিনোদ কবরীজাল,
হবে মম মৃগ-ছাল,
মনোহর কমণ্ডলু হৃদয়-উপর॥ (৩)

হৃদি কুঞ্জে স্নেহ হবি,
প্রণয় অনল ছবি,
করি হে সোহাগ যাগ যামিনী-বাসর ॥ (৪)

হেন কালে তথায় যোগিনী উপনীত।
নিরখি অমনি যোগী সমাপিল গীত ॥
কহিছে যোগিনী রোষে, "রে রে ভণ্ড যতি।
ভাল ভাল এই বটে যোগিযোগ্য রতি ॥
যেমন দুর্ম্মতি তব সেরূপ দুর্গতি।
পূর্ব্ব জন্মকথা * মনে কর দুষ্টমতি ॥
জাতিস্মর বলিয়া করহ অহঙ্কার।
চিন্তা নাহি হয় কিসে পাইবে নিস্তার" ॥
কথা শুনি সন্ন্যাসী চলিয়া গেল দূরে।
অন্য পথে যোগিনী প্রবেশে অন্তঃপুরে ॥
হেথা সতী সীমন্তিনী কিছুকাল পরে।
প্রথমারে না হেরিয়া কাতর অন্তরে ॥
শুধাইল মৃগশশী ভাবে মনে মনে।
পরিহরি গেল দিদি আমার গঞ্জনে ॥
আর বার ভাবে বুঝি লুকাইয়া আছে।
অভাগীর রঙ্গ দেখে দাঁড়াইয়া কাছে ॥
যারে হেরে সম্মুখেতে জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখেছ কি ভিকানের রাজপ্রমদারে ॥
কেহ বলে, "সে কেমন না দেখি কখন।
কেহ বলে, উপবনে কর অন্বেষণ ॥
কেহ নিরুত্তরে যায় মৃদু হাস্যাধরে।
কেহ বা অন্তরে অতি পরিতাপ করে ॥
ব্যাকুল হইয়া বালা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কভু কুঞ্জে কুঞ্জে তার অন্বেষণ করে ॥
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু ললাটে উদয়।
সিন্দূর চন্দন বিন্দু পরিভ্রষ্ট হয় ॥

* অপ্রকাশ নহে, এতদ্দেশে এরূপ প্রবাদ আছে, আকবর শাহ পূর্ব্বজন্মে এক ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন। কর্ম্মদোষে শাপভ্রষ্ট হইয়া যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অপর, আক্‌বর শাহ জাতিস্মর ছিলেন, বোধ হয়, সুচতুর আক্‌বর এইরূপ প্রবাদ প্রচার দ্বারা স্বীয় হিন্দু প্রজামণ্ডলে সমধিক প্রিয় হইবার চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন।

গলিত নয়নজলে দলিত অঞ্জন।
কপোল-কমলে যেন দ্বিরেফ রঞ্জন ॥
আকুল হইয়ে বসে বকুলের তলে।
ঘন ঘন বহে শ্বাস প্রতি পলে পলে ॥
যেন কিরাতের জালে কপোত মহিলা।
মুক্তি-লাভে বহুক্ষণে হয়ে যত্নশীলা ॥
পরিশেষ শ্রান্ত দেহে পড়ি এক ধারে।
মুহুর্মুহুঃ শ্বাস ত্যজে নারে উঠিবারে ॥
তরুতলে বসি এই স্থির করে সতী।
যে পথে এসেছি সেই পথে করি গতি ॥
শুনিয়াছি কাত্যায়নী অগতির গতি।
অবশ্য আমারে রক্ষা করিবেন সতী ॥
এত ভাবি পূর্ব্বপথে করিল গমন।
প্রবেশে পুরীর মধ্যে সচকিত মন ॥
দেখে রত্ন স্ফটিকের কত দীপাধার।
নানা রঙ্গে তাহে গাঁথা প্রভাপুষ্পহার ॥
হেম-পাত্রে স্বাহানাথ ঈষৎ উদয়।
ধূপচর্ণ চারুগন্ধ বহে গৃহময় ॥
জ্বলিছে ভিত্তির গাত্রে প্রকাণ্ড মুকুর।
মন্দাকিনী যথা দীপ্ত করে সুরপুর ॥
এই রূপ নানা সজ্জা নিরখে নয়নে।
কিন্তু জন প্রাণী নাই সেই নিকেতনে ॥
দূরে দূরে মধুর বীণার ধ্বনি হয়।
কোথায় সারঙ্গ-তানে সুধা বরিষয় ॥
কোথায় মুরলীস্বরে মন করে চুরি।
সতী ভাবে মায়ার রচনা এই পুরী ॥

মুরলীর গীত ১
(ঝিঁঝোঁটী)

কেন মত্ত হলি রে এমন।
হেন মদ কোথা পান করিলি রে মন ॥
সুধার ভাণ্ডার যার সুচারু বদন,
সে ত নাহি করে তোরে বিন্দু বিতরণ,
জ্ঞান হারাইলে তুমি, করি দরশন ॥ (১)
দরশন করি সুধা হল্যে অচেতন,
না জানি করিলে পান কি হবে তখন,
অবোধ না হেরি আর তোমার মতন ॥ (২)

রব শুনে ভাবে সতী এই দিকে যাই।
দেবীর দয়ায় যদি সদুপায় পাই॥
এত ভাবি সেই দিগে করিল প্রয়াণ।
অমনি স্থগিত তথা মুরলীর গান॥
অন্যদিগে বাজিতে লাগিল মৃদুস্বরে।
শুনিয়ে শঙ্কায় সতী শরীর শিহরে॥

মুরলীর গীত ২

(বাহার)

যৌবন-মাদকে তব ঘূর্ণিত নয়ন।
নিকটে অধীন, নাহি কর দরশন॥
মিলন শীতল বারি,
এ মাদকে হিতকারী,
পান কর প্রমোদিনি, ধরহ বচন॥ (১)
মত্ততা হইবে গত,
পথ পাবে মনোমত,
সুস্থির হইবে তব সুচঞ্চল মন॥ (২)

সঙ্গীতের ভাব শুনি ভয়ার্ত্ত ভাবিনী।
ভাবে কোথা অভাবে সম্ভব সম্ভাবিনী॥
নাহি পায় পথ ধনী যেই দিগে যায়।
কপালে কঙ্কণ মারে করে হায় হায়॥
রাবণের ঘোর-চক্র স্বরূপ ভবন।
যত ঘোরে তত ঘোরে পড়ে ভ্রান্ত জন॥
কুটিলা তটিনী যথা বাঁকে বাঁকে রয়।
দণ্ডকের পথ দিনে সাঙ্গ নাহি হয়॥
পথিক ভাবনা করে আইলাম দূরে।
শেষে দেখে পূর্ব্বস্থানে আসিয়াছে ঘুরে॥
সেই রূপ পথ সতী সন্ধান না পায়।
সেই দ্বার মুক্ত, যেই দিগে ধনী যায়॥
রজত-রচিত দ্বার শোভে শত শত।
কাঞ্চন-কবজে ঝুলে সুবিচিত্র কত॥
হুতাশে হুতাশ হয়ে পড়িল বসিয়া।
বিনোদ-কবরী-ভার গিয়াছে খসিয়া॥
তৃষায় তাপিত কণ্ঠ নাহি সরে রব।
মৃদু-স্বরে আরম্ভিল কুলদেবী স্তব॥

স্তোত্র

ভব-চিত-অলি পদ্মিনি!
ভকত-হৃদয়-সদ্মিনি!
ভব-ভয়-চয় হারিণি!
জনম-জলধি-তারিণি!
সুর-দল-বল-রূপিকে!
সব শুভ-শিব কৃপিকে!
হিম গিরিবর নন্দিনি!
হরি হর বিধি বন্দিনি!
যুকতি মুকতি দায়িনি!
স্মর-হর হৃদি শায়িনি!
ত্বরিত দনুজ দামিনি!
কুলপতি কুল-কামিনি!
পশুপতি অনুগামিনি!
ভুবন-ভরণ ভামিনি!
নরক-নিগড় মোচনি!
শতদল দল লোচনি!
ত্রিপুর মথন মোহিনি!
ত্রিপুর হৃদয় রোহিণি!
মহিষ মদ-বিমর্দ্দিনি!
অগণিত গজ নর্দ্দিনি!
মুহি তুহি পদ কিঙ্করী!
জয় জয় জয় শঙ্করি!
যবন ভবন অন্তরে!
মরি মরি ডরি অন্তরে!
তনুরুহ ঘন শিহরে।
ভয়-চয় সব ধী হরে।
প্রণত চরণ সেবিকে!
বিতর শরণ দেবিকে!
প্রসীদ সিদ্ধ ঈশ্বরি!
প্রভাত-ভানু ভাস্বরি!
মহেন্দ্র নাথ সুন্দরি!
ধরাধরা-ধুরন্ধরি!
নিশুম্ভ শুম্ভ ঘাতিনি!
প্রচণ্ড চণ্ড পাতিনি!
প্রশান্ত দান্ত পালিনি!
প্রসীদ মুণ্ডমালিনি!

শশাঙ্ক খণ্ড ভালিনি !
সুধা সমস্ত শালিনি !
কৃতান্ত যন্ত্র খণ্ডিকে !
কৃপাণু দেহি চণ্ডিকে !
প্রলম্ব হার লম্বিকে !
প্রসীদ মাতরম্বিকে !
দুরন্ত দুঃখ ত্রাহি মে ।
উপায় শীঘ্র দেহি মে ॥

এইরূপে একমনে করে নতি স্তুতি ।
প্রসন্না হইলা তাহে দেবী শিবদূতী ॥
পার্শ্বগৃহে নরাঙ্কিত হয় দৈববাণী ।
মা ভৈ মা ভৈ রবে ভৈরবী ভবানী ॥
কহিছেন স্নেহভাবে "শুন কন্যে সতি !
তোর অমঙ্গল করে কাহার শকতি ॥
সতীত্ব কবচে তোর আবৃত শরীর ।
প্রকাশে প্রভাব যেন মধ্যাহ্নমিহির ॥
কার সাধ্য অতিচার করিতে তাহার ।
কোন্ তুচ্ছ আকবর যবন কুমার ॥
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই আর ।
এই লহ তরবারি প্রসাদ আমার ॥
হৃদয়ে গোপনে রাখি করহ গমন ।
সাহসে নির্ভর সতি দৃঢ় কর মন ॥"
শুনিয়া স্তম্ভিত চিত কিছুক্ষণ সতী ।
উদ্দেশে চণ্ডিকাপদে করিল প্রণতি ॥
দেখে জালনায় এক সুতীক্ষ্ণ ভুজালী ।
হৃদয়ে রাখিল মুখে বলি জয় কালী ॥
কদম্বকুসুম প্রায় লোমাঞ্চিত কায় ।
চকিত স্থগিত নেত্রে এই মনে ভায় ॥
"যে স্বরে ভবানী-বাণী শুনিলাম কাণে ।
যেন তাহা শুনিয়াছি আর কোন্খানে ॥
অনেক চিন্তিয়া সতী করিল নিশ্চয় ।
"যোগিনীর স্বর প্রায় অনুভূত হয় ॥
বুঝিলাম কালিকার করুণা এখন ।
আমারে রাখিতে দেবী দিলা দরশন ॥
যোগীর নিকটে যেতে করিলেন মানা ।
নিবারিলা প্রথমার প্রলোভন নানা ॥
বুঝিতে না পারি কিছু অভিসন্ধি তার ।
প্রবৃত্তি প্রবন্ধ কত দিল বার বার ॥
এখন আমায় ত্যজি অদৃশ্য হইল ।
সভা-ভঙ্গে কেন মোরে সঙ্গে না লইল ॥
দেখেছি কদিন আসে এই নৌরোজায়
নানা রত্ন অলঙ্কারে গৃহে ফিরে যায় ॥
কোথায় পাইল সেই সকল রতন ।
কেন হেন কেমন কেমন করে মন ॥"
ভাবিতে ভাবিতে বালা যায় দ্রুতগতি ।
সহসা ভেটিল তথা আসি দিল্লীপতি ॥
রাজপরিচ্ছদধর মনোহর বেশ ।
রূপেতে করিল আলো প্রাঙ্গণ-প্রদেশ ॥
কোহিনুর রত্ন ভেট দিয়ে সতীপদে ।
জানু পাতি কহে যুক্ত কর-কোকনদে ॥
"শুন রাজকন্যে মহীধন্যে বরাননি ।
তব রূপ গুণ যশে ভরিল ধরণী ॥
নয়ন-শ্রবণ-বাদ-ভঞ্জন-কারণ ।
করিলাম যজ্ঞরূপ নৌরোজা সৃজন ॥
তব অধিষ্ঠানে পূর্ণ হল্যা সেই যাগ ।
লহ এই কোহিনুর তব যজ্ঞভাগ ॥
তোমার অযোগ্য এই খনিজাত মণি ।
হৃদয়ে দ্বিতীয় ভেট আছে সুবদনি ॥
যদি তুমি অনুমতি দেহ অকিঞ্চনে ।
বুক চিরে সেই মণি দেই শ্রীচরণে ॥
রাঙ্গাপায় বিকায়েছি প্রাণ আর দেহ ।
প্রসন্না হইয়ে দীনে কৃপাদৃষ্টি দেহ ॥"
যেন কোন পথিক পতিত ঘোর বনে ।
পথ হারা দিক্ হারা ভ্রমে ভ্রান্ত মনে ॥
অকস্মাৎ করে দৃষ্টি নির্গম সময় ।
ভীষণ শার্দ্দূল আসি সম্মুখে উদয় ॥
তরজে গরজে ঘোর সুগভীর স্বরে ।
সেইরূপ দেখে সতী দিল্লীর ঈশ্বরে ॥
প্রথমতঃ প্রকম্পিত হইল শরীর ।
প্রবল পবনে যেন কদলী অস্থির ॥
কিন্তু ক্ষত্রিয়ার তেজ থাকে কতক্ষণ ।
শরদ্-জলদে কভু ঢাকে বিকর্ত্তন ॥
কেশরী-কুমারী প্রায় বিষম বিক্রম ।
কহে সতী, "শুন রে মোগল নরাধম ॥

তুমি না ধার্ম্মিক ধীর বীর বাদশাহ।
তুমি না জগৎগুরু বলি যশ চাহ॥
তুমি না অভেদ-জ্ঞানী সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রতি।
তুমি না সাধুর শ্রেষ্ঠ সুরতি সুমতি॥
এই কি বীরত্ব তব যবন তনয়।
এই কি তোমার ধর্ম্ম রে রে দুরাশয়॥
এই কি তোমার পুণ্যব্রত-পরিচয়।
এই কি তোমার কীর্ত্তি কলুষনিলয়॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে মোগল দুরাচার।
মনে ভাব পরলোকে কিনে হবে পার॥"
কথা শুনি আকবর হইল অবাক্।
মানস চঞ্চল যেন কুলালের চাক॥
ভাবে "সুনিশ্চয় পতিব্রতা এই নারী।
এত দিনে অবলার হাতে হৈল হারি॥
ভুবনের ভামিনী ভাবিনীগণ যত।
আমার প্রণয় যাচে কাঙ্গালিনী মত॥
এ নারী কেমন নারী নারি চিনিবারে।
নারিলাম কোহিনুর রত্নে কিনিবারে॥
যে হোক্ সে হোক্ এরে ছাড়া কভু নয়।
ছলে বলে বশীভূত করা যুক্তি হয়॥
শুদ্ধ দেহে যদি যায় কলঙ্ক রটিবে।
রাজোড়া-মণ্ডল সহ বিবাদ ঘটিবে॥"
এত ভাবি যায় শাহ প্রসারিত করে।
ধরিতে ধীরায়, থর থর কলেবরে॥
হেরিয়ে হরিণ নেত্রা হরিদারা প্রায়।
কণ্ঠে ধরি দূরেতে ফেলিল বাদশায়॥
অবশ নরেন্দ্রনাথ স্মরশরাঘাতে।
ছিন্নমূল দ্রুম-প্রায় পড়িল ধরাতে॥
অমনি রমণী হৃদে পদাঘাত করি।
কহিতে লাগিলা করে করবাল ধরি॥
"অরে রে গোলামপুত্র গোলাম দুর্জ্জন।
এত বড় সাধ্য তোর শূকরনন্দন॥
কোথায় করেছ আশা পাপিষ্ঠ পামর।
শৃগাল হইয়া চাহ সিংহসুতা-কর॥
জান না ভানুর বংশ ভানু অংশধর।
শশদীয় পুরুষ প্রমদা পরিকর॥
রে দুর্ম্মতি আমরা মোগলসুতা নই।
বাহুরের বানরী স্বরূপ বাঁধা রই॥
আমাদের অস্ত্র নহে সূচিকা কর্ত্তরী।
এই দেখ করে করবালী ভয়ঙ্করী॥
এই দেখ পরীক্ষা তাহার দুরাচার।
এই রে তৈমুর বংশ করি রে সংহার॥"
এত বলি উঠাইল করাল কৃপাণ।
নিরখিয়া আকবর হৈল হতজ্ঞান॥
অকস্মাৎ পুষ্পবৃষ্টি সতীর উপরে।
'ধন্য ধন্য বলি' দৈব-বাণী ঘোর স্বরে॥
ভাবে শাহ ভীমা মূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ।
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম আপন মরণ॥
দূর-গত পূর্ব্বভাব কহে সবিনয়ে।
"শুন শক্তিমতী সতি শক্তির তনয়ে॥
জানিলাম তুমি সতি সত্য পতিব্রতা।
ক্ষত্রকুল-পবিত্রকারিণী কল্পলতা॥
ধন্য বীরাঙ্গনা তুমি বীরের নন্দিনী।
বীরগণ অন্তরেতে আনন্দ স্যন্দিনী॥
করিয়াছি অপরাধ মাগি পরিহার।
রোষ পরিহর হর দুর্গতি আমার॥
করিলাম মাতৃরূপে তোমারে স্বীকার।
স্বচ্ছন্দে সুখেতে যাহ গৃহে আপনার॥
একমাত্র ভিক্ষা মম কর অঙ্গীকার।
প্রকাশ না হয় যেন এই সমাচার॥"
শান্ত হয়ে সতী কহে "তবে ক্ষমি আমি।
যদি এক প্রতিজ্ঞা করহ ক্ষিতিস্বামি॥
সত্য কর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি।
লিখে দেহ নিজ পঞ্জা দস্তখৎ করি॥
যদবধি তুমি কিংবা তব বংশধর।
ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর॥
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী-অধিকারী।
না আনিবে নিজপুরে রাজপুতনারী॥"
তথাস্তু বলিয়া শাহ করে অঙ্গীকার।
লিখে দিল সেই কথা আজ্ঞা অনুসার॥
পুনরায় বহুতর করিল বিনতি।
প্রসন্ন হৃদয়ে গৃহে ফিরে গেল সতী॥
হেথা পৃথ্বী প্রিয়া-হারা পারাবত প্রায়।
যামিনী যাপন করে ছট্‌ফট্ কায়॥
কভু আসি কাকতন্দ্রা নয়নে উদয়।
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে তার কুস্বপ্ন তনয়॥

মিথ্যাদৃষ্টি মহিলা তাহার প্রমোদিনী।
মানস-প্রমদ-বনে ভ্রমে প্রমাদিনী ॥
কুস্বপ্নে দেখিছে পৃথ্বী মহা পারাবার।
প্রবল পবনে তরঙ্গিত অনিবার ॥
তরঙ্গ তুফানে এক তরণী চঞ্চল।
টলটল শতদলদলে যেন জল ॥
কখন আকাশমার্গে উঠিছে যেমন।
কখন পাতালে যেন করিছে গমন ॥
ভেঙ্গে পড়ে গুণবৃক্ষ কাণ্ডারী বিকল।
তুতকে দাঁড়ায়ে কাঁপে আরোহী সকল ॥
তার মাঝে এক নারী রোদন বদনে।
গগনের প্রতি দৃষ্টি উন্নত নয়নে ॥
ছিন্ন ভিন্ন অলকা উড়িছে সমীরণে।
ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণপ্রভার কিরণে ॥
আইল প্রবল বাত্যা ঘূর্ণিশ কল্লোলে।
ভগ্নতরী মগ্ন করে সাগর হিল্লোলে ॥
তরঙ্গে বনিতা সেই, হয়ে নিপতিতা।
কভু নিমজ্জিতা হয় কভু সমুত্থিতা ॥
দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয়।
প্রাণপ্রিয়া সতী সিন্ধুগর্ভে পায় লয় ॥
জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতী সতী।
দেখিল গৃহেতে নাই জায়া গুণবতী ॥
মনোদুঃখে বসি তথা ভাবে পুনর্ব্বার।
এখনো এল না কেন প্রেয়সী আমার ॥
না জানি কি অমঙ্গল ঘটিল তাহার।
ছারখারে যাক ছার নৌরোজা বাজার ॥
কেন তথা যাইবারে দিলাম বিদায়।
এখন ভাবিয়া মরি প্রমদার দায় ॥
দাসীরে ডাকিয়া পৃথ্বী জিজ্ঞাসে সঘনে।
"ভ্রাতৃবধূ এসোছেন ফিরে কি ভবনে ॥"
দাসী কয়, "মহাশয় অনাগত তিনি।
না জানি বিলম্ব কেন করেন ভগিনী ॥"
পুনরায় ভাবনায় তন্দ্রার তুহিন।
মুদিত করিল তার নয়ননলিন ॥
পুনরায় কুস্বপন করে নিরীক্ষণ।
যেন সুবিস্তীর্ণ এক নিবিড় কানন ॥
দাবানলে প্রজ্বলিত তার চারিধার।
নানা জাতি জীব জন্তু করে হাহাকার ॥

তার মাঝে গরজে ভুজঙ্গ ভয়ঙ্কর।
সহস্র ফণায় ক্ষরে বিষবৈশ্বানর ॥
তার পুরোভাগে এক পলায় রমণী।
ঘন বেগে পশ্চাতে ধাইছে সেই ফণী ॥
শিহরিতা বরাঙ্গনা চেতনা-রহিতা।
নিপতিতা ধরায়, হইল বিমোহিতা ॥
দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয়।
ভোগীভয়ে ভার্য্যা সতী ভ্রান্ত-মতি হয় ॥
জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি।
দেখিল গৃহেতে নাই জায়াগুণবতী ॥
বলে হায় এ কি দায় ঘটিল আমায়।
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পাই উপায় ॥
একবার ভাবে মনে যাই অন্বেষণে।
কখন হইবে দেখা প্রেয়সীর সনে ॥
আর বার ভাবে তাহে হইবে কি ফল।
সুষুপ্তির ক্রোড়ে নাস্ত মনুষ্যমণ্ডল ॥
কেহ নহে জাগরিত এমন সময়।
হতভাগ্য আমি ভিন্ন কেহ দুঃখী নয় ॥
জিজ্ঞাসিব এখন কাহারে সমাচার।
বাদশার মহলেতে পড়িয়াছে দ্বার ॥
ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ লাগিল নিদালী।
পুনরায় হৃদে বহে কুস্বপ্নপ্রণালী ॥
দেখে এক অতি উচ্চতর গিরিবর।
পরশিছে তুঙ্গ শৃঙ্গ নীরদনিকর ॥
কন্দরে ভ্রমিছে এক ভীষণ শার্দ্দূল।
ঘন ঘন ধরাপৃষ্ঠে আছাড়ে লাঙ্গুল ॥
নবীনা ললনা এক দূরেতে পলায়।
বহে স্রোতস্বতী সেই গিরির তলায় ॥
পলাইতে প্রমদা পতিতা ভৃগুদেশে।
অধোভাগে ঘোর বেগে পড়ে মুক্তকেশে ॥
দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয়।
প্রাণপ্রিয়া সতী স্রোতস্বতী-গত হয় ॥
জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতি সতি।
দেখে গৃহে দাঁড়াইয়ে জায়া গুণবতী ॥
বিভাবরীশেষে সতী আসিয়া উদয়।
নিরখিয়ে কবিবর চঞ্চল হৃদয় ॥
কহে "প্রাণপ্রিয়ে সতি কহ বিবরণ।
কোথায় করিলে এত যামিনী যাপন ॥

মনে কি ছিল না গৃহ রঙ্গ-রস পেয়ে।
শর্ব্বরীর শেষে এলে মোর মাথা খেয়ে।।
কিঞ্চিৎ ভাবিতে যদি যাতনা আমার।
তবে কি থাকিতে ভুলে আপন আগার।।
চিন্তানলে দাহন করিলে মম তনু।
নারীধর্ম্মে সার কথা কহিলেন মনু।।
কুলবধূ অবিহিত পরগৃহে গতি।
জনারণ্যে গমন না করে কভু সতী।।
তোমারে বিদায় দিয়ে দুর্ভাবনা কত।
কুস্বপনে বিভাবরী হইল বিগত।।"
কহে সতী স্মিতমুখে বচন অমিয়।
"যা কহিলে তাহাই ঘটিল প্রাণপ্রিয়।।
যে রত্তন তোমার আদৃত অতিশয়।
আজ নিশি হরিল তস্কর দুরাশয়।।
কি কাজ এ দেহে আর বল প্রাণ ধরি।
দেহ খর করবাল প্রাণ পরিহরি।।"
শুনি পৃথ্বী ভাব কিছু বুঝিতে না পারে।
কহে "পরিহাস হর প্রেয়সি আমারে।।
কহ সত্য বাণী শুনি, কহ সত্য বাণী।
তোমার বচন কভু অন্যথা না মানি।।"
প্রফুল্ল বন্ধুক প্রায় হসিত অধরে।
স্বীকৃতি পত্রিকা সতী দিল পতি-করে।।
কহিল সকল কথা গোপন না করি।
কবি কহে, "এক কথা জিজ্ঞাসি সুন্দরি
শাহের নিকটে তুমি করেছিলে পণ।
সদাকাল রাখিবারে সত্য সঙ্গোপন।।
সে সত্য করিলে ভঙ্গ প্রকাশিয়ে কথা।
সতীর এরূপ কার্য্য অযোগ্য সর্ব্বথা।।
তুমি যদি লঙ্ঘিলে আপন অঙ্গীকার।
কহ এ স্বীকৃতি পত্রে আস্থা কিবা আর।।
দেখ রণে এক পক্ষ যদি ভাঙ্গে সন্ধি।
অন্যপক্ষে কিবা দায় থাকে সত্য-বন্ধি।।"
সতী কহে, "কিসে সত্য লঙ্ঘিলাম আমি
বেদে বলে এক তনু পত্নী আর স্বামী।।
তবে জানিলাম নাথ তুমি এবে পর।
পরিণয়ে দেহ নাই অর্দ্ধ কলেবর।।"
এইরূপ হাস্যরসে পোহায় শর্ব্বরী।
প্রত্যূষে চলিল পৃথ্বী দিল্লী পরিহরি।।
সস্ত্রীক পুষ্করতীর্থে করিলেন স্নান।
কত দিন থাকি তথা করে দান ধ্যান।।
সেই সে লিখিল পত্র রাণার নিকটে।
"কাহারো নিস্তার নাই নৌরোজা-সঙ্কটে।।"
রাজ্য-নাশে সেই কালে কাননে কাননে।
ভ্রমেন প্রতাপ সিংহ পরিবার সনে।।
জনরবে শুনিলেন পৃথ্বী কবিবর।
রাজ্যলাভ হেতু পুনঃ মেরুনরেশ্বর।।
দিল্লীশ্বর-আনুগত্য করিবে স্বীকার।
পত্র পাঠাইলা জানিবারে সমাচার।।

সেই পত্র এই পত্র শুন হে সুজন।
শ্রীশূরসুন্দরী-কথা সমাপম।। ইতি

কাঞ্চীকাবেরী

[উৎকল দেশীয় বীর-রসাত্মক আখ্যান-বিশেষ]

(পাঠ—প্রথম সংস্করণ : ১২৭৯)

ভূমিকা

রাজকার্য্যের অনুরোধে বহু বৎসর হইল, আমি উৎকলদেশে প্রবাস করিলাম। আমি প্রথমে আসিয়া এই দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, শত গুণে তদবস্থার সংশোধন হইয়া আসিয়াছে। মৃণ্ময় রথ্যাসকলের পরিবর্ত্তে ইষ্টকময় রাজপথসকল প্রস্তুত হইয়াছে। সুবিমল মৌক্তিকনিভ সলিলপূর্ণ প্রণালীপুঞ্জ দেশময় পরিভ্রমণ করিয়া কৃষি ও গতি-বিধির উন্নতি সাধন করিতেছে, সপ্তাহে সপ্তাহে বাষ্পীয় পোতসকল রাজধানী কলিকাতা হইতে বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্য উৎকলের উপকূলে রাখিয়া যাইতেছে এবং এ দেশ হইতে নানাপ্রকার শস্য বহিয়া লইয়া যাইতেছে, পথের দূরতা সঙ্কীর্ণ করিয়া ক্লান্তির উপশান্তি করিতেছে, সহস্র সহস্র উৎকলীয় লোকদিগকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া অদ্ভুতদর্শন ও ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ে চরিতার্থ করিতেছে। বিদ্যাধ্যাপনা প্রচুর-রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুগভীর সুনিবিড় তিমিরময় গিরিগহ্বরে সূর্য্যরশ্মির প্রবেশবৎ উৎকলে জ্ঞানালোক সঞ্চারিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রসকল স্থাপিত হইয়াছে; বহুসংখ্যক উৎকলীয় গ্রন্থ তাল-পত্ররূপ তাপসবিহিত বল্কল-বেশ পরিহারপূর্ব্বক মুদ্রাক্ষরের প্রসাদাৎ রমণীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গৃহে গৃহে বরণপ্রাপ্ত হইতেছে, ইংলণ্ডীয় এবং বঙ্গীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল অনুবাদিত হইতেছে, সংবাদপত্রসকল প্রচারিত হইয়া কথঞ্চিৎ রাজনীতির শিক্ষা দিতেছে। এই সকল উপায়যোগে উৎকলীয় ভাষা এবং সাহিত্য দৈনন্দিন পরিষ্কৃত এবং সংশোধিত হইয়া আসিতেছে। পরমেশ্বর গরল হইতে অমৃতের সৃষ্টি করেন, দুর্ভিক্ষরূপ দারুণ দণ্ড প্রেরণপূর্ব্বক রাজপুরুষদিগের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিলেন; চিরঘৃণিত উৎকলদেশের প্রতি তাঁহাদিগের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল, তাহাতে এত শীঘ্র অশেষবিধ শুভানুষ্ঠানের উদ্যোগ হইল। বস্তুতঃ উৎকলদেশ ঘৃণার্হ দেশ নহে! অত্রত্য লোকের পূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, উৎকলীয় লোকের মানসে অনেক গুলি গৌরবভাজন শক্তিবীজ নিহিত আছে এবং তাহারা এক সময়ে বীরত্ব এবং ধীরত্বভূষণে ভূষিত ছিল। বঙ্গপ্রদেশের সহিত এ প্রদেশের প্রতিবেশিতা সম্পর্কবশতঃ বহু কাল পর্য্যন্ত সুপরিচয় আছে। বঙ্গদেশের শেষ অধিপতি মুসলমান-অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই দেশেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক-বিপ্র-কুলতিলক বিশ্বম্ভর মিশ্র—যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পশ্চাৎ পরিব্রাজকাবস্থায় বিখ্যাত হন, তিনি এই উৎকলদেশেই আপনার মত প্রকৃষ্টরূপে প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে এককালে এ দেশ হইতে নিষ্কাশিত করেন। বলিতে কি, এইক্ষণে উৎকলের তৃতীয়াংশ লোক তাঁহারই মতাবলম্বী, তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। অপর মোগল-দিগের সময়ে মহারাজ টোডরমল্ল বহুতর বঙ্গীয় কায়স্থকে এই দেশে আহ্বান করিয়া ভূমির পরিমাণ এবং রাজস্ব নির্দ্ধারণাদি রাজকার্য্যসকল শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, তাহাতে এদেশীয় লোকের সহিত আমাদের দেশীয় লোকের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারেও বঙ্গীয় কৃতবিদ্যগণ শান্তিরক্ষা, রাজস্ব আদায় এবং বিদ্যাধ্যাপনা প্রভৃতি রাজকার্য্যসকল নির্ব্বাহ করিয়া এদেশীয় লোকদিগকে ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ় করিতেছেন। কিন্তু উভয়-দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্দ্য যত বর্দ্ধিত হয়, ততই সুখের বিষয়। সেই সৌহার্দ্দ্য-রজ্জুর একটুক ক্ষীণ সূত্র বা তৃণবৎ আমি,—এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

এই কাব্য প্রণয়নের অন্যতম কারণ, কতিপয় উৎকলীয় বন্ধুর উত্তেজনা। তাঁহারা কহেন যেখানে আমি বহুকাল পর্য্যন্ত এই দেশে প্রবসতি করিলাম, সেখানে এ দেশ সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। এই উত্তেজনা কতদূর সঙ্গত, বলিতে পারি না। তবে সুহৃদনুরোধ রক্ষা করা সমাজের একটি সুনীতি। বর্ণিত আখ্যানটির বিষয়ে কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর গত হইল, মেজর কলনেট আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল মহাশয়কে কতকগুলি পুস্তক প্রদান করেন। ঐ সকল পুস্তকমধ্যে ষ্টর্লিং লিখিত উড়িষ্যার বিবরণ নামক গ্রন্থ ছিল। আমার তখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম। আমি গ্রন্থখানি সযত্নে পাঠ করি এবং তদবধি এই দেশের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগ জন্মে। পরমেশ্বর সেই অনুরাগ বদ্ধমূল-করণ কারণ পশ্চাৎ কতকগুলি উপযোগ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে এইরূপ লিখিত আছে :—

"In the country of Dakshin Kanouj Karnat Sasan, there lived a powerful Raja who had a vast fortress and palace built of a fine black stone, called Kanchinagar (Conjeveram) and a daughter so beauteous and accomplished, that she was surnamed Padmavati or Padmini. The fame of her charms having reached the ears of Maharaja Purushottam Deo, he became anxious to espouse her, and sent a messenger accordingly to the chief of Conjeveram to solicit the hand of his fair daughter. That Raja was well pleased with the prospect of having for his son-in-law so great and powerful a prince as the Gajapati of Orissa, but considered it advisable to make some inquiries regarding the customs and manners of that court, before consenting to the alliance. He soon found that the Maharajas were in the habit of performing the duties of a sweeper (Chandala) before the image of Jagannatha, on its being brought forth from the temple annually at the Rath jatra. Now the Kanchinagar Raja was a devoted and exclusive worshipper of Sri Ganesha (Ganesa), and had very little respect for Sri Jeo, the divinity of Orissa and conceiving the above humiliation to be quite unworthy of, and indeed utterly disgraceful to, a Kshatriya of such high rank, he declined the alliance in consequence. The Gajapati monarch became very wrath at the refusal, and swore, that to revenge the slight cast on him, he would obtain the damsel by force and marry her to a real sweeper. He accordingly marched with a large army to attack Conjeveram, but was defeated and obliged to retire. Overwhelmed with shame and confusion, he now threw himself at the feet of Sri Jeo, and earnestly supplicated his interference to avenge the insult offered to the deity himself in the person of his faithful worshipper. The god promised assistance, says the author of the poem, directed him to assemble another army, and assured him that he would this time take the command of the expedition against Conjeveram in person. When the Raja had arrived, during the progress of his march, at the site of the village now called Manikpatam, he began to grow anxious for some visible indications of the

presence of the deity. In the midst of cogitations on the subject, a gowalini named Manika, came up and displayed a ring which, she said, had been entrusted to her, to present to the monarch of orissa by two handsome cavaliers, mounted, the one on a black and the other on a white horse, who had just passed on to the southward. She also related some particulars of a conversation with them which satisfied the Raja that the promise of assistance would be ful filled, and that those horsemen were no other than the two brothers Sri Jeo (Krishna) and Baldeo (Baladeva). Full of joy and gratitude, he directed that village in future to be called, after his fair informant, Manikpatam, and marched onwards to the Deccan, secure of success. On the other hand the chief of Conjeveram, alarmed at the second advance of the Gajapati in great force, appealed for aid to his protecting deity Ganesa, who candidly told him that he had little chance against Jagannatha, but would do his best. The seige was now opened, and many obstinate and bloody battles were fought under the walls of the fort. The gods Sri Jeo and Ganesh espousing warmly the cause of their respective votaries, perform many miracles and mix personally in the engagements, much in the style of the Homeric deities before the walls of Troy ; but the latter is always worsted. In reality after a long struggle, Conjeveram fell before the armies of Orissa. The Raja escaped but his beautiful daughter was captured and conducted in triumph to Puri. A famous image of Gopala, called the Satyabadi Thakur, that is, the "truth speaking god" was brought off at the same time and set up in a temple ten miles north of Purushottam, where it many still be seen, a monument of the Conjeveram expedition."

"Conformably with his oath, Raja Purushottom Deva made over the fai Padmavati or Padmini to his chief minister, desiring him to wed her to a sweeper. Both the ministers, however, and all the people of Puri commisserated her misfortunes and at the next Ratha Jatra, when the Maharaja began to perform his office of Chandala (sweeper) the individual entrusted with the charge of the lady brought her forth and presented her to him, saying, 'you ordered me to give the Princess to a sweeper, you are the sweeper upon whom I bestow her.' Moved by the intercession of his subjects, the Raja at last consented to marry Padmavati, and carried her to the palace at Cuttack. The end of this lady's history is as romantic as the preceding portion of it. She issaid to have conceived and brought forth a sonby Mahadeva, shortly after which she All the circumstances were explained to the husband in a dream, who acknow-
disappeared. ledged gratefully the honour conferred on him and declared the child thus mysteriously born his successor in the Raj."

আমি পশ্চাৎ আখ্যায়িকাটি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এ দেশে আসিবার পর দুর্গোৎসবের বন্ধ উপলক্ষে একদা শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া মন্দিরের একদেশে দেখিলাম, শ্বেত এবং কৃষ্ণ তুরঙ্গারোহী সৈনিক পুরুষদ্বয়ের আকার ক্ষোদিত, পার্শ্বে এক তরুণী ক্ষীরসর লইয়া তাঁহাদিগকে প্রদানোন্মুখী। দেখিবামাত্র পূর্ব্বপঠিত আখ্যানটি মনে পড়িয়া গেল, তৎপরে কাঞ্চীকাবেরী-কাব্যের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রাপ্ত হই নাই। গল্পটি যে সত্য ইতিহাস, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, মাদলা পাঞ্জী * নামক উৎকলদেশের রাজপুরাবৃত্তে ইহা বর্নিত আছে। অদ্যাপি জগন্নাথমন্দিরে কাঞ্চী হইতে আনীত গণেশমূর্ত্তি এবং মুগনী-প্রস্তরে রচিত বিবিধ বিচিত্র জালাদি অবলোকিত হয়। অপর গৃহভিত্তিতে মাণিকা-গোপিনী এবং সিতাসিত তুরঙ্গীদ্বয়ের আকৃতি চিত্র করা উৎকলীয়দিগের এক সাধারণী রীতি। শ্রীযুক্ত বীমস্ সাহেব স্বর্ণরেখার তীরবর্ত্তী জঙ্গলাবৃত এক প্রাচীন দুর্গমধ্যেও এই প্রকার অশ্বারোহী পুরুষযুগলের পাষাণ-প্রতিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, গত দুর্গোৎসবের বন্ধের পূর্ব্বে তালপত্রে লিখিত ছন্দোভঙ্গ, পাদ ভঙ্গ প্রভৃতি নানাদোষদূষিত একখানি কাঞ্চীকাবেরী পুঁথি পাইয়া তাহাই সমাদরপূর্ব্বক পাঠ করি এবং পাঠ সমাপন পরে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কতিপয় দিবসে সমাপ্ত করিলাম। ফলতঃ আমার এ রচনা উক্ত উৎকলকাব্যের অনুবাদ নহে। আখ্যানটি মাত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, দেশবর্ণন, উৎকলদেশের পৌরাবৃত্তিক ঘটনা প্রভৃতি কোন বিষয়েই আমি উক্ত মূল কাব্যের নিকট ঋণী নহি। দুই এক স্থলে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু এ প্রকার সাদৃশ্য অপরিহার্য্য।

আখ্যানমধ্যে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা আছে। তাহা কাব্য-শরীরের প্রধান উপাদান; সাত্ত্বিক হিন্দুমাত্রেরই তত্তাবৎ বিশ্বাসভাজন, কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানোজ্জ্বল-বুদ্ধি আধুনিক যুবকগণের শ্রদ্ধেয় না হইতে পারে। তাঁহারা কহিতে পারেন, জগন্নাথ বলরামের অশ্বারোহী সৈনিক বেশ ধারণ করিয়া উৎকলাধিপতির সহায়তা করা বাস্তবিক প্রকৃত ঘটনা নহে, রাজা স্বীয় সৈন্যগণের সমরোৎসাহ বৃদ্ধিকরণ মানসে ভিন্ন দেশ হইতে আনীত অনুচরদ্বয় দ্বারা এই ষড়যন্ত্র করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকিবেন। মাণিকা-গোয়ালিনী এবং দাশরথি সূপকার তাঁহার মন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া ধূর্ত্ততাতে সহায়তা করিয়া থাকিবে ইত্যাদি। ফলতঃ এই উভয়বিধ বিশ্বাসের প্রতি আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, সাত্ত্বিক হিন্দু-মাত্রেই এই কাব্যকে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বলিয়া অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবেন। নব্য সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদ্য এই—আপনারা এই মহাপ্রসাদের মধ্যে আপনাদিগের রুচির উপযুক্ত কোন কোন পদার্থ পাইতেও পারেন।

"A theme ; a theme for Milton's mighty hand—
"How much unmet for us, a faint degenerate band !"—Scott.

কটক।

২০শে কার্ত্তিক,

১৭৯৯ শকাব্দাঃ

---

* এই গ্রন্থ চোরগঙ্গ বা চুরঙ্গ-দেব রাজার সময় হইতে লিখিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫০০ বৎসর হইল।

প্রথম সর্গ

সূচনা

দক্ষিণ জলধি-তীরে, নীলগিরি নীল নীরে,
শোভিত কলিঙ্গ * নাম দেশ।
কন্দর কেদার বন, অগণন সুশোভন,
প্রবাহিত তটিনী অশেষ॥
বিন্ধ্যপাদে সমুদ্ভূতা, অমৃত-উদক-পূতা,
রত্ন-রেণুময়ী † মহানদী।

মেঘাসন * সমাশ্রিয়া, ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার প্রিয়া,
মাননীয়া যথা বিষ্ণুপদী॥
স্বর্ণরেখা, চিত্রোপলা, খরস্রোতা, সুবিমলা,
অতি পুণ্যতরা বৈতরণী।
দেবী, দয়া, প্রাচী, সতী, কুশভদ্রা, গন্ধবতী,
ভুবনেশ গমন-শরণী।
প্রগাঢ় ভক্তির ফল, পঞ্চদেবতার স্থল,
ভারতে প্রসিদ্ধ পঞ্চপুর।
নিরখি যুড়ায় নেত্র, বিরজার চারু ক্ষেত্র,
যাজপুর তীর্থের ঠাকুর॥
গয়াসুর-নাভিকুণ্ডে, পিণ্ড দিয়ে পিতৃমুণ্ডে,
কৃতকৃত্য হয় জনগণ।
দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে, পঞ্চ পাণ্ডু-পুত্র রঙ্গে,
করিলেন যথাবগাহন †॥
হর-ক্ষেত্র ভুবনেশ, ধরি গোপালিনী ‡ বেশ,
গোচারণ করেন অভয়া।
একাম্র-কাননে লীলা, মহামায়া প্রকাশিলা,
সঙ্গেতে বিজয়া আর জয়া॥
গোপালের বেশে ভব, তাঁর প্রেম-ভিক্ষাপব,
গোপা লনী তৃষায় কাতরা।
শলাঘাতে স্মরহর নামে শ্রীবিন্দু-সাগর,
সরোবর রচিলেন ত্বরা॥
ভোগবতী ফুঁড়ি জল, প্রবাহিত অনর্গল,
যথা গৌরীকুণ্ড প্রস্রবণ।

---

* উৎকলদেশের পৌরাণিক নাম; মহাভারতের তীর্থাধ্যায়-পর্ব্বে কলিঙ্গদেশে বৈতরণী নদীর ও তৎকূলবর্ত্তী দেশাদির বর্ণন আছে, সুতরাং মহাভারত-রচনার সময়ে উৎকল শব্দের সৃষ্টি হয় নাই, মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে উৎকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে উৎকল শব্দের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বাস্তবিক বঙ্গ-অখাতের প্রায় সমস্ত পশ্চিম তীর, অর্থাৎ সুবর্ণরেখা হইতে কর্ণাটদেশের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ নামে বিখ্যাত ছিল, এই দেশ তিন ভাগে বিভক্ত বিধায় ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইত, উত্তর বা উৎকলিঙ্গ উক্ত দেশের উত্তর ভাগের নাম ছিল। উৎকল শব্দ এই উৎকলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ, এমত সম্ভব। অপর তৈলঙ্গ বা তেলিঙ্গা শব্দও ত্রিকলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ, এমত প্রতীত হয়।

† মহানদীর কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ সম্বলপুরের নিকটে তদ্‌গর্ভে হীরকাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নানা বর্ণের উপলপুঞ্জ বালুকাতে পাওয়া যায়। নীলমণি হালদার কটকে অবস্থানকালে এই সকল চিত্রোপল সংগ্রহ করিতেন।

* যে পর্ব্বতে ব্রাহ্মণী নদীর জন্ম, তাহার নাম মেঘাসন, মেঘমালা তচ্চূড়াবলীতে সর্ব্বদা আসীন।

† মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থাধ্যায় পর্ব্বে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

‡ একাম্র-পুরাণে সবিস্তর বর্ণন আছে। রামপ্রসাদ সেনের কালীকীর্ত্তনের ঐ উপপুরাণই ভিত্তিমূল।

আয় মন পুন যাই, নিরখিয়া আসি ভাই,
কীর্ত্তিকলা পাষাণে লিখন ॥
বুদ্ধ * বা বিষ্ণুর স্থান, ধরাব্যাপী যশস্বান্,
পুরীর প্রধান যেই পুরী।
যেখানে প্রেমের স্ফূর্ত্তি, চৈতন্য কনক-মূর্ত্তি,
প্রকাশিলা ভক্তির মাধুরী ॥
ত্যজি জাতি-অভিমান, যেখানেতে অন্ন পান,
একচ্ছত্রে জাতি মাত্রে খায়।
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত,
শৌচাশৌচ কিছুই না চায় ॥

সৌরতীর্থ কোণারক*, মহারোগ-সংহারক,
আছে মাত্র ভগ্ন-অবশেষ।
দেখিয়া ভাস্কর-কার্য্য, মনে মনে হয় ধার্য্য,
দেবকারু-শিল্পের উন্মেষ ॥
জিনি উগ্র শ্রবা হয়, তুরঙ্গ পাষাণময়,
দিগ্‌গজ জিনিয়া মাতঙ্গ।
পাষাণে রচিত নারী, কিবা ভঙ্গী মনোহারী,
অনঙ্গেরে দান করে অঙ্গ ॥
সরোবরে নিরখিয়া, নগ্না যত পিতৃপ্রিয়া,
ব্যাধিগ্রস্ত সন্তাপিত মনে।
হেথা শাম্ব কৃষ্ণসুত, মহা মাতৃ-ভক্তিযুত,
রোগমুক্ত ভানু-আরাধনে ॥
আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন,
দর্পণ-অচলে গজাননে ॥
যেখানে মুকুতাকারা, ঝরিতেছে জলধারা,
মহাবিনায়ক-প্রস্রবণে ॥
পূর্ব্বে এই চারু দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ,
বহুকাল আবৃত তমসে।
নদী-প্রবাহিত পলি, পঙ্কে পূর্ণ সর্ব্বস্থলী,
নরের অসাধ্য তথা পশে ॥
ঘোর হিংস্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন,
আশীবিষ কত অজগর ※।
নির্ভয়ে কুরঙ্গ-পাল, ভ্রমিত পুলিন-পাল,
বিনোদ বিচিত্র কলেবর ॥
যূথে যূথে বন-হস্তী, মস্তকে সঞ্চিত মস্তি,
মহানন্দে ফিরিত কাননে।
বন-বরাহের দলে, খেলিত কর্দ্দম-জলে,
করাল দশনযুক্তাননে ॥
শিরে খড়্গ সুশোভন, ভ্রমিত গণ্ডারগণ,
দৃঢ়দেহ পাষাণ সমান।
ঘোড়াশিঙ্গা বন্য-হয়, গয়াল গবয়চয়,
শিরে শোভে ভয়াল বিষাণ ॥

---

* জগন্নাথ দেবই বুদ্ধাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ, বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্ম উৎকলদেশের এক সময়ে প্রধান ধর্ম্ম ছিল। চীনদেশীয় সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুএনথছং খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি দেখিয়া গিয়াছিলেন, বুদ্ধমূর্ত্তির রথাদি পর্ব্বাহ ছিল। বাস্তবিক রথপর্ব্বাহ বৈদিক বা হিন্দু প্রাচীন পর্ব্বাহ মধ্যে পূর্ব্বে পরিগণিত ছিল না। জগন্নাথ-মূর্ত্তিও বুদ্ধমূর্ত্তির সঙ্গে কথঞ্চিৎ সমঞ্জসীভূত। প্রায় ৩৭০ বৎসর অতীত হইল, যখন চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে স্বীয় মত প্রচার করেন, সে সময়ে. বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র দেবও প্রথমে তন্মতাবলম্বী ছিলেন। এই সকল কারণ বশতঃ বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসক্ত উৎকলীয়দিগকে হিন্দুধর্ম্মে পুনরানয়নকল্পে এক বিশেষ কৌশল-পরায়ণ হইয়াছিলেন,—তাঁহারা বদ্ধমূল বৌদ্ধমত বোধিদ্রুমকে সমূলে উৎপাটন না করিয়া তাহার অতিরিক্ত শাখা পল্লবাদি ছেদন করিয়া সনাতন ধর্ম্মতরুর আকারে তাহাকে পরিণত করিয়া থাকিবেন। বেদপ্রতিপাদিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে হিংসা অর্থাৎ পশুচ্ছেদনপূর্ব্বক বলির বিধান আছে। রামানন্দ, রামানুজ বা চৈতন্যমতে তাহার নিষেধ,—পক্ষান্তরে অহিংসাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য বা উপদেশ,—ইহাতেও উল্লিখিত কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

* সবিশেষ বিবরণ বন্ধুবর পুরাবিৎপ্রবর মহামহোপাধ্যায় রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের 'উড়িষ্যার পুরাতন কীর্ত্তি' নামধে গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

※ উৎকলীয় শব্দ; অর্থ—নদীগর্ভস্থ ভূমি।

কিবা কালান্তের কাল, ভ্রমিত ব্যাঘ্রের পাল,
দীর্ঘদেহ বৃষভ-সোসর।
বিকট প্রকটতর, দন্তচয় ভয়ঙ্কর
আঁখি দুটি দেউটি প্রখর ॥
কি ভয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শিহরে প্রাণী,
হয়-ধ্বনি আকাশ-ভেদিনী।
তর্জ্জন-গর্জ্জন রব, করে হিংস্র পশু সব,
লম্ফে ঝম্পে কম্পিত মেদিনী ॥
ভগ্ন-হনু উচ্চ-হনু, শীর্ণতনু ফুল্ল তনু,
কত জাতি বানর বিহরে।
কুম্ভীর-হাঙ্গরচয়, সুখে চরে জলাশয়,
নদী কিবা হ্রদ-পরিসরে ॥
বিশাল বিশাল শাল, সরল অর্জ্জুন তাল,
বোধিদ্রুম বট তরুবর।
হরীতকী বিভীতকী, পিণ্ডীতকী আমলকী,
গিরিমল্লী জয়ন্তী কেশর ॥
সপ্তপর্ণ উডুম্বর, কোবিদার নাগেশ্বর,
মধুদ্রুম পীলু কন্দরাল।
নীপ লোধ্র অরুষ্কর, পিয়াল পিপাসাহর,
পারিভদ্র প্লক্ষ কৃতমাল ॥
পলাশ পুন্নাগ চারু, ব্রহ্মদারু দেবদারু,
তিনিশ শিরীষ সুকুমার।
শমী শ্যামা কুরুবক, অশোক চম্পক বক,
সিন্দুক তিন্দুক বহুবার ॥
বিবিধ বিহঙ্গচয়, গান করে মধুময়,
নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত কায়।
স্বেচ্ছামতে খায় ফল, পিয়ে নির্ঝরের জল,
বিলসিত তরু-লতিকায় ॥
শূন্যে উড়ে ভরদ্বাজ, নানা স্বরে ভীমরাজ,
থেকে থেকে জাগাইত বনে।
ডাকে বন-পারাবত, স্বরে গম্ভীরতা কত,
চাতক ডাকিত ঘন ঘনে ॥
বনপ্রিয় সেই বনে, পরম আনন্দ-মনে,
করিত স্বগণে সুখে বাস।
কন্দরেতে সারি সারি, আলাপ করিত শারী
আহা মরি কি মধুর ভাষ ॥
না ছিল বন্ধন-ত্রাস, সুখে বিহরিত চাষ,
দিবানিশি ডাকিত দাত্যুহ।
লইয়া স্বদল সঙ্গে, ময়ূর নাচিত রঙ্গে,
প্রসারিয়া কলাপসমূহ ॥
কুক্কুভ চকোর লাব, খঞ্জনের কিবা ভাব,
রমণীর নেত্র অনুকারী।
তাম্রচূড় স্বর্ণচূড়, জিবঞ্জীব গুড়গুড়,
বিষ্ণু-ভক্ত শুক বনচারী ॥
কিবা নদী গর্ভময়, চরিত কাদম্বচয়,
চক্রবাক সারস শরাল।
মৃণাল লইয়া মুখে, সন্তরিত মহাসুখে,
দল-বল বাঁধিয়ে মরাল ॥
রজনীতে ঝিল্লীরবে, নিদ্রায় নিস্তব্ধ সবে,
কেবল জাগিত ব্যাঘ্রগণ।
নয়নে মশাল জ্বলে, আহার অন্বেষি চলে,
মাঝে মাঝে ভীষণ গর্জ্জন ॥
কোটী কোটী হীরাচর, তিমির করিত দূর,
বনে জ্যোতিরিঙ্গন নিকর।
যার গুণে চলদল, অপুষ্পেও অবিরল,
অগ্নিময় পুষ্পের আকর ॥
এইরূপে কত কাল, ছিল বন্য-পশু-শাল,
মহারণ্যময় এই দেশ।
প্রকৃতির আদিমূর্ত্তি, কাননে পাইত স্ফূর্ত্তি,
মনুষ্য না করিত প্রবেশ ॥
পবাক্রান্ত আর্য্যজাতি, করে লয়ে বেদবাতি
এল পঞ্চনদ পার হয়ে।
ব্যাপ্ত আর্য্যাবর্ত্তময়, অনার্য্য অসভ্যচয়,
কাননে পলায় প্রাণ লয়ে ॥
উত্তরেতে হিমালয়*, দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়,
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দ্দেশ।

*আর্য্যেরা প্রথমে আসিয়া সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদী মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত, অর্থাৎ দিল্লীর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাস করিয়াছেন; যথা মনুঃ,—

"সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দ্দেব-নদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেব-নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥"

পরে আর্য্য পরিবার ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে ব্রহ্মর্ষি-দেশ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, মৎস্য অর্থাৎ আধুনিক মাছেরী, পঞ্চাল অর্থাৎ কান্যকুব্জ এবং শূরসেন

পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ব্বসীমা নিরূপণ,
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ ॥
এ সীমা লঙ্ঘন করি, পুণ্যভূমি পরিহরি,
যে যাইত তার জাতি নাশ।
দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে, কিবা ত্রিকলিঙ্গ বঙ্গে,
ছিল মাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস ॥
কিন্তু মধুমক্ষিকার, যত বাড়ে পরিবার,
ততই চক্রের সীমা বাড়ে।
সেইরূপ আর্য্যবংশ অনার্য্যে করিয়া ধ্বংস,
ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে ॥
এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে,
আর্য্য-ভয়ে ওড্র ভিল্ল কুলী।
দ্বাপরের শেষ-ভাগে*, রণজয় অনুরাগে,
সমাগত আর্য্য কতগুলি।
ক্রমে যত অনাচার, ম্লেচ্ছ করে পরিহার,
আর্য্য-ভূমি হ'ল ম্লেচ্ছ-দেশ।

অর্থাৎ মথুরাদেশ তাঁহাদিগের বাসস্থান হইয়াছিল। যথা মনুঃ—

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যঞ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্॥"

সুতরাং ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে ব্রহ্মর্ষিদেশ যে তাঁহাদিগের নিকট ন্যূনকল্প ছিল, তাহা এই শ্লোকেই প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু বংশবৃদ্ধির অনুরোধে তাঁহারা আরো অগ্রসর হইয়া মধ্যদেশ অর্থাৎ উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে প্রয়াগ এবং পশ্চিমে বিনশন অর্থাৎ যে প্রদেশে সরস্বতী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, এই চতুঃসীমাবদ্ধ সুপরিসর ভারতখণ্ডে অধিবসতি করিয়াছিলেন। পরিশেষে পদ্মবনবৎ বৃদ্ধিযুক্ত আর্য্যবংশের ইহাতেও স্থান সংকুলান না হওয়াতে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম-সমুদ্রের এবং হিমালয়-বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দেশকে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত করিয়াছিলেন। যথা মনুঃ,—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তংবিদুর্ব্বুধাঃ॥

* মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে এবং অশ্বমেধপর্ব্বে পাণ্ডব-দিগ্বিজয় দ্রষ্টব্য।

কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন মুনিগণ,
দেব-দেবীগণের প্রবেশ ॥
ক্রমে যত খর রবি, ধরা ধরে অন্য ছবি,
সেই রূপ সমাজের গতি।
যাগে হিংসা অপকর্ম্ম, অহিংসা পরম-ধর্ম্ম,
প্রকাশিলা গোতম সুমতি ॥
হ'ল কত কাল গত, এই দেশে সমাগত,
তথাগত * মত নিরমল।
হিংসাধর্ম্মে ঘোর বৈর, হেথায় ভূপতি ঐরণ†,
রাজ্য করে বল দশবল ‡ ॥
হেথা সেই ধর্ম্মাশোক, নিস্তার করিল লোক,
ধর্ম্ম-উপদেশ করি দান।
অদ্যাপি ধবলাচলে ††, স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপলে,
পরিচয় দিতেছে পাষাণ ॥
পিতা মাতা প্রতি ভক্তি, বনিতায় প্রেমাসক্তি,
সুতে স্নেহ, কুটুম্বে আদর।
ভ্রাতৃভাব সর্ব্বনরে, সমভাব ঘরে পরে,
বর্ষীয়ানে শ্রদ্ধা নিরন্তর ॥
দয়া সর্ব্ব-জীব প্রতি, শান্তিরসে মুগ্ধ মতি,
অবিরত জ্ঞানের সন্ধান।
শাক শস্য অন্ন সুধা, নিবারণ করে ক্ষুধা,
বিমল সলিল মাত্র পান ॥

* বুদ্ধ।

† খণ্ড-গিরিতে এই রাজার নাম ক্ষোদিত আছে। ২২০০ বৎসরাধিক হইল, সম্ভবতঃ ইনি উৎকলের একাংশের রাজা ছিলেন।

‡ বুদ্ধ।

†† মৃত মহাত্মা জেম্‌স্ প্রিন্সেপ ভুবনেশ্বরের অদূরবর্ত্তী ধৌলা অর্থাৎ ধবলা পর্ব্বতে অশোক সম্রাটের নীতিগর্ভ এই সকল আদেশলিপি সর্ব্বাগ্রে পাঠ করেন। আদেশগুলি পালি ভাষায় বিরচিত, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এবং সিন্ধুনদের পরপারে য়ুসফজৈ দেশস্থিত কর্পূরাদ্রিতে উক্ত আদেশাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তত্তাবৎ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

বিহিত প্রশান্ত মনে, বসিয়া বিজন বনে,
ঈশ্বরের ধ্যানে স্নিগ্ধ প্রাণ।
ভাবভরে নিমীলিত, নেত্র-অশ্রু বিগলিত,
সুখের নাহিক পরিমাণ ॥
কিন্তু এই সার মত, যুগান্তে হইল গত,
মানুষের মন স্থির নয়।
যথা নব নব ফুলে, ভ্রমরা ভ্রমেতে ভুলে,
ভ্রমণেতে সংবরে সময় ॥
পুনর্ব্বার ফুলদলে, চন্দন তণ্ডুল ফলে,
পরমেশে পূজার বিধান।
পুরোহিতে দিয়ে বস্ত্র, পাপে পরিত্রাণ অস্ত্র,
পশু ছেদি পুন বলিদান ॥
মৃত্তিকা পাষাণ দারু, বিরচিত বিশ্বকারু,
পুন প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল, করি মহা গণ্ডগোল,
ছেয়ে গেলা দেব-দেবী লয়ে ॥
বর্ষ পঞ্চদশ শত, অধুনা হইল গত,
মগধ-ঈশ্বর ভবগুপ্ত।
বার বার আক্রমণে, তাড়াইল বৌদ্ধগণে,
বিশ্বজিত * মত তাহে লুপ্ত ॥
যযাতি-কেশরী নাম, সেনাপতি গুণধাম,
সন্ধি-বিগ্রহের অধিকারী।
বৌদ্ধের গৌরবহর্ত্তা, প্রথম শাসনকর্ত্তা,
কটকের সূত্রপাতকারী ॥
অন্বেষিয়া জগন্নাথে, বলভদ্র ভদ্রা সাথে,
দেউলেতে বসাইলা পুন।
বলি যাগ যজ্ঞ হোম, পঞ্চ-দেব পূজাস্তোম,
কলিঙ্গেতে বৃদ্ধি বহুগুণ ॥
অব্রাহ্মণ এই দেশ, নিরখি অন্তরে ক্লেশ,
কনৌজীয় অযুত ব্রাহ্মণ‡।

নিমন্ত্রিয়া আনি রায়, ভূমি দিয়া কোশলায় *,
বসাইলা ব্রাহ্মণ-শাসন ॥
তাম্রপটে এ সকল, কীর্ত্তিকলা অবিকল,
পরিচয় দেয় অদ্যাবধি।
দ্বিতীয় যযাতি সম, অনুপম পরাক্রম,
সীমাহীন যশের জলধি ॥
এই সে কেশরী-বংশ, কত নৃপ-অবতংস,
উৎকলের মহিমা আকর।
দেখহ ভুবনেশ্বরে, কি কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে,
ললাটেন্দুকেশরী প্রবর ॥
শ্রীমন্দির শৈলসম, কারুকর্ম্ম অনুপম,
বারো শত বৎসর অতীত।
তথাপিও বোধ হয়, যেন দেবালয়চয়,
এইমাত্র হয়েছে নির্ম্মিত ॥
নৃপতি কেশরী নাম, স্থাপিলা কটক ধাম,
দুইধারা মহানদী-মুখে।
পাঠান করিল ক্ষয়, তাঁর কীর্ত্তি-কলাচয়,
স্মরণে হৃদয় দহে দুঃখে ॥
খর স্রোতে ভাঙ্গে তীর, মকর-কেশরী বীর,
পাষাণের বন্ধে বন্ধ করে।
অদ্যাপি দেখহ আসি, কি অক্ষয় কীর্ত্তিরাশি,
আছে এই কটক নগরে ॥
কালে সব হয় ধ্বংস, কালে এ কেশরী-বংশ,
উড়িষ্যায় পাইল বিরাম।
তেজি গোদাবরী-তীর, এ'ল এক মহাবীর,
গঙ্গাবংশী চৌরগঙ্গ নাম ॥
তাঁর পুত্র গঙ্গেশ্বর, মহা কীর্ত্তি-কলাধর,
পঞ্চ কটকের অধীশ্বর।
উত্তরেতে বিষ্ণুপদী, দক্ষিণেতে কৃষ্ণানদী,
শাসনের সীমা সুবিস্তর ॥

* বুদ্ধ।

‡ এই সকল ব্রাহ্মণদিগের অদ্যাপি প্রকৃত ব্রাহ্মণবৎ অনেক সদাচার আছে; যাজপুরে অদ্যাপি ৮ ঘর অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আছেন, কিছু-কাল পূর্ব্বে ইঁহাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল, কাল-প্রভাবে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

* বৈতরণী ও মহানদী-প্রবাহিত প্রদেশের নাম —সম্প্রতি যে সকল তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্তাবতের লিখনানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

সে বংশে মহিমাসীম, ভূপাল অনঙ্গ-ভীম*,
বড় দেউলের প্রতিষ্ঠাতা।
কটকেতে পরিপাটী, কিবা দুর্গ বারোবাটী,
এবে শুধু মনস্তাপদাতা ॥
হায় রে ইংরাজ রাজ, করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীর্ত্তির প্রহরী ?
তবে কেন করি চূর, সেই বারোবাটী পুর‡,
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি ?

* যাজপুরে ইহাঁর প্রথম রাজধানী ছিল, ইহাঁর সময়ে বহুসংখ্যক দেবালয়, সেতু, সরোবর, কূপ এবং ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ইনি ৪৬০ শাসন অর্থাৎ ব্রাহ্মণবসতি স্থাপন করেন। ইহাঁর আদেশেই জগন্নাথের মন্দির ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরমহংস বাজপেয়ী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, উক্ত মন্দিরবৎ দেবালয় এইক্ষণকার কালে নির্ম্মাণ করিতে হইলে ২।৩ কোটি টাকাতেও সঙ্কুলান হয় না। খৃঃ ১১৯৬ শকে এই মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ইহার আদেশে দামোদর পণ্ডিত এবং ঈশ্বর পটনায়ক কর্ত্তৃক উত্তরে হুগলী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে সোণাপুর হইতে পূর্ব্ব সমুদ্রের বেলাকূল পর্য্যন্ত সমুদয় অধিকারস্থ ভূমির পরিমাপ হয়। সমুদয় ভূমির সমষ্টি ৪৭,৪৮,০০০ বাটী। ২৪,৩০,০০০ বাটীর উৎপন্ন রাজার স্বকীয় ব্যয়ে এবং ২৩,১৮,০০০ বাটীর উৎপন্ন প্রধান রাজ-পুরুষ সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতির ব্যয়ে পর্য্যবশেষিত হইত। বাকী ১৪,৮০,০০০ বাটী নদী, পর্ব্বত, জঙ্গল প্রভৃতি পতিত ভূমিতে পরিণত।

‡ বারোবাটী দুর্গের প্রাকার পরিখাদির প্রস্তর লইয়া অধুনা কটক নগরের রাজপথ এবং প্রণালীপুঞ্জ তথা লস্‌পইণ্টের আলোকগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; পুরাতন কটক অর্থাৎ চৌদ্বারের অন্তর্গত কপালেশ্বর নামক দুর্গের প্রস্তর লইয়া বিরূপার আনীকট্ট অর্থাৎ প্রবাহরোধক বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। বলিতে অন্তঃকরণে লজ্জা এবং পরিতাপ আসিয়া উদিত হয়, এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া প্রস্তর-প্রদানার্থে আমার প্রতি ভারার্পিত হইয়াছিল।

তাঁর পৌত্র গুণাকর, নরসিংহ নরবর,
কোণার্ক তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা ॥
শিবাই সান্ত্রার কাজ, বিশ্বকর্ম্মে দেয় লাজ,
এবে সব নষ্ট, হা বিধাতা !
নেত্র বাসুদেব নাম, ছিল রাজা গুণগ্রাম,
চারি শ পঁচিশ বর্ষ গত।
অপুত্রক নরপতি, সতত বিষণ্ণ মতি,
রাজকার্য্যে উৎসাহ-বিহত ॥

একদিন শ্রীমন্দিরে, দেব-দর্শনান্তে ফিরে,
যাইবার সময় রাজন্।
দেখিলেন মতিমান্, অতিশয় রূপবান্,
যুবা এক করিছে ভ্রমণ ॥
সূর্য্যবংশী *রাজপুত, সর্ব্বসুলক্ষণযুত,
বিভূষিত বহু গুণ-জ্ঞানে।
মিষ্টালাপে তুষ্ট হয়ে, রাজা তাঁরে সঙ্গে লয়ে,
রাখিলেন নিজ সন্নিধানে ॥
স্বপনেতে প্রত্যাদেশ, পাইলেন উৎকলেশ,
পুত্ররূপে করিতে গ্রহণ।
কপিলেন্দ্র দেব নাম, অসীম যশের ধাম,
যৌবরাজ্যে পাইলা বরণ ॥

ইতি গ্রন্থ-সূচনা নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

কথারম্ভ

নেত্র-বাসুদেব অন্তে কপিলেন্দ্র রাজ।
উৎকলের সিংহাসনে করিলা বিরাজ ॥
সহস্র সমর-জয়ী বিক্রমে কেশরী।
বিস্তারিল নিজ রাজ্য বহু রাজ্য হরি ॥

* মাদলা পাঞ্জি নামক প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থমতে কপিলেন্দ্রদেব গোপজাতীয় ছিলেন। একদা গোচারণসময়ে গোষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমত সময় এক সর্প আসিয়া তাহার মস্তকোপরি ফণা বিস্তারপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল, নেত্র-বাসুদেব এই অলৌকিক শুভ শকুন দেখিয়া উক্ত গোপনন্দনকে যৌবরাজ্যে বরণ করেন।

শাসনের সীমা সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
রাজধানী ছিল রাজ-মাহেন্দ্রী নগর ॥
বিশ পুত্র নৃপতির বড় বলীয়ান্।
হামীর বলিয়া তারা পাইল আখ্যান ॥
অগ্রজ বলহামীর বলরাম প্রায়।
গদাযুদ্ধে কালপাত করে মহাকায় ॥
দ্বিতীয় কালহামীর দুই স্কন্ধে তূণ।
সব্যসাচী প্রায় শর-সন্ধানে নিপুণ ॥
যযাতি-হামীর নামে তৃতীয় কুমার।
অসি-চালনায় তাঁর তুলা নাহি আর ॥
এইরূপ অস্ত্রেশস্ত্রে পটু বিশ সুত।
কিন্তু কেহ নহে বিদ্যা-বিজ্ঞান-বিযুত ॥
ব্যসনে সময় হরে, নিরখি রাজন।
বিজনে বসিয়া সদা ব্যাকুলিত মন ॥
পরস্পর ঈর্ষাভাব, বিবাদ প্রবল।
হায় রে দৈহিক বল ! অনর্থ কেবল ॥
রাজা ভাবে মম অস্তে এই পুত্রগণ।
লাঠালাঠি করিবেক রাজ্যের কারণ ॥
অনুদিন এই চিন্তা কি হইবে শেষ।
নির্ভর ইহাতে মাত্র প্রভুর আদেশ ॥
এক দিন স্বপ্নে দেব দেন প্রত্যাদেশ।
"মম অভিলাষ যাহা শুনহ নরেশ ॥
কালি সন্ধ্যা আরাত্রির সময় যখন।
দর্শনার্থে মন্দিরে করিবে আগমন ॥
বাইশ সোপান আরোহণের সময়।
পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয় ॥
অংশুকের অধোভাগ করিয়া ধারণ।
ধীরে করিবেক তব পদানুসরণ ॥
তাহারেই যৌবরাজ্যে করিবে বরণ।
তব অন্তে উড়িষ্যার রাজা সেই জন ॥"
প্রত্যাদেশ পেয়ে নৃপ হরষিত মন।
পরদিন প্রদোষেতে সহিত স্বগণ ॥
দেব দরশনে যান সহ সব সুত।
দেখ দেখি ! ঈশ্বরের খেলা কি অদ্ভুত ॥
ভাবি প্রত্যাদেশ-কথা অ.স্থর নরেশ।
বাইশ সোপানোপরে করিলা প্রবেশ ॥
সপ্ত পীঠ উপরেতে উঠিবার কালে।
অংশুকের সীমা লগ্ন চরণান্তরালে ॥

পশ্চাতে থাকিয়া এক যুবক সুন্দর।
সীমা উঠাইয়া ধরে যেরূপ কিঙ্কর ॥
মুখ ফিরাইয়া রাজা করেন দর্শন।
নিজ উপজায়া-জাত পুত্র সেই জন ॥
নামেতে পুরুষোত্তম রূপের নিধান।
ভূপতির প্রতিকৃতি, পরম ধীমান্ ॥
কিবা জন্ম-ত্রুটি তার খণ্ড তপোফলে।
কলঙ্কী শশাঙ্ক প্রায় উদিত ভূতলে ॥
পুনরায় হেরে রায় সে বিশ নন্দন।
সোপানে নিশ্চিন্ত মনে করিছে গমন ॥
তাঁহার উদ্বেগে মাত্র উৎকণ্ঠিত নয়।
পাষণ্ড কি ষণ্ড তারা তনয় ত নয় ॥
পুরুষোত্তমের প্রতি রাজা সেইক্ষণ।
অতিশয় স্নেহভরে করেন ঈক্ষণ ॥
মনে মনে চিন্তা এই, "একি কুঘটন ?
সন্তাপের হেতু সাত সুজাত নন্দন !
বিজাতেরে রাজ্য দিতে প্রভুর আদেশ।
হায় হায় ! মম ভাগ্যে এই ছিল শেষ ॥"
সম্বোধি সে সুভগেরে কহেন রাজন।
"রাজপুরে থাক তুমি, আমার সদন ॥"
রাজার দেখিয়া ভাব, শুনি সেই কথা।
অমাত্যসমূহ করে ঠারাঠারী তথা ॥
সেই দিনাবধি রাজকুমার সোসর।
রাজপুরে বাড়িল তাহার সমাদর ॥
যত পরিচার আর পারিষদ-গণ।
যুবরাজ বলি তাঁরে করে সম্বোধন ॥
কুণ্ঠিত হামীরগণ, অনুতপ্ত মন।
দেখা মাত্র দহে গাত্র ঈর্ষা-হুতাশন ॥
সংগোপনে বসি সবে করয়ে মন্ত্রণা।
কেমনে বিগত হবে প্রাণের যন্ত্রণা ॥
সবে বলে মার দুষ্টে, বিহিত সন্ধানে।
নির্জ্জনে যখন পাবে সংহারিবে প্রাণে ॥
একদা বলহামীর অগ্রজ কুমার।
চরণ চারণ করে যথা সিংহদ্বার ॥
প্রদোষ সময়, সঙ্গে নাহি আর কেহ।
ঈর্ষায় আরক্ত নেত্র, প্রকম্পিত দেহ ॥
করেতে তোমর এক ভয়াল বিশাল
ভ্রমিছে তথায় যেন কালান্তের কাল ॥

সন্ধ্যাধূপ অন্তরে পুরুষোত্তম রায়।
সিংহদ্বারে হামীরেরে দেখিবারে পায়॥
কুমারের ভাব দেখি দুরু দুরু হিয়া।
হামীর কহিছে "শুন, শুন রে পুরিয়া॥
সিংহের বিবরে রাজা বঞ্চক শৃগাল।
তুই নাকি উড়িষ্যার হইবি ভূপাল?
কলিকাল হ'ল ঘোর, কিবা আর বাকী?
যৌবরাজ্যে টীকা তুই পেয়েছিস নাকি?
ভাল, ভাল, তাই ভাল! নাহি কিছু ক্ষতি
কিন্তু আমি অস্ত্র এক ছাড়ি তোর প্রতি॥
রে বর্ব্বর যদি সামালিতে পার তায়।
নিশ্চয় জানিব তোরে ঠাকুর সহায়॥"
এত বলি গরজিয়া ছাড়িল তোমর।
অব্যর্থ সন্ধান তার জানে সর্ব্ব নর॥
দেখহ দৈবের কর্ম্ম, বিষম দুর্গম।
অবহেলে সামালিল শ্রীপুরুষোত্তম॥
লক্ষ্য হ'ল ব্যর্থ, ব্যর্থ তোমর বিশাল।
কর প্রসারিয়া ধরে যেমন মৃণাল॥
লজ্জাভরে অধোমুখ হইল হামীর।
চকিত হইল স্থির, হৃদয় অস্থির॥
ভাবী ভাবি আরো মনে বাড়ে মহাক্লেশ।
পলায় দক্ষিণাপথে পরিহরি দেশ॥
অনন্তর বিভু-পদে ভক্তি-নম্র কায়।
শ্রীপুরুষোত্তম রায় প্রণত তথায়॥
ইষ্টদেবে স্মরি মনোদুঃখ গেল দূরে।
ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল রাজপুরে॥
কত দিনান্তরে ঋতু নিদাঘ প্রবেশ।
খরতর কর-শর বরিষে দিনেশ॥
প্রতপ্ত পৃথিবী, পয়ঃ, প্রতপ্ত পবন।
উপবনে যায় লোক, ত্যজিয়া ভবন॥
কিবা বনে, উপবনে, কিবা গিরিবনে।
ম্লানবর্ণ, শীর্ণপর্ণ, দ্রুমলতাগণে॥
তাপে তপ্ত মৌনব্রত বিহঙ্গমগণ।
পল্লবের আড়ে করে দেহ সংগোপন॥
আরক্তিম তালু, কণ্ঠ বিশুষ্ক রসনা।
মুক্তমুখে করে পবনের উপাসনা॥
কোথায় রয়েছে বায়ু, না হয় সন্ধান।
সুষুপ্ত জগৎ, কিবা শ্বাসগত প্রাণ॥
শ্বাসের সঞ্চার নাই গুম্ভিত সকল।
চিত্র-লিখিতের প্রায় অচল সচল॥
না নড়ে তরুর পাতা, মৃত-প্রায় লতা।
বায়ুভোগ-বিরহে বিহত মহীলতা॥
জগৎজীবন যেই, অভাবে তাহার।
জগতে কি থাকে আর, শোভার সঞ্চার?
একে অন্তর্হিত বায়ু, তাহাতে তপন।
বরিষে কিরণ যেন হোম-হুতাশন॥
যেন জ্বরে দগ্ধ-তনু বসুমতী মাতা।
অকালে কি সৃষ্টিনাশ করিছেন ধাতা?
ফেন-লালাবৃত মুখে রসনা চলিত।
হের! হিংস্র বনচর কিবা বিকলিত॥
বিক্রম-বিহত ব্যাঘ্র, লুকায় গহ্বরে।
বারি অন্বেষিয়ে ফিরে মহিষনিকরে॥
বন বরাহের দল পঙ্কিল পুষ্করে।
গড়াগড়ি যায়, তাপ নিবারণ তরে॥
ভয়ঙ্কর ভাব এ কি নিরখি কাননে।
অবতীর্ণ হুতাশন সহস্র আননে॥
বিকচ কুসুম্ভ কিবা সিন্দুর বরণ।
অমনি প্রবলবেগে উঠিল পবন॥
পবনে পাবকে মিলে ঘন আলিঙ্গনে।
ভস্ম-সার করিতেছে তরু-লতাগণে॥
পলায় বিহগকুল তেজিয়া বিটপী।
তরু পরিহরি ধায় দলে দলে কপি॥
তরু দহি নিরাশ্রয় প্রচণ্ড অনল।
বনভূমে তৃণদলে পড়ে অনর্গল॥
বেণুবনে অতিবেগে দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে।
চটপট্ ঘোর শব্দ গহনে কাননে॥
কিবা চারু কষিতকাঞ্চন-কলেবরে।
শিমুলের বনে জ্বলে কোটরে কোটরে॥
পলায় কুরঙ্গদল হইয়া বিকল।
ভয়ঙ্কর ভাব এ কি ধরে দাবানল॥
কি শোভা রজনীকালে শেখরে শেখরে!
প্রকটিত দাবানল দ্বিতীয় প্রহরে॥
নীলবর্ণ নগশ্রেণী দীর্ঘ কলেবর।
থাকে থাকে দাঁড়াইয়া যেন নিশাচর॥
অনলের শিখারাজি শোভে শিরোপর।
ধ্রুব স্বর্ণময় কিবা মুকুট সুন্দর!

কভু লুপ্ত, কভু দীপ্ত, হয় প্রতিক্ষণে।
অভিনব আশা যথা প্রেমিকের মনে ॥
শেখরে নিভিলে অগ্নি প্রভাত-সময়।
ধূমময় দেখা যায় চারু চূড়াচয় ॥
প্রভাত-ভানুর ছটা লাগিয়াছে তায়।
ধীর সমীরণে চলে অচলের কায় ॥
কভু আসি পড়িতেছে চরণে তাহার।
শ্যামার চরণে কিবা জবাপুষ্প-হার !
সাগরের গর্ভ ত্যেজি সংযত স্বগণে।
ভানুকরে বাষ্পরাশি উঠিয়া গগনে ॥
নানারূপ মেঘাকারে হয়ে পরিণত।
আকাশেতে চলিতেছে গজযূথ মত ॥
প্রভাতে প্রত্যহ আসি হয় দৃশ্যমান।
কিন্তু কভু বিন্দু বারি নাহি করে দান ॥
কখন কখন তর্জে গর্জে ঘোরতর।
চমকে চপলা বালা কাঁপায়ে অম্বর ॥
বোধ হয় এই ক্ষণে হইবে বরষা।
স্বপ্নের সমান সেই বিফল ভরসা ॥

দিন দিন ক্ষীণ-বারি যত জলাশয়।
বিষম বিপদাপন্ন জলচরচয় ॥
শুখাইছে সরোবরে সরোজের বন।
কোনমতে স্বল্প জলে বাঁচায় জীবন ॥
হায় যেই ভানুকরে ফুটে শতদল।
সেই ভানু করে তার জীবন বিকল ॥
সরোবরে স্নান আর নাহি হয় সুখে।
পঙ্কময় পয়ঃ তপ্ত মধ্যাহ্ন-ময়ূখে ॥

মন্ত্রণা করিল যত রাজার কুমার।
চল সবে সিন্ধুজলে করিব বিহার ॥
পুরিয়ারে সঙ্গে লয়ে স্বকার্য্য সারিব।
সন্তরণ দিতে দিতে বুড়ায়ে মারিব ॥
চলিল কুমারগণ জলধির তীরে।
নানা জল-কেলি আরম্ভিল নীল নীরে ॥
তরল তরঙ্গমালা ধায় উভরড়ে।
বেলাকূলে আসি ভূর্ণ, চূর্ণ হয়ে পড়ে ॥
নিরমল ফেনরাশি নাচে শৃঙ্গোপরে।
নানা রঙ্গ ফলে তাহে দিনকর করে ॥
হরিত, লোহিত, পীত, পাটল আকার।
কত লক্ষ স্ফটিকের জলে দীপাধার ॥

টল টল, ঢল ঢল, পবন হিল্লোলে।
যেন মদে মত্ত হয়ে পড়িতেছে ঢ'লে ॥
গরজ, গরজ, সিন্ধু ! গরজ গভীর।
কোন কালে স্থির নহে তোমার শরীর ॥
চিরকাল একভাব আর একতান।
তুমি মাত্র অনন্ত শক্তির অভিজ্ঞান ॥
তুমি মাত্র অনন্তকালের অবছায়া।
সর্ব্বদেশে বিস্তারিত আছে তব কায়া ॥
সর্ব্বজাতি প্রতি তুমি সাধারণ ধন।
পক্ষপাত নাহি তব সকলে স্বজন ॥
ধরাতলে আছে যত তরঙ্গিণীগণ।
তব দেহে সকলের বেগ প্রশমন ॥
কলিঙ্গ কি বঙ্গ দেশে গেলে যেই নীর।
সেই নীরে ধৌত পুন ইংলণ্ডের তীর ॥
তোমার উদার ভাব হেরি পুন পুন।
হায় কেন নরজাতি না শিখে সে গুণ ?
তোমার সহিত তারা দেয় হে তুলনা।
অর্থহীন কল্পনা সে, বিফল কলনা ॥
গুণের সাগর এই, রূপ-রত্নাকর।
যশের জলধি এই, রসের সাগর ॥
ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ যারা তব বিস্তাকার।
হায় ! তারা কেন করে এত অহঙ্কার ?
এই দেখ, এই ছাব রাজপুত্রগণ।
ঈর্ষানলে অনুক্ষণ সন্তাপিত মন ॥
কিন্তু যথা প্রদীপে পতঙ্গ ভস্ম হয়।
অচিরাৎ সে অনলে পাইবে অত্যয় ॥
মুখেতে অমৃত ক্ষরে, গরল হৃদয়ে।
মারিতে প্রাণের বৈরি, আভীরী-তনয়ে ॥
ভাইগণে সম্বোধিয়ে কহে একজন।
"ডুবিয়া থাকিতে কেবা পার কতক্ষণ ॥
দুই জনে, দুই জনে পরীক্ষা হইবে।
যে হারিবে, জয়ীজনে স্কন্ধেতে লইবে ॥"
এইমত খেলা হইতেছে কতক্ষণ।
দেখ দৈবের খেলা কূটনির্ব্বন্ধন ॥
শ্যামল-হামীর নামে কনিষ্ঠ নন্দন।
পুরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'ল সেই জন ॥
দুই জনে নিমজ্জিত হ'ল সিন্ধুনীরে।
বাকি সব রাজপুত্র দাঁড়াইয়া তীরে ॥

কিছুক্ষণ পরে তারা পড়ে ঝাঁপ দিয়ে।
পুরিয়ারে অন্বেষিছে জল-মধ্যে গিয়ে ॥
তার পরিবর্ত্তে তারা শ্যামলে ধরিয়া।
কণ্ঠ-আকর্ষণে ক্ষণে কেলিল মারিয়া ॥
তরঙ্গে ভাসিয়া গেল তার কলেবর।
তীরে উঠে ভাইগণ আনন্দ অন্তর ॥
উঠিয়া নিরখে তারা চক্রতীর্থ * মূলে।
দাঁড়ায়ে পুরুষোত্তম আছে বেলাকূলে ॥
দেখা-মাত্র সকলের শুখাইল মুখ।
স্তম্ভিতের মত চায়, শোকে দহে বুক ॥
ইতিকর্ত্তব্যতা-হত ধৃত চৌর প্রায়।
মনে ভয় কেহ যদি জানায় রাজায় ॥
নিস্তার কোথায় তার দোষী যেই জন ?
অনুতাপ-হুতাশনে দগ্ধ হয় মন ॥
হৃদয়স্থ আত্মদেব দেন শাস্তি ঘোর।
কিবা দিবা বিভাবরী ভীত যেন চোর ॥
অনুক্ষণ ভাবে হায় কি করিনু আমি।
ভুলেছিনু হৃদয়ে রাজিত অন্তর্যামী ॥
অগণিত বৃথা ভয়ে তনু হয় ক্ষীণ।
পাণ্ডুর বদনভাগ—যেন প্রাণহীন ॥
লোকনে অক্ষম সেই প্রভাতের শোভা।
পূর্ব্বভাগে স্মিত যবে ঊষা মনোলোভা ॥
প্রকৃতি বিকৃতরূপ তাহার নিকটে।
তার তরে বৃথা ভানু দিবস প্রকটে ॥
সরোবরে বৃথা ফুটে কমল কহ্লার।
উপবনে বৃথা ছুটে সুরভি-সম্ভার ॥
তার তরে বিফলে বিহঙ্গ গান করে।
বিফলে শারদ-শশী অমৃত বিতরে ॥
সদা যেন তিমিরে আচ্ছন্ন দিগ্ দশ।
হলাহল সম বোধ হয় সুধারস ॥
লোকালাপে ভুলিবারে প্রাণের বেদন।
দিনে জনপূর্ণ স্থানে ধায় সেই জন ॥
বিফল সে সব চেষ্টা, বিতর্ক অন্তরে।
নয়ন-ভঙ্গীতে লোক ইঙ্গিত কি করে ?

দিবসে এরূপ আত্মদেবের ঘাতন।
রজনীতে আরো বাড়ে মনের যাতন ॥
এইরূপ অনুতপ্ত রাজপুত্রগণ।
কি হইবে কোথা যাবে চিন্তা অনুক্ষণ ॥
নির্জ্জনেতে যুক্তি স্থির করি পরিশেষে।
সংগোপনে পলাইল পশ্চিম-প্রদেশে ॥
কপিলেন্দ্রদেব শুনি এই সমাচার।
মোহ-মুগ্ধ হয়ে পড়ে করি হাহাকার ॥
দশরথ-প্রায় রাজা পেয়ে পুত্রশোক।
কিছু দিন অন্তরেতে প্রাপ্ত পরলোক* ।
শ্রীপুরুষোত্তম-দেবে তবে মন্ত্রিগণে।
অভিষিক্ত করে গজপতি-সিংহাসনে ॥
রামরাজা-প্রায় রায় স্বরাজ্য-শাসনে।
দুষ্টের দলনে আর শিষ্টের পালনে ॥
প্রখরপ্রতাপ অতি ধীমান্ শ্রীমান্।
কর্ণের সমান দানে, যশের নিধান ॥
শূরবীর পণ্ডিত-মণ্ডিত মহারাজ।
বিক্রম-আদিত্য সম শোভিত সমাজ ॥
জঙ্গলীয় রাজগণ কিঙ্কর সমান।
কেহ ধরে পানদান, কেহ পিক্‌দান ॥
কেহ শিরে ধরে ছত্র, কেহ মৌরছল।
কেহ মুখ-অগ্রে ধরে দর্পণ বিমল ॥
তার প্রতি যেই দেশ করিলা অর্পণ।
অদ্যাপি বিখ্যাত নাম আছয়ে দর্পণ ॥
অদ্যাপি পুরুষোত্তমপুর বর্ত্তমান।
কিন্তু সিংহকুল পরে হ'লো মুসল্মান ॥

* পুরীর বেলাকুলবর্ত্তী মধুর সলিলযুক্ত কূপ-বিশেষের নাম।

* কপিলেন্দ্রদেবের শেষাবস্থায় মুসলমানেরা দক্ষিণ হইতে প্রথমে উৎকলদেশাক্রমণ করণে অগ্রসর হয়। মুসলমানদিগের সহিত শেষসমরে পুরুষোত্তমদেব পিতা কপিলেন্দ্রদেবের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া সবিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু এই শেষ সমরে কপিলেন্দ্রদেব কৃষ্ণানদী-তীরে পরলোক প্রাপ্ত হন। সেই স্থানেই মন্ত্রিবর্গ পুরুষোত্তম দেবকে রাজপদাভিষিক্ত করেন।

সেইরূপ গড়পদা * ভূঞার কুমার।
অর্থ-লোভে করে ব্রহ্মধর্ম্ম পরিহার॥
হেনমতে কত শত কীর্ত্তির আধান।
কেবল কুলেতে কালী কলঙ্কী সমান॥
কিন্তু রাজলক্ষ্মী যারে করেন বরণ।
কি ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন?
রাজ-রাজচক্রবর্ত্তী বৃও গোলকাদি।
পাণ্ডু আর যুধিষ্ঠিরে কে বা প্রতিবাদী?

* রাজা পুরুষোত্তমদেব পোতেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণকে ১৪০৮ বাটী অর্থাৎ ২৮১৬০ উৎকলদেশে প্রচলিত বিঘা ভূমি সূর্য্যগ্রহণকালে গঙ্গাগর্ভে দান করেন। তাম্রপট্টে ক্ষোদিত উক্ত দানপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উক্ত পোতেশ্বরের বংশ-ধর সর্ব্বেশ্বর ভট্টকে ময়ূরভঞ্জের রাজা দূরীভূত করিয়া দিয়া সেই ব্রাহ্মণ শাসন স্বরাজ্যের সামিল করিয়া লন। সর্ব্বেশ্বর মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট আর্ত্তনাদ করাতে নবাব ময়ূরভঞ্জের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের প্রতি যুদ্ধের ব্যয় পরি-শোধ করিতে আজ্ঞা দেন; সর্ব্বেশ্বর বিষয়চ্যুত বিধায় সেই ব্যয়দানে অক্ষম হইলেও নবাব তাঁহার আর্দ্দাসে শ্রুতিপাত করিলেন না। অগত্যা দরিদ্র ব্রাহ্মণ আগ্‌রায় গমন করিয়া দিল্লীশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বর ঔরংজেব অত্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম-দ্রোহী ছিলেন; তিনি একদা সর্ব্বেশ্বরকে কৌতুকচ্ছলে কহিলেন, "যদি তুমি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হও, তবে তোমার বিষয় তোমাকে দিতে পারি।" সর্ব্বেশ্বর বার বার ইহাতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু পরিশেষে নিরুপায় হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণের আদেশ আনিয়া ভূমি-সম্পত্তিতে পুনরধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অদ্যাপি পোতেশ্বর ভট্টের বংশীয়েরা গড়পদার ভূঞা নামে বিখ্যাত আছেন, মুসলমানদিগের সহিত করণ-কারণ সম্বন্ধে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের বাটীতে দেবালয় সকল এবং হোমকুণ্ড প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। গড়পদার আদি নাম পুরুষোত্তমপুর-শাসন, দর্পণগড়েও এই রূপ এক পুরুষোত্তমপুর আছে।

ভোজরাজ, মদ্ররাজ দ্রুপদ নৃপতি।
পাণ্ডবে কুটুম্ব করি চরিতার্থ অতি॥
সেইরূপ উৎকলের অধিপ তি প্রতি।
কন্যাদানে অগ্রসর কত মহাপতি।

ইতি কথারম্ভ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

পদ্মাবতী

কিবা অপরূপ, পদ্মাবতী-রূপ,
অলপ বয়সী বালা।
কেতকী কুসুম, কেশর কুসুম,
লাবণ্য ফুলের ডালা॥
নয়ন সুন্দর, নীল-নিভাধর
কাজলে উজল ভাতি।
যেন ইন্দীবরে, অলি শোভা করে,
রবহীন মদে মাতি॥
পলকে পলকে, দামিনী দলকে
চমকে যুবক-প্রাণ।
আকর্ণ সন্ধান, কামের কামান,
যুগল ভুরুর টান॥
অধরোষ্ঠ কিবা, প্রবালের ডিবা,
দশন মুকুতাধার।
মৃদু মৃদু হাসে, দর পরকাশে,
কি শোভা করে সঞ্চার॥
নাসিকার কোলে, গজমোতী দোলে,
তিলফুলে হিমকণা।
প্রলম্বিত বেণী, নাগিনীর শ্রেণী
উভে কি বিস্তার ফণা॥
প্রতিভার খনি চন্দ্রসূর্য্য মণি*,
সীমন্ত শ্রীমন্ত করে।
রত্ন কর্ণফুল, শোভে কর্ণমূল
দোলে কি আনন্দভরে?
পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে
কপাল কি আধ-ইন্দু?

* শিরোভূষণবিশেষ, ইহা কর্ণাটদেশে প্রসিদ্ধ।

মৃগাঙ্কের প্রায়, শোভিছে কি তায়,
মৃগমদ লেখা বিন্দু ?
রাঙা কোকনদ, শ্রীকর শ্রীপদ,
অঙ্গুলী চাঁপার কলী।
রস-প্রস্রবণ, প্রথম যৌবন,
কিবা ভাব টল-টলী ॥
নানা গুণবতী, সুশীলা সুমতী,
ঈশ্বরে অচলা রতি।
মধুর গভীর, সুধাসম গির,
মোহিত কর়য়ে মতি ॥
কিবা নতশির়ে, গতি অতি ধীরে,
সলজ্জ মধুর ভাব।
সুলক্ষণযুতা, কিবা সিন্ধুসুতা,
কাঞ্চীপুরে আবির্ভাব ॥
বীণা বেণু আদি, সুস্বর-সম্বাদী,
যন্ত্রতন্ত্রে মূর্ত্তিমতী।
সারদা সমানা, নৃত্যগীত নানা,
শিখিয়াছে চারুমতি ॥
নাটক নাটিকা, শব্দশাস্ত্র টীকা,
কাব্য আর অলঙ্কার।
ছন্দো ব্যাকরণ, দর্শনে দর্শন,
শ্রুতি শ্রুতি-অলঙ্কার ॥
সর্ব্ব কলাবতী, যথা-ভানুমতী,
চিত্রে চিত্রলেখা বালা !
অপূর্ব্ব রমণী, নারী-শিরোমণি,
কিবা বৈজয়ন্তী-মালা ॥
দিন দিন তার, পদ্মবনাকার,
প্রকটিত হেরি রূপ।
সমযোগ্য বর, না হয় গোচর,
চিন্তিত হইলা ভূপ ॥
সচিবের সহ, বসি অহরহ,
কতরূপ যুক্তি করে।
বিভবে বিপুল, রূপেতে অতুল,
কে আছে ভব-ভিতরে ?
স্থির অবশেষ, উড়িষ্যা-নরেশ,
শ্রীপুরুষোত্তম রায়।
কন্দর্প সমান, রূপের নিধান,
বিক্রমে বিক্রম প্রায় ॥

শুনি সমাচার, উড়িষ্যা-রাজার,
হৃদয়ে উদয় প্রীতি।
কাঞ্চীশ সদন, চারণ প্রেরণ,
করিলেন যথা নীতি ॥
কহে মন্ত্রিবর, যুড়ি দুই কর,
"অবধান মহীপতি !
রূপে অতুলনা, কমলা-কলনা,
ললনার সার সতী ॥
ভুবন-ভিতর, তাঁর যোগ্যবর,
করিবারে নিরূপণ।
এই যোগ্য হয়, উচিত প্রত্যয়,
স্বচক্ষে করি ঈক্ষণ ॥"
শুনি কাঞ্চীরায়, দিল তাহে সায়,
"সাজহ ত্বরায় যাব।
কিরূপ আকার, আচার ব্যভার,
প্রত্যক্ষে দেখিতে পাব ॥
কন্যা পদ্মাবতী, যাইবে সংহতি,
নিরখিবে ভাবী পতি।
সাগরের প্রতি, ধায় স্রোতস্বতী,
কুপথে না করে গতি ॥"
বিচারি ভূপতি, দেন অনুমতি,
সাজিল কিঙ্করগণ।
সচিব সহিত, গুরু পুরোহিত,
সৈরিন্ধ্রী পুরন্ধ্রী জন ॥
শিবিকারোহণে, সহিত স্বগণে,
চলিলা নৃপনন্দিনী।
রণ-বেশ ধরি, চলে অশ্বোপরি,
বেড়িয়া শত বন্দিনী ॥
সঙ্গে লয়ে ঠাট, আগে যায় ভাট,
উত্তরিল ক্ষেত্ররাজে।
যথা কুলাচার, পড়ি রায়বার,
কহিছে নৃপ সমাজে ॥
"কাঞ্চী নরবর, কলেবরেশ্বর,
সমাগত মতিমান্।"
শুনি গজপতি*, হরষিত মতি,
ভেটিতে সত্বরে যান ॥

---

* উৎকলাধিপতিদিগের প্রসিদ্ধ প্রাচীন খ্যাতি।

যথা সমাদরে, কর্ণাট-ঈশ্বরে
আনিলা পুরুষোত্তমে।
যোগ্য ব্যবহার, আতিথ্য-সৎকার,
সদাচার যথাক্রমে॥
কিছু দিনান্তরে, মহা আড়ম্বরে
শ্রীগুণ্ডিচা-যাত্রা * হয়।
দেখিবারে রথ, হাঁটি দূর পথ,
লক্ষ লক্ষ যাত্রিচয়॥
সাধে মনোরথ দেখি তিন রথ,
মণ্ডলিত, সিংহদ্বারে।
বাজে ঢাক ঢোল, করতাল খোল,
শ্রুতিরোধ একেবারে॥
তাল-ধ্বজোপর, কিবা মনোহর,
রেবতী-রমণ শোভা।
নন্দীঘোষ নাম, রথে ঘনশ্যাম,
ভক্তজন-মনোলোভা॥
বেদি-রথোপরি, বিরাজে সুন্দরী,
ভদ্রা সহ সুদর্শন।
এক দৃষ্টে রয়, যত যাত্রিচয়,
চরিতার্থ মনে মন॥
প্রলয়-সময়, সিন্ধু উথলয়,
হেন কোলাহল-রোল।
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ,
হরিবোল হরিবোল॥"
হইল লগন, যথা শুভক্ষণ,
উদয় উৎকলরায়।
করে পরিপাটী, সুবর্ণের বাটি,
অগুরু চন্দন তায়॥
সুবর্ণ মার্জনী, ধরি নৃপমণি,
আপন দক্ষিণ করে।
ঠাকুর সম্মুখে, ছড়া দিয়ে সুখে,
ঝাটা দিয়ে পাটী করে॥
দেখিয়া রাজার, রীতি এ প্রকার,
হাসিল কাঞ্চীর পতি।
ঘৃণা সহকার, দিয়ে টিটকার,
কহিছে মন্ত্রীর প্রতি॥

"এ কি হে দুর্গতি হয়ে নরপতি,
চণ্ডালের আচরণ।
এরে দুহিতায়, দিব আমি হায়, ?
ধিক্ ধিক্ অভাজন॥
সমুদ্রের জলে, শিলা বাঁধি গলে
বিসর্জিব পদ্মিনীরে।
বৃথা পরিশ্রম, দূরে গেল ভ্রম,
চল যাই দেশে ফিরে॥
কি আছে স্থিরতা, কেবা এ দেবতা,
জগন্নাথ যার নাম।
নাহি বেদমন্ত্রে, কি পুরাণ তন্ত্রে,
আকৃতি বিকৃতি ধাম॥
পুন দেশ শুক, বলে তারে বুদ্ধ,
বুদ্ধমূর্ত্তি দৃশ্য নয়।
যত মতিচ্ছন্ন, প্রসাদের অন্ন,
খাইয়ে কৃতার্থ হয়॥
গেল জাতিভেদ, লুপ্ত হ'ল বেদ,
সকলি ম্লেচ্ছের ভাণ।
পদ্মিনী আমার, শুচি-অবতার,
চণ্ডালে করিব দান?
শুনেছ কি আর, এই দুরাচার,
নহে ক্ষত্রী-কুলোদ্ভূত।
ক্ষেত্রে গোপিনীর, জাত মহাবীর,
তাই অনাচারযুত॥
হেথা কাজ নাই, চল ফিরে যাই,
জারজ জামাই হবে?
ক্ষত্রিয়-সমাজ, দিবে মোরে লাজ,
প্রাণে তাহা নাহি সবে॥"
যেমন বলিল, অমনি চলিল,
ক্ষেত্র ছাড়ি কাঞ্চীপতি।
উৎকল-ঈশ্বরে, নিবেদিল চরে
যথাযথ সে ভারতী॥
শুনি সে সকল, মহা ক্রোধানল,
রাজার হৃদয়ে জ্বলে।
তখন ডাকিয়া, কহিছে হাঁকিয়া,
আপনি সচিবদলে॥
"আরে দুরাচার, এত অহঙ্কার,
আমারে জারজ বলে।

* জগন্নাথের রথ-যাত্রা।

মহানন্দ শেষ, ক্ষত্রিয় নরেশ,
ক্ষত্রী কোথা ধরাতলে* ?
ক্ষত্রী হ'ল লুপ্ত, যবে চন্দ্রগুপ্ত,
মগধের মহীপাল।
ক্ষত্রী বলি আজ, এ ক্ষেত্র-সমাজ,
করে দুষ্ট ঠাকুরাল ॥
মোরে কুবচন, ব'লল দুর্জ্জন,
তাহে কিছু নাহি ক্ষতি।
এত অহঙ্কার, ঠাকুরে আমার,
গালি দেয় নষ্টমতি ?
যিনি নিরাকার, কি আকার তাঁর ?
সাকার কল্পনা-সার।
সাধকের হিত, তাহে সমাহিত,
কহে বেদ বার বার ॥
পুনঃ কহে বেদ, ভেদ জ্ঞান-ছেদ,
সেই জ্ঞান সার মাত্র।
বিভু-সন্নিধান, সকলে সমান,
ভ্রম ভাণ পাত্রাপাত্র ॥
কিবা হরিহর, ব্রহ্মা পুরন্দর,
সকলি আমার প্রভু।
পাত্রভেদে পয়ঃ, নানা বর্ণ হয়,
বস্তু ভিন্ন নয় কভু ॥
নহে বস্তু অন্য একই হিরণ্য,
সকল ভূষার মূল।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ, কিরীট-শোভন,
ললাটিকা কর্ণফুল ॥
যেবা যেই ভাবে, মনে তাঁরে ভাবে,
সেই ভাবে পাবে সেই।
নিন্দক দুর্ম্মতি, পাইবে দুর্গতি
সারোদ্ধার মাত্র এই ॥
কে আছে সংসারে ? পারে চিনিবারে,
অনন্তের চারু পদ।
সে পদে আমার, রাজত্ব কি ছার,
চণ্ডালত্ব ব্রহ্মপদ ॥

কাল বিষধর গরল প্রখর,
কাঞ্চীরাজ নিন্দাবাদ।
সহিত অন্তর, তনু জর জর,
হায় হায় কি প্রমাদ !
অর্পিতে আমায়, নিজ দুহিতায়,
এনেছিল সঙ্গে লয়ে।
আমারে না দিল, চণ্ডাল ব'লল,
মানমদে মত্ত হয়ে ॥
আমার এ পণ, শুন সভাজন,
সত্য কি জগৎপতি।
সত্য যদি তাঁর, চরণে আমার,
থাকে ভক্তি রতি মতি ॥
সত্য যদি তাঁর, কৃপায় আমার,
উড়িষ্যায় এই পদ।
তবে এই মোর, প্রতিজ্ঞা কঠোর,
দধীচি-অস্থি-আস্পদ ॥
সংবৎসর তিন, ত্রিমাস ত্রিদিন,
ভিতর সে দুরাচারে।
সমরে জিনিয়া, চণ্ডালে আনিয়া,
দিব তার তনয়ারে ॥
বলি এ ভারতী, ক্ষান্ত নরপতি,
প্রশান্ত হইল চিত।
কার্য্যে নানা মত, কত দিন গত,
জ্যৈষ্ঠ মাস সমুদিত ॥
দেব-স্নান পর্ব্বে, মাতিলেক সর্ব্বে,
মণ্ডপেতে জগন্নাথ।
ধরি করি-রূপ, শোভা অপরূপ,
বলভদ্র ভদ্রা সাথ ॥
নীল করিবর, নীলগিরীশ্বর
ধবল মাতঙ্গ বল।
কনক করিণী, সুভদ্রা ভগিনী,
শোভিছেন মধ্যস্থল ॥
ভোগের সময়, হইল ব্যত্যয়,
শুনি রাজা কোপভরে।
দাসু সূপকারে, ঘোর কারাগারে,
বাঁধি লয়ে বদ্ধ করে ॥
দিন দুই পরে, নিশীথ প্রহরে,
স্বপন দেখেন রায়।

* বিষ্ণুপুরাণাদি মান্য গ্রন্থে লিখিত আছে, নন্দবংশীয় মহানন্দই শেষ ক্ষত্রিয় রাজা, সেই সময়াবধি ক্ষত্রিয় বর্ণের লোপ হয়। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন না

কহিছে কে যেন, "এত দর্প কেন ?
ভুলিয়াছ আপনায় ॥
পুরী নামধেয়, কালি ছিলে হেয়,
আজি তুমি গজপতি।
যাঁহার কৃপায়, রাজা উড়িষ্যায়,
তাঁরে হেলা ভ্রমমতি !
এত অহঙ্কার, মম সূপকার
দাসবে দিয়াছ কারা।
সে ভক্ত আমার, কি দোষ তাহার ?
চক্ষে তার শতধারা ॥
আমিও অভুক্ত, যদবধি মুক্ত,
দাশরথি না হইবে।
সত্বরে যাইয়া দেহ ছাড়াইয়া,
তবে সে ক্ষমা পাইবে ॥
সদা মত্ত মন, ভুলিয়াছ পণ,
কাঞ্চী-কাবেরী জয়।
রাজযোগ্য রীতি, নহে এই নীতি,
প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া রয়।
কহ সূপকারে, দিউক আমারে,
পর্য্যুষিত অন্নভোগ।
লয়ে তার মাত্রা, কর যুদ্ধযাত্রা,
নিশাশেষে শুভ-যোগ ॥"
স্বপন ভাঙ্গিল, নৃপতি জাগিল,
চলে দ্রুত কারাগারে।
সূপকার-পায়, দণ্ডবৎ-কায়,
নিপতিত বারে বারে ॥
করি নমস্কার, মাগে পরিহার,
"ক্ষম মোরে অভিরোষ।
তুমি পুণ্যবান্, ভকত প্রধান,
না জানি করেছি দোষ ॥
পর্য্যুষিত অন্ন*, ভোগেতে প্রসন্ন,
করহ ঠাকুরে মোর।
সেবা প্রয়োজন, যেবা আয়োজন,
করহ থাকিতে ঘোর ॥"

যথা সংগোপন, ভোগ সমর্পণ,
শিরেতে লইয়ে রায়।
যাত্রা করে বীর, দক্ষিণ প্রাচীর,
পরিক্রম করি যায়।
যুড়ি দুই হাত, শত প্রণিপাত,
শিহরিত কলেবরে।
যথা ভক্তিভরে, মৃদু মন্দস্বরে,
শ্রীনাথের স্তব করে ॥
"প্রসীদ দেব মাধব !
নমস্ক্রিয়াস্তু মাধবঃ !
গজেন্দ্র-মোক্ষ-কারকং !
খগেন্দ্র-দর্প-হারকং !
অনন্ত-শক্তি-ধারকং !
কৃতান্ত-ভীতি-বারকং !
নিতান্ত-শান্তি-দায়কং !
নিশান্ত-কান্ত-নায়কং !
ত্রিবেদ-গীত-গৌরবং !
নমামি-রুদ্র-রৌরবং।
বপুঃ সুরারি-ভৈরবং !
প্রশান্ত-ভৃঙ্গ-কৈরবং !
নমঃ কৃতান্তঃ বা রণে
ভবাব্ধি-কর্ণধারিণে !
সুরারি-গর্ব্বগঞ্জনং।
পুরারি-নেত্ররঞ্জনং
নদী-পদাব্জ-নির্গতা !
সুরাপগা পদংগতা !
নমামি দেবমীশ্বরং !
অসংখ্য-ভানু-ভাস্বরং !
অশেষ-পাপ-নাশনং
সুধারসাবতারণং !
স্মরামি নাম তারণং
অয়ে নিদান-কর্ম্মণাম্।
কৃপানিধান পাহি মাম্ ॥
অসংখ্য রেণুরাজিতঃ,
অসংখ্য-জীবপূরিতঃ ॥
অসংখ্য-লোক-গুম্ফিতঃ।
ভবো ভ সমাশ্রিতঃ ॥
নমামি বিশ্বকারবে।

* কথিত আছে, এই সময় হইতে জগন্নাথ-দেবের পর্য্যুষিত অন্নে একটি ভোগ দিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

তরিস্তমোভবার্ণবে। প্রবোধ-সৌধ-সিন্ধবে,
সুদীনহীন-বন্ধবে।
নমামি নীল-দেহিনে,
সুনীল-শৈল-গেহিনে।
ত্রিলোকচিত্ত-মোহিনে,
দুরন্ত সত্ত্ব-দ্রোহিণে।
দয়াময়াভয়াকরঃ,
অঘৌঘমাশু সংহর!"
"রেখো রেখো শ্রীচরণে, জীবনে মরণে রণে,
চরণ স্মরণে মন রয়।
তা যদি আয়ত্ত মোর, কি আছে সুখের ওর,
তুচ্ছ বোধ করি জয়াজয় ॥
যখন চিন্তই মনে, তব দয়া অকিঞ্চনে,
তখনি স্তম্ভিত হয় প্রাণ।
পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, এবে বা কি হইলাম,
ভাবি কিছু না পাই সন্ধান ॥
তোমাতেই অনুক্ষণ, গ্রথিত পদার্থগণ,
সূত্রে যথা গাঁথা মণিচয়*।
বিশ্বগুরু বিশ্বাধার, বিশ্বযোনি বিশ্বসার,
বিশ্বেশ্বর ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥
শুনিয়াছি তব জায়া, মহাবিদ্যা মহামায়া,
কাজ তাঁর নাটুয়ার মত।
অন্তহীন এ সংসারে, ভাঙ্গেন গড়েন কারে,
কত কল্প এ খেলায় গত?
মায়াপাশে হয়ে বন্দি, কে পাবে তাহার সন্ধি,
চিন্তনীয় নহে সেই খেলা।
এইমাত্র নিরূপণ, শ্রীপদে যাহার মন,
ভবাব্ধিতে সেই লভে ভেলা ॥"
ইতি পদ্মাবতী নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ
মাণিক-গোপালিনী

পুরীর দক্ষিণ দ্বারে জলধির তীর।
হিল্লোল কল্লোলে হয় শ্রবণ বধির ॥
রেণুময় পথে কষ্টে পথিকের গতি।
স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্য বসতি ॥
পঞ্চক্রোশ অন্তরেতে আছে এক গ্রাম
নামেতে আনন্দপুর গোয়ালার ধাম ॥
পাঁচ সাত ঘর গোপ করে তথা বাস।
নাহি জানে কোন শিল্প, নাহি করে চাষ ॥
বিভবের মধ্যে আছে গো মেষ মহিষ।
তাই লয়ে সময় সম্বরে অহর্নিশ ॥
চরে চরে পশুপাল খায় ঘাস জল।
সুধারূপ দুগ্ধদান করে অনর্গল ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত ছানা সর।
সেই তত্ত্বে গোপীগণ ব্যস্ত নিরন্তর ॥
অদূরেতে দক্ষিণের গমনীয় পথ।
সিদ্ধ করে তাহাদের ধন-মনোরথ ॥
নানা গব্যে গোপীগণ সাজায়ে পসরা।
পথপাশে বসিয়াছে, বচনে প্রখরা ॥
দুই চারি, পাঁচ সাত, গোয়ালিনী মেলি।
গান করে শ্রীবৃন্দাবনের রসকেলি ॥
তার মধ্যে মাণিকা নামেতে এক বালা।
রূপের ছটায় পথ করয়ে উজালা ॥
অঙ্গের প্রতিভা যেন কষিত কনক।
বৃষভ বেহারা নামে তাহার জনক ॥
কি সুন্দর সুকুমার সুলক্ষণবতী।
শ্রীচন্দ্র বেহারা নামে হয় তার পতি ॥
প্রতিদিন প্রভাতে সে সাজায়ে পসরা।
বড় দেউলের ধ্বজা দেখি মনোহরা ॥
যথাভক্তি নত হয় যুড়ি পদ্মপাণি।
রাজপথ পাশে পরে পণ্য রাখে আনি ॥
যে কিছু পদার্থ আনে বিক্রয় কারণে।
জগন্নাথে নিবেদন করে মনে মনে ॥
তারপরে পথিকেরে করে বিনিময়।
অনুদিন জগন্নাথ হৃদয়ে উদয় ॥
অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন সকল।
একদা হইল তার জনম সফল ॥
সেইদিন পাঁচ ঘড়ি বেলার সময়।
পসরা লইয়া শিরে হইল উদয় ॥
যেমন করিল যাত্রা ভাবিনী রমণী।
বাম নেত্র বাম জানু স্ফুরিল অমনি ॥
মীনমুখে শঙ্খচিল আগে উড়ি যায়।
ধবল নকুল এক আগে আগে ধায় ॥

---

* ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব

ডাহিনে বামেতে শিবা করয়ে প্রস্থান।
চারিদিগে সুলক্ষণ হয় দৃশ্যমান ॥
ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত গোয়ালার মেয়ে।
সেদিন বাড়িল রূপ আর দিন চেয়ে ॥
একে ত রূপের খনি, বয়সে তরুণী।
অরুন্ধতী আইল কি তেজি সপ্তমুনি?
শীতল অনল প্রায় লাবণ্যের ছটা।
ধুয়াকারে শোভে নীল চিকুরের ঘটা ॥
খঞ্জন গঞ্জন নেত্রে অঞ্জন রঞ্জন।
ইন্দীবর নীলিমার গৌরব-ভঞ্জন ॥
দর হাসি মুখে যেন প্রফুল্ল বাঁধুলী।
কপোলের আভা কিবা লোহিত গোধূলি ॥
নাসিকায় ফুলগুণা * কর্ণে মল্লি-কলি †।
ভালে চিতা ‡ যেন ফুল্লকমলেতে অলি ॥
করেতে কনক-চুড়ী, কণ্ঠে কণ্ঠমালা।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী আর, পদে গোড়বালা ** ॥
কালমেঘী সাড়ী পরা, পবনে চঞ্চল।
বামকাঁধে প্রলম্বিত বিচিত্র অঞ্চল ॥
রঙ্গ পটফুলে ‡‡ কিবা বেণী বিজড়িত।
তাহে এক চাঁপা যেন জলদে তড়িত ॥
আলতায় রাঙ্গা পদে অধিক জমক্।
মত্ত মাতঙ্গের মত গতির থমক্ ॥
দাড়িম্বের বীজ দন্ত, মন্দ মন্দ হাস।
আরক্ত অধরে পর্ণরসের উচ্ছ্বাস ॥
কি মধুর বাণী যেন কোকিল কুহরে।
অমৃতের বৃষ্টি হয় শ্রবণ-কুহরে ॥
পসরা লইয়া পথে করিল প্রবেশ।
দেখে দুই অশ্বারোহী রাজপুত-বেশ ॥
নীরদ শ্যামল এক, দ্বিতীয় ধবল।
কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গযুগল ॥

* উৎকলীয় নাসা-ভূষণ বিশেষ।
† কর্ণ-ভূষণ বিশেষ।
‡ উল্কী।
** পদভূষণ বিশেষ।
‡‡ উর্ণানির্মিত কুসুমকলিত সূত্র ইহার দ্বারা কবরীবন্ধন হয়।

দিব্য দুই মূর্ত্তি হেরি ভাবে মনে মনে।
লক্ষ্মীমন্ত পথিক মিলিল শুভক্ষণে ॥
মুখেন্দু রঞ্জিত মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
পসরা লইয়া গোপী চলিলেক পাশে ॥
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল যুবতী।
বঙ্কিম অপাঙ্গ-ভঙ্গী আধোদিকে গতি ॥
মস্তক হইতে ত্বরা নামায়ে পসরা।
ললাটে অঞ্চল টানি দিল মনোহরা ॥
মাণিকার রূপ হেরি রাজপুতদ্বয়।
মনে করে দ্বাপরের ভাব রসময় ॥
এই কি সে বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকা?
প্রেমগুরু মাধবের প্রণয়-সাধিকা?
কৃষ্ণ রাজপুতে দেখি, মাণিকা মোহিত।
অপরূপ রূপে হ'ল চকিত রহিত ॥
নবীন কিশোর কৃষ্ণ কন্দর্পমূরতি।
গোলোক-পুলক দাতা কমলার পতি ॥
মনে ভাবে "এ পুরুষ অতি সুকুমার।
না জানি হইবে কোন্ রাজার কুমার ॥
এ নব বয়সে কেন প্রবাসেতে ফেরে?
কেমনে ইহার মাতা ছেড়ে দিল এরে?
দেখিয়াছি আশোবার অনেক অনেক।
হেন অশ্বারোহী কভু দেখিনি জনেক ॥
কালা ধলা ঘোড়া, কালা ধলা আশোবার।
মর্ত্ত্যে কি আইলা দুই অশ্বিনীকুমার?
গৌর-গৌরবের চৌর এ কৃষ্ণবরণ।
পুরুষ জাতির এই শ্রেষ্ঠ আভরণ ॥
আকারেতে বোধ হয় বড় ধনবান্।
সমরে সমর্থ অতি, বীর বলীয়ান্ ॥
যুদ্ধ করিবারে যেন এই বীরবেশে।
দুইজনে ত্বরান্বিত যান কোন দেশে ॥
নিরখিবা মাত্র কেন এত উচাটন।
করিল কি মম মন কটাক্ষে হরণ?
দুরন্ত সিপাহিগণ, কভু শান্ত নয়।
সত্যে কি ইহারা দধি করিবেক ক্রয়?
কড়ী নাহি দেয় পাছে ভোজন করিয়ে।
যে লোক্ হেরিব রূপ নয়ন ভরিয়ে ॥
বীরযুগ-মুখ চাহি যুড়ি দুই পাণি।
দর-হাসে বিনাইয়ে কহিতেছে বাণী ॥

"হয়েছে অনেক বেলা, খরতর খরা।
তরুতলে গাভীবৎস যাইতেছে ত্বরা॥
হেথা আছে ছায়াজল গো-রস প্রচুর।
ঘোড়া রাখি দুজনে করুন শ্রান্তি দূর॥"
বসন্ত-কোকিল প্রায় সুস্বর গভীর।
শুনি চমকিত চিত, হ'ল দুই বীর॥
চতুর নাগরবর কৃষ্ণ রাজপুত।
বঙ্কিম নয়নে খরতর শরযুত॥
নবীন নীরদ যথা নিনাদিত ধীরে।
কিবা প্রতিধ্বনি যথা মহেশ-মন্দিরে॥
সেইরূপ শ্রীমুখেতে বচন প্রকাশ।
বিম্বাধরে সুরঞ্জিত মৃদু মন্দ হাস॥
"তোমার গো-রস খাঁটি, কিম্বা নীর-ভরা।
অপরূপ নানারূপ সাজান পসরা॥
সুলভ কি দুর্লভ মূলোতে বিনিময়।
না জানিলে সওদা কেমনে বল হয়?"
বচনে চাতুরী বুঝে আভীরের বধূ।
উত্তর প্রদান করে বরষিয়া মধু॥
কহে কিছু বদনের বসন তুলিয়া।
"আমার যে কিছু আছে লও হে মুলিয়া॥
গ্রাহক যেমন, মিলে পদার্থ তেমন।
গুণের পরীক্ষা মাত্র, গুণীর সদন॥"
রসিক পাইয়া রস কথার উত্তরে।
কহেন "বিলম্ব নাই যাইব সত্বরে॥
কহ গো গোয়ালিনী কিবা তব নাম?
কোথায় জনক আর শ্বশুরের ধাম॥
শ্বশুরের ঘরে কিবা, থাক বাপ-ঘরে?
কতকাল বেচা-কেনা, এই পথোপরে?
তর্ক এত তক্র বেচ, বচনেতে ছন্দ।
নহে ত ননন্দ শ্বশ্রূ তাহে নিরানন্দ?
জান ভাল স্বজাতির ব্যবসা-কৌশল।
পোয়াতে করহ সের ঢেলে দিয়ে জল॥"
হাসিয়া মাণিকা করে আরো বাক্-ছল।
"স্বজাতির বৃত্তি প্রভু! কেবা ছাড়ে বল?
এই গ্রামে ঘর মম এই দেখা যায়।
মাণিক বলিয়া মোরে ডাকে বাপ মায়॥
গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে যাই নাকো কভু।
পতি আর পিতৃগৃহ একগ্রামে প্রভু॥
পিতা মোর বৃষভানু মাতা কলাবতী।
নাম নাহি লব, পতি কুমুদিনী-পতি॥
মোর প্রতি আছে শ্বশ্রূ ননদীর প্রীতি।
এই পথে দধি দুগ্ধ বেচি নিতি নিতি॥
ছন্দ না শিখিলে প্রভু! নাহি হয় কড়ী।
আচাভুয়া লোক পথে যায় গড়াগড়ী॥
অধীনীরে কত মত জিজ্ঞাসিছ বাণী।
আপনার নাম গোত্র কিছুই না জানি॥
জন্ম তব কোন্ বংশে, কিবা গ্রাম নাম?
কেবা পিতা মাতা তব? কহ গুণগ্রাম॥
এক মার পুত্র বুঝি নহ দুই জন।
তুমি হে শ্যামল ইনি ধবল বরণ॥
তুমি ছোট, ইনি বড়, এই মনে লয়।
বহু কথা জিজ্ঞাসিতে মনে লাগে ভয়॥
ছোট মুখে বড় কথা পাছে কোপ কর।"
এত বলি মাণিকা হইল নিরুত্তর॥
অসিত পুরুষ কন সুস্মিত আননে।
"আমাদের পরিচয় শুন বরাননে॥
শূরসেন দেশে ঘর, জন্ম যদুকুলে।
কিশোর বয়স গেল যমুনার কূলে॥
আমরা জনমাবধি মাতুলের ডরে।
লুকায়ে ছিলাম গিয়ে তব জাতি ঘরে॥
অনেক উৎপাতে তথা পাইনু উদ্ধার।
গোচারণে বনে বনে করিনু বিহার॥
সরল তোমার জাতি, সরল হৃদয়।
বিশেষে সরলা ব্রজ-গোপবালাচয়॥
বেঁধেছিল প্রেমডোরে তনু আর মন।
আর কি তেমন প্রেম হইবে ঘটন?
মাতুল মরিল রণে, ঘুচিল জঞ্জাল।
তার পরে সিন্ধুতটে গত, কত কাল॥
জগন্নাথ সিংহ রায় হয় মম নাম।
ইনি মোর বড় ভাই রূপগুণধাম॥
অন্যায় না সন ইনি দয়ার নিধান।
গদাযুদ্ধে কেহ নাহি ইঁহার সমান॥
তোমার নিকটে গোপি! কি আর বড়াই।
ঠেকিয়া শিখেছি কত দেখেছি লড়াই॥
এবে আমি ক্ষেত্রবাসী, প্রসাদে নির্ভর।
আত্মীয় আমার সব, কেহ নহে পর॥

ভারত ভরিয়া আছে সেবক আমার।
এক স্থানে নাহি থাকি ভ্রমি এ সংসার॥
আমার হইয়া সবে, আমারে না চিনে।
ক্ষণেক থাকিতে নারে কিন্তু আমা বিনে॥
চতুর্দ্দশ গড় মম, দুর্গম বিশেষ।
আজ্ঞা বিনা কার সাধ্য করিবে প্রবেশ?
সম্প্রতি যেতেছি কাঞ্চী-অধিপতি-জয়ে।
বড় তার গর্ব্ব, খর্ব্ব করণ-আশয়ে॥
পশ্চাতে আসিছে বহুতর সৈন্যদল।
হাতী ঘোড়া রথ পদাতিক মহাবল॥
যাইতেছি দুই ভাই সকলের আগে।
এখানে বিলম্ব তব নব অনুরাগে॥"
তাহা শুনি গোপী কহে কৃতকৃত্য হয়ে।
"নাহিক ভাজন হেথা, কিসে দিব লয়ে?
কাহাকে বা আগে দিব, বল হে গোঁসাই।
অধীনীর ঘরে চল, হেথা স্থান নাই॥"
অগ্রজ বলেন, "চিন্তা কিসের কারণ।
যাতে দিবে, তাহাতেই করিব গ্রহণ॥
আমাদের অনাচার সদাচার নাই।
যেখানেতে যাহা পাই তাহা খেয়ে যাই॥
আন, আন, দধি দুগ্ধ আর উপহার।
ভাণ্ড থেকে দুই ভেয়ে করিব আহার॥
পশ্চাতে খাইব আমি অন্যথা না কর।
ছোট ভেয়ে দেহ নবনীত ক্ষীর সর॥"
কৃষ্ণ রাজপুত কন "ইহা যে অনিষ্ট।
জ্যেষ্ঠে রাখি কেমনেতে খাইবে কনিষ্ঠ?
আপনি খাউন আগে, আমি খাব পরে।"
কতক্ষণ কথার কলনা পরস্পরে॥
মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া গোপের কামিনী।
সিতাসিত মেঘমাঝে যেন সৌদামিনী॥
কালিয় পুরুষ প্রতি মন মজে ছিল।
"তুমি আগে খাও", বলি বাড়াইয়া দিল॥
অগ্রজের বাক্য পুন না করি লঙ্ঘন।
অগ্রে কৃষ্ণ অশ্বারোহী করেন ভোজন॥
পরশিছে গোপবালা আনন্দে বিভোলা!
কর উত্তোলনে উভ স্তনুর চোলা॥
শ্রীমুখের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রয়।
ধ্যান, জ্ঞান, মন, প্রাণ করিল বিক্রয়॥

সামালিতে না পারিল, লজ্জা গেল দূরে।
পুলকিল তনুরুহ প্রণয়-অঙ্কুরে॥
করে কর পরশে, হরষে মুগ্ধ মন।
মহীতলে পড়ে ক্ষীর তেজিয়া ভাজন॥
নিরখিয়ে স্মিতানন কালিয় তুরঙ্গী।
ভাবগ্রাহী ভাবে বশ, হেরি ভাবভঙ্গী॥
কহিছেন, "ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়াছে দূর।
অগ্রজেরে দধি দুগ্ধ দেহ গো প্রচুর॥"
তাহা শুনি আভীরিণী সানন্দ-অন্তরে।
শ্বেত রাউতের করে গব্য দান করে॥
উদ্ধব, অক্রূর নাম সহিস দুজন।
জল দিল মুখ হস্ত শোধন কারণ॥
অনন্তর দুই ভাই প্রফুল্ল-অন্তর।
অশ্ব-চালনায় হইলেন অগ্রসর॥
গোপালিনী ভুলে গেল স্বজনে ভবনে।
ইহাদের সঙ্গে যাব, ভাবে মনে মনে॥
কহে, "ঘরে বরে আর কিবা প্রয়োজন?
নবীন কিশোর কৃষ্ণে অর্পিয়াছি মন।"
ছল করি দুই ভেয়ে কহে রসময়ী।
"দই খেয়ে চলে যাও, কড়ী দিলে কই॥"
কৃষ্ণ কন, "আমাদের সঙ্গে কড়ী নাই।
ধন-জন পিছে রেখে এসেছি দুভাই॥"
গোপী কহে, "তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব।
সংযোগ হইলে পরে কড়ী বুঝে পাব॥"
উত্তরে কহেন কৃষ্ণ, "কত দূরে যাবে?
দৌড়িয়া ঘোড়ার সঙ্গে মহা কষ্ট পাবে॥"
মাণিকা কহিছে, "দেব! এ ত বড় রঙ্গ।
কড়িও দিবে না, আর, নাহি লবে সঙ্গ॥
কি করিব বল প্রভু! ঘরে ফিরে গিয়ে।
বিনি মূলে যাও দোঁহে দুধ দই পিয়ে॥"
কালিয় কহেন, "শুন শুন গো মাণিকি!
খেলে কড়ী দিতে হয়, এ কথা জানি কি!
কি করিব এখন, লাগিল বড় ধাঁধা।
যাহা কহ তোর কাছে রেখে যাব বাঁধা॥"
সে কথা শুনিয়া ভুঁই ছুঁয়ে গোপাঙ্গনা।
ছি! ছি! কহে বার বার কাটিয়ে রসনা॥
কহে "প্রভু! মোর চেয়ে অধম কে আছে?
দ্রব্য দিয়ে বাঁধা লব তোমাদের কাছে॥

যায় যাক্ ঘর দ্বার যায় যাক্ ধন।
সঙ্গে লহ চিরকাল সে বব চরণ॥"
পুনরায় কহিতেছে, হাসিয়ে হাসিয়ে।
"কেমন তোমার যাওয়া, কড়ী নাহি দিয়ে?
সাধু হয়ে কেমনেতে ঘরে ফিরে যাব।
কে দিবে আমার কড়ী, কেমনেতে পাব?"
কহিছেন বড় ভাই, "কেন কর ক্রোধ।
বাঁধা দিয়ে ঋণ তব করি পরিশোধ॥
বন্ধক রাখহ এই রতন-অঙ্গুরী।
পশ্চাতে সামন্ত সৈন্য আসিতেছে ভূরি॥
সেনার নায়ক-হস্তে এ অঙ্গুরী দিও।
যত ইচ্ছা হয় দধি দুগ্ধ মূল্য নিও॥"
সায় দিল গোপবালা সে কথা শ্রবণে।
প্রসারিল পদ্মপাণি মুদ্রিকা-গ্রহণে॥
অপূর্ব্ব অঙ্গুরী অষ্ট রত্নে বিজড়িত।
অনামিকা হ'তে বীর খুলিয়া ত্বরিত॥
ব্রহ্মজাতি হীরক জ্বলিছে মধ্যভাগে।
গোপিকারে অর্পণ করেন অনুরাগে॥
কথায় কথায় তথা দুই বীরবর।
মুহূর্ত্তেকে হইলেন নেত্র-অগোচর॥
অঙ্গুরী লইয়া গোপী রহে দাঁড়াইয়া।
স্বপন সমান, মনে ভাবে, সব ক্রিয়া॥'

হেথা শুন সমাচার তার অনন্তর।
সমর-যাত্রায় বহির্গত নৃপবর॥
কর্ণাটের রাজধানী কাঞ্চী-পরাজয়ে।
সমবেত অগণিত নানা সৈন্যচয়ে।
পাটজোষী * যোগ লগ্ন দেখিয়া আকুল।
দক্ষিণ-যাত্রায় গ্রহ নহে অনুকূল॥
রাজা কন "যোগ লগ্ন কিছুই না মানি।
যোগ যোগেশ্বর মম প্রভু চক্রপাণি॥
তাঁর আজ্ঞা মানি যিনি গ্রহগণ-স্বামী।
এখনি বিজয় যাত্রা করিব হে আমি॥"

* পট্টজ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ—যদিও এই উপাধি হিন্দু রাজাদিগের সময়ে রাজকীয় জ্যোতিষীর সম্পত্তি ছিল,—কিন্তু এক্ষণে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ তদুপাধি এবং রায়-গুরু প্রভৃতি মহামহোপাধি সকল ধারণ করে।

নানা বল সৈন্যদল অপ্রমেয় সাজে।
অস্ত্রের ছটায় দিনমণি ম্লান লাজে॥
বলদ, তুরঙ্গ, উট, হাতী সারি সারি।
শকটে সম্ভার কত যায় ভারী ভারী॥
অনেক অগ্ন্যস্ত্র জম্ভ-নল গোলাগুলী।
পদাতিগণের অঙ্গে মাখা রঙ্গ-ধূলি॥
শিরস্ত্রাণ-বর্ম-চর্ম্মে সজ্জিত সকলে।
রণমদে মাতোয়াল, টেড়া ভাবে চলে॥
ধনুর্ব্বাণধারী চলে হাজারে হাজার।
দোকানী পসারী চলে লইয়া বাজার॥
চলে অশ্বারোহী কিবা গতির ঠমক্।
শূলকী বল্লম করে, করে চক্‌মক্।
চলে অগণিত ঢাল-তরবালধারী।
চলে মল্ল থেকে থেকে উল্লম্ফন মারি॥
চলে গদা ঘুরাইয়া কত দলবল।
চলিল বিস্তর হস্তে সর্বল কেবল॥
রাজ-অগ্রভাগে-রাজ-হস্তির প্রয়াণ।
বিষ্ণুচক্রে বিচিত্রিত লইয়া নিশান॥
উটের উপরে বাজে দামামা টিকারা।
ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাকারা॥
হস্তির গলায় ঘণ্টা বাজে টন্ ঠন্॥
পদাতির জয়ধ্বনি সিন্ধুর গর্জ্জন।
জগন্নাথ দর্শনের নাহিক সময়।
দক্ষিণ প্রাচীর তেজি অগ্রসর হয়॥
মনে মনে ইষ্টদেবে নমে যুড়ি হাত।
শ্রীদুর্গা মাধব * পদে করে প্রণিপাত॥
নীলচক্র † প্রতি চাহি কহে নরপতি।
"কর্ণাটের জয়ে, দীনে দেহ অনুমতি॥
প্রথমে সে যুদ্ধে যাহা হস্তগত হবে।
তোমার মণ্ডনে চক্র! ব্যয় তাহা হবে॥"
কটকের পদভরে কাঁপিতেছে ক্ষিতি।
চলিলেন গজপতি নাহি মাত্র ভীতি॥
অতি বেগে যায় রায় শূন্যপথে চায়।
মাংস-মুখে গৃধ্র এক দেখে উড়ে যায়॥

* পুরীর দক্ষিণ প্রাচীরান্তে এই দুই প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি আছেন।

† জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়াস্থিত বিষ্ণুচক্র।

তাহা দেখি অনেকের বিরস অন্তর।
মনে ভাবে এ শকুন অশুভ-আকর ॥
রাজা কন, "প্রভুর আদেশ মাত্র সার।
এ শকুন অশকুন, মানি সব ছার ॥"
শ্যামল ধবল অশ্বারোহী দুইজন।
দুই ক্রোশ অগ্রে অগ্রে করেন গমন ॥
মাণিক গোপিনী হস্তে অঙ্গুরী লইয়া।
চঞ্চলা হইয়া আছে পথে দাঁড়াইয়া ॥
কৃষ্ণ রাজপুতে স্মরি, অস্থির অন্তর।
যুগল নয়নে অশ্রু ঝরে নিরন্তর ॥
কহে, "কোথা গেল মোর নবীন কিশোর?
আহা মোর সুখনিশি প্রদোষেতে ভোর ॥
আর কি পাইব দেখা শ্যামল ত্রিভঙ্গে?
এই ছার পামরীকে না নিলেন সঙ্গে ॥
অধম গোয়ালা-বলে আমার জনম।
ছার বুদ্ধি, কি বুঝিব মহৎ-মরম ॥
দধি ভাণ্ড বিকাইয়া চাহিলাম দাম।
তাই কি করিয়া কোপ গেল গুণধাম?
শ্রীহস্ত-অঙ্গুরী খুলি দিয়ে গেল বাঁধা।
আমার যে মন সে চরণে গেছে বাঁধা ॥"
এইরূপে মাণিকা করিছে কাল-পাত।
অপরূপ ভাব-ভাণ্ড প্রভাতে প্রভাত ॥
যদবধি হেরিল সে পুরুষ-রতনে।
সকলেই তুচ্ছ বোধ হয় তার মনে ॥
ভাস্করে খদ্যোত ভাবে, সাগরে গোষ্পদ।
মেরু-মৃৎপিণ্ড, তৃণ কুবের-সম্পদ ॥
অমূল্য পদার্থ প্রেম, মূল্য কিবা তার?
যে জেনেছে এ সংসার তার কাছে ছার ॥
প্রেম ধর্ম্ম, সার ধর্ম্ম, প্রেম-সুখ সার।
প্রেমময় এ জগৎ সন্দেহ কি আর?
ভাবিনী এ ভাবে আছে এমন সময়।
সসৈন্যেতে নরনাথ হইলা উদয় ॥
রাউত * মাহুত দূত আরো সৈন্যগণ।
মাণিকারে নিরখিয়ে বিমোহিত মন ॥
যে দেখে, তাহার আর চরণ না চলে।
চিত্র-পুতুলের প্রায় হইল সকলে ॥
ভিড় দেখি জিজ্ঞাসা করেন নরপতি।
"স্থগিত হইল কেন কটকের গতি?"
অনুচর কহে, "অবধান মহীপাল!
অপূর্ব্ব নারীর রূপে রাজপথ আল ॥
গোয়ালিনী হবে হেন আকার প্রকার।
মস্তক-উপরে আছে গোরস-সম্ভার ॥
রম্ভা তিলোত্তমা কিবা মেনকা উর্ব্বশী।
'রাউত' 'রাউত' বলি ফুকরে রূপসী।"
শুনিয়া স্থগিত তথা হইলা ভূপতি।
"কোথায়, কোথায়?" বলি যান শীঘ্রগতি ॥
দেখেন সুন্দরী এক মুনি-মনোলোভা।
লাবণ্য-লহরী কিবা অবতীর্ণ শোভা ॥
নরবরে হেরি কহে গোয়ালার মেয়ে।
"হেথা আমি আছি শুধু তব পথ চেয়ে।"
রাজা কন, "কি বলিবে বল ত আমায়।"
মাণিকা কহিছে, "তবে শুন মহাকায় ॥

* রাজপুত শব্দের অপভ্রংশ, যদিও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুতেরাই এই উপাধি ধারণ করেন, কিন্তু উৎকলে কচুৎপাদক এক জাতি শূদ্র যেমন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া 'হলিয়া ব্রাহ্মণ' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ চাষা-খণ্ডাইতেরা ক্ষত্রিয়াভিমান-সুখ বলাৎকার করিয়া রাউত নামে পরিচয় দেয়, ইহাদিগের মধ্যে ও কোন কোন শ্রেণী গলদেশে সূত্র ধারণ করে, অনার্য্য দেশে আর্য্যদিগের সভ্যতা প্রচারিত হইলে, এইরূপ কৃত্রিম দ্বিজত্ব ধারণ করা একটি পুরাতনী প্রথা,—ভারতবর্ষের বহুতর প্রদেশে ইহা দ্রষ্টব্য,—উড়িষ্যায় যাহারা রাজাদিগের দ্বারাখণ্ডা বহনে অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত হইত, তাহারাই খণ্ডায়িত ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমান করে,—যাহারা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রহিল, তাহারা অদ্যাপি আপনা-দিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। ফলতঃ উভয়েই আদিম শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য জাতির অবশিষ্ট সন্ততি। খণ্ডায়িতেরা ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান করুক, কিন্তু চাষা অর্থাৎ শূদ্রদিগের সহিত তাহা-দিগের বিবাহাদি অবাধে চলিতেছে,—এমন কি, উৎকলে কারণাভিমানী কোন কোন মাহান্তিরাও তাহাদিগের সহিত করণকারণ করে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং বঙ্গ প্রদেশের কায়স্থদিগের ন্যায় তাহারা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে।

শ্যামল ধবল বর্ণ বীর দুইজন।
শ্যামল ধবল দুই অশ্বে আরোহণ॥
আমার পসরা হ'তে দধি-দুগ্ধ খেয়ে।
কড়ী নাহি দিয়ে চলি গেল দুই ভেয়ে॥
কড়ী পাইবারে কত করিনু আক্তী।
শেষে বাঁধা দিয়ে গেল একটী আঙ্গুটী॥
কহিল, "সামন্ত সৈন্য আসিতেছে পিছে।
সেই সঙ্গে এক জন রাউত আসিছে॥
তাহার নিকটে অঙ্গুরীটী দেখাইও।
যে কিছু তোমার মূল্য সব বুঝে নিও॥
আর এক কথা শুন সাবধান হয়ে।
কহিবে, দুভাই গেল কর্ণাট-বিজয়ে॥"
এত বলি গোপাঙ্গনা বস্ত্র-গ্রন্থি খোলে।
নামিলেন রাজা তথা ত্যজি চতুর্দ্দোলে॥
মুদ্রিকা অঞ্চল হ'তে করিতে বাহির।
জ্বলিতে লাগিল যেন দ্বিতীয় মিহির॥
নিরখিয়ে নৃপতির চিত চমকিত।
ছটায় ছাইল আঁখি, চকিত স্থগিত॥
অষ্ট-রত্নে বিজড়িত, যুক্ত সুলক্ষণে।
ভাবে হেন অঙ্গুরীয় দেখিনি নয়নে॥
অঙ্গুরী লইয়ে করে, কন নৃপমণি।
"তোর চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে রমণী?
যাঁহাদের শ্রীচরণ সেবনে কমলা!
চঞ্চলা প্রকৃতি তেজি হ'লেন অচলা॥
যাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে দেবতার তরে।
লবণ-সাগরোদরে অমৃত সঞ্চরে॥
যাঁহাদের অধিবাস অসীম উদধি!
সেই দুই ভাই তোর ভুঞ্জিলেন দধি॥"
তাহা শুনি উতরোল হ'ল সৈন্যগণ।
মাণিকার চরণে প্রণত সর্ব্বজন॥
নৃপ কন, "আমার পুণ্যের নাহি ওর।
বহু ভাগ্যে পাইলাম দরশন তোর॥
লক্ষ্মী, সরস্বতী কিবা হবে রাধারাণী।
কলিকালে অবতীর্ণা তুমি উপেন্দ্রাণী॥
কি ইচ্ছা তোমার দেবি! কর অনুমতি।
কিসে বা প্রসন্ন তুমি হবে মম প্রতি?"
এরূপে করেন রাজা বিহিত সম্মান।
কনক বরষি শিরে করাইলা স্নান॥

মাণিকা কহিছে, "দেব, মাগিব কি আর?
কৃষ্ণ রাউতের পদে মানস আমার॥
অন্য ধনে আমার বাসনা কিছু নাই।
এই কর অন্তে যেন সে চরণ পাই॥
আর সেই কৃষ্ণ রাউতের প্রতিকাম।
এই স্থানে বসাইয়ে দেহ এক গ্রাম॥"
রাজা কন, "যে ইচ্ছা তোমার ভাগ্যবতি!
সীমা নির্দ্ধারণ তরে কর তুমি গতি॥
যতদূর বেড়ি তুমি করিবে গমন।
ততদূর ভূমি আমি করিব অর্পণ।
মাণিকপত্তন বলি হবে তার নাম।
অনুদিন তব বংশে রবে এই গ্রাম॥
রাজস্ব-বিরহে তুমি কর অধিকার।"
এত বলি, করিলেন বহু পুরস্কার॥
অদ্যাপিও সেই গ্রাম আছে বিদ্যমান।
মাণিকপত্তন নাম যশের নিধান॥
ইতি মাণিক-গোপালিনী নাম
চতুর্থ সর্গ। সমাপ্ত

পঞ্চম সর্গ

যুদ্ধ-যাত্রা

চলিলেন নৃপ সুখে, বিবরিত ভাট-মুখে,
নদ নদী শিখর নগর।
চিল্‌কা হইলা পার, মাঝে মাঝে অবতার,
নীলমণি আভাত সাগর॥
দেখা যায় কতদূর, ব্রহ্মপুর ইচ্ছাপুর,
ঋষিকুল্যা, নদী বংশীধারা।
শ্রীকঙ্কালী * শ্রীনিধান, সতীর কঙ্কালী-স্থান,
যথা জয়দুর্গারূপ তারা॥
দেখ, দেখ, মহাকায়, আগে অই দেখা যায়,
কলিঙ্গ-পত্তন হে নরেশ।

* শ্রীকাকোল;—কালে কালে স্থানাদির নাম কি রূপান্তর হইয়া যায়! এই স্থলে দাক্ষ্যায়ণীর কঙ্কালী পতিত হইয়াছিল, এমত প্রবাদ।

পূর্ব্বে নরপতিগণ, হেথা থাকি সুশাসন,
করিতেন এ কলিঙ্গ দেশ ॥
হেথা হ'তে বৈশ্যগণ, করি তরি-আরোহণ,
যবদ্বীপে * করিয়া গমন।
বসতি স্থাপন করে, হিন্দু যশোরত্নাকরে,
এই এক উজ্জ্বল রতন ॥
অই দেখ হে ঠাকুর, বিমল-পত্তনপুর,
আর বিশাখা-পত্তন ধাম।
নানা স্থান অভিরাম, কত আর লব নাম,
দুই দিকে শত শত গ্রাম ॥
হইলে গো অবতরী, গোদাবরী † নাম ধরি,
দক্ষিণ দেশেতে সুরধুনী।
মধুর সলিলযুতা, ব্রহ্মাচলে সমুদ্ভূতা,
পিতা তব শতানন্দ মুনি ॥
পশ্চিম-পয়োধি তীরে, ত্র্যম্বক পর্ব্বত-শিরে,
করিয়াছ পূর্ব্বার্ণবে গতি।
যেখানেতে জন্ম তব, কি তার মহিমা কব,
যত্র তত্র দেবের বসতি ॥
এত উচ্চ গিরিকূট, জলদের দন্তস্ফুট,
সেইখানে কদাচ না হয়।
বিমল তুষার-ধার, দ্রব হয়ে অনিবার,
তব চারু তনু নিরময় ॥
কি কব তোমার বল, ভেদিয়া মহেন্দ্রাচল,
আলিঙ্গন দেহ রত্নাকরে!
বেণ-গঙ্গা ইন্দ্রাবতী, আদি কত স্রোতস্বতী,
সম্মিলিত তব কলেবরে।
দুই তটে সুশোভন নিবিড় অরণ্যগণ,
শাকদ্রুমে ‡ অপরূপ শোভা।
পুণ্যভূমি-কটিতটে, গোত্ররূপে কি প্রকটে,
মরকতময়ী মনোলোভা ॥
তব তটে গুণধাম, বন বিহরিলা রাম,
পঞ্চবটী প্রসিদ্ধ কাননে।
সঙ্গে সতী পতিব্রতা, জানকী কানকীলতা,
নিরুপমা এ তিন ভুবনে ॥
সূর্পণখা নিশাচরী, এসেছিল মায়া ধরি,
লক্ষ্মণ করিলা অপমান।
ভগিনীর অপমানে, দশানন এইস্থানে,
সীতা হরি করিল প্রস্থান ॥
তব তীরে রঘুবীর, শোকে অবনত-শির,
বিচেতন বনিতা-বিচ্ছেদে।
তোমার প্রবাহে কত, অশ্রুধারা অবিরত,
বিসর্জ্জন করিলেন খেদে ॥
তবোৎপত্তি-সন্নিধান, পবিত্র সুগন্ধা স্থান,
সুবিখ্যাত নাসিক নগর।*
সতীনাসা সেই ধামে, অর্চ্চিতা সুনন্দা-নামে,
ভৈরব ত্র্যম্বক মহেশ্বর ॥
আর বিষ্ণুচক্রঘাতে, দাক্ষায়ণী-গণ্ডপাতে,
তব তীরে দেবী বিশ্বমাতা।
বিশ্বেশ ভৈরব তাঁর, অন্য গণ্ড অবতার,
রাকিণী দেবতা অভিজাতা ॥
কমলার নিবসতি, কত পুরী ধনবতী,
তব দুই তটে শোভাকরী।
ধনে যশে গরীয়ান, নরসিংহপুর স্থান,
আর রাজ-মাহেন্দ্রী নগরী ॥
এই নরসিংহপুর, অধিপ বিজয় শূর,
সিংহ মধ্যে সিংহ যারে বলে।
রাবণ রাজার ধাম, দ্বীপরত্ন লঙ্কা নাম,
বিজয় বিজয় করে বলে ॥
কিবা বীর্য্য অনুপম, দ্বিতীয় রাঘব সম,
কলিতে কলিত গুণধাম।
রাক্ষসের দর্প চূর, লঙ্কা নাম করি দূর,
সিংহল থুইলা তার নাম ॥

* জাবা।—হিন্দুজাতিকে কূপমণ্ডূক বলিয়া ভিন্ন দেশীয় লোকেরা গ্লানি করেন; কিন্তু অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, জাবা প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুরাই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

† দক্ষিণ দেশে গোদাবরীই গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে "সান গঙ্গ" অর্থাৎ ছোট গঙ্গা কহে। গো শব্দে জল, দা শব্দে দায়িনী, বরী শব্দে প্রধানা, অর্থাৎ জলদায়িনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

‡ শাগুয়ান বা শেগুন বৃক্ষ।

* কেহ কেহ কহেন, সূর্পণখার নাসাচ্ছেদ হওয়াতে এই স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে; কেহ বা কহেন, সতীর নাসা এই স্থানে পতিত হওয়াতে নাসিক নামের উৎপত্তি।

তব গর্ভে নাকি ধাতা, চোরগঙ্গ * জন্মদাতা
গঙ্গাবংশ তাহাতে উদয় ?
তুমি রাজকুলেশ্বরি ! চরণে প্রণাম করি,
হয় যেন রাজার বিজয় ॥
অই দেখ শোভাধার, নিবিড় নীরদাকার,
শ্রেণীবদ্ধ মহেন্দ্র-অচল ।
কুলগিরি বলি গণ্য, মহাকবি † গীতে ধন্য,
নগকুলে কিবা আখণ্ডল ॥
তোমার কুটুম্বদল, সহ্যাচল বিন্ধ্যাচল,
চন্দনের আলয় মলয় ।
হৃদয়েতে অলঙ্কার, কিবা হীরকের হার,
গোদাবরী নিয়ত খেলয় ॥
সত্য কি হে গুণগ্রাম, রাজা হেমাঙ্গদ নাম,
ছিলেন তোমার অধীশ্বর ?
সত্য কি সে নৃপবর, রঘুরে দিলেন কর,
নত হয়ে যুড়ি দুই কর ?
তাঁর নাকি সৈন্যগণ, পথ-শ্রান্তি-নিবারণ,
করণার্থে তোমারে ভূধর ?
আপান কল্পনা করি, পর্ণে পর্ণে মদ ভরি,
পান করি লসিত অন্তর ?

তোমার কন্দরময়, দেব-পুষ্প * গন্ধ বয়,
তাহাতে মোহিত হয় চিত ।
দ্বীপান্তরে ফুটে ফুল, সমীরণ অনুকূল,
সুরভি সুধীরে প্রবাহিত ॥
কিবা চারু চিত্রপট, তব তট সিন্ধুতট,
পরস্পর মিলিত যথায় ।
কি বিচিত্র তালবন, সুশোভন ঘন ঘন,
কিবা ঘন নেমেছে তথায় ॥
সুরঙ্গ কুরঙ্গ † পুরী, যেখানে বাণিজ্য ভূরি,
তথা মীন-পত্তন নগর ।
নিবসে বণিকৃগণ, ধনবান্ মহাজন,
পোতপুঞ্জ-পূর্ণিত বন্দর ॥
যত্র তন্তুবায়গণ, সুচিকণ সুবসন‡,
বয়নেতে বিখ্যাত বিশেষে ।
নানারঙ্গে সুরঞ্জিত, ইন্দ্রধনু বিগঞ্জিত,
ছিট নামে খ্যাত সর্ব্বদেশে ॥
দলিত কজ্জল ভাতি, কিবা মরকত পাতি,
কল্লোলিনী কৃষ্ণা গুণবতী ।
গুণের কে দিবে সীমা, তোমার নন্দিনী ভীমা,
ঘাট-পর্ব্বা তুঙ্গভদ্রা সতী ॥
তব তটে নানা স্থলে, হীরকের খনি জলে,
কলুর কলকুণ্ড †† কুণ্ডবারে ।
কত তরু পরিপাটী, রাচক কি বৃক্ষবাটী,
অপরূপ শোভা তব তীরে ॥
সঙ্গিনী বরুণা নামা**, তিনিও বিচিত্র শ্যামা,
প্রেমভরে আলিঙ্গিত দোঁহে ।
অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাব, অহরহ আবির্ভাব,
নহে কি বিষ্ণুর মন মোহে ?

* প্রধান প্রধান রাজকুলের আদিপুরুষগণ স্বয়ং অথবা স্তাবকদিগের দ্বারা আপনাদিগের স্বর্গীয়াভিজাত্য কল্পনায় ত্রুটি রাখেন নাই। রোম-প্রতিষ্ঠাতা রোমুলস কুমারীগর্ভে দেব-বিশেষের ঔরসে জাত, জগজ্জয়ী আলেক্‌সন্দর দেবরাজের পুত্র, লঙ্কাবিজয়ী রঘুকুলতিলক রাম দেবোদ্দেশে প্রদত্ত চরুতে সম্ভূত, বঙ্গদেশের এক প্রসিদ্ধ রাজা ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র, সেইরূপ উৎকলদেশীয় গঙ্গাবংশীয় নৃপতিদিগের আদিপুরুষ চোরগঙ্গ অথবা চুড়ঙ্গ ব্রহ্মার ঔরসে গোদাবরী নদীর গর্ভজাত। অলৌকিক পুরুষ হইলে একটি আলৌকিক পিতা আবশ্যক হয়, তাহাতে মাতার পাতিব্রত্য থাকুক বা না থাকুক। মনুষ্য জাতির কি অভিমান, বিশেষতঃ পুরুষ জাতির কি আত্মম্ভরিতা পরম দেবতা মাতাকে অসতী করিয়াও আপনাদিগের দৈববীর্য্যের সংস্থান করিতে হইবে।

† কালিদাস।

* লবঙ্গ।

† বর্ত্তমান ইংরেজী অপভ্রংশ নাম করিঙ্গা।

‡ মছলীপাটম বা মছলীবন্দরে ছিট-বস্ত্রের প্রথম সৃষ্টি, এমত প্রবাদ আছে। তদ্ভিন্ন বুক্ মসলিনেরও এই নগরে প্রথম সৃষ্টি।

†† ইংরাজী অপভ্রংশ গলকণ্ডা।

** কৃষ্ণা, বরুণা এবং কাবেরী বিষ্ণুর প্রেয়সীরূপে দক্ষিণে মাননীয়া, ইহাঁদিগের পরিণয় উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে বর্ষাসময়ে এক মহোৎসব হইয়া থাকে।

জনমিয়া সহ্য-কেশে, প্রবেশি বিদুর দেশে,
দ্রুতগতি ভাগীরথী প্রায় ॥
তরল তরঙ্গে রঙ্গে, প্রণয়-প্রফুল্ল-অঙ্গে,
প্রবেশিছ পয়োধির কায় ॥
কৃষ্ণা-অন্তে কত দেশ, কি বর্ণিব সবিশেষ,
গোগুলোক অন্তগোল আদি।
তৈলঙ্গ তামল লাটী, কেহ কহে মারহাটী,
একদেশে নানা ভাষাবাদী।
অই প্রবাহিতা সতী, তৈলপর্ণী * স্রোতস্বতী,
পাণ্ডুদেশ করিছ পাবন।
কত চন্দনের বন, তব তটে সুশোভন,
অগুরু কালীয় কুচন্দন ॥
সৌরভের খনি এলা, উপবনে করে খেলা,
দারুচিনি তরুর সহিত।
প্রদোষে তোমার তীরে, মলয়-সমীরে ধীরে,
স্বরঙ্গে মানস মোহিত ॥
বহুমূল্য মুক্তাময়, বিলসিত শুক্তিচয়,
তরঙ্গিণি! তোমার সঙ্গমে।
বিলাস-সুখের সার, তব দেহে অলঙ্কার,
বিধি কি ভূষিলা যথাক্রমে?
চোলমণ্ডলের পাট, অই হৃদ পুলিকাট,
নেলুর প্রভৃত কত পুর।
কর্ণাটের অধিকার, চারিদিগে সুবিস্তার,
কাঞ্চীপুর নহে বড দূর ॥
শ্রীনাথের পদ সেব, শ্রীকৃপণী তুমি দেবি।
বরনদী কর্ণাটে কাবেরী ॥
প্রাবৃট্ প্রারম্ভে তব, পরিণয়-মহোৎসব,
যত্র তত্র বাজে তূরী ভেরী ॥
শ্রীরঙ্গপত্তন নাম, শ্রীরঙ্গনাথের ধাম,
তব কূলে শোভা নিরুপম।
দেবের দুর্লভ স্থানে, দেবীকোট-সন্নিধানে,
করিয়াছে সাগর-সঙ্গম ॥
কেরলে উদ্ভব তব, সে দেশের রীতি সব,
শুনিয়াছি বিচিত্র বিচল।
স্বৈরিণী নাএর নারী, যেন নিম্নগার বারি,
পরিণয়-বন্ধন বিফল ॥

* আধুনিক নাম পানেয়ার।

কেরলীর কেশপাশ*, নাকি অতনুর বাস,
চমরী-চমূর গর্ব্ব হরে।
লাবণ্য-প্রসূন-ডালা, নাকি সব দ্বিজবালা,
কমলার রূপগুণ ধরে?
পরিহিত চিত্রবাস, রবি-ছবি পরকাশ,
তনুরুচি চন্দনে চর্চ্চিত।
সেই দেশ ধন্য হয়, যেই দেশে নারীচয়,
সদাকাল আদরে অর্চ্চিত।
দেখ! দেবীকোটপুর, শিবজ্বর-দর্প চুর,
যেখানে করিল বিষ্ণুজ্বর।
এই সেই উমাবন, বাণরাজ-নিকেতন,
পুরাখ্যাত কোটিভী নগর ॥

* ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় অঙ্গনাগণ যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ প্রতিভায় প্রতিভাত, তাহা নিম্নলিখিত কবিতার পরিচয় দিতেছে।—

"বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনক-জনপদ-স্থায়িনীনাং কটাক্ষে। দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিত-জঘনেচোৎকল-প্রেয়সীনাম্॥ তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজল-ঘন রুচৌ কেরলী-কেশপাশে। কর্ণাটীনাং কটৌচ স্ফুরতি রতিপতিগুর্জ্জরীণাং স্তনেষু॥"

"বোধ হয়, নানাকুসুমকেলিপরায়ণ এই কবি-মধুপ কাশ্মীর, অযোধ্যা, মালব এবং সিংহলে ভ্রমণ করেন নাই, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ভাবিনীদিগের প্রকৃত রূপমহিমার পরাকাষ্ঠা দর্শন করিতে পারিতেন। আমি পূর্ব্বে কোন মৃত মিত্র কবিকে উক্ত কবিতার অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা স্মরণ নাই, অতএব দ্বিতীয়বার অনুবাদ করিলাম, যথা—

মধুপুর-বধূকুল মধুর বচনে।
বিদেহবাসিনী বালা চঞ্চলনয়নে ॥
বঙ্গীয় অঙ্গনাগণ সুচারু দশনে।
উৎকলীয় বামাদের ললিত জঘনে ॥
তৈলঙ্গী চার্ব্বাঙ্গীচয়-নিতম্ব শোভনে।
কেরলীর কেশপাশ ঘন নবঘনে ॥
কর্ণাটীর কটি আর গুর্জ্জরীর স্তনে।
রতিপতি বাস দেন সদা সুখী মনে ॥

যত্র ভাবিনীর ভূষা, রূপ প্রভাতের উষা,
তুষার বিমলার উষা সতী ॥
স্বপনে * যামিনীভাগে, হেরিলেন অনুরাগে,
চিত্তচোর অনিরুদ্ধ পতি ॥

* এইরূপ স্বপ্নযোগে দম্পতিদিগের প্রথম সন্দর্শন নানা দেশীয় কবিগণের এক বিচিত্র কল্পনা। আরব্য, পারস্য, চীন এবং ভারতবর্ষীয় বহুতর কবি এই মনোজ্ঞ মানসিক উদ্ভাবনা বা বিভাবনা বর্ণনে ত্রুটি রাখেন নাই। ইংলণ্ডীয় কবিকুল তলক লর্ড বায়রণ স্বপ্নাভিধেয় কবিতায় প্রেমাভিনয়ের প্রথমাঙ্কবর্ণনে কি প্রগাঢ় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আমি তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আখ্যায়িকা সঙ্গীতচ্ছলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্বপ্নান্তে উষার উক্তি

(রাগিণী বিভাস। তাল ঠুংরী)

স্বপনে হেরিনু যাহারে,
আরে আরে সখি দে রে তারে।
চিত্তচোর যামিনী শেষ কালে
প্রবেশিল হৃদয়-মাঝারে !
সরস পরশমণি পুরুষ রতন,
অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরি দিল দরশন,
তুলনা নাহিক তার এ তিন সংসারে !
আমি তারে আঁখি ঠারি হেরিবার আশে
যেমন নয়ন মেলি নিরখিনু পাশে,
অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে ॥

পৌরাণিক আখ্যায়িকাসকলের ঘটনাস্থল পাইয়া অধুনা মহাবিবাদ উপস্থিত, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তের সীমার বহির্ভূত অনার্য্য দেশে এই বিবাদের আতিশয্য দেখা যায়। যথা—দিনাজপুর-অঞ্চলীয় লোকেরা আপনাদিগের দেশকে মহাভারতীয় বিরাটদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। বাস্তবিক বিরাটদেশ যে আধুনিক বিরাড প্রদেশ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জাবাদ্বীপের লোকেরা কহে, মহাভারতে এবং রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাসকল তাহাদিগের ক্ষুদ্র উপদ্বীপে সংঘটিত হইয়াছিল। সেইরূপ বালেশ্বরবাসীরা

অনিরুদ্ধ সেইক্ষণ, স্বপ্নে করে নিরীক্ষণ,
সংমিলন বাণসুতা সহ।
নিদ্রাভঙ্গে ততুভয়, উৎকলিত অতিশয়,
চিন্তায় চঞ্চল অহরহ ॥
চিত্রলেখা একে একে, সুপুরুষ চিত্র লেখে,
নিজ নাথে তাহে উষা চিনে।
মন্ত্রিসুতা অনন্তরে শূন্যপথে মন্ত্রভরে,
অনিরুদ্ধে আনে কত দিনে ॥
চরিতার্থ বিধুমুখী, অন্তরে অনন্ত সুখী,
বাণরাজা পাইল সন্ধান।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র শুনে, দগ্ধদেহ ক্রোধাগুণে,
কারাগারে দিল তারে বাণ ॥
হায় রে ভবের খেলা ! সাগরে রম্ভার ভেলা,
দেখিতে দেখিতে মগ্ন হয়।

কহে, তাহাদিগের নগরের আদ্যনাম বাণেশ্বর, বালেশ্বর তাহার অপভ্রংশ মাত্র। বানেশ্বর বাণ রাজার স্থাপিত শিবলিঙ্গ, তন্নামধেয় শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। বাণপুরীর অন্য নাম শোণিতপুর, অধুনা শুনহাট নামক বালেশ্বরের পল্লীবিশেষ সেই শোণিতপুরের রূপান্তর। অপর,বালেশ্বরে উষাবমেড় এবং উষার প্রিয় সহচরী চিত্রলেখার পিতা বাণরাজার মন্ত্রীর বাসস্থান পাত্রপাড়া প্রভৃতি স্থান প্রদর্শিত হয়। পক্ষান্তরে, কর্ণাটের অন্তঃপাতী দেবীকোট-নিবাসীরা কহেন, দেবীকোটই বাণরাজার পুরী, সেইখানেই উষাহরণ হয়। দেবীকোটের সংস্কৃত নাম দেবীকোট্ট, দেবীকোটের অপরনাম কোটবীপুর, কোটবী বাণাসুরের মাতার নাম ইত্যাদি। পরন্তু উষাহরণ আখ্যায়িকা বেদে বর্ণিত প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক ঘটনাবর্ণনাত্মক একটি রূপক হইলেও হইতে পারে—অসুরেরা তমঃ হইতে উৎপন্ন, অতএব বাণাসুর সেই আদিম অন্ধকারের কল্পনা—সেই অন্ধকারেই উষা অর্থাৎ প্রভা বা দীপ্তির জন্ম এবং অন্ধকার কর্ত্তৃক উষা কারাবরুদ্ধ থাকেন—পশ্চাৎ কৃষ্ণ অর্থাৎ সূর্য্যজাত অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অবিরত অবারিত কিরণজাল আসিয়া উষার কারাবরোধ মোচন করিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন।

অস্থির ঐহিক প্রীতি, স্বপনের সম রীতি,
মিথ্যাময় কিছু সত্য নয় ॥"
চলিলেন গজপতি, মানমদে মত্তমতি,
কাঞ্চীপুর করিতে বিজয়।
অগণিত সৈন্যভটা, যেন জলধর-ঘটা,
বহুদূর ব্যাপী গরজয় ॥
সামন্ত-সিঙ্গার নাম, সেনাপতি গুণধাম,
প্রতাপে মিহির বীরবর।
পথে নরপতি কত, বিনা রণে অনুগত,
লালবন্দী-রূপে দিল কর ॥
যে করিল প্রতিরোধ, পাইল উচিত শোধ,
আচিরাৎ পাইল সংহার।
পরাভূত সৈন্যদল, সংযোগেতে বাড়ে বল,
সেনাসিন্ধু হইল অপার ॥
যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, সংমিলনে বেগবতী,
বরষায় বিষম বিস্তার।
সাগর সঙ্গমস্থলে, হিল্লোলিত কোলাহলে,
অগণিত তরঙ্গের হার ॥
কাবেরী উত্তরপারে, ব্যূহ রচি দুর্গাকারে,
গজপতি স্থাপিলা শিবির।
বস্ত্রময় ঘরদ্বার, যবনিকা শোভাধার,
বস্ত্রময় বিচিত্র প্রাচীর ॥
শৃঙ্খলিত কোন স্থলে, মত্তোৎকট হস্তিদলে,
পরিখা বেষ্টিত সেই স্থান।
কোন স্থলে রাজি রাজি, সহস্র সহস্র বাজী,
মনোজব অতি বেগবান্ ॥
কত নীল সিতাসিত, বিচিত্র লোহিত পীত,
সুদর্শন শ্রীপঞ্চকল্যাণ।
সৈন্ধব-কাম্বোজ আর, চমৎকার চমৎকার,
আরবীয় তুরঙ্গ প্রধান ॥
সারি সারি ধনুর্দ্ধর, অগ্রে অগ্রে অগ্রসর,
রণমদ-গর্ব্বে মত্তমতি ॥
পত্তিগণ পদচার, করিতেছে অনিবার,
কভু দ্রুত কভু মন্দগতি ॥
কোন স্থানে শস্যভার, সজ্জিত পর্ব্বতাকার,
ঘৃত আর তৈল সরোবর।
উড়িয়ার প্রিয় ভক্ষ্য, চিপিটক ঢেরি লক্ষ,
খণ্ড খণ্ডগিরির সোসর ॥

পলাণ্ডু লশুন আদা, পড়িয়াছে গাদা গাদা,
চিল্‌কার শুষ্কমীন রাশি।
সুপকার শত শত, ভোজ্য রান্ধে নানামত,
দলে দলে ভুঞ্জে সৈন্য আসি ॥
শ্রুত হয় কোন স্থানে, বাজে বাদ্য একতানে,
আনদ্ধ, শুষির, তত, ঘন।
বীণা বংশী ভেরী ঝাঁক, বাজিতেছে জয়ঢাক,
যেন গরজিছে নবঘন ॥
হেন বাদ্য সম্মোহন, মাতায় মুনির মন,
বীররস হয় মূর্তিমান।
অসি হেতি রণসাজে, খর তরবারি ভাজে,
চক্‌ মক্‌ চপলা সমান ॥
কোথায় বিবিধ যান, স্বর্ণসজ্জিত শোভমান,
দ্বৈপ আর প্রবহণচয়।
কম্বলে মণ্ডিত কত, শকট সহস্র শত,
নিশান উড়িছে শূন্যময় ॥
পরিহিত বীরধটী, সারসনে বদ্ধকটি,
বারবাণে আবৃত শরীর।
গলদেশে প্রতিমুক্ত, উরু কঙ্কটযুক্ত,
শিরস্ত্রাণে সুশোভিত শির ॥
শিরে বিধুরত্ন পরি, সমাগত বিভাবরী,
শান্তি-সহচরীর সহিত।
সেনাগণ শয্যোপরে, শ্রান্তি ক্লান্তি পরিহরে,
কলরব হইল রহিত

ইতি যুদ্ধযাত্রা নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

সংগ্রাম

নিশানাথ অস্তাচলে সুপ্রভাত নিশা।
নাথে পুন পেয়ে হাস্যময়ী দশদিশা ॥
ভানুকরে সুকুমারী কুমুদী মলিনী।
মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে নবোঢ়া নলিনী ॥
শৈত্য-মান্দ্য সুরভি-ভরিত সমীরণ।
কাবেরীর তীরে ধীরে করিছে ভ্রমণ ॥

সুশীলা তরুণী যথা মৃত্যুমুখে ধায়।
ভানুর কিরণে হিম-কণিকা শুখায়॥
মরীচ-কেদারে সুখে ডাকিছে হারীত।
সরসীর তীরে শ্রুত সারসের গীত॥
চক্রবাক চক্রবাকী শৈবলিনী-তীরে।
সংমিলন-সুখনীরে অভিষিক্ত ফিরে॥
বনপ্রিয় কেশরের কাননে কুহরে।
অমৃত বরিষে কিবা শ্রবণ-কুহরে॥
বৈতালিক যথাকালে ঘণ্টানাদ করে।
উঠিলেন গজপতি প্রথম-প্রহরে॥
যথাবিধি উপদেশ করিয়া প্রদান।
দূতে পাঠাইলা রাজা শত্রু-সন্নিধান॥
পুরী প্রবেশিয়া শোভা নিরখিতে দূত।
দেবতার ক্রিয়া প্রায় সকলি অদ্ভুত॥
কে না জানে কাঞ্চীপুর পুরীর প্রধান।
ভারতে ছিল না হেন পুরী বিদ্যমান॥
বহুদূর ব্যাপিয়া পরখা পরিসর।
প্রবলা অপগা প্রায় দৃশ্য ভয়ঙ্কর॥
পবন-প্রবাহে তাহে প্রবাহ উদয়।
স্থানে স্থানে ঘোরচক্র আবর্ত্ত-নিচয়॥
চারি সেতু চারি ধারে নির্মিত পাষাণে।
প্রহরী পুরুষপুঞ্জ স্থিত স্থানে স্থানে॥
কৃতান্তের দ্বারসম চারি পুরীদ্বার।
হস্তিনখে * সুশোভিত তার দুই ধার॥
ঝুলিছে কবাট-বাট লৌহের নিগড়ে।
কার সাধ্য সহসা প্রবেশে সেই গড়ে॥
পরিখা অন্তরে বপ্র পর্ব্বত আকার।
তার পরে প্রস্তরেতে রচিত প্রাকার॥
নানারম্য হর্ম্ম্য আর প্রাসাদ প্রচুর।
পরিপাটী সৌধ অন্তে চারু অন্তঃপুর॥
মনোজ্ঞ মণ্ডপ মঠে কপোত-পালিকা।
বাজীশালা, হস্তিশালা, পানীয়-শালিকা॥
মহাধনি-গৃহগণ অতি শোভমান।
স্বস্তিক সর্ব্বতোভদ্র তথা বর্দ্ধমান॥
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তথা অলিন্দ-নিকর।
কত উপবন পুষ্পবন মনোহর॥

রাজপথ-পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ তরুচয়।
স্থানে স্থানে তড়াগেতে পরিপূর্ণ পয়॥
ফুটে ফুল কমল কহ্লার ইন্দীবর।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বসে ভ্রমরী ভ্রমর॥
সন্তরে বিহরে কত সরাল মরাল।
থেকে থেকে ডাকিছে ডাহুক পালে পাল॥
সরণীর দুইধারে শোভে সারি সারি।
নানারূপ মণিহারী দোকানী পসারী॥
মণিকার-মণ্ডপে রমণী-মনোহর।
সুসজ্জিত বহুমূল্য রত্ন স্তরে স্তর॥
মরকত পদ্মরাগ বিদ্রুম বৈদূর্য্য।
রত্নরাজ হীরা, যথা গ্রহপতি সূর্য্য॥
মণিময়, মুক্তাময়, প্রকার প্রকার।
গোস্তন নক্ষত্রমালা, আদি নানা হার॥
অঙ্গুরীয়, কর্ণিকার, কেয়ূর, কটক।
কিঙ্কিণী, কঙ্কণ, কাঞ্চী, মঞ্জীর, হংসক॥
চূড়ামণি, চন্দ্রসূর্য্য, কিরীট, তরল।
ললাটিকা, সীমন্তকা, রত্নে ঝলমল॥
বসিয়াছে সাজাইয়া তন্তুবায়গণ।
কৌষেয় রাঙ্কব ক্ষৌম কার্পাস বসন॥
দুকূল, নিবীত, চোলা, চেলনা, কাঁচুলী।
জড়িত জরির কাজে জলিছে বিজুলী॥
বসিয়াছে গন্ধবেণে লয়ে নানা গন্ধ।
উড়িছে ভ্রমরচয়, সৌরভেতে অন্ধ॥
কেশর, কুঙ্কুম, কালাগুরু, কালীয়ক।
সর্জ্জরস, মৃগনাভি, কর্পূর, কোলক॥
জাতী-ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি।
মোরটা, মঙ্গলা, সুরভির তরঙ্গিণী॥
স্রোতোঞ্জন, রসাঞ্জন প্রভৃত অঞ্জন।
শিলাজতু, মনঃশিলা, সিন্দূর শোভন॥
তন্তুবায় নানাবস্ত্র করিছে সীবন।
চিত্রকর চারুচিত্র করিছে লিখন॥
শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণকার আর কর্ম্মকার।
কাংস্যকার, শঙ্খকার, তথা চর্ম্মকার।
রথকার, জায়াজীব, রজক, চারণ।
মায়াকার, মালাকার, আর নটগণ॥
দেখিতে দেখিতে দূত করিছে গমন।
মনে ভাবে ধন্য এই পুরী সুশোভন॥

* বৃক্ষজ।

ধন্য ধন্য প্রজাগণ, ধন্য নরপতি।
হায় কেন যুদ্ধানল উঠিল সম্প্রতি॥
সমর সংহার-সুত! সর্ব্বশোভাহারী!
সর্ব্বসুখ-সংহারক সর্ব্বলোপকারী!
কোথা রবে এই শোভা কিছু দিন পরে?
হায় রে ভ্রান্তির লীলা, এ ভব ভিতরে!
ভাবিতে ভাবিতে উপনীত সিংহদ্বারে।
দৌবারিক সমাচার জানায় রাজারে॥
আদেশ পাইয়ে, লয়ে গেল সন্নিধান।
অপরূপ রাজসভা, শোভার নিধান॥
চারিদিকে রক্ষিগণ, সন্নদ্ধ শরীর।
করে মুক্ত অসি, স্কন্ধে লম্বিত তূণীর॥
অবিরত উপায়ন পড়ে পদতলে।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া সামন্ত সকলে॥
অতি উচ্চ সিংহাসনে বসি কাঞ্চীপতি।
মধ্যাহ্নের বিভাবসু সম তেজ অতি॥
বামপাশে সৌম্যমূর্ত্তি মহামাত্য বসি।
গ্রহপতি-অন্তে যথা সমুদিত শশী।
পত্র দিল তাঁর করে উৎকলের দূত।
পাঠমাত্র মহারোষ হৃদয়ে সম্ভূত॥

পত্র।

"শুন রে দুরাত্মা দুষ্ট পাপিষ্ঠ প্রকট।
শৃগালের সম শঠ কপট নিপট॥
এত বড় স্পর্দ্ধা তোর, এত অভিমান।
মানিয়াছ আপনারে ক্ষত্রিয়-প্রধান॥
দুহিতা লইয়ে দুষ্ট, উড়িষ্যায় গেলি।
বিবাহ না দিয়ে কেন দেশে ফিরে এলি॥
আমারে চণ্ডাল বল, এত অহঙ্কার।
আমি এই আসিয়াছি দিতে প্রতীকার॥
ছারখারে দিব আমি এ পাট কর্ণাট।
ভাসাইব সিন্ধু জলে, দেখাইব নাট॥
নিস্তার পাইবি যদি মম কোপানলে।
নন্দিনী পদ্মিনী আনি দেহ পদতলে॥
আমি তারে চণ্ডালে করিব সমর্পণ।
তবে সে হইবে মম ক্রোধের তর্পণ।

জলন্ত অনলে কিবা হবির পতন।
কিবা কালসর্প-শিরে চরণ-ঘাতন॥
গরজিয়া উঠে রাজা শুনিতে ভীষণ।
দ্বিনয়নে জ্বলে কিবা হোম-হুতাশন॥
কিঞ্চিৎ হইল শান্ত, ক্ষণেক অন্তরে।
আজ্ঞামত প্রত্যুত্তর লিখে লিপিকরে॥

প্রত্যুত্তর।

"অরে মূর্খ উড়ে মেড়া! কি সাহস তোর।
আসন্ন তোমার কণ্ঠে মরণের ডোর।
তোরে কি রে জগন্নাথ করে নাই মানা।
ছুছুন্দর হয়ে বেটা, সিংহপুরে হানা॥
তোরে কন্যা দিব দুষ্ট! বিজাত বর্ব্বর!
ভেক চাহে ধরিবারে অপ্সরার কর॥
অসম্ভব এ বাসনা, অরে দুরাশয়।
যজ্ঞ-হবি কুক্কুরের কভু ভোগ্য নয়॥
ভাসাইব সিন্ধুনীরে, বরং পদ্মিনীরে।
তবু তোরে কভু নাহি দিব নন্দিনীরে॥
তুই কি জানিস্ রণ? দূর বেটা দূর্।
রণ্ডবন-ভূমে রাজা এরণ্ড ঠাকুর॥
দেখা যাবে জগন্নাথে কি দেবত্ব আছে।
বসাইব আমি তারে গণেশের পাছে॥
সে আবার দেবতা, তাহারে কিবা ভয়?
করুক আমার ক্ষতি, যত সাধ্য হয়॥"
পত্র প্রাপ্ত হয়ে দূত হইল বিদায়।
অতি বেগে আপন শিবিরে ফিরে যায়॥
পত্র পড়ি উৎকলেশ জ্বলিল দ্বিগুণ।
নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহে যেন দাবাগুণ॥
নিশাশেষে ঘন ঘন বাজিছে পটহ।
সমরের উপক্রম সমাগতে অহ॥
কাবেরীর পরপারে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
পঙ্গপাল মত সৈন্য ব্যাপ্ত দিগন্তর॥
হাতি, রথী, পদাতি, তুরঙ্গী, অগণন।
নানারঙ্গে চতুরঙ্গে বাজিছে বাজন॥
উড়িষ্যার সেনাদল নদীপার হেতু।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তরণীর সেতু॥
শত্রু-সেনা সন্নিকট হ'ল যে সময়।
তরঙ্গিনী-তটে ঘোরতর যুদ্ধ হয়॥

দুই দলে বাণবৃষ্টি ছাইয়ে গগন।
শ্রাবণের ধারা কিবা করকা-বর্ষণ ॥
কোনরূপে হীনবল নহে দুই দল।
ক্রমেতে প্রবল হ'ল সমর-অনল ॥
মহা ঘোরতর যুদ্ধ কি বর্ণিব আর।
শোণিত-প্রবাহ বহে নির্ঝর-আকার ॥
কিবা দুই মেঘদল করিছে গর্জন।
বিজলীর শোভা ধরে যত প্রহরণ ॥
কাবেরীর স্রোত রক্তে হইল লোহিত।
ক্রমে উড়িষ্যার সৈন্য তীরে আরোহিত ॥
পদাতি পদাতি সঙ্গে যুঝে অহরহ।
তুরঙ্গী তুরঙ্গী সঙ্গে, রথী রথী সহ ॥
মাতঙ্গে মাতঙ্গে শুণ্ড করি জড়াজড়ি।
শৈলকারে ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি ॥
সমস্ত দিবস যুদ্ধ, নাহি অবসান।
হাজার হাজার লোক হারাইল প্রাণ ॥
ভানু যায় শয্যাগারে সন্ধ্যা-করে ধরি।
চন্দ্রচূড়া হয়ে সমাগত বিভাবরী ॥
সমর হইল ক্ষান্ত, নিশীথ-সময়।
আহব শ্মশান সম, দেখি লাগে ভয় ॥
মৃত নরদেহ, আর তুরঙ্গ, দ্বিরদ।
অগণিত কাটামুণ্ড, কাটা হস্ত পদ ॥
বিকট প্রকট দন্ত, গলে রক্তধারা।
হর-নেত্র সম উর্দ্ধগত অক্ষিতারা ॥
ডাকিতেছে ফেরুপাল, ফেউ ফেউ রবে।
শবগন্ধে সমাগত সারমেয় সবে ॥
শব নিয়ে টানাটানী কলহ ভীষণ ॥
ফেরুপালে গৃহপালে বেধে গেল রণ ॥
কোথা রে মনুষ্য তোর, বীর্য্য অহঙ্কার?
মরণান্তে হও তুমি, পশুর আহার ॥
দিবাভাগে রণমদে মেতেছিলে রাগে।
শিবা-কুকুরের খাদ্য হলে নিশাভাগে ॥
কাঞ্চীপতি-হৃদয়েতে সঞ্চারিত ভয়।
জানিলেন গজপতি হীনবল নয় ॥
নগরের প্রান্তে রণভূমি পরিসর।
পরিখা-প্রাকার তাহে রচে বহুতর ॥
ধারে ধারে সাজাইল সৈন্য সারি সারি।
নিবিড় কানন সম শূল-ভল্লধারী ॥
তাহার পশ্চাতে সেনা দেখিতে ভয়াল।
হৃদয়ে প্রকাণ্ড ঢাল, করে করবাল ॥
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে পূরিল গগন।
স্থানে স্থানে প্রজ্বলিত হয় হুতাশন ॥
রজনী হইল শেষ, হাসে উষাসতী।
পুন পূর্ব্বদিকে প্রভান্বিত দিনপতি ॥
আরোহণ করি দিব্য রথ মনোহর।
রণ-যাত্রা করিছেন কাঞ্চীর ঈশ্বর ॥
অই শুন চক্রের নির্ঘোষ ভয়ঙ্কর।
বজ্রনাদে পরিপূর্ণ যেমন অম্বর ॥
লৌহময় কবাট বিমুক্ত সিংহদ্বারে।
শৃঙ্খলে উঠিছে অগ্নি ইরম্মদাকারে ॥
তুষার-ধবল কান্তি হয়-চতুষ্টয় ॥
চারু কলেবর স্বর্ণ-অলঙ্কারময় ॥
বিদ্যুতের বেগে সিংহদ্বার পরিহরে।
অই দেখ আসিতেছে সেতুর উপরে ॥
নিম্মিত চন্দন-কাষ্ঠে অপূর্ব্ব স্যন্দন।
হস্তিদন্তে বিরচিত তাহে সিংহাসন ॥
বিখচিত স্বর্ণ মণি মুক্তা মনোলোভা।
নক্ষত্র-ভূষিতা কিবা তমস্বিনী শোভা ॥
স্বর্ণময় নেমি, স্বর্ণময় যুগন্ধর।
স্বর্ণময় ধুরা, স্বর্ণময় অপস্কর ॥
মহামূল্য চীনাংশুকে পতাকা রচিত।
স্বর্ণসূত্রে গণপতি-মূর্ত্তি বিলিখিত ॥
উপনীত হ'ল রথ ভয়াল আহবে।
"জয় গণেশের জয়" ডাকে সেনা সবে ॥
নৃপে বেড়ি বীরমদে মত্ত সবে সুখে।
নাচিতে নাচিতে যায় শত্রু অভিমুখে ॥
আর কি বর্ণিব রণ বর্ণনে না যায়।
অবতীর্ণ রুদ্র কিবা হইলা তথায় ॥
কাঞ্চীসেনা তীক্ষ্ণশরে ছাইল গগন।
শত্রুদলে হয় যেন বিষ-বরিষণ ॥
উঠে ছুটে বাণ যেন ফুহারার ধারা।
শূন্য হ'তে নামে যথা খসি পড়ে তারা।
উড়িষ্যার সৈন্য তাহে হইল অস্থির।
দেহ রহি পড়ে রক্ত, শরে বিদ্ধ শির ॥
বিভাবরী সমাগত ভানু-ভাতি নাশি।
কাঞ্চীর বিজয়-ভানু সমুদিত আসি ॥

পলায় উৎকল-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে।
পশ্চাতে ধাবিত শত্রু অসি হস্তে লয়ে ॥
সমর হইল ভঙ্গ সে দিনের তরে।
জয়নাদে কাঞ্চীনাথ প্রবেশে নগরে ॥
হেন মতে দিন দিন কত যুদ্ধ হয়।
ক্রমে উৎকলের বল হ'ল বহু ক্ষয় ॥
কছুই নির্ণয় নহে জয় পরাজয়।
দুই পক্ষে শুভাশুভ উদয় বিলয় ॥
বাহিরের গড় কত হ'ল হস্তগত।
আহার-অভাবে কত বাহিনী নিহত ॥
আজি উৎকলের জয় আনন্দ-শিবিরে।
কালি নিরানন্দ সবে বসি নতঃশিরে ॥
শ্রীপুরুষোত্তম-দেব ক্ষুব্ধ অতিশয়।
মর্ম্মান্তিক মহাদুঃখে ব্যথিত হৃদয় ॥
একদা শর্ব্বরী-শেষে অনুতপ্ত মনে।
করিতেছে আর্তনাদ শ্রীজীব-চরণে ॥
বলে, "কেন করুণা ছাড়িলে প্রভু মোরে ?
কেন বা প্রবৃত্তি দিলে এ সমর ঘোরে ?
তোমারে কহিল কটু, পাষণ্ড পামর।
কেমনে সহিবে তাহা তোমার কিঙ্কর ?
কর্ণাট-সংহারে সেই হেতু মম পণ।
তুমি দিলে প্রত্যাদেশ করিতে এ রণ ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, নির্ভয় হৃদয়।
না মানিনু অশকুন যাত্রার সময় ॥
দিলে যে দয়ার চিহ্ন গোপবালা করে।
এখনো সে অঙ্গুরীয় আছে শিরোপরে ॥
তবে কেন পরাভব পাইলাম রণে ?
না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে ॥
বুঝি তব দয়াধিকতায় দয়াময়।
অহঙ্কার-মদে মত্ত আমার হৃদয় ॥
দর্পহারী ভগবান্ সেই সে কারণে।
হরিলে দাসের গর্ব্ব এই ঘোর রণে ॥
প্রণতে উন্নত কর, উন্নতে প্রণত।
কার সাধ্য এই বিধি করে অন্য মত ॥
দীনেরে উঠায়ে প্রোচ্চ পর্ব্বত উপরে।
পাথারে ভাসাও এবে বাঁধি দুই করে ॥
দোহাই, দোহাই, প্রভু করুণানিধান !
মান রাখ, প্রাণ যায়, কর পরিত্রাণ ॥"

এরূপে রোরুদ্যমান রাজা গজপতি।
স্বপ্নাবেশে পুন প্রত্যাদেশ তার প্রতি ॥
"ভয় নাই, ভয় নাই ওরে বরসুত।
তোরে অনুকূল সদা কৃষ্ণ রাজপুত ॥
কালি নিশি কাঞ্চীগড় কর আক্রমণ।
সেনাগণে চারিদিগ্ করহ বেষ্টন ॥
দক্ষিণ দ্বারেতে তুমি সহ রথিগণ।
করিবে মুষলধারে বাণ বরিষণ ॥
উত্তরের দ্বারে রবে সামন্ত-শিঙ্গার।
অগণিত পদাতিক যোগান তাহার ॥
রবেন পশ্চিমদ্বারে শ্বেত রাজপুত।
তাঁহার সহিত রবে মাতঙ্গ অযুত ॥
আমি রব পূর্ব্বদ্বারে সহ অশ্বঠাট।
শিখাইব কর্ণাটেরে, দেখাইব নাট ॥"
নিদ্রাভঙ্গে গজপতি হরষিত মতি।
পুনরায় রণোৎসাহে সমুৎসুক অতি ॥
না হইতে প্রভাত, বাধিল ঘোর রণ।
অন্তরীক্ষে শ্রুত মাত্র শব্দ শন্ শন্ ॥
কত মল্ল, করে ভল্ল, সাজে থাকে থাকে।
মারে লম্ফ, দিয়ে ঝম্প, ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
দুই নেত্র, মদক্ষেত্র, জবাপুষ্প-ভাতি।
ধৃত বর্ম্ম, স্থত চর্ম্ম-আবরিত ছাতি ॥
ফুলে অঙ্গ, ভুরুভঙ্গ, দশন-কবাটী।
খড়্গে খড়্গে অরিবর্গে ফেলিতেছে কাটি ॥
পড়ে রক্ত, কি অলক্ত, ধরা-অঙ্গে সাজে।
শুধু হেরি, শবঢেরি, জয়ভেরী বাজে ॥
ও কি মূর্ত্তি, পায় স্ফূর্ত্তি, রণ-মাতৃকার।
গলদ্রক্ত, সদাসক্ত, চিবুকে তাহার ॥
দন্তগুলা, যেন মূলা, অতি তীক্ষ্ণ দাঁড়।
কড মড়, মড় মড়, চিবাইছে হাড় ॥
কভু পড়ি, গড়াগড়ি, দেয় ভূমিপরে।
কভু উঠে, যায় ছুটে, প্রসারিত করে ॥
তাম্র-সটা, জিনি কটা, শিরে জটাচয়।
যথা চক্র, সম বক্র, উঠি ঊর্দ্ধে রয় ॥
ভয়ঙ্কর, ঘোরতর, ঘোরে দুই আঁখি।
নরনাড়ী, আছে মাড়ি, বক্ষোদেশ ঢাকি ॥
ভয়ঙ্করী, নিশাচরী, নাচিতেছে আসি।
সমাকুল, সেনাকুল উঠে ধূলিরাশি ॥

শিবাপুঞ্জে, বসা ভুঞ্জে, গৃধিনীর সঙ্গে।
ঝাঁকে ঝাঁকে, দ্রোণকাক, পিয়ে রক্ত রঙ্গে॥
কাটামুণ্ড, হীনশুণ্ড, কত হস্তী পড়ে।
কত হয়, ক্ষেত্রময়, ধায় উভরড়ে॥
ফুটে চম্পা, কিবা শম্পা, অগ্নিবাণ মুখে।
দলে দল, কত বল, আসিতেছে রুখে॥
খরধার, তরবার, যমধার নাম।
কি করাল, ভিন্দিপাল, কৃতান্তের ধাম॥
প্রক্ষেড়ন, * ঘন ঘন, দ্রুঘণ † কুঠার।
করে বধ, পরশ্বধ ‡ বিষম প্রহার॥
এইরূপে সমর হইল ঘোরতর।
দিবাশেষে দুই দল হইল কাতর॥
প্রভাতে, প্রভাত-ভানু সম রাগোদয়।
প্রদোষের অস্তভানু সহ তেজোময়॥
বেলা অবসান সহ বল অবসান।
প্রকৃতির রীতি এই নিত্য বিদ্যমান॥
বিশেষে কাঞ্চীর সেনা হইল ফাঁফর।
চারিদিগে উড়িষ্যার বাহিনী বিস্তর॥
স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিয়ে করে পলায়ন।
ক্রমে বীর্য্য প্রশমন, প্রাপ্ত প্রমথন॥
নিরুপায়ে অপায়ন বুঝি কাঞ্চীপতি।
নতঃশিরে নিজদুর্গে করিলেন গতি॥
প্রচুর প্রহরীচয় বাঁধে আট ঘাট।
চারি সিংহদ্বারে পুন পড়িল কবাট॥
তমস্বিনী তমোরাশি ছাইলে গগন।
দক্ষিণের দ্বারে যান উড়িষ্যারাজন॥
কাবেরীতে অশ্বগণ জলপান করে।
সমস্ত দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি পরিহরে॥
পুন রথে প্রযোজিত, সজ্জিত সকলে।
রণমদে হ্রেষা উঠে গগনমণ্ডলে॥
চলিলেন রথিগণ রাজারে লইয়া।
শত্রু-গর্ব্ব খর্ব্ব হেতু উল্লসিত হিয়া॥
উত্তরেতে চলিলেন সামন্ত-শিঙ্গার।
চলিত পদাতি যথা তরঙ্গের হার॥

* মরাচ অর্থাৎ লৌহময় বাণ।
† মুদ্গর।
‡ পরশুবৎ অস্ত্রবিশেষ।

"জয় জগন্নাথ, জয়!" হয় জয়ধ্বনি।
কটকের পদভরে শিহরে ধরণী॥
অগণিত অগ্নিবাণ উঠিয়া অম্বরে।
বজ্রের আকারে পড়ে নগর-ভিতরে॥
কত গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে তায়।
প্রোজ্জ্বলিত গৃহচয় যথায় তথায়॥
কিন্তু সে দুর্গম দুর্গ অভেদ্য অজেয়।
ভিতরেতে অস্ত্র আর সৈন্য অপ্রমেয়॥
প্রথমেতে পঞ্চক্রোশ নিবিড় জঙ্গল।
তারপর নদী প্রায় পরিখা প্রবল॥
তটে গিরি বনে পুন অতি গূঢ় স্থান।
মৃগনী প্রস্তরে যত প্রাকার নির্ম্মাণ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ চূড়া অতি উচ্চতর।
যেন সূর্য্যপথ রোধে, পরশি অম্বর।
দুই দ্বারে বহুক্ষণ হইল সমর।
উড়িষ্যার চমূ তাহে নিহত বিস্তর॥
নীচে থেকে উঠে উর্দ্ধে অগণিত বাণ।
গহনে গহনে পড়ি বিহতসন্ধান॥
উপর হইতে যত বর্ষে প্রহরণ।
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে সৈন্য মরে অগণন॥
প্রথম প্রহরে রাজা অস্থির-হৃদয়।
ভাবিছেন, ভুলিলেন বুঝি দয়াময়॥
অবিরত তত্ত্ব লয়ে ফিরিতেছে দূত।
পূর্ব্বদ্বারে আগত কি কৃষ্ণ রাজপুত॥
দ্বিতীয় প্রহর যবে অতীত রজনী।
অকস্মাৎ পুন পুন হয় জয়ধ্বনি॥
পূর্ব্বদ্বারে কৃষ্ণ রাজপুত সমাগত।
সঙ্গে সংমিলিত তাঁর অশ্বারোহী যত॥
পশ্চিমের দ্বারে শ্বেত রাউত উদয়।
মেঘদল সম ধায় মাতঙ্গনিচয়॥
নবরূপ অগ্নি-অস্ত্র * অতি ভয়ঙ্কর।
বজ্রের নির্ঘোষবৎ শব্দ ঘোরতর॥
মুখেতে বিদ্যুৎ জ্বলে কিবা কালানল।
আঘাতে কাঞ্চীর সৈন্য মরে দলে দল॥
দুই সিংহদ্বারে দেওড়ের বড় জাঁক।
কর্ণাটের লক্ষ্যে গোলা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক॥

* বলা বাহুল্য, এই সময়ে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে কামানের প্রথম ব্যবহার হয়।

উৎকলের সৈন্য বর্ম্মে আবৃত শরীর।
তোরণের নীচে কাটে সুড়ঙ্গ গভীর॥
ভরিল বারুদ তাহে আকারেতে গোলা!
"জয় জগন্নাথ জয়" নাদে সবে ভোলা॥
তবে কৃষ্ণ রাউতের আদেশ প্রমাণ।
সেই সুড়ঙ্গেতে অগ্নি করিল প্রদান॥
হইল বিষম শব্দ সেই সিংহদ্বারে।
লক্ষ লক্ষ বজ্র কি পড়িল একেবারে॥
ভাঙ্গিল লৌহের দ্বার হয়ে চুরমার।
উৎকলের সেনা ঢুকে করে মার মার॥
আগে আগে বীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অশ্বোপরে।
মূর্ত্তিমান্ মহাকাল কর্ণাট নগরে॥
পলায় কাঞ্চীর লোক পুর পরিহরি।
কি করিবে, কোথা যাবে, চারিদিগে অরি॥
আবাল বনিতা [illegible] বিশেষে কাতর।
জয়নাদ সহিত মিশ্রিত আর্ত্তস্বর॥
বিমূর্চ্ছিত নারীগণ মহাভয় ক্রমে।
নগর আচ্ছন্ন যেন, ভেলকীর ভ্রমে॥
জয়ী সৈন্য খুলে দিল আর তিন দ্বার।
প্রবেশে উৎকল-বল সংখ্যা নাহি তার॥
মহানন্দে গজপতি ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে।
অন্বেষিয়া ভ্রমিছেন রাজপুত্রদ্বয়ে॥
কিন্তু দুই ভাই অন্তর্হিত সেইক্ষণ।
পাতি পাতি করি খুঁজে না পান দর্শন॥
হরিষ-বিষাদে রাজা শিবিরেতে যান।
সামন্ত-শিঙ্গার রহে দুর্গ-সন্নিধান॥
প্রহরেক লুট তরে দিলা অনুমতি।
দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখি মহামতি॥
কি আর বর্ণিব তবে যে দশা হইল।
মহামূল্য দ্রব্য সব লুটিয়া লইল॥
বলাৎকারে লয়ে যায় তরুণীনিকরে।
মুক্তাকারা অশ্রুধারা দুনয়নে ঝরে॥
হায় রে পুরুষ তোর একিরে পৌরুষ!
অবলা জাতির প্রতি কেন রে পরুষ?
যারা হয় সংসার-সাগরে সার নিধি।
মৃদু উপাদানচয়ে গঠিলেন বিধি॥
তাহাদের প্রতি কেন নৃশংস ব্যাভার?
যতনের ধন তারা, স্নেহের আধার॥

মাতিয়া সমর-মদে নাহি থাকে জ্ঞান।
সরলা মহিলাগণে কর অপমান॥
যুগ-যুগান্তরে তোর এ দারুণ রীতি।
কিসের বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি?
সভ্য-শিরোমণি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল।
প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল॥
পশু করে পশু বধ ক্ষুধার জ্বালায়।
পশু-চেয়ে পশু তুই সমর-খেলায়॥
বিজয়-মাদকে মাতি ধরি নারীগণে।
দেহভ্রষ্ট করি, নষ্ট করহ জীবনে॥
মহা হাহাকার উঠে কাঞ্চীরাজ-পুরে।
রুদিত রমণীকুল ডুকরে ফুকুরে।
অন্তঃপুর-মাত্র রক্ষা পাইল লুণ্ঠনে।
নিভৃতে বসিয়া নৃপ সহ স্বীয়গণে॥
অপমানে ম্রিয়মাণ অস্থির পরাণ।
অনলে হৃদয় যেন হয় দহমান॥
অবসাদে হতচিত্ত অবশশরীরে।
ধীরে ধীরে যায় রায় গণেশ-মন্দিরে॥
ইষ্টদেব-সম্মুখেতে দণ্ডবৎ পড়ি।
করযোড়ে স্তব করে, যায় গড়াগড়ি॥
"নমো নমো গণপতি, নমো লম্বোদর!
নমো দেব দ্বৈমাতুর, নমো বিঘ্নহর!
নমো প্রভো বিনায়ক, গজেন্দ্রবদন!
নমো পার্ব্বতীর প্রিয়, হৃদয়-নন্দন!
প্রসীদ পরশুপাণি, প্রভো নিরঞ্জন!
একদন্ত, বক্রতুণ্ড, মূষিকবাহন।
হে হেরম্ব বামদেব, জটাজুটধর।
নমো সিন্দুরাভ খর্ব্ব স্থূল-কলেবর!
চতুর্ভুজ, ধৃত, পাশাঙ্কুশ-বরাভয়।
স্মরণে তোমার নাম সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
তুমি ব্রহ্মজ্ঞানদাতা, বিধির বিধাতা!
নাদব্রহ্মবীজরূপ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা!
বিঘ্নহর! বিঘ্ন হর, হয়েছি কাতর।
দোহাই, দোহাই, প্রভো দেব গণেশ্বর!
তুমি মম কুলদেব, প্রসিদ্ধ জগতে।
লজ্জানিবারণ মম কর কোনমতে॥
না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে।
নহে কেন পরাভব পাইলাম রণে?

সমরে সর্ব্বত্র জয় পুরুষানুক্রমে।
কত রাজ্য দিলে দেব এ দাস অধমে ॥
এখন এ দীনে কেন কর পরিহার?
চরণে পড়িয়ে প্রভো! মাগি পরিহার ॥
বরদ! বরদ হও করুণ নয়নে।
কোন্‌ছার গজপতি আমার সদনে?"
এইরূপে কাঞ্চীনাথ কাতর হৃদয়ে।
কুলদেবে ডাকিতেছে, ভক্তিনম্র হয়ে ॥
ভাবিতে ভাবিতে, নেত্রে নিদ্রার আবেশ।
ঘোর বিভাবরী-ক্ষণে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ ॥
"শুন, শুন, শুন রে কর্ণাট-অধিপতি!
কপাল ফাটিল তোর, ওরে ছন্নমতি!
রে দুরাত্মা! কি কারণে দেব নারায়ণে।
নিন্দিলে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে গর্ব্বিত বচনে?
না জান, না জান দুষ্ট, ভেদজ্ঞানী খল!
সকল দেবতা মাত্র কল্পনার ফল ॥
যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজাপতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পার্ব্বতী ॥
পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেয় চতুর্ব্বেদ।
পামর পাষণ্ডগণ করে সব ভেদ ॥
যদ্যপি ভালাই চাহ, উপদেশ লহ।
করহ প্রণয়-সন্ধি গজপতি সহ ॥
তোমার এ দেশে আমি রহিব না আর।
অতঃপর আবির্ভাব উৎকলে আমার ॥
চণ্ডাল বলিয়া যারে নিন্দিলে দুর্ম্মতি।
সে চণ্ডাল হবে, তব পদ্মাবতী পতি।"
স্বপন হইল ভঙ্গ, তপন উদয়।
শুম্ভিত হইল রায়, কম্পিত হৃদয় ॥
সচিবে ডাকিয়া কহে স্বপ্ন-বিবরণ।
"আর এ বিফল রণে কিবা প্রয়োজন?
এইক্ষণে গজপতি-সন্নিধানে যাও।
পদ্মাবতী দিয়ে, সন্ধি নিবন্ধন চাও" ॥
অন্তঃপুরে মহামন্ত্রী পাঠাইল বাণী।
মূর্চ্ছিতা মহিলা শিরে পদ্মপাণি হানি ॥
গজপতি-করে যথা কোকনদমালা।
গজপতি-ডরে তথা পদ্মাবতী বালা ॥
শুখাইল মুখ যেন হেমন্ত-কমল।
কর বিস-কিসলয় হইল নিশ্চল ॥
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে নয়নযুগলে।
শিশিরনিকরে কিবা কুশেশয়-দলে ॥
দুহিতার দশা দেখি মহিষী কাতরা।
শোকেতে অধীরা হয়ে পড়িলেন ধরা ॥
রোদনের কোলাহল উঠে অন্তঃপুরে।
আহা! আহা! হাহাকার রব মাত্র স্ফুরে ॥
যথা শেফালিকা-ফুল প্রভাত-প্রহরে।
সুধীর সমীরে ভূমে ঝরঝর ঝরে ॥
ধরাসনে পড়ে তথা বরাননাচয়।
মহামন্ত্রী অন্তঃপুরে হইলা উদয় ॥
করযোড়ে কহিতেছে সজলনয়নে।
"কি ফল, বল গো আর্য্যে, বিফল রোদনে?
ভবিতব্য আছে যাহা ঘটিবে তাহাই।
বিধির নির্ব্বন্ধ ছেদে কার সাধ্য নাই ॥
কেন গো কাতরা এত বিষাদ অন্তরে?
কলিঙ্গের রাজলক্ষ্মী হবে অন্তঃপুরে ॥"
এত বলি কুমারীরে সঙ্গে লয়ে যায়।
খনি হ'তে মহামণি হইল বিদায় ॥
মহানবমীর-নিশা-প্রভাত-সময়।
দেবীর বিদায়কালে যে ভাব উদয় ॥
সেই ভাব আবির্ভাব হ'ল কাঞ্চীপুরে।
এক ভাবে সকলের আঁখিযুগ ঝুরে ॥
সচিব কন্যারে লয়ে অতি ত্বরান্বিত।
গজপতি-শিবিরে হইলা উপনীত ॥
রত্নসিংহাসনোপরে প্রতাপে মিহির।
বার দিয়ে বসিয়াছে গজপতি বীর ॥
শ্বেতচ্ছত্রে জ্বলে কত মণিময় তারা।
ঝুলিছে ঝালর তাহে গজমোতি ঝারা ॥
হীরার কলস ঊর্দ্ধে দিতেছে চমক।
দণ্ডে হীরা মণি পান্না করে ঝকমক্ ॥
ঢুলাইছে চারি ভিতে ধবল চামর।
শারদ নীরদ বেড়া যেন দিনকর ॥
প্রস্থিত গম্ভীর মূর্ত্তি সচিবমণ্ডল।
দেবগণে সমবেত যেন আখণ্ডল ॥
কাঞ্চীর সচিব সন্ধিপত্র দিয়ে করে।
যথাবিধি সদ্ভাব সৰ্ক্কারি উক্তি করে ॥
কহিছেন গজপতি, আরক্ত নয়ন।
"প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন মম, না হবে কখন ॥

চণ্ডালেরে পদ্মিনীরে করিব অর্পণ।
ক্ষত্রি-অভিমান কোথা রহিবে তখন?
কাঞ্চীকুলদেব গজাননে লয়ে যাব।
মম ইষ্টদেব পাছে তাঁহারে বসাব ॥"
মন্ত্রিগণে তবে আজ্ঞা দিলা গজপতি।
"পদ্মাবতী রক্ষাভার তোমাদের প্রতি।
পরদিন শিবিরেতে হইল ঘোষণা।
"স্বদেশ গমনে পুন সাজ সর্ব্বজনা ॥"
বাদ্যরবে যেন অম্ভোনিধি উথলিল।
বন্দীভাবে গণেশেরে লইয়া চলিল ॥
হারপুরে হরিণী যেরূপ করে গতি।
সেরূপ হরিণনেত্রা পদ্মাবতী সতী ॥
সহিত সহস্র দাসী আর সহচরী।
ঘেরিয়া লইয়া যায় অসংখ্য প্রহরী ॥
চলে চতুরঙ্গ সেনা জয়মদে মাতি।
প্রবল্গিত কিবা গতি, ফুলাইয়া ছাতি।
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ মহা কোলাহল।
"জয় জগন্নাথ জয়!" বিশ্রুতি কেবল ॥
গগনে উঠিল রেণু, আচ্ছন্ন তপন।
ধূসর বরণ ধরে দিগঙ্গনাগণ ॥
আরোহিত গজপতি গজেন্দ্র-উপরে।
মাগধ চারণগণ স্তুতিপাঠ করে ॥
আগে আগে বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িছে
মহানন্দে হাসি কিবা ঢুলিয়া পড়িছে ॥
স্বর্ণ পূর্ণ কুম্ভ-যুগ, গজ-কুম্ভোপরে।
মণিময় আস্তরণ রবি ছবি ধরে ॥
লুণ্ঠিত অশেষ ধন, অসংখ্য শকটে।
মূর্ত্তিমতী জয়লক্ষ্মী প্রতিভা প্রকটে ॥
কত দিনে অতিক্রমি গোদাবরী-তীর।
নিজদেশে উপনীত গজপতি বীর ॥

ইতি সংগ্রাম নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

মিলন

আইল নিদাঘ কাল, ফুটিল নিয়ালী * জাল,
মধুমাসে মধুর উৎসবে।
আনন্দের নাহি মাত্রা, মাধবে চন্দন-যাত্রা †,
মাতিলেক ক্ষেত্রবাসী সবে ॥
কি শোভা নরেন্দ্র-হ্রদে, প্লাবিত আনন্দমদে,
তরলিত তরণীনিকর।
রত্ন সিংহাসনোপরি, কিবা বিহরিত হরি,
বিতরিত চন্দনশীকর ॥
শিখিপুচ্ছে বিরচিত, নানা রত্নে বিখচিত,
ব্যজনী বীজন করে দ্বিজ।
শ্রীচরণে অবিরত, কুসুমের বৃষ্টি কত,
মল্লিকা মালতী সরসিজ ॥
ক্ষীরনিধি-সমুদ্গত, সুধীর লহরীমত,
ঢুলায়িত ধবল চামর।
কি শোভা তরাস ভোগে ‡, স্বর্ণ রজত যোগে,
দীপ্ত দিনকর নিশাকর ॥
জিনি দিব্য শতপত্র, সুশোভিত আতপত্র,
ঝুলে তাহে মোতির ঝালর।
মুরজ মধুরী ভূরি, কাহালী ঝর্ঝরী তূরী,
বিবিধ বাদ্যের আড়ম্বর ॥
গোপীনাথ দরশনে, সচকিত যাত্রিগণে,
নরেন্দ্রের কূলে নাহি স্থান।

---

* নবমল্লিকা।

† এই পর্ব্বাহের অনুরূপ পর্ব্বাহ দেশান্তরে দ্রষ্টব্য নহে, কথিত আছে, এই পর্ব্বাহের সময়ে জগন্নাথের মন্দিরদ্বার চন্দনকাষ্ঠময় কীলকে বদ্ধ হয়, তাহাতেই চন্দনযাত্রা শব্দের উৎপত্তি। ফলতঃ এই পর্ব্বাহে নিদাঘকালোচিত চন্দনাদি উপহার দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা হয়।

‡ উৎকলদেশে ছত্রদণ্ড-চামরাদি রাজাভিজ্ঞানমূলক সজ্জামধ্যে তরাস এক সজ্জা, ইহা ত্রাস শব্দের অপভ্রংশ কি না সন্দেহ।

মনে কৃতকৃত্য গণি, মুখে হরি হরি ধ্বনি,
পুলকিত তনু মন প্রাণ ॥
দুই তরী ধীরে ধীরে, ভ্রমে নরেন্দ্রের নীরে,
বেড়িয়া মণ্ডপ সুশোভন।
গীত গোবিন্দের গীত, গুর্জ্জরীতে হয় গীত,
সুধার সুধার বরিষণ ॥
পরিহরি পিচকারী, ছুটিতে চন্দন বারি,
মৃগমদ কস্তুরী কর্পূর।
নাচে কত সুরূপসী *, তিলোত্তমা কি উর্ব্বশী,
আইল তেজিয়া স্বর্গপুর ॥
প্রদোষেতে নৃপবর, সহ অতি আড়ম্বর,
তুরঙ্গে করিয়া আরোহণ।
পর্ব্বাহেতে প্রমুদিত, রাজপথে সমুদিত,
করিছেন নরেন্দ্র গমন ॥
হেথা শুন সমাচার, সামন্ত-শিঙ্গার আর,
রাজার প্রধান যত মন্ত্রী।
পদ্মিনীর দুঃখে অতি, সবে সন্তাপিত মতি,
সংগোপনে হল ষড়যন্ত্রী ॥
কিসে কুমারীর প্রতি, নৃপতি প্রসন্নমতি,
হইবেন, সতত মন্ত্রণা।
কিসে প্রতিকূলভাব, প্রাপ্ত হবে তিরোভাব,
কিসে দূর হইবে যন্ত্রণা ॥
ভুবন-বন্দিনী হয়ে, বন্দিনী-স্বরূপ রয়ে,
তনুতনু তন্বী পদ্মাবতী।
শিশিরেতে কমলিনী, দিনন্দিন বিমলিনী,
কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনপতি ॥
দিনন্দিন পদ্মিনীরে, হেরি সবে আঁখিনীরে,
অভিষিক্ত বিষণ্ণ অন্তরে।
সেই দিন যুক্তি করি, রাখিলেন ছাদোপরি,
নৃপনেত্রে পড়িবার তরে ॥
হইল মাহেন্দ্রক্ষণ রাজা করে নিরীক্ষণ,
সহসা সে ছাদের উপরে!

অয়সে চুম্বক প্রায়, চঞ্চল কটাক্ষ ছায়,
চকোর কি প্রাপ্ত চন্দ্রকরে?
পুন পূর্ণনিভাননে, নিরখিতে ব্যগ্রমনে,
অশ্বগতি করিল মন্থর।
অমনি রমণীমণি, যথা অস্ত দিনমণি,
নয়নের হ'ল অগোচর ॥
নৃপতি পড়িল কারে, হৃদয়ে ভাবিছে কারে,
জিজ্ঞাসিব ইহার সংবাদ।
"কে এ নারী মনোহারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
অকস্মাৎ এ কি বিসংবাদ?
কলেবর শিহরিত, প্রেমবীজ অঙ্কুরিত,
পুলক-পলকে পরিচয়।
এত দিনে মনোভব করিল কি পরাভব,
বীর-বৃত্তি আমার হৃদয়?"
পরদিন নরবর, অন্তর অস্থিরতর,
নর্মসচিবেরে সংগোপনে।
ধীরে ধীরে কন কথা, প্রকাশি মনের ব্যথা,
পরামর্শ বিহিত নির্জ্জনে ॥
মন্ত্রী আচাভুয়া হেন, কিছুই না জানে যেন,
বিদায় হইল করি ভাণ।
আসি কিছুকাল পরে নিবেদিল যোড়করে,
"কিছুই না হইল সন্ধান ॥
সেই তব সুখদাত্রী, হবে বিদেশীয় যাত্রী,
দেশে গেল কিবা গৃহান্তরে।
ল'য়ে বহুতর চর, অন্বেষণ নিরন্তর,
করিলাম কত শত ঘরে ॥"
শুনি ক্ষুব্ধ নরপতি, দিন দিন ম্লান অতি,
চিত্তপটে চিত্র চারু রূপ।
ভাব-নীরে ভাবিনীর, মজ্জিত-মানস বীর,
ভাবনায় কাল হরে ভূপ ॥
পদ্মাবতী যথাক্রমে, নিরখি পুরুষোত্তমে,
বিরহে বিধুরা অতিশয়।
কিমদ্ভুত! ভাব্য নয়, মানুষের ভাবচয়,
বিষে হয় অমৃত উদয় ॥
অনৃত অথবা ভুল, প্রতিকূল অনুকূল,
কেবা কিবা কিছু স্থির নহে।
এই শীত সমীরণ, কাঁপাইছে অপঘন
এই মন্দ গন্ধবহ বহে ॥

---

* বলা বাহুল্য, উৎকলদেশীয় অনার্য্য ইতর জাতিদিগের শরীরে আদিম রক্তের অদ্যাপি বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে। সুতরাং এ স্থলে নর্ত্তকীদিগের রূপগরিমার ব্যাখ্যা কবি-কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যে ছিল পিতার অরি, সে নিল মানস হরি,
তার ভাবে মুগ্ধ অহরহ।
দাবদগ্ধ মৃগীপ্রায়, সদা সন্তাপিত কায়,
হৃদে জ্বলে বিশিখ-বিরহ ॥
দক্ষবৈরী শিবপ্রতি, সতীর অচলা রতি,
শচীপিতৃবৈরী অনুরতা।
যে বিষ্ণুর ছলে বলে, সিন্ধু মথে দেবদলে,
সিন্ধু-সুতা সে বিষ্ণু-সংগতা ॥
ভাবিনী ভীষ্মকসুতা, প্রেম-অনুরাগযুতা,
সহোদর-সূদন কেশবে।
দুর্যোধন-সুতা সতী, মুগ্ধমতি শাম্ব প্রতি,
এইমত কত শত ভবে ॥
কাঁদে সতী পদ্মাবতী, লোটাইয়া বসুমতী,
অনিবার হাহাকার মুখে।
কহে "হায়! হা বিধাতঃ, কোথা মম পিতামাতা,
অহর্নিশ মরি মনোদুখে ॥
হা রে বিধি অকরুণ! তুখিনীরে নিদারুণ,
এত কেন, কিসের কারণ?
ক্ষুধাতুর-সন্নিধান, সুধা আনি করি দান,
পানকালে কর নিবারণ!
কি কারণ গজপতি, বিমুখ আমার প্রতি,
না জানি কি দোষ শ্রীচরণে?
সে চরণে প্রাণ মন, করিয়াছি সমর্পণ,
সমভাবে জীবনে মরণে ॥
পিতা সহ জাতি-দ্বন্দ্ব, আমার কপাল মন্দ,
অপরাধ-বিহনে বন্দিনী।
দশানন-দোষ হেতু, সাগরেতে বদ্ধ সেতু,
বিবাসিতা জনক-নন্দিনী ॥"
এইরূপে কৃশোদরী, কাঁদে দিবা বিভাবরী,
ভগ্ন আশা, বিভগ্ন ভরসা।
বিগত নিদাঘকাল, মঞ্জরি তমাল শাল,
বরষা সরসা করে রসা।
নাশিতে বিরহ-শাস্তি, মেঘ কি কজ্জল কান্তি,
শার্দ্দূল গরজে অবিরত ॥
বলাকা দশনাবলী, দামিনী রসনা জ্বলি,
ক্ষণে ক্ষণে হয় বহির্গত ॥
দশদিক্ অন্ধকার, হেরি ধায় একাকার,
পরিপূর্ণ জলাশয়-কূল।

কুল-পদ্মিনীর প্রায়, পুষ্করিণী শোভা পায়,
কুলটা তটিনী ভাঙ্গে কূল ॥
দম্পতি বাঁধিয়া রসে, মানসে সুখমানসে,
মরালমণ্ডলী ধায় দ্রুত।
বিজুলীর ধক্‌ধকী, মণ্ডূকের মক্‌মকী,
ঘড়ী ঘড়ী ঘড় ঘড় শ্রুত ॥
ফুটে ফুল নানা-জাতি, কদম্ব কেতকী জাতি,
যূথী চম্পা কুটজ মালতী।
সরোবরে সুখভরে, জলচরে কেলী করে,
ঝাঁক বাঁধি ইতস্ততো গতি ॥
?
অবিশ্রাম ধারা বরিষণে।
নবদূর্ব্বাদল ক্ষেত্রে, হরষ-চঞ্চল নেত্রে,
চরিয়া বেড়ায় মৃগগণে ॥
কমল বুড়িল জলে, কেবল সমূহ দলে,
বহুবংশ নির্ধনের মত।
কোকিলা হইল কৃশা, চাতকীর গেল তৃষা,
ঘনরস ঘনরসে রত ॥
নীরদ অমৃত বর্ষে, কৃষিকুল মহা হর্ষে,
গীত গায় কেদারে কেদারে।
কেহ রোপে কেহ বুনে, কেহ লাঙ্গলের গুণে,
সুকঠিন ধরণী বিদারে ॥
বিস্তারি কলাপচক্র, কভু ঋজু কভু বক্র,
মেঘনাদে নাচে মেঘনাদ।
ফুটিল কুসুম কাশ, বসুধা-বদনে হাস,
বরষায় বিগত বিষাদ ॥
নিদাঘের তাপ গত, বিটপী ব্রততী যত,
জীবনেতে পাইল জীবন।
এমনি ঋতুর গুণ, বসন্ত-শোভায় পুন,
সুশোভিত বন উপবন ॥
ধরা হ'ল স্বর্গপুর, প্ররোহিত বীজাঙ্কুর,
ঘনশ্যাম রুচি অভিরাম।
বৃষ্টি নহে সুধা-সৃষ্টি, বিভুর করুণা-বৃষ্টি,
ধান্য-ক্ষেত্র কমলার ধাম ॥
ঋতুরসে বিনোদিত, ক্রমে আসি সমুদিত,
আষাঢ়ের পূর্ণ শশধর।
উল্লসিত ক্ষেত্রবাসী, পুন সমাগত আসি
দেবস্নান-যাত্রা আড়ম্বর ॥

গোসহস্রী অমা গত, সিন্ধুস্থানে লোক রত,
দ্বিতীয়ার হইল প্রবেশ।
পুন সুসজ্জিত হয়, মনোহর রথত্রয়,
ত্রিমূর্ত্তির বিনোদিয়া বেশ ॥
পুন স্বর্ণ-সম্মার্জ্জনী, করে লয়ে নৃপমণি,
স্বর্ণাধারে লইয়া চন্দন।
সরায়ে রথের দড়া, দেব-অগ্রে দেন ছড়া,
ধূলা মারি করেন মার্জ্জন ॥
হেনকালে মন্ত্রিবর, ধরি পদ্মিনীর কর,
নৃপ-করে দিয়ে শীঘ্রগতি।
কহে "ভো ধরণীপতি, চণ্ডালেরে পদ্মাবতী,
কন্যাদানে দিলা অনুমতি ॥
ভারমুক্ত অদ্য আমি, লহ হে চণ্ডালস্বামি,
প্রমদার সার পদ্মাবতী।"
দেখি তাহা লোকারণ্য, সবে করে ধন্য ধন্য,
"ধন্য হে সচিব মহামতি ॥"
নিরখি পদ্মিনী-মুখ, বিগত বিরহ দুখ,
সুখনীরে মগ্ন মহীপতি।
স্বপনের হারা-নিধি, জাগ্রতে মিলালে বিধি,
অতনু কি প্রাপ্ত পুন রতি?
পতি-পদে চারুশীলা, দণ্ডবৎ প্রণমিলা,
প্রেম-অশ্রু-প্লাবিত-নয়নে।
নরনাথ অনন্তর, ধরি কামিনীর কর,
ধীরে ধীরে যান নিকেতনে ॥
যত সব বর বধূ, নিরখিয়া বর বধূ,
শঙ্খনাদে পূরিল গগন।
এ দিকে রথের ছটা, ও দিকে বিবাহ-ঘটা,
মহোল্লাসে মত্ত জনগণ ॥
পদ্মিনীরে লয়ে রায়, করে স্বর্গসুখ পায়,
বহুকীর্ত্তি করিল স্থাপন।
অদ্যাপি মাণিকামূর্ত্তি, দেউলেতে পায় স্ফূর্ত্তি,
ক্ষীর খান ভাই দুইজন ॥
ভক্তিভরে মহীপাল, সত্যবাদী শ্রীগোপাল,
প্রতিষ্ঠিলা পুরীর অদূরে।
কাঞ্চী-জয়-অভিজ্ঞান, গণেশের দিলা স্থান,
প্রভুর পশ্চাতে তাঁর পুরে ॥
আর দেব-দেবী কত, কাঞ্চী হ'তে সমাগত,
শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পুন।
অদ্যাপি মৃগনাচয়, দান করে পরিচয়,
কর্ণাটের শিল্পিগণ-গুণ ॥
কালে পদ্মাবতী * সতী, বীর-বংশধরবতী,
মূর্ত্তিমতী প্রতাপলহরী।
রূপে গুণে একশেষ, শাসিল উৎকলদেশ,
শ্রীপ্রতাপরুদ্র নাম ধরি ॥

ইতি মিলন নাম সপ্তম সর্গ।

পদ্মাবতীর জীবন আদ্যোপান্ত দুর্জ্ঞেয় ঘটনাবলীপূর্ণ। কথিত আছে যে, প্রতাপরুদ্রের জন্ম পরে পদ্মাবতী মনুষ্যলোক হইতে অন্তর্হিত হন,—ফলতঃ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এ প্রকার দৈবী কল্পনা ব্যতিরেকে রাজবংশ-সমূহের মহত্ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। খ্রীঃ ১৫০১ অব্দে প্রতাপরুদ্র উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিদ্বান্, ভক্তিমান্, বলীয়ান এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি রাজকীয় বিবিধ গুণ-ভূষণে বিভূষিত ছিলেন। রাজা প্রথম বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রতিপোষক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাণী দেব-দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের শক্তি-পরীক্ষার নিমিত্ত রাজা একদা এক কুম্ভমধ্যে একটি সর্প বদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তন্মধ্যে কি আছে। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন মৃত্তিকা আছে, কুম্ভের মুখোদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল, তন্মধ্যে যথার্থই মৃত্তিকা রহিয়াছে, তদ্দর্শনে রাজার এককালে সম্পূর্ণরূপ মত-পরিবর্ত্তন হইল, তিনি তদবধি বৌদ্ধদিগের প্রতি ঘোরতর বৈরাচরণ করিতে লাগিলেন এবং অমরকোষ ও বীরসিংহ ব্যতীত বৌদ্ধদিগের যাবতীয় গ্রন্থ ভস্মসাৎ করিলেন। এই সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বদলবলে আসিয়া কিছুকালমধ্যে প্রতাপরুদ্রকে স্বমতাবলম্বী অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব করিয়া তুলিলেন।

কাঞ্চীকাবেরী সমাপ্ত

উমা

(মারবর দেশীয় উপাখ্যান)

(পাঠ—রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহ ১৩৬৬)

—মঙ্গলাচরণ—

নমস্তে গির্ব্বানি দেবী ! বাণী প্রদায়িনি !
অবিদ্যা নাশিনি মাত ! বিদ্যা-বিধায়িনি !
কবিত্ব-কমল বনে নিত্য বিহারিণি !
নানা রাগ প্রসবিনি ! বীণা বিধারিনি !
বিনোদ বসন্ত ঋতু বিধান কারিনি !
নিত্যানন্দ সঞ্চারিনি, জড়তা হারিণি !
তুমি গো ত্রিগুণময়ি ! সর্ব্বগুণময়ি !
তোমার প্রভাবে প্রভাবিত হয় ত্রয়ি।
তোমার প্রসাদে কবি, কবি নামধর।
পুরাণ পুরাণবেত্তা বিবুধ নিকর ॥
জাল্মিক বাল্মিক হৃদে করি অধিষ্ঠান।
উপজিলে অনুপম অনুষ্টুপ তান ॥
অন্যতর জাল্ম * পুন তোমারি প্রসাদে।
ধরণীতে ধন্য ধন্য কবিত্ব প্রসাদে ॥
কোথায় আছ গো দেবি ! এ ঘোর সময়ে
আর তুমি নাই কি মা ! ভব বিষময়ে ?
তব প্রিয়তম ভূমি এই পুণ্যভূমি।
কেন গো তাহারে মাতা ত্যজিয়াছ তুমি ?
তব নিত্য কেলি-স্থলী নানা নগশ্রেণী।
জাহ্নবী যমুনা সহ তুমিই ত্রিবেণী ॥
তোমার স্থাবর দেহ আর দৃশ্য নয়।
চিহ্ন মাত্র দৃশদ্বতী মন্দ মন্দ বয় ॥
সেইরূপ তব মনোময় কলেবর।
মন্দগতি পুণ্যভূমে বহে নিরন্তর ॥
সেই সারস্বত দেশ আছে বর্ত্তমান।
সেই সে মালব আছে কবিত্ব নিধান ॥
আছে সেই হিমালয় তোমার নিলয়।
কিন্তু তব দিব্য মূর্ত্তি কেন দৃশ্য নয় ?

---

* কালিদাস।

প্রথম সর্গ

হিমালয় বর্ণন

"হিমালয়"—এই শব্দ শুনি যেইক্ষণ।
কত শত ভাব আসি হৃদে উদ্দীপন॥
জন্মভূমি পুণ্যভূমি প্রধান প্রহরী।
উচ্চতায় সর্ব্ব পর্ব্বতের গর্ব্বহরী॥
অগণিত শিরোধর গগণ পরশী।
অগণিত যার কণ্ঠে স্রবিত সরসী॥
ভারতের অলংঘ্য অগম্য দুর্গবর।
অনন্ত তুষার বপ্রে সদা শোভাকর॥
অপ্রমেয় বীর্য্যধর বীরবরগণ।
প্রকম্পিত তোমারে করিয়া নিরীক্ষণ॥
তুমি মাত্র অদ্ভুত রসের অধিকারী।
তুমি মাত্র ভ্রান্ত নরে বিবেক সঞ্চারী॥
কত কবি তোমার বর্ণনে তৎপর!
বর্ণনায় অদ্যাপি কত বা অগ্রসর॥
কিন্তু কেবা কৃতার্থ ও প্রতিভা বর্ণনে।
কোটিতম অংশ নহে বিবৃত বচনে॥
আমি কি অধম ছার ওহে গিরিধব।
বিবরিব শোভা, যাহে ব্রহ্মা পরাভব॥
পঙ্গুবৎ গিরিবর লঙ্ঘনে বাসনা।
কিম্বা যথা টিট্টিভের সমুদ্র-শোষণা।
বিধাতা কি এ জগৎ নির্ম্মাণের আগে।
সৃজিলেন তোমারে হে অতি অনুরাগে?
জগতে যে কিছু উপাদান বিদ্যমান।
করিলেন তোমারে কি অগ্রে সম্প্রদান?
তোমা হতে লয়ে পবে দ্রব্য সার সার।
রচিলেন এ ব্রহ্মাণ্ড শোভার ভাণ্ডার॥
নহে কেন হেন দ্রব্য না হয় গোচর।
যাহা নাই তব কলেবরে গিরিবর?
উষ্ণ, শীত, সম খ্যাত ত্রিবিধ মেখলা।
অবনীর কটিতটে শোভে সমুজ্জ্বলা॥
লোহিত, হরিৎ, পীত, নানা রত্নচয়।
ফুল-ফল রূপে নানা দেশে দীপ্তিময়॥
যে কিছু কুসুম, শস্য, ফল, কন্দ মূল।
ভিন্ন ভিন্ন কটিবন্ধে আছে অনুকূল॥
সকলি তোমাতে দৃশ্য হয় এককালে।
কে পারে বর্ণিতে তব সেই শোভাজালে?
পূর্ব্বভাগে কমলা, কদলী, আনারস।
উষ্ণদেশ জাত ফল, দেয় নানা রস॥
পশ্চিমেতে অমৃতাহব দ্রাক্ষা নাসপাতি।
আখরোট খুবানী প্রভৃতি মেবাজাতি॥
নিম্নভাগে শাল, তাল, শিশুক, গম্ভারী।
মধ্যভাগে দেবদারু বন মনোহারী॥
ঊর্দ্ধভাগে সন্তানক আদি বৃক্ষদল।
কবির অসাধ্য বর্ণে, বর্ণে সে সকল॥
লোকে কয় পারিজাত কবির কল্পনা।
নন্দন কাননবৎ অসার জল্পনা॥
মিথ্যা নয় পারিজাত পেয়েছি প্রমাণ।
অই দেখ রুদ্র দ্রুম * শোভার নিধান॥
† তটে ফুটে ভূচম্পক, চম্পক, কদম্ব।
সরোবরে কত জাতি কমল কদম্ব॥
ভগুদেশে কত শত প্রকার প্রকার।
রক্তচ্ছদ শতচ্ছদ ‡ পুষ্প অবতার॥
সুবিস্তৃত প্রকৃতির আসন অনুপ।
কোনতন্ত্রে নিয়মিত গালিচা এরূপ!
সদাকাল ষড়ঋতু তোমাতে বিহরে।
হেনভাব আর কোথা, ভুবন ভিতরে?

* Rhododendran—"রোদোদ্রেন্দ্রন"-এই শব্দ সংস্কৃত "রুহ" ধাতু অর্থাৎ রোহিত বা লোহিত এবং সংস্কৃত "দ্রু" শব্দ সমন্বয়ে বিরচিত। অতএব Rhododendran শব্দের "রুদ্রদ্রুম" অনুবাদ করা গেল। বস্তুতঃ এই মনোহর পুষ্প যে কালিদাস বর্ণিত "নমেরু" বা পারিজাত তাহা অনুমান সিদ্ধ বলা হয়। কালিদাস রুদ্রের আশ্রমে অর্থাৎ গৌরীশিখার নমেরুর সংস্থান করিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ 'রোদোদেন্দ্রন' নামক অপূর্ব্ব পুষ্পবৃক্ষ হিমালয়ের উক্ত উচ্চ শিখরে বিরাজমান আছে—এমন বর্ণনা করেন। হিমালয়ের অন্যতর সৌরভগভ পুষ্পের নাম—মাগ্‌নোলিয়া। জনৈক ফরাসী উদ্ভিদ বেত্তার নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ফলতঃ এই সকল স্বদেশী বৃক্ষের প্রকৃত দেশীয় নাম স্থিরীকরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন—তাহাতে অনেকবস্তু যাহা এইক্ষণে অদূরদর্শীগণ কাল্পনিক জ্ঞান করেন, তাহার প্রকৃত সত্তা, সপ্রমাণ হইবে।

† Terie—হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশ 'তরাই' নামে অভিহিত হয়।

‡ একশত দল বিশিষ্ট সুপ্রকাণ্ডকায় পদ্মফুল।

ঊর্দ্ধদেশে চিরদিন হিমের নিবাস।
অনন্ত তুষার রাশি বিভায় বিভাস॥
অই কি শিবের রূপ রজত অচল ?
শিরেতে কিশোরী গঙ্গা করে ঢল ঢল ?
অই কি অনলভালে দহে দাবানল ?
হিমে হিমকরকলা রুচির শীতল !
অই কি স্খলিত জটা তুষার সংহতি ?
ভূকম্প তাণ্ডবে যবে মত্ত পশুপতি॥
কত উষ্ণ প্রস্রবনে নীল ধূম ছুটে।
অই কি শিবের কণ্ঠে শোভা কালকূটে ?
অগণিত অজগরে সদা ভয়ঙ্কর।
গরজিত ভয়ঙ্কর শব্দে নিরন্তব॥
চারিধারে বিরাজিত ভূতপ্রেত দানা।
হিমালয় বাসী ভয়াবহ জাতি নানা॥
তুষার সংহতি চয় বহু ক্রোশ বেড়ে।
প ড়তেছে, গিরি ! তব শিরঃ শিখা ছেড়ে॥
কি ভয়াল দৃশ্য ! কি ভয়াল বেগ তার।
কি ভয়াল শব্দ ! বজ্র-নির্ঘোষ হাজার।
কত শত শিলা আর গণ্ড শিলাচয়ে।
ধুনে* ধায় ধুনিত কার্পাস কায় হয়ে॥
তথা পড়ি কত কাল গর্ত্ত ভরালসে।
তটিনী প্রসব করে ভানুর ঔরসে॥
বসন্তের অধিকার সদা মধ্যদেশে।
মার কি মারিল বাণ, তথায় মহেশে !
চকোর চকোরী চয়, পিয়ে চন্দ্রবস।
কুহরে কোকিল, জাগাইয়ে দিগ্‌দশ।
মরাল ময়ূর নাচে কলাপ প্রসরি।
গায় বুল্ বুল্ বোস্তা সারা বিভাবরী॥
পূর্ব্বভাগে বর্ষাঋতু সদা আবির্ভূত।
নিদাঘ বসন্ত তথা সদা পরাভূত॥
নিবিড় নীরদ জাল নিয়ত উদিত।
গিরিগুহা গহ্বরেতে মন্দ্র নিনাদিত॥
চমকিতে চকিতে বালা চপলা চমকে।
ক্ষণ এক স্থির নহে বজ্রের ধমকে॥
বঙ্গীয় অখাতে মেঘ হইয়া সংজাত।
ব্রহ্মপুত্র পরিক্রমি করে গতায়াত॥
অবিশ্রাম বর্ষে বারি, বার মাস ভরি।
একদণ্ড ক্ষান্ত নহে দিবস শর্ব্বরী॥

* হিমালয়ের ভূগু প্রদেশ।

সংখ্যাহীন তটিনীর তুমি জন্মদাতা।
তব কন্যা বিশ্বমাতা, গঙ্গা ভীষ্মমাতা॥
চন্দ্রভাগা, ঐরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা।
শতদ্রু, যমুনা, কোশী, তথা পাপ নাশা॥
স্বর্ণশ্রী, ঘর্ঘরিকা, ত্রিস্রোতা, মনাশ।
গণ্ডকী—শ্রীশালগ্রাম শিলার নিবাস॥
তব শিরোত্তরে গিরি ! শোভার অকর।
শ্রীমানস সরোবর—হ্রদেব ঈশ্বর॥
আর সেই জম্বুহ্রদ-স্বর্ণের জনক।
অমূল্য অতুল্য যার বিষদ কনক॥
অগণিত চূড়াচয় ব্যোম বিহরিত।
অভিষিক্ত করে শির, স্বর্গীয় সরিত॥
সে কাঞ্চনজঙ্ঘ * শৃঙ্গ, আছে সর্ব্বোপরি।
গিরিগজ-কুলে ঐরাবত রূপ-ধরি॥
কুবের * কৈলাসচূড়া * আর জহ্নুমুনি।*
যাহার অক্ষয়কীর্ত্তি গঙ্গা সুরধুনী॥
অলকানন্দার মাতা, নন্দাদেবী চূড়া।*
কত যুগ পরিগত, না হইল বুড়া॥
জগৎ বিখ্যাত চূড়া—ধবল অচল।*
গোষ্ঠিকুলে গোষ্ঠিপতি, কিবা আখণ্ডল॥
কি আছে এমন জন্তু ভুবন ভিতরে !
যাহা নাই গিরি ! তব শেখরে কন্দরে॥
পশুর ঈশ্বর সিংহ কলিত কেশরে।
কৃতান্তের চর ব্যাঘ্র গভীর গহ্বরে॥
মৃগাদন, দংষ্ট্রী, ঋক্ষ, প্রকার, প্রকার।
ঈহামৃগ, বাতমৃগ, শাখামৃগ আর॥
যত জাতি মৃগ আছে অবনী মণ্ডলে।
শায়িত কস্তুরীমৃগ স্নিগ্ধ শিলাতলে॥
চমুরু, সমূরু, চীন গবয় সমব।
পৃষত, রোহিত, ত্রণ, রৌহিস, সম্বর।
শরভ, গোকর্ণ, শশ, রঙ্কু, কৃষ্ণসার।
ভ্রমিছে গোধার, শল্য, হাজার হাজার॥
ভ্রমিছে ভীষণ খড়্গা, মাহষ জম্বুক।
কত জাতি আখুভুক, মর্কট, উল্লুক॥
তব দেহে কত জাতি নরের বসতি।
রূপের নিধান কিম্বা বিকৃত মূরতি॥

*হিমালয়ের চূড়া সকলের নাম—কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুবের, কৈলাশ, জহ্নুমুনি, নন্দাদেবী, ধবলগিরি প্রভৃতি।

হয়াশ্ব, কিন্নর, যক্ষ, কুবেরানুচর।
কিরাত, ধীমাল, কোচ, ভোট ভয়ঙ্কর ॥
লেপ্‌চা, বোদো, আবু, লিম্ব, মুম্মি আদি আর।
নাগবংশী, শিখিবংশী, বিকট আকার ॥
পশ্চিমেতে দরদাদি জাতির নিবাস।
ব্রাত্যক্ষত্র বলি যারা পুরাণে প্রকাশ ॥
জাতিভেদে, ধর্ম্মভেদে হিমালয়বাসী।
বিভিন্ন বিভিন্ন কত শত ভাষাভাষী ॥
সমধিক তথাগত-মত পরায়ণ।
কোথাও বা বেদধর্ম্ম নিষ্ঠ জনগণ ॥
দরদ অধুনা মহম্মদ মতাশ্রয়ী!
হায়! হিন্দু হিমালয়ে কোরাণ বিজয়ী ॥
ফলে তুমি বিভু-ধ্যান-ধৃতি মন্ত্রদাতা।
তপঃ শ্রেষ্ঠ স্থলরূপে গড়িলেন ধাতা ॥
তোমার স্বর্গীয় শোভা করি দরশন।
নাস্তিকতা নিশাচরী করে পলায়ন ॥
অদ্ভুত ঐশিকভাব হয় উদ্দীপন।
ভক্তি আর ভয়ে প্রকম্পিত হয় মন ॥
সহসা প্রতীতি হয় ভব-ভঙ্গুরতা।
এককালে হয় মতি ব্রহ্মপদে রতা ॥
তাই তব দেহাশ্রয়ে, ওহে গিরিবর!
যুগে যুগে কত শত যোগী যোগীশ্বর ॥
কাটিয়া ভবের মায়া, মোহময় ফন্দ।
চিদানন্দ ধ্যানে লভিলেন চিদানন্দ ॥
কে ও সে কন্দরে, তব তপস্যা আচরে?
না হেরি পুরুষ হেন, ভুবন ভিতরে ॥
অর্দ্ধশশীকলা সম প্রসন্ন ললাট।
যেন বিলেখিত তাহে মহারাজ্য পাট ॥
আয়ত আরক্ত আঁখি, রক্ত শতদল।
উর্দ্ধগত তারা যেন ভ্রমর যুগল ॥
যোগাসনে বসি যোগী ভাবে যোগীশ্বরে।
দর দর দুই নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে ॥
বিহঙ্গ সে অশ্রুপানে তাপ তৃষা হরে।
চারিধারে মৃগদল সুখেতে বিচরে ॥
পঞ্চানলে তপ্ত তনু অঙ্গার আকার।
তুষারে বসিয়া তপ করে অনিবার ॥
গিরিদ্রুম সম শিরে সহে বারিধার।
প্রবল বাত্যায় তনু অচল আকার ॥

পাইলাম পরিচয় অহে গিরিবর।
মল্লদেব রায় ইনি মরুর * ঈশ্বর ॥
যশল্মীর মহীপতি-সুতা উমাসতী।
একাধারে অবতীর্ণ লক্ষ্মী-সরস্বতী ॥
মল্লদেব মুগ্ধ তাঁর শুনি রূপ গুণ।
পদ্মপাণি প্রার্থনা করিল পুন পুন ॥
বিষম বালার পণ, রণে যেই বীর।
পরাভূত করিবেক দেশ যশল্মীর ॥
তাহারেই বরমালা করিবে প্রদান।
বীরভোগ্যা বীরবালা ইহাই প্রমাণ ॥
বীরত্বের পরিচয় সম্মুখ সমরে।
না দিবে আপন কর কাতরের † করে ॥
বার বার সংগ্রামেতে পরাভূত রায়।
গুণবতী স্মেরাননে উপেক্ষিল তায় ॥
ললনার অপমানে অস্থির অন্তর।
ঘোরতর প্রতিজ্ঞা করিল বীরবর ॥
আরাধিব মহেশ্বরে গিরি হিমালয়ে।
করিব সমাধি যোগ সংযত হৃদয়ে ॥
তাহাতে বরদ যদি নন পঞ্চানন।
নিশ্চয় ত্যজিব এই অসার জীবন ॥
যথাকালে তপে তুষ্ট দেব পশুপতি।
নিশাশেষে প্রত্যাদেশ হয় তাঁর প্রতি ॥
"যাও নৃপ যাও ঘরে—এবার সমরে।
অবশ্য হইবে জয়ী, প্রতিপক্ষোপরে ॥
লভিবে রমণীরত্ন উমা ব্রহ্মদাসী।
সতী শিরোমণি সেই প্রভা পৌর্ণমাসী ॥
যথাধর্ম্ম তারে তুমি করিবে আদর।
অন্যথায় বিফল হইবে এই বর ॥"
বর লভি নৃপবর চলিলেন দেশে।
উদয় যশল্মীরে সমরের বেশে ॥
হইল বিষম যুদ্ধ কি কব বিশেষে।
যশোচ্যুত যশল্মীর হল পরিশেষে ॥

ইতি প্রথম সর্গ

---

* মারবার বা যোধপুরের নরপতি

† ভীরু।

দ্বিতীয় সর্গ

বিগ্রহ ও বিবাহ

দেখ দেখ মারবর কিবা দেশ ভয়ঙ্কর
চারিধারে অচল নিকর।
অই দেখ কি দুর্গম অসীম ভীষণতম
অন্তহীন বালুকা প্রান্তর ॥
নামে মরু ফলে মরু নাহি লতা নাহি তরু
ছায়া জল বিহীন প্রদেশ।
কণ্টকেতে সমাকীর্ণ স্থানে স্থানে স্থাণুশীর্ণ
ছায়াহীন বাব্‌লা বিশেষ ॥
লবনাম্ব পূর্ণ ধুনী রাজস্থানে খ্যাত লুনী
তৃষায় না খায় কেহ নীর।
পোষা উট ঘরে ঘরে প্রান্তরেতে সুখে চরে
জন্মে যথা প্রচুর করীর ॥
আছে অই দেশ জুড়ে আকন্দ পাতার কুঁড়ে
ফণীমনসার বেড়া তায়।
বাজ্‌রা ভাঙ্গিয়ে রোটী ডালমোট মোটামোটী
মারবরী মহাসুখে খায় ॥
নাহি জন্মে আম জাম দাড়িম্ব অমৃত-ধাম
নারীকেল কদলী পনস।
নাহিক সিন্দূর রঙ্গ সুমধুর নাগরঙ্গ
নাহি ইক্ষু নাহি আনারস ॥
উষর সিকতাময় আছে তরমুজ চয়
অগণিত করিকুম্ভ মত ॥
কর্কট † কর্কটি ‡ ফুটি হরিত মুগের শুঁটী
কুষ্মাণ্ড কদুর জাতি যত ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য বল এ ভীষণ মরুস্থল
কিসে হল বীরত্বের খনি!
এই মারবর দেশে বিভূষিলা সবিশেষে
কত শত শূর শিরোমণি ॥

ময়দানবের পুরী * যার কীর্ত্তি ভূরি ভূরি
পুরাণে প্রসিদ্ধ সবিশেষ।
দুর্গ দেখি বোধ হয় মানুষের কীর্ত্তি নয়,
অদ্ভুত রসের সমাবেশ।
যে দেশে ভুজঙ্গ শির চোহান শ্রীগর্গবীর †
রামদেব শ্রীমেঘ মঙ্গল।
হরবা ‡ সংকলা নাম বীরবর গুণধাম
প্রতাপেতে মর্ত্ত্যে আখণ্ডল ॥
আর যেই বীর্য্যাধার মল্লিনাথ † নাম যার
প্রিয়া যার পদ্মাবতী সতী।
রণে হত নিজ পতি রণে প্রাণ ত্যজি সতী
সূর্য্যলোকে করিলেন গতি ॥

---

* মারবরীদিগের দারিদ্র মেওয়ার দেশীয় কোন কবি রহস্যছলে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—আকরা ঝোপড়া, কোঁকরা বার।
দেখো হো রাজা, তেরি মারবার ॥

† শশা।

‡ কাঁকড়ী।

* এইরূপ লিখিত আছে যে মারবারের প্রাচীন নগর মন্দোর ময় দানবের পুরী ছিল। মন্দোরের প্রাচীন নাম—মন্দোদরী। কথিত আছে ময়দানব আপন কন্যার নামে ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন। মন্দোরের স্থান বিশেষ রাবণ ও মন্দোদরীর বিবাহ-সভা প্রস্তর প্রকৃতি পুঞ্জে বিখচিত আছে।

† গজনীর অধিপুতি মহম্মদ যে সময়ে ভারতবর্ষ বিজয়ে আগমন করেন। সেই সময় মারবারের এই বীররত্ন স্বীয় ৪৭ জন পুত্রসহ শত্রুর আগমন নিবর্ত্তনে শতদ্রু নদীতীরে ঘোরতর যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

‡ যোধপুর প্রতিষ্ঠাতা যোধকে পরাস্ত করিয়া চিতোরের রাণা মন্দোর অধিকার করিলে কেবল এই মহা সাহসী বীরের সহায়তায় যোধা স্বদেশ হইতে শত্রুদিগকে দূরীভূত করিয়া পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

† মল্লিনাথ একজন মারবরের অগ্রগণ্য বীরবর, —ইনি যুদ্ধে হত হইলে ইঁহার প্রেয়সী পদ্মাবতী সহমৃতা হন।

উচ্চৈঃশ্রবা শক্তিশালী নামেতে কেশর কালা
হয়বর খ্যাত রাজস্থানে।
প্রভুজী যাহার স্বামী মনোজব সমগামী
যার কান্তি-কলা গীত গানে॥

এই মল্লদেব রায় বিক্রমে কে তুল্য তায়
অদ্যাপি ও দেশ মারবরে।
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে, প্রজাগণ পূজা করে
যশোগীত নগরে নগরে॥

কি তার বীরত্ব কব মুসল্মানে পরাভব
করে যার সমর-উৎসাহ।
রণে হয় ছারখার পরাভূত বারবার
দিল্লীর অধিপ শেরশাহ॥

বিশুদ্ধ রাঠোর বংশ যশো সরসীর হংস
আদিস্থান কান্যকুব্জপুর।
করিয়া মন্দোর জয় রাজ্যপাট কাড়ি লয়
পুরীহর বংশে করি দূর॥

তদবধি কত শূর সেই বংশে বিভাস্বর
রায়মল্ল, বারসিংহ রায়।
শূরগণ অগ্রগণ্য মীরাবাঈ * পিতা ধন্য
রত্নসিংহ বিখ্যাত ধরায়॥

* * * * * * ‡

আঘাতে জর্জর হয়ে বীর বর
স্খলিত হইল পদ।
রক্ত দেহময় রক্ত মুখে বয়
আঁখি রক্ত কোকনদ॥

কাপিল শরীর ধরাশায়ী বীর
ভূকম্পে অচল প্রায়।
মুদিয়া নয়ন তেজিল জীবন
পতিত নিস্পন্দকায়॥

তেজোময় প্রাণ করিল প্রস্থান
সূর্য্যলোকে যথাস্থানে।
ধূলার এ দেহ ধূলা প্রতি স্নেহ
রহে ধূলা সন্নিধানে॥

রণে সহোদর প্রাপ্ত লোকান্তর
শুনি উমা রাজসুতা।
তুরঙ্গে আরোহি করেতে শিরোহী
এলো রণরসযুতা॥

কিরীট ধারিণী প্রলম্বহারিণী
বারবাণে তনুঢাকা।
না লুকায় ছটা ব্যর্থ ঘনঘটা
আবরিতে নারে রাকা॥

সেনায় সুন্দরী সম্বোধন করি
কহিতেছে এই বাণী।
"যেই ভঙ্গ দিয়ে যাবে পলাইয়ে
ভীরু বলি তারে মানি॥

সেই কভু নয় ক্ষত্রিয় তনয়
রাজপুত্র কুলে কালি।
জন্মিল যখনি তাহার জননী
অগ্নিতে না দিল জ্বালি॥

পলাইবে যেই হত হবে সেই
আমার আমোঘ শরে।"
শুনি সে বচন যত সেনাগণ
ফিরে এল থরে থরে॥

পুনরায় রণ বাধিল ভীষণ
দুইদলে কাটাকাটী।
চামুণ্ডার তৃষা ক্রমে হয় কৃশা
রক্তপানে পরিপাটী॥

---

* রত্নসিংহের কন্যা সুবিখ্যাতা মীরাবাঈ উদয়পুরাধিপতি কুম্ভ রাণার বণিতা ছিলেন। ইনি পরম, বষ্ণবী ছিলেন। ইঁহার রচিত ভক্তিরস পূর্ণ গাতসকল এইক্ষণে ও প্রচলিত আছে।

[‡ ইহার পর পাণ্ডুলিপিতে কয়েকটি পৃষ্ঠা (২৫-৩২) সংযোজিত না থাকায় ভাব-প্রবাহের একটু অসংগ্নতা প্রমাণিত হইতেছে।
—সম্পাদক]

যত প্রহরণ শব্দ রণরণ
করিছে আঘাত পেয়ে।
পতাকার পট করে পটপট
চৌদিগে অম্বর ছেয়ে ॥
রণে দিয়ে ভঙ্গ মাতঙ্গ তুরঙ্গ
পলাইয়ে যায় ছুটে।
কারো কাটামুণ্ড কারো কাটা শুণ্ড
ধরাসনে কেহ লুটে ॥
নাচে ক্ষেত্রপাল নাচিছেন কাল
মুণ্ডমাল পরি গলে।
ভূষণ্ডী বায়স পিয়ে রক্তরস
ডাকিছে শকুনী দলে ॥
নাচে গৃধ্রপাল নাচে ফেরুপাল
নাচিছে কঙ্কগণ।
সিন্ধু রাগময় * সমর-বিজয়
গীত গীত অনুক্ষণ ॥

যশল্মের সৈন্য ক্রমে প্রাপ্ত দৈন্য
পড়ল অনেক বীর।

প্রফুল্ল কমল শ্রীমুখ মণ্ডল
ধূলায় লুটায় শির ॥

বিতর্ক করেন মনে মল্লদেব রায়।
উচিত অস্ত্রের শিক্ষা দেখান উমায় ॥

বিহিত সন্ধান করি মারে একবাণ।
উমার কিরীট কাটি করে খান্ খান্ ॥

স্খলিত হইল তাহে মুখ আবরণ।
প্রকটিত চারু মুখ বালার্ক বরণ ॥

লজ্জিত হইয়া উমা নিবর্ত্তিয়া যান।
রাঠোর শিবিরে হয়, জয়, জয় গান ॥

বিধিমতে পরাভূত যশল্মের সেনা।
বাহুড়িল স্রোত মুখে ধায় যথা ফেণা ॥

পরদিন প্রাতে যশল্মের অধিপতি।
সভামাঝে বসিলেন ম্লান মুখ অতি ॥

মহামন্ত্রী নিবেদিল যুড়ি দুই কর।
"ক্ষোভের বিষয় কিছু না হয় গোচর ॥
পবিত্র রাঠোর বংশ, সমুজ্জ্বল অতি।
ধনমানে প্রতাপে প্রধান তার পতি ॥
করিলা বিষম পণ মহারাজ-বালা।
রণজয়ী বিনে নাহি দিবে বরমালা ॥
হারিলেন মল্লদেব বারেক দুবার।
তপেতে প্রতাপ বৃদ্ধ হইল তাঁহার ॥
রাজর্ষির প্রায় ধারা, রূপে রতিপতি।
তেজে বিভাবসু, মহারাজ, মহামতি ॥
রাজ রাজচক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ ধীমান্।
কে আছে হে রাজস্থানে তাঁহার সমান ॥
ষোড়শী হইলা বালা এই ত সময়।
পরিণয়ে বিলম্ব বিহিত কভু নয় ॥
রূপে গুণে অতুলনা, যেমন কুমারী।
উপযুক্ত বর তার রাঠোরাধিকারী ॥

মাকন্দে মাধবী যথা শোভার নিধান।
হরশিরে মন্দাকিনী কিবা পাবে স্থান ॥"

"ভাল, ভাল",—বলি সভাসদ দিল সায়!
বিচার করিয়া রায়, মত দিলা তায় ॥

গণক করিল শুভ দিনের নির্ণয়।
রাজপুরে ধুমধাম আনন্দ উদয় ॥

রাঠোর সমীপে তবে টীকার প্রেরণ।
নারীকেল লয়ে হস্তে চলিল চারণ ॥

যথাকালে নির্ব্বাহিত হইল বিবাহ।
যশল্মে প্রবাহিত উৎসাহ প্রবাহ ॥

হায় রে! মানব তব কি বিচিত্র ধারা।
সুধায় গরল উঠে, বিষে সুধাধারা ॥

এই যারে মনেতে মানিলে ঘোর অরি।
তারে কর কন্যা দান সমাদর করি ॥

ইতি—দ্বিতীয় স্বর্গ

---

* রাজপুতদিগের রণ বিজয় সঙ্গীত সকল সিন্ধুরাগে রচিত হয়।

তৃতীয় সর্গ

বিফল বিবাহ

শিখরে সঞ্চিত বারি নিরমল মনোহারী
অতি বেগে নিম্ন দেশে ধায়।
পাষাণে রচিত বন্ধ করে তার গতি বন্ধ
ঘুরে ঘুরে স্রোত ফিরে যায় ॥
তাহাতে রচিত হ্রদ কিবা বারি সুবিষদ
সমুজ্জ্বল কজ্জলের রাগে।
প্রকৃতি রেখেছে সাজি ইন্দ্রনীল রত্নরাজী
গলাইয়ে সোহাগ সোহাগে ॥
সেই জলে শতশত মানিকের তোড়া মত
শোভা পায় রক্ত কোকনদ।
স্ফটিকের দীপাকার কিবা ভাতি চমৎকার
বিকসিত শ্বেত শতচ্ছদ ॥
কমল কুমুদ কোলে লিপ্ত অলী রসভোলে
উঠিবার শক্তি নাহি আর।
কাশ্মীরী কপোলভাগে শোভা যথা নীল রাগে
পুঞ্জ পুঞ্জ ভৃঙ্গের আকার ॥
সরসীর পরিসরে চরেতে সারস চরে
কিবা স্বর গভীর মধুর !
খেলিছে মরালদল করি কিবা মদকল
কারো মুখে মৃণাল অঙ্কুর ॥
নীরে নীরে ঝাঁকে ঝাঁক বিহরিছে চক্রবাক
দম্পতি প্রেমের মন্ত্রদাতা।
দিবাভাগে সুসংযোগ নিশিতে বিয়োগ রোগ
হায়, হায় ! নিদারুণ ধাতা ॥
সেই সরসীর মাঝে অপরূপ সৌধ সাজে
বিরচিত ধবল উপলে।
জালি কার চারিধারে নানা রত্ন ফুলহারে
মিনার লতিকা ঝলমলে ॥
থাকে থাকে তিন তল উঠেছে কি শ্বেতাচল
চূড়াচয় পরশে অম্বর।
সুচারু চত্বর ঘর সুধাকর মনোহর
চারিধারে অলিন্দ সুন্দর ॥

অতি উচ্চ স্তম্ভআলী চন্দ্রশালা সুখশালী
স্থানে স্থানে আরাম শোভন।
শীতল শীকর চয় শ্রম ঘর্ম্ম নিবারয়
জলযন্ত্র নয়ন লোভন ॥
বিলাস সুখের সার বিনোদ শয়নাগার
রত্নময় পালঙ্ক নিচয়।
উপরেতে চন্দ্রাতপ জ্বলে তারা দপ্ দপ্
মাঝে রাজে চন্দ্র হীরাময় ॥
খুরাতে বিচিত্র কাজ চারিস্বর্ণ মৃগরাজ
সরজিনী শয্যা সুকোমল।
খচিত বৈদূর্য্য ফুলে মুক্তা ঝালর ঝুলে
জ্বলে যেন জ্যোতির মণ্ডল ॥
ভিত্তিতে বিচিত্র রঙ্গে বিচিত্র বিবিধ রঙ্গে
পুরাণের নানা রস লীলা।
কৃষ্ণে হেরি বংশী বটে কলিন্দ নন্দিনীতটে
নগ্না ব্রজাঙ্গনা লজ্জাশীলা ॥
কোথায় বা রস রাসে মধ্যে রাখি পীতবাসে
অষ্ট সহচরী নৃত্য করে।
কোথায় মানের দায় ধরিয়া রাধার পায়
নন্দ সুনু সাধে জোড় করে ॥
কোথায় প্রমত্ত মন যাদব যাদবীগণ
রত লাস্য অথবা তাণ্ডবে।
সুভদ্রা রৈবতাচলে বিমূর্চ্ছিতা মহীতলে
নিরখিয়া তৃতীয় পাণ্ডবে ॥
কোথা পুরুরবা সঙ্গে উর্ব্বশী বিহরে রঙ্গে
অপরূপ কুসুমেষু কলা।
কোথা হেরি মেনকায় বিশ্বামিত্র মোহ যায়
জাত যাহে দেবী শকুন্তলা ॥
কোথা অসম্ভব কেলি অঞ্জনা সহিত মেলি
প্রভঞ্জন কাননে বিহরে।
ইন্দ্র চন্দ্র কোন স্থানে জর্জ্জরিত ফুলবাণে
নিজ নিজ গুরুদারা হরে ॥
কোথা সেই দশানন করে করি আকর্ষণ
রম্ভারে হারয়ে লয়ে যায়।
কোথা তিলোত্তমা তরে দুই ভেয়ে যুদ্ধ করে
সুন্দ উপসুন্দ মহাকায় ॥

কোথায় স্মরারি হর স্মর-শরে থর থর
মোহিনীর পাছে পাছে ধায়।
কোথা উষা স্বপ্নাবেশে নিরখিছে জীবিতেশে
উঠাইয়ে বাহু লতিকায়॥
এইরূপ অপরূপ চন্দ্র শালিকায়।
যামিনী যাপন করে মল্লদের রায়॥
বিগত প্রথম যাম, অনাগত প্রিয়া।
বিহ্বল বিলাস রসে, দুরুদুরু হিয়া॥
সচকিত দুই নেত্র একদৃষ্টে চায়।
যোগী যেন যোগভরে যোগেন্দ্রে ধিয়ায়॥
পালিত কলাপী পদে বাজিলে ঘুঙ্গুর।
ভাবে বুঝি প্রিয়া মম এলো কেলিপুর॥
মদন সারিকা পড়ে কাঞ্চন পিঞ্জরে।
রাজা ভাবে এলো প্রিয়া এতক্ষণ পরে॥
বিরল বিজনস্থান নাহি শব্দ সাড়া।
সামান্য শব্দের প্রতি নৃপ কর্ণ খাড়া॥
চিন্তা আর উদ্বেগের স্বরা সহচরী।
বার বার সেবে তায় নৃপতি কেশরী॥
অই এলো, অই এলো, ভাবে অনিবার।
ছট্‌ফট্‌ জালে বদ্ধ কুরঙ্গ আকার॥
প্রবেশ দ্বারের প্রতি একদৃষ্টে চায়।
বীণার ঝঙ্কারে কভু এইরূপ গায়॥'
"উদয়ে উদয় শশী বিগত তিমির মসী
হাসিতেছে দিগঙ্গনাগণ।
কতক্ষণে প্রিয়া মোর নাশিবে বিরহ ঘোর
মলিনতা করিবে হরণ॥
ফুটিছে চামেলী ফুল ছুটিছে মধুপ কুল
বিলসিত কেলি কুঞ্জময়।
সুমন সদৃশ মন রসহীন অনুক্ষণ
প্রিয়া বিনা প্রফুল্ল না হয়॥
কলিকার কানে কানে কি কথা কহে কে জানে
গন্ধবহ মৃদু মৃদু স্বরে।
নব বধূ পুষ্পকলি সে রসে যেতেছে গলি
মন্দহাস বিকাশ অধরে॥
সেইরূপ কতক্ষণে প্রিয়াসনে একাসনে
বসি মৃদু মধুর বচনে।
সাধনা করিব তার জুড়াইবে প্রাণামার
সুধাময় স্মিত সঞ্চরণে॥
তীক্ষ্ণতান সমাশ্রিয়া ডাকে বন-প্রিয় প্রিয়া
বসি ঘন তমালের দলে।
প্রিয়ার অমিয় বাণী শ্রবণেতে এই মানি
বাণী-বীণা ঝঙ্কার ভূতলে॥"
মন্মথ অনল জ্বলে না পায় আহুতি।
প্রিয়া পাশে দুইবার পাঠাইল দূতী॥
ফিরে আসি মল্লদেবে কহিল কিঙ্করী।
বিনোদ বেশেতে ব্যস্ত আছেন সুন্দরী॥
বেশ-ভূষা সমাপিয়া আসিছেন ত্বরা।
সমূর্চিত কিছুক্ষণ সম্বরণ করা॥
হেনকালে দেখ কি দৈবের দুর্ঘটনা।
আইল তথায় এক ললিত ললনা॥
প্রথম যৌবনী ধনী, লাবণ্যের ডালা।
উমার সে নর্মসখী, হয় নববালা॥
ভ্রান্তিদেবী নাম তার উমার আকার।
উমা বলি, হৃদে হয় ভ্রান্তির সঞ্চার॥
উমা আগমন বার্ত্তা কহিতে রাজায়।
অগ্রসর, মরাল গমনে ধীরে যায়॥
যুগল নয়ন যেন কমলেতে অলী।
অধরে মধুর হাস, হসিত বান্ধুলী॥
হেরি তায় উঠি রায় অধৈর্য্য হইয়ে।
পালঙ্ক উপরে তারে বসান লইয়ে॥
কোলেতে লইয়ে পুনঃ গাঢ় আলিঙ্গিয়ে।
আদর করেন কত চুম্বিয়ে চুম্বিয়ে॥
অবাক হইল ভ্রান্তি, নাহি সরে কথা।
হেনকালে উমাদেবী উপনীত তথা॥
হতবুদ্ধি মল্লদেব হেরি অবলায়।
গৃহ ত্যজি ভ্রান্তিদেবী ছুটিয়ে পলায়॥
জম্বুকীর সহ স্বীয় নাথে নিরখিয়া।
কেশরী কুমারী যথা উঠে গরজিয়া॥
সেইরূপ গরজিয়া উঠে উমা সতী।
ক্রোধভরে গরগর, গরল ভারতী॥
"ধিক্ ধিক্ শতধিক্, ধিকরে রাঠোর!
রাজপুত কুলে তুমি কলঙ্ক কঠোর॥

পুরুষ বলিয়ে বৃথা দেহ পরিচয়।
ধৈর্য্যবল কিছুমাত্র লক্ষ্য নাহি হয় ॥
হিমালয়ে তপস্যা করিলে কার লাগি ?
অমৃতের স্পৃহা রাখি, বিষে অনুরাগী ॥
কি কাজের বল, এই শরীরের বল।
ধৈর্য্য বিনা বীর্যবল বিফল কেবল ॥
পাইলাম পরিচয় প্রকৃত তোমার।
তুমি কভু যোগ্য বর নহ হে আমার ॥
যা হবার হইয়াছে বিধির নিবন্ধ।
প্রস্ফুট নয়ন মম, আর নাহি অন্ধ ॥
আর আমি মুখ তব না হেরিব কভু।
কেলি হেতু অনেক কামিনী আছে, প্রভু!
সেই নরাধম, তার নাহি দূর দৃষ্টি।
যে ভাবে, কামার্থে শুধু কামিনীর সৃষ্টি ॥
মান বিনা সুখ নাই রমণীর মনে।
সুখ বিনা রতি রস ব্যর্থ সর্ব্বক্ষণে ॥
গণিকা প্রদান করে দিবা নিশি রতি।
কখন কি সুখান্বিত হয় তার মতি ?
এই আমি তব পদে লইনু বিদায়।
নামেতে সধবা, কিন্তু বিধবার দায় ॥
মানসে পূজিব তব পদ অহরহ।
হইল বিরহ কিন্তু শরীরের সহ।"
এত বলি নম্রমুখী, নম্রমুখে যায়।
কাষ্ঠ পুত্তলিকা প্রায় মল্লদেব রায় ॥
প্রভাতের পূর্ব্বে পরিহরি যশল্মীর।
মনোদুখে আপনার দেশে যায় বীর ॥
হেথা শুন সমাচার ভ্রান্তি দেবী নিয়া।
প্রাণভয়ে ধায় সেই রাজপথ দিয়া ॥
মন্দোরের অধিপতি সিংহরাজ নাম।
বিবাহেতে এসেছিল যশল্মীর ধাম ॥
ভ্রান্তিরে দেখিয়া পথে অশ্বে তুলে লয়।
স্বদেশেতে গিয়ে তারে করে পরিণয় ॥

ইতি তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

আশা বিভঙ্গ

ধরিল যতিনী বেশ উমা বিনোদিনী।
নবীন যৌবনে যথা নগেন্দ্র নন্দিনী ॥
একবেনী শিরোদেশে, লুণ্ঠিত ভূতলে।
যমুনা নেমেছে কিবা ত্যজি হিমাচলে ॥
বিনা তৈলে চিক্কণতা না হইল দূর।
সধবার চিহ্নমাত্র সীমন্তে সিন্দূর ॥
অধরে নাহিক মাত্র তাম্বুলের রাগ।
সহজে আরক্ত, পক্কবিম্ব পরভাগ ॥
অঞ্জন বিহীন নেত্র কিবা শোভাস্থল।
সহজে অপাঙ্গ তার দলিত কজ্জল ॥
অষ্ট অঙ্গে অলঙ্কার পরিহরে বালা।
কেবল শ্রীকর কমলেতে অক্ষ মালা ॥
বিভূতি ভূষিত ধনী করিলেন কায়।
ভস্মে কভু অনলের প্রতিভা লুকায় ?
গৈরেয় বসনে শোভা বাড়িল দ্বিগুণ।
আবক্ত নীরদাবৃত তরুণ অরুণ ॥
মহাসুখে পরিহরে সে পঞ্চ মকার।
প্রাণ ধারণের উপযোগী ঘৃতাহার ॥
প্রাতঃ, মধ্য, সন্ধ্যাকালে তিনবার স্নান।
চিদানন্দে চিন্তা করে, চিত্ত একতান ॥
অবিরত পূজা হোম যত ব্রতাচার।
দেব দ্বিজ প্রতি ভক্তিমতী অনিবার ॥
দিন দিন তনু তনু, লাবণ্য না ছাড়ে।
শশীকলা সম রূপ দিন দিন বাড়ে ॥
একদা উমার পুরে দৈব নির্ব্বন্ধন।
আইল ধূর্জ্জটি নামে বিখ্যাত চারণ ॥
উমা তারে পূজিলেন বিহিত সৎকারে।
দক্ষিণা না লয়ে সেই কহিছে উমারে ॥
"দক্ষিণা তোমার করে লইতে না পারি।
সধবা হইয়ে তুমি বিধবা আচারী ॥
ধব সত্ত্বে ধবহীনা, এ কেমন রীতি ?
কেন বিপর্য্যয় কর শাস্ত্র সিদ্ধ নীতি ?

পতির আয়তি রক্ষা করে পতিব্রতা।
হাত রণ্ড করিয়াছ—একি ধার্ম্মিকতা ?
এই কথা সার, বেদ পুরাণে নিশ্চয়।
পতি যদি সহস্র দোষেতে দোষী হয়॥
পতিব্রতা কভু তারে অশ্রদ্ধা না করে।
যথাশক্তি গৃহ দেবে পূজে ভক্তি ভরে॥
কহ কহ রাজবালা কিসের কারণ ?
একবেণী শিরোদেশে করিছ ধারণ ?
অতি অবিহিত এই সব ব্যবহার।
অবিলম্বে এই বেশ কর পরিহার॥
নতুবা, জানিহ মম এই স্থির পণ।
দক্ষিণা না লয়ে আমি করিব গমন॥"
শুনি বাণী বিনোদিনী ধীরে ধীরে কন।
"সুধা বিষে মিশ্র প্রভু, তোমার বচন॥
যাহার সুখের জন্য অঙ্গে নারীগণ,
পরিধান করে নানা বসন ভূষণ॥
যাহার সোহাগে তারা হয় সোহাগিণী।
দিবানিশি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমানুরাগিণী॥
সেই পতি করে যদি অবজ্ঞা তাহারে।
কিবা প্রয়োজন বল রত্ন অলঙ্কারে ?
কিবা প্রয়োজন চীনাংশুক পরিপাটী ?
কিবা প্রয়োজন বারাণসীজাত শাটী ?
কিবা প্রয়োজন তার অগুরু চন্দনে ?
কিবা প্রয়োজন চারু গন্ধ আবর্ত্তনে ?
যতি ধর্ম্ম সে নারীর প্রতি সমুচিত।
ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করা চিত॥
সত্য বটে পতি যদি শতদোষী হয়।
তাহারে উপেক্ষা করা পত্নী-ধর্ম্ম নয়॥
একান্তে পতির পদ চিন্তিবে প্রমদা।
আমি পতি পদাম্বুজ চিন্তা করি সদা॥
রণ্ড হস্তে দক্ষিণা যদ্যপি নাহি লহ।
এই আমি পরিতেছি ভূষণ নিবহ॥"
গৃহান্তরে যায় ধনী, কহি এ বচন।
সধবা বিহিত বেশ করিল রচন॥
বিজটা বলয় করে, করে ঝলমল।
শোভে পুন মুক্তামালা হৃদয় মণ্ডল॥
কর্ণে পুন স্থান পেয়ে নাচে কর্ণফুল।
সীমন্তে রতন গুচ্ছ নাহি তার তুল॥
চঞ্চলিত চন্দ্রহার শ্রোণীর ফলকে।
চরণে চরণ-পদ্ম ঝলকে পলকে॥
স্বর্ণ তন্তুময় শাটী কাঁচুলী চমকে।
মধুর ঘুঙ্ঘুর বাজে, গতির ঠমকে॥
স্বর্ণপাত্রে স্বর্ণমুদ্রা সুসজ্জিত করে।
কমলা আইলা কিবা চারণ গোচরে।
দক্ষিণা প্রদান করি, করিলা প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করেন চারণ গুণগ্রাম॥
"হউক পতির পদে ভক্তি অবিচল।
করে যেন পুত্র তব স্তন্য সমুজ্জ্বল॥"
বিদায় লইয়া তবে চলিল চারণ।
অচিরাৎ মারবরে দিল দরশন॥
মল্লদেব সমাদরে পূজিলেন তায়।
উমার প্রসঙ্গ উঠে কথায় কথায়॥
ধূর্জ্জটি কহেন,-"শুন, শুন, নরপতি।
উমার সমান নাই ধরাতলে সতী॥
একান্ত তোমার পদে আছে তার রতি।
যতী ধর্ম্ম আশ্রয়ে ছিলেন গুণবতী॥
আইলা দক্ষিণা দিতে দুটী রণ্ড করে।
নিরখি আমার নেত্রে অশ্রুধারা ক্ষরে॥
কহিলাম বিধবার বেশ সত্ত্বে স্বামী।
দক্ষিণা তোমার হস্তে না লইব আমি॥
শুনিয়া বিধবা বেশ করি পরিহার।
ক্ষণান্তে আইলা সতী, পরি অলঙ্কার॥
কহে রোষ কিছুমাত্র নাহি তব প্রতি।
পতির সহস্র দোষ ক্ষমে যেই সতী॥"
শুনিয়ে রাজার মনে আশার সঞ্চার
মৃতদেহে প্রাণ যেন আইল আবার॥
প্রখর ময়ূখ রমনীর নিন্দাজালে।
আশারূপ চারুলতা শুখাল অকালে॥
চারণের বাক্যে বর্ষে প্রবোধ সলিল।
মৃতপ্রায় আশালতা পুনঃ মঞ্জরিল॥
উমাসহ পুনর্ব্বার হইবে মিলন।
নিভিবে বিরহানল জুড়াবে জীবন॥

আর যে এমন হবে নাহি ছিল মনে।
উমাশশী প্রকাশিবে হৃদয় গগনে ॥
মনের যাতনা যত সব হত হবে।
ভাবী সুখ ভাবি রায়, মাতিল উৎসবে ॥
দিন স্থির করি বীর বিহিত বিধানে।
ধূর্জ্জটিরে পাঠাইলে উমা সন্নিধানে।
পতি আগমণ বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
চারণেরে চারুশীলা কহেন বচন ॥
"এখনো পরীক্ষা বাকী আছয়ে আমার।
মরুর ঈশ্বর যদি তাতে হন পার ॥
তবেই তাঁহার সঙ্গে হইবে মিলন।
অন্যথা বিরহ বনে ত্যজিব জীবন ॥
ধূর্জ্জটি আইল ফিরে রাজার সদন।
উমার সকল কথা করে নিবেদন ॥
শুনি কথা এই তক নৃপতির মনে।
না জানি কি পরীক্ষা লইবে বরাননে ॥
যে হৌক সে হৌক গিয়ে সমীপে তাহার
পদাম্বুজে ধরিয়া মাগিব পরিহার ॥
সহচর সঙ্গে রঙ্গে তুরঙ্গে চাপিয়া।
প্রিয়া পাশে যায় বীর আনন্দিত হিয়া ॥
কতদিনে যশল্মীরে গিয়া উপনীত।
সমাগত বিভাবরী, দিবস অতীত ॥
প্রদোষের সুধীর সমীর প্রবাহিত।
ফুটিল রজনীগন্ধা, সুরভি ভরিত ॥
প্রস্ফুটিত কুমুদিনী, যুথিকা মল্লিকা।
প্রস্ফুটিত কস্তুরিকা, চামেলী কলিকা।
ফুটিল ধুতুরা ফুল, ধবল উজ্জ্বল।
যেন যামিনীর শিরে, মুকুতা অমল ॥
শ্বেতনিভ পুষ্পচয়, রবি ছবি লাজে।
যেন হীরা মোতী বিভূষণে নিশি সাজে ॥
অধোভাগে রক্তাভ কুসুম নিচয়।
উপরে নক্ষত্রমালা সাজে স্বর্ণময় ॥
সুধাময় শুভ্রময় শশীর কিরণ।
তামসীর তমোশাটী করিল হরণ ॥
স্বর্ণবর্ণ বসনে শোভিত বিভাবরী।
অপূর্ব্ব সুরভি ভরে ভরিত সুন্দরী ॥

মৃদু মধু মলয়জ সুরভি মাখিয়া।
ঝুরঝুর ধরে সুর, থাকিয়া থাকিয়া ॥
অর্দ্ধনিশী গত প্রায়, রূপসীর দাসী।
রাজারে ডাকিতে এলো মুখে মন্দ হাসি ॥
চলিলেন মল্লদেব তটস্থ হইয়া।
অপরাধী চৌর প্রায় ভয়ে ভীত হিয়া ॥
দেখিলেন বসি উমা পালঙ্ক উপরে।
মানাম্বরে আবরিয়ে মুখ সুধাকরে ॥
ধরিবারে ধীরার চরণে ধীর ধায়।
অমনি রমণী মানি উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
চিন্তাভরে চিত্ত যেন চেতনা বিহীন।
কপোল কমল চারু করতলে লীন ॥
প্রভাতের চাঁদ প্রায় মলিন বদন।
তপ্ত শ্বাসে শুষ্কাধর সুধার সদন ॥
নাথের প্রথম দোষ হৃদয়েতে জাগে।
থর থর কলেবর অভিমান-রাগে ॥
নয়ন নলিন যুগে অশ্রুর আদেশ।
সিক্ত তাহে নিরমল কপোল প্রদেশ ॥
চির বিরহান্তে রায় উমা-সম্বোধনে।
জিজ্ঞাসেন—"কেমন আছ হে সুবদনে ॥"
কিছু না কহিলা উমা, কিন্তু দু'নয়ন।
সকলি কহিল করি অশ্রু বরিষণ ॥
হের! মল্লদেব প্রসারিয়া দুইবাহু।
উমাশশী ধরিবারে ধায় যেন রাহু ॥
সেইক্ষণে উমাসতী বাতায়ন দিয়া।
অকস্মাৎ নীচে পড়ি যান পলাইয়া ॥
নীচে ছিল অশ্ববর তাঁহার আদেশে।
তাহে পড়ি যান বালা নিভৃত প্রদেশে ॥
হতবুদ্ধি মল্লদেব দেখিয়ে চরিত।
আশাভঙ্গে মলিনতা মেঘাচ্ছন্ন চিত ॥
প্রভাতে আপন দেশে করিলা প্রয়ান।
দিন দুই পরে উমা পত্রিকা পাঠান ॥

———

মল্লদেবের প্রতি উমার পত্রিকা

"প্রাণে মরি নাই নাথ ! তোমার প্রসাদে।
সকল মঙ্গল মম তব আশীর্ব্বাদে ॥

পাইলাম প্রভু তব আরো পরিচয়।
পতি-পত্নী একদেহ মিছে লোকে কয় ॥

তা হইলে কেনই বা হইবে বিরহ !
প্রথম পরীক্ষা নাথ মনেতে স্মরহ ॥

দ্বিতীয় পরীক্ষা এই শুন প্রাণ পতি।
আমি অর্দ্ধ অঙ্গ নহি, অসৌভাগ্যবতী ॥

যখন পড়িনু আমি ত্যজি বাতায়ন।
কেন সঙ্গে সঙ্গে, তুমি না হলে পতন ?

প্রাণে বাঁচিলাম, কিম্বা পাইনু সংহার।
একবার সমাচার না নিলে আমার ॥

স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলে আপনার দেশে।
জ্ঞান লেশ নাহি পতি-ধর্ম্ম-উপদেশে ॥

কিসের বীরত্ব তার বুঝিতে না পারি।
বিপদে না দেখে যেই আপনার নারী ॥

চিরকাল পতি পরায়ণা যত সতী।
সম্পদে বিপদে, যথা পতি তথা গতি ॥

দেখহ জনক স্বতা সীতা চারুমতী।
রাজ্য ছাড়ি বনে যান পতির সংহতি ॥

বনে বনে ফিরিলেন মহানন্দ মনে।
ইন্দ্রের অমরাবতী মানিয়া কাননে ॥

সেইরূপ দময়ন্তী রাজা নল সনে।
নল তারে ছেড়ে গেল বিজন গহনে ॥

স্মরহ হরিশ্চন্দ্র নৃপের আখ্যান।
অন্যের চিন্তায় চিন্তা মূর্চ্ছাগত প্রাণ ॥

সেইরূপ যাজ্ঞসেনী কানন চারিণী।
পাণ্ডব মোহিনী সতী দুঃখ নিবারণী ॥

দেখহ সাবিত্রী কথা, অদ্ভুত ভারতি।
নিজ পুণ্যবলে সতী বাঁচাইলা পতি ॥

সতী শিরোমণি দাক্ষায়নী শিবরানী।
প্রাণ ত্যজিলেন শুনি পতি নিন্দা বাণী ॥

এইরূপ কত শত পুরণেতিহাস।
নারী পতিভক্তি কথা করিছে প্রকাশ ॥

পুরাণে প্রমাণ কিন্তু নাহি পাই আমি।
নারীর বিপদে পতি তার অনুগামী ॥

কোন্ পতি পত্নী নিন্দা শুনি ত্যজে প্রাণ ?
কোন্ পতি হয় পত্নীর চিতায় শয়ান ?

কোন্ পতি রণ্ড থাকে পত্নী হলে গত ?
কোন্ পতি পত্নীগতে ভোগরাগ হত ?

এক মন, এক দেহ, ভাবে যে দম্পতি।
সেইখানে স্বখ আর সৌভাগ্য উন্নতি ॥

যেখানে পত্নীরে পতি ভাবে নিজ দাসী।
নিগড় শৃঙ্খল কিম্বা মায়াময়ী ফাঁসী ॥

ইন্দ্রিয় স্বখের জন্য নারীরূপা যন্ত্র।
স্বতস্বতা প্রসবের একমাত্র যন্ত্র ॥

সেইখানে স্বখ নাই, দুঃখ ভরা মাত্র।
জীয়ন্তে জ্বলিত নারী কিবা দিবারাত্র ॥

নারী নহে গৃহসজ্জা, বসন, ভূষণ।
শুধু পুরুষের স্বখ-সম্ভোগ কারণ ॥

যদবধি তব নাথ এই ভাব রবে।
ততবধি মম সহ মিলন না হবে ॥

এ জীবনে সিদ্ধ নহে মম মনস্কাম।
লহ হে জীবিতেশ্বর, দাসীর প্রণাম ॥

ইতি চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

সহমরণ

ক্রমে ক্রমে গত কাল   সমাগত হয় কাল
পীড়াক্রান্ত মল্লদেব রায়।
ব্যাধি বিদ্যা পরায়ণ   আসিয়া ভিষকগণ
বিধিমতে করেন উপায় ॥
ক্রমে বৃদ্ধি পায় রোগ   শান্তি স্বস্ত্যয়ণ যোগ
কিছুতেই কিছুই না হয়।
কাল আসি ধরে যায়   কে রক্ষা করিবে তায় ?
বিধাতার সাধ্য কভু নয় ॥
দিন দিন তনুক্ষীণ   কভু কভু জ্ঞানহীন
প্রলাপ বকেন কত রায়।
কভু তন্দ্রা কভু ভ্রম   শ্বাস ত্যাগে হয় শ্রম
মিথ্যা দৃষ্টি কথায় কথায় ॥
কখন হিমাঙ্গ সব   কখন বা নাহি রব
কখন পিপাসা অতিশয়।
ভাব দেখি ভূপতির   ইহাই হইল স্থির
উচ্চ হর্ম্মে রাখা আর নয় ॥
নৃপে লয়ে শিরোপরি   অট্টালিকা পরিহরি
অনুচর গণের কল্লোল।
শুনি কথা অকস্মাৎ   হল যেন বজ্রপাত
অন্তঃপুরে রোদনের রোল ॥
আছে নদী সর্পাকার   নাগদহ নাম তার
তার তীরে পুষ্পকুণ্ড নাম।
আছে এক মনোহর   গভীর গহ্বর বর
নাহর রায়ের সুখধাম ॥
শ্রীময় দানব কারু   নিরখিলা দুর্গচারু
নাম তাই মন্দোদরী পুর।
আছে গণ্ড শৈলময়   রচিত প্রাচীর চয়
পর্ব্বতের গর্ব্ব করে দূর ॥
মন্দির অচলোপম   গৃহচয় মনোরম
শ্বেতবর্ণ শিলায় শোভন।
কোথা প্রতিষ্ঠিত ধীর   প্রতিমূর্ত্তি নাথজীর
হস্তে অক্ষমালা বিভূষণ ॥
কোথায় কঙ্কালমালে   শোভা পান পঞ্চশালে
ভয়ঙ্করী কঙ্কাল-মালিনী।
কোথায় চামুণ্ডাচণ্ডী   মহিষ মস্তকখণ্ডী
অষ্টভূজা অমর পালিনী ॥
সেই স্থানে ভূপতির   দেহ রাখে যত বীর
পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ।
এই সে মন্ত্রণা হয়   আছে বহু রাণীচয়
সহমৃতা হবে কোন্ জন ?
প্রধানা সে উমাসতী   আর সবে পুত্রবতী
স্নেহপাশে বদ্ধ অনুক্ষণ।
কেহ নিজ অভিলাষ   না করিলা পরকাশ
সহ মরণেতে ভীত মন ॥
ধূর্জ্জটি উঠিয়া কন   "শুন সভাসদ্‌গণ
নিশ্চয় আমার এই বাণী।
দেহ দেহ সমাচার   ইতে অগ্রসর আর
কেবা আছে বিনা উমারাণী ?"
চারণের উক্তি সমাপন হবা মাত্র।
ধূর্জ্জটিরে যশল্মীরে পাঠাইলা পাত্র ॥
উষ্ট্রে উঠি যায় সেই অতি ত্বরাত্বরি।
কতদিনে উপনীত যশল্ নগরী ॥
উমার নিকটে গিয়ে দিল সমাচার।
শুনি কথা স্বর্ণলতা স্তম্ভিত আকার ॥
যেন স্থির, পাষাণের প্রতিমা মতন।
কিছুক্ষণ নাহি নেত্রে পলক পতন ॥
ক্ষণান্তে সে ভাব গত কহিলা চারণে।
"এখনি যাইব আমি পতির সদনে ॥
পতি চিতানলে তনু করি ছারখার।
রাজপুত্রী যোগ্য ধর্ম্ম করিব স্বীকার ॥
ক্ষণেকে ক্ষণিক দেহ হবে ভস্মসার।
পতি সহ প্রবেশ করিব স্বর্গদ্বার ॥
অমরাবতীতে আর না হবে বিরহ।
নন্দনে আনন্দ মনে যাবে অহরহ ॥"
শুনিয়া সতীর বাণী, তাঁর ভ্রাতৃজায়া।
বিজয়া তাহার নাম প্রকম্পিত কায়া।

কহে—"একি ননদিনি ! সুকঠিন পণ ।
প্রত্যাখান তোরে উমা ! করিল যে জন ॥
যেই তোরে উপেক্ষা করিল বার বার ।
পরকীয় রসে রত অগ্রেতে তোমার ॥
তার তরে প্রাণ দিবে, কেন গো কিজন্যে ?
স্বচ্ছন্দে গৃহেতে বসি থাক রাজকন্যে ॥
যার তরে একাকিনী একবেনী বালা ।
ধরণীতে লুটাইলে জটা সুবিশালা ॥
যার তরে যতিনী হইলে এ যৌবনে ।
যার অপরাধে ধিক্ মানিলে জীবনে ॥
তার তরে প্রাণ দিবে কিসের কারণ !
কার তরে করিলে গো এ প্রাণ ধারণ !
বিধবার মত তব সব ব্যবহার ।
সেই মত পতি গতে থাকগো আবার ॥
এই দেহ লাভ হয় বহু পূণ্য বলে ।
তাহে রাজকুলে জন্ম বহুভাগ্য ফলে ॥
মনে কর, সহ কত, যত্ন আর স্নেহ ।
লালিত হইল তব মনোহর দেহ ॥
কত যত্নে পূর্ণ তব লাবণ্য সরসী ।
একবার হৃদয়েতে চিন্তহ রূপসি !
নাহি তুল্য বহুমূল্য এই তব দেহ ।
ঈশ্বরের অনুগ্রহ, কি আছে সন্দেহ !
ঐশিক নিয়ম এই শুন সুবদনি !
জরাগ্রস্ত হয়ে জীব যান সংযজনী ॥
কিম্বা রোগ ভোগ করি দেহের অত্যয় ।
আকস্মিক ঘটনায় কভু হয় লয় ॥
ইচ্ছা করি আত্মহত্যা - পরম পাতক ।
নরক যন্ত্রনা সহে, যে আত্মঘাতক ॥
আর শুন ননদিনি ! বচন নির্য্যাস ।
শাস্ত্র উপদেশে যদি এতই বিশ্বাস ॥
নহেত অক্ষয় স্বর্গ সহমৃতা প্রতি ।
নিয়মিত কাল স্বর্গে বাস সহ পতি ॥
কালগতে পুনরায় হইবে বিরহ ।
এ হেন বিষম কার্য্যে কিবা সুখ কহ ॥
বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সুবিহিত ।
চিরকাল স্বর্গে বাস পতির সহিত ॥"
এরূপে বিজয়া কহে প্রবোধ বচন ।
কিছুই না শুনি উমা কহেন তখন ॥ *

* কাব্যটির সমাপ্তি এই স্থানেই হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যদিও পাণ্ডুলিপিতে ইহার পর আর কোন পৃষ্ঠা সংযোজিত নাই ।
—সম্পাদক ।

ভেক মূষিকের যুদ্ধ

(পাঠ—প্রথম সংস্করণঃ ১৮৫৮)

এডুকেশন গেজেট হইতে সমুদ্ধৃত

কলিকাতা

সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল

১৮৫৮ ।

ভূমিকা

এই উপকাব্য, পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়াছিল। রচনা দৃষ্টে অনেকে কৌতুকানুভব করিয়া গ্রন্থাকারে তদ্দর্শনের ইচ্ছা বিজ্ঞাপন করাতে তাঁহাদিগের অভিমত পালন করা যাইতেছে। ইউরোপীয় কবিকুলের পিতৃস্বরূপ আদি মহাকবি হোমর মহোদয়ের নামে এই উপকাব্যের জনন প্রবাদ আছে, কিন্তু ঈলিয়ড্ ও অডেসি খ্যাত অনুপম মহাকাব্যদ্বয়ের জনয়িতা যে এরূপ ক্ষুদ্র কাব্যের প্রণেতা হইবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তবে এই এক প্রবোধের পথ আছে, যে, যে মহাসমুদ্র প্রবাল মৌক্তিকাদি রত্ননিচয়ের ও তিমি তিমিঙ্গিলাদির আধান হইয়াছেন, সেই রত্নাকর শুক্তি শম্বুকাদি সামান্যতম জলজন্তুনিকরেরও আকর স্বরূপ! ফলতঃ ভাবুকদিগের নিকট সাগরজ শুক্তি শম্বুকাদির চাকচিক্য এবং বিচিত্র রাগরঙ্গাদি সামান্যতর নয়ন মনোহরঞ্জনকারি নহে। ভেক মূষিকের মূলকাব্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই তাহার মাধুর্য্য রসে অপূর্ব্ব সুখানুভব করিয়া থাকিবেন। উপস্থিত মর্ম্মানুবাদ তাঁহাদিগের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ প্রস্তুত নহে, ফলতঃ ইউরোপীয় মহাকবিদিগের কবিত্ব ছটার প্রতিবিম্ব, এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিম্বিত করাই আমাদিগের মুখ্য অভিপ্রেত। অনেকে কহেন, ইউরোপীয় কবিত্ব এতদ্দেশীয় ভাষাসমূহে সংগ্রহ করা অসম্ভব কার্য্য, কিন্তু আমরা একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি না। মনুষ্যের মানসিক ভাবনিচয় সর্ব্বদেশে একই প্রকার, তবে দেশ কালপাত্র ভেদে তাহার কথঞ্চিৎ বিপর্য্যয় হইবার সম্ভবনা। ললিত নয়নের তুলনায় কোন দেশে ইন্দীবরের, কোন দেশে বা নর্গেসের, কোন দেশে বা নীলবর্ণ ক্ষীণবৃন্ত স্থূল কুসুমান্তরের সাদৃশ্য উল্লেখ হয়, প্রত্যুত, লালিত্যানলয় নীললোচন দৃষ্টে সকল দেশীয় কবির মনে একই প্রকার ভাবোদয় হয় সন্দেহ নাই, তবে উপমিতি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োজক পদার্থ সর্ব্বদেশে একই প্রকার জন্মে না, এই নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিভেদ সম্ভূত হয়, কিন্তু যে পদার্থ সর্ব্বদেশেই বর্ত্তমান আছে, তাহা কোন সাদৃশ্য জ্ঞাপক হইলে সর্ব্ব দেশীয় কবিরাই তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা “মৃগলোচন”, —এই দৃষ্টান্ত কি ভারতবর্ষীয়, কি পারস্য, কি ইউরোপীয়, ভিন্ন ভিন্ন সকল দেশের কবিরাই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এক দেশের কবির ভাব যে অপর দেশের ভাষায় আকর্ষিত হইবার যোগ্য নহে একথায় আমরা কখনই সম্মত নহি। এতদ্দেশীয় লোকেরা অধুনা ইউরোপীয় ফল, মূল, শাক, শস্যাদি স্বদেশীয় রুচি অনুসারে স্বদেশীয় নিয়মে পাক করিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে শরীরের মাত্র পোষণ হয়, কিন্তু ইউরোপীয় অশনে মানসের পোষণও আবশ্যক, এতাবতা, আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, ইউরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য, কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না?

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেকদিগের নাম

ফুল্ল-গণ্ড।
পঙ্কিল।
জলেশী।
নিনাদক।
পঙ্কজ।
কলম্বীক।
বডবড়িয়া।
মৃণালাশা।
সরঃপ্রিয়।
শৈবালক।
বারিবিলাস।
পঙ্ক-শায়ী।
লগুনাশী।
কৰ্দমম্ভ।
নল-গামী।
প্লুত-গতি।
মেঘ-বল্লভ।
কটকটিয়া।

মূষিকদিগের নাম

শস্যহারী।
পিষ্টকাশী।
মধু-লেহিনী।
রম্ভা-ভোগী।
ভোগ-বিলাস।
ভাণ্ড-বিহারী।
লেহন-সার।
গর্ত্ত-পতি।
ক্ষুর-দন্ত।
মোদক-চোর।
তড়িদ্গতি।
মঞ্চ-নিবাস।
মণ্ডানস-প্রিয়।
শূচী-মুখ।

প্রথম সর্গ

উর গো কবিতা-শক্তি তেজি দিব্যপুরী।
পূর গো আমার কাব্যে মোহন মাধুরী॥
বিবরিব বিগ্রহ বিষম বীর রসে।
ভুবন ভরিবে যত যোদ্ধগণ যশে॥
কিরূপে মূষিকগণ মাতি রণ-রঙ্গে।
করিল ভয়াল যুদ্ধ ভেক জাতি সঙ্গে॥
সে যুদ্ধ সামান্য নয় তুলনা কি তার।
দেবতা দানবে যুদ্ধ উপমায় ছার॥
যাবৎ গগনে রবি হইবে উদিত।
তাবৎ সে কীর্ত্তি রবে জগতে বিদিত॥
একদা পড়িয়া ক্রুর বিড়ালের গ্রাসে।
পলায় মূষিক এক অনেক আয়াসে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় ত্রাসে গতি খরতর।
স্বেদজল বহে দেহে তৃষায় কাতর॥
এক সরসীর তীরে করিয়া প্রয়াণ।
গোঁপ ডুবাইয়া মূষা করে জল-পান॥

মূষিকে সম্বোধি এক ভদ্র ভেক তথা।
শির তুলি ঘোর স্বরে কহিতেছে কথা॥
"কে হে তুমি ভিন্ন-দেশী জন্ম কোন্ কুলে?
ক্লান্ত হয়ে পড়ে কেন সরোবর কূলে?
যথা সত্য কথা কহ হইয়া নির্ভয়।
হে মূষিক নাহি দিও মিথ্যা পরিচয়॥
মিত্রতার যোগ্য হও, কর তাহা ভাই।
সুখ-সরোবর মধ্যে এসো লয়ে যাই।
প্রবেশি আমার পুরী আতিথ্য লইয়া।
বিদায় হইবে পরে সানন্দ হইয়া॥
রজত সন্নিভ এই হ্রদের উপর।
আমার প্রভুত্ব, আমি ভেকের ঈশ্বর॥
পঙ্কিলের বংশধর ফুল্ল-গণ্ড নম।
জলেশী জননী, যাঁর যমুনায় ধাম॥
তথা মম পিতা সহ পরিণয় পরে।
আবির্ভূত হই আমি তাঁহার উদরে॥

তোমার লক্ষণ সব দেখি বোধ হয়।
তুমি বীর হবে কোন রাজার তনয় ॥
পরিচয় দিয়ে কর সংশয় বিচ্ছেদ।”
শুনিয়া মূষিক তারে কহিতেছে ভেদ ॥
“সুর নর কি বিহঙ্গ উড়ে যত দূর।
তত দূর মম নাম আছে ভর-পূর ॥
জানহ, যদ্যপি নহে তব জ্ঞাত-সার।
মহামহিম শ্রী. শস্যহারী নামামার ॥
পিষ্টকাশী পিতা মম বীর শ্রেষ্ঠ তিনি।
তাঁহার গেহিণী সতী শ্রীমধুলেহিণী ॥
গর্ত্তপতি মহামতি জনক তাঁহার।
মহারাজ সুতা মাতা মহা অধিকার ॥
মনোহর মঞ্চোপরে জনম আমার।
পুষিলেন দিয়ে নানা সুমিষ্ট আহার ॥
কহ কিসে বন্ধুতা হইবে তব সহ।
উভয়ের স্বভাবেতে একতা বিরহ ॥
তব পুরী পরে খেলে তরল তরঙ্গ।
মনুষ্যের দিব্য খাদ্যে পুষ্ট মম অঙ্গ ॥
কত যত্নে রুটী পিটা প্রস্তুত করিয়া।
লুকাইয়া রাখে নর হাঁড়িতে ভরিয়া ॥
সুধার মাংসের বড়া, কোফ্‌তা কুরকেট।
ইলিসের ডিম ভাজা, রোহিতের পেট ॥
সন্দেশ মিঠাই নানা মোরব্বা আচার।
ক্ষীর ছানা পনীর প্রভৃতি উপহার ॥
দেবের দুর্ল্লভ ভোগ কত শত আর।
কত কষ্টে গুপ্ত করে ভয়েতে আমার ॥
বৃথায় আয়াস, আর বৃথায় প্রয়াস।
তখনি আস্বাদ লই, হল্যে অভিলাষ ॥
যেরূপ চতুর ইথে সেরূপ সংগ্রামে।
কত শত বীর কাঁপে শস্যহারী নামে ॥
রণে ভঙ্গ দিয়ে কভু যাই নাই ভেগে।
এক মনে এক ধ্যানে রণে যাই লেগে ॥
আমার অপেক্ষা অতি দীর্ঘদেহী নর।
কিন্তু আমি কখন করিনে তারে ডর ॥
শয্যাপরে সুখভরে নিদ্রা যায় যবে।
চুপি সাড়ে গুড়ি গুড়ি যাই আমি তবে ॥
কর পল্লবেতে কিম্বা পদাঙ্গুলি ধরি।
বসাইয়া দিয়ে দন্ত লহুজারী করি ॥
এমনি চালাকি তায় আমার জাহের।
ঘুমাইয়া থাকে নর পায় নাকো টের ॥
তথাপিও আমাদের শত্রু বহুতর।
তাহাদের অত্যাচারে সর্ব্বদা কাতর ॥
বিড়াল পেচক এরা কালান্তের কাল।
খাবায় দাবায় সব উন্দুরের পাল ॥
বিকল করেছে তাহে ফাঁদ আর কল।
দিন দিন জ্ঞাতি গোত্র মারে দল দল ॥
শব্দ নাই প্রাণ নাই স্তব্ধ ভাবে চলে।
লুকাইয়া থাকে যম খাদ্য রাখি কলে ॥
সবে বটে আমাদের ভয়ানক অরি।
সব চেয়ে বিড়াল শত্রুরে ভয় করি ॥
অন্ধকারে পলাইলে রক্ষা তবু নাই।
ঘোরতর আঁধারে ধরিয়া মারে ভাই ॥
সে যা হোক, জলজাত গাছড়া ভক্ষণে।
জীবন ধারণ বল করিব কেমনে ॥
নয়ন না তৃপ্ত হবে দেখি লাল মূলা।
আর আর অনর্থক খাদ্য কতগুলা ॥
এ সকল ভেকদের খাদ্য প্রিয়তর।
অতিশয় ঘৃণা করে মূষিক নিকর ॥
এরূপে মূষিক যদি কহিল বচন।
উত্তরে কহিছে তবে মণ্ডুক রাজন ॥
“ভাল হে বিদেশী, কর আহারের জাঁক।
আমাদের বিধি শুদ্ধ দেশ নাই ডাক ॥
স্থলে জলে কেলি করি নাচিয়া বেড়াই।
দুই ভূতে বাস, নানা খাদ্য তাহে পাই ॥
কিন্তু যদি আশ্চর্য্য দেখিতে ইচ্ছা হয়।
এসো লয়ে যাই হ্রদে, কিছু নাই ভয় ॥
উঠিয়া আমার কাঁধে বস্যো স্থিরভাবে।
চলহ আমার পুরী, নানা ভোজ্য পাবে ॥”
এত বলি পিঠপাতি দিল ভেক পাড়ে।
লাফ দিয়া উন্দুর উঠিল তার ঘাড়ে ॥
দুই বাহু পসারিয়া জড়াইয়া ধরে।
চলিল মূষিক রাজ সুখ সরোবরে ॥
বিচিত্র রসেতে পূর্ণ উল্লসিত মনে।
কত বাঁক ছাড়াইয়া চলিল সঘনে ॥
সমুদ্রের কূলে যেন বন্দর সকল।
দেখি মূষিকের হয় নয়ন সফল ॥

তরল তরঙ্গোপরে যখন চলিল।
উঠিল শরীরে তার সে নীল সলিল ॥
তখন হৃদয়ে তার উপজিল ভয়।
যুগল নয়ন পথে অশ্রুধার বয় ॥
ছিঁড়ে ফেলে চিকুর, চঞ্চল পদদ্বয়।
দুরু দুরু করে বুক, জীবন সংশয় ॥
প্রকট সংকট ভাবি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
বিফলে বাসনা আর ফিরে যেতে পাড়ে ॥
লাঙ্গুলে করিয়া হাল বৃথা ঝিঁকে মারে।
গগন ভরিল তার বার্থ হাহাকারে ॥
মৃতপ্রায় হয়ে বীর জলের উপরে।
এইরূপে কাঁদিতে লাগিল আর্ত্তস্বরে ॥
"হায় কেন মাটি খেয়ে আইলাম জলে।
অসাধ্য সাধিতে গেলে এই দশা ফলে ॥
কোন পুরুষেতে মম, স্থলছাড়া নয়।
হায় বিধি কি কুবুদ্ধি হইল উদয় ॥
শুনিয়াছি এইরূপে ভুলায়ে সীতারে।
লয়ে গেল দশানন জলধির পারে ॥
যেই দশা জানকীর জলধি উপর।
আমার সেরূপ, ভয়ে কাঁপি থর থর ॥
যা হবার হবে তাই, তাহে খেদ নাই।
কোন মতে ভেকপুরে গেলে রক্ষা পাই।"
এইরূপে মূষা যবে করিছে রোদন।
কাল আসি অন্য মূর্ত্তি করিল ধারণ ॥
পানি গোখুরার-কুলে জাত এক বীর।
অকস্মাৎ জল হতে হইল বাহির ॥
লোহিত নয়ন দুটা ঘুরায় সঘনে।
ফুলিল বুকের পাটা পাত্র দরশনে ॥
তীর বেগে ধায় রেগে প্রবাহ উপর।
ভয়ে ভীত ভ্রান্তচিত ভেক ভূমীশ্বর ॥
উন্দুরে ফেলায়ে দূরে ডুবমারে জলে।
সাপ দেখে, বাপ ডেকে তনু ঢেকে চলে ॥
বিশ্বাসঘাতক ভেক যারে কাঁধে করি।
বন্ধু বলি যেতে ছিল আপন নগরী ॥

সে কত সাঁতারু তাহা জানে সর্ব্বলোকে।
নাকানী চোবানী খায়, পেটে জল ঢোকে ॥
চরণে রাখিয়া ভার বৃথা চাহে ত্রাণ।
ডুবে আর উঠে বীর শ্বাস-গত প্রাণ ॥
আঁকু বাঁকু করে আখ্ ডুবে আর উঠে।
অসাড় হইল অঙ্গ মুখে রক্ত ছুটে ॥
নিরাশয় নীরাশয়ে হইয়া ফাঁফর।
মৃত্যুকালে কহে মূষা, ক্রোধে গর গর ॥
"অরে রে বিশ্বাসঘাতী রাজা দুরাচার।
করিলি আমার প্রতি এই কুব্যাভার ॥
ইহার উচিত ফল পাবি অচিরাৎ।
ফেলে পলাইলি দুষ্ট করে জলসাৎ ॥
স্থলোপরি শক্তি তোর নাহি মম সম।
জলে জারি জুরি, তোর চাতুরী বিষম ॥
ভো দেবতাগণ! সাক্ষী তোমরা সকল।
কোথারে উন্দুরসেনা দিস্ প্রতিফল ॥
এই কথা বলে বীর ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
সেই সঙ্গে প্রাণ তার ত্যজে দেহ বাস ॥
হেন কালে ফুলময় সেই হ্রদ তীরে।
ভ্রমণ কারণ মৃদু সায়াহ্ন সমীরে ॥
আইল লেহন-সার বয়সে কিশোর।
দেখে যুবরাজ মরে করি ঘোর শোর ॥
দূর দূরান্তরে ছুটে তাহার চীৎকার।
উন্দুরের পুরে উঠে মহা হাহাকার ॥
গভীর শোকের নীরে ভাসিল সকলে।
বিবর ভরিলসব নয়নের জলে ॥
শস্যহারী প্রিয়তমা শোকে অচেতন।
আলু থালু কেশ বেশ, ধরায় শয়ন ॥
পুরনারী শস্যহারি গুণ ব্যাখ্যা করি।
বিনাইয়া কাঁদে সবে দিবস শর্ব্বরী ॥
একে শোকস্বরে পূর্ণ মূষিক মণ্ডল।
তাহে ক্রোধে তর্জে গর্জে সেনানী সকল ॥
ঘরে ঘরে ধেয়ে যেয়ে রাজ দূতগণ।
প্রভাতে যাইতে বলে রাজার সদন ॥

দ্বিতীয় সর্গ

পূর্ব্বদিগে পদ্মপাণি প্রকাশিলে উষা।
মূষারাজ সভায় আইল যত মূষা ॥
উঠিলেন পিষ্টকাশী শোকাচ্ছন্ন মনে।
সম্বোধিয়া কহিছেন সভাগত গণে ॥
"হারাধন শস্যহারী শোকে প্রাণ দহে।
সকলের শোক ইথে, শুদ্ধ মম নহে ॥
বীরবর তিন পুত্র জন্মেছিল মম।
একে একে মম অগ্রে গ্রাসিলেক যম ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরীর অন্তরে বস্তে ছিল।
ভয়াল বিড়াল বেটা তাহারে খাইল ॥
মধ্যম কুমারে নাশে সর্ব্বনেশে কল।
হা করিয়া ছিল তুষ্ট, মুখে রেখে কল ॥
লাফ দিয়ে প্রবেশিবে ভিতরে যেমন।
চাপাকলে বাপা মোর হইল নিধন ॥
হা হা পুত্র প্রিয়তম সর্ব্বগুণধর।
কি ক্ষণে কলের সৃষ্টি করেছিল নর ॥
অবশেষে ছিল মাত্র কনিষ্ঠ নন্দন।
আমার অন্ধের নড়ী, দরিদ্রের ধন ॥
তোমাদের আশা ভরসার সেই স্থল।
পালিত পরম যত্নে মূষিক মণ্ডল ॥
ফুল্ল-গণ্ড ভেক তারে ডুবাইল জলে।
মরিল আমার যাদু, সে বেটার ছলে ॥
সাজ, সাজ, সাজ সবে, দেহ প্রতিফল।
মারহ মণ্ডূক রাজে, মার ভেক দল ॥"
রাজবাক্য শুনি সবে গর্জ্জিল বিক্রমে।
ধরিল সমর সজ্জা যথা রীতি ক্রমে ॥
বেদানা সীমের খোসা হইল বিনামা।
মরা বিহঙ্গের পক্ষে বিরচিল জামা ॥
পতিঙ্গের চাকি ঢালে সুশোভিত পিট।
বাদামের খোলা হলো মাথার কিরীট ॥
ছুঁচের বল্লম হাতে করে ঝক্‌মক্।
সাজিল মূষিক সেনা, দৃশ্য ভয়ানক ॥
মহা গণ্ডগোল উঠে ভেক সন্নিধানে।
নিকটে কিসের গোল কেহ নাহি জানে ॥
জল ছেড়ে দল বেঁধে উঠে গিয়া পাড়ে।
জিজ্ঞাসিল কোন্ শত্রু সিংহনাদ ছাড়ে ॥
এমন সময় তথা এলো এক বীর।
শ্রীভাণ্ড-বিহারী নাম মূষিক সুধীর ॥
পিষ্টকাশী রাজদূত, সেই মহোদয়।
বিপক্ষেরে ডাকি বীর রাজ-আজ্ঞা কয় ॥
"অরে রে ভেকের দল শুনরে সকলে।
আসিছে মূষিক সেনা সংগ্রামের স্থলে ॥
মাতিয়াছে রণ মদে দিবে প্রতিফল।
প্রতি অঙ্গে নানা অস্ত্র করে ঝলমল ॥
তোদের নির্দ্দয় রাজা ফুল্ল-গণ্ড যেই।
আমাদের যুবরাজে মারিয়াছে সেই ॥
ভাগ্যহীন রাজপুত্র, পতিত চাতরে।
এখনো তাঁহার অঙ্গ ভাসে সরোবরে ॥
এই কথা বলি বীর করিল প্রস্থান।
শুনিয়া ভেকের দল ক্রোধে কম্পবান ॥
গর্ব্বে ফুলে, কিন্তু সবে চিন্তিত অন্তর।
রাজার অধিক নিন্দা করে পরস্পর ॥
দেখিয়া এভাব তবে ফুল্ল-গণ্ড রায়।
স্বীয় দোষোদ্ধারে কহে মাণ্ডূক সভায় ॥
"শুন শুন মিত্রগণ আমার বচন।
আমি কেন সে মূষিকে করিব নিধন ?
কখন মরিল মূষা, নাহি অবগত।
আপনার দোষে সেই হইল নিহত ॥
বৃথা অভিমানী ছিল মূষিক কুমার।
আপনি আইল জলে পাড়িতে সাঁতার ॥
আমাদের বিদ্যা তাহা জানিবে কেমনে ?
মরিল নির্ব্বোধ শিশু সেই ত কারণে ॥
অকারণে রাগ করে উন্দুরের দল।
অনর্থ আমারে চাহে দিতে প্রতিফল ॥
যেমন চতুর শত্রু আসিয়াছে রেগে।
তেমনি দেখাও শক্তি, যাবে তারা ভেগে ॥
আমি তার পন্থা বলি শুন সর্ব্বজন।
নিশ্চয় হইবে জয়, লয় মম মন ॥
যথা উচ্চতর অতি সরোবর তীর।
স্থিরভাবে নীচে তার সুগভীর নীর ॥
ধারে ধারে থাক সবে হয়ে সাবধান।
আসুক শত্রুর সেনা বরষিয়া বাণ ॥
অনন্তর সন্নিকট যখন হইবে।
নিজ নিজ সম-যোদ্ধা বাছিয়া লইবে ॥

প্রতি জন এক এক ধরিয়া উন্দুরে।
সরোবর লক্ষ্য করি ফেলে দিবে দূরে ॥
এমনি ধরিয়ে জোরে ফেলাইবে জলে।
ঘুরিতে ঘুরিতে যেন মরে হ্রদতলে ॥
ঝপাৎ ঝপাং শব্দ হইবেক তায়।
শত পাকে ঘুরিবেক সরোবর কায় ॥
জয় লাভে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাইবে সকলে।
নিশান উড়ায়ে দিবে সংগ্রামের স্থলে ॥"
এত বলি ফুল্ল-গণ্ড বসে সিংহাসনে।
কথা শুনি দ্বিগুণ মাতিল ভেকগণে ॥
সবুজ পোষাক পরে যতেক প্লবঙ্গ।
শৈবাল সাজোয়া দিয়ে ঢাকিলেক অঙ্গ ॥
পাতাড়ীর পাতা ঢালে শোভে পৃষ্ঠদেশ।
কোথা কে দেখেছে হেন সংগ্রামের বেশ?
শুক্তি শম্বুকের নানা টোপর সুন্দর।
ঝক্‌মক্ ভানুকরে করে নিরন্তর ॥
ভয়ানক শূল অস্ত্র নল খাগড়ার।
ছাইল গগন ঘন কানন আকার ॥
এইরূপে সাজিয়া উঠিল ভেকগণ।
অস্ত্র দেখাইয়ে চাহে মূষা স্থানে রণ ॥

তৃতীয় সর্গ

মালঝাঁপ

দুই দল, মহাবল, ধরাতল, কাঁপে।
থর থর, খরতর যুড়ি শর, চাপে ॥
ঝল মল, কি উজ্জ্বল, সুবিমল, বস্ত্র।
সেনাগণ, সুশোভন, সম্মোহন, অস্ত্র ॥
প্লবঙ্গক, ভয়ানক, মক মক, শব্দ।
মূষাগণ, বিঘোষণ, ত্রিভুবন, স্তব্ধ।
তড়াগের, ধারে ঢের, মণ্ডুকের তাম্বু।
শেহালার, ডেরা তার, খাগড়ার বাম্বু ॥
আগে তার, আগুসার, সার সার, যোদ্ধা।
ঊর্দ্ধশির, রণবীর, অতি ধীর, বোদ্ধা ॥
রহিলেক, যত ভেক, হয়ে এক পংক্তি।
হুহুঙ্কার, চীৎকার, যত যার, শক্তি ॥
ছেয়ে মাঠ, মূষা ঠাট, কাট কাট, শোরে।
মহা জাঁক, ডাক হাঁক, রহে থাক ধোরে ॥
রণশৃঙ্গ, হল্যো ভৃঙ্গ, নহে রিঙ্গ, কাযে।
কি আহব, মহোৎসব, ভোঁ ভোঁ রব, বাজে ॥
শুনি রব, সুভৈরব, মাতে সব, শুদ্ধ।
দ্রুত বেগে, যায় রেগে, গেল লেগে, যুদ্ধ ॥

পয়ার।

নিনাদক নামে ভেক দৃপ্ত ভয়ঙ্কর।
লাফ দিয়া আগে ভাগে পড়ে বীরবর ॥
ছাড়িল বিষম শূল দ্বিতীয় অশনি।
পড়িল লেহন-সার বীর চূড়ামণি ॥
বয়সে কিশোর অতি ছিল মূষা-সুত।
সংগ্রামে কেশরি-প্রায়, নানা গুণযুত ॥
যশো লাভ লোভে বীর সকলের আগে।
দাঁড়াইয়া ছিল, মাতি নব অনুরাগে ॥
বজ্রের সমান শূল ছাড়ে নিনাদক।
চর্ম্ম বর্ম্ম ভেদ করি পশিল ফলক ॥
নাগাকার করি মূষা পড়ে ধরাতলে।
ধূলায় লুটায় তার সুচারু কুন্তল ॥
দেখিয়া জ্ঞাতির গতি বীর গর্ত্তপতি।
বিপর্য্যয় গদা হস্তে নিল মহামতি ॥
পঙ্কজের শিরোপর করিল আঘাত।
এক ঘায়ে হলো ভেক ধরায় প্রপাত ॥
কালের কবলে সেই হারাইল জ্ঞান।
রুধিরের স্রোতে প্রাণ করিল প্রয়াণ ॥
শরাসনে কলম্বক যুড়ি তীক্ষ্ণ তীর।
ভাণ্ড-বিহারির বক্ষ লক্ষ্য করি বীর ॥
ছাড়িল দুর্জ্জয় শর যমের দোসর।
মরিলেন শ্রীভাণ্ড-বিহারী বীরবর ॥
দেখি ক্রোধে ক্ষুরদন্ত হইল অস্থির।
তিন শরে কেটে ফেলে কলম্বীর শির ॥
আর বার অস্ত্র যুড়ি গর্জ্জিয়া ছাড়িল।
বড়্‌বড়িয়ার মাথা কাটিয়া পড়িল ॥
অভিমানী ছিল এই ভেকের নন্দন।
আপনার গুণ গানে রত অনুক্ষণ ॥
দিবা নিশি বড়্ বড়্ করণ কারণ।
শ্রীবড়্ বড়িয়া নাম বিখ্যাত ভুবন ॥
ক্ষুর দন্ত অস্ত্র তার ঢুকিল উদরে।
মরিল ভেকের চূড়া কিছুকাল পরে ॥

বন্ধুর বিয়োগ দেখি বীর মৃণালাশী।
ক্রোধ ভরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশিল আসি ॥
হস্তে করি নিল এক প্রকাণ্ড কঙ্কর।
ভীমের করেতে যেন শোভিল শেখর ॥
ঘুরাইয়া প্রহারিল গর্ত্তপতি বুকে।
অধৈর্য্য হইল মূষা রক্ত উঠে মুখে ॥
প্রস্থানেতে গর্ত্তপতি ছিলেন নিপুণ।
অসন্ন কালেতে আর কোথা থাকে গুণ ?
ললাটে লিখন বল খণ্ডিতে কে পারে ?
জীবন ত্যজিল বীর কঙ্কর প্রহারে ॥
গর্ত্তপতি-মৃত্যু শোকে হইয়া বিধুর।
দ্বিতীয় লেহনসার নামে এক শূর ॥
মৃণালাশী বক্ষে মারে খরতর শর।
গর্ত্তপতি পার্শ্বে ভেক ত্যজে কলেবর ॥
পুনরায় মূষাসুত বাণ বৃষ্টি করে।
ভাগিল ভেকের ভাগ ভয়ার্ত্ত অন্তরে ॥
সরো প্রিয় নামে তথা আইল প্লবঙ্গ।
ক্ষণ পরে শরে তার জর জর অঙ্গ ॥
রণে পটু নহে ভেক ভোজনে চতুর।
পলাইল হ্রদ তটে হয়ে ভয়াতুর ॥
লাফ দিয়া যেমন পড়িল গিয়া পাড়ে।
অমনি লেহনসার চড়ে তার ঘাড়ে ॥
পাশ দিয়া প্রহার করিল তার পেটে।
এক চোটে নাড়ীভুঁড়ী সব গেল কেটে ॥
রুধির বহিল সেই সরোবর জলে।
জয় জয় শব্দে মূষা বাহুড়িয়া চলে ॥
ভেকগণ ভঙ্গ দেখি ভর্ৎসিয়া ভীষণ।
ভল্ল-ভাঁজি এলো যুদ্ধে ভেক একজন ॥
শৈবালক নাম তার শেহালায় বাস।
মারিল মোদক-চোরে অস্ত্র চন্দ্র-হাস ॥
ফাফর হইল মূষা মুখে ছুটে ফেনা।
মেটাই চুরির বুদ্ধি হেথা খাটিবে না ॥
সে দিন চুরির ধন ছিল মা্তচুর।
ভেক অস্ত্রে পেট কেটে পড়িল প্রচুর ॥
মোদক-চোরের মৃত্যু করিয়া ঈক্ষণ।
অগ্রসর হল্যো আসি বীর একজন ॥
তড়িতের ন্যায় তার গতি খরতর।
সেহেতু তড়িদগতি খ্যাত শূরবর ॥

সলিল-বিলাস নামে তরুণ মণ্ডূক।
মূষার বিক্রম দেখি কাঁপে ধুক ধুক ॥
পাতাড়ীর ঢালে দেহ করি আচ্ছাদন।
রণভূমি ত্যজি করে দূরে পলায়ন ॥
পশ্চাতে তড়িৎ ছুটে তড়িতের প্রায়।
দুই ভিতে ভাগে ভেক দেখিয়া তাহায় ॥
আখু বংশে তড়িতের তুল্য নাহি আর।
পরিপুষ্ট দেহ তার করি মাংসাহার ॥
হ্রদ তটে সলিল-বিলাস বক্ষোপরে।
প্রহারিল প্রহরণ ঝন ঝন স্বরে ॥
জীবন তেজিল ভেক করি ছট্‌ফট্।
রুধিরে ভাসিয়ে গেল সরসীর তট ॥
সেই কালে পঙ্কে শুয়ে ছিল তার ভাই।
পঙ্কশায়ী নাম তার কোলাকুলে চাঁই ॥
অন্তরেতে প্রজ্বলিত ভ্রাতৃশোক তাপ।
পঙ্ক থেকে উঠে বীর দিয়ে এক লাফ ॥
প্রকাণ্ড কোলায় দেখি পলায় তড়িৎ।
লাফে লাফে পঙ্কশায়ী চলিল ত্বরিত ॥
ছাড়িল পাষাণ খণ্ড, লণ্ড ভণ্ড শির।
নাসারন্ধ্র পথে হল্যো মস্তিষ্ক বাহির ॥
জয় জয় শব্দ উঠে ভেকের শিবিরে।
আনন্দ মঙ্গলধ্বনি করে ফিরে ফিরে ॥

লঘু ত্রিপদী

শুনি জয়-নাদ, গুণি পরমাদ,
কহেন মূষিকরাজ।
এক বেটা পেঁকো, করে গেল ভেকো,
ছি ছি এত বড় লাজ ॥
শুনিয়ে রাজার, বাক্য এ প্রকার,
মূষিক ভোগবিলাসী।
যুড়ি দুই কর, হয়ে অগ্রসর,
প্রণমিল হাসি হাসি ॥
দিয়ে হুহুঙ্কার, করি মার মার,
বরিষে নারাচ জাল।
সমুখে যে ছিল, সকলে বিন্ধিল,
মরে ভেক পালে পাল ॥

লণ্ডনাশী নাম, এক গুণধাম,
ছিলেন সবার আগে।
গাত্র গন্ধে তার, কাছে থাকা ভার,
দেখিয়া পলায় নাগে ॥
ঘনাইল কাল, নারাচ বিশাল,
পশিল হৃদয় মাঝে।
মরে লণ্ডনাশী, শ্রীভোগ বিলাসী,
নিবেদিল মূষারাজে ॥
কর্দ্দমজ বীর, শোকেতে অস্থির,
লণ্ডনাশী মৃত্যু হেতু।
ঘোষিল ভীষণ, প্রলয়ে যেমন,
মহাকাল বৃষকেতু ॥
লাফে লাফে গিয়া, ধরে আকর্ষিয়া,
মূষিক মঞ্চ-নিবাসে।
ধরিয়া তাহায়, হ্রদে লয়ে যায়,
অচেতন মূষা ত্রাসে ॥
ঘন ঘন জলে, ডুব মারি চলে,
নিশ্বাস হইল রোধ।
মারিয়া উন্দুরে, শোক গেল দূরে,
দিল ভাল প্রতিশোধ ॥
হোথায় সংগ্রামে, শস্যহারী নামে,
আর এক ধনুর্দ্ধর।
যাহার কারণ, হয় এই রণ,
বিক্রমে তাঁরি সোসর ॥
মলগামী ভেকে, মারিলেক টেঁকে,
বিষম বল্লম এক।
মরে মলগামী, শুনি ভেকস্বামী,
রোদন করে অনেক ॥
দেখি প্লুত-গতি, অতি ক্রুদ্ধমতি,
ডুব মারি সরোবরে।
দুই হাত ঠাসি, নীয়ে পঙ্করাশি,
উঠে গিয়ে তীরোপরে ॥
মূষা প্রতি টাক, করি বর্ষে পাঁক,
ছাইল বদন তার।
পূর্ণ শশধরে, আচ্ছাদন করে,
যেন জলধর হার ॥
হল্যো দৃষ্টিহীন, সমর প্রবীণ,
মূষিকের চূড়ামণি।
প্রকাণ্ড পাষাণ, ধরি একখান,
ঘুরায়ে ছাড়ে অমনি ॥
দৃশ্য ভয়ঙ্কর, যেমন শেখর,
মেদিনী কাঁপিল ভারে ॥
অধুনা সে ভার, মূষা দশ বার,
তুলিতে ও নাহি পারে ॥
যেরূপ কলিতে, মানবাবলীতে,
বলের হয়েছে হ্রাস।
সেইরূপ প্রায়, শক্তি ক্ষয় পায়,
উন্দুর বংশ সকাশ ॥
সেইত পাথর, পর্ব্বত সোসর,
মলগামী পদে পড়ে।
ভগ্ন পদ লয়ে, সভয় হৃদয়ে,
পলাইল উভরড়ে ॥
জয়মদে মাতি, ফুলাইয়া ছাতি,
নাচে বীর শস্যহারী।
তার নৃত্য দেখে, বিপর্য্যয় ডেকে,
উঠে ভেক অধিকারী ॥
শুনি সেই রব, এলো এক প্লব,
শ্রীকট্কাটিয়া নাম।
শস্যহারী বক্ষ, করি সূক্ষ্ম লক্ষ্য,
মারে বাণ গুণগ্রাম ॥
কট্ কট্ স্বরে, প্রকট সমরে,
বিকট হুঙ্কার করে।
ক্ষণেক যুঝিয়া, ঝুঁজিয়া ঝুঁজিয়া,
মূষাদেহে রক্ত ঝরে ॥
প্রাণের আধার, রুধিরের ধার,
ঝরিয়া হইল শেষ।
পড়ে শস্যহারী, শরীর বিস্তারি,
লণ্ড ভণ্ড কেশ বেশ ॥
একি পরমাদ, হয়ে ভগ্ন-পাদ,
মহানস-প্রিয় বীর।
ত্যজি রণস্থল, গিয়া মহাবল,
লুকাইল স্বশরীর ॥
পগারের ঝোড়ে, নিবিড় নিওড়ে
গোপন করিল কায়।
মণ্ডূক প্রধান, না'পায়ে সন্ধান,
নিজ দলে ফিরে যায় ॥

পয়ার

এইরূপে দুইদলে ঘোর যুদ্ধ হয়।
নিপাত হইল তাহে বহু সৈন্য চয় ॥
রুধিরের স্রোত বহে সংগ্রামের স্থলে।
খাদ্যলোভে পিপীলিকা সারি সারি চলে ॥
গৃধিণী আকারে ফিরে তেলাপোকাগণ।
বৃশ্চিক কবন্ধ প্রায় করয়ে ভ্রমণ ॥
দুই দলে সেনাপতি মরিল প্রচুর।
সমরে প্রবিষ্ট দুই রাজাবাহাদুর ॥
এক দিগে গদা হস্তে পিষ্টকাশী শূর।
অন্যদিগে ফুল্ল গণ্ড ভেকের ঠাকুর ॥
হইল বিষম যুদ্ধ একই প্রহর।
দুই মত্ত হস্তি যেন কানন ভিতর ॥
অবশেষে পিষ্টকাশী স্থির লক্ষ্য করি।
মারিল দুর্জ্জয় গদা ভেক গুলফোপরি ॥
দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ করে যেন ভীম।
পলাইয়া যায় বীর যাতনা অসীম ॥
সর্পাকারে রুধিরের ধারা তাহে পড়ে।
পিছে পিছে মূষারাজ ধায় ঊভরড়ে ॥
ভগ্ন অর্দ্ধ পদ ঝুলে পশ্চাতে রাজার।
অচল হইল ভেক শক্তি নাহি আর ॥
ঊর্দ্ধমুখ করি রাজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
প্রাণ পরিহার করে সরোবর পাড়ে ॥

ভঙ্গ ত্রিপদী

ভেকরাজ হইলে প্রত্যয়,
তাঁর পুরে মহা শোকোদয়।
অনিবার হাহাকার, বিগলিত অশ্রুধার,
সকলের কাতর হৃদয় ॥
কাঁদে যত ভেক রাজ-দারা,
চক্ষে বহে শত শত ধারা।
ভঙ্গ সব রাগ রঙ্গ, পঙ্কেতে লোটায় অঙ্গ,
দিবানিশি হয়ে জ্ঞানহারা ॥
রাজজ্ঞাতি ছিল যত ভেক,
সবে গেল, বাকি মাত্র এক।
শ্রীমেঘ-বল্লভ নাম, বহুবিধ গুণধাম,
সিংহাসনে প্রাপ্ত অভিবেক ॥

সমরেতে নহেন নিপুণ,
জপ তপে যত তাঁর গুণ।
দুর্ব্বল শরীর তাঁর, বহুকষ্টে গুণাধার,
মৃত রাজ-চাপে দিল গুণ ॥
দূরে হত্যে করিয়া সন্ধান,
বরষিল খাগড়ার বাণ।
ঠেকি পিষ্টকাশী ঢাল, ধরাতলে শর জাল,
ভেঙ্গে পড়ে শত শত খান ॥
দেখি মণ্ডুকের মন্দগতি,
হাস্য করে মূষিকের পতি।
তাঁহার ইঙ্গিত পেয়ে, এলো এক বীর ধেয়ে,
সূচীমুখ নাম মহামতি ॥
বয়সেতে নিতান্ত কিশোর,
কিন্তু বলবীর্য্যে নাহি ওর।
কুলের তিলক শিশু, ধনুকে যুড়িয়া ইষু,
মার মার শব্দ করে ঘোর ॥
দ্বিতীয় কুমার * প্রায় বীর,
তেজঃপুঞ্জ প্রফুল্ল শরীর।
মহাদম্ভে নিজগুণ, ব্যাখ্যা করি পুনঃপুন,
উপনীত সরোবর তীর ॥
কহে "ওরে ছার শত্রুদল!
কোথা গেল পলায়ে সকল?
আজ সব বিনাশিব, ভেক কুল না রাখিব,
নির্ভেক করিব ধরাতল ॥"
ইহা বলি নামিল সলিলে,
তরঙ্গ উঠিল সেই বিলে।
দেখি ব্রহ্মা খিন্ন হয়ে, আকাশ বিমানে রয়ে
যুক্তি করে দেব সহ মিলে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

কহে ব্রহ্মা, "একি দায়, অকালে প্রলয় প্রায়,
রুধির সমুদ্র সমুদ্ভব।
শব দেহ স্তূপে স্তূপে, দৃশ্য গিরি শ্রেণীরূপে,
অসম্ভব অদ্ভুত আহব ॥
এক দিবসের রণে, হেন কাণ্ড ত্রিভুবনে,
কভু না দেখিল কোন জনে।
বহু দিনে হেন-ভাব, হয়েছিল আবির্ভাব,
দাশরথি দশানন রণে ॥

* কার্ত্তিকেয়।

অসিত বরণধর, সূচীমুখ বীরবর,
সূচী শরে ছাইছে গগন।
সরোবরে পড়ে শর, ভেক দলে হাহাম্বর,
তরঙ্গ বহিছে ঘন ঘন।।
হেন অনুভব হয়, ভেক জাতি হবে ক্ষয়,
কোন মতে নাহি দেখি ত্রাণ।
কি দেখহ দেবগণ! মম দৃষ্টি সংহরণ,
ইহাতে আমার অপমান।।
যদ্যপি তোমরা কেহ, কৃপা দৃষ্টি নাহি দেহ,
ভেককুল হইবে নির্ম্মূল।
অতএব বাক্যধর, কেহ হয়ে অগ্রসর,
সেই পক্ষে হও অনুকূল।।
সাজ গো চামুণ্ডা রঙ্গে! দল বল লয়ে সঙ্গে,
মূষিকের দর্পচূর্ণ কর।
তব চন্দ্রহাস ধারে, কভু কি থাকিতে পারে,
বর্ব্বরের গর্ব্ব ঘোরতর।।
অথবা হে ষড়ানন! দেব সেনা বিমোহন,
ভেক প্রতি করুণা প্রকাশ।
নিপাতিয়ে সূচীমুখে, রক্ষা কর মৃত্যুমুখে,
নিপাতিত মণ্ডুক সকাশ।"

পয়ার

এত বলি বসে বিধি হয়ে খিন্নমতি।
উত্তরে কহিছে তবে দেব সেনাপতি।।
"অবধান কর দেব আমার বচন।
এই যুদ্ধ অগ্রসর হবে কোন জন?
কাহারো না সাধ্য হবে হইতে সহায়।
এযুদ্ধ সামান্য নহে প্রলয়ের প্রায়।।
এক এক মূষাবীর অগ্নি অবতার।
প্রবেশি সমর ক্ষেত্রে করে মহামার।।
আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ দেবরাজ।
মূষিকে নিবৃত্ত করা তাঁহারই কায।।"
কুমারের কথা শুনি মরালবাহন।
বাসবেরে ইঙ্গিত করেন সেই ক্ষণ।।
সাজিলেন দেবরাজ মেঘগণ সঙ্গে।
বহে উনপঞ্চাশ পবন নানা রঙ্গে।।
ঐরাবতে থাকি ইন্দ্র মূষা লক্ষ্য করি।
ছাড়িল বিষম বজ্র দেব গুরু স্মরি।।
চমকে চপলা বালা কার চকমক্।
উঠিল ভেকের পুরে শব্দ মকমক্।।
কাঁপিল উন্দুর সেনা কুলিশ নির্ঘোষে।
তথাপিও ভেক প্রতি ধায় রোষে রোষে।।
দেখিয়ে সে ভাব সুচিন্তিত দেবগণ।
হেনকালে দেখ সবে দৈব নির্বন্ধন।।
জলদের আগমনে ছাড়ি সরোবর।
উঠিলেক এক জাতি, ভেক হিতকর।।
সুকঠিন বর্ম্মধর বজ্রের সমান।
লাগিল বিপক্ষ বাণ হয় খান খান।।
কূর্ম্মাকৃতি কলেবর বক্রভাবে চলে।
চারিদিগে সুখর নখর অস্ত্রছলে।।
যোড়া যোড়া কাঁটা শোভে মুখের দু পাশে
স্বভাবতঃ মাংসোপরি অস্থি পরকাশে।।
প্রতিপদে, পদে পদে গ্রন্থি বহুতর।
বক্ষস্থলে শোভে চক্ষু কৃষ্ণ নিভাধর।।
আঁটা সাঁটা গাঁটা গোঁটা দৃঢ় দেহ ধরি।
দুই পাশে আছে দশ চরণ বিস্তারি।।
দুই দিগে দুই মুখ দৃশ্য শোভাকর।
কর্কট নামেতে খ্যাত পৃথিবী ভিতর।।
দেবলোকে যোগ্য নাম অবশ্যই আছে।
জীবের বিকৃত নাম আমাদেরি কাছে।।
এদেশে কর্কট সেনা উঠি চারি ভিতে।
ঘেরিল উন্দুর দলে ভেকদের হিতে।।
দাড়ায় দাড়ায় ধরে আখুর শরীর।
ল্যাজকাটা হয়ে ছুটে কত শত বীর।।
কেহ বা হারায়ে পদ পলাতে না পারে।
গড়াগড়ি যায় সেই সরোবর ধারে।।
স্তূপে স্তূপে অস্ত্র শস্ত্র পড়ে যথা তথা।
পলায় মূষক দল, মুখে নাহি কথা।।
ভয়েতে বাড়িল ভয় ভেবাচেকা হয়ে।
ভঙ্গ দিয়ে যায় নিজ নিজ প্রাণ লয়ে।।
কেহ কেহ শ্রান্ত হয়ে গর্ত্ত অন্বেষিয়া।
নিমিষে ঢুকিয়া তায় রহে লুকাইয়া।।
হেনকালে অস্তাচলে চলিল তপন।
ঘোরতর তিমিরে পূরিল ত্রিভুবন।।
এইরূপে এক দিনে এহেন সমর।
সম্ভূত সমাপ্ত হলো বর্ণিতে বিস্তর।।
বিধির নির্বন্ধ ইহা কে খণ্ডিতে পারে।
পাত্র ভেদে এইরূপ ঘটে এ সংসারে।।
সমাপ্তোয়ং গ্রন্থম্।

—বিজ্ঞাপন—

যে সকল কারণে কুমার-সম্ভব অনুবাদিত হইল, তাহা এই স্থলে বিজ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য,—

১। বাল্যকালাবধি যাহা অভ্যস্ত হয়, তাহা অধিক বয়সে পরিহার্য্য নহে; পূর্ব্বের ন্যায় আমার অবকাশ নাই;—বিষয় কর্ম্মে সমস্ত দিবস ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাতে এবং প্রদোষে যে দুই এক দণ্ডকাল নিশ্বাস-পরিত্যাগের সময় আছে, তাহাতে নূতন কোন বিষয় চিন্তা করিয়া লেখা দুরূহ, অথচ অভ্যাসরক্ষার অনুরোধে আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদকরণে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু পশ্চাৎ দেখিলাম, নূতন রচনাপেক্ষা পুরাতন অনুবাদ করা অধিকতর পরিশ্রম-সাপেক্ষ। কি করি, আরম্ভ করিয়া কোন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে মূঢ়তা প্রকাশ পায়, সুতরাং অনুবাদ সমাপ্ত করিলাম।

২। অনেকে এইক্ষণে পদ্যময় কাব্যের অনুবাদ গদ্যে সম্পাদন করেন, সহৃদয়বর্গ কহেন, তাহাতে অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়; চম্পকপুষ্পের প্রতিকৃতি স্বর্ণসহকারে নির্ম্মিত হইলেই সুন্দর দেখায়;

কুমার-সম্ভব

নামক

মহাকাব্য

বঙ্গীয় বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুবাদিত

পাঠ—প্রথম সংস্করণ ঃ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

রজতে রচিত হইলে তাদৃশ শোভনীয় হয় না, অতএব কোন কোন বন্ধু সংস্কৃত প্রধান পদবীস্থ কাব্য-নিচয়ের পদ্যানুবাদ-করণে আমাকে অনুরোধ করাতে আমি সেই অনুরোধ-রক্ষার প্রথম আদর্শ স্বরূপ তাঁহাদিগের হস্তে এই গ্রন্থ সম্প্রদান করিতেছি।

৩। আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায় ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদি পরিহারপূর্ব্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্য্যালোচনা করণে স্বদেশহিতৈষীমাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে. সেই বাসনা পূর্ণকরণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর, বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্য-কলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কিরূপ পরিচ্ছদ, কিরূপ বাসগৃহ ছিল, কিরূপ নিয়মে বিবাহাদি সংস্কার সম্পন্ন হইত, তাহা মহাকবি কালিদাসের লিপিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অভিলাষ কথঞ্চিদ্রূপে পূর্ণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্তেও আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ-করণে প্রবৃত্ত হই।

উপরিভাগে অনুবাদ-করণের হেতু প্রদর্শিত হইল; অনুবাদ সম্বন্ধেও কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে ;—

মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় সর্গ এক ছন্দোবিশেষে রচিত না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধের অনুসরণ করিয়াছি, অনবরত ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে জড়তার প্রাদুর্ভাব হয় ; জলযন্ত্র নির্গত অনর্গল একাকার ধারা-পাত-শব্দ নিদ্রাকর্ষণের উপযোগী বটে, কিন্তু কাব্যশাস্ত্র নিদ্রাকর্ষণের জন্য নহে, তাহা চিত্তকে অনবরত সচেতন রাখিবার সহকারী, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। প্রত সর্গের সমাপ্তিতে বাদ্যের পরাঙ্গের ন্যায় মহাকবি ২।১ শ্লোক বিভিন্ন ছন্দে রচনা করিয়াছেন, আমি সর্গৈক ভিন্ন সমুদয় সর্গে তন্নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি।

মহাকবি এই কাব্য ঊনবিংশতি সর্গে সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এমত কিংবদন্তী,—কিন্তু কুমার-সম্ভব অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের জন্মের পূর্ব্বে হর-পার্ব্বতীর পরিণয়-বর্ণনাত্মক সপ্তম সর্গ পর্য্যন্তই কালিদাস-রচিত বলিয়া সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ। অনেকে কহেন, উত্তর সর্গ সকল তাঁহার প্রণীত নহে, তত্তাবৎ ভোজরাজের সভাসদ্ কালিদাস-খ্যাত অন্য এক কবিকর্ত্তৃক রচিত, ফলতঃ সপ্তম সর্গ পর্য্যন্তে যেরূপ কবিত্বচ্ছটা বিকীর্ণ আছে, তাহার সহিত অবশিষ্ট সর্গ সকলের রচনার তুলনা করিলে এই কথা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে আবার কহেন, অষ্টম সর্গে হর-পার্ব্বতীর বিশ্রব্ধ বিহার বর্ণনায় মহাকবি অত্যন্ত অশ্লীলতা অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং ধার্ম্মিকগণ সপ্তম সর্গ পর্য্যন্তের সমাদর করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এ কথাও অতি সঙ্গত, ইহাতে হিন্দুজাতি যে একান্ত অশ্লীলতার পরবশ নহেন, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। সম্প্রতি পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি কর্ত্তৃক এবং বারাণসীতে প্রকটিত পণ্ডিতাখ্য পত্রে উত্তরসর্গসমূহ প্রচারিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আমি উৎকলদেশে দুইখানি হস্তলিখিত কুমার-সম্ভব গ্রন্থে ঐ সকল সর্গ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে অষ্টম সর্গে যত অশ্লীলতার আশঙ্কা ছিল, তত পরিমাণে দৃষ্ট হয় নাই। যাঁহারা নৈষধকাব্যে নলরাজার বাসর পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকটে অষ্টম সর্গের বিহার-বর্ণন-ঢক্কানাদ-সমীপে ডমরুধ্বনিবৎ উপলব্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ঐ সর্গে সন্ধ্যাবর্ণনাটির স্থানে স্থানে অতি মনোজ্ঞ কবিত্বচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়াছে, আমি তাহা অনুবাদপূর্ব্বক পুস্তকপরিশিষ্টে প্রদান করিলাম।

আমি এই গ্রন্থরচনায় অনুবাদের অনুরোধে কোন কোন স্থানে ২।১টি অতিরিক্ত শব্দ সংযোগ করিয়াছি, কোথাও বা ২।১টি শব্দ পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছি, ফলতঃ সাধ্যমতে মহাকবির ভাব সংরক্ষণ করিতে যত্নের ত্রুটি রাখি নাই।

মহাকবি কালিদাস কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার কবিত্বের চমৎকারিতা, তাঁহার মনুষ্য-প্রকৃতিতে সমীচীন জ্ঞান এবং নৈসর্গিক শোভা-বর্ণনে অপরিমিত শক্তি প্রভৃতি সমালোচনা-পূর্ব্বক এই স্থলে দিবার বাসনা ছিল, কিন্তু তৎ প্রবন্ধ রচনা করিতে করিতে গ্রন্থপ্রমাণ হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহা স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করা যাইবে।

হুগলি।
১লা ভাদ্র, ১২৭৯ শকাব্দা।

প্রথম সর্গ

উত্তরেতে আছে দেবাত্মক দেবধাম,
অচলের অধিরাজ হিমালয় নাম।
পূর্ব্বাপর ভাগ যার পয়োনিধি-গত,
রহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড-মত ॥ ১ ॥

দোহনেতে দক্ষ মেরুবরে পরিহরি,
যারে শৈলগণ বৎস প্রকল্পন করি।
দীপ্তিমান্ মণি মহৌষধি সবিশেষে,
দুহিয়াছে ধরণীকে পৃথু-উপদেশে ॥ ২ ॥

পরিমাণশূন্য রত্নরাজির প্রভা,
হিম হেতু নহে তার গৌরব লাঘব।
গুণসমূহেতে এক দোষ লুপ্ত করে,
কলঙ্ক নিমগ্ন ইন্দু করে নিজ করে ॥ ৩ ॥

শেখরের ধাতু-আভা লাগি মেঘচয়ে,
অকালেতে সন্ধ্যা বোধ হয় হিমালয়ে।
মনোহরা অপ্সরার তাহে মন হরে,
বিভ্রমেতে অসময়ে বেশ-ভূষা করে ॥ ৪ ॥

যার কটিতটাবধি গিয়ে মেঘচয়,
নিম্ন সম ভূমিভাগে ছায়া বিস্তারয়;
স্নিগ্ধ ছায়ে থাকি বৃষ্টি-ব্যস্ত সিদ্ধগণ,
ভানু-করোজ্জ্বল শৃঙ্গে করেন গমন ॥ ৫ ॥

সংহারিল সিংহগণ দ্বিপ দলে দলে,
রুধিরাক্ত পদচিহ্ন ধৌত হিমজলে,
সে চিহ্ন অভাবে নখে মুক্ত মুক্তাচয়,
কেশরী কোথায় গেল কিরাতেরে কয় ॥ ৬ ॥

যথায় ভূর্জ্জের ত্বচ্-পত্রিকা সুন্দর,
কুঞ্জরের বিন্দু সম শোণ-বিন্দুধর;
বিদ্যাধর-বালাগণ তাহে অনুরাগে
লিখয়ে অনঙ্গলেখা ধাতু-রস-রাগে ॥ ৭ ॥

যেই গিরি-দরীমুখ-জাত সমীরণ,
বংশের বিবর-ভাগ করি সম্পূরণ,
গানে রত গন্ধর্ব্বগণের সন্নিধান,
স্বর-সংমিলন হেতু চড়াইছে তান ॥ ৮ ॥

করিগণ ঘরষণ করিয়াছে হনু,
সরল-বিটপীবৃন্দ তাহে ছিন্নতনু,
ক্ষরিয়াছে ক্ষীরধারা গন্ধে মনোহর,
ভরিয়াছে সুরভিতে কন্দরনিকর ॥ ৯ ॥

কিরাত-দম্পতি প্রতি গত-অন্ধকার,
কন্দরের অভ্যন্তরে প্রভার সঞ্চার,
রজনীতে বিনা তৈলে ওষধিনিকর,
হইয়াছে সুরতের প্রদীপ সুন্দর ॥ ১০ ॥

যেখানে তুষাররাশি পথে শিলীভূত,
সে কারণে পদাঙ্গুলি সদা ক্লেশযুত,
শ্রোণি-পয়োধর-ভারে ভারাক্রান্ত তায়।
কিন্নরীর গতি-মান্দ্য কখন না যায় ॥ ১১ ॥

দিবাভীত অন্ধকার নিবসি কন্দরে,
রাত্রিচর প্রায়, রক্ষা পায় ভানুকরে;
শরণ আগত অতি ক্ষুদ্র জন প্রতি,
নিতান্ত মমতাশীল মহতের মতি ॥ ১২ ॥

চমরী-লাঙ্গুল-ক্ষেপ কিবা শোভাকর,
নিন্দিয়া চন্দ্রের দ্যুতি অতি শুভ্রতর;
গিরিরাজ নাম গিরি ধরে সত্য বটে,
এ হেন চামর যার ঢুলায় নিকটে ॥ ১৩ ॥

কাঁচলী হরিছে কান্ত তাহে সুলজ্জিতা,
কিন্নর-কামিনীকুল বিভ্রম-মজ্জিতা;
দৈবী, মেঘমালা প্রলম্বিত কলেবরে,
গুহাগৃহদ্বারে যবনিকা * কার্য্য করে ॥ ১৪ ॥

---

* বিলাসগৃহ-দ্বারে যবনিকা অর্থাৎ পর্দ্দা ব্যবহার অতি পুরাতন রীতি, সন্দেহ নাই। যবনিকা

অঙ্গে ধরি ভাগীরথী নির্ঝর-শীকর,
কাঁপাইছে বার বার মন্দারনিকর,
হেন সমীরণ সেবে মৃগ-অন্বেষণে,
চঞ্চল-ময়ূরপুচ্ছ-ধারী ব্যাধগণে ॥ ১৫ ॥
অধোভাগে বিভাকর করেন ভ্রমণ,
গিরিশিরে সরোবরে সরোরুহগণ,
সপ্তঋষি চয়নান্তে যাহা ছিল শেষ,
উর্দ্ধ করে বিকসিত করেন দিনেশ ॥ ১৬ ॥
যেই যজ্ঞসাধনীয় বস্তুর নিধান,
রমণী ধরিয়া যার বল ফলবান্,
যাগ-ভাগ দিয়ে তারে আপনি বিধাতা,
করিয়াছে শৈল-আধিপত্যে অধিষ্ঠাতা ॥ ১৭ ॥
পিতৃগণ অতিশয় মান পুরঃসরে,
স্বজিলা মানসী কন্যা কুল-রক্ষা তরে ;
নিজ যোগ্য সেই মুনিমান্যা মেনকারে,
বরিলেন মেরুমিত্র বিধি-অনুসারে ॥ ১৮ ॥
কালক্রমে দুইজনে মাতিলেন রঙ্গে,
স্বরূপ সুরভে রত বিবিধ প্রসঙ্গে,
মনোরম যৌবনের প্রভাব সুসার,
মহীধর-মহিলার গর্ভের সঞ্চার ॥ ১৯ ॥
মৈনাক নন্দনে রাণী করিলা প্রসব,
নাগবধূ-বঁধূ সেই সিন্ধুর বান্ধব,
ইন্দ্রকোপে নহে যার পক্ষের ছেদন,
কভ না জানিল সেই বজ্রের বেদন ॥ ২০ ॥
মহেশের পূর্ব্বপত্নী দক্ষের দুহিতা,
পিতৃকৃত অপমানে হইয়া দুঃখিতা,
যোগভরে তনুত্যাগ করি গুণবতী,
গিরীন্দ্র-গৃহিণীগর্ভে সমুদিতা সতী ॥ ২১ ॥
ভূধর-নিকর অধীশ্বর পতিসনে,
সমাধি-সংযতা রাণী সদা শুচি মনে ;
যথা নীতি উৎসাহেতে সম্পদ সঞ্চার,
সেইরূপ মঙ্গলার হৈল অবতার ॥ ২২ ॥
সুপ্রসন্ন দিক্, রজোহীন সমীরণ,
শঙ্খ স্বন অনন্তর পুষ্প বরিষণ,
স্থাবর-জঙ্গম যত দেহধারিগণ,
তাঁর শুভ জন্মদিনে সবে সুখী মন ॥ ২৩ ॥
পূর্ণ প্রভাপুঞ্জ পুত্রী জনম লইলা,
সে প্রভায় প্রসূতিও প্রদীপ্ত হইলা,
নব মেঘরবে যথা জন্মি রত্নশলা,
বিদূর-ভূমিরে দেয় প্রতিভা বিমলা ॥ ২৪ ॥
দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল গিরিবালা,
সুধাকরে বাডে যথা মরীচির মালা ;
এক কলা পরে যেন ব্যক্ত অন্য কলা,
সেইরূপ হইলেন লাবণ্য-উজ্জ্বলা ॥ ২৫ ॥
আদরিণী বালিকারে যত বন্ধুজনে,
ডাকে পিতৃ-পূর্ব্বক পার্ব্বতী সম্বোধনে,
উমাবলি বারিত মা তপো-আচরণে,
উমা-নাম পরেতে লভিলা সে কারণে ॥ ২৬ ॥
পুত্রবান্ হইয়াও গিরি হিমবান্,
উমা দেখি নাহি তাঁর তৃপ্তি অবসান ;
বিকসে অনন্ত পুষ্প বসন্ত সময়ে,
একা চূতকলিকায় ভ্রমরে রময়ে ॥ ২৭ ॥
প্রভাবতী শিখা সহ দীপ যথা সাজে,
ত্রিদিবে ত্রিধারা যথা শোভায় বিরাজে,
দেবভাষা করে যথা পণ্ডিতে মণ্ডন,
পূত বিভূষিত গিরি লভি উমাধন ॥ ২৮ ॥
মন্দাকিনী-পুলিনেতে বেদি নিরমিয়া,
কন্দুক কৃত্রিম পুত্র পরিবার নিয়া,
সঙ্গিনীগণের সঙ্গে বিনোদ বিহার,
বাল্যলীলা-রসে রত হন অনিবার ॥ ২৯ ॥
শরদে মরাল যথা ভাসে গঙ্গাজলে,
নিশাগমে মহৌষধি যথা স্বতঃজ্বলে,
সেইরূপ সমাগমে শিক্ষার সময়,
লভিলেন পূর্ব্ব-জন্মার্জিত বিদ্যাচয় ॥ ৩০ ॥

শব্দে বোধ হয় যেন, এ ব্যবহারটি দেশান্তর হইতে অনুসৃত হইয়া থাকিবে। ফলে পুনর্ব্বার এতদ্দেশে এ শব্দ প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিনা যত্নে আভরণ-শোভা কলেবরে,
আসব নহেক কিন্তু তার কার্য্য করে,
পুষ্পবাণ নহে কিন্তু মদনের শর,
এ হেন যৌবন প্রাপ্ত বাল্য-অনন্তর ॥৩১॥
তুলিকায় করে যথা চিত্রের বিকাশ,
দিনকর-করে যথা অরবিন্দে হাস,
সেইরূপ উমা-দেহে নবীন যৌবন,
সম চতুরাংশে কিবা করে বিভাজন ॥৩২॥
অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুল স্থূল, নখর-কিরণ,
নিক্ষেপেতে রক্ত আভা করে উদ্গীরণ :
স্থলকমলের শোভা * করিয়া হরণ,
অবনীতে অবতীর্ণ উমার চরণ ॥৩৩॥
শিখিতে কি মঞ্জীরের মধুর নিস্বন,
চরণ-চারণে শিক্ষা দিল হংসগণ ?
নহে কেন ধরিলেন ন[illegible]-কলেবরা,
বিভ্রম-বিক্রম যুক্ত গতি মনোহরা ? ॥৩৪॥
নহে অতি দীর্ঘ, ক্রমে স্থূলতার হ্রাস,
সুবৃত্ত জানুর শোভা বিশেষে বিকাশ ;
সৌন্দর্য্যের শেষ বিধি করিয়া তথায়,
শেষাঙ্গ রচিতে রূপ সঙ্কে পুনরায় ॥৩৫॥
করিবর-কর-চর্ম্ম বিশেষে কর্কশ,
রামরম্ভা-তরু অতি শীতল পরশ ;
কেবল বিশাল ভাব ধরিলে কি হবে ?
উমা-উরু উপমান নাহি দেখি ভবে ॥৩৬॥
তার পর নিরুপম কাঞ্চীগুণ-স্থান,
কি আর বর্ণিব তাহা করি অনুমান ?
অন্য নারী মোহিবারে নারিল যে হরে,
তিনি তারে নিজ অঙ্কে স্থাপলেন পরে ॥৩৭॥
তনুতর নব রোমরাজি শোভাধার,
প্রবেশিল নতনাভি বিবরে তাঁহার,
নীবি অতিক্রম করি অপরূপ সাজে,
নীলমণি-চ্ছটা যেন কাঞ্চীগুণ-মাঝে ॥৩৮॥

বেদিসম কৃশোদরী কটি শোভাকর,
ধরিলেন তাহে বালা ত্রিবলী সুন্দর ;
মদনের আরোহণে সোপান সমান,
নব-যৌবনের যোগে হইল নির্ম্মাণ ॥৩৯॥
কমলনয়নী কুচদ্বয় পরস্পর,
ঘরষণে পাণ্ডুবর্ণ বাড়িল সুন্দর ;
শ্যামমুখ স্থূল কুচযুগল মাঝারে
মৃণালের সূত্র মাত্র সঞ্চারিতে নারে ॥৪০॥
উমা-বাহুযুগে, এই বিতর্ক আমার,
শিরীষ কুসুমাধিক হবে সুকুমার ;
মনোভব পরাভব, করিলা যে ভব,
তাঁহার কণ্ঠের পাশ যে বাহু-সম্ভব ॥৪১॥
সমুন্নত পয়োধরে কণ্ঠ সুবন্ধুর,
মুক্তামালা শোভা তথা বাড়িল প্রচুর,
উভয়েই উভয়ের শোভার জনন,
ভূষা আর ভূষ্য ভাব হৈল সাধারণ ॥৪২॥
চন্দ্রে গিয়ে সরোজ-সুরভি প্রাপ্ত নহে,
পদ্ম গতা তথা চন্দ্র-সুধা নাহি রহে,
চপলা কমলা তায় উমার বদনে,
উভয়ের গুণ লভি রহে প্রীত মনে ॥৪৩॥
নবীন পল্লবে যদি কুসুম ঘটিত,
প্রবালেতে মুক্তাফল যদি প্রকটিত,
উমা অরুণিত ওষ্ঠে স্মিত নিরমল,
তবে সে হইত তারা উপমার স্থল ॥৪৪॥
মধুরভাষিণী উমা সুমধুর স্বরে,
আলাপেতে অবিরত অমৃত নিঃসরে,
কঠোর কোকিল-রব তাহার নিকটে,
বিতন্ত্রী বীণার যথা কর্ণে কটু রটে ॥৪৫॥
আয়ত-নয়নে চারু কটাক্ষ চপল
প্রবাত সময়ে যথা শোভে নীলোৎপল,
মৃগাঙ্গনা সহ এই বিবাদ বিষয়,
কে কাহার নেত্র নিল হইল সংশয় ॥৪৬॥
দলিত অঞ্জনে কি লিখিত মনোহর,
দীর্ঘ রেখাযুক্ত দুটি ভুরু শোভাকর ;
বিলাস-চতুর শোভা নিরখি মদন ;
স্বধনু-সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব দিল বিসর্জ্জন ॥৪৭॥

---

*স্থলে কভু কমল জন্মে না, যদি জন্মিত, তবে তাহার শোভা হরণপূর্ব্বক উমার চরণ-প্রতিভা প্রকাশ করিত।—নিদর্শনালঙ্কার।

যদ্যপি থাকিত লজ্জা পশুদের মনে,
পার্ব্বতীর সুচারু চিকুর-দরশনে,
অসংশয় চমরীর কেশের গৌরব,
একেবারে শিথিল হইত তবে সব ॥৪৮॥
সকল উপমাদ্রব্য করিয়া সংগ্রহ,
যথাস্থানে নিবেশিত করি পিতামহ,
সৃজন করিল বুঝি শৈলেন্দ্র-সুতারে,
হেরিবারে সকল সৌন্দর্য্য একাধারে ॥৪৯॥
কামচর নারদ একদা তথা আসি,
দেখিলেন পিতৃপাশে কন্যারূপ-রাশি,
কহিলেন ইনি এক-পত্নী-ভাব ধরি,
হরের অর্দ্ধেক অঙ্গ লইবেন হরি ॥৫০॥
শুনিয়া নিশ্চিন্ত গিরি, বয়স্থা সুতায়,
শিব ভিন্ন অন্য বরে দিতে নাহি চায়।
কৃশাণুর যোগ্য মন্ত্রপূত হব্যচয়,
অপর তেজেতে কভু যোগ্য নাহি হয় ॥৫১॥
প্রার্থনাবিহীন দেবদেব মহেশ্বর,
সুতাদানে সমর্থ না হয় গিরিবর,
অভ্যর্থনা-ভঙ্গ-ভয় করিয়া সুজন,
উদাসীন-ভাবে করে কালসম্বরণ ॥৫২॥
যদবধি পূর্ব্ব জন্মে শোভনা সুদতী,
দক্ষ-রোষে কলেবর ত্যজিলেন সতী,
তদবধি সঙ্গহীন হয়ে পশুপতি,
পত্নী-পরিগ্রহে সদা উদাসীন-মতি ॥৫৩॥
মৃগনাভি সুরভিত, কিন্নর-ক্বণিত,
গঙ্গাজল-সিক্ত-দেবদারু চয়ান্বিত,
হেন কোন হিমালয়-প্রস্থে করি বাস,
তপস্যা করেন যতচিত্ত কৃত্তিবাস ॥ ৪॥
সুমেরু-কুসুমে চূড়া বাঁধি ভূতগণ,
সুখস্পর্শ ভূর্জ্জত্বচে করিয়া বসন,
কলেবরে দিয়ে মনঃশিলার বিলেপ,
শৈলজের শিলাতলে করে কালক্ষেপ ॥৫৫॥
খুরেতে খনিয়া শিলা হিম ঘনীভূত,
মদগর্ব্বে বৃষভ বিঘোর রবযুত,
না সহি সিংহের নাদ গর্জ্জে ভয়ঙ্কর,
ভয়ার্ত্ত হইয়া দেখে গবয়নিকর ॥৫৬॥

হোম-হুতাশন জ্বালি সমিধ প্রহিত,
নিজ অষ্ট-মূর্ত্তিগত-মূর্ত্তি সন্নিহিত,
তপস্যার ফলের বিধান যেই করে,
কি ফল উদ্দেশে সেই তপস্যা আচরে ॥৫৭॥
বৃন্দারক-বৃন্দ-পূজ্য মহার্ঘ্য মহেশে,
অর্ঘ্য-দানে অর্চ্চনা করিয়া সবিশেষে,
শুদ্ধাচারা তনয়ারে সহচরী-সাথ,
হর-আরাধনে আদেশিল অদ্রিনাথ ॥৫৮॥
যদিও সমাধি-বিঘ্নকারিণী পার্ব্বতী,
তবু তাঁর সেবা লইলেন পশুপতি,—
বিকারের হেতু সত্বে অধীর যে নহে,
প্রকৃত সুধীর ধীর তাহাকেই কহে ॥৫৯॥
সাজাইয়া নানা ফুল, বিধিবৎ ফল, মূল,
মার্জনা করিয়া পূজাস্থল,
নিত্য-কৃত্য-সহকারী, ভৃঙ্গারে ভরিয়া বারি,
উপচিয়া যজ্ঞ-তৃণ দল।
হরশিরে সুধাকর, তার সুশীতল কর,
পার্ব্বতীর ক্লান্তি দূর করে,
অনুদিন এইরূপে, বিনোদিনী বিশ্বরূপে,
সেবা করে যথা ভক্তি ভরে ॥৬০॥

ইতি উমোৎপত্তি নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

তারক দানব, করে উপদ্রব,
কাতর যতেক সুর,
শচীনাথে আগে, লয়ে অনুরাগে,
চলিলেন ব্রহ্মপুর ॥১॥
মলিন সকল, শ্রীমুখমণ্ডল,
চতুরানন গোচরে,
হইল সরস, সুপ্ত তামরস,
প্রভাত-ভানুর করে ॥২॥
সৃজনকারণ সর্ব্বতো আনন,
বচন-আধিপ প্রতি,
দেবতা সকলে, পড়ি পদতলে
স্তুতিকরে অর্থবতী ॥৩॥

"নমো জগৎপতি, ত্রিবিধ মূরতি,
একমাত্র সৃষ্টি আগে,
পরে গুণলয়, নিজ গুণত্রয়,
প্রকাশিলে তিন ভাগে ॥৪॥
তুমি হে অমোঘ, নিজ বীজ ওঘ,
বপিলে জল-ভিতরে,
তাহাতে উদয়, চরাচর চয়,
ভণিত বেদনিকরে ॥৫॥
একমাত্র ছিলে, ত্রিভাগ হইলে,
মহিমাপ্রচারছলে,
সৃজন পালন, আর সংহরণ,
করণ-কারণ ফলে ॥৬॥
তুমি হে বিধাতা, সর্ব্ব-পিতা-মাতা,
বিঘোষিত চরাচরে,
নিজ কলেবরে, ভাগ করি পরে*,
বিরচিলে নারী নরে ॥৭॥
নিজ পরিমাণে, রাত্রিদিনমানে,
করিয়াছ বিভাজন,
হও যবে সুপ্ত, সব হয় লুপ্ত,
জাগিলে হয় সৃজন ॥৮॥
জগতের তাত, আপনি অজাত,
সর্ব্বক্ষয় হে অক্ষর!
জগতের আদি, আপনি অনাদি,
জগদীশ নিরীশ্বর ॥৯॥
প্রভাব আপন, জ্ঞান বিলক্ষণ,
আত্মরূপ সৃষ্টিকর,
করিয়া সৃজন, করহ নিধন,
ওহে সর্ব্ব-শক্তিধর ॥১০॥
তুমি দ্রবরস, নিবিড় কর্কশ,
লঘু গুরু সূক্ষ্ম স্থূল,
ব্যক্ত ব্যক্তেতর, তুমি কামচর,
সকল বিভূতিমূল ॥১১॥
যেই বাক্য সব, প্রথমে প্রণব,
ত্রিতয় স্বরে ভণিত,
যজ্ঞ স্বর্গ ধর্ম্ম, যাহাদের কর্ম্ম,
তাহারা তব প্রণীত ॥১২॥
পুরুষার্থে প্রীতি- দায়িনী প্রকৃতি,
তোমাকেই কৃতি জানে,
তোমাকেই পুনঃ, বিচলিত গুণ,
পুরুষ বলিয়া মানে ॥১৩॥
"তুমি হে সবিতা, পিতৃগণ-পিতা,
দেবাধিদেবতা পাতা,
তুমি পরাৎপর, পরমার্থ পর,
তুমি হে ধাতার ধাতা ॥"১৪॥
"তুমি হে শাশ্বত, হব্য হোতা স্বতঃ,
ভোজ্য আর ভোগকারী,
তুমি জ্ঞেয় চয়, জ্ঞাতা মহাশয়,
ধ্যেয় পুনঃ ধ্যানধারী ॥"১৫॥
এইরূপে শ্রুতি, করি দেবস্তুতি,
হৃদয়-সঙ্গত অতি,
প্রসাদাভিমুখ, হয়ে চতুর্ম্মুখ,
কহিছেন সুরপ্রতি ॥১৬॥
যেই পুরাতন, কবির আনন,
চতুষ্টয়ে চতুষ্টয়,
শব্দ অবয়ব, প্রবৃত্তি প্রভব,
অর্থসহ ব্যক্ত হয় ॥১৭॥
"কি মহৎ কার্য্য, হেতু অনিবার্য্য,
শক্তিধর সুরগণ!
স্ব স্ব অধিকারে, প্রভাব-সঞ্চারে,
সুখে হেথা আগমন?" ॥১৮॥
"তুষার-পতনে, যথা তারাগণে,
প্রকাশিত হয় দুঃখে,
তোমাদের হায়, দেখি তার প্রায়,
পূর্ব্বরাগ-ভ্রষ্টমুখে" ॥১৯॥
"প্রথমেতে কহ, এ অস্ত্র নিবহ,
কি কারণে ছটাহীন,
এই বৃত্র-হর বজ্র ভয়ঙ্কর,
ইন্দ্র-করে কেন ক্ষীণ?"॥২০॥
"কেবা সে সবার, আর দুরাচার,
যাতে প্রচেতার পাশ,
মন্ত্রে বীর্য্যহত, ভুজঙ্গের মত,
পাইতেছে পরকাশ?"॥২১॥

* বলা বাহুল্য, এই উক্তির সহিত য়িহুদীয় নরনারী-সৃষ্টির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, মুসা ঈশ্বরাকারে আদ-পুরুষের সৃষ্টি এবং তাহা হইতে আদ্যা নারীর উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন।

"কেন ধনেশ্বর, গদাহীন কর,
ভগ্নশাখ তরুপ্রায়,
দেয় পরিচয়, তব পরাজয়,
মনের বেদনা তায় ?॥"২২॥

"ওহে যম তুমি, লিখিতেছ ভূমি,
আপন অমোঘ দণ্ডে,
নির্ব্বাণ অঙ্গার, সম দশা তার,
কেন গত লণ্ডভণ্ডে ?॥"২৩॥

"অহে ভানুগণ, হেরি কি কারণ,
সুশীতল তাপক্ষয়ে,
চিত্রলেখা প্রায়, হইয়াছে হায়,
হেরে সবে স্থির হয়ে ?"॥২৪॥

"কেন পর্য্যাকুল, হে মরুতকুল,
বেগভঙ্গ হয় বোধ,
প্রতীপ-গমনে, তরঙ্গ-সৃজনে,
জলে যথা গতিরোধ ?" ॥২৫॥

"হুঙ্কারবিহীন, অতিশয় দীন,
রুদ্রগণে যায় দেখা,
পরাভবে ভালে, মুক্ত জটা-জালে,
বিলম্বিত শশিলেখা ॥"২৬॥

"কেবা সেই পর,* বলবান্ বর,
ফেলিয়াছে সবে ফেরে,
বিশেষ নিয়ম, করে অতিক্রম,
যথা নিত্য নিয়মেরে ?"॥২৭॥

"কহ না কারণ, অহে বংসগণ,
প্রয়োজন আসিবার,
সৃজন অন্তরে, তোমাদের করে,
দিয়াছি পালন-ভার ॥"২৮॥

ধীরে সমীরণ, ভরে পদ্মবন,
হয় যথা কম্পমান,
তথা শচীপতি, বৃহস্পতি প্রতি,
সহস্র-নয়নে চান ॥২৯॥

সহস্র-নয়ন, হ'তো বিচক্ষণ,
বাসবাক্ষি বৃহস্পতি,
যথাভক্তিভরে, কহে বদ্ধকরে,
দ্বিনয়ন অজ-প্রতি ॥৩০॥

"অহে ভগবান্, এ কথা প্রমাণ,
অধিকারচ্যুত সব,
সর্ব্ব-অন্তর্যামী, হও তুমি স্বামী,
কিবা অগোচর তব ?"॥৩১॥

"আপনার বরে, ভুবন ভিতরে,
তারকাখ্য মহাসুর,
যথা ধূমকেতু, সৃষ্টিনাশ হেতু,
হইয়াছে বিভাসুর ॥"৩২॥

"তার পুরে রবি, খরতর ছবি,
একেবারে পরিহরে,
শুধু সরোবরে, কমল নিকরে,
বিকসে বিহিত করে ॥"৩৩॥

"সর্ব্বদা সকলা, কলানাথ-কলা,
স্বেচ্ছমতে ভোগ করে,
কেবল যে কলা, হর-শিরোজ্জ্বলা,
তাঁহারেই নাহি হরে ॥"৩৪॥

"কুসুমহরণ, দোষে সমীরণ,
আরামে বিরাম ডরে,
থাকি দৈত্য পাশে, মৃদুমন্দ শ্বাসে,
ব্যজনীর কর্ম্ম করে ॥"৩৫॥

"ক্রম অনুসার, ত্যজি অধিকার,
ভয়ে সব ঋতুকুল,
মালীর সমান, দিতেছে যোগান,
অকালে বিবিধ ফুল ॥"৩৬॥

"তার উপায়ন, বিবিধ রতন,
জলময় নিজোদরে,
পুষ্ট যদবধি, না হয় জলধি,
প্রতীক্ষায় কাল হরে ॥"৩৭॥

"প্রখর নিকর, রত্নরাজি-ধর,
বাসুকি ভুজঙ্গরাজ,
সারা বিভাবরী, স্থিরভাব ধরি,
করে প্রদীপের কাজ ॥"৩৮॥

"আসি অনুক্ষণ, তার দূতগণ,
কল্পদ্রুমে হরে ফুল,
অনুগ্রহ-আশে, ইন্দ্রভাবে ত্রাসে,
কিসে রবে অনুকূল ॥৩৯॥

"এরূপে আরাধ্য, হয়ে সে অবাধ্য,
পীড়িছে ভুবনত্রয়,—
প্রতি-অপকারে, দুর্জ্জনে নিবারে,
উপকারে শাম্য নয় *॥৪০॥

* শত্রু।

* সাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ

"যে নন্দনবনে, সুর বধূগণে,
দয়ায় তুলিত দল,
সেই তরুগণে, কর্ত্তনে পাতনে,
নিপাত করিছে খল ।।"৪১।।

"ঘুমালে অধম, মৃদু শ্বাস সম,
ব্যজনী-বীজনে রয়,
নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
সুরনারী বন্দিচয় ।।"৪২।।

"রবির তুরঙ্গ খুর-কৃত ভঙ্গ,
সুমেরু শিখরাবলী,
আপন আলয়ে, রচিয়াছে লয়ে,
উপগিরি * কেলিস্থলী ।।"৪৩।।

"দিক্-হস্তী-মদ, যে হয় আস্পদ,
হেন মন্দাকিনী জলে,
জাত হেমপদ্ম, হরি নিজ সদ্ম
বাপাতে রুপেছে বলে ।।"৪৪।।

"তার আসা ভয়ে, স্বর্গ পথ চেয়ে,
খিলভাব আবির্ভাব।
ভুবন-লোকন সুখ দেবগণ,
নাহি করে অনুভাব ।।"৪৫।।

"যাজ্ঞিক অধ্বরে, হব্য দান করে,
বৃথা আমাদের তরে,
দুঃখে মরি দেখে, অগ্নিমুখ থেকে,
যাগ ভাগ সব হরে ।।"৪৬।।

"ইন্দ্রের অর্জিত, বহুকালার্জিত,
যশ উচ্চৈঃশ্রবা হয়,
উচ্চ কলেবর, বাজি-রত্নবর,
হারিয়াছে দুরাশয় ।।"৪৮।।

"যথা সন্নিপাতে, বিকার-উৎপাতে,
মহৌষধ ব্যর্থ হয়,
তাতে সেই মত, আমাদের যত,
উপায় সফল নয় ।।"৪৮।।

"হয়-প্রতিঘাতে, তেজ জাত যাতে,
জয় আশা দেবতার,
সেই সুদর্শন, হয়েছে শোভন,
ধুকধুকী গলে তার ।।"৫৯।।

"তার যত করী, পরাভূত-করি,
ঐরাবত গজবরে,
পুষ্কর আবর্ত্ত, আদি মেঘাবর্ত্ত-
মাঝে বপ্রক্রীড়া করে ।।"৫০।।

"কর্ম্মবন্ধনাশী, ধর্ম্ম অভিলাষী,
যেরূপ মুমুক্ষু জ্ঞানী,
অমর-আশ্বাসে, তারক বিনাশে,
সৃজন দেব-সেনানী ।।"৫১।।

"সুর-সেনাপতি, করিয়া সঙ্গতি,
পুরোভাগে লয়ে তারে,
নমুচিসূদন, জয়শ্রী মোচন,
পারিবেন করিবারে ।"৫২।।

বাক্য অবসান, পরে ভগবান্,
বিধির রুচির কথা,
গরজন পরে, বরিষণ করে,
সুভগ জলদ যথা ।—৫৩।।

"দেব-মনোরথ, সিদ্ধ যথাযথ,
হবে কিছু কাল পরে,
নাশিতে এ রিষ্টি, না করিব সৃষ্টি,
আমি সেনাপতিবরে ।"৫৪।।

"আমা হ'তে দুষ্ট, হইয়াছে পুষ্ট,
ক্ষয়যোগ্য নাহি হয়,—
বিষ-তরুবরে, সৃষ্টি করি পরে,
ছেদন উচিত নয় * ।।"৫৫।।

"পূর্ব্বে দৈত্যবর, নিল এই বর,
প্রতিশ্রুত সে কারণ,
তপঃ-হুতাশনে, দহে ত্রিভুবনে,
বরে করি নিবারণ ।।"৫৬।।

অমর সহিত, সমর প্রহিত,
সে তারক দুরাচার,
শিবতেজ-অংশ, বিনা করে ধ্বংস,
বল বল আছে কার ।৫৭।।

"তমোগুণ-পারে, মহাদীপ্যাকারে,
আছেন সে মহাপ্রভু,
আমি, ত্রিবিক্রম, জানিতে অক্ষম,
প্রভাবের সীমা কভু ।।"৫৮ ।।

"সংযমস্তিমিত, মহেশের চিত,
উমারূপে আকর্ষণে।

* উপবন মধ্যে কেলিশৈল রচনা করা ভারতবর্ষের পুরাতন প্রথা, ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে অধুনা প্রচলিত হইয়াছে।

* বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম সাম্প্রতম্

হও যত্নবান্, চুম্বক সমান,
লৌহ-প্রতি আক্রমণে ॥"৫৯॥
"সহিবারে ক্ষম, শিব আর মম,
মহাবীর্য্য নিজাধারে-
নগেন্দ্রকুমারী, অথবা এ বারি,
মহেশের একাকারে ॥"৬০॥
"সিতিকণ্ঠসুত, বিভূতি-প্রভূত,
হবে দেব সেনাপতি,
সুরবন্দিগণে, বেণী * বিমোচনে,
পাবে তবে অব্যাহতি।"৬১॥
বলি এ বচন, জগৎ-জনন,
করিলেন তিরোধান,
যথা সুবিহিত, অন্তরে আহিত
দেবদল স্বর্গে যান।৬২॥
এ কার্য্য সাধন, করিতে মদন,
যোগ্য ইতি স্থির পরে,
পাকনিসূদন, করেন স্মরণ,
ফুলময় পঞ্চশরে ॥৬৩॥
অনন্তর সুললিত, ভামিনী ভ্রূলতাচিতে,
শৃঙ্গধর ধনু মনোহর,
রতির বলয়-পদ, চারুচিহ্ন শোভাস্পদ,
কণ্ঠতটে ধরি নিরন্তর ॥৬৪॥
ঋতুপতি-সহচর, করে যার শোভাকর,
মাকন্দমঞ্জরী প্রহরণ,
শচীনাথসুগোচরে, প্রাঞ্জল-আবদ্ধ-করে,
সমুদিত হইল মদন।৬৫॥
ইতি ব্রহ্মাভিগমন নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

সুরগণ পরিহরি রতিপতি পতি,
সহসা সহস্র দৃষ্টি দেন শচীপতি।—
প্রায় দেখা যায় প্রভুদের প্রয়োজনে,
আদরের অস্থিরতা অনুগত জনে ॥১॥
আনি আপনার সিংহাসন-সন্নিধানে,
স্থান দিয়া কহিলেন বসো এইখানে।
প্রভুর প্রসাদ শিরে বন্দিয়া মদন,
গুপ্ত যুক্তি জানি করে বচন-রচন ॥২॥
"আজ্ঞা কর যেবা হয় হে পুরুষধব,
সংসারেতে কোন্ কার্য্য করণীয় তব।
অনুগ্রহ স্মৃতিপথে সমুদিত যবে,
আজ্ঞা-যোগে তাহারে হে বাড়াইতে হবে ॥৩॥
অতিশয় তপোবলে কিবা কোন্ জন,
তব পদাকাঙ্ক্ষী হেতু ঈর্ষ্যার ভাজন?
শায়ক-সঙ্কিত এই আমার কোদণ্ড।
লক্ষে পড়ি যদবধি নহে লণ্ডভণ্ড ॥৪॥
তোমার অমতে পুনর্জন্মে ভীতমন,
মুক্তি-মার্গ প্রাপ্ত বল হবে কোন্ জন?
কামিনীর কটুতর কটাক্ষের জোরে,
চিরকাল বদ্ধ হয়ে রবে ভব-ঘোরে ॥৫॥
পড়ুক হাজার নীতি উশনার কাছে,
বিষয়ে মজাতে তায় মোরে ভার আছে,—
তরল তরঙ্গ যথা তোয়ধির তটে,
অর্থ ধর্ম্ম প্রপীড়িত আমার নিকটে ॥৬॥
বল, কোন্ একপত্নী-ব্রত * দুঃখশীলা,
চারু রূপে তব মন মোহিলা মহিলা,
চাহ কি হে সেই মুক্তলজ্জা প্রমদারে,
কণ্ঠে ধরি আলিঙ্গন দিবেক তোমারে?৭॥
সুরতাপরাধে তব কেবা সে কামিনী,
পদানত হইলেও, সনয়া ভামিনী?
অনুতাপে তাপ আমি বাড়াইব তার,
করাইব কোমল পল্লব-শয্যা সার ॥৮॥
সংহর আপন বজ্র, প্রসাদ করহ,
মম শরে কোন্ দনুজের রক্ষা কহ?—
বাহুবল হয়েছে বিশাল যার তরে,
কামিনীর কোপরক্ত ওষ্ঠ দেখে ডরে ॥৯॥

* পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে পতিবিরহিণীগণের একবেণী রক্ষা করা রীতি ছিল; স্বামীর পুনঃ-সংমিলন ব্যতীত তাঁহারা সেই বেণী মোচন বা কবরীবন্ধনাদি করিতেন না।

* এতদ্বারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক অহল্যা-হরণের কথা সূচনা হইতেছে।

"তব অনুগ্রহে হয়ে ফুলশর-ধর,
লইয়ে সহায় মাত্র ঋতুর ঈশ্বর,
পিনাকী হরের ধৈর্য্য হরিবারে পারি,
কি আর গণনা করি অন্য ধনুর্ধারী ?" ।।১০।।
উরুহস্তে উত্তোলন করিয়া চরণ,
মহামূল্য পাদপীঠে করিয়া স্থাপন,
কাম-মুখে ব্যক্ত শুনে নিজ অভিপ্রায়,
আখণ্ডল এইরূপে কহিছেন তায় ।।১১।।
"অহে সখে ! যা কহিলে যথার্থ সকল,
তুমি আর বজ্র মধ্যে তুমিই সফল,—
কুলিশ বিষম কুণ্ঠ তপোবীর্য্য কাছে,
সর্ব্বগামী তব শর অসাধ্য কি আছে ?" ।।১২।।
"তব বল জেনো শুন্যে—সমুচিত তার—
গুরুভার-নিয়োগেতে বাসনা আমার,—
ভূভার-ধারণে ধৃষ্ট নিরখিয়া শেষে,
স্বভার-বহনে বিষ্ণু নিয়োজিল শেষে" ।।১৩।।
"হর-প্রতি শর-ক্ষেপে সাধ্য আছে তব,
এই কথা যখন বল্যেছ মনোভব !
বিষম বৈরিতে ব্যস্ত বৃন্দারকগণ,
মনোরথ-সিদ্ধিপথ প্রাপ্ত সেইক্ষণ ।।১৪।।
"হর-তেজে সম্ভূত হবেন সেনাপতি,
তাহে হবে দেবতার বিজয়-সঙ্গতি,
ব্রহ্ম-ধ্যানে লীন চিত্ত ব্রহ্মাঙ্গ-নিধান,
হেন হরে শর-ক্ষেপে তুমি ক্ষমবান্" ।।১৫।।
"নগেন্দ্র নন্দিনী উমা, সদাকাল শুচি,
চালহ তাঁহাতে যতচিত্ত-শিব-রুচি,—
বিধির নির্ব্বন্ধ এই রমণী মাঝারে।
উমা মাত্র ক্ষমা হর-তেজ ধরিবারে" ।।১৬।।
"হিমালয়-সানুদেশে পিতার আদেশে,
হর-আরাধেন উমা বরের উদ্দেশে,—
অপ্সরার মুখে সব আছি সুগোচর—
আমার স্বজন তারা হয় গুপ্তচর" ।।১৭।।
"অতএব দেবকার্য্য কর হে সুজন !
ইহাতে অপর অর্থে * আছে প্রয়োজন ;
তথাপি তুমি হে হও উত্তম কারণ—
বীজাঙ্কুর-পূর্ব্বে যথা সলিল-সেচন ।।১৮।।
"অমরের জয়ের উপায় এই, কাম !
হরে কার শরাঘাত রাখ নিজ নাম ;
সামন্য-কঠিন-কার্য্যে যশ লভে নর,
তুমি কৃতী-অসামান্য কার্য্য তব স্মর" ।।১৯।।
"দেবতার প্রার্থনীয় এই প্রয়োজন,
ত্রিলোকের কার্য্য তাহে শুন হে মদন,
চাপের প্রতাপ ইথে হিংসা নাই অতি,
স্পৃহণীয়-বীর্য্য তুমি অহে রতিপতি ।।২০।।
"শুন মনোভব, তব মাধব বান্ধব,
বিনা আবাহনে, তব সহায় সম্ভব,—
যথা আবির্ভূত মাত্র হল্যে হুতাশন,
অমনি প্রোজ্জ্বল তারে করে প্রভঞ্জন" ।।২১।।
প্রভুর প্রসাদ-পুষ্প-মাল্য তার পরে,
আজ্ঞাসহ মদন ধরিলে শিরোপরে,
করীন্দ্র-তাড়ন জন্য কর্কশিত করে,
শচীনাথ, স্মরতনু, পরশে সাদরে ।।২২।।
সঙ্গে লয়ে সশঙ্কিত সঙ্গী রতিপতি—
প্রিয় বন্ধু ঋতুরাজ, প্রিয় দারা রতি—
দেবকার্য্য-সাধনায় শরীর-পতনে,
চলিল তুহিন-গিরি-স্থিত স্থাণু-বনে ।।২৩।।
সেই বনে সমাধিস্থ তপোধন গণ,
তপস্যার ফলসিদ্ধি বারণ-কারণ,
মদনের অভিমান সুখের বিষয়,
স্বরূপ প্রকাশি আসি বসন্ত উদয় ।।২৪।।
কুবের-রক্ষিতা দিক্ উদীচির সঙ্গে
অসময়ে দিনকর মাতে রতিরঙ্গে ;
দক্ষিণা দক্ষিণা সতী গন্ধবহ-মুখে
পতি প্রতিকূল হেতু নিশ্বসিত দুঃখে ।।২৫।।
সদ্য সদ্য মঞ্জরিত অশোক সুন্দর,
আপাদ মস্তকে নব পল্লব নিকর—,
সুন্দরীর সুশিঞ্জিত চরণ-পরশ,
অপেক্ষা না করি সেই হইল সরস ।।২৬।।

* কারণ।

নিরমিয়া শর, সহ মাকন্দমঞ্জরী,
নবদল পুষ্প পুঞ্জ তাহে যুক্ত করি,

মধুকরশ্রেণী মধু মুড়িয়া শোভায়,
মদনের নামাক্ষর লিখেছে কি তায়* ? ২৭॥

বর্ণে বটে বর্ণনীয় কর্ণিকার ফুল,
গন্ধহীন হেতু হয় হৃদয় ব্যাকুল—
সকল বিকল, দেখি বিধি-সৃষ্টি, বিধি,
কাহাকেও করে নাই সর্ব্বগুণনিধি ॥২৮॥
বালশশী সম বক্র, আর বিলোহিত,
পলাশ-মুকুলপুঞ্জ হল্যো প্ররোহিত,

বনভূমি-বরাঙ্গনা-গণের শরীরে,
বসন্ত নখরে ক্ষত করে কি অচিরে ? ২৯ ॥

ভাল সজ্জা ধরিলেক বাসন্তীয় শোভা,—
নয়নে অঞ্জন হলো মত্ত মধুলোভা,

চিত্রবর্ণ তিলকে তিলক পরিপাটী,
নবচূত-প্রবালেতে আল্‌তার পাটী ॥৩০॥
পিয়াল-ফুলের রজে বিম্বিত লোচন,
কাননে কাননে মদমত্ত মৃগগণ,
জীর্ণ পর্ণপাতে মর্ম্মরিত বনস্থলী,
হেলে তলে বায়ু-প্রতিকূলে যায় চলি ॥৩১॥
রসাল রসাল ফুলে করি রসপান,
কল কোকিলের কণ্ঠে বাড়িল সুতান,—
মানবতী মহিলার মান-পরিহারে,
কামের আদেশ কিবা কোকিল ফুকারে ॥৩২॥
বিশদ হইল কিন্নরীর বিম্বাধর,
রঙ্গ-ছটা-শূন্য মুখ পাণ্ডুবর্ণধর, *

পত্রাবলি মুছে গেছে কপোলফলকে,
হিমগতে শ্রমজল তথায় ঝলকে ॥৩৩॥

অসময় রসময় বসন্ত উদয়,—
স্থাণু-বনবাসী যত যতি সমুদয়,

ঋতুর প্রভাবে পূর্ব্ব-ভাবের বিলয়ে,
বহুযত্নে শাম্য করে ইন্দ্রিয় নিচয়ে ॥৩৪॥
ফলধনু, ফুলধনু ধরি, স্থাণুবনে
উদয় হইল আসি, প্রিয়া রতিসনে,
তাহাতে, আসক্তচিত্ত প্রণয়-সঙ্গমে,
হইল দাম্পত্য-বন্ধ, স্থাবর জঙ্গমে ॥৩৫॥

একপুষ্প-পানপাত্রে মত্ত মধুকরে,
প্রিয়ার উচ্ছিষ্ট মধু পিয়ে প্রেম ভরে,

কুরঙ্গ স্বশৃঙ্গে করে অঙ্গ কণ্ডূয়ন—
সুখের পরশে মৃগী মুদিছে নয়ন ॥৩৬॥
সরোরুহ-সুরভিত-বারি লয়ে করে,
করিণী সাদরে দান করে করিবরে।
মৃণালের অর্দ্ধভাগ করিয়া আহার,
চক্রবাক্ প্রেয়সীরে দেয় উপহার ॥৩৭॥
কিন্নরকামিনীমুখে গীত-উপরমে—
পত্রলেখা ঈষৎ মুছেছে স্বেদাগমে,
পুষ্প-মধু * পানে তার ঘূর্ণিত নয়ন—
কিন্নর সুচারু মুখে করিছে চুম্বন ॥৩৮॥
ঘন পীন পুষ্পগুচ্ছ-স্তন মনোহর,
প্রবাল-প্ররোহ কিবা লোহিত অধর,
এ হেন লাবণ্যবতী লতাবধূগণে,
শাখা-ভুজ নমি শাখী বাঁধে আলিঙ্গনে ॥৩৯॥
পশিলেও অপ্সরার সংগীতশ্রবণে,—
আত্মার সন্ধানে হর স্থিত সেইক্ষণে,—
আত্মা বশ যার, তার বিঘ্ন যদি ঘটে,
সমাধি না ভঙ্গ হয় তাহার নিকটে ॥৪০॥

* অস্ত্রের অঙ্গে নাম লিপি করা ভারতবর্ষের পুরাতনী রীতি।

† ইয়ুরোপীয় অঙ্গনাগণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় ভামিনীগণ শীতকালে শীতজনিত বিস্ফারণ নিবারণ জন্য অধরে দ্রব মোম বিলেপন করিতেন। অপিতু মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা উৎপাদন করণার্থ কুঙ্কুমাদি চূর্ণক ম্রক্ষণ করিতেন। বসন্তোদয়ে মোম রাহিত্য হেতু অধর বিশদ, এবং রঙ্গচূর্ণ-বিরহে মুখমণ্ডল স্বাভাবিক পাণ্ডুর অর্থাৎ ঈষৎপীত শুভ্রপ্রতিভা পুনঃপ্রাপ্ত হইত।

* উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ মধুক অর্থাৎ মউল ফুলের মদ্য প্রভৃতি আসব।

লতাগৃহ দ্বারে নন্দী দাঁড়াইল রাগে—
শোভিত স্বুবর্ণ-দণ্ড বামবাহুভাগে—
মুখেতে তর্জ্জনী রাখি ইঙ্গিত তর্জ্জনে,
"স্থির হও" বলি আদেশিল শিবগণে ।।৪১।।

অমনি স্তম্ভিত তরু, নিশ্চল ভ্রমর,
নীরব অগুঞ্জ, শান্ত কুরঙ্গ নিকর,
নন্দীর শাসনে প্রশমিত সর্ব্বজন
চিত্র-লিখিতের ন্যায় হইল কানন ।।৪২।।

হর-নেত্র-অন্তরালে, চলিল মদন,
প্রয়াণে সম্মুখ শুক্র * সম যে নয়ন,
নিবিড় নমেরু-তরু-প্রান্ত সুশোভন,
হেন ধ্যানস্থানে কাম করিল গমন ।।৪৩।।

দেবদারু-মূল সুশোভন সুখাসন—
শার্দ্দূলের চর্ম্মে আচ্ছাদিত আয়তন—
সমাধিস্থ হরে তায় করে দরশন,
আসন্ন-মরণ-মুখে পতিত মদন ।।৪৪।।

বীরাসনে স্থিত—স্থির পূর্ব্ব কলেবর,
বিনত কন্ধর, ঋজু তনু পরিসর,
উত্তান যুগল পাণি—অঙ্ক-অন্তরালে,
প্রফুল্ল কমল যেন শোভিত মৃণালে ।।৪৫।।

প্রলম্বিত জটাজূটে ভুজঙ্গ বিরাজে,
শ্রবণেতে দুই ছড়া অক্ষসূত্র সাজে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-প্রভা নীলিমাসংকাশ,
কৃষ্ণাজিন প্রাপ্ত তাহে বিশেষে বিকাশ ।।৪৬।।

ঈষৎ প্রকট নেত্রে তারকা স্তিমিত,
ভুরুর বিক্ষেপ সঞ্চালন-বিরহিত,
ত্রিনয়নে পক্ষ্মপুঞ্জ স্পন্দনবিরত,
নাসালক্ষ্যে অক্ষিতেজ অধোদিকে নত ।।৪৭।।

যথা বর্ষাভাবে স্থির মেঘের বিস্তার,
সেইরূপে প্রাণ আদি বায়ুর সঞ্চার,
তরঙ্গবিহীন হ্রদে অপান-নিরোধ,
নিবাত নিষ্কম্প দীপ সমান উদ্বোধ ।।৪৮।।

* যাত্রাকালে শুক্রগ্রহ সম্মুখস্থ হওয়া অশুভ।

ঊর্দ্ধ দিকে ললাটস্থ নেত্রের উচ্ছ্বাস,
ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে তার জ্যোতির প্রকাশ,
হরিতেছে শিরস্থিত বালশশীশোভা—
মৃণালসূত্রের ন্যায় অতিমনোলোভা ।।৪৯।।

নিগম, আগম, বিরহিত নবদ্বার,
সমাধিতে বশ চিত্ত হৃদয়ে প্রচার
যেই নিত্য ধনে ভাবে তত্ত্বদর্শীগণ,
সে আত্মায় স্ব-আত্মায় করেন দর্শন ।।৫০।।

এইরূপ বিরূপাক্ষে, অতনু অদূরে,
নিরীক্ষণ করে, হৃদে সাহস না স্ফুরে,
শ্লথ হয়ে গেছে হস্তে শর শরাসন,
ভয়ের প্রভাবে তাহা নহে দরশন ।।৫১।।

নষ্ট-প্রায় মদনের বল-বীর্য্য পুনঃ
যেন বপুগুণে বাড়াইতে বহুগুণ,
বনদেব-দারাগণ-সঙ্গেতে সঙ্গিনী,
উদিতা তথায় আসি নগেন্দ্র-নন্দিনী ।।৫২।।

পদ্মরাগে উপেখিয়া অশোকের হার—
কর্ণিকারে স্বুবর্ণ সুবর্ণ-সমাহার—
সিন্ধুবার-কলিকার মুকুতার মালা*—
মধু-পুষ্প-ভূষণে ভূষিতা গিরিবালা ।।৫৩।।

তরুণ অরুণ-বর্ণ কাঁচলী-কষণ—
ঈষৎ স্খলিত স্তনে সে চারু বসন—
সপল্লব পুষ্পগুচ্ছে নতা লতা-প্রায়,
হেলে দুলে শৈলসুতা উদিত তথায় ।।৫৪।।

নিতম্বে লম্বিত বকুলের চন্দ্রহার,
থেক্যো থেক্যো সরে আর ধরে বার বার,
যথা-স্থান-পরিজ্ঞানে বিজ্ঞ বটে কাম,
অন্যেতর ধনুর্গুণ সেই কাঞ্চীদাম ।।৫৫।।

সুরভিত নিশ্বাসেতে প্রবল পিপাসী,
বিম্বাধর-সমীপে চঞ্চরী চরে আসি,
চমকে চঞ্চল দৃষ্টি তাহে প্রতি পলে,
নিবারণ করিছেন লীলা-শতদলে ।।৫৬।।

* ইহার মুকুল বর্ত্তুলাকার এবং রক্তাভ, ভাষা নাম নিষিন্দা।

নিরখি যে অকলঙ্ক চারু রূপবতী,
লজ্জা-অনুভবে পরাভব মানে রতি ;
জিতেন্দ্রিয় হর-পরাজয়ে আর বার,
হইল কামের মনে কামনা-সঞ্চার ॥৫৭॥
ভাবি পতি পশুপতি-প্রেম-অনুরাগে,
দাঁড়াইলা শৈলসুতা দ্বার-পুরোভাগে,
দেখিলেন—ধ্যানে ধরি পরমাত্ম-ধনে,
সার জ্যোতি-দরশনে সুখী শিব মনে ॥৫৮॥
অনন্তর, অনন্ত কম্পিত কলেবরে,
বহুযত্নে ধরাতলে ধরে শিরোপরে,—
প্রাণ-রোধ করি যিনি করেন মোচন,
শিথিল হইল সেই শিবের আসন ॥৫৯॥
প্রণমি সভয়ে নন্দী করে নিবেদন,
"এসেছেন শৈলসুতা সেবিতে চরণ,
আজ্ঞা যদি হয় প্রভো করেন প্রবেশ",
ভ্রূ ভঙ্গীতে অনুমতি দিলেন মহেশ ॥৬০॥
পরে শৈল-নন্দিনীর সঙ্গিনী-আবলি,
প্রণমিয়ে শিবপদে, দেন পুষ্পাঞ্জলি,
হেমন্তের অন্তকারী বসন্ত-প্রসূন,
অভঙ্গ পল্লব-পুঞ্জ নিজ হস্ত-লূন ॥৬১॥
উমার চিকণ চারু চিকুরের মাঝে,
নব কর্ণিকার ফুল শোভিত সুসাজে,
বৃষভ-বাহন-পদে করিতে প্রণাম,
কর্ণ হতে খসিয়া পড়িল পুষ্পদাম ॥৬২॥
প্রণতারে সম্বোধিয়ে কন পশুপতি,
"অনন্য-প্রণয়ী পতি প্রাপ্ত হও সতি।"
সেইরূপ পার্ব্বতীর হলো ফলোদয়,—
মহাপুরুষের বাক্য কভু মিথ্যা নয় ॥৬৩॥
শর-সন্ধানের কাল বুঝিয়া অনঙ্গ—
বহ্নিমুখে যেতে যথা লোলুপ পতঙ্গ—
উমার সম্মুখে হরে লক্ষ্যবদ্ধ করি,
মুহুর্মুহুঃ আকর্ষিল ধনুর্গুণ ধরি ॥৬৪॥
সেই কালে আরক্ত শ্রীকরে গিরিবালা,
অর্পিলেন তপস্বীরে পদ্মবীজমালা—
দিনকর খর করে বিশোষিত-রস,
মন্দাকিনী-জলে জাত সেই তামরস ॥৬৫॥
ভক্তিমতী পার্ব্বতীর প্রীতির কারণ,
শিব সমুদ্যত মালা করিতে গ্রহণ,
অমনি কুসুমধনু করিয়া সন্ধান,
নিয়োজিল সে অমোঘ সম্মোহন বাণ ॥৬৬॥
হরের হইল কিছু ধৈর্য্য পরিগত,
চন্দ্রের উদয়কালে অম্বুরাশিমত,—
উমামুখে অধরোষ্ঠ যুগ্ম বিম্বফল,
ত্রিলোচন-ত্রিলোচন তাহাতে বিহ্বল ॥৬৭॥
নগনন্দিনীর কিছু হলো ভাব-ভঙ্গ,
কোমল কদম্ব-কল্প শিহরিল অঙ্গ,
বিভ্রমেতে ব্রীড়ানত হইল লোচন,
সাচীকৃত করিলেন সুচারু আনন ॥৬৮॥
পরেতে পরেত-পতি, প্রাদুর্ভব সহ,
বলবান্ ইন্দ্রিয়ের করিয়া নিগ্রহ,
চিত্তবিকারের হেতু, অন্বেষণ হেতু,
দশদিকে দৃষ্টি করিলেন বৃষকেতু ॥৬৯॥
দেখিলেন মনোভবে—আলীঢ়, আসনে,
দক্ষিণ অপাঙ্গতটে মুষ্টি-আকর্ষণে,
আকুঞ্চিত সব্যপাদ, কন্ধর বিনত,
চক্রীকৃত চাপ চারু মারিতে উদ্যত ॥৭০॥
তপোভঙ্গে কোপের প্রভাব ঘোরতর—
বিকট ভ্রূ ভঙ্গীযুত মুখ ভয়ঙ্কর,
তৃতীয় লোচন হতে হইয়ে প্রোজ্জ্বল,
সহসা উদয় আসি হইল অনল ॥৭১॥
"সংহর, সংহর ক্রোধ, প্রভো শূলপাণি !"
আকাশে মরুতগণ কহে এই বাণী,
না হইতে ভূভাগে এ বাণী অবতার,
হর-নেত্রানলে কামতনু ছারখার ॥৭২॥
অতি ঘোরতর শোকে অচেতন মতি,
একেবারে মূর্চ্ছাগত হইলেন রতি,
পতির দুর্গতি ক্ষণে না জানে অন্তরে,—
মঙ্গল-দায়ক মোহ, মোহিনীর তরে ॥৭৩॥

ব্রজে যথা তরুভঙ্গ, সেই ভাব ধরি,
তপোবিঘ্নকারী কাম-অঙ্গ ভঙ্গ করি,
অবলার-সঙ্গত্যাগ করণ-কারণ,
পলায়িত প্রমথেশ সহ স্বীয়গণ ॥৭৪॥
উন্নত পিতার আশ, সকল হইল নাশ,
ললিত লাবণ্য-গর্ব্ব হইল বিগত।
জানিল সঙ্গিনীচয়, তাহে লজ্জা অতিশয়,
গৃহেতে চলিল গৌরী হয়ে আশাহত ॥৭৫॥
রুদ্র-রৌদ্র-রসে ভীতা, নেত্রদ্বয় নিমীলিতা,
দয়াস্পদ দুহিতারে রাখি বাহুপরে—
দন্তে ধরি সলিলজ, যথা শোভে সুরগজ—
দীর্ঘদেহে ধায় গিরি দ্রুত বেগভরে ॥৭৬॥
ইতি মদন-দহন নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

মোহপরায়ণা রতি, বোধবিরহিতা সতী,
বশ নহে ইন্দ্রিয়নিবহ,
ভর্ত্তাভাব-ভব নব, অসহ্য যাতনা সব,
জানাতে জাগান পিতামহ ॥১॥
মোহভাব পরিহরি, আঁখি উন্মীলন করি,
সচকিত চারিদিকে চায়,
নাথে নিরখিয়ে যার, তৃপ্তি নাহি একবার,
লুপ্ত হেতু দেখিতে না পায় ॥২॥
"ওহে প্রাণেশ্বরামার, জীবিত আছ কি আর?"
উঠিলেন এই উক্তি করি ॥
দেখেন পুরুষাকার, হর-কোপে ছারখার,
নিপতিত ধরণী উপরি ॥৩॥
ভস্মে হেরে পুনরায়, বিহ্বলাঙ্গী বসুধায়,
লুটায়ে ধূসর পয়োধরা।
এলাইয়া কেশভারে, হাহাকারে নিজাকারে,
অটবীরে করিল কাতরা ॥৪॥
"তব তনু কান্তিযুত, উপমার মূলীভূত,
যাহে লোক বিলাসে বিভোর,
তার দশা দেখি হেন, না বিদরে হিয়া কেন?
নারীর হৃদয় সুকঠোর ॥৫॥
"তবাধীন মমপ্রাণ, কোথা রেখে গেলে প্রাণ,
তব স্নেহশূন্য করি ক্ষণে?
সেতুভঙ্গে বহে নীর, হয় যথা নলিনীর,
প্রাণাকুল জীবন-বিহনে ॥৬॥
আমার অপ্রিয় কভু, কর নাই তুমি প্রভু,
আমিও তা করিনি কখন।
তবে কেন অকারণ, কাঁদাইছ এতক্ষণ,
রতিরে না দেহ দরশন?" ॥৭॥
"স্মরিছ কি হে প্রাণেশ, কাঞ্চী বন্ধনের ক্লেশ,
পর নামে ডাকিলে আমারে?
কিম্বা চ্যুত-রজো বৃষ্টি, দূষিত করিত দৃষ্টি,
কর্ণ-ইন্দীবরের প্রহারে? ॥৮॥
তব হৃদে মম বাসা, সে কেবল ছল ভাষা,
আমারে তুষিতে অভিলাষ।
যথার্থ হইলে পরে, কহ তব দেহান্তরে,
আমি কেন না পাইনু নাশ?" ॥৯॥
"হে নাথ অবশ্য আমি, হব তব অনুগামী,
অহে নব পরলোক-বাসী!
বিধি তব সংহরণে, বঞ্চিয়াছে জীবগণে,
তবাধীন দেহি-সুখরাশি" ॥১০॥
"তোমার অভাবে আর, কে করাবে অভিসার,
প্রিয়াগণে প্রাণেশ-মন্দিরে?
মেঘরবে ভীত-চিতা, রাজপথে সচকিতা,
আবরিতা নিশির তিমিরে" ॥১১॥
"সীধুপানে আর নাকি, ঘুরিবে অরুণ আঁখি,
পদে পদে স্খলিত বচন?
প্রমদা-সভায় এবে, আর তারে কেবা সেবে,
বারুণীর হল্যো বিড়ম্বন" ॥১২॥
"প্রিয় বান্ধবের গাত্র, কথায় রহিল মাত্র
জানি নিজ বিফল বিকাশ।
ইন্দু কৃষ্ণপক্ষ গতে, করিবেক কোনমতে,
নিজ তনু তনুতা বিনাশ" ॥১৩॥

"কলপিক রবে রুত, আর কার তরে চুত,
অধুনা নবীন মনোহর।
প্রসবি মুকুলগণ, রচিবেক প্রহরণ,
হরিত লোহিত বৃন্তধর ?"॥১৪॥
"মধুকর-শ্রেণী নিয়ে, গুণপুঞ্জ নিরমিয়ে,
যুড়িতে হে চাপ পরিকরে।
গুরুশোকে শোকাকুল, অই শুন অলিকুল,
মম সঙ্গে সঙ্গে খেদ করে" ॥১৫॥
"পুনরপি কলেবর, প্রাপ্ত হয়ে মনোহর,
প্রসাদ করহ কোকিলারে।
স্বভাবে সে সুপণ্ডিতা, মধুস্বর-বিমণ্ডিতা,
রতি-দূতি-পদ দেহ তারে" ॥১৬॥
"আমার চরণ ধরি, শিহরিত থর থরি,
আলিঙ্গন-ভিক্ষায় কাতর।
সে নিভৃত লীলা স্মরি, মরি নাথ মরি মরি,
হয় মম অস্থির অন্তর" ॥১৭॥
"হে রতিপণ্ডিত নাথ! বসন্ত-কুসুম-সাথ,
আমায় ভূষিতে রসময়!
এখনো সে পুষ্পচয়, রহিয়াছে তন্ময়,
তব চারু দেহ দৃশ্য নয়" ॥১৮॥
"দারুণ দেবতাগণে, ডেকে নিল তোমাধনে,
মম লজ্জা না করিতে শেষ।
অলক্ত আরক্ত রাগে, মম বামপদ-ভাগে,
রঙ্গ-দানে সাঙ্গ কর বেশ" ॥১৯॥
"যতক্ষণ সুরালয়ে, চতুরা সুরজাচয়ে,
তব প্রতি না দেয় লোভন,
ততক্ষণ আমি গিয়ে, হুতাশনে প্রবেশিয়ে,
তব অঙ্ক করিব শোভন" ॥২০॥
"শুন প্রাণ-প্রিয় স্বামি, আমি তব অনুগামী,
হব ইহা যদিও নিশ্চয়।
একক্ষণ কাম গতে, রতি ছিল এ জগতে,
রহিল অখ্যাতি অতিশয়" ॥২১॥
"লোকান্তর-গত ধব, কেমনে করিব তব,
মৃত দেহ উচিত মণ্ডন
ইহাত ছিল না বোধ, একেবারে সব রোধ,
দেহ সহ যাইবে জীবন ?"॥২২॥
"অপাঙ্গে চাহনী বাঁকা, মুখে মধু হাস্য মাখা,
মধুসহ মধুর আলাপ,
শর ঋজু অভিমত, ফুলধনু অঙ্কগত,
স্মরি মোর হৃদে বাড়ে তাপ" ॥২৩॥
কুসুম-কার্ম্মুক চারু, বসন্ত বিনোদ কারু,
কোথায় সে প্রাণবন্ধু তব ?
পিনাকীর উগ্র কোপ, তারেও কি কৈল লোপ,
বন্ধুগতি-গত কি মাধব ?" ॥২৪॥
অনন্তর সকাতরা, রতি প্রবোধিতে ত্বরা,
পুরোভাগে বসন্ত উদয়,—
বিলপিত শোক-স্বরে, বিষ-বিলেপিত শরে,
বিদ্ধ যেন তাহার হৃদয় ॥২৫॥
তারে নিরখিয়ে সতী, দ্বিগুণ রোদনবতী,
হৃদয়েতে করাঘাত করে,
বন্ধু-অগ্রে দুঃখভার, বৃদ্ধি হেতু হিয়াদ্বার,
প্রহারিত বিমোচন তরে ॥২৬॥
কহিতেছে করুণায়, "হের অহে ঋতুরায়,
কি দশা পাইল বন্ধু তব ?
ভস্মে পরিণত তূর্ণ, কপোত কর্ব্বুর চূর্ণ,
উড়াইছে অঞ্জনাবান্ধব ॥২৭॥
"এসো ওহে মীনকেতু, তব দরশন হেতু,
মাধবের মানস চঞ্চল,—
পুরুষের নারী-প্রতি, কভু নহে সম রতি,
বন্ধুজনে প্রণয় অটল" ॥২৮॥
"তোমার এ সহচর, রচি দিত ফুল-শর,
বিসতন্তু চাপে সংমোহন,—
করিতে হে দর্পচূর কি অসুর কিবা সুর,
আজ্ঞাকারী এ তিন ভুবন" ॥২৯॥
বাতাহত দীপ-মত, সে সখা লইল হত,
রাখিতে নারিলে তুমি তারে।
দেখ দশা দশা * প্রায়, পড়ে আছি আমি হায়,
গুরু শোক-ধূমের সঞ্চারে ॥৩০॥

* সলিতা।

"পতি-অর্দ্ধ-অঙ্গ আমি, তবে কেন গতে স্বামী,
বিধাতা রাখিল প্রাণ ধড়ে ?—
করিকরে তরুবর, ভূমিসাৎ হল্যে পর,
নিরুপায় লতিকাও পড়ে" ॥৩১॥
তাই বলি ঋতুরাজ, এখন করহ কায,
বন্ধুজন সার প্রয়োজন।
হেরি মোরে শোকান্বিতা, সাজাইয়ে দেহ চিতা,
পাব তাহে পতি প্রাণধন ॥৩২॥
"শশী যবে অস্তে যায়, জ্যোৎস্না তার সঙ্গে ধায়,
মেঘ সঙ্গে তড়িৎ প্রয়াণ,
পতি-পথ-পরা সতী, পতি-ভিন্ন নাই গতি,
জড়েতেও দিতেছে প্রমাণ" ॥৩৩॥
"পরে হয়ে অগ্রসর, পতি ভস্ম শোভাকর,
পয়োধরে শোভা করি তায়।
নবপত্র-শয্যা প্রায়, অনলে ঢালিব কায়,
বিভাবসু প্রভাব কোথায় ?" ॥৩৪॥
"রতি কামে কতবার, দিতে অহে সদাচার,
সাজাইয়ে কুসুম শয়ন।
প্রণতি তোমার পায়, এই ভিক্ষা ঋতু রায়,
দেহ আশু চিতা-আয়োজন" ॥৩৫॥
"অনন্তর মম দেহ, হুতাশনে জ্বালি দেহ,
সঞ্চারিয়ে মলয়-পবন,
জান ত হে গুণধাম, আমার বিরহে কাম,
রহিবারে নারে একক্ষণ" ॥৩৬॥
"এ দেহ উঠিলে জ্বলি, দিও এক জলাঞ্জলি,
আমাদের কুশল-কারণ,—
তব সখা লোকান্তরে, মম সহ সুখান্তরে,
করিবেন সলিল-সেবন" ॥৩৭॥
"তব সখা প্রিয়ঙ্কর, চূতাঙ্কুর পরিকর,
লোল পল্লবিত শাখা তার।
বিতরিয়া স্মরোদ্দেশে, এই তুমি করো্যো শেষে,
পরলোক-বিধি ক্রিয়া সার" ॥৩৮॥
তনু-ত্যাগে স্থির মতি, এইরূপে স্থিত রতি,
আকাশে সম্ভূতা সরস্বতী*,।
যথা সফরীর প্রাণ, হ্রদশোষে ম্রিয়মাণ,
প্রথমা বরষা কৃপাবতী ॥৩৯॥
"অগো ফুলশরদারা, চিরদিন পতিহারা,
রবে হেন ভাবিও না মনে।
শুন শুন যেই হেতু, শলভত্ব মীনকেতু,
প্রাপ্ত হর-কোপ-হুতাশনে" ॥৪০॥
"বিচলিত প্রজাপতি, তব পতি তাঁর রতি,
টলাইল নন্দিনীর প্রতি।
ইন্দ্রিয় বিকার পরে, নিগ্রহ করিয়ে স্মরে,
শাপিলেন তাই এ দুর্গতি" ॥৪১॥
"পার্ব্বতীর তপোবল, হবে যবে সিদ্ধফল,
হর-পরিণয়ে সুখভোগ।
অবসান তাহে শাপ, পরিগত পরিতাপ,
অতনুর তনুর সংযোগ" ॥৪২॥
"ধর্ম্মের প্রার্থনা মত, স্মর শাপ-অভিগত,
বিধাতা দিলেন এ সংবাদ,—
বশী-ক্রোধ কৃপাপর, অশনি অমৃতাকর,
মেঘসম রোষান্তে প্রসাদ" ॥৪৩॥
তাই শুন কৃশোদরি, ভাবি সুখ আশা ধরি,
রাখহ আপন কলেবর,—
রবি পীত তরঙ্গিণী, বরষায় সুরঙ্গিণী,
পুন বহে প্রবাহ প্রখর ॥৪৪॥
সেই অলক্ষিত রূপ, কামিনীর এইরূপ,
মৃত্যুচিন্তা মন্দীভূত করে।
সে আশ্বাসে ঋতুরায়, আশ্বাসেন প্রমদায়,
সুসঙ্গত বচন নিকরে ॥৪৫।
অতঃপর স্মর-দারা, লাবণ্য লহরী-হারা,
দুঃখশেষ দিন গণে দুঃখে,—
যথা নিশানাথ-রেখা, দিবাভাগে দেয় দেখা,
ধ্যানে ধরি বিভাবরী-মুখে ॥৪৬॥

ইতি রতিবিলাপ নাম চতুর্থ সর্গ

* বাক্য

পঞ্চম সর্গ

এইরূপে পুরোভাগে রুদ্র-কোপে কাম
দগ্ধ দেখি, পার্ব্বতীর ভগ্ন মনস্কাম,
আপনার রূপে ধিক্ মানে মনে মনে,—
সকল, সৌন্দর্য্য, প্রিয় হল্যো প্রিয়জনে ॥১॥
সার্থক করিতে রূপ, শৈলরাজসুতা,
তপস্যাচরণে মনে অতি নিষ্ঠা-যুতা,
সেইরূপ পতি-প্রেম, সেইরূপ পতি,
তপস্যাবিরহে কভু হয় কি সংগতি ? ॥২॥
মহেশে মানসমুগ্ধ প্রাণের নন্দিনী,
মুনিব্রতে বৃতা শুনি, নগেন্দ্র-মোহিনী,
সুমহৎ সমাধির নিবারণ-তরে,
কুমারীরে কোলে করি কহে স্নেহভরে ॥৩॥
"আছেন আমার গৃহে কুলদেব দেবী,
করহ কামনা পূর্ণ তাঁহাদিগে সেবি,
কোথা তপ, কোথা তব তনু সুকুমার ?—
শিরীষে ভ্রমর সহে, নহে, পক্ষী-ভার" ॥৪॥
তপস্যায় স্থির-বুদ্ধি নন্দিনীরে রাণী,
নিবারিতে না পারিল কহি হেন বাণী,
ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠা, আর নিম্নগামী পয়,
বেগ ফিরাইয়া দিতে কেবা ক্ষম হয় ? ৫॥
হবে যাহে ফলোদয় হেন ব্রতে, সতী,
বনবাসে রত হল্যো দৃঢ় অভিমতি,
মনোরথবিজ্ঞ পিতা-স্থানে, চারুমতী,
প্রিয়সখী দ্বারা চাহিলেন অনুমতি ॥৬॥
অনুরূপ অভিমতে প্রীত সবিশেষ,
গরীয়ান্ গিরিগুরু দিলেন আদেশ,
চলিলেন গৌরী, শিখি-শোভিত শিখরে,
তাঁর নামে*খ্যাত যারে কয়ে লোক পরে ॥৭॥

অনিবার্য্য ইচ্ছামতী গিরিবরবালা,
চন্দনবিলোপকরী লোল মুক্তামালা,
ত্যজি, বালারুণ বর্ণ স্তন-পরিসরে,
বাঁধিলেন ছিন্ন-ভিন্ন ত্বচ্ পরিকরে ॥৮॥
উমামুখে মধুর চিকুর চিকণিয়া,
বাড়িল মাধুর্য্য তার জটা বিনাইয়া—
নিকর ভ্রমর বটে বিভাত কমল,
শৈবালেও তার শোভা প্রকাশে অমল ॥৯॥
কাঞ্চীগুণ স্থানে গৌরী, ব্রতের বিহিত,
মুঞ্জময়ী ত্রিগুণা মেখলা পরিহিত,
না পরিতে আলোহিত হইল জঘন,
রোমাবলী শিহরিত হয় ঘন ঘন ॥১০॥
নিঃশেষেতে মুছিলেন অধরের রাগ,
স্তনরাগে অরুণিত যার দেহভাগ,
হেন ক্রীড়াকন্দুকে ত্যজিলে গিরিবালা,
কুশক্ষত অঙ্গুলীর সখী অক্ষমালা ॥১১॥
পার্শ্ব-পরিবর্ত্তে, যাঁর কেশচ্যুত ফুল,
মহামূল্য শয্যাতেও, করিত আকুল,
সেই দেবী বাহুলতা করি উপাধান,
বালুময় যজ্ঞভূমে পড়ি নিদ্রা যান ॥১২॥
শৈলরাজ-সুতা, ব্রত-ধারণ-কারণ,
দুই স্থানে দুই বস্তু করিলা স্থাপন,—
মৃগে লোল-দৃষ্টি, আর বিলাস লতায়,
তপোশেষে পুন তাহা গ্রহণ-আশায় ॥১৩॥
অতন্দ্রিতা হয়ে উমা ক্ষুদ্র-তরুগণে,
বর্দ্ধন করেন ঘটস্তন-প্রস্রবণে ;
কুমার অগ্রজ এই কুমারনিকরে,
কুমার নারিলা স্নেহ কমাইতে পরে ॥১৪॥
লালনা করেন দিয়ে বন্য বীজাঞ্জলি,
তাহে এত বশ হল্যো কুরঙ্গ-আবলি,
তাহাদের নেত্র সহ কৌতুক-অন্তরে,
জুকিতেন সখীগণ-নয়ননিকরে ॥১৫॥
স্নান সমাপন-পরে, হোম সমাধান,
ত্বচের উত্তরী করি অঙ্গেতে পিধান,
শ্রুতিপাঠে নিবেশিতা ; আসে ঋষিগণ,
ধর্ম্মজ্যেষ্ঠে কনিষ্ঠতা না মানে কখন ॥১৬॥

* অধুনা হিমালয়ের যে অংশ গৌরীশঙ্কর অথবা মাউণ্ট এবরষ্ট নামে খ্যাত, তাহাই গৌরী-শিখর হইতে পারে। অপর গঙ্গোত্তরীর নিম্নে কেদারগঙ্গা নাম্নী নদী গৌরী-কুণ্ড হইতে প্রবাহিতা

খাদ্য জীবে খাদকের পূর্ব্বভাব গত,
অতিথিসেবায় প্রাপ্ত ফল মনোমত,
নব পূর্ণ-কুটীরেতে সম্ভূত অনল,
পবিত্র হইল সেই তপোবন-স্থল ।।১৭।।
যে সময়ে পূর্ব্ব তপ সমাধি-আশ্রয়ে,
ফললাভ সুদুষ্কর, দেখি সে সময়ে,
নিজদেহ সৌকুমার্য্যে সমাদর হত,
অতি ঘোর তপস্যায় হইলেন বৃত ।।১৮।।
কন্দুক ক্রীড়ায় * যার শ্রম উপজিত,
সেই দেবী তীব্রতর মুনিব্রতে বৃত—
কনক-কমলে ধ্রুব সৃষ্ট তনু তাঁর,
যেমন প্রকৃতি মৃদু, তেমনি সসার ।।১৯।।
চারিদিকে প্রজ্জ্বলিত করি হুতাশন,
শুচিকালে † শুচিস্মিতা তার মাঝে রন ;
জয় করি খর কর নয়ন-মর্ষণ,
অনন্য দৃষ্টিতে ভানু করেন দর্শন ।।২০।।
তপনের তাপে তপ্ত শ্রীমুখমণ্ডল,
সরোজের শোভা ধরি করে ঝলমল,
কেবল অপাঙ্গ তাঁর দীর্ঘ আয়তন,
মন্দ মন্দ শ্যাম রেখা করে বিসর্পণ ।।২১।।
অযাচিত উপস্থিত আকাশের জল,
সুধাময় সুধাকর-কিরণ কেবল,
এই দুই মাত্রে তাঁর রহিল পারণা,
ধরিয়ে, বৃক্ষের বৃত্তি, ধ্যানের ধারণা ।।২২।।
দিনকর খরতর কর-বরিষণে,
ইন্ধন প্রজাত অন্যবিধ হুতাশনে,
অতিতাপে তপ্তা উমা, নিদাঘ-অত্যয়ে,
ধরা-সহ বাষ্প ত্যজে ধারাসিক্ত হয়ে ।।২৩।।
প্রথম বারিদ-বিন্দু ‡ পক্ষ্মেতে পতন,
ক্ষণে থাকি তথা, ওষ্ঠে করিয়া ঘাতন,
পয়োধরে পড়ি চূর্ণ, বলীতে স্খলিত,
এত পরে নাভিকূপে হইল কলিত ।।২৪।।
বায়ুযুত বৃষ্টি বরষিত অনিবার,
শিলাতে শয়না উমা বিহনে আগার ;
চপলা স্বরূপ চক্ষু উন্মীলন করি,
হেন ঘোর তপস্যার সাক্ষী বিভাবরী ।।২৫।।
হিম বায়ুযুত সহস্যের তমস্বিনী,
বারিরূপ বাসে অবস্থিত তপস্বিনী,
বিয়োগেতে বিলপিত রথাঙ্গদম্পতি *,
পুরোভাগে দেখি, উমা হন কৃপাবতী ।।২৬।।
নিশায় নলিনী-গন্ধযুক্ত সে আননে,
কম্পিত অধর-পত্র শীত সমীরণে,
হিম-বরিষণে পদ্ম-শোভা না টুটিল,
সলিলেতে যেন চারু সরোজ ফুটিল ।।২৭।।
স্বতঃ বিগলিত পত্র আছিল আহার—
তপস্যার শেষ-তাহা করে পরিহার ;
প্রিয় বাদিনীরে তাই, পুরাবিদ্‌গণ,
অপূর্ব্ব অপর্ণা নাম করিল অর্পণ ।।২৮।।
কমলিনী-কন্দ তনু সুকুমার কিবা
হেন দেহে হেন ঘোর তপ নিশীদিবা,—
দৃঢ়দেহ মুনিগণ সঙ্গে যেই ব্রত,
বহু দূরে উমা তারে করে অবনত ।।২৯।।
হেনকালে বাক্যে পটু, অজিন-অম্বর,
ব্রহ্মতেজে দীপ্ত, পলাশের দণ্ডধর,

* গোলা লইয়া ব্যায়ামক্রীড়া করা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় বালিকাদিগের মধ্যে নিয়ম ছিল।

† গ্রীষ্মকালে।

‡ এই শ্লোকে মহাকবি পার্ব্বতীর নেত্রলোমের সান্দ্রতা, অধরের সুকুমারত্তা, পয়োধরের কঠিনতা, উদররেখার নিম্নোন্নততা এবং নাভির গভীরতা, অপূর্ব্ব কৌশলে বর্ণন করিয়াছেন।

* চক্রবাক্-দম্পতির রাত্রিযোগে বিরহ-সংঘটন বিহঙ্গবিদ্যাবিৎ ইয়োরোপীয় কোন কোন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, অস্মদ্দেশে প্রসিদ্ধ নিম্নোদ্ধৃত কবিতা অতি মনোজ্ঞ,—

"চক্রবাক্ চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশাযোগে নিষাদ আনিল নিজ ঘরে ।।
চকী বলে চকা প্রিয় এ বড় কৌতুক।
বিধি হত্যে ব্যাধ ভাল এত দুঃখে সুখ ।।"

মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য, জটাবদ্ধ-কেশ,
কোন যতি তপোবনে করিলা প্রবেশ ॥৩০॥
আতিথ্য-পালিনী উমা বিহিত সৎকারে,
পূজিতে প্রবৃত্ত, যথা পর্য্যা-অনুসারে
শাস্ত্রের নিয়ম এই, হইলে সমান
পাত্রভেদে দেয় তারা বহুতর মান ॥৩১॥
যথা বিধি পূজা যতি করিয়া স্বীকার,
ক্ষণকাল পরিশ্রম করি পরিহার,
নিরখিয়ে শৈলজারে সরল নয়নে,
আরম্ভিলা বিধিবৎ বচন-রচনে ॥৩২॥
"সমিধ-কুশাদি হেথা সুলভ ত বটে ?
স্নান-উপযুক্ত বারি আছে ত নিকটে ?
তপস্যা-বিহিত তব আছে ত হে বল ?—
ধর্ম্ম-সাধনের মূল শরীর কেবল ॥৩৩॥

"তব-সিক্ত-জলে কিবা এ লতা সকলে,
পরস্পর আলিঙ্গিত নব দলদলে ?
অলক্ত-স্বত্যক্ত স্বতঃ রক্ত তবাধরে,
অনুরূপ হইবারে বুঝি চেষ্টা করে" ॥৩৪॥
কমল-নয়নে ! কহ, এ মৃগনিকর,
তব চক্ষু-চঞ্চলতা অভিনয়কর,
প্রীতিভরে হরে তব করে তৃণচয়,
তবুত আছে হে তব প্রসন্ন হৃদয় ? ॥৩৫॥
"লোকে কহে পাপাচারে রূপ নাহি হয়,
সত্য সত্য, হে পার্ব্বতি ! এ কথা নিশ্চয়,
উদার দর্শনে ! দেখ কি শীলতা তব,
তব স্থানে উপদেশ-প্রাপ্ত মুনি সব" ॥৩৬॥
"সপ্তঋষি-পরিত্যক্ত প্রসূন রুচিরে,
প্রহসিত গঙ্গাজল পড়ে গিরিশিরে,
তাতে যত পবিত্র না হল্যো মেনাধব,
সবংশে ততই পূত, পূতাচারে তব" ॥৩৭॥
"আজ্ হে হইল এই নিশ্চয় আমার,
ত্রিবর্গের মাঝে মাত্র ধর্ম্ম হয় সার,
নহে কেন অর্থ কাম করি পরিহার,
এক মাত্র ধর্ম্ম সেব্য হয়েছে তোমার ?" ॥৩৮॥

"যথা উপচারে পূজা করিলে আমার,
পরভাবে ভাবিতে হে নাহি পার আর,—
শুন, সন্নতাঙ্গি ! কহে সুধীরনিকর,
সতেদের সখ্য সপ্ত কথার অন্তর" ॥৩৯॥
"এই হেতু, মম প্রতি বহু ক্ষমাবতী,
স্বভাবে দ্বিজাতি আমি অতি ধৃষ্টমতি.
কিছু জিজ্ঞাসিতে মম ইচ্ছুক অন্তর,
রহস্য না হয় যদি দাও হে উত্তর" ॥৪০॥
"সকলের আদি বিধি তাঁর কুলে-জাত,
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্যে তব তনু প্রতিভাত,
বয়সে যৌবন, ধনে কি ভাবনা বল ?
এর বাকী কাছে বা কি তপস্যার ফল ?" ॥৪০॥
"যখন অনিষ্ট *আর সহ্য নাহি হয়,
তপে তবে রত হয় ধীর নারীচয়,
বিচার-মার্গতে চিত্ত করিয়া প্রহিত,
নাহি দেখি সুন্দরি, তোমাতে সে অহিত" ॥৪২॥
'শোক-নিদর্শন কিছু নাহি তব দেহে,
নন্দিনীর অনাদর কোথা পিতৃগেহে ?
তব প্রতি কে হইবে কুভাব-অন্তর,
ফণীশিরে মণি নিতে কে বাড়ায় কর ?" ॥৪৩॥

"অলঙ্কার পরিহার করিয়া যৌবনে,
বৃদ্ধোচিত বাকল পরিলে কি কারণে ?
তারা তারাপতি যুক্ত প্রদোষ-সময়,
তখন কি ভাল লাগে অরুণ উদয় ?" ॥৪৪॥

স্বর্গ অভিলাষ যদি, বৃথা এই শ্রম,
তোমার পিতার পুরী অমর-আশ্রম,
পতি ইচ্ছা যদি, তপে কিবা প্রয়োজন ?—
লোক চাহে রত্নে, লোকে না চায় রতন ॥৪৫॥

*পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশীয় দয়িতাগণ পতি কর্ত্তৃক পীড়িতা হইলে তপস্যাচরণে কালহরণ করিতেন, পতির প্রতি কদাচই প্রতিকূলতাচরণ করিতেন না, ইহা অপেক্ষা আর পাতিব্রত্য কোথায় ?

তপ্ত শ্বাসে বেদন করিছ নিবেদন,
তবু মম সংশয় না হইল ছেদন,
তোমার প্রার্থনা যোগ্য না দেখি সংসারে,
প্রার্থিত দুর্ল্লভ তবে হলো কি প্রকারে ? ॥৪৬॥

কেবা সে কঠিন যুবা, বাঞ্ছিত তোমার,
হায় হেন দশা দেখি, উপেক্ষা তাহার !
উৎপলবিহীন কর্ণ, কলমা-পিঙ্গল,
শ্লথ জটাজালগ্রস্ত কপোল-মণ্ডল ॥৪৭॥

তপতাপে তব তনু তনু অতিশয়,
ভানুকরে কালীবর্ণ ভূষ্যস্থান চয়,
দেখি তোমা, দিনে শশিরেখার আকার,
নাহি হয় সহৃদয় হৃদয় কাহার ? ॥৪৮॥

তবানন-বন্ধু, চারু চন্দ্রব লোকন,
কুটিল কটাক্ষযুক্ত চঞ্চল নয়ন,
ধিক্ ধিক্ তোমার বল্লভ-রূপমদে,
অনিবার না হেরিল এ শোভা-সম্পদে ॥৪৯॥

আর কত কাল, গৌরি ! যাবে এই শ্রমে ?
আছে হে সঞ্চিত মম তপ পূর্ব্বাশ্রমে,
তার অর্দ্ধভাগ লয়ে লভ প্রিয় ধব,
বিশেষে জানিতে চাহি কে বাঞ্ছিত তব" ॥৫০॥

এইরূপে দ্বিজমুখে মনো-অভিলাষ
শুনি উমা, নন ক্ষমা, করিতে প্রকাশ,
অঞ্জনবিহীন নেত্রে সঙ্গিনীর প্রতি,
ইঙ্গিত ভঙ্গীতে দৃষ্টি করেন পার্ব্বতী ॥৫১॥

সখী কহে, "শুন তবে, অহে ব্রহ্মচারি !
জানিবারে যদি তব ইচ্ছা এত ভারী—
যে কারণে, শতপত্র-আতপত্র-প্রায়,
এই তনু নিয়োজিত তপঃ সাধনায়" ॥৫২॥

বাসব, বরুণ, যম, আর যক্ষপতি
বিভবেতে অবমতি করি মানবতী,
মদন-নিগ্রহে রূপ ব্যর্থ হয় যাঁরে,
হেন হরে ইহাঁর বাসনা বরিবারে ॥৫৩॥

দগ্ধতনু অতনুর শিলীমুখ বাণ,
হরের হুঙ্কারে হয়ে বিহত-সন্ধান,
উমার হৃদয়ে গিয়ে পশিয়ে গভীর,
কৃশ করিতেছে এঁর কোমল শরীর ॥৫৪॥

তদবধি স্মর-শরে তপ্ত কলেবরা,
ললাটিকা * চন্দনেতে অলকা ধূসরা,
পিতৃগৃহে শিশির-সংঘাত শিলাতল,
তাহাতে শয়ন করি না হন শীতল ॥৫৫॥

চন্দ্রচূড়-সুচরিত রচি বনান্তরে,
গিরিবালা গান গান গদ গদ স্বরে,
কিন্নর-কুমারীকুল সহচরীগণ,
করুণা কাতর হয়ে করয়ে রোদন ॥৫৬॥

ত্রিযামার শেষভাগে ক্ষণেকের তরে
নেত্র মুদি, অমনি জাগিয়ে তার পরে,
"কোথা যাও নীলকণ্ঠ"—বলি সম্বোধন,
বৃথা কণ্ঠ লক্ষ্য ক'রে, কর-প্রসারণ ॥৫৭॥

অন্তর্যামী তোমারে হে কহে বুধগণ,
অধীনীর ভাব জ্ঞাত নহ কি কারণ ?
শিবমূর্ত্তি লিখি উমা, বিজনেতে বসি,
ভ্রমে তাঁরে এই কথা কহেন রূপসী ॥৫৮॥

ভুবনে শভর্ত্তা-লাভে কতই ভাবনা,
অন্য কিছু উপায় না দেখি বরাননা,
আমাদের সঙ্গে, লয়ে পিতৃ-অনুমতি,
তপোবনে তপস্যায় প্রবৃত্ত পার্ব্বতী ॥৫৯॥

সখী-হস্ত-জাত তপঃ সাক্ষী তরুগণ,
সাক্ষাতে দেখহ, ফল করিছে ধারণ,
কিন্তু তাঁর মনোরথ, মহেশে আশ্রয়,
অদ্যাপি অঙ্কুর তার দৃষ্ট নাহি হয় ॥৬ ॥

তপতাপে তনু তনু ইহাঁর নেহারি,
সখীগণ নিবারিতে নারে নেত্র-বারি,
কবে সে দুর্ল্লভ দয়া করিবেন তাঁয়,
ইন্দ্র-প্রায় অনাবৃষ্টি-পীড়িত সীতায়" ॥৬১॥

*হিন্দুস্থানে টিকা ইতি প্রসিদ্ধ।

"গিরিজার গূঢ় ভাবে সখী বিচক্ষণা,
বর্ণনীয় বর্ণী-প্রতি করিলে বর্ণনা—
মনোসুখ গুপ্ত করি জিজ্ঞাসেন যতি,
"এ কথা কি সত্য না কি রহস্য-ভারতী ?"॥৬২॥

হস্ত-অগ্রে মুকুলিত অঙ্গুলিতে বালা,
সমর্পণ করি স্ফটিকের অক্ষমালা,
বহুকষ্টে-বহুকাল-ব্যবস্থিত কথা,
মিত ভাষে সন্ন্যাসীরে কহিছেন যথা, ॥৬৩॥

"যা শুনিলে যোগীবর, সেই কথা সার,
উচ্চ পদ আক্রমণে উদ্যম আমার,
আমার এ তপ সে দুর্লভে পাইবারে,—
ইচ্ছার অগম্য কিছু না দেখি সংসারে" ॥৬৪॥

যতি কন, "সে মহেশে ভাল জানি আমি,
জেনে শুনে পুন তুমি তার অনুগামী ?
স্মরণ করিয়া তার অমঙ্গলে রতি,
তব আনুকূল্যে মম নাহি যায় মতি ॥৬৫॥

থাকুক পরের কথা, প্রথমেতে ধনি !
জান না কি হর-করে বলয়িত ফণী ?
হে তুচ্ছপদার্থ-প্রিয়ে ! কেমনে সে কর,
সহিবে তোমার কর শুভসূত্রধর ? ॥৬৬॥

ভালমতে মনে মনে কর বিবেচনা,
যদি এ সংগত কভু হয়, সুলোচনা !
কলহংস-বিলেখিত বধূর বসন,
আর গজাজিন, যাহে শোণিত বর্ষণ ? ৬৭ ॥

কুসুম রচিত চারু চতুষ্ক ভবন, *
যে চরণ-অলক্তে রঞ্জিত সুশোভন,
শব-কেশ ক্লিপ্ত শ্মশানেতে সে চরণ !
শত্রুরো মনেতে ইহা ছিল না কখন ॥৬৮॥

তব স্তন-যুগ, হরিচন্দননিধান,
ত্রিনয়ন-হৃদয়েতে হবে তার স্থান,
যে হৃদয়ে চিতাভস্ম-চূর্ণ পূর্ণ অতি,
কেমনে অযুক্ত হেন করিবে পার্ব্বতি ? ৬৯ ॥

বিবাহের আর এক দেখি বিড়ম্বনা,
গজেন্দ্র বাহন তব যোগ্য, বরাননা !
বৃদ্ধ বৃষোপরে তোমা করি দরশন,
স্মেরানন হবে নাকি যত সাধুগণ ? ॥৭০॥

পিনাকীর প্রেমে পড়ি এখন দুজন
লোকের শোকের ভাল হইল ভাজন,—
প্রথমেতে কলানাথ-কলা কান্তিমতী,
দ্বিতীয়ে জগৎ-নেত্র-কৌমুদী পার্ব্বতী ॥৭১॥

রূপেতে বিরূপনেত্র, কুল লক্ষ্য নয়,
ধন যত দিগম্বর-ভাবে পরিচয়,
বরে, বরাননে ! যাহা চাহে জনগণে*,
কিছুই কি আছে তাহা সেই ত্রিলোচনে ?৭২॥

"অতএব পরিহর এ অসৎ রতি,
কোথা সে অভাগা, কোথা তুমি ভাগ্যবতী ;
শ্মশানের শূল নিয়ে কভু সাধুজন,
বেদের বিহিত যূপ না করে স্থাপন" ॥৭৩॥

এইরূপ শুনি উমা, প্রতিকূল ভাষ,
কম্পিত অধরে কোপ করেন প্রকাশ,
উপান্ত ঈষৎ রক্ত বঙ্কিম নয়ন,
ভ্রূলতা-কুঞ্চিত করি করেন ঈক্ষণ ॥৭৪॥

উমা কন, "সুনিশ্চয় তাঁরে না জানহ,
তাই পরমার্থ হরে হেন কথা কহ,
অলোক-সামান্য আর অচিন্ত্য কারণে
মহাত্মা-চরিতে দ্বেষ করে মূঢ় জনে ॥৭৫॥

সম্পদের মদে, কিম্বা বিপদ্-বারণে,
সুমঙ্গল দ্রব্য সেব্য হয়, জনগণে,
জগৎ শরণ্য শিব, শূন্য-অভিলাষ,
আত্মার দূষণ, ইথে তাঁর কিবা আশ ?॥৭৬॥

---

* চকমিলান বাটী।

* "কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ।"

অস্যার্থঃ।

কন্যা চাহে রূপ, পিতা বিদ্যা, মাতা ধন।
কুটুম্বেরা কুল, অন্যে মিষ্টান্ন ভোজন ॥

বস্তুহীন হইলেও সম্পদ কারণ,
ত্রিভুবনপতি কিন্তু শ্মশান-ভবন,
ভীমরূপ ভীম, পুন শিবমূর্ত্তি-ধর,
কেবা জানে তাঁর তত্ত্ব ভুবন-ভিতর ?॥৭৭॥

ভূষণে ভূষিত, কিম্বা ভুজঙ্গ-ভূষণ ;
গজাজিনধারী, কিম্বা দুকূল-বসন,
কপালে কপাল, কিম্বা কলানাথ-কলা,
কি মূর্ত্তি সে বিশ্বমূর্ত্তি নাহি যায় বলা ॥৭৮॥

সত্য বটে আছে চিতা ভস্মবিলেপন,
সে যে শুদ্ধ তাঁর অঙ্গ করি পরশন ;
নৃত্য-অভিনয়ে চ্যুত সে চিতা-পরাগে,
দেবগণ বিলেপন করে শিরোভাগে ॥৭৯॥

মানিলাম শিবের সম্বল মাত্র বৃষ,
কিন্তু ঐরাবত-গামী হয় সেই বৃষ,*
সেহ শির নমি ফুল্ল মন্দার নিকরে,
তাঁর পদাঙ্গুলি গুলি অরুণিত করে ॥৮০॥

"অনেক নিন্দিলে তুমি, স্বভাব-বিপথ,
কিন্তু এক কথা কহিয়াছ যথাযথ,
আত্ম জন্ম বিধাতার যে জন কারণ,
তাঁর জন্ম কেমনেতে হবে নির্দ্ধারণ ? ॥৮১॥
ফলে এ বিবাদে কিবা প্রয়োজন আর ?
তুমি যাহা জান হোক্ সেই কথা সার,
তাঁতে আত্মরসবশ আমার হৃদয়,—
স্বেচ্ছাচারে কেবা করে কলঙ্কেরে ভয়"?॥৮২॥
উত্তর-বিধানে পুন স্ফুরিত অধর,
"বটু কটু ভাষে সখি ! নিবারণ কর;
মহাত্মা নিন্দক শুধু নহে পাপভাগী,
সেহ দোষী যে জন শ্রবণে অনুরাগী" ॥৮৩॥
গমনে চঞ্চলা বালা, বলে 'যাই চল,'
বল্কল বসন তাহে হৃদয়ে চঞ্চল,
অমনি স্বরূপ ধরি মৃদু হাস্যাধর,
ধরিলেন প্রমথেশ পার্ব্বতীর কর ॥৮৪॥

* ইন্দ্র।

তাঁরে হেরি হৈমবতী,
শিহরি উঠিলা সতী,
সরস শরীর অতি,
পদ নাহি পড়ে ঊর্দ্ধে স্থিত একেবারে,

যথা অবরোধ যায়,
গমনে না পথ পায়,
আকুলিত নদী প্রায়,
যাইতেও নারে বালা থাকিতেও নারে ॥৮৫॥

অনন্তর কৃত্তিবাস,
কহেন মধুর ভাষ,
"আজ হতে তব দাস
তপস্যায় ক্রীত আমি হইলাম সতি।"

ব্রতজাত ক্লেশ যত,
তখনি হইল গত,
ফললাভে মনোমত,
শ্রম-অপগমে নবভাবের সঙ্গতি ॥৮৬॥

ইতি ফলোদয় নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অনন্তর হৈমবতী, সংগোপনে সখী প্রতি,
আদেশিলা কহিতে ঈশানে—
"আমারে করিতে দান, গিরিরাজ ক্ষমবান্,
ইহ-মাত্র রাখুন প্রমাণে" ॥১॥
যেরূপ বসন্ত-মুখে, মুখরা কোকিলামুখে,
চূতশাখা ভাব ব্যক্ত করে,
সখীমুখে সেইমত, প্রকাশিয়ে মনোগত,
প্রগাঢ় প্রসক্ত চিত্ত হরে ॥২॥
"তাই হবে" ইতি পণ, করি হর নিরূপণ,
সন্তাপিত উমা পরিহার।
মহিমা ময়ূখান্বিত, ঋষি সপ্ত বিগণিত,
স্মরণ করেন স্মর-অরি" ॥৩॥
তপস্যার তেজস্তোম, তাহে দীপ্ত করি ব্যোম,
অরুন্ধতী সহিত শোভন,

স্মরণে অমনি আসি, পুরোভাগ পরকাশি,
রহিলেন তপোধনগণ ॥৪॥
প্রবাহ উছলে কূলে, নিকর মন্দারফুলে,
মন্দাকিনী-নীর মনোহর,
খেলে দিগ্‌হস্তিদল, মদ-গন্ধযুক্ত জল,
হেন জলে ধৌত কলেবর ॥৫॥

মুক্তামালা উপবীত, তনুরাজি সুশোভিত,
হেমময় বাকল বসন,
রত্ন অক্ষমালা করে, শেষাশ্রমে শোভা করে,
কিবা কল্পতরু সুশোভন ॥৬॥

যে মুনি মণ্ডলতলে, থামাইয়ে অশ্বদলে,
নামাইয়ে রথের নিশান,
হইয়ে প্রণতিপর, প্রয়াণার্থ প্রভাকর,
আজ্ঞাবধি উর্দ্ধদিগে চান ॥৭॥

যাঁহারা কল্পের অন্তে, মহাবরাহের দন্তে,
শ্রান্তি দূর করিলেন কায়,
তথায় নির্ভর করি, ধারায় রাখিয়া ধরি,
আকষিয়া বাহু-লতিকায় ॥৮॥

বিশ্বযোনি অনন্তর, এই সপ্তঋষিবর,
সর্গ-শেষ করেন রচন,
তাই পুরাবিদ্‌গণ, বলি ধাতা পুরাতন,
তাঁহাদিগে করেন কীর্ত্তন ॥৯॥

পূর্ব্বজন্মে সুবিমল, তপস্যার যত ফল,
পরিণত হইল সকল।
সেই সব ফল-ভোগী, হইয়াও সপ্ত-যোগী,
তপস্যা করেন অবিচল ॥১০॥

তাঁহাদের মধ্যভাগে, বিভাত বিমলরাগে,
পতি-পদে অর্পিত-নয়না,
সাক্ষাৎ তপের ফল, সিদ্ধিরূপা অবিরল,
অরুন্ধতী ব্রত-পরায়ণা ॥১১॥

সহ সম সমাদর, দেখিলেন মহেশ্বর,
মুনিগণে সতীর সহিত,—
এই নারী অই নর, এ বিচার ভ্রান্তিপর
পূজ্য মাত্র সতের চরিত ॥১২॥

অরুন্ধতী-দরশনে, বাড়িল মহেশ-মনে,
গৃহিণী-গ্রহণে ইচ্ছা ভারী,—
জগতে যে কিছু ধর্ম্ম, হোম আদি যত কর্ম্ম,
মূলমাত্র পতিব্রতা নারী ॥১৩॥

যথা ধর্ম্ম অনুসারে, গ্রহণার্থ গিরিজারে,
সমুদ্যত দেখি মহেশ্বরে,
পূর্ব্বপাপে ভীতমতি, পুন অতনুর অতি,
আশ্বাসের উচ্ছ্বাস অন্তরে ॥১৪॥

ঋষিগণ তার পরে, যথোচিত ভক্তিভরে,
পূজা করি দেখ দিগম্বরে,
সাঙ্গবেদ-পরায়ণ, নীলকণ্ঠ-প্রতি কন,
প্রীতি-কণ্টকিত কলেবরে ॥১৫॥

"অবিরত হয়ে যত, বেদাভ্যাস হৈল যত,
হুতাশনে হুত অনর্গল,
তপে তপ্ত বিধিমত, তবু নহে পরিণত,
আজ হে পাকিল সেই ফল" ॥১৬॥

জগতের অধীশ্বর, মানসের অগোচর,
তাঁহার মানসে পেয়ে স্থান,
আমাদের আর বল, বাকী কি রহিল ফল?
সকল হইল সমাধান ॥১৭॥

এ সংসারে যেই নরে, তোমার স্মরণ করে,
সেই হয় কৃতার্থ-প্রবর,
ব্রহ্মবীজ তুমি হর, তুমি হে যাহারে স্মর,
তার চেয়ে কেবা ভাগ্যধর? ॥১৮॥

দিনকর নিশাকর, উপরেতে শোভাকর,
সত্য বটে আমাদের স্থান,
অদ্য স্মরণেতে তব, বিধু ভানু পরাভব,
করি, পদ আরো গরীয়ান্ ॥১৯॥

তোমার আদরে অদ্য, চরিতার্থ হয়ে সদ্য,
মানসেতে মানি বহুতর,
আপনার গুণযোগে, সাধু সাধুবাদ ভোগে,
আত্মার প্রত্যয় করে নর ॥২০॥

তব অনুধ্যানে নাথ। যে সুখ-হৃদয়-সাথ,
কি আর করিব নিবেদন,
তুমি প্রভো অন্তর্যামী, সকল দেহের স্বামী,
সকলি করিছ দরশন ॥২১॥

কিছু তত্ত্ব নাহি জানি, যদিও হে শূলপাণি,
দেখিতেছি সাক্ষাতে তোমায়,
বুদ্ধির গোচর নও, আপন স্বরূপ কহ,
অনুগ্রহ করি এ সভায় ॥২২॥

এইরূপে কোন্ রূপ, প্রকাশিছ বিশ্বরূপ!
এ কি মূর্ত্তি জগৎজনন?
না কি হে পালন মূর্ত্তি, ধরিয়ে পাইছ স্ফূর্ত্তি,
কিবা বিশ্ব-হরণ কারণ? ॥২৩॥

"অথবা হে পশুপতি! এ প্রার্থনা সুমহতী,
থাক্ সে প্রার্থনা গুরুতরা,
স্মরিয়াছ কি কারণে, সমাগত জনগণে,
আজ্ঞা কর করিব আমরা" ॥২৪॥

ইন্দুমৌলী তারপর, দিতেছেন প্রত্যুত্তর,
প্রকাশিয়ে দশন-কিরণ,
যে কিরণ শুভ্রতর, ললাটস্থ সুধাকর,
ক্ষীণকরে করিল বর্দ্ধন ॥২৫॥

"জানত হে মুনিগণ! হয়ে স্বার্থ-পরায়ণ,
প্রবৃত্তি স্ফুরিত মম নয়,
লক্ষ্য পর-উপকার, প্রমাণ দেখহ তার,
অষ্টমূর্ত্তি দেয় পরিচয়" ॥২৬॥

যথা কপিঞ্জলদল, পিপাসায় সুবিকল,
জলদেরে, 'জল দেরে' কয়,
সেইরূপ অবিকৃত, দেবদল বিপ্রকৃত,
মম স্থানে কুমার প্রার্থয় ॥২৭॥

তাই হে তাপসগণ! হইয়াছে মম মন,
গিরিজারে করিতে গ্রহণ,—
যথা যজমান-করে, অরণি শরণ করে,
হুতাশন-জনন কারণ ॥২৮॥

এ হেতু তোমরা যাও, হিমালয়-স্থানে চাও,
পার্ব্বতীরে আমার কারণ,—
সদাশয় সমাশ্রিয়া, হয় যে সম্বন্ধ ক্রিয়া,
তাহে বিঘ্ন না হয় ঘটন ॥২৯॥

উন্নত শেখরধর, সেই হিম-গিরিবর,
প্রতিষ্ঠিত ধরি ধরা-ভার,
সম্বন্ধ তাহার সহ, যোজনে কি দোষ কহ?
বঞ্চনা না হইবে আমার ॥৩০॥

যা কহিবে হিমবানে, দুহিতার সম্প্রদানে,
প্রয়োজন শূন্য শিক্ষা-দান,—
তোমাদের সদাচার, অনুসারে সদাচার,
গণে করে নীতির বিধান ॥৩১॥

পূজনীয়া অরুন্ধতী, এ বিবাহ-কার্য্যে সতী,
হউন আমারে অনুকূল,
যে হেতু এরূপ কার্য্য, করিবারে অবধার্য্য,
সুচতুরা সীমন্তিনীকুল ॥৩২॥

"আমার সন্দেশ লয়ে, যাও সবে হিমালয়ে,
নগর ওষধিপ্রস্থ যাতে,
পুনরায় মুনিগণ! আমাদের সংমিলন,
হবে মহাকোশীর প্রপাতে" ॥৩৩।

মহাযোগী মহেশ্বর, পরিণয়ে অগ্রসর,
নিরখিয়ে তপস্বিনিচয়,
পরিণয়-ব্রীড়ারস, ত্যজি যত মহাযশ,
হইলেন স্বচ্ছন্দ-হৃদয় ॥৩৪॥

চলিলেন মুনিদলে, অঙ্গীকার ব্যক্তছলে,
প্রণবের করি উচ্চারণ,
তথা দেব পশুপতি, করিলেন সুখে গতি,
মহাকোশী-প্রপাত সদন ॥৩৫॥

অসি সম নীল ভাস, আকাশেতে সুপ্রকাশ,
হয়ে সপ্ত তপস্বিপ্রবর,
নগেন্দ্র-নগরে অতি, সত্বরে করিলা গতি,
মানসিক গতির সোসর ॥৩৬॥

রত্নখনি ভূরি ভূরি, সহিত অলকাপুরী
তুলে আনি এ পুরী-রচনা,

যেন স্বর্গ অতিরেক, অংশ লয়ে করিলেক,
এই উপনিবাস * স্থাপনা ।।৩৭।।
পরিখা গঙ্গার স্রোত, প্রাকারেতে উতপ্রোত,
প্রজ্বলিত ওষধিনিকর,
বৃহৎ বৃহৎ মণি, শিলা যার সাল গণি,
অকৃত্রিম দুর্গ মনোহর ।।৩৮।।
যথা নাই সিংহ ভয়, সুখে চরে করিচয়,
বিলযোান ✝ যথা হয় হয় ।
গুহ্যক কিন্নরগণ, যেখানেতে পৌরজন,
যোষা বনদেবতা নিচয় ।।৩৯।।
মনেতে সন্দেহ হয়, গরজিত মেঘচয়,
আছে তারা শিখরেতে যুড়ে,
কেবল তালের ঘায়, এই মাত্র বুঝা যায়,
মুরজা বাজিছে গৃহ-চূড়ে ।।৪০।।
যথা কল্পতরু-প্রায়, তরুচয় শোভা পায়,
বিলোলিত অংশুক নিবহে ।
গৃহ-যন্ত্র পতাকার, শোভা করে সুবিস্তার
পৌরজন-প্রয়াস-বিরহে ।।৪১।।—
যথায় স্ফটিক-হর্ম্ম্য, সুরাপান-স্থান রম্য,
নিশাকালে করে ঝলমল,
আকাশে উদয় তারা, প্রতিবিম্বে হারাকারা,
উপহার দেয় নিরমল ।।৪২।।
যেখানে যামিনীকালে, প্রদীপ ওষধিজালে,
সঙ্কেতের পথ প্রকাশয়,
তাহে অভিসারিকার, নাহি থাকে অন্ধকার,
দুর্দ্দিনেও সুদিন উদয় ।।৪৩।।—

*মহাকবি অবিকল এই শ্লোকার্দ্ধ রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে ২৯ শ্লোকে নিবেশিত করিয়াছেন এবং মেঘদূত কাব্যেও উজ্জয়নী-বর্ণনে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—
“স্বল্পীভূতেসুচরিত ফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং।
শেষৈঃ পুর্ণ্যৈর্হৃতবিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং।
✝ দেবরাজের অশ্ববিশেষ।

জরায় না জরে গাত্র, বয়স যৌবন মাত্র,
মার ভিন্ন মার নাহি আর,
রতি-খেদ সমুদ্ভূত, সুখ-নিদ্রা আবির্ভূত,
নাহি অন্য নিদ্রার সঞ্চার ।।৪৪।।
শাত্রবতা-ভাব লোপ, কেবল ভামিনী-কোপ,
মনোহর তর্জ্জনী তর্জ্জনে,
ভ্রূকুটী কুটিলতর, প্রকম্পিত ওষ্ঠাধর,
অনুগ্রহ-ভিক্ষু কামীজনে ।।৪৫।।
পুরোভাগে অভিরাম, সুশোভিত পুষ্পারাম,
গন্ধময় সে গন্ধমাদন,
সন্তানক তরুগণ, পথে যার সুশোভন,
ছায়ে সুপ্ত বিদ্যাধরগণ ।।৪৬।
দেখি পুরী হিমালয়, সেই দেবঋষিচয়,
মনে মনে করেন ভাবনা,—
স্বর্গহেতু জ্যোতিষ্টোম, আদি যজ্ঞ আর হোম,
করা মাত্র সব বিড়ম্বনা ।।৪৭।।
নগনাথ-নিকেতনে, নামিছেন ঋষিগণে,
দ্বারিচয় ঊর্দ্ধদৃষ্টে চায়,
বেগভরে জটাভার, নিশ্চল অনলাকার,
চিত্রপটে যথা শোভা পায় ।।৪৮।।
যথা জল-অভ্যন্তরে, পুঞ্জ ভানু বিম্ব ধরে
সেইরূপ শান্ত প্রভাময়,
মুণিগণ অগ্রসর, অগ্রজ অনুজপর,
একে একে হইলা উদয় ।।৪৯।।
তাঁহাদের পূজা তরে, অর্ঘ্যজল লয়ে করে,
আগ্ বাড়াইয়া গিরি ধায়,
সে যে গুরু তার সার, চরণের ভারে তার,
নামাইয়ে দেয় বসুধায় ।।৫০।।
ধাতু তাম্র ওষ্ঠাধর, অতিশয় বৃহত্তর,
দেবদারু তরু ভুজদ্বয়,
স্বভাবত বক্ষ তার, সুকঠিন শিলাধার,
দেখা মাত্র দেয় পরিচয় ।।৫১।।
যথাবিধি অনুসারে, পূজা করি পূতাচারে,
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধান্ত অন্তরে,
আগে আগে নিজে গিয়ে, পথ দেখাইয়ে দিয়ে,
লয়ে যান তপস্বিনিকরে ।।৫২।।

বেত্রময় * সুখাসনে, বসাইয়ে মুনিগণে
আপনি বসিয়া তার পরে,
অচলের অধীশ্বর, হয়ে কৃতাঞ্জলিপর
এইরূপে ভাব ব্যক্ত করে ॥৫৩॥

"অনুদয়ে মেঘদল, বরষিত হল্যো জল,
ফুল বিনা ফলের সঞ্চার,
না করিতে চিন্তা মনে, তোমাদের দরশনে,
অসম্ভব সম্ভব আমার ॥৫৪॥

বিগত হইল ভ্রম, বিজ্ঞান উদয় মম,
কাঞ্চনত্ব লভিল অয়সে,
ধরণীতে থাকি আমি, হইলাম স্বর্গগামী,
তোমাদের অনুগ্রহ বশে ॥৫৫॥

আজ হত্যে প্রাণিগণ, শুদ্ধ হত্যে আকিঞ্চন,
আমারে করিবে অন্বেষণ—
পূজ্যগণ-অধ্যাসন, হয় যথা সংঘটন,
তারে তীর্থ কহে জনগণ ॥৫৬॥

অহে সপ্তদ্বিজোত্তম ! আজ হে হইল মম,
শিরোশুদ্ধি দুই গঙ্গাজলে,
জাহ্নবী-প্রপাত শিরে, পদ-প্রক্ষালন-নীরে,
দ্বিতীয় প্রপাত সেই স্থলে ॥৫৭॥

আমি দুই রূপ ধরি, অনুগ্রহ ভাগ করি,
তাই দুয়ে করিলে প্রসাদ,---
ভৃত্যভাবে এ জঙ্গম, তনু নিস্তারিলে মম,
স্থাবরেতে, রক্ষা করি পাদ ॥৫৮॥

আমার এ কলেবর, পরিব্যাপ্ত দিগন্তর,
বিখ্যাত বিশাল অতিশয়.
কিন্তু এই অনুগ্রহে, পরিতোষ-পরিগ্রহে,
সেই দেহে স্থান নাহি হয় ॥৫৯॥

তোমাদের তেজোময়, নিরখিয়ে মূর্ত্তিচয়,
কেবল আমার গুহাগত,
তম নহে অপগত, মানসিক তম যত,
এককালে সব হল্যো গত ॥৬০॥

তোমরা নিস্পৃহ-মন, সিদ্ধ সব প্রয়োজন,
তবে এল্যে কোন্ প্রয়োজনে ?
বুঝি এই কদাচারে সুপবিত্র করিবারে,
আসিয়াছ এ দীন-সদনে ॥৬১॥

তথাপি আমার প্রতি, কর কিছু অনুমতি,
তোমাদের আমি হে কিঙ্কর—
প্রভু পরিচারী ধর্ম্ম, নাহি ঘটে বিনা কর্ম্ম,
কি করিব দাসে আজ্ঞা কর ॥৬২॥

এই আমি, এই দারা, এই কন্যা প্রাণাকারা,
মম কুলে ওহে মুনিগণ,
যদি হয় প্রয়োজন, করিব হে সমর্পণ,
অন্য ধন করি কি গণন ?" ৬৩॥

এইরূপ হিমালয়, করিলেন অনুনয়,
প্রজাপতি-পুত্রগণ-প্রতি,
কিবা গুহা-মুখদ্বারে, প্রতিধ্বনি সুবিস্তারে,
দুইবার কহিলা ভারতী ॥৬৪॥

অনন্তর মুনিগণ, অঙ্গিরস প্রতি কন,
প্রত্যুত্তর করিতে প্রদান,
প্রালেয় পর্ব্বত প্রতি, কহিছেন মহামতি,
যিনি কথা-প্রসঙ্গে প্রধান ॥৬৫॥

"যা কহিলে গিরিবর ! সব তব সাধ্যপর,
তার চেয়ে আছে সাধ্য তব,---
নিজ শিখরের মত, মন তব সমুন্নত,
মহতেই মহৎ সম্ভব ॥৬৬॥

তোমার স্থাবর কায়, লোকে কহে বিষ্ণু*যায়
সেই কথা যথা সারোদ্ধার,
স্থাবর জঙ্গম যত. হয়ে তব কুক্ষিগত,
রহিবারে পেয়েছে আধার ॥৬৭॥

কমল মৃণালাকার, সুকোমল ফণা যার,
সে ফণায় অনন্ত কখন,
ধরিতে পারিত ভূমি, রসাতলে যদি তুমি,
তাহারে না করিতে ধারণ ? ॥৬৮॥

অবিচ্ছিন্ন, নিরমল, তব তরঙ্গিণীদল,
আর হে তোমার কীর্ত্তিচয়,

* এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে মোড়া প্রভৃতি বেত্রাচ্ছাদিত আসনের ব্যবহার ছিল।

* "স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ" ইতি গীতাবচনম্।

অবারিত এ উভয়, সিন্ধু উর্ম্মিবদ্ধ নয়,
পুণ্যে নিস্তারিল লোকত্রয় ॥৬৯॥
বিষ্ণুপদে সদ্ভূতা, সেহেতু গরিমাযুতা,
সুরধুনী হন একবার,
তোমাতেও, উর্দ্ধশির ! জন্মি পুনঃ গাঙ্গিনীর,
মহিমার হইল প্রচার ॥৭০॥
কদাচন নারায়ণ, ত্রিবিক্রম খ্যাত হন,
তিনপুরে চরণ বিস্তারি,
তুমি সর্ব্বকাল তরে, তিন পুরে কলেবরে,
বিস্তারহ বিক্রম প্রচারি ॥৭১॥
স্বর্ণ শেখরধর, বটে মেরুগিরিবর,
তব সন্নিধানে হীনমান,
যেহেতু হে স্বভাজন ! যজ্ঞভাগ-ভোগিগণ,
মধ্যে তব পদ বিগুমান ॥৭২॥
শুন হে মহানুভব ! যে কিছু কাঠিন্য তব,
অর্পিত স্থাবর কলেবরে ;
এ জঙ্গম তনু তব, ভক্তিরসে সদা দ্রব,
সজ্জনের আরাধনা তরে ॥৭৩॥
শুন, যেই কার্য্য ছলে, আগমন এই স্থলে,
তোমারি সে কার্য্য হিমাচল !
শ্রেয়ঃ কার্য্য মতিমান্ ! উপদেশ সম্প্রদান,
এইমাত্র আমাদের ফল ॥৭৪॥
অনিমাদি গুণময়, অন্যে নাহি পরশয়,
ঈশশব্দ, সেই শব্দ-ধর,
ললাটফলকে যাঁর, প্রভাপুঞ্জ অনিবার,
প্রকাশিছে অর্দ্ধসুধাকর ॥৭৫॥
তুরঙ্গ যেরূপ পথে, আকর্ষণ করে রথে,
সেই ভাব করিয়া ধারণ,
পরস্পর সংযোগিনী, অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা যিনি,
বিশ্বভার করেন বহন ॥৭৬॥
যেই দেবে যোগিগণ, করে সদা অন্বেষণ,
যিনি স্থিত অন্তর অন্তরে,
যাঁহারে মনীষিচয় পুনর্জ্জন্ম-জাত ভয়,
বারণ-কারণ খ্যাত করে ॥৭৭॥
বিশ্বকার্য্য সমুদয়, সাক্ষী সেই বিশ্বময়,
সকল কামনা-পূর্ণকারী,
আমাদের প্রবচনে, বাসনা করেন মনে,
বরিবারে তোমার কুমারী ॥৭৮॥
গিরিশে গিরিজা-দান, উচিত হে মতিমান্,
বাক্যে যথা অর্থের অন্বয়,
যেহেতু উত্তম বরে, কন্যাসমর্পণ পরে,
ক্ষোভশূন্য পিতার হৃদয় ॥৭৯॥
ওহে গিরি পুণ্যবান্ ! হরে কর কন্যা দান,
চরাচরে দান কর মাতা,
যে হেতু সে পুরহর, জগতস্থ চরাচর,
সকল জীবের জন্মদাতা ॥৮০॥
বৃন্দারকবৃন্দ হরে, প্রণাম করিয়া পরে,
উমাপদ করুন বন্দন,
অবনী-লুণ্ঠন-কালে, চূড়ামণি-ছটাজালে,
রঞ্জন করুন শ্রীচরণ ॥৮১॥
এ বিবাহ শোভাকর, উমা বধূ, শিব বর,
দানকর্ত্তা তুমি হিমালয়,
আমরা যাচক তায় তব কুল-প্রতিভায়,
উচ্ছ্রায়িত হইবে নিশ্চয় ॥৮২॥
স্তবনীয় নাই যাঁর, স্তূয়মান সবাকার,
পূজ্যহীন কিন্তু পূজ্যবর,
তাঁরে দিয়ে তনয়ারে, বিশ্বগুরু বলে যাঁরে,
তাঁর গুরু হও হে ভূধর" ॥৮৩॥
দেব-ঋষিগণ-মুখে, এই কথা শুনি সুখে,
পিতাপার্শ্বে অধোমুখে সতী,
লীলাশতদল-দল গণনায়, কুতূহল
সংগোপন করেন পার্ব্বতী ॥৮৪॥
যদিও সম্পূর্ণ কাম, তবু গিরি গুণধাম,
মেনকার মুখপানে চান—
কন্যাকার্য্য প্রয়োজনে, প্রায় দেখি গৃহিগণে,
গৃহিণীর বিধান প্রধান ॥৮৫॥
মহীধর মনোগত, অভিমতে দেন মত,
মেনকা মহিষী চারুমতি—
পতি-মতে অনুমতা, সদাকাল পতিব্রতা,
অনুমতা নন যত সতী ॥৮৬॥
মুনি-বাক্য-অনন্তর, এই যোগ্য তদুত্তর,
গিরিবর মনে অনুমানি,

কহিছেন মহামতি, মঙ্গল-মণ্ডনবতী,
নন্দিনীর ধরি দুটি পাণি ॥৮৭॥

"শুন মা কল্যাণি কন্যে! বিশ্ববীজ বিভু জন্যে,
তব কর ভিক্ষার উদ্দেশে,
সমাগত মুনিগণ, তাহে মম উপার্জন,
গৃহমেধি-ফল সবিশেষে" ॥৮৮॥
তনয়ারে এই মত, সম্ভাষিয়ে হিমবত,
ঋষিগণে কহেন তখন,
"ত্রলোচন-সীমন্তিনী, তোমাদের পদ ইনি,
বন্দিছেন করুন ঈক্ষণ" ॥৮৯॥

ইষ্টকার্য্যে নিষ্ঠমতি, অদ্রি-অধিপতি প্রতি,
সাধুবাদ দিয়ে মুনিগণ,
সাক্ষাৎ সুফলযুক্ত, পার্ব্বতীর প্রতি উক্ত,
করিলেন আশিষ-বচন ॥৯০॥
প্রণতি করিতে ভ্রংশ, হল্যো হেম-অবতংস,
নগেন্দ্র-নন্দিনী-শ্রুতিমূলে,
নম্রমুখী লজ্জাভরে, পার্ব্বতীরে সমাদরে,
অরুন্ধতী কোলে লন তুলে ॥৯১॥
গিরীন্দ্র-গেহিনী তবে, দুহিতাবিরহ হবে,
ভাবি ভীতা, স্নেহে অশ্রুমুখী,
সতিনীর নাহি ভয় বর তাহে মৃত্যুঞ্জয়ী
গুণচয় ভাবি পুনঃ সুখী ॥৯২॥
হরবন্ধু সেইক্ষণে, চীরবাস ঋষিগণে,
জিজ্ঞাসেন কবে কার্য্য হবে,
পরিগতে দিনত্রয়, হইবেক পরিণয়,
এত বলি চলিলেন সবে ॥৯৩॥
মুনিগণ হিমালয়ে, এইরূপ বল্যে কয়ে,
উপনীত মহেশের পাশে,
"সিদ্ধ তব প্রয়োজন" করি এই নিবেদন,
শিবে ত্যজি উঠিলা আকাশে ॥৯৪॥
উমাসমাগম-ভাবেতে, বিষম চঞ্চল হইল মতি,
সেই তিন দিন, অতি ক্লেশাধীন,
যাপিলেন পশুপতি।
স্মর-পরবশ অবশ মানস, কিনা হয় অন্য নরে?
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, কুশল-বিগ্রহ,
এ ভাব পরশে হরে ॥৯৫॥

ইতি উমাপ্রদান নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

অনন্তর সিতপক্ষে, অচলঈশ্বর,
সুলগ্ন যামিত্র-লগ্নে তিথি শুভকর,
সহিত কুটুম্বগণ সুতার বিবাহ
দীক্ষাবিধি, যথাবিধি করেন নির্ব্বাহ ॥১॥
বিবাহ-বিহিত যত আনন্দ-মঙ্গলে—
গৃহে গৃহে ব্যস্ত পুর-পুরন্ধ্রী সকলে—
হিমালয়-অনুরাগে হেন ব্যবহার,
অন্তঃপুর সহ যেন এক পরিবার ॥২॥
মন্দারকুসুমে রাজপথ বিখচিত,
চীনের পাটিনে যত নিশান রচিত,
কাঞ্চন-তোরণগণ বিশেষে বিভাস,
স্বর্গসম গিরিপুরী পাইল প্রকাশ ॥৩॥
থাকিতে অনেক পুত্র আর কন্যাগণ,
একা উমা, পুনর্জাত যেন হারাধন,
নিকটে বিবাহ তার, যাবে পর-ঘরে,
মাতাপিতা-প্রাণসম হল্যো তার তরে ॥৪॥
জনাজাত, আশীর্ব্বাদ করিয়া উমারে,
কোলে লয়ে সাজাইয়ে দিল অলঙ্কারে,
গোত্রের * গোত্রজগণে, থাকিতে সন্তান,
উমামাত্র হইলেন স্নেহের নিধান ॥৫॥
তৃতীয় মুহূর্তে ভানু করিলে প্রবেশ,
উত্তরফল্গুনীগৃহে যাইলে দ্বিজেশ,
কুটুম্বিনী যত কুটুম্বিনীগণ, †
করিতে লাগিল উমাদেহ-প্রসাধন ॥৬॥

* পর্ব্বত।

† পতি পুত্রবতী স্ত্রী। বিবাহাদি কর্ম্মে বিধবা এবং বন্ধ্যাগণের সংসর্গতা এইক্ষণেও দূষণীয়।

দূর্ব্বাদল সহ রাজী-রাজী বিরাজিত,
হেন চেলী উমাদেহে করিল সজ্জিত,
সকল শরীরে সজ্জা শেষ হলো পর,
শৈলসুতা করাম্বুজে ধরিলেন শর ॥৭॥
বিবাহ-বিহিত সেই সুশোভন শরে,
হইল অপূর্ব্ব শোভা পার্ব্বতীর করে,—
যেরূপ অসিত পক্ষ হইলে অন্তর,
দিনকর-করে সন্দীপিত-সুধাকর ॥৮॥
লোধ্র-চূর্ণে তৈল উঠাইয়া কলেবরে,
ইষৎ নীরস কালাগুরু দিল পরে,
অভিষেক-উপযুক্ত বাস পরাইয়া,
চতুষ্ক-গৃহেতে তাঁরে বসাইল নিয়া ॥৯॥
মরকত-শিলাময় সেই স্নান-ঘরে,
চারিধারে মুকুতারঝারা শোভা করে,
কনক-কলসী তুলে নামাইয়া শিরে,
শুভবাদ্যনাদে নাহাইল পার্ব্বতীরে ॥১০॥
সুমঙ্গলস্নানে সুপবিত্র-কলেবরা,
বিবাহ-বিহিত চারু শুভ্রবাস ধরা,
নিনাদিত নীরধর-নীর-জাত-কাশে,
বিনোদ বিভায় যথা বসুধা বিকাশে ॥১১॥
মণিময় স্তম্ভচারি, তাহার উপরে,
চিকণিয়া চন্দ্রাতপ চক্ মক্ করে,
এ হেন মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র আসনে,
উমা কোলে করি নিল পতিব্রতাগণে ॥১২॥
পূর্ব্বমুখী করি তারে বসাইয়া পরে,
পূর্ব্বভাগে উপবিষ্ট পুরন্ধ্রীনিকরে,
স্বাভাবিক শোভা হেরি মজিল নয়ন,
প্রসাধনে বিলম্ব করিল কিছুক্ষণ ॥১৩॥
ধূপযোগে আর্দ্রভাব শুকায়ে বিশেষে,
কুসুমকলিত তাঁর কমনীয় কেশে,
দূর্ব্বাদলযুক্ত মধু পুষ্প-মালিকায়,
অপরূপ সাজাইল গিরি-বালিকায় ॥১৪॥
গৌরী-গৌর দেহ মাজি অগুরুচন্দন,
গোরচনা পত্রাবলী করিল লিখন,
শোভায় হারায় যত সুরত-রঙ্গিণী,
রথাঙ্গ পুলিনযুক্তা সুর-তরঙ্গিণী ॥১৫॥

কি আর উপমা দিব নাহিক উপমা,
মেঘলেখা সহ যথা চমকে চন্দ্রমা,
কিবা কমলেতে লগ্ন মত্ত মধুলোভা,
জিনিয়া অলকাযুক্ত উমামুখ-শোভা ॥১৬॥
লোধ্রে সুরঞ্জিত চারু কপাল-ফলক,
তাহে গোরোচনা-চিত্র দিতেছে ঝলক,
তার কাছে শ্রুতিপুটে যবের অঙ্কুর,
আঁখি-আকর্ষণে শোভা বিশেষে চতুর ॥১৭॥
সিক্ত সিকৃথে নিরমল অধরোষ্ঠ রাজে,
বিলেখিত রেখা চারু তাহাদের মাঝে,
কি আর বর্ণিব শোভা বার বার স্ফুরে।
হবে বলি সে লাবণ্য সফল অদূরে ॥১৮॥
অলক্ত-রঞ্জন করি আরক্ত চরণে,
আশীর্ব্বাদ করে সখী রহস্যবচনে,—
"ইথে প্রহারিও পতি-শির-শশিকলা"
শুনি তার ফুলহার প্রহারে বিমলা ॥১৯॥
সুজাত উৎপলদল সুন্দর-নয়নে,
নিরখি নিরখি সখী শোভে কালাঞ্জনে,—
সে কেবল সুমঙ্গল কার্য্যের আচারে
নেত্রনিভা কজ্জলে কি বাড়াইতে পারে ?॥২০॥
আভরণ প্রসাধন সমাপন পরে,
তনুরাজি-প্রভাপুঞ্জ পরকাশ করে,
কুসুমিত লতা, কিবা জ্যোতিষ্মতী নিশা,
অথবা বিহঙ্গযুক্ত তটিনী সদৃশা ॥২১॥
মুকুরেতে চারুবেশে করি বিলোকন,
চকিত স্থগিত হলো উমার নয়ন,
চঞ্চল হইল চিত হেরিতে মহেশ,—
পতি নিরখিলে সিদ্ধ বনিতার বেশ ॥২২॥
মঙ্গলার মঙ্গলে মেনকা মগ্না হয়ে,
অঙ্গুলে হিঙ্গুল আর হরিতাল লয়ে,
উন্নত করিয়ে কর্ণফুলযুক্ত মুখে,
বিবাহ তিলক চারু লিখিতেছে সুখে ॥২৩॥
উমাস্তনোদ্ভেদ * সহ বৃদ্ধ মনোরথ,
অদ্য সেই মনোরথ প্রাপ্ত সিদ্ধিপথ,

* এতদ্দ্বারা পূর্ব্বকালে বয়স্থা হইবার পরে কন্যাদানের সু নিয়ম ছিল, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

বিলোকিত নহে কিছু পুলকাশ্রুভরে--
কোনমতে ললাটে তিলক-লিপি করে ॥২৪॥
আনন্দের অশ্রুধারা নয়নেতে ক্ষরে,
ঊর্ণাময় সূত্র রাণী বাঁধে স্থানান্তরে—
আসিয়া উমার ধাত্রী কৌতুক-অন্তরে,
যথাস্থানে কৌতুক* বান্ধিল তার পরে ॥২৫॥
যথা, ফেনপুঞ্জে ক্ষীরোদের তীরে ভাতি,
শরদ সময়ে যথা পূর্ণিমার রাতি,
সেইরূপ উমাদেহে নবপট্টবাস,
মুকুর-ফলকে প্রভা করিল প্রকাশ ॥২৬॥
উপদেশে সুনিপুণ মেনা পুণ্যবতী,
অনুমতি লয়ে তার কল্যাণী পার্ব্বতী,
কুলদেবগণে পূজি, করিয়া প্রণতি,
ক্রমে ক্রমে বন্দিলেন যত সব সতী ॥২৭॥
প্রণতা পার্ব্বতী-প্রতি কহে সতীচয়,
"প্রাপ্ত হও অখণ্ডিত পতির প্রণয়"—
স্নিগ্ধজন-আশীর্ব্বাদ অতিক্রম করি,
পতি-অর্দ্ধ-অঙ্গ উমা পরে লন হরি ॥২৮॥
আপন বিভব আর ইচ্ছা অনুসার,
যথাবিধি কার্য্য সব করি দুহিতার,
কৃতি আর সভ্য গিরি, বুধগণে লয়ে,
রহিলেন বৃষধ্বজ-উদয়-আশয়ে ॥২৯॥
সেইকালে অনুরূপ, কৈলাস সমাজ,
হইতেছে বিবাহ-বিহিত বর-সাজ,
সমাদরে মাতৃগণ † নানা আভরণ,
পুরশাস্তা-পুরোভাগে করেন স্থাপন ॥৩০॥
মাতৃগণ-গৌরবার্থ কৈলাস-ঈশ্বর,
পরশিলা মাত্র সেই ভূষণনিকর,

* বিবাহ-সূত্র।

† "ব্রাহ্মীচ বৈষ্ণবী চৈন্দ্রী রৌদ্রী বারাহিকী তথা কৌবেরী চৈব কৌমারী মাতর সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ"।

মতান্তরে ইঁহাদিগের সংখ্যা অষ্টবিধ, যথা, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, কৌবেরী অথবা চামুণ্ডা এবং চৰ্চ্চিকা।

আত্মবেশে রহিলেন, অথচ সে বেশ
অন্যভাবে লোক প্রতি দেখান মহেশ ॥৩১॥
ভস্ম—ভাবগত—হল্যো সিত অঙ্গরাগ,
কপাল, কিরীটরূপে শোভে শিরোভাগ,
রোচনা অঙ্কিত পটিযুক্ত পট্টবাস,
গজাজিন সেই শোভা করিলে প্রকাশ ॥৩২॥
ললাটের মধ্যভাগে লোল বিলোচন,
বিমল পিঙ্গল তারা তাহাতে শোভন—
যথাস্থানে হরিতালে যেন সুরঞ্জিত—
হইয়াছে বিবাহের তিলক লাঞ্ছিত ॥৩৩॥
অঙ্গে অঙ্গে বলয়িত ভুজঙ্গ-নিচয়,
মণিময় আভরণ-শোভা প্রকাশয়—
কেবল করিল নিজ বপু ভিন্নাকার,
স্বভাবতঃ ফণাচয় মণির আধার ॥৩৪॥
হরশিরে বালশশি-শোভা চমৎকার,
স্বল্প হেতু দৃষ্ট নহে কলঙ্ক তাহার,
দিবসেও হয় যাহে দীপ্তি নিঃসরণ,
হেন চূড়ামণি সত্তে, অন্যে প্রয়োজন? ॥৩৫॥
যিনি মাত্র সমুদয় অদ্ভুত-প্রভব,
যাঁহার প্রভাব শ্রেষ্ঠ বেশের উদ্ভব,
অসি আনি ধরিলেক অনুচরগণ,
তাহে তিনি নিজ রূপ করেন ঈক্ষণ ॥৩৬॥
ভক্তিভরে করে বৃষ সঙ্কুচিত কায়—
পরিসর পৃষ্ঠ ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত তায়—
নন্দীকরে ভর রাখি বৃষভ-বাহন,
কৈলাস আরোহি যেন করেন গমন ॥৩৭॥
বাহনের গতি-ভঙ্গে কম্পিত কুণ্ডলে,
শিবের পশ্চাতে যান মাতৃকা সকলে,—
লোহিত পরাগ মুখ ময়ূখমণ্ডল,
আকাশে ফুটিল কিবা অমল কমল ॥৩৮॥
পুরোভাগে মাতৃগণ কনক-বরণ,
যেন আগে আগে শোভে ক্ষণপ্রভাগণ—
বলাকা-বলিত নবনীল কাদম্বিনী,
তাহাদের পাছে যান কালী কপালিনী ॥৩
মহেশের আগে ভাগে চলে ভূতগণ,
বাজাইয়ে সুমঙ্গল বিবিধ বাজন,—

রথোপরে উঠি বাদ্য দেবদলে কয়,
সদাশিব-সেবনের এই ত সময় ॥৪০॥
বিশ্বকারু-বিরচিত নব আতপত্র,
সূর্য্য আসি শিব-শিরে ধরে সেই ছত্র,
ঝুলিছে ঝালর তায় ঝলমল ছবি,
হর-উত্তমাঙ্গে যথা পতিত জাহ্নবী ॥৪১॥
মূর্ত্তিমতী জাহ্নবী যমুনা দুই জনে
আশুতোষে তুষিছেন চামর-ব্যজনে,
যদিও নাহিক আর রূপ জলময়
মরাল-আবলী দেয় যথা পরিচয় ॥৪২॥
সাক্ষাৎ বিরিঞ্চি আর শ্রীবৎস লাঞ্ছন
আসি তথা করিলেন বিজয়-বচন—
হুতাশনে তেজ যথা বৃদ্ধি করে হবি,
মহিমা বাড়ান তাঁর কৃষ্ণ আর কবি ॥৪৩॥
তিন ভাগে বিভাজিত একই আকার,
গুরু লঘু ইথে কিবা সম্বন্ধ বিচার ?
কভু হর, কভু হরি, কভু কমলজ,
পরস্পর তিন জন অনুজ অগ্রজ ॥৪৪॥
আড়ম্বর পরিহরি ইন্দ্রে আগে লয়ে,
ধরিয়ে বিনীত বেশ লোকপালচয়ে,
নন্দীরে ইঙ্গিতে কহে স্ব স্ব অভিমত,
প্রদর্শিত পরে সবে প্রাঞ্জলি প্রণত ॥৪৫॥
বিধি সম্ভাষিলা শিব শির-সঞ্চালনে,
বাক্য যোগে সম্ভাষণ সরোজাক্ষ সনে,
মৃদুহাস্য-যোগে শচীনাথে সম্ভাষণ,
অপর দেবতা প্রতি করি বিলোকন ॥৪৬॥
পুরোভাগে সপ্তঋষি আসি তার পরে,
জয়শব্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন হরে,
মৃদু হাসি কন শিব "এ বিবাহযাগে,
তোমাদের বরণ করেছি আমি আগে" ॥৪৭॥
অগ্রে লয়ে বিশ্বাবসু-প্রবীণ বীণায়,
ত্রিপুর-বিজয়-গীত গন্ধর্ব্বেরা গায়,
স্বান্ত যাঁর ভ্রান্ত নয় তমোগুণভরে,
চলিলেন চন্দ্রচূড় নগেন্দ্র-নগরে ॥৪৮॥

চারুগতি বৃষবর অম্বর-উপরে,
কনক-কিঙ্কিণী রিণি ঝিনি রব করে,
ঘন ঘন নাড়ে শৃঙ্গ ওতপ্রোত ঘনে,
যেন পঙ্ক লাগিয়াছে আড্ডুলী-খননে ॥৪৯॥
পর্ব্বতেশ-প্রপালিত, প্রাপ্য নহে পরে,
হেন পুরী বৃষভ পাইল ক্ষণপরে,
কিবা হেমসূত্র হর-কটাক্ষ-পতন,
তাহাতে পড়িল গাঁথা গিরি-নিকেতন ॥৫০॥
তার উপকণ্ঠে, ঘন নীলকণ্ঠধরে,
পুরবাসিগণ দেখে উৎসুক অন্তরে,
স্বশর-চিহ্নিত শূন্যরথ পরিহরি,
নামিলেন ভবদেব ভূমির উপরি ॥৫১॥
হর-আগমনে মনে হরষিত হয়ে,
অগ্রসর গিরিবর বন্ধুগণ লয়ে,
করিবৃথে আরোহিত সবে ঋদ্ধিমান্,
কুসুমিত তরুময় কটক * সমান ॥৫২॥
দেবদল, আর যত গিরীন্দ্র বান্ধব,
পুর † প্রবেশিছে দূরে প্রচারিয়ে রব,
উদ্ঘাটিত দ্বারে দুই দলের মিলন—
সেতু ভঙ্গে দুই পয়ঃপ্রবাহ যেমন ॥৫৩॥
ত্রিলোকের পূজ্য শিব করেন প্রণাম,
লজ্জিত হইল তাহে গিরি গুণগ্রাম;
না জানিল তার পূর্ব্বে স্বীয় শিরোদেশ,
মহেশ-মহিমা অগ্রে প্রণত বিশেষ ॥৫৪॥

* পর্ব্বতের পার্শ্বে প্রসারিত ভূগু বা নিতম্ব।

† এই শ্লোক হইতে ৭০ শ্লোক পর্যন্ত পুরী অর্থাৎ নগর এবং তৎপরে অট্টালিকা বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের স্থানে যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আধুনিক নিয়মে নগর এবং প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করেন নাই, এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। কেহ কেহ কহেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বাটী বিভক্ত করিতে জানিতেন না, মুসলমানদিগের নিকটে ইহা শিক্ষা করেন, এ কথা অমূলক।

প্রীতিভরে প্রফুল্লিত বদনমণ্ডল,
জামাতার আগে আগে চলে হিমাচল,
পণ্য-বীথিকার পথে আগুল্‌ফ-প্রমাণ,
পুষ্প বরাবরে পুরে প্রবেশে ধীমান্ ॥৫৫॥
সেইক্ষণে পুরাঙ্গনা যত মাদলসা—
হর-দরশনে মনে ললিত লালসা,
পরিহরি অন্য কার্য্য-চেষ্টা সমুদয়,
প্রাসাদে প্রাসাদে গিয়ে হইল উদয় ॥৫৬॥
জালনায় *দ্রুতপদে গমনে চঞ্চলা,
বিমুক্ত বন্ধন-মালা, বিযুক্ত-কুন্তলা—
বাঁধিতে বিনোদ বেণী নাহি অবকাশ,—
কোন ধনী ধায় করে ধরি কেশপাশ ॥৫৭॥
প্রসাধিকা কারো পদে আলতা পরায়,
রঞ্জন না হতো শেষ, টেনে নিয়ে তায়,
মন্দগতি ত্যজি, বেগে বাতায়নে চলে,
দুইপদ-দ্রব্য রাগে দাগে গৃহতলে ॥৫৮॥
অপরা দক্ষিণনেত্রে রঞ্জয়ে অঞ্জন,
সে রাগে বঞ্চিত করি বাম বিলোচন,
অঞ্জনের তুলী করে করিয়া ধারণ,
বাতায়ন-সন্নিধানে করিল গমন ॥৫৯॥
জালান্তরে অন্যা করে কটাক্ষ-চালনা,
চঞ্চল-গমন-ভরে চলিত চেলনা,
নীবি-স্থানে করে ধরি রাখিয়েছে বাস,
নাভিমধ্যে কঙ্কণের প্রতিভা-প্রকাশ ॥৬০॥
অর্দ্ধ গাঁথা না হইতে রত্ন রশনা,
উঠিয়ে ধাইল ছুটে কোন বরাননা—
পায় পায় মণিমুক্তা যেতেছে পড়িয়ে—
রহিল গাঁথন-সূতা অঙ্গুষ্ঠে জড়িয়ে ॥৬১॥
সীধুগন্ধ-সুরভিত সে মুখনিকর,
ঘন কৌতূহলযুক্ত নয়ন-ভ্রমর,
বাতায়ন-আয়তনে স্থান নাহি আর,
হইল সহস্রদল-কমল-আধার ॥৬২॥
হেনকালে রাজপথ-প্রাপ্ত ত্রিলোচন,
পুঞ্জ পুঞ্জ পতাকায় ভূষিত তোরণ,
দিবাদীপ্ত চূড়াচয়, প্রাসাদ-উপরে,
আরো দীপ্ত হলো হরশির-শশিকরে ॥৬৩॥
অন্য বস্তু-জ্ঞান-বিরহিত বামাগণে,
সেই মাত্র রূপ পান করিছে নয়নে,
সকল ইন্দ্রিয় যেন একত্র হইয়ে,
প্রবেশিল তাহাদের নয়নেতে গিয়ে ॥৬৪॥
কহে, "ধন্য ধন্য কোমলাঙ্গী অর্পণারে,
স্থান বুঝি রত ঘোর তপস্যা-আচারে,
যে হরের দাসী হলো সার্থক জীবন,
সে হরের অঙ্কে হবে ইহার শয়ন ॥৬৫॥
স্পৃহণীয় এই দুই রূপের আকর,
যদি না করিত বিধি যুক্ত পরস্পর,
তবে এ উভয়ে রূপ-বিধান কারণ,
বিফল হইত সব বিধির যতন ॥৬৬॥
কে বলে হরের কোপে দহিল মদন?
এ আকারে কোপোদয় না হয় কখন,—
রূপ নিরখিয়ে লজ্জাবশে ফুলশর,
আপনা আপনি ত্যাজিয়াছে কলেবর ॥৬৭॥
শুনলো সজনি আজি এ কি ভাগ্যোদয়,
মহীধর-মনোরথ সিদ্ধ সমুদয়,
কহই উন্নতি, শিরে ধরণী ধরিয়া,
উন্নতির শেষ, হরে জামাই করিয়া" ॥৬৮॥
এইরূপ গিরি-পুরাঙ্গনাগণ-মুখে
শ্রুতি-সুখকরী কথা শুনি, শিব সুখে,
কেয়ূর চূর্ণিত লাজে সমাকীর্ণ দেশ,
হিমালয়-নিলয়েতে করিলা প্রবেশ ॥৬৯॥
শারদ-নীরদ-শুভ্র বৃষ পরিহরি
হরি-ব[illegible] ধরি অবতীর্ণ যেন হরি
অগ্রে প্রবেশিলে পরে সরোজ-আসন,
প্রকোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে যান দেব-ত্রিলোচন ॥৭০॥

* জালশব্দে জান্‌লাকে বুঝায়, অন্তঃপুরের জান্‌লা পূর্ব্বকালে কি ইয়োরোপে কি আশিয়া, খণ্ডের সভ্য জাতিদিগের মধ্যে ধাতুকাষ্ঠ, প্রস্তর, অথবা ইষ্টকে বিরচিত জালদ্বারা আবৃত হইত, এই জন্যই জাল-শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। জানলা শব্দ বোধ হয়, জাল শব্দের অপভ্রংশ। (আধুনিক পণ্ডিতদের মতে ইহা পোর্ত্তুগীজ শব্দ।)

* সূর্য্যঃ।

পরে ইন্দ্রে আগে লয়ে দেবতাসকল,
সপ্তঋষি-পূর্ব্ব যান মহামুনিদল,
তার পরে শিবগণ গিরি-গৃহে গত,
শুভকর্ম্ম-পরে পরমার্থ পুঞ্জ-মত ॥৭১॥
যথাবিধি মহেশ করিলে অধিষ্ঠান,
রত্নযুক্ত অর্ঘ্য গিরি করেন প্রদান,
মধুপর্ক আর নব দুকূল বসন,
মন্ত্রপূত পরে হর করেন গ্রহণ ॥৭২॥
চেলী পরাইয়ে পুরচারী স্ববিনীত,
বধূ-সন্নিধানে বরে করিল বিনীত,
নব শশি-করে গত বেলা-সন্নিধান,
স্ফুট-ফেনরাজিযুক্ত সমুদ্র সমান ॥৭৩॥
সমুজ্জ্বল কান্তিযুত উমাচন্দ্রানন,
প্রফুল্ল করিল হর-কুমুদনয়ন,—
নিরমল জল প্রায় প্রসন্ন হৃদয়,
উমা-আবির্ভাবে যেন শরদ উদয় ॥৭৪॥
পরস্পর দরশনে সুকাতর চিত,
বাসনা প্রবল কিন্তু চপল চকিত,
ক্ষণে স্থির হয় ক্ষণে রহিতে না পারি,
লজ্জাভরে অমনি মুদিত চক্ষুচারি ॥৭৫॥
হর-ডরে স্মর আর প্রকাশিতে নারে,
উমার শরীরে রহে প্রচ্ছন্ন আকারে,
আরক্ত অঙ্গুলে তার অঙ্কুর সঞ্চরে,
গিরিদত্ত কর হর ধরেন স্বকরে ॥৭৬॥
উমাদেহে রোমাবলী শিহরিল রসে,
শিবের অঙ্গুলী স্বিন্ন সে সুখ-পরশে,—
অতনুর আবির্ভাব সমান বিভাগে,
বধূ আর বরে বিভাজিত অনুরাগে ॥৭৭॥
অন্য বর বধূগণ বিবাহ সময়,
যাঁদের উদয়েতে শোভার উদয়,
সেই শিব শিবা, বর বধূ বেশধারী,
হেন শোভা মনোলোভা বর্ণিতে কি পারি? ॥৭৮॥
প্রজ্বলিত হুতাশন সমুন্নত জ্বালে
কিবা বিভা, বর-বধূ প্রদক্ষিণ কালে,—
দিবা-বিভাবরী যেন সংমিলিত কায়,
সুমেরু বেষ্টন করি ঘুরে ঘুরে যায় ॥৭৯॥
নিমীলিত আঁখি, পরশন সুখভরে,
তিনবার পতিপত্নী প্রদক্ষিণ পরে,
পুরোহিত-হিত উমা, জ্বলিত জ্বলনে
লাজাঞ্জলি বিমোচন করেন সেক্ষণে ॥৮০॥
গুরু-উপদেশে গৌরী, গন্ধে বিমোহন
লাজাঞ্জলি ধূম, মুখে করেন গ্রহণ,—
শিখা বিসর্পিয়ে তাঁর কপোলফলকে,
কর্ণ-ইন্দীবর শোভা অর্পিল পলকে ॥৮১॥
বিবাহ-বিহিত সেই ধূম-সমাকুলে,
যবাঙ্কুর কর্ণপুর ম্লান শ্রুতিমূলে,
আঁখি হতো বিগলিত দলিত অঞ্জন,
অরুণ আস্বিন্ন গণ্ড করিল রঞ্জন ॥৮২॥
পুরোহিত কন, "কন্যে কর গো শ্রবণ,
তব বিবাহের সাক্ষী এই হুতাশন,
অতএব ভর্ত্তা সহ, না করি বিচার,
করিবে গো যথাবৎ ধর্ম্মের আচার" ॥৮৩॥
অপাঙ্গ-সমীপবর্ত্তী শ্রবণে ভবানী,
গ্রহণ করেন সেই পুরোধার বাণী—
নিদাঘের তাপে তপ্ত যথা বসুন্ধরা,
প্রথম পয়োদ-জলে স্নিগ্ধ কলেবরা ॥৮৪॥
নিত্য পতি নীলকণ্ঠ, প্রিয়দরশন,
কহিলেন "ধ্রুবতারা কর বিলোকন',—
মুখ তুলে লজ্জাভরে ক্ষীণস্বরে তারা'
কোনমতে কহিলেন, "দেখিলাম তারা" ॥৮৫॥
বিধি-বিজ্ঞ পুরোহিত বিধি সমাশ্রিয়া,
সমাপ্ত করিলে পরে পরিণয়-ক্রিয়া,
প্রজাপুঞ্জ-মাতাপিতা, উমা,-উমাপতি,
পদ্মাসনস্থিত পিতামহে করে নতি ॥৮৬॥
বধূ-প্রতি আশীর্ব্বাদ করেন বিধাতা,
"হও মা কল্যাণি, বীর সন্তানের মাতা,
যদিও বিধাতা হন বাক্যের ঈশ্বর,
হর-আশীর্ব্বাদে তাঁর না সরিল স্বর ॥৮৭॥

অনন্তর বধূ-বর বসি সিংহাসনে—
ইচ্ছনীয় লোকাচার-পালন কারণে—
কুসুম-খচিত চতুরস্র বেদী-পরে,
রোপণ করেন দ্রব্য যব লয়ে করে ।।৮৮।।
আয়ত মৃণালদণ্ড, দল-অন্তরালে,
সুশোভিত নিকর শীকর মুক্তামালে,
হেন শতপত্র আতপত্র করে করি,
কমলা ধরিলা বর বধূ শিরোপরি ।।৮৯।।
সংস্কৃত পূত বরে, সংস্কৃত বাণী,
বিধিমতে বিনাইয়া তুষিছেন বাণী,
বধূর মধুর ভাবে মধু রসাশ্রিত
প্রকৃতি-সুলভ কথা কহেন প্রাকৃত ।।৯০।।
বিকসিত বৃত্তিচয় চারু অঙ্গ-ভঙ্গে,
রসান্তরে রাগান্তর বাঁধিয়ে সুরঙ্গে,
অপ্সরে দেখায় প্রাণ্ড লীলার চটক,
দেখেন দম্পতি দিব্য নাটিকা নাটক ।।৯১।।
তার পরে, পরিণীত শিব-পদতলে,
করাটে বাঁধিয়ে বস্ত্র পড়ে দেবদলে,
কহে, "প্রভো ! পুন তনু লভিলা মদন,
শাপ অবসান, সেবা করুন গ্রহণ" ।।৯২।।
রোষান্তে প্রশান্ত শান্ত হইলেন ভব,
মনোভব-শরক্রিয়া কৃত-অনুভব—
যে জন যথার্থ হয় কার্য্যেতে কুশল,
কাল বুঝে প্রভুরে জানায়ে লভে ফল ।।৯৩।।
বিবিধ বিবুধগণ
পরিহরি, ত্রিলোচন
চলিলেন করে ধরি গিরি-তনুজারে,
কনক-কলস চিত,
ফুলহারে বিখচিত,
ক্ষিতি বিরচিত শয্যা কৌতুক-আগারে ।।৯৪।।
নব-পরিণয়-লজ্জা
ভূষণে সুন্দর সজ্জা
হর আকর্ষণে মুখ ফিরান পার্ব্বতী ।
শয়ন-সখীরে তথা
কথঞ্চিৎ কন কথা,
প্রমথের মুখ-ভঙ্গে গূঢ় হাস্যবতী ।।৯৫।।

ইতি উমা-পরিণয় নাম সপ্তম সর্গ ।

পরিশিষ্ট

সন্ধ্যাবর্ণন

*　　*　　*　　*　　*　　*

মলয়-শেখরে কভু, বিহার করেন পভু,
যেখানেতে চন্দনের বন,
লবঙ্গ কেশর সহ, কাঁপাইয়ে গন্ধবহ,
রতিখেদ করয়ে হরণ ।।২৫।।

কনক-কমল-ঘায়, পীড়িত পার্ব্বতী-কায়,
করজলে বিম্বিত লোচন,
নামিলে নদীর জলে, কটি ঘেরি মীনদলে,
করে পুন মেখলারচন ।।২৬।।

সুরবধূ স্পৃহাযুক্ত, সমীক্ষণ পরিভুক্ত,
নন্দনকাননে পঞ্চানন,
শচীর অলকোচিত, পারিজাতে বিখচিত,
উমারে করেন অনুক্ষণ ।।২৭।।

স্বর্গ আর ধরাভূত, দুই সুখ অনুভূত,
করি শিব প্রেয়সীর সনে,
দিনকর খর-কর, আলোহিত হলে পর,
যান গন্ধমাদন-কাননে ।।২৮।।

পার্ব্বতীর সব্যকর, বাম করে ধরি হর,
বসি হেমময় শিলাতলে,
প্রদোষেতে স্নিগ্ধতর, নিরখিয়ে প্রভাকর,
বনিতারে কন সেই স্থলে ।।২৯।।

"আরক্ত অপাঙ্গ ধর, তব নেত্রে দিনকর,
পদ্মকান্তি করিয়ে স্থাপন,
দিবসে সংহার করে, ধাতা যথা যুগান্তরে,
জগতের করেন হরণ ।।৩০।।

অস্তমিত দিনকর, করে শোভে মনোহর,
তব পিতৃ-পর্ব্বত-নির্ঝর ।
ইন্দ্রধনু শোভাচয়, করিয়াছে পরাজয়,
অই দেখ শীকরনিকর ।।৩১।।

চক্রবাক্ চক্রবাকী, মুখেতে মৃণাল-বাকী,
গ্রীবাভঙ্গ প্রিয়-অভিমুখে,
সরোবরে ধীরে ধীরে, ক্রমে গেল দূর নীরে,
বিরহে বিলাপ করি দুঃখে ।।৩২।।

শল্লকীতরুর ক্ষীর, গন্ধে সুবাসিত নীর,
তাহে অলিবদ্ধ সরোরুহ,
সারা দিবসের পরে, সেই নীর পান তরে,
চলিয়াছে মাতঙ্গসমূহ ।।৩৩।।

অই দেখ প্রাণপ্রিয়ে, পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে,
অস্তগত ভানু মহোদয়,
দীর্ঘ প্রতিবিম্বছলে, কেমন সরসীজলে,
রচিতেছে সেতু স্বর্ণময় ।।৩৪।।

দীঘল দশনধর, আরণ্য বরাহবর,
দন্তে ভাঙ্গি বিস-কিশলয়,
প্রগাঢ় পঙ্কেতে যত, তাপ করি অপগত,
উঠিতেছে ত্যজি হ্রদচয় ।।৩৫।।

হের অই তরুপর, স্বর্ণ-বর্ণ পুচ্ছধর,
বসিয়াছে শিখী রূপরাশি,
দিবা অবসানকালে, দিনকর-করজালে,
সেই কি ফেলিল সব গ্রাসি ?।৩৬।।

ভানুর কিরণ জল, পরিগতে নভঃস্থল,
কিছু শুষ্ক সরসীর প্রায়,
পর্ব্বদিগে তমোরাশি, ক্রমে সঞ্চারিল আসি,
যেন পঙ্ক সম দেখা যায় ।।৩৭।।

উটজ-অঙ্গনে চলি, যেতেছে কুরঙ্গাবলী,
তরুপুঞ্জ-মূল সিক্ত জলে,
আসে যজ্ঞধেনুগণ, প্রজ্বলিত হুতাশন,
কিবা শোভা আশ্রমসকলে ! ॥৩৮॥
বিহরিছে সরসিজ, বদ্ধ করি কোষ নিজ,
ক্ষণদার আগমন-ক্ষণে,
তথাপিও কিছু স্থান, ভ্রমরে করিতে দান,
রাখিয়েছে প্রীতিফুল্ল মনে ॥৩৯॥
ক্রমে হয় ক্ষীণছবি, আলোহিত তাহে রবি,
প্রতীচীর কি শোভা সে কালে ?
যেন কোন নববালা, চারু বান্ধুলীর মালা,
সকেশর পরিয়াছে ভালে ॥৪০॥
হৃদয়-সঙ্গত তানে, মিলাইয়ে সামগানে,
সহস্রেক বন্দনার সনে,
কিরণোষ্ম-পায়ি * গণ, করিছেন সংস্তবন,
অগ্নিগত † ভাস্কর কিরণে ॥৪১॥
আনত কন্ধরধর, যুগে নমিত কেশর,
চামরেতে বিঘ্নিত নয়ন,
হেন হয়চয় সহ, সমুদ্রে ডুবায়ে অহ,
অস্তমিত হইল তপন ॥৪২॥
তাঁর তেজ হলো লুপ্ত, আকাশ যেমন সুপ্ত,
মহৎ তেজের এই গতি—
যবে থাকে দীপ্তিমান, করে তবে দীপ্তিদান,
ক্ষয়ে করে ক্ষয়ের সঙ্গতি ॥৪৩॥
দিবসপতির গতি, অনুগতা সন্ধ্যা সতী,
অস্তাচলে সমর্পিয়ে অঙ্গ,
পূর্ব্বে পূর্ব্বাচলে তাঁর, স্থানে প্রাপ্ত পুরস্কার,
আপদেও না ছাড়িল সঙ্গ। ৪৪॥
রক্ত পীত কৃষ্ণ রাগে, অই দেখ পুরোভাগে,
কত শত নীরদনিকর,
তাহে যেন সন্ধ্যা সতী, নানাবিধ বর্ণবতী,
তুলিকায় চিত্রকলেবর ॥৪৫॥
দেখ প্রিয়ে ! সন্ধ্যাতেজে, অচল সমান সেজে,
ভাতি ভাতি কি শোভা সে পায়,—
কোথা সিংহজটা সম, কোথা ধাতু-শৈলোপম,
মঞ্জরিত বিটপী কোথায় ॥৪৬॥
পদ অগ্রে রাখি ভর, পবনাম্বুদান-পর,
বিশিক্তিক্ত তপোধনগণ,
লোকালয় অভ্যন্তরে, জপিছেন ভক্তিভরে,
ব্রহ্মমন্ত্র সিদ্ধির কারণ ॥৪৭॥
এই হেতু মম প্রতি, দেহ প্রিয়ে অনুমতি,
মুহূর্ত্তেক প্রস্তুত কারণে,
বিনোদিনী সখী সব, বিনোদচতুরা তব,
বিনোদিবে তোমারে সেক্ষণে” ॥৪৮॥
তা শুনি শৈলেন্দ্র-সুতা, পতি প্রতি কোপযুতা,
বঙ্কিম করিয়া বিম্বাধর,
সন্নিহিত সহচরী, বিজয়ারে লক্ষ্য করি,
বৃথালাপে হইয়া তৎপর ॥৪৯॥
সায়াহ্নের সমুচিত, মন্ত্রজপ সমাহিত,
সমাপন করি ত্রিলোচন,
মানে মৌনী গিরিজায়, কাছে আসি পুনর্ব্বার,
মৃদু হাসি কহেন বচন ॥৫০॥
“অকারণ মানময়ি ! পরিহর মান অয়ি,
সন্ধ্যায় বন্দিনু অন্যে নয়,
জান না কি মম মন, সহধর্ম্ম-পরায়ণ,
চক্রবাক্-সমবৃত্তি হয় ॥৫১॥
পূর্ব্বে ধাতা মহাশয়,* নিরমিয়া পিতৃচয়,
ত্যজিলেন যেই কলেবর,
তুই সন্ধ্যা সেই তনু, পূজনীয় সে কারণ,
তাই মম ইহাতে আদর ॥৫২॥

---

* বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ।

† “অগ্নিমাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতীতি” শ্রুতেঃ। সূর্য্য অস্তগত হইলে আপন তেজ অগ্নিতে রাখিয়া যান, সে জন্য অগ্নিতেই সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি করা যায়।

* তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—“পিতামহঃ পিতৃন্ সৃষ্ট্বা মূর্ত্তিং তামুৎসসর্জ্জহ। সা প্রাতঃ সায়মাগতা সন্ধ্যারূপেণ পূজ্যতে।” অপিচ, ব্রহ্মা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অসুরদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়া যে তনুত্যাগ

দেখ অই সন্ধ্যা সতী, তিমিরে কাতরা অতি,
ভূমিলগ্ন সম দেখা যায়,
কিম্বা তমালের বন, একতটে সুশোভন,
ধাতু-দ্রব তটিনীর প্রায়। ৫৩॥

প্রদোষের অস্তমিত, শেষ তেজে আলোহিত,
প্রতীচীর শোভা চমৎকার।—
যেন রণভূমিভাগে, টেরাভাবে তাগ তাগে
রক্তমাখা খর তরবার ॥৫৪॥

করিয়াছিলেন, তাহাই রাত্রি ; যেহেতু সেই তনু অন্ধকারের মূল সূত্র মাত্র। দেবগণের সৃষ্টির পরে যে মূর্ত্তি ত্যাগ করেন, তাহাই দিবা। অপর পিতৃদিগকে সৃষ্টি করিয়া যে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই সায়ংসন্ধ্যা এবং মানব সৃষ্টির পরে যে কলেবর ত্যজিয়াছিলেন, তাহাই প্রাতঃসন্ধ্যা। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাধ্যায়। অপরন্তু ভাগবত পুরাণের তৃতীয়াধ্যায়ে সায়ংসন্ধ্যার এইরূপ মনোহর মূর্ত্তি বর্ণিত আছে,—

"তাং ক্বণচ্চরণাম্ভোজাং মদবিহ্বল লোচনাম্।
কাঞ্চী কলাপ বিলসদ্দুকূলাচ্ছন্ন রোধসম্ ॥
অন্যোন্যাশ্লেষয়োত্তুঙ্গ নিরন্তর পয়োধরাম্
সুনাসাং সুদ্বিজাং স্নিগ্ধহাস লীলাবলোকনাম্ ॥
গূহন্তীং ব্রীড়য়াত্মানং নীলালক বরূথিনীম্ ॥"

অস্যার্থ :—

চরণরাজীব রাজে, মধুর মঞ্জীর বাজে,
মদভরে বিহ্বল লোচনা।
সুচিকণ চীন শাটী, কটিতটে পরিপাটী
স্বর্ণচন্দ্রহারে সুশোভনা ॥
আলিঙ্গিত পরস্পর, কিবা দুই পয়োধর,
সমুন্নত বিহীন অন্তর।
চারু নাসা সুদশনা, মৃদুহাস্যে বরাননা,
উল্লসিত কটাক্ষ সুন্দর ॥
কি শোভা ললাট পাশে, চাঁচর চিকুরপাশে,
সুনিবিড় নীল নিভাধর।
সুবদনা লজ্জাভরে, অঞ্চল লইয়া করে,
ঝাঁপিতেছে মুখসুধাকর ॥

দিবা আর যামিনীর, সন্ধিজাত যে মিহির,
নিওড়িলে সুমেরু শিখরে।
দেখ হে বিশালনেত্রে! অন্ধতমঃ কর্ম্মক্ষেত্রে,
অনর্গল বিজৃম্ভণ করে ॥৫৫॥

কোথাও না দৃষ্টি চলে, কি ঊর্দ্ধ কি অধঃস্থলে,
কিবা পার্শ্বে কিবা আগে, পাছে।
যেন গর্ভবাস-দৃশা, তিমিরে আচ্ছন্ন নিশা,
একেবারে বিশ্ব বেড়িয়াছে ॥৫৬॥

কি বিমল, কি সমল, কি অচল, কি সচল,
কি বঙ্কিম কি সরল প্রতি।
হতান্তর অন্ধকার, ধরে ভাব একাকার,—
ধিক্, ধিক্ দুষ্টের উন্নতি ॥৫৭॥

সিত সরোরুহাননি! প্রকাশিল নিশামণি,
হরিবারে নিশার তিমির,
দিগঙ্গনা মুখে তায়, আবরিত প্রতিভায়,
কেতকী পরাগ সুরুচির ॥৫৮॥

মন্দরের অন্তরালে, থাকি শশী তারাজালে,
বিভূষিতা নিশায় নেহারে।
তোমারে সঙ্গিনী ঘেরি, রহিলে যেরূপ হেরি,
পাছে থেকে কথা শুনিবারে ॥৫৯॥

পূর্ব্ব দিগঙ্গনা প্রিয়ে! প্রথমেতে মুচকিয়ে,
মুখচন্দ্রিকায় হাসি হাসি,
সারাদিন রুদ্ধগতি, চন্দ্রমারে এবে সতী,
নিশাদেশে দিতেছে প্রকাশি ॥৬০॥

পক্ক প্রিয়ঙ্গুর প্রায়, প্রকাশিত প্রতিভায়,
নভঃস্থল আর সরোবরে।
বিম্বযোগে সুধাকর, দূর হেতু সুকাতর,
রথাঙ্গদম্পতিভাব ধরে ॥৬১॥

নখরাগ্রে নিশাকর, কাটিয়া আপন কর,
যেন সুকুমার যবাঙ্কুর।
অই দেখ নবোদয়ে, তোমার শ্রবণদ্বয়ে,
রচিয়া দিতেছে কর্ণপুর ॥৬২॥

তিমির চিকুরে শশী, করাঙ্গুলে ধরি কসি,
চুম্বিতেছে বিভাবরীমুখে।
মুগ্ধ হয়ে সেই রসে, আঁখিরূপে তামরসে,
যামিনী মুদিছে মনোসুখে ॥৬৩॥

নিবিড় তিমির নব, ইন্দুকরে ভগ্ন সব,
তাহে কিবা শোভে নভঃস্থল—
মানস-সরসী জলে, নাহি যেন হস্তিদলে,
স্বচ্ছবারি করিল সমল ॥৬৪॥
অই দেখ কৃশোদরি ! রক্তভাব পরিহরি,
চন্দ্র ধরে বিশুদ্ধ মণ্ডল,
বয়সের দোষাধীন, বিকার কি চিরদিন
থাকে, যার স্বভাব নির্ম্মল ? ॥৬৫॥
উপরেতে শশিকর, অবস্থিত হ'লো, পর,
নিম্নগামী হলো নিশা তম।
বেধসের সন্নিধানে, গুণ দোষ যথাস্থানে,
গত হয় নিজ আত্মাসম ॥৬৬॥
চন্দ্রকান্ত মণিচয়, চন্দ্রকরে দ্রব হয়,
অসময়ে গিরি সেই জলে।
শিখিগণে জাগাইল, যাহারা ঘুমায়ে ছিল,
সান্দ্রস্থিত বিটপীর দলে ॥৬৭॥
নিরুপম হে সুন্দরি ! দেখ কল্পবৃক্ষোপরি,
প্রস্ফুরিত হয়ে সুধাকর।
যেন কর-দ্বারা তার, গণনা করিতে হার,
কুতূহলে হইল তৎপর ॥৬৮॥
সুবন্ধুর কলেবর, ধরে এই গিরিবর,
দিতেছে তাহাতে কত রঙ্গ—
সতিমির চন্দ্রকর, যেরূপ বিভূতিধর,
বিচিত্রিত মাতাল মাতঙ্গ ॥৬৯॥
ঘোরতর তৃষাভরে, কুমুদিনী পান করে,
চন্দ্রপ্রভা রস অতিশয়।
সহিতে না পারি আর, কাটিল উদর তার,
গুঞ্জে তাহে ভ্রমরনিচয় ॥৭০॥
দেখ দেখ মানময়ি, কল্পতরুপরে অই,
চন্দ্রিকার কিরূপ সংশয় ?
যেন সমীরণ বয়, তাহাতে চঞ্চল হয়,
সুচিকণ বসননিচয় ॥৭১॥
পতিত কুসুমাকার, শশিকর সুকুমার,
পত্র ভেদি দিতেছে ঝলক।
অঙ্গুলি উঠায়ে প্রিয়ে, তরু যেন বিনাইয়ে,
দিতেছে হে তোমার অলক ॥৭২॥
দেখ প্রিয়ে অই তারা, নববধূ-সম ধারা,
নব সঙ্গমেতে ভীতা অতি।
প্রকম্পিত কলেবরা, চঞ্চল মণ্ডলধরা,
যায় যথা বর দ্বিজপতি ॥৭৩॥
ধরি জ্যোৎস্না প্রতিমূর্ত্তি, তব গণ্ড পায় স্ফূর্ত্তি,
পাকা শর আভা আকর্ষণে।
দেখ দেখ তদুপর, আরোহিল চন্দ্রকর,
অহে চন্দ্র নিহিত নয়নে ! ॥৭৪॥
রক্ত সূর্য্যকান্ত মণি, পাত্রে দেখ সুবদনি,
কল্পতরু মধু পরকাশে।
গন্ধমাদনের বন বাসিনী দেবতাগণ,
আসিয়াছে তোমার সকাশে ॥৭৫॥
কেশর কুসুম দ্রব্য, সুরভিত মুখ তব,
স্বভাবতঃ আরক্ত নয়ন।
তাহাতে পাইয়ে স্থান, কত গুণ বৃদ্ধিমান,
করিবে হে মদিরা এখন ? ॥৭৬॥

সমাপ্ত

মেঘদূত কাব্যখানি কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ। কবি হিসাবে অন্যান্য কবিদের মত রঙ্গলালেরও কালিদাসের প্রতি একটা আন্তরিক মমত্ব বোধ ছিল এবং সেজন্য তিনি প্রথম জীবনে কালিদাস কৃত কুমার-সম্ভবের পদ্যানুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাকবি রঙ্গলাল যে তাঁর জীবৎমানের কোন্ সময় মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। মেঘদূতে যে ভাবে আদিরস বর্ণিত হইয়াছে রঙ্গলাল তাহা প্রশ্রয় দানে কুণ্ঠিত। সম্ভবতঃ সেই কারণে মেঘদূত কালিদাস রচিত গ্রন্থ হইলেও এবং বহু যত্নে তাহার পদ্যানুবাদ সম্পাদন করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন নাই।

যে জীর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে "মেঘদূত" উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্থান এমন ভাবে পর্য্যুদস্ত যে বহুস্থলে কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পদ্যাংশ নকল করিতে

মেঘদূত

মহাকবি কালিদাস রচিত কাব্যের পদ্যানুবাদ

পাঠ—রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহ ঃ—১৩৬৬)

হইয়াছে—ফলে, সমস্ত স্থলেই যে কবির রচনা সঠিক মত নকল করা গিয়াছে এমন কথা অকাতরে বলা চলে না। যে শ্লোকগুলি এরূপ বহু কষ্টে উদ্ধার করা হইয়াছে সেগুলির নির্দ্দেশক সংখ্যার পাশে (–) এরূপ চিহ্ন দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, রঙ্গলাল তাঁর গ্রন্থ মাত্রেই পাদটিকা যোজনা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং মেঘদূতেও তিনি বহু পাদটিকার সংযোজনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের উত্তর-মেঘ অংশের পাদটিকা গুলি উদ্ধার করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইল কিন্তু পূর্ব্বমেঘ অংশের কোন পাদটিকাই উদ্ধার করিতে না পারায় দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, সেই পাদটিকা গুলিকে বর্জন করিয়াই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। হয়তো এই পাদটিকাগুলি উদ্ধার করিতে পারিলে মেঘদূত সম্পর্কে নূতন কিছু আলোক সম্পাত করা সম্ভব হইত!

—শ্রীশিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বমেঘ

কোন যক্ষ অভিশপ্ত হয়ে কর্ম্মদোষে।
মহিমা বিগত একবর্ষ প্রভু রোষে ॥
বিরহের গুরুভারে দয়িতের সনে।
মুহ্যমান হয়ে রয় রামগিরি বনে ॥
হেথা তরুগণ তোষে স্নিগ্ধ ছায়া দানে।
জলধারা পুণ্যময়ী জানকীর স্নানে ॥=(১)

কাটিল কয়েক মাস তনুক্ষীণ হয়।
মণিবন্ধ হতে খসে স্বুবর্ণ বলয় ॥
আষাঢ়ের প্রথম দিবস সমাগতে।
হেরে যক্ষ মেঘ আসি উদয় পর্ব্বতে ॥
সমাচ্ছন্ন সানুদেশ পয়োদ পাটলে।
যেন বপ্রক্রীড়া মত্ত মাতঙ্গের দলে ॥=(২)

রাজরাজ অনুচর যক্ষ বহুক্ষণ!
চাপিয়া অন্তরবাষ্প করে নিরীক্ষণ ॥
কৌতুক-আধান মেঘ করে অন্যমন।
মিলন স্বুখেতে যারা থাকে অনুক্ষণ ॥
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনী দূরে থাকে যার।
মেঘাগমে মনোব্যথা কি বর্নিব তার ॥=(৩)

আসন্ন শ্রাবণ মাস, দয়িতা জীবন।
কেমনে বাঁচাবে, তাই, করিল মনন ॥
দূত করি পয়োমুচে দায়তা সদন।
স্বকীয় কুশল বার্ত্তা করিবে প্রেরণ ॥
কুটজ কুসুমে অর্ঘ্য সাজাইয়া ক্ষণে।
মেঘেরে স্বাগত দেয় বিনম্র বচনে ॥=(৪)

ধূমজ্যোতি জল আর মিশিয়া পবন।
সঞ্জাত যে পুরোবর্ত্তী মেঘ অচেতন ॥
না করি বিচার তার প্রার্থনা জানায়।
কামাতুর যক্ষ মেঘে মনের জ্বালায় ॥
সচেতন প্রাণী বিনা বার্ত্তা কেবা বয়।
কামীজনে সেইজ্ঞান অবলুপ্ত হয় ॥=(৫)

পুষ্কর আবর্ত্ত বংশ বিদিত ভুবন।
তুমি তার বংশধর, ওহে মহাত্মন্!
প্রকৃতি পুরুষ মেঘ কামরূপ-ধর!
ভাগ্য দোষে প্রিয়া মোর অতি দূরান্তর ॥
ভিক্ষার্থী আজিকে তাই তোমার সকাশে।
প্রার্থনা উচিত সদা গুণীজন পাশে ॥
মহতের বিমুখতা তবু সহনীয়।
অধমেতে লব্ধকাম নহে বরনীয় ॥=(৬)

তাপিত শরণ তুমি হে পয়োদ বর!
ধনপতি কোপে পাই দুর্দ্দশা বিস্তর ॥
সমাচার লয়ে মোর প্রিয়া পাশে যাও।
মরম যাতনা হতে তাহারে বাঁচাও ॥
ধনবান যক্ষগণ বাস করে যথা।
অলকা নগরী নাম যাইবে হে তথা ॥
পুরীর বাহিরে এক আছয়ে উদ্যান।
চন্দ্রমৌলি মহাদেব তথা রত-ধ্যান ॥
ললাট চন্দ্রিকা হতে জ্যোৎস্না ধারা ক্ষরে।
সৌধ কিরিটিনী পুরী তাহে স্নান করে ॥=(৭)

নিত্যপুষ্প তরু সেথা, উন্মাদ ভ্রমর।
কুসুমের মধুপানে নিয়ত মুখর ॥
সরোবর নিত্যপদ্মা মরাল-মেখলা।
ভবন-কলাপী-নিত্য কলাপ-উজ্জ্বলা ॥
কেকারবে তারা সদা উৎকণ্ঠিত রয়।
নিত্য জ্যোৎস্না তমোনাশে প্রদোষ সময় ॥
=(৮)

পবন সরণী ধরি চলিবে যখন।
পথিক বনিতা সবে করিবে ঈক্ষণ ॥
সরায়ে অলকাবলী হতে পদ্মানন।
লভিবে আশ্বাস তারা প্রিয় আগমণ ॥
মম হেন পরাধীন ভিন্ন কোন্ জন!
করয়ে উপেক্ষা বল প্রিয়া হেন ধন!=(৯)

তব অনুকূলে বায়ু মন্দ মন্দ ধায়।
বামেতে চাতক অই স্বুমধুর গায় ॥
গর্ভাধান অভিলাষী বলাকার দল।
আকাশে রচনা করে স্বুচারু শৃঙ্খল ॥=(১০)

শ্রুতি সুখকর তব নিনাদ সময় ।
উঠিবে মহীরচ্ছত্র উচ্ছিলীন্ধ্র চয় ॥
সে রবে মরালদল হবে মোদমান ।
মানস সরসী জলে করিবে পয়ান ॥
পাথেয় মৃণালখণ্ড লয়ে মুখে সবে ।
তব সঙ্গে কৈলাস অবধি যাবে নভে ॥ (১১)

ওহে মেঘ পুরোবর্ত্তী এই উচ্চ নগ ।
বন্দ্যনীয় রঘুপতি পদাঙ্কে সুভগ ॥
ইনি তব প্রিয় বন্ধু দিয়ে আলিঙ্গন ।
যথা সমাদরে কর প্রিয় সম্ভাষণ ॥
কালে কালে সংযোগে বন্ধুতা বাড়ে ভারি ।
বিরহান্তে তাই ত্যাগ করে বাষ্প করি ॥ (১২)

একমাত্র পত্নী মোর তব ভ্রাতৃপ্রিয়া ।
হরিতেছে এবে কাল দিবস গণিয়া ॥
দেখিতে তাহারে মেঘ পাইবে নিশ্চয় ।
মোর আশে বেঁচে আছে বাঁধিয়ে হৃদয় ॥
কুসুমের মত মৃদু নারীদের হিয়া ।
বিরহ ব্যথায় পড়ে অচিরে ভাঙ্গিয়া ॥
অবাধ গতিতে মেঘ যাত্রা কর ত্বরা ।
ভাবিয়া সে অবলায় নিতান্ত কাতরা ॥ (১৩)

শুনহে জলদ ! এবে বলি বিবরণ ।
যে মার্গ তোমার যোগ্য যাত্রার কারণ ॥
তারপর প্রেরণীয় মম সমাচার ।
পান করি শ্রুতি পথে হবে আগুসার ॥
পথশ্রমে ক্লান্ত পদ হয়ে জলধর ।
বিশ্রাম লইবে বসি শিখর উপর ॥
বারি বরিষণে যদি তনুক্ষীণ হয় ।
সেবিবে নির্ঝর হতে পরিলঘু পয় ॥ (১৪)

সরস বেতস কুঞ্জে শোভিত অঞ্চল ।
তেয়াগি উত্তর মুখে যাইবে চঞ্চল ॥
পথি মাঝে দিকনাগে উর্দ্ধে শুঁড় তুলি ।
ধরিতে তোমায় মেঘ হইবে ব্যাকুলি ॥
এড়াইবে সে সংঘাত নিজ বুদ্ধি বলে ।
তোমার উৎসাহ হেরি সিদ্ধাঙ্গনা দলে ॥
মুগ্ধনেত্রে ভাবিবেক সচকিত মনে ।
হরিতেছে গিরিশৃঙ্গ বুঝি বা পবনে ॥ (১৫)

অই হের পুরোভাগে বল্মীকের পরে ।
তোমার গমন বার্ত্তা ঘোষণার তরে ॥
রত্নরাজি প্রভাময় হাসে ইন্দ্রধনু ।
সাজাইতে জলধর তব শ্যাম-তনু ॥
ধরিবে অপূর্ব্ব রূপ যথা শ্যামরায় ।
চূড়াতে কলাপ পরি ব্রজে শোভা পায় ॥ (১৬)

তোমার আয়ত্তাধীন কৃষি কাজ যত ।
জনপদ বধূগণ জানে রীতি মত ॥
জানেনা ভ্রূলীলা ছলা, প্রীতি স্নিগ্ধ মনে ।
তোমারে করিবে পান নয়নের কোণে ॥
মালভূমি ব্যাপী যত আছে ক্ষেত্র চয় ।
সদ্য হল-কর্ষণেতে সোঁদাগন্ধ ময় ॥
সেখানে পশ্চিম মুখে কিছুদূর গিয়া ।
লঘুগতি যাবে পুনঃ উত্তর হইয়া ॥ (১৭)

আম্রকূটে বসি করো পথশ্রম দূর ।
সে অদ্রি তোমার পাশে কৃতজ্ঞ প্রচুর ॥
সেখানেতে দাবানল করিলে দমন ।
বরষিয়া জলধারা ওহে মহামন !
মহতের কাছে বন্ধু কৃত বরণীয় ।
সে কথা ভাষায় কভু নহে বর্ণনীয় ॥
হইলেও ক্ষুদ্রজন স্মরি উপকার ।
বন্ধুরে আশ্রয়দানে না করে বিচার ॥ (১৮)

প্রান্তদেশ সমাচ্ছন্ন আম্রের কাননে ।
শোভে বৃক্ষ পক্ক ফলে পাণ্ডুর বরণে ॥
বসিবে শিখরে যবে স্নিগ্ধ বেণী প্রায় ।
অমর মিথুনে সবে নিরখিবে তায় ॥
যেন ধরা সুন্দরীর শ্যামল চুচুক ।
পাণ্ডুর বিস্তার সহ রয়েছে উন্মুখ ॥ (১৯)

বনচর বধূদের ভুক্তকুঞ্জ বনে ।
ক্ষণেক বর্ষিবে বারি মৃদুমন্দ স্বনে ॥

তারপর দ্রুতবেগে করিবে হে গতি।
বিন্ধ্যগিরি পাদদেশে যথা রেবা সতী॥
বিস্তর উপল মাঝে শীর্ণভাব গত।
ভক্তিভরে বিচিত্রিত গজ অঙ্গ মত ॥ (২০)
বমন করিয়া বৃষ্টি, ওহে নব ঘন!
অন্তঃসার শূন্য যদি হও সেইক্ষণ ॥
পবন তোমারে লঘু তুলার মতন।
উড়াইয়া লয়ে যাবে যেথা চায় মন ॥
অঙ্গপুষ্টি লাগি কিছু পান করি লবে।
রেবার সুপেয় নীর বাসিত সৌরভে ॥
বনগজ মদস্রাব সে স্রোতে গলিত।
জম্বু কুঞ্জ পরিস্রুত হেতু দেহ-হিত ॥
পূর্ণতায় বৃদ্ধি করি গুরুত্ব প্রথমে।
উপক্রমী হয়ো মেঘ পথ অতিক্রমে ॥ (২১)

কচ্ছভূমে কন্দলীর প্রথম মুকুল।
সুখেতে চর্ব্বনরত সারঙ্গের কুল ॥
হেরিবে অদূরে নব অর্দ্ধ বিকশিত।
কদম্ব-কেশর বর্ণ কপিশ-হরিত ॥
অরণ্যের সোঁদাগন্ধ আঘ্রান করিয়া।
ছুটিবে তোমার আগে মাতাল হইয়া ॥ (২২)
জলবিন্দু গ্রহণেতে চাতক চতুর।
হেরিয়া তোমায় নভে আনন্দ প্রচুর ॥
অতৃপ্ত নয়নে তারা দেখিবে তোমায়।
বলাকা চলিবে নভে কিবা শৃঙ্খলায় ॥
শ্রেণীবদ্ধ তার সংখ্যা গুণিতে গুণিতে।
চলিবে সুরঙ্গে মেঘ গম্ভীর ধ্বনিতে ॥
শঙ্কিতা তোমার রবে সিদ্ধাঙ্গনা যত।
বেপথু বাহুতে বাঁধে প্রিয়ে দৃঢ় মত ॥
প্রিয়া আলিঙ্গনে হৃষ্ট সেই সিদ্ধগণ।
কৃতজ্ঞতা মানিবেক তোমার সদন ॥ (২৩)

যদি ও উৎগ্রীব সখে প্রিয় কার্য্যে মম।
দ্রুতগতি চলিবার করিছ উদ্যম ॥
পর্ব্বতে-পর্ব্বতে তবু কালক্ষেপ হবে।
প্রস্ফুটিত ককুভের মোদিত সৌরভে ॥

স্বাগত করিবে মেঘ! কলাপীরা সবে।
শুক্লাপাঙ্গ সজল নয়নে কেকারবে ॥
সে সবার অনুরোধ অবহেলা করি।
কেমনে চলিবে বলো স্বীয় মার্গ ধরি ॥ (২৪)
দশার্ণ দেশেতে যবে হবে উপনীত।
সঙ্গী তব হংসগুলি তোমার সহিত ॥
করিবে বিশ্রাম সেথা দিন কতিপয়।
ওদিকে পাকিবে বনে শ্যাম জম্বুচয় ॥
কণ্টকী কেতকী ফুল বেড়া প্রান্ত ভরি।
ফুটিবে গৌরবে মুখে পাণ্ডুরাগ ধরি ॥
গ্রাম্য চৈত্যে গৃহবলীভূক পক্ষী সব।
নীড় রচনায় মাতি করে কলরব ॥ (২৫)

সেই সব দৃশ্য মেঘ দেখিতে দেখিতে।
আসিবে বিখ্যাত পুরী বিদিশা চকিতে ॥
রাজধানী গিয়া পাবে সদ্য সদ্য ফল।
কামুকের কাম্য যত লব্ধ অবিকল ॥
প্রান্ত দিয়ে কুলুকুলু বেত্রবতী ধায়।
সুস্বাদু সে জলধারা পান করো তায় ॥
সে চলোর্ম্মি স্রোতস্বিনী মুখপদ্মে তারি ॥
ভ্রূভঙ্গী বিলাস খেলে অতি চমৎকারী ॥ (২৬)
নীচৈ নামে গিরি এক আছয়ে তথায়।
বিশ্রাম লইবে বসি তাহার মাথায় ॥
তব আগে প্রস্ফুটিত প্রৌঢ় নীপদল।
তোমার পরশে হবে পুলক চঞ্চল ॥
শিলা কাটি গুহা তথা হয়েছে রচনা।
উদ্দাম নাগর যায় সহ বারাঙ্গনা ॥
গুহাতল পরিলিপ্ত রতি পরিমলে।
যৌবন সম্ভোগ কথা ব্যক্ত সেই ছলে ॥ (২৭)

বিশ্রামান্তে যাইবে হে বননদী তীরে।
উদ্যানে যূথিকাজালে জল দিবে ধীরে ॥
সে মালঞ্চে কমলের কুণ্ডল-ধারিণী।
স্বেদসিক্ত গণ্ডস্থল অনেক মালিনী ॥
যূথিকা চয়ন করি পরিশ্রান্ত হয়।
তাহাদের প্রতি তুমি হইবে সদয় ॥

ছায়াপাত অছিলায় পুষ্পাবলী মুখে।
ক্ষণ পরিচিত হয়ে চলি যাবে সুখে ॥ (২৮)

যদিও উত্তর থেকে যেতে হবে ঘুরে।
তথাপিও যেও মেঘ উজ্জয়িনী পুরে।
সৌধের উৎসঙ্গ প্রেমে হয়োনা বিমুখ।
পুরাঙ্গনা পাশে পাবে লোলাপাঙ্গ সুখ ॥
বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত সে চাহনি চকিত।
না হেরি নয়নে যেন করোনা বঞ্চিত ॥ (২৯)

হেরিবে নির্বিন্ধ্যা নদী। বীচিমালা পরে;
মুখর বিহগ সারি অঙ্গবাস ধরে ॥
স্রোতবেগে আলুথালু সে চারু বসন।
স্খলিত হয়েছে তার নাভি আবরণ ॥
বিভ্রমেতে যেন বালা জানায় প্রণয়।
নামিও তাহার জলে হবে রসময় ॥ (৩০)

বেণীর আকারে ক্ষীণ বহে জলধার।
তট তরু জীর্ণপত্র পড়ি অনিবার ॥
মনোহর অঙ্গ তার পাণ্ডু রাগ ধরে।
তোমার বিরহ চিহ্ন প্রকাশিত করে ॥
তটিনীর কৃশদেহে আনিবে জীবন।
ভাগ্যবান পয়োধর! তব দরশন ॥ (৩১)

অনন্তর অবন্তীতে করিবে হে গতি।
যেই পুরী কবিকৃত যশে ঋদ্ধিমতী ॥
উদয়ন কথা লয়ে গরিমার ধাম।
•বিশালা শ্রীশালী বলি কি বিশালা নাম ॥
নিজ পুণ্যবলে যারা দিব্যলোকে যায়।
পুণ্যশেষে আর তথা থাকিতে না পায় ॥
তাই বুঝি খণ্ড চারু করি তার চুরি।
ধরাধামে বসাইলা উজ্জয়িনী পুরী ॥ (৩২)

বিকচ কমল গন্ধ অঙ্গময় মেখে।
উঠেছে শীতল বায়ু শিপ্রানদী থেকে ॥
প্রভাত সময়ে কিবা ধীরে ধীরে ধায়।
সারসের মদকল দূরে লয়ে যায় ॥
সুরতান্তে চাটুকার নায়ক যেমন।
কামিনীর শ্রমহরে করিয়া ব্যজন ॥
সেইরূপ প্রাতে বায়ু করি ঝুর ঝুর।
করিতেছে নারীদের রতিখেদ দূর ॥ (৩৩)

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ওহে জলধর।
পোষণ করিতে যদি চাহ কলেবর ॥
নবীন ললনা গণ উজ্জয়িনী পুরে।
নানা গন্ধ ধূপদেয় চিকণ চিকুরে ॥
গবাক্ষে করিয়া গতি সে ধূম সেবিবে।
ললিত-বনিতা-পদ-চিহ্ন নিরখিবে ॥
কুসুম সুরভীযুত হর্ম্ম্য সৌধোপর।
গৃহশিখী প্রীতিভরে হবে নৃত্য পর ॥ (৩৪)

চণ্ডেশ্বর নিকেতনে করিলে গমন।
তব পুণ্যদেহ নিরখিবে শিবগণ ॥
নীলতনু তব, নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-প্রায়।
প্রভু প্রভা সমাদরে দেখিবে হে তায় ॥
কুবলয় গন্ধে আমোদিত গন্ধবতী।
জলকেলি করে তথা যতেক যুবতী ॥
সেই সুরভিতে বায়ু একে বিমোহন।
আরো তাহে গন্ধ গন্ধে কাঁপে কুঞ্জবন ॥ (৩৫)

মহাকাল মন্দিরেতে হয়ে উপনীত।
প্রদোষ অবধি তথা হবে অবস্থিত ॥
প্রদোষে প্রমথপতি আরতির ক্ষণে।
অতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত পট স্বনে ॥
তোমার গম্ভীর স্বরে হবে অবিকল।
পাইবে তাহার ফল গর্জ্জন সফল ॥ (৩৬)

নৃত্যতাল পদন্যাসে দেবদাসীগণ।
নিতম্বের চন্দ্রহারে তুলিবে নিক্কণ ॥
রতন মণ্ডিত দণ্ড চামর সুন্দর।
ঢুলাইয়া সাবলীলে হবে ক্লান্ত-কর ॥
অবশ হাতের নখ-ক্ষত বেদনাতে ॥
নব বরষার তব জলবিন্দু পাতে ॥
হইবে পরম তুষ্ট দিবে উপহার।
মধুকর-শ্রেণী-দীর্ঘ কটাক্ষ-সম্ভার ॥ (৩৭)

সান্ধ্যতেজে নবজবা রক্তরাগ শোভা।
ধরিবে হে কলেবরে অতি মনোলোভা॥
অনন্তর পশুপতি নৃত্যকালে যবে।
শত শত বাহু মেলি অভিলাষী হবে॥
পাইবারে প্রিয় তাঁর আর্দ্র নাগাজিন।
নিজ দেহ করো মেঘ শিব-বাহুলীন॥
ভব প্রতি ভক্তি ভঙ্গীযুক্ত তব কায়া।
হেরিবেন স্তিমিত নয়নে ভবজায়া॥ (৩৮)

যেখানে সঙ্কেত স্থানে রজনী সময়॥
নরপতি পথে যায় ভাবিনী নিচয়॥
দেখিতে না পায় পথ তিমির ঘটায়।
দেখাইও দামিনীর কনক ছটায়॥
বরষিয়ে বারিধারা গুরু গরজনে।
কাতর করোনা সেই বিলাসিনী গণে॥ (৩৯)

সৌধোপরি কপোত বড়ভী শোভা পায়।
সুপ্ত পারাবত সহ নিদ্রা গিয়ে তায়॥
প্রভাত সময়ে শীঘ্র করিবে গমন।
তোমার বিরহে খিন্ন সৌদামিনী গণ॥
তুমি থাক নানা রসে ব্যস্ত নানা স্থানে।
হেন রীতি কেমনেতে সবে তারা প্রাণে॥
বিশেষতঃ বন্ধু কার্য্য করিয়া গ্রহণ।
বল কেবা অন্যমত করে সুভাজন॥ (৪০)

উষায় গৃহেতে ফিরি প্রণয়ির দল।
মুছাবে খণ্ডিতাননে নয়নের জল॥
কমলের দল হতে শিশিরের দাগে।
তুলিবেন ত্বরা আসি তপন সোহাগে॥
সে সময় রবি তেজে করোনা আটক।
ওহে মেঘ! কিবা কাজ দ্বেষে অনর্থক॥ (৪১)

তোয় সুধা গম্ভীরার করে ঢল ঢল।
প্রসন্ন হৃদয় যেন স্বচ্ছ সুবিমল॥
অভিলাষী ধরিবারে বক্ষে আপনার।
স্বভাব সুন্দর ছায়া পয়োদ তোমার॥
তার জলে খেলা করে শফরী চঞ্চল।
মনোহর কান্তি যেন কুমুদ ধবল॥
আঁখি ভরি সেই রূপ লয়ে প্রবাহিনী।
হানিবে কটাক্ষশর মরম দাহিনী॥
আর কি সংযম সাজে, ওহে জলধর!
ধরা দিয়ে জয় করো কোমল অন্তর॥ (৪২)

বেতসের শাখা ঝুলে দুই তট ভরি।
সুনীল বসনা নদী দুই হাতে ধরি॥
নিতম্ব ঢাকিতে করে মৃদু আকর্ষণ।
বৃথাই প্রয়াস তার থাকে না বসন॥
বিবসনা জঘনার সে মোহিনী টান।
পারিবে কি উপেক্ষিতে মেঘ লম্বমান? (৪৩)

যাইবে যখন তুমি দেবগিরি ধাম।
মন্দ মন্দ সমীরণে পাইবে আরাম॥
বসুধায় গন্ধ জাগে বারি বরিষণে।
মাতঙ্গে অনিল পান করে গুরু স্বনে॥
কাননেতে উডুম্বর পরিণত হয়।
শীতল বাতাসে পাকে কিবা রসময়॥ (৪৪)

সদা তথা বিরাজিত স্কন্দদেব রন।
পুষ্পমেঘী হইবেক করিয়া যতন॥
আকাশ গঙ্গায় স্নান করি সমাপন।
পুষ্পবৃষ্টি সহ তাঁরে করিবে ভজন॥
বাসব বাহিনী রক্ষা কারণে শঙ্কর।
সূর্য্য সম জ্যোতির্ম্ময় তেজ ভয়ঙ্কর॥
হুতাসনে অর্ঘ্যরূপে করি সমর্পণ!
সৃজিলেন স্কন্দদেবে সন্তান আপন॥ (৪৫)

তারপর গুরুগুরু স্বনন্ করিবে।
অদ্রিগণ শুনি যাহে প্রতিধ্বনি দিবে॥
পাবকী কলাপী রঙ্গে হবে নৃত্যপর।
হর-শির-চন্দ্রালোক-ধৌত-দৃষ্টি-ধর॥
স্খলিত কলাপ যার শ্রবণ কমলে।
ধরেন ভবানী যত্নে পুত্রস্নেহে গলে॥ (৪৬)
শরবন-ভব-দেবে আরাধনা সারি।
চলিবে আকাশ পথে যবে তাড়াতাড়ি।

সিদ্ধ মিথুনের দল জলকণা ভয়ে।
বীণাসহ পলাইবে ত্রস্ত-পদ হয়ে॥
চর্ম্মণ্বতি নদী হেরি জলস্পর্শ আশে।
নামিয়া আসিবে মেঘ সেই অবকাশে॥
রন্তিদেব কীর্ত্তি সেই করিবে প্রণতি।
সুরভি-তনয়া লহ-মূর্ত্ত-স্রোতস্বতী॥ (৪৭)

শার্ঙ্গপাণি শ্রীবিষ্ণুর ওহে বর্ণ চোর।
নামিবে জলেতে যবে হয়ে ভক্তিভোর॥
দূর হতে ব্যোমচারী সে পৃথু সরিতে।
হেরিবে মুক্তা মালা বসুধার চিতে॥
সেই সূক্ষ্ম হার মাঝে তব অবস্থান।
ইন্দ্রনীল মণিসম হবে দৃশ্যমান॥ (৪৮)

নদী ত্যাগি দশপুরে যবে উত্তরিবে।
মুগ্ধনেত্রে বধূগণ তোমারে হেরিবে॥
জনেজনে পরিচিতা ভ্রূলতা লীলার।
চটুল নয়ন পক্ষ্ম তোলে বার বার॥
শ্বেতক্ষেত্র মাঝে কৃষ্ণ তারকার শোভা।
কুন্দ কুসুমেতে যেন মুগ্ধ মধুলোভা॥
কটাক্ষের শরভরা সে ভ্রমর দলে।
হানিলে উন্মত্তে ছোটে অতি কুতূহলে॥
দশপুর বধূকুলে হবে দর্শনীয়।
দর্শক হয়োনা কভু ওহে রমণীয়! (৪৯)

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে মেঘ করি ছায়াদান।
রণভূমি কুরুক্ষেত্রে করিবে পয়ান॥
সেখানে কৌরব সনে পাণ্ডবের রণ।
ক্ষত্রকুল অন্তঃকারী ঘটেছে ভীষণ॥
প্রফুল্ল কমলদলে বারিধারা প্রায়।
অর্জুন গাণ্ডীবধন্বা রাজন্যের গায়॥
শতশত শরক্ষেপে করিল জর্জ্জর।
হেরিবে সেখানে তার চিহ্ন বহুতর॥ (৫০)

যদিও অসিতবর্ণ তুমি বারিধর।
সরস্বতী * জলে হবে বিমল অন্তর॥
যার তীরে বান্ধব প্রণয়ে হলধর।
তপ আচরিল ঘোর ত্যজিয়ে সমর॥
রেবতীর আঁখি বিভাসিত কাদম্বরী।
এক চসকেতে পান পরিহার করি॥
অঞ্জলি ফলকে সেই সরস্বতী নীর।
পানে কুতূহলী হইলেন হলী বীর॥ (৫১)

পরিহরি ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ অনন্তর
কনখল ♣ দেশে গঙ্গা পাবে পয়োধর॥
শৈলরাজ অবতীর্ণা জাহ্নবীর বেণী।
সগর বংশের স্বর্গ সোপানের শ্রেণী॥
ফেনছলে হাসি হর জটা আকর্ষণে॥
ভ্রূকুটি রচেন সতী সতিনী বদনে॥
আর নিজ তরল তরঙ্গ রূপ করে
পরশেন শিব শির শোভী শশধরে॥ (৫২)

জাহ্নবীর নীর যেন স্ফটিক বিমল।
এই মনে করি পান হেতু সেই জল॥
নামিয়া পড়িলে তুমি ত্যজিয়া আকাশ।
সুরেশের গজ সম পাইবে প্রকাশ॥
অথবা যেখানে নাই যমুনা সঙ্গম।
সেখানে হইবে সেই শোভা মনোরম॥ (৫৩)

* ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে এইক্ষণে সরস্বতী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ ব্রহ্মাবর্ত্তের আধুনিক সময়ের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রকৃত সরস্বতী বহুদিন হইল বিলুপ্ত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের বর্ত্তমান নাম পানীপথ অর্থাৎ পানীয় পতিত; ইহাতেই সরস্বতীর এক সময়ে আবির্ভাব ছিল—এমন প্রমাণ প্রাপ্তি হইতেছে।

♣ বর্ত্তমানে কনখল হরিদ্বারের একক্রোশ পূর্ব্বে গঙ্গা ও নীলধারার সংযোগ স্থলে একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এক সময়ে কনখলের পরিসর বহু বিস্তৃত ছিল। পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞের এই স্থানে অনুষ্ঠান হয়। লিঙ্গ পুরাণের মতে কনখল গঙ্গা ধারার সমীপবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত।

জাহ্নবী জনম স্থান সেই হিমালয়।
শ্রম দূরে যাবে তথা পাইলে উদয়॥
উপবিষ্ট হেতু তথা কুরঙ্গ নিচয়।
সুরভিত শিলাতল মৃগমদ ময়॥
তুষারে তুষার গিরি ধবল উজ্জ্বল।
তার শৃঙ্গে হবে তব শোভা সুবিমল॥
যেন বৃষেশের বৃষ বিষাণে খুঁড়িয়ে।
ধরিয়াছে পঙ্ক রাশি মস্তক জুড়িয়ে॥ (৫৪)

প্রচণ্ড পবনে ঘরষিত শাখা দল।
তাহাতে সরল বৃক্ষে * উদিত অনল॥
লাগিয়ে সে হুতাশন চামরী চামরে।
বিশাল মশাল হেন দিগ্‌দাহ করে॥
সেই দাবদাহে যদি গিরি হিমালয়।
ঘোরতর তপ্ত তাপে তপ্ত তনু হয়॥
সহস্র সহস্র ধারা বরষি তখন।
নির্ব্বাণ করিও সেই বিষম দহন॥
সাধুদের সম্পদের এই ত উদ্দেশ।
হরণ করণে যত বিপন্নের ক্লেশ॥ (৫৫)

তবোদয়ে হিমালয়ে হবে ঘোর রব।
সে রবে শরভে † হবে মদ সমুদ্ভব॥
বলদর্পে তোমার লঙ্ঘন অভিলাষ!
করকা বরষি তুমি প্রকাশিবে হাস॥
গর্ব্ব খর্ব্ব আর অঙ্গ ভঙ্গ হবে তায়।
বৃথা আকুঞ্চনে কেবা পরাভব পায়॥ (৫৬)

চন্দ্রচূড় চারু চরণের চিহ্ন রেখা।
হে নীরদ! সেই শিলাতলে আছে লেখা।
যেই চিহ্ন উপহারে পূজে সিদ্ধগণে।
প্রদক্ষিণ করো তারে ভক্তি নম্র মনে॥
হে পদাঙ্ক দরশনে পাপ পরিগত।
কল্পান্তে শিবত্ব লাভ করে ভক্ত যত॥ (৫৭)

মুরজ মৃদঙ্গ রবে কিন্নর নিকর।
ত্রিপুর বিজয় গীত গায় নিরন্তর॥
কন্দরে যখন তব প্রতিধ্বনি হবে।
কীচকে পূরিলে বায়ু সুমধুর রবে॥
সঙ্গীত হইবে যেন ত্রিপুর সম্বাদ;
বাজাবে মুরজ বাদ্য তোমার নিনাদ॥ (৫৮)

হিমালয় উপতটে গিরি নদীগণ।
অতিক্রম করি পরে করিতে গমন॥
ভৃগুরাম কীর্ত্তি ক্রৌঞ্চরন্ধ্র†† শোভা করে।
সেই রন্ধ্র দিয়া তুমি যাইবে উত্তরে॥
পরশু আঘাতে হলো সে পথ প্রকাশ।
সেই পথ হয়ে যায় মরাল সঙ্কাশ॥
বলি দমনার্থ যথা বামনের পদ।
সেরূপ সে পথে তুমি শোভিবে বিষদ॥ (৫৯)

* সরল বৃক্ষ অতি ঋজুভাবে তুষারাবৃত প্রোচ্চ পর্ব্বত শেখরে জন্মে। ইহার উদ্ভিদ তত্ত্ব ঘটিত নাম Pinus Longifolia. কোন অনভিজ্ঞ বাঙ্গালা কোষকার সরল শব্দে শাল বৃক্ষ লিখিয়াছেন। শালবৃক্ষের সহিত সরল বৃক্ষের কোন বিষয়ে ঐক্য নাই। শাল এবং সরল যে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ তাহা বাল্মিকী রচিত গঙ্গাস্তোত্রে প্রকাশ পাইতেছে।

† মৃগ জাতি বিশেষ।

‡ মুরজ—মৃদঙ্গ ভেদ হইতে পারে। যেহেতু মুরজ ফলা পনস বৃক্ষের নাম। কাঁঠালের আকৃতি মৃদঙ্গ তুল্য।

†† ক্রৌঞ্চরন্ধ্র—ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাইবার অন্যতম পথ। এই গিরিবর্ত্ম অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

যার মূল শ্লথীভূত দশমুখ করে ।*
উদয় হইবে হেন কৈলাস শিখরে ॥
ত্রিদশ বনিতা বৃন্দ মোহন দর্পণে ।
অতিথি হইও নিরছায়া সমর্পণে ॥
কুমুদ সদৃশ শুভ্র প্রকাশে কৈলাস ।
যেন দশদিশি ভরি শম্ভু অট্টহাস ॥ (৬০)

দ্বিরদ রদন নিভ কৈলাস শেখর ।
তুমি তাহে প্রকাশ পাইলে অম্বুধর ॥
তবদেহ যেন স্নিগ্ধ দলিত অঞ্জন ।
একচক্ষে নিরখিবে যতজন গণ ॥
এই মনে করি যেন নীল পট্টবাস ।
হলধর স্কন্ধে শোভা করিল প্রকাশ । (৬১)

ভুজঙ্গ বলয় শূন্য পতিকর ধরি ।
ক্রীড়া শৈলোপরে যদি ভ্রমেন শঙ্করী
তাঁর পদ স্পর্শ সুখ প্রাপন কারণ ।
দেহস্থিত বারিবেগ করিয়ে স্তম্ভন ॥

বাঁকাইয়ে নিজ তনু ভক্তি ভঙ্গি ছলে ।
পড়িবে সোপান হয়ে গৌরী পদতলে ॥ (৬২)

সুরবালা বালা বিজড়িত হীরাহারে ।
বমন করিবে বারি তাহার প্রহারে ॥
তাহাতে ঘটিবে তব অপরূপ রূপ ।
হবে সে ললনাদলে জলযন্ত্র রূপ ॥
অঙ্গ সঙ্গ হেতু যদি গ্রীষ্ম বোধ হয় ।
গরজিয়ে বালা বৃন্দে দেখাইও ভয় ॥ (৬৩)

স্বর্ণ শতদল যুত মানসের জল ।৬৪
পান করি বহিবে হে সমীর শীতল ॥
উড়াইয়ে দিও কল্পতরু স্থিত কেতু ।
অনন্তর ঐরাবত প্রীতি বৃদ্ধি হেতু ॥
নীলচেলী সমাসৌম্য শরীর তোমার ।
ক্ষণকাল তার মুখে করিও বিস্তার ॥
ছায়াশূন্য স্ফটিক সদৃশ গিরিবরে ।
হে পয়োদ ! প্রবেশ করিও তার পরে (৬৪)

* Quotation from the Ramayana.

উত্তরমেঘ

কামুক কৈলাস কোলে অলকা সুন্দরী ।
জানিতে পারিবে তারে নিরীক্ষণ করি ॥
নিতম্বে স্খলিত তার গঙ্গারূপ শাটী ।
হইয়াছে তাহে কিবা শোভা পরিপাটি ॥
অম্বুদ অলকাজাল অলকার ভালে ।
কামিনী-কবরী যেন বেড়া-মুক্তাজালে ॥ (৬৫)

আর তব ইন্দ্র ধনু ভূষণ সমান ।
সুবিচিত্র নানা চিত্র তথা বিদ্যমান ॥
আর যথা তব অঙ্গে নানা রঙ্গসাজে ।
সেরূপ বিবিধ নিধি তথায় বিরাজে ॥
আর তব দৃশ স্নিগ্ধ গম্ভীর নিস্বনে ।
হতেছে সঙ্গীত বাদ্য অমর ভবনে ॥ (৬৬)

দেখিবে হে মেঘ সেই অলকা নগরে ।
তব সম যথা সুরপুর পরিকরে ॥
বিরাজিত সুরূপসী সুরবালাগণ ।
তব প্রিয়া সৌদামিনী স্বরূপ লক্ষণ ॥

করকমলেতে শোভে লীলা শতদল ।
নবকুন্দ কল গাথা অলক কুন্তল ॥
লোধ্র কুসুমের রজে ভূষিত আনন ।
কবরী কলিত কুরুবকে বিমোহন ॥

কোমল শিরীষ যুগ শ্রুতিমূলে দোলে !
সুশোভিত নব নীপ সীমন্তের কোলে* ।।(৬৭)
যথা সিত মণিময় রম্য হর্ম্ম্য চয় ।
নক্ষত্র স্বরূপ নানা কুসুম উদয় ।।
যক্ষগণ সঙ্গে লয়ে সুচারু তরুনী ।
পান করে কল্পতরু প্রসূত বারুণী ।।
রতিরস বৃদ্ধি তাহে গীত বাদ্য সহ ।
গুরু গরজন যেন করে বারিবহ ।। (৬৮)
যথা ভানূদয়ে প্রকাশিত সেই পথ ।
যে পথে নিশায় নারী সাধে মনোরথ ।।
করিতে চঞ্চল পদে তথা গতায়াত ।
পতিত কবরী হতে পুষ্প পারিজাত ।।
কর্ণ থেকে পড়িয়াছে কনক কমল !
স্তনভরে হার ছিঁড়ে ভ্রষ্ট মুক্তাফল ।।
কোথা বা পতিত কেশগুচ্ছ ছিন্ন হয়ে ।
জানিবে অলকাপুরী এই চিহ্ন চয়ে ।। (৬৯)
যথা বক্ষ স্বেচ্ছাধীন অনভৃত করে ।
নীবিবন্ধ শ্লথ করি প্রিয়াবাস হরে ।।
নিবিড় নিতম্বাধরা ললনা নিচয় ।
লজ্জা ভয়ে কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান শূন্য হয় ।।
পুরোভাগে রত্নদীপ জলে ধক্ ধক্ ।
*তাহে চূর্ণ মুষ্টিক্ষেপ করে অনর্থক ।। (৭০)
তোমার সদৃশ যথা জলধর কত ।
উর্দ্ধগামী সমীরণে হয়ে সমুদ্গত ।।
অট্টালিকা উপরেতে করি আরোহণ ।
খণ্ড খণ্ড হয়ে করে বিন্দু বরিষণ ।।
ভিত্তিস্থিত চিত্রচয়ে দোষ ঘটে তায় ।
ধূম প্রায় তাই ভয়ে গবাক্ষে পলায় ।। (৭১)
যথা প্রিয়তম ভুজে হয়ে উত্থাপিতা ।
আলিঙ্গিতা বরবালা বিনোদে ব্যথিতা ।।
তোমার অভাবে স্নিগ্ধ সুধাকর করে ।
সুরত জনিত সেই গ্লানি দূর করে ।।
শান্ত হয় চন্দ্রকান্ত† রস পরশিয়া ।
অথবা বেদনা হরে দোলায় বসিয়া ।। (৭২)
যথা ধনেশের সখা মহেশের ডরে ।
ভৃঙ্গ শ্রেণী গুণ ধনু অতনু না ধরে ।।
কেবল কামিনী কুল বিলাস বিভ্রমে ।
মদনের মনোরথ সিদ্ধ যথাক্রমে ।।
ভুরুচাপ কটাক্ষে কামের খরশর ।
কেমনে পাইবে ত্রান কামুক নিকর ।। (৭৩)

---

* এই কবিতায় মহাকবি ষড়ঋতু জাত ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :— পদ্ম, কুন্দ, লোধ্র, কুরুবক, শিরীষ এবং নীপ। পদ্ম শারদীয়, কুন্দ হৈমন্তিক ; লোধ্র শিশির সাময়িক ; কুরুবক বাসন্তীয় ; শিরীষ নৈদাঘ কালীয় এবং নীপ প্রাবৃষেণ্য। ইহাতে নিসর্গের বিরোধ উৎপত্তি হইতে পারে ; এক ঋতু প্রভাব সময়ে ছয় ঋতু জাত বিভিন্ন কুসুম কলাপ সম্ভবে না, কিন্তু অলকাপুরী মনুষ্যলোক নহে। মনুষ্য লোকের নিসর্গ সহ অলকা প্রভৃতি দিব্য লোকের নিসর্গের একতা হইতে পারেনা। মহাকবি মিলটন প্যারাডিস বর্ণনায় এইরূপ নিসর্গ-বিরোধ বর্ণন করিয়াছেন। যথা:—"The rose without thorn" etc ফলতঃ মহাকবিগণ নিসর্গ প্রেমিক হইলেও কখন তাহার অসম্ভাব স্থলে সদ্ভাব সংস্থান করিয়া দেন। সুন্দরী স্ত্রী বর্ণনায় তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ করিয়া থাকেন কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী স্ত্রী কোথায় ?

† এ স্থলে সিতমনি যে শ্বেত মার্ব্বেলের উদ্দেশ্য তাহার আর সন্দেহ নাই। হোরেস হেমান উইলসন মহোদয় এরূপ নিষ্পন্ন করিয়াছেন মার্ব্বেলের সংস্কৃত নাম—রত্নশিলা। মার্ব্বেল প্রস্তরে যে পূর্ব্বে প্রাসাদাদি প্রস্তুত হইত ; ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ উক্ত বহুমূল্য শিলা মধ্য-দেশের বিস্তর পর্ব্বতে পাওয়া যায়।

‡ চন্দ্রকান্ত মণির বর্ত্তমান নাম নির্ণয় করা কঠিন। ডাক্তার কেরী স্বীয় কোষমধ্যে সন্দেহ ক্রমে লিখিয়াছেন ইহা জাসপার (Gasper) হইতে পারে। জাস্পরকে পারস্য প্রভৃতি দেশে য়াস্পিন কহে। কবির লিখন ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে; তাহাতে রস নির্গত হইত। মণি জাতি মধ্যে এবম্প্রকার কোন রত্নআছে কিনা মণিবেত্তাগণের অনুসন্ধেয়।

ধনপতি পুরোত্তরে আমার আগার।
ইন্দ্রধনু প্রায় চারু তোরণ * তাহার ॥
দূরে থেকে দেখিতে পাইবে সেই দ্বার।
পুরোদ্যানে আছে এক কুমার মন্দার ॥
কৃত্রিম তনয় সম পালিলেন প্রিয়া।
করলভ্য গুচ্ছ তার পড়েছে নামিয়া॥ (৭৪)

উপবনে আছে এক বাপী বিদ্যমান।
মরকত মণি বাঁধা তাহার সোপান ॥
তাহে মুকুলিত কত কনক কমল।
বৈদূর্য্য মৃণালে কিবা করে ঢল ঢল ॥
তার নীরে বাসকরে রাজহংস চয়
হে নীরদ ! নিরখিয়ে তোমার উদয় ॥
অদূরেতে মানস সরসী সুপ্রকাশ।
আর কি করিবে তথা যেতে অভিলাষ ॥ (৭৫)

তার তীরে চিত্র গৃহ শোভে মনোহর।
* * ইন্দ্রনীল রত্নে যার রচিত শিখর ॥
চারি ধারে চারু তরু কনক কদলী।
মম প্রেয়সীর সেই অতি প্রিয়স্থলী ॥
তোমার স্বরূপ সেই ক্রীড়া শৈলবর। ‡
সৌদামিনী শোভা ধরে কদলী নিকর ॥ (৭৬)

লোহিত অশোক † সুচঞ্চল নবদলে।
আর আছে কেশর †† শোভিত সেইস্থলে ॥
নিকটে বিলাস গৃহ মাধবী মণ্ডিত।
কুরুবক ‡‡ ঝাড়ে ঘেরা তার চারি ভিত ॥
মম সহ প্রিয়া বাম পদ† একে আশা।
অপরেতে তাঁর মুখ মদিরা পিপাসা ॥ (৭৭)

হেমদণ্ড আছে সেই তরুযুগ মাঝে।
কাঁচা বাঁশ সম মণি মূলে তার সাজে ॥
স্ফটিক ফলক তার অতি শোভাকর।
তব প্রিয় নীলকণ্ঠ কলাপী নিকর ॥
তদুপরি নৃত্য করে দিবা অবসানে।
মম প্রিয়া রণৎকারী বলয়ের তানে ॥ (৭৮)

* ভারতবর্ষে পুরাকালীন অট্টালিকা নিকরে যে অর্দ্ধ অর্কাকার খিলান গ্রথিত হইত; উপরি উক্ত কবিতায় তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে।

** কোন বঙ্গাভিধানে ইন্দ্রনীলের অর্থে পান্না লিখিত আছে। ফলতঃ ইন্দ্রনীল মণি পান্না নহে। মণিকারেরা ইহাকে ফিরোজা কহে। ইহা নির্ম্মল আকাশের ন্যায় নীল বর্ণধর। পান্নার সংস্কৃত নাম মরকত এবং বৈদূর্য্য।

‡ ক্রীড়াশৈল পর্য্যায়ে হড্ডচন্দ্র লেখেন,—"ক্রীড়া শৈলশ্চিত্র গৃহে সুরালিপ্ত গৃহান্তর" ইহাতেই এবম্প্রকার স্থলের প্রয়োজনীয়তা এবং রমণীয়তা অনুভূত হইবে। আধুনিক ইউরোপীয় দিগের ন্যায় পূর্ব্বতন কালে ভারতবর্ষীয় ধনীদিগের প্রমোদবনে এইরূপ কৃত্রিম শৈল সকল ক্রীড়ার্থ সংস্থাপিত হইত, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

† বৃক্ষ রাজ্য মধ্যে শোভাকল্পে অশোকের প্রতিযোগী আর নাই। মহাত্মা স্যর উইলিয়ম জোন্স ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কুসুমিত অশোকের সদৃশ শ্রী আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; যেন বনস্থল আলোকময় করিয়া দেয়। জোন্স সাহেবের নামেই এইক্ষণে ইহা বিখ্যাত হইয়াছে।

†† কেশর শব্দে তিন ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প বৃক্ষকে বুঝায়। যথা নাগকেশর, বকুল পুন্নগা। কবি কোন্ বৃক্ষকে লক্ষ্য করেন, স্থিরী করণ করা দুরূহ, উক্ত তিন কুসুমই কবিজন মনোহর।

‡‡ রক্তঝিণ্টি বা ঝাঁটি বৃক্ষের নাম, ইহা দ্বারা সুন্দর রূপ বৃত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

† সংস্কৃত কাব্যকলা বিলসিত মহাশয়দিগের নিকটে অশোক বৃক্ষে সুন্দরী নারীর বাম চরণাঘাত রূপ দোহদ ক্রিয়ার টিপ্পনী করণের প্রয়োজন নাই, তপভিন্ন অপর সম্প্রদায় কাব্যামোদ-পরায়ণ যুবক গণের প্রতি বিজ্ঞাপ্য এই যে, অশোক বৃক্ষ মঞ্জুরিত না হইলে তৎপ্রতি বরবর্ণিনা দিগের বামপদ স্পর্শরূপ মিষ্ট তিরস্কারের প্রয়োজন হইত।

ওহে সাধু! নিরখিয়া এই চিহ্ন হয়।
নিশ্চয় জানিবে তুলি আমার আলয় ॥
দ্বার পাশে লেখা আছে শঙ্খ শতদল।
আমার বিরহে শোভা শূন্য গৃহস্থল ॥
স্বীয় প্রিয় মিত্র মিত্র অভাবে যেমন।
কমলিনী শোভা কভু না করে ধারণ ॥
প্রিয়াত্রাণ হেতু সেই রম্য সানুপরি। (৭৯)
বসিও হে ক্ষুদ্র করি শিশুরূপ ধরি ॥
তড়িৎ প্রকাশে মৃদু মেলিত নয়নে।
নিরখিবে অঙ্গনারে পতিত অঙ্গনে ॥
নাহিক সে রূপপ্রভা বিরহে আমার।
জ্যোতিরিঙ্গণের শ্রেণী স্বরূপ আকার ॥ (৮০)
হীরকদশনা তন্বী পক্ক বিম্বাধরা।
শ্যামা * মধ্যক্ষামা নিম্ননাভী মনোহরা ॥
চকিত হরিণী প্রায় চঞ্চল নয়না।
নিবিড় নিতম্ব ভরে মন্থর গমনা ॥
স্তনভরে আছে দেহ স্তোক নম্র হয়ে।
বিধিআদ্য সৃষ্টি তিনি যুবতী বিষয়ে ॥ (৮১)
জানিতে পারিবে সেই মিত ভাষিনীরে।
দ্বিতীয় জীবন প্রিয় আমার শরীরে ॥
চির বিরহেতে বালা বিশেষ বিকলা।
নাথহীনা চক্রবাকী যেরূপ চঞ্চলা ॥
শিশির পতনে শীর্ণা যেরূপ নলিনী।
এখন প্রেয়সী মম সেরূপ মলিনী ॥ (৮২)

অনুমানে এই বুঝি ওহে কামচর।
দুর্দ্দিনেতে দীন যথা হন নিশাকর ॥
সেইরূপ ম্লান তাঁর মুখ শশধর।
আলুয়িত সুদীর্ঘ অলক তদুপর ॥
রোদনে রোদনে স্থূল নয়ন যুগল।
চন্দ্রাননে সদা সমর্পিত করতল ॥
অশীতল নিঃশ্বাসে নীরস বিম্বাধর।
হইয়াছে এখন বিভিন্ন বর্ণধর ॥ (৮৩)
এইরূপ অবস্থায় দেখিবে তাহারে।
অথবা ব্যাকুলা বালা পূজার আগারে ॥
অথবা বিরহে মম তনু তনুতর।
লিখিছেন প্রতিকৃতি ফলক উপর ॥
অথবা পিঞ্জর স্থিতা সারিকার প্রতি।
করিছেন এই প্রশ্ন প্রিয়ম্বদা সতী ॥
তুমি লো তাঁহার প্রিয়া ছিলে বিলক্ষণ।
নিভৃতে বসিয়ে তাঁরে স্মর কি এখন? (৮৪)
ওহে সৌম্য! আর এই করি অনুমান।
বিরচিত করি মম নামাঙ্কিত গান ॥
বীণা লয়ে কোলে, প্রিয়া, মদন বিহ্বলে।
মাজিয়ে তাহার তার নয়নের জলে ॥
ব্যাকুলা বনিতা বসি মলিন দুকূলে।
বার বার স্বকৃত মূর্চ্ছনা যায় ভুলে ॥ (৮৫)
অথবা দেহলী ৎ মুক্ত কুসুম দর্শনে।
শাপান্তের শেষ মাস দিন দিন গণে ॥

*এই 'শ্যামা' পদে কবি এস্থলে কৃষ্ণবর্ণা লক্ষ্য করেন এমত বোধ হয় না। যেহেতু যক্ষাঙ্গনাকে গৌরবর্ণ রূপে অন্যত্র বিন্যাস করিয়াছেন। 'শ্যামা' পদে এস্থলে সুলক্ষণাক্রান্তা নায়িকা ভেদ—

তথাহি ত্রিকাণ্ডে :—"শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালে চ শীতলা।
নারী লক্ষণ সম্পন্না শ্যামা সা স্বেদ বর্জ্জিতা ॥"

বিশেষতঃ হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে শ্যামবর্ণা স্ত্রী নাই।

ৎ এই 'দেহলী' শব্দ হইতে হিন্দী "দেহড়ী" এবং তাহার বাঙ্গালা অপভ্রংশ "দেউড়ী" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দেহলীর উপর পুষ্প রচনা করা সকল সুসভ্য জাতির মধ্যেই রীতি আছে। ফলতঃ গৃহ প্রবেশে তাহা শুভদ শকুন এবং নয়নের প্রসন্নতা প্রদ বটে। পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি এরূপ পুষ্প রচনার প্রথা প্রসিদ্ধ আছে, বিশেষতঃ বিবাহ বাসরে পাত্রকে দেহলীর ঊর্দ্ধে সজ্জিত পুষ্প রচিত যন্ত্রভেদ করিয়া ভাবী শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিতে হয়,—ইহাকে "তোরণ তোড়না" কহে। তোরণ-তোড়নের সময়ে মহা কৌতুক হয়—পাত্রীর সহচরী বরবালাগণ কন্দর্প সেনাবৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন—তোরণ তোড়নে পাত্র যাহাতে পরাভূত হন, তদুদ্দেশ্যে কৈতব শর প্রভৃতি শর সন্ধানে ত্রুটি করেন না।

ঝরিলে কুসুম এক করে অনুমান।
এই একমাস কাল হলো অবসান॥
এই ফিরে আইলেন মম প্রাণপতি।
এই সংমিলন হল্যো তাহার সংহতি॥
এইরূপ হৃদয়েতে করিয়া কল্পনা।
বিরহে বিনোদ লভে ললিত ললনা॥ (৮৬)

গৃহ কার্য্যে কুলবধূ দিনগত করে।
ক্ষণদা যাতনা প্রদা অতি তার তরে॥
অতএব বাতায়নে অবস্থিত হয়ে।
মম বার্ত্তা আলাপিয়া নিশীথ সময়ে॥
প্রবোধিবে সেই তব ভ্রাতৃ বনিতায়।
ধরাসন শ্বেতা সাধ্বী নিদ্রা নাহি যায়॥ (৮৭)

এবে কৃশ তনু কান্তা বিষম বিয়োগে।
পূর্ব্বে মম সহ ইচ্ছা সুরত সম্ভোগে॥
ক্ষণপ্রায় ক্ষণদায় পরিতেন বোধ।
এবে উষ্ণ অশ্রুজলে নেত্রপথ রোধ॥
বিরহ শয্যার এক পাশে নিপতিতা।
শেষ শশিকলা যথা প্রচীতে উদিতা॥ (৮৮)

দুঃখে দীর্ঘশ্বাস বহে তাম্রাধর দলে।
উড়াইয়া দেয় তায় অলক কুন্তলে॥
রুক্ষ স্নানে কেশজাল হয়ে অচিক্কণ।
যুগল কপোলে প্রলম্বিত অনুক্ষণ॥
স্বপ্নে মম সহ সংমিলন ইচ্ছা করি।
নিদ্রা যেতে অভিলাষ করেন সুন্দরী॥
কেমনে প্রবেশ নিদ্রা করিবে নয়নে।
সদা অবরুদ্ধ আঁখি অশ্রু বিসর্জ্জনে॥ (৮৯

বেঁধে দিব পুনঃ কেশ শাপ অবসরে।
ইতে শোকগতা আদ্য বিরহ বাসরে॥
একবেণী বদ্ধ করি রেখেছেন প্রিয়া।
আছে সেই বেণী গণ্ডস্থল সমাশ্রিয়া॥
নিরলক্ত নখরে উৎক্ষিপ্ত অনিবার।
চিকুরের চারু চিকণতা নাহি আর॥ (৯০)

গবাক্ষে শীতল শশী কিরণ সঙ্কাশ।
পূর্ব্বপ্রীতি হেতু দেখিবার অভিলাষ॥
নিরখিতে নয়নে শোকাশ্রু ধারা বয়।
অমনি মুদেন গুরু আর্দ্র পক্ষ্মদ্বয়॥
ওহে সখে! দেখ গিয়ে প্রিয়া সন্নিধান।
মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থল নলিনী সমান॥
নহেন জাগ্রত প্রিয়া নহেন নিদ্রিত।
যথা সে নলিনী নহে ফুল্ল কি মুদ্রিত॥ (৯১)

নাহিক সুন্দর দেহে কোন অলঙ্কার।
শয্যাতলে অস্থির শরীর অনিবার॥
দারুণ বিরহ ব্যথা সে দেহে কি সয়?
শয়নেতে যাতনা কখন গত হয়॥
দেখি অশ্রুপাত তব হবে ঘন ঘন।
করুণায় আর্দ্র সদা হন সাধুগণ॥ (৯২)

ওহে সখা! এমন করোনা তুমি মনে।
বাচালতা করিতেছি তোমার সদনে॥
প্রথম বিরহে বালা বিধুরা হইয়া।
আমাতে আছেন স্নেহে চিত্ত সমর্পিয়া॥
করিলাম যেইরূপ অবস্থা বর্ণন।
সেইরূপ অবিকল করিবে দর্শন॥ (৯৩)

তাঁহার সমীপে তুমি হইলে উদয়।
মীন উদ্ঘাটনে যথা কাঁপে কুবলয়॥
সেইরূপ মম দারা নয়ন যুগল।
পুনঃ পুনঃ স্পন্দমান হবে অনর্গল॥
আলুয়িত লম্বিত চিকুরে সে নয়ন।
অপাঙ্গের রঙ্গহীন হয়েছে এখন॥
অঞ্জন বিরহে এবে পাইবে প্রকাশ।
অধুনা নাহিক তাহে ভ্রূভঙ্গি বিলাস॥ (৯৪)

হে নীরদ! তোমারে করিয়ে নিরীক্ষণ।
চারু বাম উরু তাঁর করিবে স্পন্দন॥
কনক কদলীসম গুরু গৌরতর।
মুক্তামালে শোভিত থাকিত নিরন্তর॥

এখন অঙ্কিত নহে আমার নখরে।
স্বরতান্তে সম্বাহিত নহে মম করে ॥ (৯৫)
নিদ্রিতা থাকেন যদি এমন সময়ে।
এক যাম থাকিও হে রবশূন্য হয়ে ॥
তোমার নিনাদে নিদ্রা হইবে বিগত।
তাহে প্রিয়া পাইবেন মনোদুখ কত ॥
মমভুজে বাঁধা যদি থাকেন স্বপনে।
সে বন্ধনচ্যুত হবে তোমার গর্জ্জনে ॥ (৯৬)
বরষিয়ে বারিবিন্দু শীতল সমীরে।
তারপর উঠাইয়ে দিও প্রেয়সীরে ॥
বাতায়নে বসি ধীর ধীর বিঘোষণে।
তুষিও তাঁহারে তুমি স্বখ সম্ভাষণে ॥
চঞ্চলা দর্শনে তাঁর নয়ন চঞ্চল।
আশ্বাসের স্থল নব মালতী কেবল ॥ (৯৭)
কবে—"ওহে অবিধবে! করি নিবেদন।
আমি মেঘ, আসিয়াছি তোমার সদন ॥
যেই মেঘ প্রবাসী পুরুষে দেয় ত্বরা।
বাঁধিবারে বনিতার বেণী মনোহরা ॥
পথশ্রমে যদি কোথা করে অবস্থান।
স্নিগ্ধ মন্দ্রস্বরে করি উপদেশ দান ॥ (৯৮)
শুনিয়ে তোমার কথা অতি সাবধানে।
সম্ভাষণা করিবেন বিহিত বিধানে ॥
মারুতীর কথা যথা শুনিলেন সীতা।
সেইরূপ হইবেন অতি ব্যগ্র চিতা ॥
পতিবার্ত্তা শুনি সতী পতিবন্ধু মুখে।
মুগ্ধ হয় কথঞ্চিত সংমিলন সুখে ॥ (৯৯)
ওহে আয়ুষ্মান্! মম মঙ্গল উদ্দেশে।
বলিও হে এই সমাচার সবিশেষে ॥
হে অবলে, রামগিরি আশ্রম উপর।
জীবিত আছেন তব জীবিত-ঈশ্বর ॥
মৃত্যুমুখে পতিত যদিচ জীবগণ।
তথাপিও এই বাক্য আশ্বাস বন্ধন ॥ (১০০)
বলিবে হে—"তব নাথ ক্ষীণ কলেবর।
গাঢ় তাপে তপ্ত উৎকণ্ঠিত নিরন্তর ॥
দরদর ধারা বরষিছে দু'নয়ন।
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রবাহিত অনুক্ষণ ॥
বৈরি বিধিকৃত হয়ে বঞ্চিত বিশেষ।
মানসে তোমার দেহে করিছে প্রবেশ ॥*(১০১)
পরশিতে তোমার ও বদন কমল।
একদা সঙ্গিনী মাঝে হইয়ে বিকল ॥
তব কানে কানে কথা কহিল যে জন।
শ্রবণ নয়ন পথ অন্তরে এখন ॥
প্রবাসে যে সব পদ করিল রচনা।
মম মুখে সে সকল শুন সুলোচনা ॥ (১০২)

* যেরূপ ধাতুরত্ন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে জন্মিলেও তাহাদিগের বিভিন্ন প্রকৃতি হয় না; মহাকবি জাতিও তদ্রূপ প্রতীয়মান হন। তাঁহাদিগের হৃদয়রাজীবস্থ ভাবমধু একই রূপ হয়। মহাকবি সেক্সপীয়র বিরহ বর্ণনে উপরিউক্ত কবিতার ভাব একস্থানে এইরূপ প্রকটন করিয়াছেন যথা :—

If the dull substance of my flesh were thought,
Injuious distance should not stop my way ;
For then despite of space I would be brought.
Form limits for remote where thou dost stay.

অস্য ভাবার্থ

যদি ভাবরূপী হতো মম জড় কায়।
তবে কি দূরতা দুষ্ট রাখিত আমায় ॥
আসিতাম ছার মানি ব্যবধান ভূমি।
মিলিতাম যথায় বিরাজ কর তুমি ॥

হে মানিনি ! কেমনে সে ভুলিবে তোমারে !
যথা তথা তব রূপ স্বরূপ নেহারে ॥
অঙ্গের বলনী তব, শ্যামা লতিকায় ।
চঞ্চল অপাঙ্গ ভঙ্গী কুরঙ্গী দেখায় ॥
কপোলের প্রভা শশী কিরণে প্রকাশ ।
কলাপী কলাপে হেরে তব কেশপাশ ॥
তটিনীর মৃদুতর তরঙ্গ উচ্ছাস ।
তাহাতে নিরখে তব ভুরুর বিলাস ॥ (১০৩)

ধারাসিক্ত ভূমি প্রায় পরিমল যুত ।
তব মুখ অন্তরে এখন দূরীভূত ॥
বিরহ অনলে তনু একে তনুতর ।
তাহে আরো ক্ষীণকরে পঞ্চশর শর ॥
নিদাঘ অত্যয়ে নব নীরদ নিকর ।
দশদিক আঁধার করিবে ঘোরতর ॥
দিনকর কর তাহে হইলে বিলীন ।
কেমনে কাটিবে সেই বরষার দিন ॥ (১০৪)

কোপভরে অরুণিত তব কলেবর ।
গিরি মৃত্তিকায় লিখি শিলার উপর ॥
পদতলে পড়িবারে যবে ইচ্ছা করে ।
দৃষ্টি পথ রোধ হয় অশ্রুজল ভরে ॥
হায় কাল কৃতান্ত কি নির্দয় হৃদয় ।
প্রতিকৃতি সহ সঙ্গ, তাও সহ্য নয় ॥ (১০৫)

স্বপনে তোমার রূপ করি দরশন ।
গাঢ় আলিঙ্গন হেতু করি আকুঞ্চন ॥
অম্বরে ওঠাই যবে বাহুলতাদ্বয় ।
দেখি দশা বনদেবতার দয়া হয় ॥
হিমবিন্দুছলে তরু কিশলয়োপরে ।
মুক্তাফল সমস্থূল অশ্রুপাত করে ॥ (১০৬)

দেবদারু* পত্রচারু করিয়ে ভঞ্জন ।
মোদিত তাহার ক্ষীর গন্ধে প্রভঞ্জন ॥
হিমালয় পরিহরি বহিলে দক্ষিণে ।
আলিঙ্গন করে তারে এই আশাধীনে ॥
যদি কভু প্রেয়সীর রুচির শরীর ।
পরশিয়ে থাকে সেই শীতল সমীর ॥ (১০৭)

তোমার বিরহে ওহে চঞ্চল নয়নে ।
নিয়ত ব্যথিত চিত্ত দহে অনুক্ষণে ॥
নিরুপায়ে করে কত দুর্লভ কামনা ।
দীর্ঘযামা ত্রিযামা হউক স্বল্পক্ষণা ॥
পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন আর সায়াহ্ন সময় ।
মন্দ মন্দ তাপযুক্ত যেন তারা হয় ॥ (১০৮)

আর তারে একথা বলিও জলধর ।
এইরূপ চিন্তা আমি করি নিরন্তর ॥
ধৈর্য্য ধরিলাম শেষে আপনা আপনি ।
অতএব কাতর না হন যেন ধনী ॥

* মহাকবি কালিদাস যে ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উদ্ভিদ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে ! তিনি মধ্য-দেশীয় পর্ব্বত-শ্রেণীতে বেতস্ ; কুন্দ ; নীপ, ককুভ প্রভৃতি বৃক্ষের সংস্থাপন করেন এবং হিমালয়ে ধবল, দেবদারু এবং অপর আর আর হিম প্রধান দেশজ তরুলতা বর্ণন করিয়াছেন । এই প্রকৃতিতত্ত্ব আধুনিক ইউরোপীয় ভ্রমণ কর্ত্তাদিগের লিপিতে সপ্রমাণ হইতেছে ।

চিরদিন সুখ দুঃখ না থাকে কাহার।
রথচক্র সম উচনীচ বারম্বার ॥ (১০৯)

শের শয্যা হরি * হরি করিলে উত্থান।
আমার এ অভিশাপ হবে অন্তর্ধান ॥
কোনরূপে বরাননে মুদিয়া নয়ন।
এই চারিমাস কাল করহে ক্ষেপণ ॥
অনন্তর শারদীয় শাশঙ্ক কিরণে।
বিরহ বসনা যত পুরাব দু'জনে ॥ (১১০)

একদা আমার কোলে দেখিয়ে স্বপন।
জাগিয়া উঠিলে তুমি করিয়ে রোদন ॥
কেন কেন বলি আমি জিজ্ঞাসিলে পরে।
বলেছিলে মৃদু মৃদু সহাস্য অধরে ॥
ওহে ধূর্ত্ত! করিলাম স্বপনে দর্শন।
রমিলে রমণ পর রমণীর মন ॥ (১১১)

বলো—হে অসিত নেত্রে! কুলমান ভরে
অবিশ্বাস করিওনা এই জলধরে ॥
কহিলাম যেই গুপ্ত কথা রসময়।
ইথে আমি হিতকারী জানিহ নিশ্চয় ॥
যেহেতু বিরহ ঘোরে শুধু স্নেহবশে।
বচনীয় নহে হেন কোন ভুক্ত রসে॥
পুনরায় নয়নগোচর যদি করে।
প্রণয় প্রবাহ বহে প্রেমিক অন্তরে ॥ (১১২)

ওহে সৌম্য! তোমারে নিরখি নিরন্তর।
আশ্বাসিত হইতেছে আমার অন্তর ॥
যাচক চাতকে দেহ নীরবেতে জল।
সেরূপ বাসনা মম করিবে সফল ॥
বন্ধু প্রতি সাধুদের এই ব্যবহার।
প্রত্যুত্তর দান করে করি উপকার ॥ (১১৩)

স্নেহ হেতু বন্ধু কার্য্য করি সমাধান।
কিম্বা মম দুঃখ দেখি করি কৃপাদান ॥
পরে বরষার শোভা ধরি বিমোহন।
বাঞ্ছনীয় দেশে তুমি করিও গমন ॥
নিরন্তর সুখে থাক সৌদামিনী সহ।
আমার স্বরূপ যেন না হয় বিরহ ॥ (১১৪)

* কার্ত্তিকেয়ী শুক্লা চতুর্দ্দশী রজনী অতি মনোহারিণী সন্দেহ নাই। পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি উক্ত রজনীতে মহা সমারোহ হয়। এই পর্ব্বাহের নাম জলযাত্রা। অগ্নুৎসব এবং নৌকারোহণে জলক্রীড়া ইহার প্রধান অঙ্গ। ফলতঃ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী হইতে উক্ত দিবস পর্য্যন্ত চাতুর্মাস্য নির্ণয়ের মূলীভূত কারণ জলদজালে প্রায় সূর্য্য মণ্ডল আচ্ছন্ন, সুতরাং তাহা নারায়ণের শয়নউক্ত করা উপযুক্ত বটে। হরিপদে যেরূপ বিষ্ণুকে বুঝায়; সেইরূপ সূর্য্যের প্রতিও তাহা আদিষ্ট হয়। বস্তুতঃ বিষ্ণু এবং সূর্য্য অভেদ দেবতা। অনেক দূরদর্শী ইউরোপীয় পণ্ডিত এরূপ মীমাংসা করিয়াছেন।

সমাপ্ত

ঋতুসংহার

(পাঠ—রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহ ঃ—১৩৬৬)

গ্রীষ্ম বর্ণনা

স্থানে স্থানে নিরন্তর   শুখাইল সরোবর
খর কর দিনকর স্পৃহনীয় শশী।
রমনীয় দিবসান্ত   উপশান্ত রতিকান্ত
এহেন নিদাঘ কাল আইল প্রেয়সি ॥১॥
শশী করে দিশি দিশি   নীলনিভা শূন্য নিশি
সুশোভিত সুবিচিত্র জলযন্ত্রচয়।*
নানা রত্ন † বিভূষণ   সরস চন্দন ঘন
নিদাঘেতে সেবা করে জন সমুদয় ॥২॥
সুবাসিত সুশীতল   মনোহর হর্ম্ম্যতল
প্রিয়ামুখ-মধুরূপ মধুর আসব।
সুতন্ত্রী গীতের তান   কাম যাহে দীপ্তিমান
নিদাঘ নিশীথে অনুভবে কামী সব‡ ॥৩॥
নিতম্বে চিকণ শাটী   চন্দ্রহার পরিপাটী
পয়োধরে দিয়ে হার আর সুচন্দন।
স্নানে চারু গন্ধকষা   কেশে মাখি মাথাঘষা
কামীজনে সুশীতল করে যোষাগণ ॥৪॥
লাক্ষারসে অতিশয়   লোহিত চরণদ্বয়
তাহাতে নূপুর পরি নিতম্বিনীগণ।
পদে পদে মনোহারী   হংসরব অনুকারী
মন্মথে মথিত করে জনগণ মন ॥৫॥
পয়োধরে কৃশোদরী   চন্দনে চর্চ্চিত করি
শিরোপরে শোভি হিম সম শুভ্রহার।
নিতম্বেতে শোভাধার   দিয়ে স্বর্ণ চন্দ্রহার
সমুৎসুক চিত্ত বল না করে কাহার ॥৬॥
তনু-সন্ধি করি ভেদ   বহির্গত হয় স্বেদ
স্থূল শাটী পরিহরি এবে সে কারণ।
যত সব সযৌবনা   পীবর উন্নত স্তনা
চিকণ কাঁচলী স্তনে করিছে ধারণ ॥৭॥

চন্দন-সলিল মাখা   পবন প্রসারি পাখা
মনোহর মুক্তাহার স্তনে লাগাইয়া।
বিনোদ বীণার গান   অব্যক্ত মধুর তান
নিদ্রিত মন্মথে এবে দিল জাগাইয়া ॥৮॥
শুভ্রবর্ণ ছাদোপরে   নিদ্রা যায় সুখভরে
সমস্ত যামনী যোগে কামিনী নিচয়।
তাহাদের চন্দ্রানন   হেরি শশী বহুক্ষণ
শরমে পাণ্ডুর বর্ণ ধরে নিশা ক্ষয়ে ॥৯॥
অসহ্য পবনে কত   রেণু রাশি সমুদ্গত
প্রখর ভাস্কর তাপে তপ্ত মহীতল।
প্রেয়সী বিরহানলে   দগ্ধ প্রবাসীর দলে
নিরীক্ষণ করিবারে নারে এ সকল ॥১০॥
প্রখর ভাস্কর করে   পরিতপ্ত কলেবরে
মৃগদল পরিশুষ্ক তালু পিপাসায়।
দলিত কজ্জলোজ্জ্বল   নিরখিয়ে নভোস্থল
জল ভাবি অপর কাননে কভু ধায় ॥১১॥
সবিভ্রম স্মিতাধরে   রঙ্গিন কটাক্ষ শরে
বিলাসিনী নারীগণ নাগরের মনে।
অনঙ্গের হুতাশন   করে আশু সন্দীপন
চারু শশী-বিভূষণা সন্ধ্যা আগমনে ॥১২॥
খরতর রবিকরে   তনু সন্তাপিত করে
পথের ধূলায় নাগ হয়ে দহ্যমান।
বক্রগতি নতানন   নিঃশ্বসিত ঘন ঘন
ময়ূরের তলে গিয়া জুড়াইছে প্রাণ ॥১৩॥
মহতী তৃষ্ণায় যত   বিক্রম উদ্যম হত
জৃম্ভিত বদনে মুহুর্মুহুঃ শ্বাসস্ফুরে।
মুখে জিহ্বা বিলোলিত   কেশরাগ্র বিচলিত
হরি নাহি মারে করি পাইয়া অদূরে ॥১৪॥

* জলযন্ত্র—ফুয়ারা। গ্রীষ্মকালে শ্রবণ নয়ন এবং ত্বগেন্দ্রিয়ের পক্ষে ইহা অতীব আনন্দ বিধায়ক। এই মনোজ্ঞ যন্ত্র যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা মুসলমানদিগের স্থানে ঋণ গ্রহণ করেন নাই, ইহা যে ভারতবর্ষের পুরাতন পদার্থ তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

† মূল কাব্যে "মণি প্রকারা" লিখিত আছে। বোধ হয় ইহা "চন্দ্রকান্ত মণি" হইতে পারে, যেহেতু চন্দ্রকান্ত মণি জলপ্রসবী এবং শৈত্য বিধানকারী ইহা মহাকবি কালিদাস এবং অন্যান্য কবিগণ ভূরি ভূরি স্থানে লিখিয়াছেন। এইক্ষণেও Moon stone নামক এক প্রকার মণি ব্যবহার আছে—তাহা শীতল স্পর্শ বটে।

‡ গ্রীষ্মকালে অর্দ্ধরাত্রের সময়ে এই সকল উপভোগ এই ক্ষণেও বিস্মৃত হয় নাই।

শুখায়েছে কণ্ঠোদ্গত সলিল শীকর যত
মার্ত্তণ্ড ময়ূখে অতিতপ্ত কলেবর।
অতিশয় তৃষাভরে জল অন্বেষণ করে
কেশরীর প্রতি করি অভয় অন্তর ॥১৫॥
যেন হোম হুতাশন খরকর বিকর্ত্তন
ক্লান্ত তাহে কলাপীর দেহ আর মন।
তাহার কপাল তলে মুখরাখে সর্পদলে
ভোগীরে না ভোগে শিখী পাইয়া সদন ॥১৬॥
দীপ্ত ভানু প্রতিভায় অতি সন্তাপিত কায়
আয়ত মুখাগ্র সব সরসী খননে।
নাগর মুথার দলে পাণ্ডুপঙ্ক ভূমিতলে
গড়াগড়ি যায় যত শূকর স্বগণে ॥১৭॥
একে ভানু খরকরে দগ্ধকরে কলেবরে
তাহে তপ্ত সরসীর পঙ্কময় জলে।
ভেকগণ লাফাইয়ে নিঃশ্বাস ছাড়িছে গিয়ে
তৃষিত ফণীর ফণারূপ ছত্রতলে ॥১৮॥
অশেষ মৃণাল তুলে দায়ে ফেলি মীনকুলে
সারস সমূহে করি ভয়ে দ্রুত পদ।
পরস্পর ঘরষণ করি দেহ করিগণ
ঘন কর্দ্দমেতে বিমর্দ্দিত করে হ্রদ ॥১৯॥
প্রখর রৌদ্রের ঘটা হত শিরোমণি ছটা
লোল জিহ্বা দ্বয়ে করে পবন লেহন।
বিষাগ্নি তপন তাপ তপ্ত তনু হয়ে সাপ
তৃষাকুল ভেককুলে না করে হনন ॥২০॥
দুই কস্ নিঃসারিত ফেনলালে আবরিত
নির্গত লোহিত জিহ্বা উন্নত বদন।
অতিশয় তৃষাকুল হইয়া মহিষী কুল—
গিরিগুহা ছাড়ি করে জল অন্বেষণ ॥২১॥
বনদাহে অতিশয় দগ্ধ তব তৃণচয়
ঘোর বায়ুবেগে ঝরে শুষ্ক পত্রাবলী।
ভয়ঙ্কর ভাব একি বন-অন্তরালে দেখি
দিনকর করে বারি বিহীন সকলি ॥২২॥
শীর্ণ পর্ণ ক্রমাশ্রয়ে শ্বাস ছাড়ে পক্ষীচয়ে
গিরিবনে লুকাইছে ক্লান্ত কপিদল।
ভ্রমিছে গবয়গণ করি বারি অন্বেষণ
কূপ হতে উঠে উট হইয়া সরল ॥২৩॥
পরুষ পবন বেগে পাবক উঠিল রেগে
বিকচ কুসুম্ভ কিবা বিমল সিন্দুর।
তরু শাখা লতাগণে অতি ব্যস্ত আলিঙ্গনে
দিশি দিশি ভূমি ভাগ দহিল প্রচুর ॥২৪॥
গিরি গুহা অভ্যন্তরে বায়ুবেগে শব্দ করে
চট্‌পট্ নিনাদিত শুষ্ক বংশবনে।
তৃণে পড়ি দাবানল ক্ষণে হয় সুপ্রবল
প্রান্তে লাগি দূরীভূত করে মৃগগণে ॥২৫॥
বহুরূপে হয়ে জাত শিমুলের বনে ভাত
কোটরে কোটরে স্ফুরে কনক বরণে।
জনমিয়ে শাখাচলে তরু ত্যজি তেজে চলে—
পবনে কম্পিত অগ্নি ভ্রমে বনে বনে ॥২৬॥
দ্বন্দ্বভাব পরিহরি সুহৃদের ভাব ধরি
করী, হরি, বন-গরু সন্তাপিত কায়।
হুতাশনে খিন্ন অতি বনছেড়ে শীঘ্রগতি
বিপুল পুলিন থেকে পড়ে নিম্নগায় ॥২৭॥
কমল কাননে জল করিয়া সঞ্চয়।
পারুল ফুলের গন্ধে মোহিয়ে হৃদয় ॥
সুখ সলিলেতে স্নান, সেব্য চন্দ্রকর।
নিশাকালে হর্ম্ম্যোপরে গীত মনোহর ॥
কামিনীগণের সঙ্গে রঙ্গ রসোৎসব।
এরূপে নিদাঘ কাল যায় যেন তব ॥২৮॥

ইতি গ্রীষ্ম বর্ণনা সমাপ্ত।

বর্ষা বর্ণনা

মত্তহস্তী স-শীকর বারিধর দল।
তড়িত পতাকা বাজে অশনি মাদল ॥
রাজার মতন ঘোরতর শব্দ করি।
কামি-প্রিয় বর্ষাকাল আইল সুন্দরী ॥১॥
কোন স্থানে যেন নীলোৎপল দলসাজে।
কোথা ভিন্নাঞ্জন রাশি নিভায় বিরাজে ॥
কোথায় গর্ভিনী-প্রমদার স্তনপ্রভা।
আকাশেতে বসিয়াছে জলদের সভা ॥২॥
তৃষায় আকুল হয়ে যত কপিঞ্জল।
জলদেরে কহে, জল দেরে দেরে জল ॥
যাচিত হইয়া মেঘ শ্রুতি মনোহারী।
শব্দকরি বরষিয়া যায় নব বারি ॥৩॥
অশনি নিশানে বিভূষিত মেঘগণ।
ইন্দ্রচাপে তড়িদ্‌গুণ করিয়া যোজন ॥
বরষিয়া "তীক্ষ্ণতর ধারা জলশর।
গরজিয়া তুড়িতেছে বিরহী অন্তর ॥৪॥

প্রভিন্ন বৈদূর্য্য মণি নিভ তৃণাঙ্কুর।
দলে দলে উঠিতেছে কন্দলী প্রচুর॥
ইন্দ্রগোপ কীটচয়ে হয়ে বিভূষণা।
নানা রত্নে শোভে ক্ষিতি যেন বরাঙ্গনা॥৫॥
সদা সমুৎসুক শুনি চারু মেঘনাদ।
বিস্তারি কলাপচক্র শোভে মেঘনাদ॥
কেলিরসে আলিঙ্গনে চুম্বনে আকুল।
নর্ত্তনে প্রবৃত্ত আজ কলাপীর কুল॥৬॥
উপাড়িয়া তটস্থিত বিটপী সকল।
ঘোরতর বেগে ধায় লয়ে কাদাজল॥
পয়োনিধি প্রাপ্তত্বরা পয়স্বিনীগণ।
সকামা কামিনী-যথা বিভ্রমে মগন॥৭॥
সুকোমল শস্যের প্ররোহ, তৃণোদগম।
মৃগমুখ ক্ষত, নীল নিভা মনোরম॥
কিম্বা নবদলে বিভূষিত তরুগণ।
শোভায় হরিছে মন রমণীর বন॥৮॥
বিলোল নয়নপদ্ম শোভিত আনন।
উপজাত ভয়ে ভীত ভ্রান্ত মৃগগণ॥
সমাচিত সৈকতিনী সহ বিন্ধ্যাচল।
উৎকলিত করিতেছে মানস সকল॥৯॥
তীব্রতর উচ্চধ্বনি করে মেঘদলে।
যদিও যামিনী বৃত তিমির পটলে॥
দামিনীর দীপ্তি যোগে প্রদর্শিত পথ।
যায় অভিসারিকা সাধিতে মনোরথ॥১০॥
পয়োধর সুগভীর ধীর ধ্বনি করে।
যে স্বরে চঞ্চল চিত্ত হইয়া সত্বরে॥
অপরাধী হইলেও প্রাণেশ্বরগণ।
শয়নেতে ভামিনীরা দেয় আলিঙ্গন॥১১॥
ইন্দীবর নয়নেতে বিন্দু বিন্দু বারি।
বিম্বাধর চারু পত্র অভিষিক্ত কারী॥
ত্যজিয়ে লেপন আভরণ-পুষ্পমালা।
নিরাশায় স্থিত যত বিরহিনী-বালা॥১২॥
ধূলি কীট তৃণান্বিত পাণ্ডুর বরণ।
সর্পপ্রায় বিসর্পিত বঙ্কিম গমন॥
হেন নবোদক ধীরে নিম্ন মুখে ধায়।
ভয়াকুল ভেককুল নিরখিয়ে তায়॥১৩॥
প্রফুল্ল কমল দল করি পরিহার।
সমুৎসুক মনোহর করিয়া ঝঙ্কার॥
নবোৎপল ভাবি মূঢ় মধুকর গণ।
নৃত্যশীল শিখিপুচ্ছে হতেছে পতন॥১৪॥
নবীন মেঘের রবে, বনহস্তিচয়ে।
মুহুর্মুহুঃ মাতিতেছে মদান্বিত হয়ে॥
বিমল কমলনিভ কপোল প্রদেশ।
মধু লোভে মধুকর নিকর নিবেশ॥১৫॥
তোয়ভরে নম্র মেঘে চুম্বিত উপল।
ইতস্ততো প্রস্রবন বহিছে সকল॥
নর্ত্তনে প্রবৃত্ত শিখিকুলে সমাকুল।
ধরাধর দেয় মনে আনন্দ বিপুল॥১৬॥
শালার্জ্জুন নীপ কেয়া কদম্বমঞ্জুরী।
এসব কুসুমগন্ধে বাসিত বিহরি॥
সজল জলদ সঙ্গে শীতল শরীর।
কাহারে না সমুৎসুক করিছে সমীর॥১৭॥
লম্বিত বিনোদবেণী নিতম্বের তটে।
সুগন্ধি ফুলের দুল শ্রবণে প্রকটে॥
হার যুক্ত পয়োধর শীধুযুক্ত মুখ।
কামীজনে কামিনী সঞ্চরে রতিসুখ॥১৮॥
তড়িৎ লতিকা, ইন্দ্রধনু বিভূষণ।
জলভরে প্রণমিত জলধরগণ॥
কাঞ্চীমণি মেখলায় উজ্জ্বলা রমণী।
প্রবাসীগণের মন হরিছে যেমনি॥১৯॥
কদম্বকেশর কেতকীর পুষ্পমালা।
গাঁথি শিরে শোভো করে যত পুরবালা॥
নব অবতংস কিবা ককুভ-মঞ্জরী।
রচি শ্রুতি মূলে পরে যতেক সুন্দরী॥২০॥
চর্চ্চিতাঙ্গ কালাগুরু প্রচুর চন্দনে।
কেশপাশ সুরভিত কুসুমাভরণে॥
প্রদোষ সময়ে শুনি জলদের ধ্বনি।
গুরুগৃহ থেকে যায় শয্যাগৃহে ধনী॥২১॥
কুবলয় নীল, সমুন্নত, জলযুত।
মন্দ মন্দগতি মন্দ পবনে বিধুত॥
ইন্দ্রধনু সহ মেঘ করে বিচেতন।
বিরহ বিধুরা পথিজন বধূগণ ॥২২॥
মুদিত সকল স্থান কদম্বাদি ফুলে।
পবনে চঞ্চল শাখা, নাচে শিখিকুলে॥
কেতকীর মুখে দিয়ে হাস্য মনোহর।
নবজল জুড়াইল বনান্ত নিকর ॥২৩॥

মস্তকে মালতীমালা সহিত বকুল।
প্রফুল্ল যূথিকাকলী আর বনফুল ॥
কর্ণপুর রচি দিয়ে কদম্ব রসাল।
বধূদের বন্ধুসম শোভে বর্ষাকাল ॥২৪॥
সমুন্নত কুচযুগে হার শতেশ্বরী।
শ্রোণিবিম্বে শ্বেতাভ স্থূল শাটীপরি।
কামিনীর কটি আর ত্রিবলী বিরাজি।
নবজলসেকে সমুদ্গত লোমরাজী ॥২৫॥
নবজলকণা সেকে শীততা ধারণে।
নাচাইয়া ফুলভারে নত তরুগণে ॥
কেতকী পরাগে সুরভিত সমীরণ।
প্রবাসীজনের মন করিছে হরণ ॥২৬॥
জলভরে অবনত, অম্বুদ আশ্রয়।
এই উচ্চ বিন্ধ্য ইহা জানি মেঘচয় ॥
অতিতপ্ত দেখি তায় গ্রীষ্ম হুতাশনে।
হৃষ্টি করিতেছে তায়ে বারি বরিষণে ॥২৭॥
বহুগুণ রমণীয় নারী মনোহারী।
তরুশাখা লতাগণে অতি হিতকারী ॥
প্রাণীদের প্রাণপ্রদ, এ সুখ সময়।
তব বাঞ্ছনীয় শুভ করুণ উদয় ॥২৮॥

ইতি বর্ষা বর্ণনা সমাপ্ত

শরদ্বর্ণনা

কাশকুসুমেতে কঞ্চুলিত রূপবতী।
বিকচ কমল মুখ মনোহর অতি ॥
মত্ত মরালের রব মঞ্জির ধারিণী।
রুচির অপক্কশালি, শরীর শালিনী ॥
রমণীয় নববধূ সমরূপ ধরি।
আইল শরৎ অই দেখলো সুন্দরি ॥১॥
কাশপুষ্পে মহী, বিভাবরী চন্দ্রকরে।
হংসজালে জল, হ্রদ কমল নিকরে ॥
ছাতিমের পুষ্পভরে বনান্ত আবৃত।
মালতীতে উপবন সব শুক্লীকৃত ॥২॥
চঞ্চল শফরীরূপ চন্দ্রহার পরি।
শ্বেত বিহঙ্গের শ্রেণী হার হৃদে ধরি ॥
বিপুল পুলিন নিতম্বিনী পয়স্বিনী।
সমদা প্রমদা সম মন্থর গামিনী ॥৩॥
রাজবৎ আকাশ হয়েছে শোভমান।
কোথায় রজত, শঙ্খ, মৃণাল সমান ॥
অম্বুহীন লঘুকায় যত জলধর।
বায়ুবেগে ঢুলাইছে শতেক চামর ॥৪॥
আকাশ প্রকাশে চারু ভিন্নাঞ্জন রাগ।
বাঁধুলীর রঙ্গে অরুণিত ভূমিভাগ ॥
সুপক্ক কলমা ধান্যে ক্ষেত্র সুশোভন।
উৎকলিত নাহি করে কোন যুবামন ॥৫॥
মন্দ গন্ধ বহে প্রচঞ্চল শাখাচয়।
অগ্রভাগে কলিকা কলিত কিশলয় ॥
প্রমত্ত মধুপ পীত মকরন্দ ধার।
কারো চিত্ত কোবিদার না করে বিদার ॥৬॥
ভূষিতা প্রচুরতর নক্ষত্র ভূষণে।
মেঘের ঘোমটা মুক্ত শশাঙ্ক বদনে ॥
পরিধান করি জ্যোৎস্না বিমল বসন।
দিনদিন বাড়ে নিশি যুবতী যেমন ॥৭॥
কারণ্ডব চঞ্চুঘাতে চঞ্চল তরঙ্গ।
কূলে চরে কলহংস সারস বিহঙ্গ ॥
লোহিত সরোজ রজে, রুত হংসরবে।
শৈবলিনী প্রীতি প্রদা হইতেছে সবে ॥৮॥
মনোজ্ঞ মরীচি মালা, নেত্রানন্দকারী।
শিশির শীকরবর্ষী, আহ্লাদ প্রচারী॥
বিরহ বিষাক্ত শরে একে জর জর।
অনুদিন তন্বীতনু দহে সুধাকর ॥৯॥
দোলাইয়ে ধান্যতরু অবনত ফলে।
নাচাইয়ে ফুলে নত কুরুবক দলে ॥
কাঁপায়ে নলিনী, ফুটাইয়ে পদ্মবন।
যুবামন মাতাইল বিশেষে পবন ॥১০॥
সুশোভিত যোড়া যোড়া মত্ত হংসদলে।
বিভূষিত নিরমল প্রফুল্ল কমলে ॥
উত্থিত তরঙ্গমালা ধীর সমীরণে।
সহসা সরসী বিচলিত করে মনে ॥১১॥
ইন্দ্রধনু লয় প্রাপ্ত জলদ-উদরে।
ব্যোমকেতু সৌদামিনী আর না বিহরে।
নভো না কাঁপায় পক্ষে আর বকগণে।
না হেরে গগন শিখী উন্নত বদনে ॥১২॥
নর্ত্তন প্রয়োগহীন শিখী পরিহরি।
কাম চড়ে মধুর গায়ক হংসোপরি ॥

কদম্ব ককুভ কুর্চি শাল নীপ ছেড়ে ।
ফুল ফোটা শোভা গেল ছাতিমের বেড়ে ॥১৩॥

শেফালিকা কুসুমের গন্ধ মনোহর ।
সুখেস্থিত বিহঙ্গগণের চারুস্বর ॥
সর্ব্বত্র উৎপল দৃশ কুরঙ্গ নয়ন ।
মানস মোহিত করে যত উপবন ॥১৪॥

কাঁপাইয়ে কহ্লার কৈরব কুবলয়ে ।
তাঁর সাহচর্য্যে অতি সুশীতল হয়ে ॥
পত্র অগ্রে হিমধারা করিয়া হরণ ।
বনিতার মন মোহে প্রভাতে পবন ॥১৫॥

পক্বধান্যে ধরাতল গিয়াছে ছাইয়ে ।
প্রচুর গোধন চরে সচ্ছন্দ হইয়ে ॥
প্রীতি নিনাদিত [illegible] সারসের রবে ।
প্রমোদিত করে মন সীমান্তর সবে ॥১৬॥

কামিনীর গতিভঙ্গী হরে হংসদল ।
মুখ সুধাকর কান্তি হরে শতদল ॥
নীলোৎপল হরে নয়নের মধুরিমা ।
সুতনু তরঙ্গ হরে ভুরুর ভঙ্গিমা ॥১৭॥

পুষ্পেলতা শ্যামালতা পল্লব নিকরে ।
বনিতার বিভূষিত বাহু-কান্তি হরে ॥
বাঁধুলি ঘটিত নব মালতী মঞ্জরী ।
অধর-দশন-স্মিত শোভা নিল হরি ॥১৮॥

নিতান্ত নিবিড় নীল কুঞ্চিতাগ্র কেশে ।
নব মালতীতে বালা ভূষিছে বিশেষে ॥
কনক কুণ্ডল দোলে শ্রবণ যুগলে ।
কেহ বা ভূষিছে তায় ফুল্ল শতদলে ॥১৯॥

সচন্দন হার কিবা পয়োধরে মাজে ।
সুবিপুল শ্রোণীতটে চন্দ্রহার সাজে ॥
মধুর মঞ্জির পরে চরণ কমলে ।
প্রমুদিত মানসেতে প্রমদা সকলে ॥২০॥

প্রফুল্ল কুমুদ আর রাজহংসময় ।
মরকত মণিনিভ মনোহর পয় ॥
সরোবরে কিবা শোভা, কিবা নভোস্থলে ।
মেঘগতে ইন্দুসহ নক্ষত্র উজলে ॥২১॥

প্রভাতে প্রভাত হেরি রবির মণ্ডল ।
সংযোগিণী মুখনিভ হাসিছে কমল ॥
বিধু অস্তগতে হাস্যহীন কুমুদিনী ।
প্রবাসীর প্রিয়া প্রায় অতি বিষাদিণী ॥২২॥

শরদী কুমুদী সঙ্গে শীতল পবন ।
দিগঙ্গনা সুপ্রসন্না গতে মেঘগণ ॥
পঙ্কহীন বসুন্ধরা সুবিমল জল ।
স্ফুটদ্যুতি চন্দ্র তারা চিত্র নভোস্থল ॥২৩॥

অসিত নয়ন-শোভা হেরি ইন্দীবরে ।
ক্বণিত কনক কাঞ্চী মত্ত হংসস্বরে ॥
অধর রুচির শোভা বাঁধুলির ফুলে ।
কাঁদিতেছে ভ্রান্তমতি প্রবাসীর কুলে ॥২৪॥

শশাঙ্কের শোভা রাখ বনিতা-বদনে ।
মণি মঞ্জীরেতে চারু মরাল নিস্বনে ॥
মধুর অধরে রাখি বাঁধুলির শোভা ।
কোথা যায় শরতের রূপমনোলোভা ॥২৫॥

বিকচ কমল, শ্রীমুখমণ্ডল ফুল্লনীলোৎপল আঁখি ।
নব কাশফুল, সুচারু দুকূল কলেবর তাহে ঢাকি ॥
কুমুদ-হাসিনী, বরবিলাসিনী শরৎ তোমার প্রতি ।
হয়ে অনুকূল পীরিতি সঙ্কুল করুন হে রসবতি ॥২৬

ইতি শরদ্বর্ণন সমাপ্ত

হেমন্ত বর্ণনা

তরুণ পল্লবোদ্গম শস্যে কিবা মনোরম
বিকসিত লোধ্র পুষ্প পক্কধান্য চয়।
কমল পাইল লয় তুষার পতন হয়
অই যে আইল সই হেমন্ত সময় ॥১॥
হিমকুন্দ ইন্দুকর সমশুভ্র ভাতি-ধর
মুকুতার হার আর অগুরু চন্দন।
আর নাহি পয়োধরে হেমন্তে ভূষণ করে
পীনোন্নত পয়োধরা প্রমোদিনীগণ ॥২॥
ভুজবন্ধ তাড়বালা আর নাহি পরে বালা
শীতল পরশহেতু বাহুলতিকায়।
নিতম্ব মণ্ডলোপরে নববাস নাহি পরে
পয়োধরে নাহি ধরে সূক্ষ্ম লতিকায় ॥৩॥
কাঞ্চন রতন ভার বিরচিত চন্দ্রহার
আর না ভূষিত করে নিতম্ব প্রদেশ।
কমলের কান্তিহর চরণ কমলোপর
হংসরুত মঞ্জীরে না করয়ে নিবেশ ॥৪॥
কৃষ্ণ চন্দনে ইদানী মাজিতেছে তনুখানি
কপোল কমলে লিখি বিচিত্র পল্লব।
দিয়ে কালাগুরু বাস বিনাইয়ে কেশ পাশ
জাগায় যুবতী যত সুরত উৎসব ॥৫॥
রতিশ্রমে শ্রান্তিমতী বদন পাণ্ডুর অতি
ভাবিনীর হয় যদি উল্লাস উদয়।
দশনাগ্র চিহ্নচয় নিরখি অধরময়
উচ্চস্বরে হাসিবারে সাহস না হয় ॥৬॥
অতিশয় শোভাকর পীনোন্নত পয়োধর
তাহার পীড়ন জন্য খেদে খিন্ন হয়ে।
তৃণ অগ্রভাগ স্থলে তুষার পতন ছলে
কাঁদিতেছে শীতকাল প্রভাত সময়ে ॥৭॥
প্রসবিয়ে সুশোভন সুপ্রচুর ধান্যধন
কুরঙ্গ অঙ্গনা গণে ভূষিত বিশেষ।
মনোহর ক্রৌঞ্চস্বর নিনাদিত পরিসর
হৃদয় সানন্দ করে সীমান্ত প্রদেশ ॥৮॥
বিকসিত ইন্দীবর নিকরেতে শোভাকর
শরাল মরাল দলে তরঙ্গ চঞ্চল।
কিবা সুপ্রসন্ন জল শোভিত শৈবাল দল
মন বিমোহন করে তড়াগ সকল ॥৯॥

অই দেখ প্রাণ প্রিয়ে হিম হেতু শিহরিয়ে
পাকিল সে প্রিয়ঙ্গু লতিকা মনোহর।
বায়ুভরে কাঁপে পর্ণ ধরিয়াছে পাণ্ডুবর্ণ
প্রিয় বিরহেতে যথা ললনা নিকর ॥১০॥
পান করি পুষ্পাসব সুরভিত মুখসব
নিশ্বাস বাতাসে আমোদিত কলেবরে।
স্মরশরে বিদ্ধ হয়ে শুয়েছে দম্পতি চয়ে
গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ পরস্পরে ॥১১॥
দশনেতে বিম্বাধর বিঘাতন চিহ্নধর
নখরেতে বিলেখিত পীন পয়োধর।
নবীন ললনা চয় অতিশয় নিরদয়
সুরত উৎসব সব পরকাশ পর ॥১২॥
তরুণ অরুণ করে বসিয়া দর্পণ করে
সাজাইছে কোন বালা বদন রাতুলে।
প্রিয়তম রসভুক্ত দশনাগ্র ক্ষতযুক্ত
দেখিতেছে বিম্বাধর ধরিয়া অঙ্গুলে ॥১৩॥
গাঢ়রতি শ্রমে শ্রান্তা থির অন্য এক কান্তা
অর্দ্ধঘূর্ণিত নেত্রাম্বুজ যামিনী জাগরে।
ব্যাপিয়া শয্যার শেষ আলুয়ে পড়েছে কেশ
নিদ্রা যায় তপ্তকায় মৃদুভানু করে ॥১৪॥
নীরস কুসুমদাম সুরভিতে অভিরাম
ঘননীল কেশজাল বিমোচন করি।
পীনোন্নত স্তনভরে অবনত কলেবরে
বিনায় বিনোদ বেণী অপর সুন্দরী ॥১৫॥
হেরি প্রিয়ভুক্ত গাত্র উল্লসিয়া অতিমাত্র
কপোল অধর চারু রঞ্জিত করিয়া।
লুলিত অলকরঙ্গে কুঞ্চিতাক্ষি নত অঙ্গে
নব রক্তাংশুক পরে অন্য এক প্রিয়া ॥১৬॥
সুরতে সুরত অতি অন্য এক রসবতী
পরিশ্রমে খিন্নহেতু শিথিল শরীর।
বিপুল উরোজ উরু মর্দ্দনে বেদনা গুরু
অভ্যঞ্জন দান করে তাহাতে রুচির ॥১৭॥
রমণীর মনোহারী রমণীয় অতি।
গ্রামসীমা যাহে বহু পক্ক ধান্যবতী ॥
তুষার পতনশীল ক্রৌঞ্চ গীত যুত।
তব প্রিয়, হিম প্রিয়ে করুণ বহুত ॥১৮॥

ইতি হেমন্ত বর্ণনা সমাপ্ত।

শিশির বর্ণনা

প্ররোহিত শালি আর ইক্ষুশালী ধরণী কি শোভা ধরে।
কুরর নিকরে বসি সুখভরে যে কালে নিনাদ করে।।
রতির ঈশ্বর যুক্ত খরশর প্রমদার মনোহর।
বর্ণিব শিশির সময় রুচির প্রেয়সি শ্রবণ কর।।১।।
বন্ধ এ সময় জানালা নিচয় গরম গৃহ-উদর।
সন্তাপ দায়ক প্রদীপ্ত পাবক দিবস-পতির কর।।
আর স্থুলতর বসন নিকর সযৌবনা নারীগণ।
এ সুখ সময় যত লোকচয় হয় ভোগ পরায়ণ।।২।।
আর না চন্দন রোহিণী রমণ জ্যোৎস্নাজাল সুশীতল।
আর না সে ছাদ শরদের চাঁদ সম অতি নিরমল।।
আর না তুষার সম হিমাধার সুশীতল সমীরণ।
জনগণ মন করিতে হরণ ক্ষম হয় এইক্ষণ।।৩।।
তুষার সংঘাত হতেছে সম্পাত শীতল হইয়ে তায়।
শশধর কর অতি স্নিগ্ধতর করিয়াছে পুনরায়।।
মলিন সকল নক্ষত্র মণ্ডল বিভূষিতা বিভাবরী।
জনগণ প্রতি না হয় সম্প্রতি কোন মতে সুখকরী।।৪।।
যত নব বালা, যুক্ত ফুলমালা বিলেপন আর পান।
মুখ পদ্মময় চারুগন্ধ বয় পুষ্পাসব করি পান।।
উষ্ণতায় পূর্ণ কালাগুরু চূর্ণ সুবাসিত কলেবরে।
সহ প্রেমাবেশ করিছে প্রবেশ নিজ নিজ শয্যাঘরে।।৫।।
করি অপরাধ গত সব সাধ তাম্বুনী খেয়েছে কত।
কম্প কম্পান্বিত ভয়ে অতি ভীত বুদ্ধি শুদ্ধি সব হত।।
হেরি মদালসা সুরত লালসা যুক্ত হেন প্রাণেশ্বরে।
শীত নাহি সয় অপরাধ চয় ভুলে গেল নিজান্তরে।।৬।।
অতি নিরদয় যুবক নিচয় অনঙ্গ জ্বরেতে জ্বরি।
বার বার বার করিল বিহার পেয়ে দীর্ঘ বিভাবরী।।
নবীন যৌবনা যত বরাঙ্গনা যামিনী প্রভাত কালে।
শ্রান্ত অতিশয় গুরু উরুদ্বয় থমকি চরণ চালে।।৭।।
উচ্চ কুচভাগে কুঙ্কুম পরাগে পীত অরুণিত রাগ।
নবীন যৌবন জাত সুখগণ ভুক্তসহ অনুরাগ।।
কেলি পরায়ণ বিলাসিনীগণ স্তন করি বিমর্দ্দন।
শীতের প্রভাব করিয়া অভাব নিদ্রা যায় কামীজন।।৮।।
হৃদি রসায়ন আঁটিয়া কষণ প্রপীড়িত পয়োধরা।
রঙ্গিয়া সুন্দর রেশমী অম্বর বিভূষিতা কলেবরা।।
শিরোরুহজালে নানা পুষ্পমালে করি সুখে সুশোভন।
কিবা পায় শোভা যত মনোলোভা হিমাগমে বালাগণ।।৯।।

সুগন্ধি নিঃশ্বাস সহিত সুবাস চঞ্চল কুণ্ডল ছায়া।
পড়িয়াছে যায় যাহে বৃদ্ধি পায় কামসহ কামজায়া ॥
যামিনী সময় প্রফুল্ল হৃদয় কামীজনে সঙ্গে লয়ে।
এহেন মধুরা মাদনীয় সুরা পিয়ে প্রমোদিনী চয়ে ॥১০॥

বিগতে যামিনী জনেক কামিনী অপগত মদরাগ।
পতি আলিঙ্গনে নিবিড় বন্ধনে নমিত কুচাগ্রভাগ ॥
প্রিয়তম ভুক্ত চারুচিহ্ন যুক্ত নিরখিয়া নিজকায়।
শয়নের ঘরে ত্যজি গৃহান্তরে হাসিয়া হাসিয়া যায় ॥১১॥

গন্ধে বিমোহন অগুরু চন্দন মোদিত সে গন্ধভরে।
ছিন্ন পুষ্পমাল মুক্ত কেশজাল কুঞ্চিতাগ্র ধরিকরে ॥
নিম্ন নাভিধরা কটি ক্ষীণতরা নিতম্বিনী মনোলোভা।
উষার সময় শয়ন নিলয় পরিহরে কিবা শোভা ॥১২।

কনক কমল বদন মণ্ডল সদ্য প্রক্ষালিত জলে।
শ্রুতি তটাসক্ত কি বা সে আরক্ত অপাঙ্গ জিনি পাটলে ॥
প্রলম্বিত বেণী হয়ে দুই শ্রেণী পড়িয়াছে স্কন্ধোপর।
কমলা সমান গৃহে মূর্ত্তিমান প্রভাতে নারী নিকর ॥১৩॥

গুরু উরু ভর করিছে কাতর মাজাখানি কিছু নত।
পয়োধর ভরে ক্লান্ত কলেবরে সুধীর গমনে রত ॥
নিশা কলোচিত সুরত বিহিত পরিহরি বেশ ভূষা।
দিব্য যোগ্য বেশ বনাইছে বেশ বামাগণ হেরি উষা ॥১৪॥

করি নিরীক্ষণ স্তনাগ্রভূষণ নখরে বিভঙ্গ সব।
জানি পরশনে বিভিন্ন দশনে অধর চারু পল্লব ॥
সুখের সুরত বেশ মনোমত অনুভবে রসে রসি।
অরুণ-উদয়ে তরুণী নিচয়ে সাজাইছে মুখশশী ॥১৫॥

গুড়ের বিকার নানা, বর্ণন বিস্তর।
সুমিষ্ট শালির অন্ন, ইক্ষু রসাকর ॥
প্রবল সুরত কেলি কলাপ কলিত।
কন্দর্পের দর্পদীপ সদা প্রোজ্জ্বলিত ॥১৬॥

প্রিয়জন বিরহিত যেই জনগণ।
তাহাদের সন্তাপের হেতু যিনি হন ॥
প্রেয়সি তোমারে হেন শিশির সময়।
সদাকাল হন যেন সুখ রসময় ॥১৭॥

ইতি শিশির বর্ণনা সমাপ্ত।

বসন্ত বর্ণনা

বিকসিত চূতাঙ্কুর খরতর শর ।
মধুপের শ্রেণী ধনু সুশোভিত কর ॥
তাহে কামীজন গণ মন বিদ্ধ করি ।
আইল বসন্ত বীর অহে প্রাণেশ্বরি ॥১॥
সকমল জল, সকুসুম তরুগণ ।
সকামা কামিনী, সসুরভি সমীরণ ॥
সুখময় সন্ধ্যাকাল, দিবা রমণীয় ।
বসন্তে সকলি প্রিয় দেখ কমনীয় ॥২॥
মণিময় মেখলায় আর বাপীজলে ।
সুধাকর করে তথা প্রমদা মণ্ডলে ॥
কুসুম ভারেতে নত চূত তরুগণে ।
কিবা শোভা ঋতুরাজ দিতেছে এক্ষণে ॥৩॥
স্তনেহার সহকার সিত সুচন্দন ।
ভুজ লতিকায় পরি বিজটা কঙ্কণ ॥
কটিতটে কাঞ্চি শোভি নিতম্বিনী গণ ।
অভয়ে অনঙ্গ সুখ বিতরে এখন ॥৪॥
কুসুম ফুলের রঙ্গে রঞ্জিত বসনে ।
বিনোদ বিচিত্র শোভা বিলাসিনী গণে ॥
কঙ্কুমেতে অরুণিত চিকণ কাঁচলি ।
পয়োধরে ধরে সব প্রমদা আবলি ॥৫॥
শ্রুতিমূলে দোলে অভিনব কর্ণিকার ।
অলকে অশোক, হৃদে তার ফুলহার ॥
কবরীতে বেড়ি নব মল্লিকার মালা ।
অপরূপ শোভায় শোভিত যত বালা ॥৬॥
কনক সরসীরুহ সম শোভাকর ।
পত্রলেখা যুক্ত প্রমদার মুখোপর ॥
আর মুক্তামালা সঙ্গ হেতু পয়োধরে ।
সমুদ্গত হয়ে স্বেদ বিন্দু বিন্দু ক্ষরে ॥৭॥
ঘনশ্বাসে কাঁচলী কষণ শ্লথ করে ।
জর জর কলেবর ফুলশর-শরে ॥
কাছে বসি প্রাণেশ্বর তথাপি অন্তরে ।
অনঙ্গে অস্থির হয় ললনা নিকরে ॥৮॥
তনুতনু পাণ্ডুবর্ণ সদালসে ঢলে ।
মুহুর্মুহুঃ হাই উঠে বদন কমলে ॥
অনঙ্গ অনঙ্গা অঙ্গ, দেখ প্রাণপ্রিয়ে ।
লাবণ্য রসেতে এবে দিল গলাইয়ে ॥৯॥
নয়নে বিলোল ভাব মদিরা-অলস ।
গণ্ডে পাণ্ডুবর্ণ, স্তনে কঠিন পরশ ॥

জঘনে পীবরভাব, নিতম্বে বিনতি ।
রমণীতে বহুরূপ ধরে রতি পতি ॥১০॥
নিদ্রারসে সব অঙ্গ বিহ্বল বিবশ ।
বচনেতে কিছু কিছু মদিরা-অলস ॥
কুটিল কটাক্ষ যুক্ত চাহিনী-চঞ্চল ।
কাম এবে কামিনীতে দিল এ সকল ॥১১॥
প্রিয়ঙ্গু কালীয় সহ কুঙ্কুম কেশর ।
অঙ্গরাগে বিচর্চ্চিত করি পয়োধর ॥
মৃগনাভি মিশাইয়ে সহিত চন্দন ।
তনুরাজী মাজিতেছে মদালসাগণ ॥১২॥
পরিহরি স্থূলবাস, চিকণ বসন ।
অলক্তের রঙ্গে তার করিয়া রঞ্জন ॥
কালাগুরু ধূপে পুনঃ সুরভি-নিধান ।
স্মর-শরাহত গণ করে পরিধান ॥১৩॥
রসাল রসেতে মাতি অই পিকবর ।
চুম্বিতেছে প্রিয়ামুখ সাদর অন্তর ॥
নলিনীতে বসি অই ভ্রমর গুঞ্জরি ।
তোষামদে তুষিতেছে প্রেয়সী-ভ্রমরী ॥১৪॥
অরুণিত পল্লব প্ররোহে হত নত ।
মুকুলিত চারু শাখা আম্রতরু যত ॥
দেখ প্রিয়ে পবনেতে হইয়ে চঞ্চল ।
প্রমদার মনে করে প্রণয় প্রবল ॥১৫॥
কিবা সে লোহিত বর্ণ জিনিয়া প্রবাল ।
মূলাবধি পুষ্পচয় সহিত প্রবাল ॥
অশোকে নিরখি নব বিরহিনী চয় ।
সশোক হৃদয় আজ হইল নিশ্চয় ॥১৬॥
মত্ত মধুকরে বিচুম্বিত চারুফুল ।
সুধীর সমীরে দোলে কিশলয় কুল ॥
নব অতিমুক্ত লতা করি দরশন ।
সমুৎসুক হয় যত যুবকের মন ॥১৭॥
কান্তানন কান্তি হরি হেরলো প্রেয়সি !
কুরুবক অচিরাৎ উঠিল বিকসি ॥
নিরখি অপূর্ব্ব শোভা মঞ্জরী নিকরে ।
কার মন বিদ্ধ নহে কুসুমেষু-শরে ॥১৮॥
অনল সমান দীপ্ত, পবনে চঞ্চল ।
পুষ্পিত পলাশ বনে ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল ॥
সদ্য যেন সমাগতে ঋতু পুষ্পাকর ।
নববধূ সম ধরা পরে রক্তাম্বর ॥১৯॥

দহেনি কি সে কিংশুক শুক-মুখাকার !
হরিতে কি বাকি রাখিয়াছে কর্ণিকার ॥
তাই পুনরপি পিকগণ মধুস্বরে।
সুমুখি হে ? যুবাদের সদা মন হরে ॥২০।
প্রফুল্ল হইয়া পিক ফলরস পানে।
গাহিছে মধুর গীত উন্মাদক তানে ॥
নম্রা সলজ্জা ধীরা কুলবধূ কুল।
গুরুগন কাছে বসি, তথাপি আকুল ॥২১॥
কাঁপাইয়ে কুসুমিত চূত-শাখাচয়ে।
প্রসারিয়ে পরভৃত স্বর রসময়ে ॥
সুভগ বসন্তে বায়ু হিমবৃষ্টি হীন।
প্রমদার মন হরণেতে সুপ্রবীণ ॥২২॥
সবিভ্রম বধূসম বিমল হসিত।
উপবনে কমনীয় কুন্দ বিকশিত ॥
বীতরাগ মুনিমন করয়ে হরণ।
সহজে সামান্য নর প্রেমাসক্ত মন ॥২৩॥
প্রলম্বিত হেমকাঞ্চী আর হারবতী।
কন্দর্পের দর্পে তনু শিথিলিত অতি ॥
মধুমাসে মধুর মধুপ পিকস্বরে।
রভসে যুবতী যত যুবা মন হরে। ২৪॥
বিবিধ বিনোদ পুষ্পতরু শোভাবৃত।
সানুদেশ হরষিত পিকরবে রুত ॥
শৈলয়াদি পরিণদ্ধ শিলাগুহাগণে।
মানস মোহিত হেন শৈল দরশনে ॥২৫॥
প্রবাসী, প্রেয়সী বিনা সন্তপ্ত হৃদয়।
নিরখিয়া কুসুমিত চূত তরুচয় ॥
নয়ন মুদ্রিত করি কাঁদে উচ্চস্বরে।
ঘ্রাণপথ আচ্ছাদন করি দুই করে ॥২৬॥
মত্ত মধুকর ধ্বনি, কোকিল হুঙ্কার।
কুসুমিত সহকার আর কর্ণিকার ॥
শরচয়ে তীক্ষ্ণ এই আয়ুধ নিকরে।
মদন মানিনী মন প্রপীড়ন করে॥২৭॥
মৃদু সমীরণে কাঁপি আম্র তরুগণ।
চারু স্বর্ণবর্ণ পুষ্প করে বরিষণ ॥
পথে যেতে পুরোভাগে হেরিয়ে বিকল।
স্মর শরে মোহ যায় প্রবাসী সকল ॥২৮॥
কল কোকিলের রবে মধুর বচন।
কুন্দের প্রভায় স্মিত দশন কিরণ ॥
কর-কান্তি রাখি বিক্রমাভ পত্রোপরে।
রামাগণে ঋতুরাজ উপহাস করে ॥২৯॥
কনক কমল মুখ কপোল পাণ্ডুর।
বিভূষিত হারে চন্দনাক্ত পয়োধর ॥
মদনের জন্মদাতা কটাক্ষের শরে।
মুনীন্দ্রে কাঁপায় নারী নত স্তন ভরে ॥৩০॥
অরুণিত আঁখি মুখপদ্মে মধুবাস।
চারু নব কুরুবকে গাঁথা কেশ পাশ ॥
লয়ে গুরুতর পয়োধর শ্রোণিভার।
কাম কার্য্যে কামিনীর অকার্য্য কি আর ॥৩১॥
ফুল্ল সহকার ফুলে সুরভিত হয়ে।
কাঁপাইয়ে জিতেন্দ্রিয় মুনীন্দ্র হৃদয়ে ॥
মদাকুল অলিকুল কলপিক স্বরে।
প্রেয়সি ! পবন কর্ণ ঝালাপালা করে ॥৩২॥
রমণীয় সন্ধ্যাকাল, ফুটে শশিকর।
সুগন্ধি পবন তথা কোকিলের স্বর ॥
মত্ত অলিরব, সর্ব্বরীতে সীধু পান ॥
সব হেরি কন্দর্প কেলির সুনিধান ॥৩৩॥
তরুছায়া অভিলাষ করে জনগণ।
নিশায় বাঞ্ছিত পুন সুধাংশু কিরণ ॥
সুখ শয়নের স্থল স্নিগ্ধ হর্ম্ম্যতল।
কান্তা কোলে করে কামী হইতে শীতল ॥৩৪॥

মধুর মার্দবময় মলয় মারুত বয়
উল্লসিত ললিত-লহরী।
মধুকর পরিকর আলিঙ্গিত কলেবর
অভিনব মাকন্দ মঞ্জরী ॥
সরোবর তীরোপরে গাহিছে পঞ্চম স্বরে
বসি পিক মহীরুহ ডালে।
দেখি শুনি এ সকলে হা-কষ্ট বিরহী দলে
প্রিয়া বিনা এ বসন্ত কালে ॥৩৫॥
মলয়জ সমীরণে বিদ্ধ হয়ে অনুক্ষণে
রমণীয় কোকিলের স্বরে।
সহিত সুগন্ধ মন্দ করিতেছে মকরন্দ
তাহে সুরভিত কলেবরে ॥৩৬॥
নানাবিধ মধুকরে যূথে যূথে নিরন্তরে
প্রসারিত করি সব স্থান ॥
বসন্ত ঋতুর পতি প্রেয়সি, তোমার প্রতি
সুখরাশি করুন প্রদান ॥৩৭॥

বসন্ত বর্ণনা সমাপ্ত।

নীতি কুসুমাঞ্জলি

[এই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুল-রচিত কবিতাকলাপ অনুবাদিত হইবে। কোন গ্রন্থবিশেষ পর্য্যায়ানুক্রমে অনুবাদিত হইবে না—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাস, কাব্য প্রভৃতিতে যখন যে মনোজ্ঞ-হিত কথা নয়নপথে পতিত হইবে, তখন তাহারই মর্ম্মানুবাদ সঙ্কলন করা অভিপ্রায় মাত্র।]

প্রথম অঞ্জলি

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময়।
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদ্বয় ॥
তার এক কাব্যামৃত-রস-আস্বাদন।
অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন ॥১॥

দ্রুমালয়, ভক্ষ্য ফল দল, পেয় জল।
তৃণনিচয়েতে শয্যা, বসন বল্কল ॥
বনে ব্যাঘ্র-গজ-সেবা বরং মঙ্গল।
এ ভবে বিভবহীন জীবন বিফল ॥২॥

মাণিক কুগ্রহফলে, লুটায় চরণতলে,
কাঁচ যদি উঠে বা মাথায়।
মাণিক মাণিক রবে, কাঁচে লোক কাঁচ কবে,
থাক্ তারা যথায় তথায় ॥৩॥

কাক কৃষ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর,
উভয়েই এক বর্ণ ধৃত।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভৃত ॥৪॥

ইতর পাপের ফল ভোগের কারণ।
যেইরূপ ইচ্ছা তব কর নিয়োজন ॥
কিন্তু অরসিকে যেন কবিত্বে ভজনা।
লিখনা ললাটে ধাতা লিখ না লিখ না ॥৫॥

ভয়ানক ভাবধর, করিরাজ কুম্ভবর,
ভেদকারী কথা সুনিশ্চয়।
বায়ু চেয়ে বেগগতি, গিরিগুহা গৃহপতি,
তব সিংহ পশু বই নয় ॥৬॥

বায়সের যদি হয়, চঞ্চুটি স্বর্ণময়,
মাণিকে মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতিপক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমল-জ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয় ॥৭॥

কোকিল গর্ব্বিত নহে চূতরস পিয়ে।
ভেক মক্ মক্ করে কর্দ্দম খাইয়ে ॥৮॥

রোহিত রহিত-দর্প গভীর পুষ্করে।
একাঙ্গুল জলে পুঁটি ছটফট করে ॥৯॥

মেঘাগমে স্তব্ধ যত পরভৃতগণ।
ভেক ভায়া যথা বক্তা, মৌনই শোভন ॥১০॥

শিখরেতে থাকে শিখী, গগনে নীরদ।
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ ॥
কুমুদবান্ধব কত লক্ষান্তরে রয়।
যে যাহার বন্ধু হয় কভু দূর নয় ॥১১॥

মাতা নিন্দাপরায়ণ, পিতা প্রিয়বাদী নন,
সোদর না করে সম্ভাষণ।

ভৃত্য রাগে কহে কত, পুত্র নহে অনুগত,
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥
পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ,
কিছুমাত্র কথা নাহি কয়।
ওরে ভাই এ কারণ, কর ধন উপার্জ্জন,
ধনেতেই সব বশ হয় ॥১২॥

ধনেতেই অকুলীন, কুলীন-কুমার।
ধনেতেই পায় লোকে আপদে নিস্তার ॥
ধন চেয়ে এ সংসারে বন্ধু কেহ নয়।
তাই ভাই কর কর ধনের সঞ্চয় ॥১৩॥

ব্রহ্মহত্যা করি লোকে, পূজ্যপাদ হয় লোকে,
যদি তার প্রচুরার্থ থাকে।
শশিতুল্য সুকুলীন, যদি হন ধনহীন,
কেবা বল গ্রাহ্য করে তাকে ॥১৪॥

অতিশয় চলচিত্ত, চপল যে কিছু বিত্ত,
সুচঞ্চল জীবন যৌবন।
সকলেই চলাচল, যার আছে কীর্ত্তিবল,
তার মাত্র অচল জীবন ॥১৫॥

সেই জন সজীবন, সেই জন যশোধন,
সজীব যে জন কীর্ত্তিমান্।
অযশ অকীর্ত্তি যার, জীবন কোথায় তার,
বেঁচে থাকা মৃতের সমান ॥১৬॥

কখন সন্তুষ্ট, কখন বা রুষ্ট,
তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।
হেন মতিচ্ছন্ন, হল্যেও প্রসন্ন,
ভয়ঙ্কর মানি মনে ॥১৭॥

গ্রন্থগত-বিদ্যা, পরহস্তগত ধন।
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হল্যে প্রয়োজন ॥১৮॥

উদ্যোগী পুরুষসিংহে লক্ষ্মীর আসন।
কাপুরুষে কহে দৈব ধনদাতা হন ॥
দৈব দূর ক'রে আত্মশক্তি কর সার।
যত্নে সিদ্ধ না হইলে দোষ বল কার ॥১৯॥

সম্পদে কর্কশ, খলের মানস,
আপদেই সুকোমল।
সুশীতল পয়, * সুকঠিন হয়,
কিন্তু মৃদু তপ্ত জল ॥২০॥

গুণীর যে গুণ তাহা, জানে গুণধর।
অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর ॥
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন।
নাসিকাই জানে, কভু না জানে লোচন ॥২১॥

ক্ষোভের যাতনা সহে সাধুশীল নর।
সহিতে না পারে কভু ইতর পামর।
মহা শাণ ঘর্ষণেতে হীরাই সক্ষম।
চড়াইলে চূর্ণ হয় চামড়া অধম ॥২২॥

স্বজাতীয় বিনা বৈরী পরাভূত নয়।
হীরাতেই ছিদ্র করে মণিমুক্তাচয় ॥২৩॥

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধন করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপপয়, প্রায় তৃষা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবারে? ২৪॥

এক ভূমিজাত, ঐক্য কাণ্ড আর দলে।
কেবা শালি, কেবা শ্যামা, পরিচয় ফলে ॥২৫॥

মুখ ভরি অন্ন দিলে কে না বশ হন।
মৃদঙ্গে মধুর ধ্বনি অর্পিলে ক্ষীরণ ॥২৬॥

রত্নাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয়।
তাহে বা কি বিন্ধ্যাচলে আছে করিচয় ॥
কি ফল মলয়াচলে চন্দন-কানন।
পরের হিতেই শুদ্ধ সাধুজন-ধন ॥২৭॥

* কর্কর প্রভৃতি।

বিকসিত বকুল-মুকুলে যেই জন।
তৃষাতেও না করিত চরণ চারণ॥
আহা আহা হা বিধাতা সেই মধুকরী।
বিপদে পড়িয়া সার করিলা বদরী॥২৮॥

পিপাসায় গিয়ে আমি সিন্ধু-সন্নিধান।
শুদ্ধ এক গণ্ডূষ করিনু জল পান॥
জলধির দোষমাত্র তাহে কিছু নাই।
আমার কর্ম্মের ফল ফলিয়াছে ভাই॥২৯॥

কি ফল নির্ব্বাণ দীপে তৈল দান করা।
চোর গতে সাবধান কিসে যায় ধরা॥
কি ফল কামিনী কেলি সমাগতে জরা।
কি ফল প্রবাহ গতে আলি বন্ধ করা॥৩০॥

বরং অসিধারে কিম্বা তরুতলে বাস।
বরং ভিক্ষা করা ভাল, কিম্বা উপবাস॥
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন।
তথাপি লয়ো না গর্ব্বী জাতির শরণ॥৩১॥

কুজনের সেবা আর কু-গ্রামে নিবাস।
কুভোজন, ক্রোধমুখী ভার্য্যা সহবাস॥
বিধবা তনয়া আর বিদ্যাহীন সুত।
অনল-বিরহে তনু করে ভস্মীভূত॥৩২॥

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমলনিকর॥
অচল সচল হয় অনল শীতল।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল॥৩৩॥

যথা নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চরয়ে জল,
সেরূপ লক্ষ্মীর আগমন।
গজভুক্ত কথ্ বেল, সেরূপ লক্ষ্মীর খেল,
পলায়ন করেন যখন॥৩৪॥

অতি রমণীয় কার্য্যে পিশুন যে জন।
সবিশেষ যত্নে করে দোষ অন্বেষণ॥
যথা অতি রমণীয় চারু কলেবরে।
ব্রণ অন্বেষণ করে মক্ষিকানিকরে॥৩৫॥

সদ্‌গুণীর যত গুণ, বর্ণনায় সুনিপুণ,
যিনি হন সাধু সদাশয়।
নব চূতাঙ্কুররস, পান করি হয়ে বশ,
কোকিল ললিত কুহরয়॥৩৬॥

সতের সদ্‌গুণ, দুর্জ্জন পিশুন,
ক্ষণেকে দূষিত করে।
যথা ধূমরাশি, বিমলতা নাশি,
মলিন করে অম্বরে॥৩৭॥

যত্র দোষচয়, প্রকটিত হয়,
বিভাত না হয় গুণ।
চন্দ্রে মৃগরেখা, স্পষ্ট যায় দেখা,
প্রসন্নতা তাহে ন্যূন॥৩৮॥

কাম-ক্রোধজাত দোষ বিবেক বিলয়।
ভাস্কর কিরণে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষয়॥৩৯॥

উপদেশ উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধিমান্।
বিফল নির্ব্বোধ জড়ে উপদেশ দান॥
কুসুম-সুরভি তিল করে আকর্ষণ॥
যব তাহে ক্ষমবান্ নহে কদাচন॥৪০॥

মরণেও সদ্‌গুণীর গুণের প্রচার।
পুড়িলে চন্দন-কাষ্ঠ সৌরভ-বিস্তার॥৪১॥

দুষ্টের দৌর্জ্জন্যচয়, কখন কি গতি হয়,
কি করে বা উত্তম আকরে।
জনমিয়া রত্নাকরে, প্রাণিগণ-প্রাণ হরে,
কালকূট বিস ভয়ঙ্করে॥৪২॥

উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জন ।
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধা পিয়ে সুরগণ ॥৪৩॥

আপদেও অবিকৃত স্বভাব সাধুর ।
পাবকে পড়িয়া গন্ধ বিতরে কর্পূর ॥৪৪॥

আপৎসময়ে সাধু আরো শোভাকর ।
রাহুগ্রস্ত সুধাকর দ্বিগুণ সুন্দর ॥৪৫॥

যদি এ জগৎ কভু পদ্মশূন্য হয় ।
আবর্জনা-পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময় ॥
তবে কি মৃণালভোজী রাজহংসগণ ।
কুক্কুটের প্রায় করে মল অন্বেষণ ॥৪৬॥

মদযুক্ত মাতঙ্গের মস্তক-উপরে ।
সিংহ-শিশু পড়ে গিয়া মহাঘোর স্বরে ॥
প্রকৃতিতে জাত এই স্বত্ব-মহাধন ।
বয়সের ধর্ম্ম ইহা নহে ত কখন ॥৪৭॥

সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি ।
দশ ব্যাঘ্র, সপ্ত সিংহ, তিন হস্তী সনে ।
অবহেলে পরাভূত করিয়াছি রণে ॥
তোমাতে আমাতে অদ্য হইবে সমর ।
দেখুন দেখুন আসি যতেক অমর ॥

শূকরের প্রতি সিংহের উক্তি ।
যা রে যা বিহিত দূরে শূকর-নন্দন !
সিংহজয়ী বলি বৃথা কর আস্ফালন ॥
সিংহ শূকরের বলে ভেদ কত দূর ।
ভালমতে জ্ঞাত যত পণ্ডিত ঠাকুর ॥৪৮॥

বিশেষ যত্নের সহ, নিঙ্গড়িলে অহরহ,
বালুকায় তৈল পেতে পার ।
পান করি মৃগতৃষ্ণা, সলিল-পানের তৃষ্ণা,
বুঝি কভু হইবে সংহার ॥
কদাচিৎ পর্য্যটন, করিয়া মানবগণ
শশশৃঙ্গ পাইতেও পারে ।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কিছু ফল নাই এ সংসারে ॥৪৯॥

মকরের ভয়যুক্ত, দন্ত থেকে করি মুক্ত,
সদ্য মণি উদ্ধারিয়া লও ।
তরঙ্গেতে অনিবার, তরলিত পারাবার,
সন্তরিত পার হবে হও ॥
রোষযুক্ত বিষধর, ফণা ঘোর ভয়ঙ্কর,
ধর গিয়া কুসুম আকারে ।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর
কোন ফল নাই এ সংসারে ॥৫০॥

যদবধি তব, ছিল হে শৈশব,
তদবধি ক্রীড়াসক্ত ।
যৌবন রসাল, ছিল যত কাল,
তরুণীতে অনুরক্ত ॥
এলো বৃদ্ধকাল, সহ চিন্তাজাল,
সতত রহিলে মগ্ন ।
পরম-ঈশ্বরে, আপন অন্তরে,
কভু না করিলে লগ্ন ॥৫১॥

দিবস যামিনী আর প্রদোষ প্রভাত ।
শিশির বসন্ত সদা করে গতায়াত ॥
কালক্রীড়া-রত, গত হইতেছে আয়ু ।
তথাপি না পরিত্যাগ করে আশা-বায়ু ॥৫২॥

শরীর গলিত, কেশ হইল পলিত ।
মুখ থেকে দন্তগুলি হইল স্খলিত ॥
করেতে ধরিয়া দণ্ড কাঁপিতেছে কায় ।
তথাপিও ভণ্ড আশা না ছাড়ে আমায় ॥৫৩॥

যদবধি ধন কর উপার্জ্জন,
নিজ পরিজন করয়ে স্নেহ।
যখন জরায়, জর্জ্জর করায়,
তখন ধরায় নাহিক কেহ ॥৫৪॥

অষ্ট কুলাচল আর সাতটি সাগর।
রুদ্র দিনকর আর ব্রহ্মা পুরন্দর।
আমি তুমি তারা কেহই না রবে।
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে ॥৫৫॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার।
কেবল সক্ষম কর আত্মা আপনার ॥
আত্মজ্ঞানহীন যেই, সেই জন মূঢ়।
তাহারেই পচাইবে নরক নিগূঢ় ॥৫৬॥

দেবতামন্দির কিম্বা তরুমূলে বাস।
ভূমিতল শয্যা আর মৃগচর্ম্ম বাস ॥
সকল প্রকার কর্ম্মভোগ পরিহার।
বৈরাগ্য সুখদ বল না হয় কাহার ॥৫৭॥

অনর্থের মূল বিত্ত, মনেতে ধিয়াও নিত্য,
নাহিক তাহাতে সুখলেশ।
ধনভাগে পুত্রগণ, নানা দ্রোহ-পরায়ণ,
নীতি-শাস্ত্র-বর্ণিত বিশেষ ॥৫৮॥

কে তব ললনা, কে পুত্র বল না,
কি আশ্চর্য্য এ সংসারে।
তুমি কার ছেল্যে, কোথা থেকে এল্যে,
মনে ভাব ভাই আরে ॥৫৯॥

ধন জন কি যৌবন, মদে মত্ত হয়ে মন,
করো্যা না করো্যা না অহঙ্কার!
এ সব বিভবজাল, দেখিতে দেখিতে কাল,
নিমিষেতে করয়ে সংহার ॥

মায়াময় এ সংসার ওরে মন অনিবার,
ভাবনা করিয়া এই সার।
ব্রহ্মপদে আশু মজ, ভজ ভক্তিভাবে ভজ,
তোরে বল কি বলিব আর ॥৬০॥

কমলের দলে জল, সদা করে টল টল,
তার চেয়ে জীবন তরল।
ব্যাধি ঘোর বিষধর, গ্রাসে গ্রস্ত যত নর,
শোকানলে প্রতপ্ত সকল ॥৬১॥

তত্ত্ব চিন্তা কর ভাই অবিরত চিত্তে।
পরিহার কর চিন্তা বিনশ্বর বিত্তে ॥
ক্ষণেক সজ্জন-সঙ্গ কর যত্ন করি।
সেইমাত্র ভবসিন্ধু তরিবার তরী ॥৬২॥

মদে অন্ধবুদ্ধি করী, কর্ণ অবঘাত করি,
তাড়াইয়া দেয় মধুকরে।
তারি গণ্ড-শোভা হত, ভৃঙ্গ গিয়ে মনোমত
বিকচ কমল-বনে চরে ॥৬৩॥

মৃণাল কমল দল যাহার আহার।
মত্ত মাতঙ্গিনী সহ যে করে বিহার ॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রময়ে সেই কন্দর-নিকরে।
যাহার পানীয় পয় পর্ব্বত-নির্ঝরে ॥
সেই বন্য করী নিপতিত নরকরে।
তৃণরাশি চিবাইয়া দেহ রক্ষা করে ॥৬৪॥

গ্রহ-পীড়া প্রাপ্ত নিশাকর দিনকর।
অবরুদ্ধ বিষধর আর কবিবর ॥
মতিমানে ধনহীন করি বিলোকন।
বিধাতাই বলবান্ জানিনু এখন ॥৬৫॥

আকাশ-একান্তে চরে, বিহঙ্গম পরিকরে,
তারাও আপদ ছাড়া নয়।
সাগরেতে মীনচয়, অগাধ সলিলে রয়,
চতুর চাতরে নষ্ট হয় ॥

কি লাভ উত্তম স্থানে, কিবা কর্ম অনুষ্ঠানে,
বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘত।
বিপদ প্রসর করে, বসি কাল দুরান্তরে,
সকলেরে করে আকর্ষণ ॥৬৬॥

সিংহ-নখে বিদারিত, করিকুম্ভ-বিগলিত,
রুধিরাক্ত চারু মুক্তা ফলে।
বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে॥
দেখি তায় শুভ্রতর, সুকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন।
কুস্থাতে পড়িলে পর, মনস্বী মনুষ্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন ॥৬৭॥
হে অশোক তরুবর, কিবা কার্য্য নম্রতর,
শাখা আর উন্নত মস্তক।

কি কাজ কোমল-দল, লীলারসে ঢল ঢল,
কমনীয় কুসুম-স্তবক॥
যেহেতু তোমার তলে, বিষণ্ণ পথিকদলে,
খিন্ন হয়ে করি কত স্তব।
মৃদু মধুযুক্ত ফল, না পাইয়ে সুবিকল,
অন্তরেতে প্রাপ্ত পরিভব ॥৬৮॥

সারহীন হে শিমূল, অতি দূরে তব মূল,
কণ্টকে আবৃত পুন কায়।
ছায়াশূন্য তব দল, যে আছে তোমার ফল,
বানরেও নাহি খায় তায়॥
কুসুমেতে নাহি গন্ধ, নাহি মাত্র মকরন্দ,
কোন গুণ নাহিক তোমার।
থাক থাক, আমি যাই, কিছুমাত্র ফল নাই,
তবাশ্রয়ে থাকিয়ে আমার ॥৬৯॥

পদ্মবন মনে ভাবি ধায় হংসদল।
সুরভির লালসায় ভ্রমর চঞ্চল॥
স্বাদু ফল ভাবি ব্যস্ত পথিক সকল।
মাংস ভাবি গৃধিনী শকুনি সুবিকল॥
দূরে থেকে দেখি সমুন্নত পুষ্পচয়।
সারহীন মিথ্যা সে উন্নতি সুনিশ্চয়॥
ওরে রে শিমূল গাছ বল কি কারণ।
চিরকাল জগতেরে করিছ বঞ্চন ॥৭০॥

শুকপক্ষীর উক্তি।

কাঞ্চন-পিঞ্জরে, থাকি নিরন্তরে,
নৃপতির করে, মার্জ্জিত কোমলকায়।
খাই সুরসাল, দাড়িম্ব রসাল,
পান করি ভাল, পয়ঃসুধা পিপাসায়॥
সমাজেতে হাম, পড়ি অবিশ্রাম,
রাম রাম নাম,তবু কেন হায় হায়।
কানন-ভিতরে, কোন তরুপরে,
জনমকাটেরে, সদা মম মন্ ধায় ॥৭১॥

মিত্রে কর বশীভূত বিমল ব্যাভারে।
রিপুজয় কর যুক্তি বল সহকারে॥
লোভিজন ধনদানে, কার্য্যেতে ঈশ্বরে।
যুবতীরে প্রেমে, দ্বিজগণে সমাদরে॥
সমভাবে বশ কর কুটুম্বনিকরে।
বাদীপ্রতি স্তুতি আর ভক্তি গুরুবরে॥
মূর্খে নানা কথা কয়ে, রসিকেরে রস।
শীলতা গুণেতে কর সকলেরে বশ ॥৭২॥
নৃপতির নীতি আর গুণীর বিনতি।
যুবতীর লজ্জা, দম্পতির স্থির রতি॥
গৃহের শোভন শিশু, বুদ্ধির কবিতা।
তনুর লাবণ্য মতি স্মৃতি-সমন্বিতা॥
দ্বিজের প্রশান্তি ক্ষমা ক্রোধাসক্ত জনে।
সত্যের সুস্থতা, গৃহাশ্রম শোভা ধনে ॥৭৩॥
ছিন্ন হইলেও তরু উঠে পুনরায়।
ক্ষয় পেয়ে পুন হয় শশাঙ্কের কায়॥
এইরূপ চিন্তা করি সদাশয়গণ।
বিষম বিপদে তপ্ত কদাচ না হন ॥৭৪॥

কমল আকরে, কমলনিকরে,
দিনকর ফুল্ল করে।
কিবা চক্রবাল, কুমুদিনী দল,
বিকাশে বিধুর করে ॥
প্রার্থনা বিহনে, জলধরগণে,
করয়ে সলিল দান।
বিনা আবাহন, পরার্থে সুজন,
করেন হিত বিধান ॥৭৫॥

ফলভরে নত হয় বিটপী-নিকর।
নবজলে ভূমে নামি পড়ে জলধর ॥
অনুদ্ধত সুজনের শ্রেষ্ঠ হয় ধন।
স্বভাবত পরহিতে করেন যোজন ॥৭৬॥

কৃপণতা হরে যশ, ক্রোধে গুণচয়।
ক্ষুধায় মর্য্যাদা, দম্ভে সত্যনাশ হয় ॥
বিপদে স্থৈর্য্যের নাশ, ব্যসনেতে ধন।
বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনষ্ট ব্রাহ্মণ ॥৭৭॥

ক্রূরতায় কুলনাশ, মদেতে বিনয়।
অসাধ্য চেষ্টায় হয় পুরুষার্থ ক্ষয় ॥
দরিদ্র দশায় সমাদর পরিগত।
মমতায় আত্মার প্রভাব হয় হত ॥৭৮॥

বল বল কারে বল, নারীর যৌবন বল,
তোষামোদ পর-প্রত্যাশীর।
প্রতাপ নৃপতিগণে, সত্য বল সাধুজনে,
সুসঞ্চয় সামান্য ধনীর ॥
ঠকেদের বাক্‌ছল, পণ্ডিতের বিদ্যাবল,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ক্ষমা-বল।
কুলের একতা বল, যথা ব্যয়ে বিত্ত ফল,
শান্ত বল বিবেক কেবল ॥৭৯॥

দলাদলি প্রিয় হয়ে বিদ্যাবান্ জ্ঞানী।
ধনহীন গৃহী আর পরাধীন মানী ॥
পরবল সুখী তথা সধন কৃপণ।
বৃদ্ধ হয়ে নাহি করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
নৃপতি কুমন্ত্রিবশ, মূর্খ সুকুলীন।
পুরুষ হইয়ে হয় নারীর অধীন ॥
সৎক্রিয়া-বিহীন ব্রহ্মজ্ঞানী পদ পেয়ে।
কিবা আর হাস্যাস্পদ ইহাদের চেয়ে ॥৮০॥

উৎপাটিত যিনি পুন করেন রোপণ।
প্রফুল্ল হইলে পুষ্প করেন চয়ন ॥
সুতরুণ তরুগণে পোষেণ যতনে।
প্রোন্নতকে নত উন্নয়ন নতগণে ॥
ছাড়াইয়া দেন যথা জড়াজড়ি হয়।
বাহির করেন ঘোর কণ্টকী-নিচয় ॥
যেখানে দেখেন তরু হইতেছে ম্লান।
সেইখানে জলসেচ করেন প্রদান ॥
প্রয়োগ-নিপুণ হেন মালীর সমান।
সর্ব্বদা থাকুক সুখে রাজা কীর্ত্তিমান্ ॥৮১

কুসুম-স্তবকাকার, দ্বিপ্রকার ব্যবহার,
প্রাপ্ত হন জ্ঞানবান্ মনুষ্য-নিকরে।
সর্ব্বলোক-শিরোপরে, অপরূপ শোভা ধরে,
অথবা বিশীর্ণ হন কানন-ভিতরে ॥৮২॥

অনল শীতল হয়, সলিল-সম্পাতে।
ছত্রে ভানু-কর, করী অঙ্কুশ-আঘাতে ॥
গো গর্দ্দভ বশীভূত লাঠির প্রহারে।
ভেষজেতে ব্যাধি, মন্ত্রে গরল নিবারে ॥
সর্ব্বত্র ঔষধ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে।
সকল ঔষধ ব্যর্থ মূর্খদের কাছে ॥৮৩

সজ্জন-সঙ্গমে বাঞ্ছা পরগুণে প্রীতি।
পত্নী প্রতি রতি, আর অপযশে ভীতি।

গুরুজন প্রতি যথা নম্র আচরণ।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বিদ্যায় ব্যসন ॥
ইন্দ্রিয়দমনে শক্তি, সেই শক্তি সার।
সেই মুক্তি কপট সংসর্গ পরিহার ॥
যাঁহাদের আছে হেন চারু-গুণগ্রাম।
তাঁহাদের পদে মম সহস্র প্রণাম ॥৮৪॥

রাজা ধর্ম্মহীন, শুচিবিহীন ব্রাহ্মণ।
সত্যহীন দারা, জ্ঞানহীন যতিগণ ॥
গতি-হীন অশ্ব, জ্যোতি-বিহীন ভূষণ।
ব্রতহীন তপ, বীরহীন যোদ্ধাগণ ॥
ছন্দোহীন গান, স্নেহ-হীন সহোদর।
ঈশহীন নরে, ত্যজে শীঘ্র সুধীবর ॥৮৫॥

ক্ষীণফল তরু ত্যজে বিহঙ্গ-নিকর।
সারস ত্যজিয়া যায় শুষ্ক-সরোবর ॥
পর্য্যুষিত পুষ্পত্যাগ করে মধুকর।
কুরঙ্গ ছাড়িয়া যায় দগ্ধ-বনান্তর ॥
বার-বধূ ত্যজে নর হইলে নির্ধন।
শ্রীভ্রষ্ট ভূপালে পরিহরে মন্ত্রিগণ ॥
ফলতঃ সংসারে কেহ কারু বশ নয়।
কার্য্যবশে সকলেই রমণীয় হয় ॥৮৬॥

দীনজনে দান নাই তবে কিবা ধন।
সে কি সেবা পরহিতে অভাব যতন ॥
কি কাজ বিবাহে যদি না হেরে নন্দনে।
বল্লভা-বিরহ যদি কি কাজ যৌবনে ? ॥৮৭॥

নিত্য ধনাগম আর নিত্য অরোগিতা।
প্রিয়তমা প্রিয়ংবদা সদা পরিণীতা ॥
বশীভূত পুত্র, বিদ্যা অর্থকরী হয়।
এই ছয় গৃহস্থের সুখের নিলয় ॥৮৮॥

সুত বলি তারে, যে জন পিতারে,
সুখ দেয় সুচরিতে।
সেই ত কামিনী, যে দিবা-যামিনী
চিন্তয়ে পতির হিতে ॥
মিত্র সেই হয়, সমভাবে রয়,
সুসময় অসময়।
বহু পুণ্যফলে, এ জগতীতলে,
এই তিন লাভ হয় ॥৮৯॥

ভোগেতে রোগের ভয়, কুলে ভয় ক্ষয়।
মানে দৈন্য ভয়, আর বলে রিপু ভয় ॥
যদি কিছু ধন থাকে সদা ভয় ভূপে।
নিরন্তর ভয় আছে তরুণীর রূপে ॥
শাস্ত্রে বাদী ভয়, গুণে খলজনে ভয়।
শরীরের ভয় সদা যম মহাশয় ॥
এ সংসারে কিছুমাত্র ভয়শূন্য নয়।
কেবল বৈরাগ্যে দেখি নাহি কিছু ভয় ॥৯০॥

শশাঙ্কে কলঙ্ক-রেখা, কণ্টক মৃণালে।
যুবতী যৌবন-ক্ষয়, সিঁতি কেশজালে ॥
জলধির জল লোণা, পণ্ডিত নির্ধন।
হা নির্ব্বোধ বিধি ধনলোভী বৃদ্ধগণ ॥৯১॥

দিবসেতে সুধাকর, ধূসর বরণ ধর,
বিগলিত যৌবন ললনা !
কমল-কুসুমবর, বিহীন কমলাকর,
মুখে পর-নিন্দার কলনা ॥
প্রভু ধন পরায়ণ, দীন দশা সর্ব্বক্ষণ,
প্রাপ্ত হন যতেক সুজন।
নৃপতির সন্নিধান, দুরন্ত খলের মান,
এই সাত মনের বেদন ॥৯২॥
দীন যেই জন, শতে আকিঞ্চন,
শতীর হাজারে মন।
হাজারীর লক্ষ্য, হয় এক লক্ষ
লক্ষেশ্বর রাজ্য পণ ॥
রাজা যেই হয়, তৃষা কৃশা নয়,
সম্রাট হইতে চায়।

সম্রাট্ যে জন, চিন্তে অনুক্ষণ,
ইন্দ্রপদ কিসে পায় ॥
সহস্র-লোচন, ভাবে মনে মন,
ব্রহ্মত্ব মিলে আমারে।
বিধি গৌরীশ্বর, হরিপদ হর,
কে গিয়াছে আশাপারে ॥৯৩॥

পাপকর্ম্মে রত দেখি করে নিবারণ।
হিতকর কার্য্যে সদা করে নিয়োজন ॥
অতিশয় গুপ্ত গুণ করয়ে প্রচার।
আপদে কদাচ নাহি করে পরিহার ॥
সময় পড়িলে করে সাহায্য প্রদান।
সুমিত্র-লক্ষণ এই কয় মতিমান্ ॥৯৪॥

শুভাশুভ কর্ম্মফল কালেতে উদয়।
শরদেই আক্ষণ্য সমস্তে না হয় ॥৯৫॥
নীচের সংসর্গে ধনী প্রভা হয় দূর।
তন্ন দণ্ডে লশুনাক্ত মাখিলে কর্পূর ॥৯৬॥

স্বজাতি সহায়ে সিদ্ধ কর্ম্ম সুভঙ্কর।
জল দিয়ে কর্ণজল বহিষ্কৃত কর ॥৯৭॥

উপভোগে ভোগীদের ভোগেচ্ছা না যায়।
যত সুণ খাও তত তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ॥৯৮॥
স্বভাব-সুন্দরে কিবা কার্য্য সংশোধনে।
মুক্তারে না ঘুড়ে কেহ শাণের ঘর্ষণে ॥৯৯॥

ভুবন-রঞ্জনকারী শীলতা যাঁহার।
অঙ্গেতে প্রদীপ্ত আছে নিকটে তাঁহার ॥
বহ্নি হয় জল, জলনিধি হয় কূপ।
মৃগপতি মৃগ, মেরু শিলার স্বরূপ ॥
ভুজঙ্গ হইতে হয় পুষ্পমালা সৃষ্টি।
বিষরস হইতে অমৃত হয় বৃষ্টি ॥১০০॥

বিদ্যা-বিভূষিত খলে পরিহার কর।
মণিমস্ত ভুজঙ্গ কি নহে ভয়ঙ্কর ॥১০১॥
খল ক্রূর বটে আর ক্রূর বিষধর।
কিন্তু খল সর্প চেয়ে হয় ক্রূরতর।
মন্ত্র আর ওষধিতে সর্প বশ হয়।
কোনরূপে ক্রূর খল নিবারিত নয় ॥১০২॥

অতি দূর পথশ্রমে হইতে শীতল।
তরুর ছায়াতে বসে পথিক সকল ॥
প্রস্থান করযে পুন হইলে শীতল।
কে কাহার বাথায় ব্যথিত ভবে বল ॥১০৩॥

ইতি প্রথম অঞ্জলি।

দ্বিতীয় অঞ্জলি।

কার্য্যকালে জানা যায় ভৃত্য-পরিচয়।
কুটুম্বের পরিচয় ব্যসন-সময় ॥
মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ-উদয়ে ॥
ভার্য্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে ॥১॥

চক্ষুর বাহির হলো কার্য্য ক্ষয়কারী।
সম্মুখেতে কথাগুলি মধুমাখা ভারী ॥
গরলেতে ভরা কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
হেন মিত্রে পরিহার করিবে সুধীর ॥২॥

অকালে না মরে জীব শত শরপাতে।
কালপ্রাপ্তে মরে, কুশ-কণ্টক আঘাতে ॥৩॥
বহু গুণ সত্ত্বে এক দোষের কারণ।
নিমজ্জিত শশধর, কহেন যে জন ॥
কভু নাহি দেখিলেন সে কবি নিশ্চয়।
দরিদ্রতা দোষ, গুণরাশি-নাশী হয় ॥৪॥

কৃতকর্ম্মে পুনরায় নাহিক করণ।
মৃত যেই তার পুন নাহিক মরণ ॥
সেই রূপ গত বিষয়ের নাহি শোক।
এই তত্ত্ব কন যত বেদবিদ্ লোক ॥৫॥

হেমাচল কিম্বা রজতাচল-সম্ভূত।
তরুগণ কখন স্বভাব নহে চ্যুত ॥
প্রণমি মলয়াচলে যাহার কৃপায়।
শেওড়া, কুড়চী, নিম, চন্দনত্ব পায় ॥৬॥

সম্পদে কোমল চিত্ত, আপদে কর্কশ।
বসন্তে কোমল পাতা, নিদাঘে নীরস ॥৭॥
যদি উচ্চপদলাভে হয় অভিমত।
তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত ॥
কেশরী প্রথমে নত করিয়া শরীর।
মহা তেজে উঠে গিয়া মস্তকে করীর ॥৮॥

উদার হৃদয়, সুপ্রসন্ন হয়,
ক্রোধ যবে পরিগত।
জলন্ত অঙ্গার, বিভূতি আকার,
ভস্মে যবে পরিণত ॥৯॥

সজ্জনের গুণবৃদ্ধি সজ্জনেই করে।
কুসুমসুরভি বায়ু দিগন্তে বিস্তারে ॥১০॥
শীলতাই সদ্গুণের শোভার ভবন।
যৌবনই যোষাদের ভূষণ শোভন ॥১১॥

জড়ের প্রভাবে পায় দুঃখ সাধুদলে।
চন্দ্রের উদয়ে পদ্ম সঙ্কুচিত জলে ॥১২॥

কারু প্রতি কেহ হয়, বিহিত মঙ্গলময়,
কারু প্রতি দুঃখের আকর।
দিনকর নিজকরে, কমলে প্রফুল্ল করে,
কুমুদের মুখ-ম্লানকর ॥১৩॥

যেখানেই অবস্থিত হোন গুণবান।
সর্ব্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান ॥
দেখ মণি শিরে, গলে, বাহুতে বিরাজে।
পাদপীঠে থাকিলেও অপরূপ সাজে ॥১৪॥

উৎসব আগতে কত প্রমোদ প্রবাহ।
বিগত হইলে আর না থাকে উৎসাহ ॥
কিবা শোভা পায় শশী প্রদোষ সময়।
প্রভাত আগত ক্রমে প্রভাশূন্য হয় ॥১৫॥
গুণ থাকিলেই লোক করয়ে পূজন।
শুধু বড়জাতি নহে পূজার ভাজন ॥
স্ফটিকের পাত্র যবে চুরমার হয়।
পাঁচ গণ্ডা দিয়ে কেহ নাহি করে ক্রয় ॥১৬॥
থাকিলে বিভব, না হয় গৌরব,
দুরদৃষ্ট ভয়ঙ্কর।
দেখহ গোময়, কমলা আলয়,
কভু নহে মনোহর ॥১৭॥
যাতে সমুদ্ভব দোষ, তাতেই নিবারে।
অগ্নিতেই অগ্নিদোষ বিস্ফোটক মারে ॥১৮॥

পরবুদ্ধি লয়ে যার জীবিকা-বিধান।
বুদ্ধিমান বলি তার কেন অভিমান ॥
অঙ্গে ধরি পরের প্রদত্ত অলঙ্কার।
কখন কি সমুচিত হয় অহঙ্কার ॥১৯॥

যদি ছোট সন্নিধান, বড় কভু কিছু চান,
তাহে তাঁর নাহি যায় মান।
আরাধিয়ে জলনিধি, কৌস্তুভাদি নানানিধি,
প্রাপ্ত হন বিষ্ণু ভগবান্ ॥২০॥

সাধুগণ স্তবে তুষ্ট, অধমের ধনে।
যথা স্তোত্র দেবতার, বলি ভূতগণে ॥২১॥

পরান্নে জীবন, করিতে যাপন,
বিরত মনস্বিচয়।
বায়স-আবলী, লুটে খায় বলি,
পিক তাহে রত নয় ॥২২॥

আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে,
সন্তোষ বিলয় পায়।
সরসীর সেতু, ভাঙ্গিবার হেতু,
অচির বর্ষার দায় ॥২৩॥

এই আত্মা কভু মর্ত্ত্যে, কভু স্বর্গে যান।
শ্মশান উদ্যান হয়, উদ্যান শ্মশান ॥২৪॥

নিজাশয় যে প্রকার, অপরের তদাকার,
জ্ঞান করে যত নরগণ।
প্রতিমার মুখশশী, আপন ফলকে অসি,
দীর্ঘরূপে করয়ে ধারণ ॥২৫॥

পণ্ডিত-সমাজে, কভু নাহি সাজে,
গুণহীন লোকচয়।
বিগতে তিমির, আগতে মিহির,
দীপপ্রভা কভু রয় ॥২৬॥

দুর্গে প্রবেশিলে পরাভূত বীরবর।
গাঢ় পঙ্কে মগ্ন অঙ্গ মাতঙ্গ ফাঁফর ॥২৭॥

স্বকার্য্য উদ্ধার তরে, অপরের প্রতি নরে,
সুনিশ্চয় প্রণয় আচরে।
প্রচুর লোমের আশে, গাড়লে নবীন ঘাসে,
গাড়লের দেহ পুষ্ট করে ॥২৮॥

এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট।
সময়াস্তে নহে তাহা সে রস বিশিষ্ট।
শৈশবের স্বাভাবিক লাবণ্য সুন্দর।
যৌবন-সময়ে কভু নহে মনোহর ॥২৯॥

সুলভ বস্তুতে কভু না থাকে আদর।
স্বদার ত্যজিয়া পরদারে মজে নর ॥৩০॥

যেই ধন আহরণ ধর্ম্মের কারণ।
কিম্বা পোষ্যগণের ভরণে প্রয়োজন ॥
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ।
সেই সব ধন সদা হয় ধর্ম্ম-ধন ॥৩১॥

রূপ, কুল, বিদ্যা, বল, যৌবন, বিভব।
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব ॥
সেই অবজ্ঞার হয় গর্ব্ব অভিধান।
তদানন্দ মোহ-মদ মদিরা সমান ॥৩২॥

বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীরুতা বিষম ॥
নীতি-হীন শৌর্য্য হয় পশুর বিক্রম ॥৩৩॥

মহৎ বাড়িলে কভু অপথে না যায়।
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায় ॥৩৪॥

তীব্রভয় দেখাইয়া মৃদুরূপে সাজা।
হেন যুক্ত * দণ্ডপ্রদ হইবেন রাজা ॥৩৫॥
করী জানে কেশরীর বল কত দূর।
সে বল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর ॥৩৬॥

বিদ্যাই নরের হন সমধিক রূপ।
বিদ্যাই প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধনের স্বরূপ ॥
বিদ্যা সম্ভোগপ্রদা, যশোবিধায়িনী।
বিদ্যাই গুরুর গুরু, কল্যাণদায়িনী ॥

* যুক্তিবিশিষ্ট।

বিদ্যা হন বন্ধুজন বিদেশ-গমনে।
পূজনীয়া হন বিদ্যা ভূপতি-সদনে॥
পরম দেবতা বিদ্যা সর্ব্বজন-সার।
বিদ্যাহীন নর হয় পশুর আকার॥৩৭॥

গুণীর যে গুণ জানে যে গুণপ্রবীণ।
গুণা-গুণ কেমনে জানিবে গুণহীন॥
বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল।
দুর্ব্বল যে বল কিসে জানিবেক বল॥
কোকিল বিশেষে জানে বসন্তে কি রস।
সেই রস অনুভবে অশক্ত বায়স॥৩৮॥

গুণগণ গুণিস্থানে গুণগণ রয়।
নির্গুণীর স্থানে সেই গুণ দোষ হয়॥
সুমধুর জলে জাত সরিৎ স্রোতসী।
সে পয় অপেয় হয় সাগর পরশি॥৩৯॥

কি আশ্চর্য্য সাধুগণে, দোষকেও গুণ গণে,
দুর্জ্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয়।
সাগরের লোণাজল মিষ্ট করে মেঘ-দল,
ক্ষীর পান করি ফণী বিষ বরিষয়॥৪০॥

বিবাদের জন্য বিদ্যা, দর্প হেতু ধন।
শক্তি প্রয়োজন পরপীড়ার কারণ॥
খলের এ রীতি, বিপরীত সাধুজনে।
পরিণত জ্ঞান, দান, পর-প্রয়োজনে॥৪১॥

জ্ঞাতি-ভাজ্য নহে, চোরে না করে হরণ।
দানে ক্ষয়-হীন বিদ্যারত্ন মহাধন॥৪২॥

সকলেই গুণ খুঁজে, রূপ নাহি চায়।
পুষ্পরাজ * মণি বটে গন্ধ নাহি তায়॥৪৩॥

আপনারে ভাবি মনে অজর অমর।
বিদ্যা আর ধন চিন্তা করিবেক নর॥
কেশে ধরি বসিয়াছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
এইভাবে ধর্ম্ম সাধে যত সুধীবর॥৪৪॥

শরীরের বল চেয়ে বড় বুদ্ধিবল।
তদভাবে হেন দশা প্রাপ্ত হস্তিদল॥
মাহুতে কদাচ করী মারিবারে পারে।
এই কথা গজ-ঘণ্টা ঘোষে বারে বারে॥৪৫॥

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয়।
করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয়॥
পর প্রতি দয়া আর হিত আচরণে।
শরীরের শোভাবৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে॥৪৬॥

কুলের কল্যাণে এক জনে পরিহর।
গ্রামের কল্যাণে কুল পরিত্যাগ কর॥
জনপদ-হিতে গ্রাম করহ বর্জ্জন।
পৃথিবী করহ ত্যাগ আত্মার কারণ॥৪৭॥

স্বজাতির বধে মানুষের বাড়ে রঙ্গ।
শিকরে বিহঙ্গ মারে, না মারে ভুজঙ্গ॥৪৮॥

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ,
পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই।
দুগ্ধের কারণ, সহিত যতন,
গোধন পূজন, ধর্ম্মহেতু নহে ভাই॥৪৯॥

মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভ-দলনে চতুর।
কিম্বা সিংহ-বধে দক্ষ আছে কত দূর॥
কিন্তু আমি বলি, বলী আছে যত জন।
অশক্ত কন্দর্প-দর্প করিতে দলন॥৫০॥

* পোখরাজ- হিন্দী।

যার নাম শুনা মাত্র, সন্তাপেতে দহে গাত্র,
দেখা মাত্র উন্মাদ বাড়য়।
পরশিয়া যার কায়, সকলেই মোহ যায়,
তাহারে দয়িতা * কেন কয় ॥৫১॥

তদবধি কৃতীদের হৃদয়-কন্দরে।
বিমল বিবেক-দীপ চারু প্রভা ধরে ॥
যদবধি কুরঙ্গনয়না বালাগণ।
চঞ্চল অপাঙ্গ নাহি করে সঞ্চালন ॥৫২॥

শ্রুতিতে মুখর, পণ্ডিত-নিকর,
কেবল বচনে পটু।
কহে ছাড় সঙ্গ, নারী-রতিরঙ্গ,
কার্য্যকালে কিন্তু হটু ॥
নীলাব্জ-নয়না, জঘন-শোভনা,
রসনা-মণিমণ্ডিত। †
করে পরিহরি, শকতি কাহার,
কে আছে হেন পণ্ডিত ॥৫৩॥

বিজাতীয় বাঞ্ছা কভু শোভিত না হয়
বিতর্কে বেদের প্রভা কখন না রয় ॥
অধরে অঞ্জন-রেখা কেবল দূষণ।
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ব্ব ভূষণ ॥৫৪॥

সতের সংসর্গে প্রায় অসত দুর্জন।
পরিহার করে দুষ্ট-স্বভাব আপন ॥
দেখহ প্রখরতর দিনকর কর।
অমৃত-ধারায় ক্ষরে প্রাপ্তে নিশাকর ॥৫৫॥

কালক্রমে পরিণামে সব ভাবান্তর।
পূর্ব্বতন বুদ্ধি প্রতি জন্মে অনাদর ॥
পূর্ব্বে বারিধারে যেই ছিল জল-কণা।
শুক্তিগর্ভে মুক্তা হলো, বংশেতে রোচনা ॥৫৬॥

* দয়াবতী
† চন্দ্রহার।

ঋণ-শেষ অগ্নি-শেষ আর রোগশেষ।
বিচক্ষণগণ কভু না রাখেন লেশ ॥
থাকিলেই পুনর্ব্বার সংবর্দ্ধিত হয়।
অতএব শেষ রাখা সমুচিত নয় ॥৫৭॥

পর-পরীবাদ, পরদ্রব্য পরদার।
গুরুস্থানে পরিহাস কর পরিহার ॥৫৮॥

যার বশে থাকে দারা, সুত, ভৃত্যবর্গ।
অভাবে সন্তোষ তার ধরাতলে স্বর্গ ॥৫৯॥

এক পদে রাখি ভর, অন্য পদে অগ্রসর,
হয়েন যাঁহারা বুদ্ধিমান্।
যদবধি পরস্থান, নাহি হয় দৃশ্যমান
পরিত্যজ্য নহে পূর্ব্বস্থান ॥৬০॥

দানকর্ত্তা দাতাগণ ভূতলে বিরল।
ঘরে ঘরে পূর্ণ কিন্তু ভিখারীর দল ॥
চিন্তামণি আছে কি না বিবাদ বিষয়।
পথে পথে ধূলার ত সংখ্যা নাহি হয় ॥৬১॥

জাতি যায় রসাতল, গুণগণ সুবিমল,
একেবারে অধোগত হয়।
চূর্ণ শৈলতটে পড়ি, শিলা যায় গড়াগড়ি,
হুতাশনে দগ্ধ বন্ধুচয় ॥
শূরত্ব বীরত্ব যত, বৈরিকৃত সব হত,
আশু প্রপতিত বজ্রানলে।
একা ধনাভাব জন্য তৃণসম হয় গণ্য,
সব গুণ বিগত বিফলে ॥৬২॥

বিষ-দন্ত ভগ্ন হেতু নাহি তেজ মাত্র।
সাপুড়ের সাপুড়ীতে সুপীড়িত গাত্র ॥
ক্ষুধায় মলিন তাহে ইন্দ্রিয়-নিকর।
জীবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধর ॥

হেনকালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি।
রজনীতে এলো তথা ইন্দুর দুর্ম্মতি ॥
ক্ষুধানলে প্রজ্জ্বলিত তাহার শরীর।
সাপুড়ীতে আছে খাদ্য ইহা করি স্থির ॥
কাটুর কুটুর রবে গর্ত্ত কাটি তলে।
একেবারে প্রবেশিল ফণীর কবলে ॥
আহার পাইল ফণী প্রাপ্ত হলো পথ।
একেবারে সিদ্ধ তার দুই মনোরথ।
অতএব শুন ভাই কথা সাবধানে।
শুভাশুভ সকলই বিধির বিধানে ॥৬৩॥

কন্দুকের * আছাড়ি মার ভূমির উপরে।
তখনি লাফায়ে সেই উঠিবে অম্বরে ॥
সেরূপ জানিবে যত মহতের ধারা।
বিপদে পড়িবামাত্র সমুত্থিত তাঁরা ॥৬৪॥

কন্দুকের প্রায় সব মহৎ ধীমান্।
যেমন পতন প্রাপ্ত অমনি উত্থান ॥
মাটিতে মিশায় মাটি ঢেলা যদি পড়ে।
ইতর বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে ॥৬৫॥

বিভবেতে মহতের মানস কমল।
উৎপলের অনুরূপ বিহিত-কোমল ॥
আপদ্-সময়ে কিন্তু সেই তামরস।
মহাশৈল-শিলা সম বিষম কর্কশ ॥৬৬॥

পূর্ব্বে দুগ্ধ কৃপাধান, উদকেরা দিল স্থান,
দুই তনু এক তনু তায়।
তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীরে, সহ্য নাহি হয় নীরে,
অনল প্রবেশে দ্রুত ধায় ॥
দেখি নীরে ক্ষিপ্তপ্রায়, দুগ্ধ নাহি ছাড়ে তায়,
উভয়েতে প্রবেশে অনলে।
এইরূপ সদাচার, যদি হয় সুসঞ্চার,
সেই যে মিত্রতা ভূমণ্ডলে ॥৬৭॥

একটুকু পচা নাড়ী বসাতে মলিন।
কিংবা একখানি অস্থি মজ্জা-মাংসহীন ॥
প্রাপ্ত হয়ে কুক্কুরের পরিতোষ কত।
ফলে তার ক্ষুধার সুধার নহে গত ॥
কিন্তু দেখ কেশরীর রীতি ভিন্নমত।
যদ্যপি জম্বুক তার হয় অঙ্কগত ॥
কুঞ্জরে দেখিবামাত্র তারে পরিহরি।
কুম্ভ বিদারিয়ে রক্তধারা পিয়ে হরি ॥
অতএব স্বীয় স্বত্ব অনুরূপ ফল।
কষ্টে-সৃষ্টে অন্বেষিয়া লয় জীবদল ॥৬৮॥

মৃগ, মীন আর সাধু সজ্জন-নিকরে।
তৃণ, জল, সন্তোষেতে জীবিকা নির্ভরে।
নিষাদ, ধীবর আর পিশুন দুর্জ্জন।
অকারণে ইহাদের বৈরি-পরায়ণ ॥৬৯॥

সন্তাপে বিকৃত বারি প্রখর অনলে।
মুক্তাকারে শোভা পায় নলিনীর দলে ॥
সাগরের শুক্তিমধ্যে পতনে তাহার।
অপরূপ মুক্তারূপ ফল অবতার ॥
কেবল সংসর্গ গুণে জানিবে নিশ্চয়।
অধম-মধ্যমোত্তম গুণজাত হয় ॥৭০॥

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায়।
বাচাল বাতুল বলে বাক্পটুতায়।
ক্ষমাগুণ যদি থাকে ভীরু নাম হয়।
সহ্য গুণ না থাকিলে ছোটলোক কয় ॥
ধৃষ্ট খ্যাতি যদ্যপি নিকটে সদা রয়।
অন্তরে থাকিলে পরে জড় সুনিশ্চয় ॥
অতএব সেবা-ধর্ম্ম পরম দুর্গম।
যোগীরাও না জানেন তাহার মরম ॥৭১॥

লোভ যদি হৃদয়স্থ গুণে কিবা হয়।
ক্রূরতা থাকিলে সেই পাতক নিশ্চয় ॥

---

* বস্ত্র বা চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত গোলা।

সত্য যদি থাকে তপে কিবা প্রয়োজন।
শুচিমনে কিবা কাজ তীর্থ-পর্য্যটন ॥৭২॥
ভজ এক দেব বিষ্ণু কিম্বা পশুপতি।
মিত্রতা ভূপতি কিম্বা যতির সংহতি॥
হয় বাস নগরেতে, কিম্বা বাস বনে।
বিবাহ সুন্দরী সনে কিম্বা দরী * সনে ॥৭৩॥
তৃষ্ণা ত্যজ, ভজ ক্ষমা, মদ পরিহর।
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা সার কর ॥
সাধুর চরণচিহ্নে করহ পয়ান।
সেব সুপণ্ডিতগণে, মান্যে দেহ মান ॥
বিদ্বেষীকে বশীভূত কর অনুনয়ে।
স্বমুখে করো না ব্যক্ত নিজ গুণচয়ে ॥
দুঃখিতেরে দয়া কর কীর্ত্তির পালন।
এই সব সুজনগণের আচরণ ॥৭৪॥
বুদ্ধির জড়তা হরে, সত্যে দেয় মতি।
সম্মানে উন্নতি করে, নাশে বিবতি॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্ত্তির সঞ্চয়।
সাধুসঙ্গে মানুষের কি না লাভ হয় ॥৭৫॥
মুকুরে বিম্বিত মুখ যথা ধৃত নয়।
অনায়ত্ত সেইরূপ কুমারী-হৃদয় ॥
পর্ব্বতের সূক্ষ্ম পথ যেরূপ বিষম।
সেইরূপ হয় তার ভাব সুদুর্গম ॥
চিত্তটি তরল যেন পদ্মপত্র-জল।
যারে হেরি বিদ্বানেরো মানস বিকল ॥
কুমারী লতিকারূপ গরল-অঙ্কুর।
দোষরূপ পঙ্কে তার শ্রীবৃদ্ধি প্রচুর ॥৭৬॥
স্বার্থ পরিত্যাগ করি পরার্থ যোজনা।
যাহার দ্বারায় হয় সাধু সেই জনা ॥
আত্মলাভ প্রতিকূলে পরার্থে যোজনা।
সচেষ্ট যে নহে সেই সামান্য গণনা ॥
স্বার্থ হেতু পরহিত-বিঘ্নকারী যেই।
মানুষ রাক্ষস দুষ্ট নরাধম সেই ॥
নিরর্থক পরহিত যে জন সংহারে।
সে যে কি পদার্থ আমি না জানি তাহারে ॥৭৭॥
দোষগুণ সব কার্য্যে আছে বিদ্যমান।
পরিণাম চিন্তি কার্য্য করেন ধীমান্ ॥
সম্পদে সহজে কৃতকার্য্য বহুতর।
বিপদে হৃদয় দহে শেলের সোসর ॥৭৮॥

বনে, রণে, শত্রুমাঝে, সলিলে, অনলে।
মহার্ণবে কিম্বা গিরি-মস্তক-মণ্ডলে ॥
প্রসুপ্ত প্রমত্ত তথা বিষম বিপদে।
পূর্ব্বকৃত পুণ্য রক্ষা করে পদে পদে ॥৭৯॥

পূর্ব্বপুণ্য-বল যার আছয়ে যথেষ্ট।
তার পক্ষে ভীমবন হয় পুরশ্রেষ্ঠ ॥
দুর্জ্জন সুজন হয় যাহার সদনে।
নিধি-রত্ন-পূর্ণ ধরা সদা সর্ব্বক্ষণে ॥৮০॥
বরং ঘোর বনে ভ্রম বনচর সহ।
সুরেন্দ্র-ভবনে মূর্খ-সংসর্গ দুঃসহ ॥৮১॥
ধনের তৃতীয় গতি দান, ভোগ, নাশ।
দান ভোগ-হীন প্রাপ্ত তৃতীয় নির্যাস ॥৮২॥

ধন যার আছে সুকুলীন সেই নর।
সেই বক্তা, সেই মনোহর-রূপধর ॥
সেই সুপণ্ডিত শ্রুতবান্ গুণালয়।
স্বর্ণতেই সব গুণ করয়ে আশ্রয় ॥৮৩॥
ঈর্ষী, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট, নিত্য ভীত, রাগী।
পরভাগ্যজীবী, এই ছয় দুঃখভাগী ॥৮৪॥

যজ্ঞে, পরিণয়ে, রিপুক্ষয়ে কি ব্যসনে।
যশস্কর কর্ম্মে আর মিত্র-সংগ্রহণে ॥
প্রাণ-প্রিয়া নারী তথা বান্ধব কারণ।
এই অষ্টে অতিব্যয় নাশ কদাচন ॥৮৫॥
সর্ব্বসুখ নাশে তৃষ্ণা, রূপ নাশে জরা।
খলসেবা পুরুষের অভিমান-হরা ॥
ভিক্ষায় গৌরব, আত্মম্ভরিতায় গুণ।
চিন্তা-জ্বরে বল, অদয়ায় লক্ষ্মী, ন্যূন ॥৮৬॥
অনুদ্যোগী পুরুষের যশ হয় ক্ষয়।
মৈত্রী কোথা যেখানেতে একভাব নয় ॥
ধনলুব্ধে ধর্ম্মনাশ, কুকর্ম্মীর কুল।
ব্যসনীর বিদ্যা-ফল ব্যসনে নির্ম্মূল ॥
কৃপণ বিনষ্ট যদি করে ব্যবহার।
মাতাল মন্ত্রীর দোষে রাজ্য ছারখার ॥৮৭॥
জলনিধি আবরণ হন ধরণীর।
আবাসের আবরণ হয় ত প্রাচীর ॥
রাজা ভিন্ন দেশের কি আবরণ আর।
সুচরিত্র আবরণ হয় ললনার ॥৮৮॥

*পর্ব্বতের গুহা।

হস্তের প্রতিষ্ঠা যদি দান-ধর্ম্মে রত।
মস্তকের শ্লাঘা যদি গুরুপদে নত ॥
মুখের প্রশংসা সত্যবাণী সুনিশ্চয়।
ভুজের প্রতিষ্ঠা বীর্য্যবিভাত বিজয় ॥
হৃদয়ের শ্লাঘা ইচ্ছামত আচরণ।
শ্রুতির গৌরব সদা শ্রুতির শ্রবণ ॥
প্রকৃতি-মহৎ যাঁরা, সেই সব নরে।
ধন বিনা এ সকল ভূষা শোভা করে ॥৮৯॥

আমাতে তোমাতে অন্যে একই ঈশ্বর।
তবে বল মম প্রতি কেন ক্রোধ কর ॥
একেবারে পরিহার করি ভেদজ্ঞান।
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান ॥৯০॥

নূতন বসন, নূতন ভবন,
নবছত্র নব নারী-রতন।
সর্ব্বত্র নূতন, হয় সুশোভন,
সেবকান্ন পুরাতন ॥৯১॥

কভু ভূমিশয্যা কভু পালঙ্কে শয়ন।
কভু শাকাহার, কভু পরান্ন ভোজন ॥
কভু ছেঁড়া কাঁথা কভু বিনোদ বসন।
ইথে সুখ দুঃখ জ্ঞানী না করে গণন ॥৯২॥

তিন লোক দান করি, অর্চ্চনা করিয়া হরি,
বলি গেল পাতালভবন।
ছাতু-শরা করি দান, কোন এক তপস্বান্,
স্বর্গপুরে করিল গমন ॥
আবাল্য অবধি যার, কত কত হৈল জার,
সে কুন্তীর স্বর্গেতে বসতি।
আহা পতিপ্রাণা সতী, সীতার পাতালে গতি,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি ॥৯৩॥

কানীন আপনি মুনি, পুনঃ পুরাণেতে শুনি,
ভ্রাতৃবধূ বিধবা-রমণ।
গোলক নন্দনগণ, তাঁর নাতি পাঁচজন,
কুণ্ড বলি আছে বিঘোষণ ॥
সে পাণ্ডব অব্যাহত, এক রমণীতে রত,
পুণ্যবলে নাহি কিছু ক্ষতি।
তাহাদের গুণগান, গায় লোক অবিশ্রাম,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি ॥৯৪॥

আহারেতে শুদ্ধাচার, বচন সুধার ধার,
গৃহাভাবে পরঘরে রয়।
মমতা-বিহীন মন, বনে রস আলাপন,
বাচালতা বসন্তসময়।
এত গুণ সেই ধরে, ত্যজি হেন পিকবরে,
কি কারণ ভক্তিভাবে অতি।
খঞ্জরীট কৃমিভুজে, মানবমণ্ডলী পূজে,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি ॥৯৫॥

কপোতিনী সকাতরে কান্তপ্রতি কয়।
আজ নাথ অন্তকাল হইল উদয় ॥
ধনুঃশর-করে ব্যাধ ভ্রমে অধোভাগে।
উপরেতে শ্যেন পক্ষী ভ্রমে তাগে তাগে ॥
হেনকালে ব্যাধেরে দংশিল বিষধর।
শ্যেনেরে আহত করে নিষাদের শর ॥
উভয়ে তখনি গেল যমের বসতি।
দেখ দেখি অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি ॥৯৬॥

পারীন্দ্রের পরাজয়ে, সুরভীর মাংস লয়ে,
বাড়াইনু কুক্কুরের কায়।
দিলাম শাল্যন্ন দধি, পায়সান্ন নিরবধি,
ফুলিয়া উঠিল তনু তায় ॥
কিন্তু সিংহ-রব শুনি, অতি ভয়াতুর শুনী,
গভীর গুহায় পলাইল।
হায় এ কি সর্ব্বনাশ, হত যত অভিলাষ,
লাভ মাত্র গোবধ হইল ॥৯৭॥

চন্দন চম্পক-বন, রসাল রসালগণ,
কাটি কাঁটা করীরি * রক্ষণ।
হিংসি হংস শিখাবল, কোকিল কোকিলাদল,
কাক লয়ে ক্রীড়া আকিঞ্চন।
করী করি বিনিময়, গর্দ্দভ ক্রয়িত হয়,
কার্পাস কর্পূরে এক দাম।
গুণিপক্ষে এ প্রকার, যথা হয় অবিচার
সে দেশের পায়েতে প্রণাম ॥৯৮॥

পুরোভাগে রেবা-পার, শোভিতেছে পরে তার,
দুরারোহ পর্ব্বত-শিখর।
পশ্চাতে শবরবর, ধনুঃশরযুক্ত কর,
ধাইতেছে অতি দ্রুততর ॥
দক্ষিণেতে সরোবর, বামে দহে ভয়ঙ্কর,
দাবদাহ-তাপে তপ্তকায়।
পলাইয়া যেতে নারে, থাকিতেও নাহি পারে,
মৃগশিশু কাঁদে হায় ॥৯৯॥

* কইক বৃক্ষবিশেষ

ইতি নীতি-কুসুমাঞ্জলি

PROVERBS OF EUROPE AND ASIA

Translated

into

The Bengali language

Printed by Jagamohana Tarkalankara, Kavyaprakasha press, 168, Cornwalls Street, for The Calcutta School Book and vernacular literature society. 9 Government Place, East.

ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালা

দ্বিতীয় ভাগ

পাঠঃ প্রথম সংস্করণ—১৮৬৯

CALCUTTA

1869

PREFACE

The following contains a free Translation into Bengali by Babu Rangalal Banerjee of proverbs selected by me from the German, Italian, Spanish, Protuguese, Dutch, Danish, French, Badagar, Malaylim, Tamul Chinese, Panjabi, Mahratta, Hindi, Orissa and Russian languages. The object is to introduce to the notice of the Bengali people the wit and wisdom of peasants and women in other parts of the world, the Russian proverbs 200 in number though last in the series will not be found the least in their wit and keen sarcasm.

Calcutta,
November 15, 1869. J. Long.

জর্ম্মনীয় প্রবাদ।

১। অধিক দিন বাঁচিতে চাহ তো কুকুরের মত পান কর, আর বিড়ালের ন্যায় আহার কর।
২। অনুতাপই অন্তঃকরণের ঔষধ।
৩। আগুন আর জল উত্তম দাস বটে; কিন্তু প্রভু ভাল নহে।
৪। আত্মাহীন কলেবর, নারীহীন নর। নরহীন নারী, শিরঃশূন্য কলেবর।
৫। আলস্য দারিদ্র্যের চাবি।
৬। আলো মাত্রেই সূর্য্য নহে।
৭। আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে।
৮। উকীল আর গাড়ীর চাকায় তেলচর্ব্বির প্রয়োজন।
৯। উৎক্রোশ কখন মাছী মারে না।
১০। উদর বড় কুমন্ত্রী।
১১। একখানা কঁদোয় কখন বরাবর আগুন থাকে না।
১২। একটি মৌমাছী একমুঠা মাছীর সমান।
১৩। এক বিন্দু সের্কা অপেক্ষা এক বিন্দু মধুতে অনেক মাছী আটক হয়।
১৪। এ কখন সম্ভব, বিড়াল দুধ না খেয়ে চুপ করো বস্যে থাকবে?
১৫। ঔষধের বড়ি গিলিয়া খাও, চিবিও না!
১৬। ক্রোধ নিবারণের ঔষধ কাল।
১৭। গোলাব আর কুমারীগণের লাবণ্য অচিরে বিগত হয়।
১৮। ঘুমন্ত কুকুরকে চটাইও না।
১৯। চক্ষের জলের ন্যায় কোন পদার্থই শীঘ্র শুখায় না।
২০। চাক্তী যেথায় বলবতী, যুক্তি না ফলবতী।
২১। চামড়া চুরি কর্য়ে ঈশ্বরোদ্দেশে জুতা দান।
২২। চোর আপন ফাঁসী কাঠের উপযুক্ত গাছ খুঁজে পায় না।
২৩। চোর দিয়ে চোর ধর।
২৪। ডিম্বের স্থলে মুর্গী দান।
২৫। তিনটা নারী, তিনটি হাঁস, আর তিনটী ব্যাঙ্গে একটী হাট।
২৬। তীর্থ যাত্রার ফেরৎ লোক প্রায় যতি নহে।
২৭। দুই চক্ষু দুই কর্ণ, কিন্তু একটিমাত্র মুখ। অর্থাৎ অধিক দেখা শুনা ভাল, অধিক কথা কহা ভাল নয়।
২৮। ধূয়া যার নাহি সয়, সে কখন কামার নয়।
২৯। ধৈর্য্য আর কালক্রমে তুত পাতাও খাসা গরদ হয়। "কালে বান্দাও পণ্ডিত"।
৩০। নদীতীরে কূপ খনন।
৩১। নারীর রূপ, বনের প্রতিধ্বনি, আর রামধনু, শীঘ্র উপে যায়।
৩২। নিষ্পাপ আত্মা খাসা বালিস।
৩৩। নেকৃড়ে বলে "তোমার কথা মিষ্ট বটে, কিন্তু আমি গায়ের ভিতর যাব না"।
৩৪। পর্ব্বতের গর্ভে সোনা, কিন্তু রাজ পথে ধূল।
৩৫। পাগল-গাছ বাড়াইতে জল সেচনের প্রয়োজন নাই।

৩৬। পীরিত আর গান করা জোরের কাজ নয়।

৩৭। পূর্ব্ব পুরুষ ঘোড়া ছিল বলো খচ্চরদের বড ধূমধাম্।

৩৮। প্রতিবাসীর প্রতি প্রীতি কর, কিন্তু তার বেড়া নেড়ো না।

৩৯। বড হল্যেই সব দিকে বড় হয় না, তা হল্যে গাই গোরু খরগোসকে দৌড় ঝাঁপে হারাইত।

৪০। বহু কাল উপবাস থাকা, আহারের সম্বন্ধে পরিমিত ব্যয় নয়।

৪১। বাড়ী বানায় অজ্ঞগণ, ক্রয় করে বিজ্ঞ জন।

৪২। বিচারপতির দুই কর্ণই সমান হওয়া উচিত।

৪৩। বেড়া নীচু দেখিলেই মানুষ তাকে ডিঙ্গিয়া যায়।

৪৪। ভূম্যে পড়্যে থাকে যেই, মাড়ামাড়ী যায় সেই।

৪৫। ময়ূর, ময়ূর, ময়ূর, আপনার পা দেখ।

৪৬। মাছী ধরা ভিন্ন কোন কার্য্যই শীঘ্র কর্ত্তব্য নয়।

৪৭। মাছীর উৎপাত হত্যে সিংহকেও আত্মরক্ষা কত্যে হয়।

৪৮। মিথ্যা কথা ফাঁসীকাষ্ঠে উঠিবার প্রথম সিঁড়ী।

৪৯। মিথ্যা কথার চরণ খাট। অর্থাৎ শীঘ্র ধরা পড়ে।

৫০। যত আইনের আঁটা আঁটি, বিচারের দফায় ততই ঘাটি।

৫১। যদি থাক কাচের ঘরে, ঢিল ছুড না পরের তরে।

৫২। যাহা তিন জনে শুনেছে, তাহা ত্রিশ জনে শুনেছে। "ষট্‌কর্ণে মন্ত্রণা ভ্রষ্ট।"

৫৩। যাহা বড় উচ্চ, তারে কর তুচ্ছ।

৫৪। যুদ্ধের দূরবর্ত্তী সকল লোকই যোদ্ধা।

৫৫। যুবার মৃত্যু স্থির নয়, বুড়ার মৃত্যু সুনিশ্চয়।

৫৬। যে ঘরেতে মদ্য ঢোকে, লজ্জা পালায় সে ঘর থেকে।

৫৭। যে জন বিড়াল নাহি পালে, পালুক তবে নেংটের পালে।

৫৮। সিঁড়ীর আগায় উঠ্‌তে, গোড়া থেকে আরম্ভ কর্ত্যেই হয়।

৫৯। রাজমুকুট কিন্তু শিরঃপীড়ার ঔষধ নয়।

৬০। লাঙ্গলের খবর নিলে সে তোমার খবর নেবে।

৬১। লুণের সংস্থান রেখে মাছ কাট।

৬২। লেপের পরিসর অনুসারে পা ছড়াও।

৬৩। শাস অপেক্ষা খোলার জন্য অধিক বিবাদ।

৬৪। শিকারী পক্ষীরা গান গায় না।

৬৫। শীঘ্র পাকে, শীঘ্র পচে।

৬৬। শূন্যোদরে হৃদয় ভারী।

৬৭। সরদারী কর্ত্যে হল্যে, কানে শুনে কালা হও, আর চোখে দেখে কানা হও।

৬৮। সোনার বাগ্‌ডোর হইলেই উত্তম ঘোড়া হয় না।

৬৯। স্বদেশে দাসত্ব অপেক্ষা বিদেশে স্বাধীনতা শ্রেয়ঃ।

৭০। স্বপ্নসকল ফেনা মাত্র।

৭১। ক্ষুধার্ত্ত জঠরের কর্ণ নাই।

ইতালীয় প্রবাদ।

৭২। অন্ধকে পথ দেখান সহজ নয়।

৭৩। আগুনে আগুন নিবায় না।

৭৪। উকীলের চাপ্‌কানের আস্তর মোয়াক্কেলের জিদ।

৭৫। একজন মারে ঝাড়া, অন্য জন ধরে খড়া *।

৭৬। একসের বিদ্যা চেয়ে এক ছটাক অকুফ্‌ ভাল।

৭৭। এক হাতে দ্বিতীয় হাত পরিষ্কার, দুই হাতে মুখ পরিষ্কার।

৭৮। ওষ্ঠের শীলতা, বিনা ব্যয়ে বহু সন্তোষের সৃষ্টি।

৭৯। কথা কওয়া আর করা, এ দুয়ের মধ্যে অনেক যোড়া জুতা ক্ষয়।

৮০। কথা স্ত্রী, কার্য্য পুরুষ।

৮১। কাকের চক্ষু কাকে উৎপাটন করে না। "কাকের মাংস কাকে খায় না"।

৮২। কাছিমের পিঠে কামড় মেরে মাছীর ওষ্ঠ ভগ্ন।
"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"।

৮৩। কাল, একটি শব্দহীন উখা।

৮৪। কুকুর মাত্রেই আপন কোটে সিংহ।

৮৫। কুকুরের চীৎকারের প্রতি চন্দ্র শ্রুতিপাত করেন না।

৮৬। কুকুরের প্রতি হাড় ছুঁড়িলে তাহার ক্রোধের বিষয় কি?

৮৭। কুকুরের সঙ্গে শয়ন করিলে এঁটুলিগাত্রে উঠ্‌তে হবে।

৮৮। কুওর সঙ্গে লড়াই কর্ল্যে, কলসীর মাথা ফাটে।

৮৯। কৌলীন্য, অন্নের সহিত জঘন্য ব্যঞ্জন।

৯০। খড়ের পুরুষের সোনার স্ত্রী চাই।

৯১। ঘরে আগুন লাগিলে দূরস্থ জলে নিবায় না।

৯২। ঘেউ ঘেউয়া রোগ কুকুরের চাম্‌ড়ার পক্ষে সর্ব্বনাশ।

৯৩। চক্ষু নাহি দেখে যাহা, মন নাহি শোনে তাহা।

৯৪। চাকা যত জের্‌ বার্‌, ততই তার শোর্‌ শার।

৯৫। ছাগল চুরি কর্য্যে ঈশ্বরোদ্দেশে কলায় উৎসর্গ। "গরু মেরে জুতো দান"।

৯৬। ছোট চোর ফাঁসীতে মরে, বড় চোর গেঁজের জোরে।

৯৭। ছোট ছেলেদের শিরঃপীড়া, বড় ছেলেদের মনঃপীড়া।

৯৮। ছোটলোকের প্রতি নির্ভর, বালীর উপর বাঁধ দেওয়া।

৯৯। যে যুবতী জানালায় যেতে ভালবাসে। সে তো যেন আঙ্গুরের থোবা পথপাশে॥

১০০। টাঙ্গন ঘোড়ায় যাহা খায়, বেতো্য ঘোড়ায় তা'ই চায়।

১০১। টোপে টোপে পড়ে বারি, পাষাণের ক্ষয়কারী। "ধীর জলে পাষাণ বিঁধে"।

১০২। তাঁহার পাঁচক্ষুরে ভেড়ার অন্বেষণ।

১০৩। তিনি পেরেক্‌ বাহির কর্য্যে গোঁজ চালান।

---

* খরগোস।

১০৪। দাঁত থাকিলে ব্যাংও কাম্‌ড়াইত।

১০৫। ধীরে সুস্থে ক্রয় করে, পায় দ্রব্য সস্তা দরে।

১০৬। নারী, গর্দ্দভ, আর বাদামের জন্যে শক্ত হাত চাই।

১০৭। নিজে গাধা হইয়া যে আপনাকে হরিণ ভাবে,
সে পগার ডিঙ্গাইবার সময় আপন ভ্রম টের পায়।

১০৮। নিরাপদে যদি ইচ্ছা সংসার যাপন।
শিকরার * মত তব হউক নয়ন ॥
গর্দ্দভের ** ন্যায় কর্ণ, কপিবৎ † মুণ্ড।
উষ্ট্রের সমান স্কন্ধ ††, শূকরের তুণ্ড ‡ ॥
হরিণের ‡ ‡ সম রাখ যুগল চরণ।
অনায়াসে পরিত্রাণ পাবে জনগণ ॥

১০৯। নোঙ্গরের মত সমুদ্রে বাস, কিন্তু সাঁতারের সঙ্গে খোঁজ নাই।

১১০। পত্রের পতনে ভয় হয় যার মনে।
সে জন কখন যেন নাহি যায় বনে ॥

১১১। পূর্ণোদরে উপবাসের ব্যবস্থা দেওয়া সহজ।

১১২। পেটুকতায় যত মরে, অস্ত্রাঘাতে তত নয়।

১১৩। প্রচুর থাক্‌লেই নিরিখ্ চেরা। "পেট ভরিলেই পতির গঁদা"।

১১৪। প্রেমের রাজ্যে তলবার নাই।

১১৫। বজ্রের শব্দে চোরও সাধু।

১১৬। বড় বড় গাছের ফল অপেক্ষা ছায়ার আধিক্য।

১১৭। বড় মাছীরা মাকড়সার জাল ভাঙ্গিয়া যায়।

১১৮। বরং সে গাধা ভাল বোঝা যেই বয়;
ভার ফেলে দেয় যেই, কাজ-কি সে হয়?

১১৯। বাক্যে কখন বিড়ালের পেট ভরে না।

১২০। বিড়াল মাছ ভালবাসে, কিন্তু পা ভিজাতে নারাজ।

১২১। বিড়ালের পীঠে হাত বুলাইবে যত।
ততই সে নিজ ল্যাজে করিবে উন্নত।

১২২। বৈদ্য প্রায় পাঁচন খায় না।

---

* দূরদৃষ্ট।
** দূরে শ্রবণশীল।
† অতি কঠিন।
†† গুরুভার বাহী।
‡ কণ্টক পর্য্যন্ত আহারক্ষম
‡ ‡ অতি খরগামী।

১২৩। বৈদ্যের ভুল শ্মশানে লুপ্ত।
১২৪। বোকার দাড়ীতে নাপিতের কামান শিক্ষা।
১২৫। ভরা পেটে ক্ষুধায় অবিশ্বাস।
১২৬। ভাঙ্গা অপেক্ষা নোয়া ভাল।
১২৭। ভাল ঘোড়ার লাগাম চাইনে।
১২৮। ভিক্ষা দানে কেহ-কখন কাঙ্গাল হয় নাই।
১২৯। ভেড়া চরাইতে বাঘের প্রতি ভার। "ডাইনের কোলে পো সমর্পণ"।
১৩০। মালমসলার জন্য অট্টালিকা ভঙ্গ।
১৩১। যদি এক ইন্দুর নড়ে, চোরের প্রাণ ধড় ফড়ে।
১৩২। যদি তব গৃহে কাচের ছাদ।
অন্যে মারিবারে না কর সাধ।
১৩৩। যার দুওর নীচু, তাকে অবশ্য হেঁট হইতে হবে।
১৩৪। যার নাই ঋণ, সেই চিন্তাহীন।
১৩৫। যার নিকট রুটী, তারি নিকট কুক্কুর।
১৩৬। যার ল্যাজ খড়ে নির্ম্মিত, তারি সদা আগুনে ভয়।
১৩৭। যাহার মোমের মাথা, সে যেন রৌদে না যায়।
"ননীর পুতুল যেন, রৌদ্র পেলে গলে যাবে"।
১৩৮। যাহার হৃদয়ে প্রেমের স্থিতি।
তার আশে পাশে কণ্টক নিতি।
১৩৯। যেই ফুলে মধুকর মধু পান করে।
বোলতা কেবল তাহে তিক্তরস হরে।
১৪০। রন্ধনশালে যার বাস, তার অঙ্গে ধোঁয়ার বাস।
১৪১। রাজমুকুট কিছু মাথা ব্যথার ঔষধ নয়।
১৪২। শকটরোহণে নাশ মৃগয়া।
১৪৩। শত্রু পলাইলে সকলেই সাহসী। "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে"।
১৪৪। শৃগাল ফাদে ল্যাজ্ হারাইয়া স্ব-জাতির প্রতি উপদেশ দিল, সকলে ল্যাজ্ কাটাও
১৪৫। সংসার এক সিঁড়ী, কেউ উঠে, কেউ নাবে।
১৪৬। সূর্য্য মলপিণ্ডের উপর দিয়া গমন করিলে অপবিত্র হন না।
১৪৭। সে ডালের পক্ষী বিক্রয় করে।
১৪৮। সোনার চাবিতে সকল দ্বার খোলে।
১৪৯। সোনার বাগ্ ডোর হইলেই ভাল ঘোড়া হয় না।
১৫০। স্থির জলে কীটের জন্ম।
১৫১। হস্তী মক্ষিকার দংশন অনুভবে অপরাগ।
১৫২। হাঁড়ী চাঁচার পালক ছেঁড়; কিন্তু তাকে চেঁচাইতে দিওনা।
১৫৩। ক্ষত চক্ষুতে আলোক পীড়াদায়ক।

১৫৪। অনলে দগ্ধ বিড়ালের শীতল বারিতে ভয়।
"ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখে ডরায়"।

১৫৫। অন্ধের দেশে একনেত্র পুরুষ রাজা। "আদাড় গায়ে শিয়াল বাঘ"।

১৫৬। আগে আমাকে পাড়, তবে জলপাই বলিয়া ডাকিও। "না আঁচালে বিশ্বাস নাই"।

১৫৭। এক বালতি জলের চেয়ে, এক মিষ্ট কথায় অধিক নির্বাণ করে।

১৫৮। এক মুষ্টি উপস্থিত বুদ্ধি, এক চাঙ্গারী বিদ্যার সমতুল্য।

১৫৯। কলসী পাথরকে আঘাত করুক. কলসীরই সর্ব্বনাশ।

১৬০। কাজের বেলা গা শীহরে. খাবার বেলা ঘর্ম্ম ঝরে।
"কাজে কুড়ে ভোজনে ডেড়ে,
বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে"।

১৬১। কুঁজো আপন কুঁজ দেখিতে পায় না, পরের দেখিতে পটু।

১৬২। "গয়াং গচ্ছ,,' "নাস্তি" বাটী গমনের পথ।

১৬৩। চোটের তাড়না সহ হইলে নেহাই।
হাতুড়ী যদ্যপি হও চোট মার ভাই॥

১৬৪। ছুরীর মার * মিটে, কিন্তু জিহ্বার মার মিটে নয়া।

১৬৫। তিন জনের যে গুপ্ত কথা, তাহা সকল লোকের গুপ্ত কথা।

১৬৬। তিনটী বিষয়ে আনে মানুষের কাল।
খর রৌদ্র, রাত্রে ভোজ, আর চিন্তাজাল।

১৬৭। দরিদ্র হইলে দাতা, ধনী হইলে কৃপণ।

১৬৮। দুই উকীলের মধ্যে মুর্খ মওয়াক্কেল, যেন দুই বিড়ালের মধ্যে একটী মাছ।

১৬৯। দুই চক্ষু অপেক্ষা চারি চক্ষুতে অধিক্ দৃষ্ট হয়।

১৭০। দুই জনের মধ্যে গুপ্ত কথা, ঈশ্বরের গুপ্ত কথা।

১৭১। পঙ্গু অপেক্ষা মিথ্যাবাদী শীঘ্র ধরা পড়ে।

১৭২। পরের হাতদিয়া গর্ত্ত থেকে সাপ বাহির করা।

১৭৩। বৈদ্যদের ভ্রম যত, পৃথিবীর গর্ত্তগত।

১৭৪। মহিলা মদিরা আর তামাক ও তাস।
মানুষের এই চারো বুদ্ধি হয় নাশ॥

১৭৫। মাতাল আর ষাঁড়কে পথ ছাড়িয়া দেও।

১৭৬। মামলার পিরীতে ধন নাশ, বৈদ্যের পিরীতে দেহ নাশ।

১৭৭। যার গরু হারায়, সে সর্ব্বদাই ঘণ্টার শব্দ শুনে।

১৭৮। যেখানেতে কম জোর, সেই খানে ছিঁড়ে ডোর।

১৭৯। নির্দ্দোষ খচ্চর যে জন চায়,
পদব্রজে যেন সে জন যায়।

১৮০। যে জন সমাজে নাহিক মিসে।
হইবে তাহার সুজ্ঞান কিসে? ॥

---

* প্রহার।

১৮১। যে বন্ধু পাখাদিয়া ঢেক্যে ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে মারে, সে বন্ধুকে ত্যাগ করে।
১৮২। যে স্থানে গভীর নীর, সেই স্থান সদা স্থির।
১৮৩। সত্য, তেলের মত, উপরেই ভাসিয়া উঠে।
১৮৪। হাট ভাঙ্গিলে নির্ব্বোধের উদ্যোগ আরম্ভ।
১৮৫। হাতের ঢিল আর মুখের কথা, ছাড়িয়া দিলে আর ফেরে না।

পোর্তুগীস প্রবাদ

১৮৬। হবু কাল কে দেখেছে ?
১৮৭। আলস্য দারিদ্রের কুঁজী কাঠী।
১৮৮। উত্তম খাদ্য বটে, কিন্তু অগ্নিমান্দ্য।
১৮৯। এক গাধার অনেক স্বামী হল্যে সে নেক্‌ড়ের গর্ভস্থ হয়।
১৯০। করাঘাতে শশারু নষ্ট করা অনুচিত কর্ম্ম।
"অর্থাৎ তাহাতে আপনারই হানি।"
১৯১। কালো [illegible] অপেক্ষা রাঙ্গা মুখ ভাল।
১৯২। তার মাথা আছে বটে, কিন্তু আলপিনেরও মাথা আছে
১৯৩। দয়িতা আর দর্পণ সর্ব্বদা বিপদাক্রান্ত।
১৯৪। নারী আর কুক্কুটী অধিক ভ্রমণে পথভ্রষ্ট।
১৯৫। পুরুষ অনল সম, রমণী কাপাস।
শয়তান জেলে দিয়ে করে সর্ব্বনাশ॥
"ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্‌
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্বুধঃ।"
১৯৬। বাঘের দাঁত গেলেও ইচ্ছা যায় না।
১৯৭। ভেড়ার লাথীতে নেক্‌ড়িয়ার আনন্দ।
১৯৮। মধু, গাধার মুখের জন্যে নয়।
১৯৯। মুখাবরোধ করাতেই নির্ব্বিরোধে আছি।
"বোবার শত্রু নাই।"
২০০। সুবিমল জল যদি তোমার হে চাই।
নির্ঝর হইতে তবে তোল তাহা ভাই॥
২০১। যেই জন মাছ ধরে সে যেন না জলে ডরে॥
"মাছ ধরতে গেলেই কাদা মাখতে হয়॥"
২০২। যে কুকুর অধিক ডাকে, তার কামড় বড় কম।
২০৩। যে দ্বারের অনেক চাবী, তার প্রতি সাবধান।
২০৪। লাঠি হস্তে যে সন্ধি, সে সন্ধি নহে, বিগ্রহ।
২০৫। সমুদ্রে বারি প্রদান।
"সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য।"

২০৬। অণ্ডের কেনা মুণ্ডন। "শিরোঃনাস্তি শিরঃপীড়া"।

২০৭। অল্পকালে পাকে যেই, ত্বরায় পচে সে।
অল্পকালে জ্ঞানী হৈলে, শীঘ্র যায় টেসে।

২০৮। অস্ত্র, নারী, আর গ্রন্থ প্রত্যহ দেখা আবশ্যক।

২০৯। আগুনের উপর তৈল দান।
"জ্বলন্ত অনলে ঘৃতের আহুতি"।
"কাটা গায়ে নুনের ছিটে"।

২১০। আনাড়ী ছুতারেরই অধিক খুঁচির প্রয়োজন।

২১১। আপনার লেপের সীমা পর্য্যন্ত পা ছড়াও।

২১২। আলস্য ক্ষুধার জন্মদাতা, আর চৌর্য্যের সহোদর।

২১৩। উৎক্রোশ কখন কপোতের জন্ম দেয় না।

২১৪। এক ঘরে যুগল মোরগে সদা দ্বন্দ্ব।
বিড়াল মূষিকে সেইমত ভালমন্দ॥
বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা সে রূপ প্রকার।
কলহ কোন্দল কত করে অনিবার॥

২১৫। একটা ঘেয়ো ভেড়ায় খোঁয়াড় নষ্ট।
"একবিন্দু গোমূত্রে এক কলসী দুধ নষ্ট"।

২১৬। এক পিপা সির্কা অপেক্ষা এক গণ্ডূষ সরবতে অধিক মাছী আটকে।

২১৭। এক লাঙ্গলে, গাধা ও বলদের ভাল যোগ হয় না।

২১৮। কচী ফেকড়ী নত হয়, গুঁড়ী কভু নয়।

২১৯। কাঁটা খোঁচার আঘাত বড়। দুষ্ট জিহ্বার আঘাত দড়।

২২০। কান পাতলা ছেল্যেদের প্রতি সাবধান। কারণ ছোট কলসীর বড় কানা॥

২২ । কুক্কুট আপন গোবর গাদায় মহাবীর। "শৃগাল আপন কোটে সিংহ"।

২২২। কুকুরকে আদর দিলে কাপড় ময়লা করে।
"কুকুরকে লাই দিলে মাথার উপর চড়ে"।

২২৩। খরগোশরাও মৃত সিংহের দাড়ী ধরিয়া টানে।
"হাবড়ে পড়িলে হাতী ব্যাঙ্গে মারে চাট॥"

২২৪। গর্জ্জনকারী বিড়াল অত্যল্প ইন্দুর ধরে। "যত গর্জ্জে তত বর্ষে না"।

২২৫। গাধাকে যব দিলেও সে কাঁটা ঘাসের তত্ত্বে দৌড়ে।
"তথাপি জন্মবিটপি ক্রোড়ে মনো ধাবতি"।

২২৬। গাধা দানা বয়ে মরে, ঘোড়াতে আহার করে। "চিনীর বলদ"।

২২৭। গোলাব ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু কাঁটা চিরকাল থাকে।

২২৮। চালিত লাঙ্গল ফালে চাকচিক্য বাড়ে।
স্থির নীরে কেবল দুর্গন্ধ মাত্র ছাড়ে॥

২২৯। চিত্রিত পুষ্পে গন্ধ নাই।
২৩০। চিরকাল গাধা চড়া অপেক্ষা, এক বৎসর ভাল ঘোড়াতে চড়া ভাল॥
২৩১। চোরের গৃহে চুরি করা দুঃসাধ্য।
২৩২। জনশ্রুতির নাম অর্দ্ধমিথ্যা।
২৩৩। জালে না পড়িলে কাৎলা বলিয়া চীৎকার করিওনা।
২৩৪। জোয়ার মাত্রেরই ভাটা আছে।
২৩৫। ঢাক বাজাইয়া খরগোশ ধরা।
২৩৬। তাঁর এক ঝুড়ি জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু ঝুড়িটা তলা ফুটা।
২৩৭। তাকে আঙুলটী দিলে সে তোমার হাতটী ধরবে।
"বসতে পেলে শুতে চায়।"
২৩৮। তার শিশার ছুরির ন্যায় ধার।
২৩৯। তিমির আর তমস্বিনী চিন্তার জননী।
২৪০। তুষ ছাড়া তণ্ডুল নাই।
২৪১। ধূম হতে পলাইয়া অগ্নিতে পতন।
২৪২। নষ্ট নারী যার, ধরায় পতন তার।
২৪৩। না আছাড় খেলে সুন্দর পা হয় না। "ঠেকে শেখা।"
২৪৪। নূতন জোড়া না পাইলে পুরাণ জোড়া ছেড় না।
২৪৫। নেড়্যে পোতা গাছ তেজাল হয় না।
২৪৬। পাতায় লতায় ভয় হইবে যাহার।
সে যেন না যায় কভু বনের মাঝার।
২৪৭। প্রথম ঘাতেই গাছ পড়ে না।
২৪৮। বংশ-মাহাত্ম্য-অপেক্ষা মনের মাহাত্ম্য সমধিক পূজ্য।
২৪৯। বড় গাছেই বড় ঝড়।
২৫০। বড় বক্তারা ছোট কর্ত্তা।
২৫১। বড় বিজ্ঞানী হলেই বড় জ্ঞানী হয় না।
২৫২। বড় বিজ্ঞেরা বড় অধার্ম্মিক।
২৫৩। বহু কাল কূপে কুম্ভ গিয়ে বার বার।
পরিশেষে তনু তার হৈল চুর মার॥
২৫৪। বাঘের সহিত তার গর্জ্জন প্রভব।
ভেড়ার সহিত কিন্তু ছাড়ে ভ্যা ভ্যা রব॥
২৫৫। বাছুর ডুবিলে পর কূপের মুখ রুদ্ধ করা॥
২৫৬। বিড়াল ইন্দুর ধরিবার সময় মেও মেও ডাক ছাড়ে না।
২৫৭। বিড়ালে মারিলে ঘুম, ইন্দুরের নৃত্যের ধুম॥
"বামুন গেল ঘর, তো লাঙ্গুল তুলে ধর।"
২৫৮। ব্যাং সোণার পিঁড়িতে বসিলেও, ডোবা দেখ্‌লে লাফ দিবে।
"ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।"

২৫৯। ভিকারীর হাত তলাফুটা ঝুড়ি।

২৬০। মধু বটে বড় মিষ্টি, মৌমাছির হুলবিষ্টি।

২৬১। মক্ষিকারে হস্তী জ্ঞান, ইন্দুরটিবীতে পর্ব্বত আরোপ।

২৬২। মাটী দিয়ে মুখ ভর্ত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লোভের শান্তি নাই। অর্থাৎ লোভ আমরণ পর্য্যন্ত সহচর।

২৬৩। যদি ডিম্ব খেতে সাধ, তবে সহ হংসনাদ।

২৬৪। যদি সবে আপনার নাছ ঝেঁটাইতে।
তবে রাজপথ রাত্রে বিমল থাকিত।

২৬৫। যার মধুর প্রয়োজন, সে যেন মৌমাছীর হুলে ভয় করে না।

২৬৬। যাহাতে ব্যয় নাই, তার আবার মূল্য কি।

২৬৭। যাহার মাখনের মাথা, সে যেন উনুনের নিকট না যায়।
"ননীর পুতুল নয় যে রৌদ্র পেলে গল্যে যাবে।"

২৬৮। যে ইন্দুরের এক মাত্র গর্ত্ত, সে শীঘ্র ধরা পড়ে।

২৬৯। যে কুকুরের মুখে হাড়, তার বন্ধু কোথায়।

২৭০। যেখানে চুল নাই, সেখানে চুল বাঁধা নোংরামী। "শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া।"

২৭১। সমধিক গাঢ় হয় যে খালের তল।
সেই খালে আগে বাগে বেগে ধায় জল॥

২৭২। রসুয়ে আর ভাণ্ডারীতে ঝগড়া লাগিলে কে ঘি চোর তাহা জাস্তে পারা যায়।

২৭৩। রাজমুকুট শিরঃপীড়ার ঔষধ হয়।

২৭৪। ল্যাজ না খসলে গরু ল্যাজের মূল্য বুঝতে পারে না। "দাঁত থাকতে দাঁতের মরম জানে না।"

২৭৫। শূওরের পেট ভরিলেই ডাবা উপুড় করিয়া ফেলে।

২৭৬। সত্য কালের পুত্র।

২৭৭। স্বর্ণ অঙ্গুরী ধারণ করিলেও যে বানর সেই বানর। 'তথাপি সিংহঃ পশুরের নান্যঃ।"

২৭৮। হংসী চীৎকার করে, কিন্তু কামড়ায় না।

২৭৯। ক্ষীণ সূতা আস্তে টান।

২৮০। ক্ষুধাই উত্তম চাট্‌নী।

২৮১। ক্ষুধার্ত্ত জঠরের কর্ণ নাই।

২৮২। ক্ষেত্রের পক্ষে উত্তম সার, কৃষকের নয়ন আর চরণ।

দিনামার প্রবাদ

২৮৩। অধিক উচ্চে উঠিতে চেষ্টাই অধঃপাতে যাইবার পথ।

২৮৪। অনেকের যুক্তি লৈয়ে যে রচে আলয়।
তার ঘর বাঁকা টেড়া হইবে নিশ্চয়॥

২৮৫। অন্ধ দেখিতে অক্ষম বলিয়া আকাশের নীলবর্ণ কম হয় না।

২৮৬। অপ্রিয় অতিথি হন সেরূপ গৃহীত।

২৮৭। অভাব আর প্রয়োজন, বিশ্বাস এবং শপথ ভঞ্জনকারী।

২৮৮। অর্দ্ধ সম্পন্ন কর্ম মূর্খকে দেখাইবে না।

২৮৯। অল্প আগুনে শীত হরে, অধিক আগুনে পুড়িয়ে মারে।

২৯০। আকরোটের গাছ, গাদা, আর কুন্দলিয়া নারী। এ তিনকে না ঠেঙ্গালে কোন ফল পাওয়া যায় না।

২৯১। আশা একটি ডিম্ব, কেহ কুসুম পায়, কেহ শ্বেতাংশ পায়, কারো ভাগ্যে খোলা সার।

২৯২। আশা জাগ্রত স্বপ্ন।

২৯৩। ইন্দুরের পেট ভরিলে অন্নব্যঞ্জন তিত লাগে।

২৯৪। উকীল আর চিত্রকার ইহারা অচিরাৎ কালোকে শাদা, শাদাকে কালো করিতে পারে।

২৯৫। করিবারে পারি পর নয়ন মুদ্রিত।
করিবারে নারি কিন্তু তাহারে নিদ্রিত॥

২৯৬। শৃগাল হংসালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক কহিল "হংসেভ্যো নমঃ।" "বকঃ পরম ধার্মিক।"

২৯৭। শৃগালের লোম খসে, কিন্তু চাতুরী খসে না।

২৯৮। সকল কর্ম্মই প্রথমে বড় কঠিন, এই কথা বলিয়া চোর নেহাই চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

২৯৯। সকল গুলীতে পাখী মারা যায় না।

৩০০। সততা বিরহে রূপলাবণ্য স্বুবর্ণের খাদ!

৩০১। কাণা পায়রাও কখন কখন গম খুঁটিয়া খায়।

৩০২। কামারের ছেলেদের, অগ্নি কণার ভয় কি?

৩০৩। কুকুর যে বর্ণের হোক্, কুকুর ভিন্ন আবার কিছু নহে।

৩০৪। কুক্কুট না ডাকলেও প্রভাত হয়।
"যে দেশে কাক নাই, সে দেশে কি রাত পোহায় না?"

৩০৫। কুলা হাতে দিয়া কন্যার পরীক্ষা, নাট রঙ্গে তাহার পরীক্ষা নহে।

৩০৬। কোমল বচন ও কমনীয় বদনই নারীদিগের ভূষণ।

৩০৭। গাছ পড়লে তাহার উপর চড়া সহজ কর্ম।

৩০৮। গাধা সোনার ছালা বহুক, কিন্তু তা বল্যে কাঁটা ঘাস কম করো খাবে না।

৩০৯। চড়ুই পাখীর উচিত নহে সারসের সঙ্গে নৃত্য করা। "ছাতারের নৃত্য"।

৩১০। জঙ্গলা গাছ অল্প কাল মধ্যে বাড়ে কিন্তু বহুকাল থাকে।

৩১১। জঙ্গলে গাছের নিপাত নাই।
৩১২। ডিম্ব আর শপথ, ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ।
৩১৩। তামার ডেকের সহিত ঝগড়ায় মাটীর হাড়ীর উপকার নাই।
৩১৪। তুফান না থাক্‌লে হাল্যে বসা সহজ কর্ম্ম।
৩১৫। দশনে সর্ব্বদা রসনাঘাতে একত্রে বাস হল্যে কি হবে।
৩১৬। নষ্ট নারী শয়তানের গুলম্যাক্।
৩১৭। পরিশ্রমের শিকড় তিত, কিন্তু ফল মিষ্ট।
৩১৮। পাপ বৃক্ষ রোপণে পাপ ফল হয়।
৩১৯। পাপ শিক্ষায় গুরু মহাশয়ের প্রয়োজন নাই।
৩২০। পিয়াজ, ধূম, নষ্টনারী চক্ষে আনে অশ্রুবারি।
৩২১। পুরাণ ডাল নোয়াইলেই ভাঙ্গিয়া পড়ে।
৩২২। ভরাপেটে উপবাসের প্রশংসা।
৩২৩। ভূঞ্জিবারে সাধ যার অনলের তাপ।
তাহাকে সহিতে হয় ধূম আর তাপ॥
৩২৪। ভেড়ার উপর বাঘ বিচারপতি হল্যে ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা।
৩২৫। ভেড়ার ছা ভক্ষণে, বাঘের বৈরক্তির বিষয় কি?
৩২৬। মর্চ্যা লোহা ক্ষরে, হিংসা নিজ কলেবরে॥
৩২৭। মাথার উপরে পাখী উড়ুক, কিন্তু যেন চুলে বাসা না করে।
৩২৮। মিথ্যা কথা লাটিন ভাষা হইলে সকলেই পণ্ডিত হইত।
৩২৯। মূর্খের প্রতি উপদেশ, হাঁসের গায়ে জল নিক্ষেপ।
৩৩০। যত পার থাক পাখী আকাশ উপরে।
ধরায় নামিতে হবে আহারের তরে॥
৩৩১। যত ময়লা নাড়িবে, ততই দুর্গন্ধ ছাড়িবে।
৩৩২। যাকে সাপে কামড়াইছে, তার বাইন মাছকেও ভয়।
"ঘর পোড়া গরুর সিন্দূরে মেঘে ভয়" ॥
৩৩৩। যার প্রত্যেক ঝোড়ে ভয়, সে কখন বনে যেতে পারে?
৩৩৪। যে জন লয় কভু সস্তা উপদেশ।
সেই কিনে অনুতাপ মহার্ঘ বিশেষ॥
৩৩৫। যে ব্যক্তি অনেক উচ্চৈ লম্ফ দিবে, সে ব্যক্তি অনেক দূর দৌড়ুক।
৩৩৬। রাজ সদনে অবস্থান, নরকের স্বল্প সোপান।
৩৩৭। রেসমের জিহ্বা আর শণের হৃদয় প্রায় সহচর।
৩৩৮। বড় নদী, বড় মানুষ, আর বড় রাস্তা এই তিনই মন্দ প্রতিবাসী।
৩৩৯। বয়সে অনেকের মাথা শাদা হয়, কিন্তু স্বভাব শাদা হয় না।
৩৪০। বহু সংখ্যক রেণুতে জাহাজ মারা পড়ে।
৩৪১। বিড়ালের খেলা মূষিকের মৃত্যু।
৩৪২। শিকল কামড়ালে কুকুরের নিষ্কৃতি নাই।
৩৪৩। শূন্য শকটেই অধিক শব্দ।

৩৪৪। শৃগাল যখন রাজহংসীর উপদেশ কর্ত্তা তখন রাজহংসীর গ্রীবাদেশ বিপদাক্রান্ত।

৩৪৫। শৃগাল যে কালে মুখে লয়ে হংসবরে।
ক্রুত বেগে গতি করে, কানন ভিতরে॥
হংস বলে কেয়া মজা কর দরশন।
যথাসুখে করিতেছি তুরঙ্গ ভ্রমণ॥

৩৪৬। শ্বেত কেনা মৃত্যুকুসুমের মুকুল।

৩৪৭। সন্ধ্যা হল্যে পর দিন ভাল বলিয়া ব্যাখ্যা কর।

৩৪৮। সদ্‌গুণ বিহীন রূপ, গন্ধহীন গোলাব।
"নির্গন্ধ ইব কিংশুকঃ।"

৩৪৯। স্বর্গদ্বার ব্যতীত সকল দ্বারই সোনার চাবীতে খোলা যায়।

৩৫০। হংসীর জন্যে জুতা নির্ম্মাণের ফল কি ?

৩৫১। হিংসা জ্বররোগ হইলে জগৎ শুদ্ধ পীড়িত থাকিত।

৩৫২। হাঁটীবার পূর্ব্বে হামাগুড়ি।

৩৫৩। ক্ষতির উপর উপদেশ, মৃত্যুর পর ঔষধ। "পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ।"

৩৫৪। ক্ষুদে কুকুর, শিং ছাড়া গোরু আর বাউনে মানুষ, ইহারা প্রায় অহঙ্কারী। "কাণা খোড়া একগুণ বাড়া"

ফরাসী-প্রবাদ

৩৫৫। অতিথি আর মৎস্য তিন দিনের পর বিষ।

৩৫৬। অর্থ উৎকৃষ্ট ভৃত্য, কিন্তু অপকৃষ্ট প্রভু।

৩৫৭। অধিক পেটাটেপীতে বাইন্ মাছ হাত ছাড়া হয়।

৩৫৮। অন্ধকারে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও জ্বলিতে থাকে।

২৫৯। আইনের নাক মোমে নির্ম্মিত।

৩৬০। আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ।

৩৬১। আঁখি দেখে নাই যারে, মন নাহি শোচে তারে।

৩৬২। আণ্ডার লোভে মুর্গী হত্যা করা।

৩৬৩। আলপিনের তল্লাসে মোমবাতী জ্বালান। "ভেড়ার কল্যাণে মহিষ বলী।"

৩৬৪। উকীলের বগ্‌লা নরকের দ্বার।

৩৬৫। উকীলদের বাটী মূর্খদের মুণ্ডে নির্ম্মিত।

৩৬৬। এক প্রেকে অন্য প্রেক বাহির কর।
"কাঁটা দিয়ে কাঁটা বাহির করা।" "জল দিয়ে জল বাহির করা"।

৩৬৭। একটু সুখের জন্য সহস্র দুঃখ।

৩৬৮। ঔষধের বড়ি চিবিও না, গিলে খাও।

৩৬৯। কয়লার মুটেও আপন ঘরে প্রভু।

৩৭০। কণ্টক শূন্য গোলাব নাই। "পদ্মের মৃণালে কাঁটা।"

৩৭১। ফাঁসীতে যার প্রাণ গত, তার ঘরে ডোরের কথা উল্লেখ করা অনুচিত।

৩৭২। কুকুর ডুবিয়ে মরিবার সময় লোকে বলে কুকুরটা খেপিয়াছে।

৩৭৩। কুকুরকে অতিক্রম করিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত মিষ্ট কথার প্রয়োজন।

৩৭৪। কুকুরকে স্নানই করাও আর তাহার লোমই আঁচ্‌ড়াইয়া দাও, যে কুকুর সেই কুকুরই থকিবে। "কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ"।

৩৭৫। কুঁজ আপনার কুঁজ দেখ্‌তে পায় না, পরের দেখ্‌তে পটু।

৩৭৬। কোন ব্যক্তিকে ভাল করে জানিতে হইলে তাহার সহিত এক কাঠা লুণ খাওয়া আবশ্যক।

৩৭৭। কৃপণ আর শূকর না মরা পর্য্যন্ত কোন উপকারে আইসে না।

৩৭৮। খাসা খাঁচা বলিয়া পক্ষীর নিস্তার নাই।

৩৭৯। গাধা সাধারণের সম্পত্তি হইলে বোঝাইয়ের বেলা বড় শক্তাশক্তিতে পড়ে। "সাজার মা গঙ্গা পায় না।"

৩৮০। গাধার শির ধোলায়ে সময় ও সাবান ক্ষয়। "গাধা পিটে কখন ঘোড়া হয় ?"

৩৮১। গাধার নিকটে রেশম চাওয়া।

৩৮২। গাধার জন্যে মধু নহে। "চাসা কি জানে মধুর স্বাদ।"

৩৮৩। গাধার যদি তৃষ্ণা না থাকে, তবে তুমি তাহাকে কখনই জল খাওয়াইতে পার না।

৩৮৪। গোলাব অপেক্ষা শূওরের কাছে ভূষী অধিক প্রিয়।

৩৮৫। চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে।

৩৮৬। চক্ষুর অন্তর হইলেই মনের অন্তর।

৩৮৭। চুনা পুঁটী রাঘব বোয়ালের খাদ্য।

৩৮৮। জল ঘোলা হইলে মাছ ধরিবার সুযোগ।

৩৮৯। তাড়া দেওয়া পক্ষী ধরিবার উত্তম পন্থা নহে।

৩৯০। তুফান না থাকিলে সকলেই মাঝি।

৩৯১। দাঁড়কাককে লালন পালন করিলে সে তোমার চক্ষু উৎপাটন করিবে।

৩৯২। যাহার ক্ষতি হইবার পদার্থ নাই, সে ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়।

৩৯৩। দিন যতই দীর্ঘ হউক, কিন্তু তাহার অবসান আছে।

৩৯৪। দিবা দুই প্রহরে লান্ঠন লওয়া।

৩৯৫। দূরস্থ গাভী বহু দুগ্ধবতী।

৩৯৬। ধুঁয়া, বন্যা, কুন্দুলে নারী, জীবনের ক্ষয়কারী।

৩৯৭। নদীতে জল প্রদান। "সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ।"

৩৯৮। নষ্ট লোককে ফাঁসীকাষ্ঠ হইতে নামাইলে সে তোমাকে টাঙ্গাইয়া দিবে।

৩৯৯। নিতান্ত কোমল হৃদয়া জননী।

৪০০। নেবা চক্ষে সকলই হরিদ্রা বর্ণ।

৪০১। পরহিংসায় কান পাতিলেই পরহিংসক হতে হয়।

৪০২। পাঁচটি পদার্থ সংসারে অপদার্থ—রণপ্রিয় পুরোহিত। চক্ষুর্লজ্জাশীল বিচারপতি। ভীরু সেনাপতি। দুর্গন্ধ দেহী নাপিত। আর পাঁচড়াক্ষত হালুয়াই।

৪০৩। পিঠা আর লুহনার কারবার ভাঙ্গাই কর্ত্তব্য।
৪০৪। প্রথম ঘাতেই গাছ্ পড়ে না।
৪০৫। প্রথম পদক্ষেপই বড় কঠিন।
৪০৬। প্রাচীরেরও কান আছে।
৪০৭। ফলভারাবনত বৃক্ষেই লোকে লোষ্ট্রক্ষেপ করে।
৪০৮। ভালুক মারার পূর্ব্বে তাহায় চামড়া বিক্রী করিও না। "কালনিমার লঙ্কা ভাগ।",
৪০৯। ভেড়া বাঁচাইয়া তাহার পশম লোকসান ভাল।
৪১০। মালীর কুকুর সেটা নিজে নাহি খায়। পরে নিতে এলে শাক তাহারে তাড়ায়॥
৪১১। মাছদিগকে সাঁতার শিখিও না।
৪১২। মুদিতমুখে মাছি প্রবেশ করিতে পারে না। "নীরবের শত্রু নাই" "সব্‌সে চুপ ভাল।"
৪১৩। যতই সেলায়ে কারিগরী, ততই চীরে চেরাচিরি। "বজ্র আঁটুনী ফস্কা গিরা।"
৪১৪। যত দিবে নাড়া চাড়া, ততই গন্ধ ছাড়্‌বে বাড়া।
৪১৫। যদি ট্যাকে টাকা নাই, মুখে মধু রাখ ভাই।
৪১৬। যদি মাখনে মাথা হয়, তবে হালুয়াইকর হইও না।
৪১৭। যমের লক্ষ্য দরিদ্রের গরু, আর ধনবানের পুত্রের প্রতি।
৪১৮। যাঁতা এবং উনানের নিকট এক কালেই উপস্থিত থাকা অসম্ভব।
৪১৯। যার নেকড়িয়ার সঙ্গে বাস, সে হোয়া হোয়া ডাক ছাড়বে।
৪২০। যাহার মোমের মাথা, সে যেন আগুনের নিকট না যায়।
৪২১। যাহার অনেক কন্যা, তাহার সর্ব্বদাই রাখালবৃত্তি।
৪২২। যাহা আজ ভাল, তাহা চিরকাল ভাল।
৪২৩। যে করে বচন ব্যয় সে করে রোপণ। সে করে আদায় শস্য, যে করে শ্রবণ॥
৪২৪। যে কূপের জল খাবে তাতে থুথু ফেলিও না।
৪২৫। যেখানেতে কম জোর, সেই খানে ছিঁড়ে ডোর।
"যেখানেতে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধে হয়।"
৪২৬। যে জন পথে ছড়ায় কাঁটা, তার যেন থাকে জুতা আঁটা।
৪২৭। যে দিগে বাতাস, সেই দিগে পালী তোল।
৪২৮। যেজন পাপে ক্ষমা করে, সেজন পুণ্য করে।
৪২৯। যেরূপ বিছানা পড়িবে, সেইরূপ শয়নে সুখলাভ করিবে।
৪৩০। রাত্রিকালে সকল বিড়ালই সমান শাদা।
৪৩১। লম্বা লাফ দিবার সময় দুহাত পিছে হটা ভাল।
৪৩২। ল্যাজ্ থাকিতে গরু তাহার মূল্য বুঝিতে পারে না, ল্যাজ হারাইলেই বুঝিতে পারে।
"দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা জানে না।"
৪৩৩। লোণা ইলিশের জালায় চিরকাল গন্ধ।
৪৩৪। বলদের সম্মুখে লাঙ্গল যোজন।
৪৩৫। বড় বক্তারা বড় কর্ত্তা নহে।
৪৩৬। বানরের ন্যায় বিড়ালের থাবা যোগে উনান হইতে আলু বাহির করা।

৪৩৭। ব্যবহার অপেক্ষা মর্চ্যায় অধিক ক্ষয়।

৪৩৮। বিনির্গলৎ প্রস্তরে শৈবাল সঞ্চয় হয় না।

৪৩৯। বিষমরোগে বিষম চিকিৎসা। "বুনওলে বাগা তেঁতুল।"

৪৪০। বুড় গরু ভাবে সে কখন বাছুর ছিল না।

৪৪১। বৃষ্টির ভয়ে জলে ঝাঁপ দেওয়া।

৪৪২। শত বৎসরের চিড়্ চিড়িনিতে এক পয়সার ঋণ শোধ হয় না

৪৪৩। শোয়ারের চক্ষুতেই ঘোঁড়ার পুষ্টি।

৪৪৪। স্বর্গস্থ হবার অপেক্ষা লোকে নরকস্থ হতে অধিক চেষ্টা পায়।

৪৪৫। সাঁকো, ভাঙ্গা, নদীর কাছে, ভৃত্য আগে কর্ত্তা পাছে।

৪৪৬। সিংহের ল্যাজ হওয়া অপেক্ষা কুকুরের মুণ্ড হওয়া ভাল।

৪৪৭। সূর্য্য প্রদর্শনার্থ মশাল জ্বালা।

৪৪৮। সে ঝাড়ে বন, অন্যে ধরে পাখী।

৪৪৯। সে ভাল উকীল বটে, কিন্তু মন্দ প্রতিবাদী।

ফরাসীপ্রবাদ সমাপ্ত।

বাদাগাদিগের প্রবাদ

[বাদাগা জাতি নীলগিরির আদিম নিবাসী। তাহারা উটকামুণ্ডের নিকটে বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকানেক কৌতুকাবহ আচার ব্যবহার আছে। ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় জাতি সমূহের প্রবাদাবলী সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রচার করিলে সবিশেষ ফল আছে; যে হেতু তদ্দ্বারা তাহাদিগের পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত এবং সামাজিক অবস্থার সূত্র পাওয়া যাইতে পারে।]

৪৫০। অলস লোকেরা ময়ূরের ন্যায় বৃষ্টিকে ভয় করে।

৪৫১। আপনার কপাতে যখন খাইদ্ মিশাল, তখন সেকয়ার সঙ্গে ঝগ্ড়া কেন।

৪৫২। আপনার ভেয়ের কাপড় পরা আর বাঘের চামড়া পরা সমান।

৪৫৩। উনুই বন্ধ করা যায়, কিন্তু পরের মুখ বন্ধ করা যায় না।

৪৫৪। এক ফোঁটা ঘী বাঁচাতে গিয়ে কলসী শুদ্ধ গেল

৪৫৫। এক লাঙ্গলে মহিষ আর বলদ জুতিলে বলদ টানে বাদার দিকে, মহিষ টানে পাহাড়ের দিকে।

৪৫৬। এক খানা আঙ্গায়ে আলো হয় না। একাকী পথিক পথ পায় না॥

৪৫৭। কর্ণহীনে বেহালার কিবা প্রয়োজন। কি কার্য দর্পণে বল অন্ধ যেই জন॥

৪৫৮। কুটুম্বকে বিদায় দেওয়া নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে এম্নি ধোঁয়া দেওয়া যে কুটুম্ব পালাতে পথ পান না।

৪৫৯। গোলাতে কত ধান আছে, তা কি রাখাল জানে।

৪৬০। গোলাম যদি বাদ্সা হয়। তবে রাত্রিকালেও ছাতা বয়॥

৪৬১। তৃপ্তিতেই হাঁচীর জন্ম, অধিক কথায় বিবাদের জন্ম।

৪৬২। ধনলোভী নর, উচ্চতরু ফলধর। নাগাল না পাওয়া যায় তাহার অন্তর॥
৪৬৩। পাগ্ড়ী একফের্ হউক, আর দশফের্ হউক তবু সে পাগড়ী।
৪৬৪। বড়লোকে বুন হাতী করয়ে প্রণতি। পিপীড়াঁও ঢিল মারে ছোট লোক প্রতি॥
৪৬৫। বন বরাহ কি করিবে হস্তী আরোহীরে।
৪৬৬। বানরেতে দর্পণের জানে কি সম্মান। শিয়ালেতে দেউলের রাখে না সন্ধান॥
৪৬৭। বোক্না আয় যুবতী সদা চপল মতি। বিশ্বাস করো না এই উভয়ের প্রতি॥
৪৬৮। ভাঙ্গা ঘর আর চিড়্ চিড়্যা মাগ সমান দুঃখ দেয়।
৪৬৯। ভাল মানুষেরা ভাগ্যে তুষ, নষ্টে খায় ভাত।
৪৭০। ভিকারীর পেট ভরিয়া দিলে সে তোমার ঘর চেপে বস্বে।
৪৭১। মহিষী দানে পেয়ে কি জিজ্ঞাসে দুধলী কি নয়।
৪৭২। মালিক অভাবে ফসল মন্দ।
৪৭৩। মূর্খের দুই চক্ষু অপেক্ষা রাজপুত্র অর্দ্ধ চক্ষুতে অধিক দেখতে পান।
৪৭৪। যখন ছিলনা কিছু তখন সন্তোষ। সন্তোষ হইল হত পেয়ে রত্নকোষ॥
৪৭৫। যদি কিছু জান তবে কথা কহ ভাই। নতুবা মারহ চুপ কথা কার্য নাই॥
৪৭৬। যতক্ষণ হাতে ততক্ষণ সরা খানা। হাত থেকে ফেলে দিলে খোলা কুচী কাণা॥
৪৭৭। যেমন মা, তেমন ছাঁ।
৪৭৮। রসনার অগ্রভাগ চিনি দিয়ে মোড়া। গরলেতে ভরা কিন্তু আছে তার গোড়া॥
৪৭৯। রাক্ষসের মাছী খাওয়ার ন্যায়।
৪৮০। লুণ দিলে ব্যাঞ্জনের হাল্সানী যায়। লবণ বিস্বাদ হল্যে কি আছে উপায়॥
৪৮১। লুণ খেকো কুঁকড়ার মত সেটার চীৎকার।
৪৮২। সকলি সময়ে ভাল শুন সব ভেয়ে। বৎসরের শস্যনানা একবেলা খেয়ে॥
৪৮৩। সর্দারের আগে আগে কর না গমন। ঘোঁড়া আগে পিছে পিছে সোয়ার যেমন॥
৪৮৪। সুরূপা না পেলে পর, কুরূপারে বিয়ে কর॥
৪৮৫। সে কখন স্রোতে ভাসে যে জন নৌকায়?
৪৮৬। ক্ষীরেতে মিশাল নীর তবু ক্ষীর কই। মা হলে রাক্ষসী তবু কি আর মা বই॥

মালেয়ালম্ প্রবাদ

[মালেয়ালম্ ভাষা মালবর উপকূলে ২৫ লক্ষ লোকের ভাষা। ইহার সহিত সংস্কৃত ভাষার ঐক্য আছে। এই প্রদেশই মলয়াচলের অন্তর্গত।]

৪৮৭। উন্দুর লেংটে, শুওর, বামুন আর বানর না থাকিলে মালবর স্বর্গ হইত।
৪৮৮। ঔষধ মাড়্তে পারে অনেকে, খেতে হয় একেকে।
৪৮৯। কাঁচা কাঠের সাঁকোর মূল্য কালে প্রকাশ পায়।
৪৯০। কাঁটা ধরিয়ে এঁটে সেঁটে।
৪৯১। কাঁঠালের পুরাণ পাতা ঝরিলে নূতন পাতারা হাঁসে না।
৪৯২। কাদা ঘাঁটিলে কাদা মাখতে হবে।

৪৯৩। কালই সত্যের প্রকাশ কর্ত্তা।
৪৯৪। কুকুর সমুদ্রের মাঝখানে গেলেও কেবল জল খাবে।
৪৯৫। কুকুরের দশটা ছাঁ হল্যে কি উপকার, গোরুর এক বাছুরেই যথেষ্ট।
৪৯৬। কুড়ালীর পরশ্ বন্ কেট্যে।
৪৯৭। কৃতঘ্নের শীত নাই। অর্থাৎ সঙ্কোচ নাই।
৪৯৮। ক্রোধের চক্ষু নাই।
৪৯৯। গর্ত্তস্থ শূওরকে শীকার করা দায়।
৫০০। গাধা জানে কি কুঙ্কুমের মূল্য ?
৫০১। গাধাকে পরালে সাজ ঘোড়া নাহি হয়।
৫০২। গাধার ক্ষুর আলিঙ্গন করিলে যদি কোন ফল থাকে, তবে কর্ত্তব্য।
৫০৩। গাধার পিঠে জোয়াল দিবার সময় কি অনুমতি নিতে হবে।
৫০৪। গাভীর চক্ষে বাছুরটী সোণার জেল্লা।
৫০৫। গৃহ শূন্যের অগ্নিতে ভয় নাই।
৫০৬। ঘর খোলা দিয়ে ছাপ, আর পাতা দিয়ে ছাও, তাতে স্থানের কিছু পরিবর্ত্তন হয় না।
৫০৭। ঘোড়ার ছার্তক আর হাতির কদম এক সমান।
৫০৮। ঘোড়ার মাথায় সিং দিলে কেহ মালবারে তাকে আর রাখবে না।
৫০৯। চক্ষু কানা না হল্যে কেহ তার মূল্য জানে না।
৫১০। চীৎ হয়ে থু থু ফেল্লে আপনার বুকেই পড়ে।
৫১১। চিনার ভিতর পিঠ যেমন, বাহির পিঠ ও তেমন।
৫১২। ডাকিবার সময় কুকুর কামড়ায় না।
৫১৩। ডিম ফাটাতে লাঠীর প্রয়োজন নাই।
৫১৪। তরঙ্গ ছাড়া সমুদ্রের নড় চড় নাই।
৫১৫। তিত খাওয়া কঠিন বটে, কিন্তু মিষ্টি মুখ থেকে ফেলা আরো কঠিন।
৫১৬। তীরে গিয়েছে বল্যে হাল্ ছেড় না।
৫১৭। তুমি পড়্যে গেলে না হাঁসেন এমন সেঙাৎ নাই।
৫১৮। দরিদ্রের কথা, শ্রবণের পথ নাহি পায় যথা তথা।
৫১৯। দানে পাওয়া গরুর, দেখিবার আবশ্যক কি ?
৫২০। দুঃখী লোক ধনী হল্যে রাৎ দুপরে ছাতী ধরায়।
৫২১। দুওর কাটিবার পূর্ব্বে দেওয়াল উঠাও।
৫২২। দুটী মুখের মাধ্য একটী ঐক্য হয় কি না ?
৫২৩। দুষ্ট দত্ত দুগ্ধও তিত।
৫২৪। নখে যাহা কাটা যায় নবীন বয়সে। বুড়া হল্যে কুড়ালীর দাঁত নাহি বসে।
৫২৫। নদীর এক ধার থেকে অন্য ধার সবুজ।
৫২৬। না মরিলে, কেহ সোজা হয় না।
৫২৭। নেড়ে পোঁতা গাছে ফল ধরে না।
৫২৮। নৌকাতে দৌড়িলে কি শীঘ্র তীরে যায়।

৫২৯। পতিত বৃক্ষও এক লাফে উঠা যায় না।
৫৩০। পর্ব্বত কেটো পাড়্‌তে হলে সোণার কুড়ল চাই।
৫৩১। পরের দন্ত অপেক্ষা আপনার গুলী অধিক প্রিয়।
৫৩২। পা দিয়ে মাড়ালে না কামড়ায় এমন সাপ নাই।
৫৩৩। পা সরিলে হাতীও পড়ে।
৫৩৪। পিঁপড়া হাজার চেঁচাইলে মন্দির পতন হবে না।
৫৩৫। পেট ভরা যার সে কি ক্ষুধার্ত্তের কষ্ট জানে।
৫৩৬। পোড়া বিড়ালের শীতল জলেও ভয়।
৫৩৭। বলবানের নিকট একগাছী খড়ও অস্ত্র।
৫৩৮। ভাল সময়ে ১০ নারিকেলের ড্যাপ পুঁতিলে মন্দ সময়ে ১০টা নারিকেল পাওয়া যায়।
৫৩৯। ভাল সহকারী দ্বার পর্য্যন্ত এলেই যথেষ্ট।
৫৪০। মহিষকে সাঁতার শিখাতে হয় না।
৫৪১। মহিষের নিকট বীণার বাদ্য।
৫৪২। মিষ্টির মধ্যে মুখের মিষ্টিই প্রধান।
৫৪৩। মুর্গীর নিকট ধান চাউলের সমান দর।
৫৪৪। মুর্গীর মাস খাই বল্যে কি মোরগের চূড়া মাথায় দিব?
৫৪৫। যখন দুওর আছে, তখন পাঁচিল ডিঙ্গাইবার আবশ্যক কি?
৫৪৬। যাতে আছে চিনীর গন্ধ, সে হাত চুষতে সবার আনন্দ।
৫৪৭। যাহা জান না, তাহা বল্যো না।
৫৪৮। যার যাতে জ্ঞান আছে, কেন তাঁকে বলা?
৫৪৯। যেখানে পদার্থ আছে, সেইখানেই মানুষ।
৫৫০। যেখানে বাছুর সেখানে গাই।
৫৫১। যেখানে স্চের সঞ্চার হয়, সেখানে স্তার সঞ্চারও হয়।
৫৫২। যে ছোরাতে কায নাই, তা কাছে রাখা কেন।
৫৫৩। যে জন শেখে চুরি কর্ত্তে। সেই শেখে কাঁসিতে মর্ত্তে॥
৫৫৪। রণভূমে কি ছত্রদণ্ড লাভ হয়।
৫৫৫। রাজা, জল, আগুন আর হাতী ইহাদের সহিত তামাসা করিও না।
৫৫৬। রৌদ্রের পরই বৃষ্টির আগমন।
৫৫৭। লড়ায়ে ঘোড়াকে ঘোড়াশালে রাখিলে ফলভাব।
৫৫৮। লাফ মারিবার পূর্ব্বে জায়গা দেখ।
৫৫৯। লুণ খেলেই জল খেতে হয়।
৫৬০। বন্য মহিষের নিকট বেদ পাঠে ফল কি।
৫৬১। বরং গাভীর দুধ তিত হয়। তবু প্রবাদ কভু মিথ্যা নয়॥
৫৬২। বাছুরের তরিবতের ভার, বাঘের প্রতি।
৫৬৩। বাজীকর হাজার উচ্চে দড়ীর উপর নাচুক, বক্‌সীসের সময় নীচে আস্‌তেই হবে।
৫৬৪। বাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করে ইন্দুর মারিবার ফল।

৫৬৫। বাতাসের জোরে, পাথরও পড়ে।
৫৬৬। বানরের জন্যে সিঁড়ির দরকার নাই।
৫৬৭। বানরের পদাঙ্গুলে ফুলের মালা।
৫৬৮। বারো বৎসর নলের মধ্যে কুকুরের ল্যাজ রাখিলেও তাহা সোজা হয় না।
৫৬৯। বিড়াল যতবার পড়ুক, পায়ের উপর পড়িবে।
৫৭০। বীজ আগে রোপণ কর, তার পর বেড়া দিও।
৫৭১। বোবার নিকটে তোৎলা মহা জ্ঞানবান্।
৫৭২। সমরে কি কাজ বল বালকের দলে। তৃষ্ণা শান্তি রহে কচী নারিকেল ফলে॥
৫৭৩। সমুদ্রে ডুবালেও কলসীতে যাহা ধরিবার তাহাই ধরিবে।
৫৭৪। সব ঘরেতে ঠাকুরুণ দিদী, সব কোমরে ছুরী।
৫৭৫। সোণা খাটী করিবার জন্য বিড়ালের কোন প্রয়োজন নাই।
৫৭৬। স্রোতের দৌড় যত দূর। গোলা ছোটে তত দূর॥
৫৭৭। স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত নরপতি। গ্রাম ছাড়া কুকুরের সমান দুর্গতি॥
৪৭৮। স্বেচ্ছাচারের ঔষধ নাই।
৫৭৯। হতাশ্বাসে বাঘকেও খড় খাইতে হয়।
৫৮০। হাজার কথার ভার এক ছটাকও নয়।
৪৮১। হাজার হাজার ভৃত্য চেয়ে রাজাকে দেখাই ভাল।
৪৮২। হাট বাজারের ভাওয়ের কথা ভেড়া নাহি জানে।
৫৮৩। হাত না ভিজালে কি মাছ ধরা যায়।
৫৮৪। হাত হতে পড়ে দ্রব্য তুলে লব তায়। মুখ থেকে পড়ে যদি কি আছে উপায়॥
৫৮৫। ক্ষুধার না চাই চাটনী, নিদ্রার না চাই শয্যা।
৫৮৬। ক্ষুধিত বলদের নিকট একখানা কাপড়ও উপাদেয়।

তামল অর্থাৎ দ্রাবিড় দেশীয় প্রবাদ

[তামল ভাষা মান্দ্রাজের দক্ষিণে ব্যবহৃত। ইহা পুরাতন সাহিত্যাদি ধনে ধনশালিনী এবং ইহাতে ভূরি ভূরি প্রবাদ সমূহ আছে। এই ভাষার মূল তাতার ভাষা, অর্থাৎ যে ভাষা, রুষিয়া রাজ্যের অন্তঃপাতি তুর্কস্তান দেশে প্রচলিত। ভারতবর্ষে এই ভাষা কি প্রকারে সঞ্চার হইল, তাহার এইক্ষণে অনুসন্ধান হইতেছে।]

৫৮৭। অগ্নি শব্দটার ব্যাখ্যা করিলে কি মুখে পোড়ে?
৫৮৮। অতিশয় তীক্ষ্ণ যদি হয় তরবারী। ভোতা অস্ত্র সম সেই অতি অপকারী॥
৫৮৯। অনেক নেংটে একত্রে থাকিলে গর্ত্ত করে না।
৫৯০। অমৃতও অধিক পান করিলে বিষ হয়।
৫৯১। অর্দ্ধ কথায় মাত্র সম্মত হয়্যে লাথী মেরে দন্তপাত।
৫৯২। অলঙ্কার শাস্ত্র শিখে কবিতা-লিখন। তার চেয়ে ভাল কর্ম্ম ডেম্‌সা বাদন॥
৫৯৩। অহি-নকুল-সম্বন্ধ।

৫৯৪। আকাশে থুথু ফেলিলে মুখে এসে পড়ে।
৫৯৫। আগুণে পতিত বিছা যে করে উদ্ধার। অমনি দংশিবে সেই অঙ্গুলে তাহার॥
৫৯৬। আর আর গোরু আট্টীর মেলে, হারাণ গোরুটী মেলা ভার।
৫৯৭। ইন্দুর গর্ত্ত খুঁড়ে মরে। সাপে তাহা দখল করে॥
৫৯৮। ইন্দুর ধরিতে পর্ব্বত পাড়িবে না কি?
৫৯৯। ইক্ষু মিষ্ট বল্যে কি শিকড় পর্যন্ত খেতে হবে।
৬০০। এক গুলীতে কি কেল্লা ফতে হয়।
৬০১। এক ছুঁচের মধ্যে অন্য ছুঁচ চলে না।
৬০২। একটা ভাত টিপে দেখিলে হাঁড়ী শুদ্ধ ভাতের পরীক্ষা হয়।
৬০৩। একটী পুঁটীমাছের জন্য কাবেরীর পাহাড়ী ভঙ্গ।
৬০৪। এক মার দুই কন্যা যে করে গ্রহণ। আধ হাত দড়া নাহি পায় কি সে জন?
৬০৫। একবার নেয়ে আর একবার খেয়ে। চিরকাল নাহি যায় শুন সব ভেয়ে॥
৬০৬। এক হাতে তালী বাজে না।
৬০৭। এক হাতে প্রহার, অন্য হাতে আলিঙ্গন।
৬০৮। কম্বলে আস্‌কাত্তরা।
৬০৯। কলসীর ভিতরে প্রদীপ।
৬১০। কাঁকড়া পোড়াইয়া শিয়ালকে পাহারায় নিয়োগ।
৬১১। কাক্ বোচ্‌কা ভারী হলো ভ্রমণেতে ভয়।
৬১২। কাঁটা দিয়ে কাঁটা বাহির করা।
৬১৩। কাক গাছে বসিয়াছে বল্যে কি তাল পড়িবে?
৬১৪। কাক, বলদের বল্ পরীক্ষা করে না।
৬১৫। কাঠবিড়ালী পলাইনে কুকুরের যত ভেবা।
৬১৬। কাণা ঘোড়া বলিয়া কিছু কম খায় না।
৬১৭। কাণার হাতে বাইনমাছ ধরার ন্যায়।
৬১৮। কাপড় না পরিলে, তাহা কীটের আহার।
৬১৯। কামারের দোকানের কুকুর কি হাতুড়ীর শব্দে ভয় করে?
৬২০। কাশী দর্শনের পর কি থোড়া সন্ন্যাসীর পায়ে পড়িব।
৬২১। কুকুরের মুখ চুম্বন করিলে সেও তোমার মুখ চাটিবে।
৬২২। কুকুরেরে ধৌত করি রাখ সিংহাসনে। তথাপি ধাইবে সেই মল অন্বেষণে॥
৬২৩। কুড়ালীতে কাঠ কাটার ন্যায় তিনি সকল কথার সিদ্ধান্ত করেন?
৬২৪। কুমীর আপন নিবাস জল মধ্যে হাতী ধর্যে টানে।
৬২৫। কুম্ভকারের বহু দিবসের পরিশ্রম এক দিনে নষ্ট।
৬২৬। কূপ খনন করিয়া কি তাহাতে ব্যাং ভর্ত্তি করিবে।
৬২৭। কূপ খনন করিলেই কি তৃষ্ণা শান্তি হয়?
৬২৮। কূপ থেকে যত জল তুলিবে, ততই উন্নই ভাল চলিবে।
৬২৯। কূপমণ্ডুকের রাজ্যের খবরে আবশ্যক কি?

৬৩০। খেঁকশিয়ালের ল্যাজ দিয়ে কুত্তর গহেরা মাপা যায় না।
৬৩১। খরগোশ কাছিমের ডিম মত পাড়্‌তে গিয়ে চোক্ ফেটে্য মল্য।
৬৩২। খরগোশ তাড়াইয়া ঝোপে আঘাত।
৬৩৩। খিড়কীর দ্বার দিয়ে কেহ হাতী চড়ে না।
৬৩৪। খোড়া মুর্গীর বদলে ছাগল বলিদান।
৬৩৫। গলাটী ছুঁচের মত, পেটটা থল্যের প্রায়।
৬৩৬। গাছটীর ছায়া জল, কিন্তু কাঠপিপড়ার দৌরাত্ম বড়।
৬৩৭। গাড়ীর উপর না, নায়ের উপর গাড়ী।
৬৩৮। গাধা কি জানে মৃগনাভির গন্ধ ?
৬৩৯। গাধাকে ইক্ষু দিয়ে প্রহার করিলে সে কি তার রসাস্বাদন পায় ?
৬৪০। গাধার কাণে ধরে তুমি শিখাও নানা কথা। হোঁক্কা হোঁক্কা রব তার না হবে অন্যথা॥
৬৪১। গির্‌গিট খোঁজে জঙ্গল, ভেক খোঁজে জল।
৬৪২। গুড় গুড়ে পাখী আকাশে উঠিলেও চিল হয় না।
৬৪৩। গুবুরো পোকাকে সিংহাসনে বসাইলেও গোবর গাদী খুঁজিবে।
৬৪৪। গোঁফ রাখ্‌তেও ইচ্ছা, ঝোল খেতেও ইচ্ছা।
৬৪৫। গোবর গাদা উচ্চ হলেই কি ? রাজ বাটী নীচ হলেই কি ?
৬৪৬। গোরু কালো বল্যে কি দুধও কালো হবে ?
৬৪৭। ঘর্ষণে চন্দনের গন্ধ ক্ষয় পায় না।
৬৪৮। ঘানী চালবার জন্যে কি গাঁ শুদ্ধ লোকের প্রয়োজন।
৬৪৯। ঘেউ ঘেউয়া কুকুর শীকারী হয় না।
৬৫০। ঘোড়া কিনে লাগামের জন্য ঝগড়া কেন ?
৬৫১। ঘোড়ার স্বভাব জেনেই ঈশ্বর শিং দেন নাই।
৬৫২। চক্ষু কানা বলিয়া কি নিদ্রার ব্যাঘাত হয় ?
৬৫৩। চক্ষুতে তেল লাগিলেই জ্বলে, জ্বলে নাকো গলে।
৬৫৪। চাঁদ দেখে কুকুর চেঁচালে, চাঁদের তাতে কি ক্ষতি ?
৬৫৫। চাউল ছড়ালে কুড়ান যায়। জল ছড়ালে কুড়ান দায়॥
৬৫৬। চারি শের বিষের কি দরকার ?
৬৫৭। চিনী কথাটি মাত্র চাকিলে মিষ্ট লাগে না।
৬৫৮। চুল চলে না যথা। এমন বন্ধুত্বে ঋণ, করিল অন্যথা॥
৬৫৯। চুল পুড়িয়ে আংরা হয় না।
৬৬০। চোর আর মালী একাত্মা।
৬৬১। ছুরীর ধার আছে কি না ? তা কি খাপ কেট্যে পরখ্ কর্ত্যে হবে ?
৬৬২। ছুঁচ, সোণার হলেই বা কি ?
৬৬৩। ছোট লোকে বড় লোক হল্যে, রাত্রিকালে, ছাতি ধরায়।
৬৬৪। জলের গহেরা মাপা যায়। মনের গহেরা মাপা দায়।
৬৬৫। জাঁতার বল, না পেষকের বল ?

৬৬৬। ঝাঁটার পেটে রেসমের থোপ্।
৬৬৭। ঝড়ের মুখে শুক্‌না পাতা।
৬৬৮। ঝুড়ীটা ছেঁড়া, কিন্তু ধারিটা পোক্ত।
৬৬৯। ঝোল রান্ধিবার জন্যে কি মুর্‌গীর অনুমতি চাই?
৬৭০। ঢিল্‌টী পাইলে কুকুরটী নাই। কুকুরটী পাইলে ঢিল্‌টী নাই।
৬৭১। তাঁর বিড়ালের মত ধাঁচা, কিন্তু বাঘের মত লাফ্।
৬৭২। পেঁচার ন্যায় তাকানী।
৬৭৩। তালের কোঁড় হাতে ভাঙ্গা গেলে মূষল মুদ্গরের প্রয়োজন কি?
৬৭৪। তিনি পা দিয়ে যাহা বাঁধেন, তাহা হাত দিয়ে কেউ খুলতে পারে না।
৬৭৫। তীরের উপর যত রাগ, তীরন্দাজে নাই।
৬৭৬। তুলা আর আগুণ কি একত্রে সাজান যায়।
৬৭৭। থুথু খেয়ে পিপাসার শান্তি হয় না।
৬৭৮। দর্পণের ভিতর এক মোট টাকা দেখার ন্যায়।
৬৭৯। দিনের মধ্যে তিনবার নাইলেও কাক কখন বক হবে না।
৬৮০। দুঃখার্ত্তের অশ্রু তীক্ষ্ণ অসি।
৬৮১। দুধও শাদা, ঘোলও শাদা।
৬৮২। দুধ্ কি আবার গোরুর পালানে ফিরে যেতে পারে?
৬৮৩। দুষ্ট লোকের ঘরেও চাঁদের আলো পড়ে।
৬৮৪। ধীর জলে পাষাণ বিন্ধে।
৬৮৫। ধোবা জানে গ্রামে মধ্যে দুঃখী কোন্ নর। স্বর্ণকার জানে কেবা ধনের ঈশ্বর।
৬৮৬। নাকের লোম ছিঁড়িলে কি কখন শরীরেব ভার লাঘব হয়।
৬৮৭। নিকামান্তে নাপিত বিড়াল ধরিয়া কামায়।
৬৮৮। নির্ব্বোধ আর কুমীর আপনার মুট ছাড়ে না।
৬৮৯। নিষ্কার্ম্মা চাষার ৫৮ খানা কাস্ত্যা।
৬৯০। নেংটে মারিবার সময় কি জয় ঢাক বাজাতে হবে।
৬৯১ নেংটের দৌরাত্ম্য ঘরে আগুণ দিবার ন্যায়।
৬৯২। পরিবারের মধ্যে কজ্জ, আর হাতের তেলতে পাঁচড়া, এ দুই সমান।
৬৯৩। পরের তরে রুইতে এস্যে সীমানার তক্‌রার কেন?
৬৯৪। পর্ব্বত চাঁদমারী হল্যে কাণাও লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে।
৬৯৫। পর্ব্বতের প্রতি যদি কুকুর ফুকুরে। পর্ব্বতের ক্ষতি, না কি, ক্ষতিটী কুকুরে?
৬৯৬। পাতরের ছাল ছাড়ান।
৬৯৭। পাপীসহ বন্ধু তায় সার হয় শোচা। কুপথ ভ্রমণে যথা পায়ে লাগে খোঁচা।
৬৯৮। পায়ে যদি ছোট একটী কাঁটা ফোটে, তবে তাহাকেও বাহির করা উচিত।
৬৯৯। পিঁপড়ে আপন হাতের চারি হাত লম্বা।
৭০০। পিতল ঘষ আর মাছ, তার গন্ধ যায় না।
৭০১। পিপাসায় কাতর হল্যো, দূরস্থ জলে ফল কি?

৭০২। পুকুর গাবিয়ে চিলকে মাছ খাওয়ান।
৭০৩। পুকুর না কাটতেই কুমীরের বাস।
৭০৪। পুষ্ পুষ্, করিয়া ডাকিলে কি বিড়ালে আবার গোলামী কর্ত্তে আসবে।
৭০৫। পোষা ময়নার দ্বারা বিড়ালের নিকট খবর পাঠান।
৭০৬। ফুঁ পাড়িয়া রসায়ণ শিখ, অভ্যাস দ্বারা শাস্ত্র শিখ।
৭০৭। ফেণ খেয়ে গোলাব জলে আঁচান।
৭০৮। বক জানে না কুঁকড়ার ছা ধর্ত্তে।
৭০৯। বাঘের ঔরসে জন্মিয়া কি থাবা ছাড়া হয়?
৭১০। বাঘের হামাগুড়ী লাফ দিবার উপক্রম।
৭১১। বাজনা বাজিয়ে ধান ভানিলেও তুষ ছাড়া হয় না।
৭১২। বানরের হাতে ফুলের মালা।
৭১৩। বাপের খোদা কূপ বল্যে কি তাতে ঝাঁপ দিতে হবে?
৭১৪। বালিশ বদলালেই কি মাথা ব্যথার লাঘব হয়?
৭১৫। বিড়ালের খেলায় নেংটের মৃত্যু।
৭১৬। বিষ্যাতরু বাড়াইতে সেঁচ চক্ষুর্জল।
৭১৭। বুড়ী নিকটে গেলেই পাঁচিল পড়ে।
৭১৮। বেণে, নদী শুদ্ধ জল করিল সেচন। একটী মরিচ পুনঃ প্রাপণ কারণ॥
৭১৯। বেদিয়ার পান্না পাওয়ার ন্যায় হস্তান্তর হইল।
৭২০। বৈদ্য ঔষধ দিয়ে ফিরিতেছেন, ওদিকে ঘরে ঘায়ের পোকায় তাঁর স্ত্রী মরিল।
৭২১। ব্যাং মুখের হা বাড়াইয়া মরিল।
৭২২। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু গুঁড়ুলী থামে নাই।
৭২৩। ভাত খাইয়ে গলা-কাটা।
৭২৪। ভাত ছড়ালে হাজার কাক আসে;
৭২৫। ভীরুর নিকট আকাশ, রাক্ষসে পূর্ণ।
৭২৬। ভূষী খেকো মানুষকে তূরী বাজাইতে বলা।
৭২৭। ভেড়া ভিজিতেছে বল্যে বাঘের আছাড়ি বিছাড়ী কান্না।
৭২৮। ভোজনের বেলায় আগে বসে। লড়ায়ের বেলায় সবার শেষে॥
৭২৯। মগ ডালের ফুল দেবতার দান।
৭৩০। মড়ার হাতে তাম্বুল দান।
৭৩১। মধু থাকলেই মৌমাছী তাকে খুঁজে বাহির কর্ব্বে।
৭৩২। মন্দিরের বিড়াল বল্যে ঠাকুর পূজা করে না।
৭৩৩। মহা প্রলয় পর্য্যন্ত বর্ষিলেও খাপরায় কখন ধান জন্মিবে না।
৭৩৪। মহিষী প্রসব না হত্যে ঘীয়ের দর প্রচার।
৭৩৫। মাথায় উঠিলে জল কিবা প্রয়োজন। আধ হাত এক হাত করা নিরূপণ॥
৭৩৬। মানুষ পঞ্চাশ হাত দূরে গেলেও পাপ কখন ছাড়ে না।
৭৩৭। মার্, ধর্, কর্য্যে ঘোড়া আর ছাতা দান।
৭৩৮। মালাধারী বিড়াল ধর্ম্মোপদেশ দাতা।

১৩৯। মাসুল আর ফেন, ক্রমে ঘন হয়।
১৪০। মুখ টক্ না আঁব টক।
১৪১। মুখ বিশ্রী হল্যে দর্পণের দোষ কি।
১৪২। মুর্গীর আণ্ডার লোমোৎপাটন।
১৪৩। মোকদ্দমায় এক পক্ষের নালিস সুতার চেয়ে সোজা।
১৪৪। মোরগ আর কুকুর না ডাকিলে কি প্রভাত হয় না ?
১৪৫। মৃত্যু পরে বল কেবা করয়ে সন্ধান।
পৃথিবী উল্‌টেছে কিম্বা রয়েছে সমান॥
১৪৭। যখন হাতী পর্য্যন্ত দান, তখন অঙ্গনাটা লয়্যে ঝগড়া কেন ?
১৪৮। যাহার জড়তা অতি না চলে চরণ। পাঁচ ক্রোশ দূর তার ঘরের প্রাঙ্গণ॥
১৪৯। যাহার পুরাণ যা আছে, সে অর্দ্ধ চিকিৎসক।
১৫০। যাহার মরণে ভয় নাই, তার নিকট সমুদ্রেও হাঁটু জল।
১৫১। যে খরগোশটা পলায়, সেই খরগোশটা বড় নয় ?
১৫২। যে গাছে কেউ উঠ্‌তে পারে না, তার ফল অসংখ্য।
১৫৩। যে গুরু, চালের উপর উঠে পাখী ধর্ত্ত্যে পারে না, সে আবার বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে
১৫৪। যে জন ছেদন করে সেই তরুবরে। সেই তরু ছায়া দান করে সেই নরে॥
১৫৫। যে দেশে গাধার লোমোৎপাটন হয়, সেই দেশ।
১৫৬। যে দেশে মুসলমান নাই, সেই দেশে কাক নাই।
১৫৭। যে ভাসুক না কেন, চাউল্ হলেই হয়।
১৫৮। যেমন জোরে আঘাত, তেমনি গোলার প্রতিঘাত।
১৫৯। যে মাংস খায় সে উদর পীড়ার ঔষধও জানে।
১৬০। যৌতুক দিবার ভয়ে কাণা-কন্যাকে বিবাহ করা।
১৬১। রাগভরে নাক কাটিলে হাঁসিতে জোড়া যায় না।
১৬২। রাগাল ষাঁড়ের নিকট শ্রুতিরাবৃত্তি।
১৬৩। রাজহাঁসের চাইল্ শিখতে গিয়ে, কাক আপনার চাইল্ পর্য্যন্ত ভুলে যায়।
১৬৪। ল্যাজ্ ছেঁড়া চিলের মত।
১৬৫। শিশিরপাতে কি পুকুর পূরিবে ?
১৬৬। শিশিরের ভরসায় চাষ চষা।
১৬৭। সমুদ্রের মাজখানে পরিত্যাগ।
১৬৮। সর্ষা আর ইক্ষু না পীড়িলে উপকার নাই।
১৬৯। সর্ষ্যার দানা হাজার ছোট হৌক্, ঝাল কম নয়।
১৭০। সমুদ্র অপেক্ষা সহ্য গুণ।
১৭১। সমুদ্র শুকালে মাছ খাব বল্যে বক শুকিয়ে মরিল।
১৭২। সহস্র নক্ষত্র কি চন্দ্রের সমান।
১৭৩। সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।
১৭৪। সাপকে দুদ খাওয়ালেও বিষের লাঘব হয় না।
১৭৫। সাপের দীর্ঘতাই কেবল বিচার্য্য নয়।

৭৭৬। স্বরুতেই যদি সাঁতার জল, তবে পারে যাবে কেমন ?
৭৭৭। সেতুভঙ্গ কারী এই প্রবাহের নীরে। হাজার ডাকই তুমি আসিবে না ফিরে ॥
৭৭৮। স্বর্গগামী লোকের চরকায় প্রয়োজন কি ?
৭৭৯। হাজার টাকা দিলেও কাটাকাণ জোড়া যায় না।
৭৮০। হাজার খান মোহর দিয়ে হাতী কিনে, অঙ্কুশ কিনিবার সময় আঁটাআঁটি।
৭৮১। হাড়ের ভিতর ঘা হোলে আর্শীর প্রয়োজন কি ?
৭৮২। হাতী স্বদেশে, বিড়াল বিদেশে।
৭৮৩। হাবড়ে পড়িলে হাতী কাকে মারে ছোঁ।
৭৮৪। হিঙ্গু যথা দ্রব হয় অপার সাগরে। বাতাস যেরূপ বদ্ধ কলসী ভিতরে ॥
৭৮৫। ক্ষত হেতু বলীবর্দ্ধ হয়েছে অস্থির।
৭৮৬। রক্ত পূষ ভোগীকাক ক্ষুধায় অস্থির।

চীন দেশীয় প্রবাদ

৭৮৭। ইন্দুরের মুখে হাতীর দাঁত বেরয় না।
৭৮৮। এক দেওয়ালে দুই দেওয়ালের কাজ।
৭৮৯। এক ক্ষণের ভ্রম, চিরকালের অনুতাপ।
৭৯০। কথাটী মুখের বাহির হোলে এক অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা ফেরে না।
(মুখের কথা হাতের ঢিল্ ছাড়লে আর ফেরে না।)
৭৯১। কাণা যদি কাণাকে পথ দেখায়, তবে দুজনেই আগুনে পড়িবে।
৭৯২। খাঁটী সোণা হোলে আগুন উস্কুতে হয় না।
৭৯৩। গাছ পড়িবার পূর্ব্বে বানরের চম্পট।
৭৯৪। গাধার উপর চড়্যে আবার সেই গাধার তল্লাস।
(কাকে কাণ নেগেল বলে কাকের পেছু পেছু দৌড়ান।)
৭৯৫। গোরুর নিকট বাদ্য বাজান।
৭৯৬। চাঁদ কিছু সর্ব্বদা গোলাকার নন্, মেঘেরাও ছড়িয়ে পড়ে।
৭৯৭। চিলের সঙ্গে কস্তুরার বিবাদে জেলের মাত্র লাভ।
৭৯৮। ধনুকের নিকট চুল তফাৎ হোলে লক্ষ্যের নিকট আধক্রোশ তফাৎ।
৭৯৯। নদী ঘুলিয়ে দিয়ে ময়লা জল বল্যে নিন্দা করা।
৮০০। পাতরের সহিত আণ্ডার লড়াই। (খাড়ায় কুমড়ায় বিবাদ।)
৮০১। পুকুর ভরাট হয়, কিন্তু বাসনার ভরাট নাই।
৮০২। বনচর তরে আছে বহু বনস্থল। জলচয় মস্তে আছে সু বিস্তর জল।
৮০৩। বাঘ মরিলে চামড়া রেখে যায়। মানুষ মরিলে নাম রেখে যায় ॥
৮০৪। বাঘে হরিণে এক পথে চরে না।
৮০৫। বাতাস না থাকিলে গাছ নড়ে না।
৮০৬। বায়ু আর বৃষ্টির পরিমাণ নাই (অর্থাৎ ভাগ্যের স্থিরতা নাই।)
৮০৭। বুদ্ধিমানের নিকট এক কথাই যথেষ্ট।
ভাল ঘোড়ার গায়ে একবার চাবুক ছোঁয়া-নোই যথেষ্ট।

৮০৮। ভাল লোহাতে পেরেক বানায় না, ভাল মানুষে সিফাই হয় না।

৮০৯। মাগ করিবে মন পরুকে। বাঁদী রাখিবে মুখ দেখে॥

৮১০। মানুষ জানে বর্ত্তমান, ঈশ্বরমাত্র ত্রিকালজ্ঞ।

৮১১। মানুষের মুখ দেখে কিছু বুঝা যায় না। কাঠাতে সিন্ধুর কুল পরিমাণ পায় না॥

৮১২। যে হরিণ মারে, যে খরগোসের প্রতি লক্ষ্য করে না।

৮১৩। রাজবাড়ীর সকল কড়ীকাষ্ঠ এক গাছে জন্মে নাই।

৮১৪। সন্তানেরে শিক্ষা দেহ ভূমিষ্ঠ অন্তরে। বণিতার শিক্ষারম্ভ বিবাহ বাসরে॥

৮১৫। সুন্দর হইলে প্রায় দুঃখে কাল যায়।

৮১৬। সূর্য্যের প্রতি যে চায়, সে হয় কানা।

৮১৭। বজ্রের প্রতি যে কাণ দেয়, সে হয় কালা।

পাঞ্জাবী প্রবাদ

৮১৮। আনাড়ী তাঁতি উঁচু জায়গায় সূতা পাতে।

৮১৯। একটুকখানি আগুন নিতে এসে, এখন বলে আমি ঘরো গিন্নী।

৮২০। কাণা মুর্গীর নিকট পোস্ত দানা ছড়ান।

৮২১। গরবিণী গরবেতে, এই পরেন নাকে নত, এই পারেন কাণে।

৮২২। গোতুরে পাখীর মাথায় টাক, কিন্তু মগ্ ডালেতে বাসা।

৮২৩। ঘরে নাইকো কাপাস সূতা, তাঁতীর সঙ্গে নিত্য কোন্দল।

৮২৪। চাষা যদি ফকীর হয়, তবে পিঁয়াজ তার জপমালা।

৮২৫। চক্ষু হীনের নাম পদ্মলোচন।

৮২৬। জিলাপীর খবরদারীতে চোরা কুত্তীর প্রতি ভার।

৮২৭। তোলার উপর বসে তিন ছটাক খিচুড়ী রান্ধা।

৮২৮। তোমার নাম পর্য্যন্ত জানিনে, অথচ তুমি বল্‌ছ তুমি আমার ভাইপো।

৮২৯। নাচ্‌তে না জেনে নাচ্‌নী বলে উঠন বাঁকা।

৮৩০। পর প্রতিজ্ঞাত ঘোলের লোভে গোঁফ কামান।

৮৩১। বাপ মেরেছিল উকুন বলে। ছেলে বলে আমি ধনুর্দ্ধারী॥

৮৩২। মদগর্ব্বী পিয়ালা পেয়ে জল খেয়ে খেয়ে পেট ফুলান।

৮৩৩। মা কুড়ান বিল ঘুঁটে ইন্ধনের তরে। পুত্র গোথা যারে তারে হীরা দান করে॥

৮৩৪। মা ছিলেন মূলা, বাপ্ পিঁয়াজ। ছেলে সেজেছেন জাফ্‌রাণ।

৮৩৫। স্ত্রীলোক সন্ন্যাস ধর্ম নিলেও তার বাসন কুশন কমেনা।

৮৩৬। হাজার কুকুরে স্থান দেহ শয্যাগারে। অবশ্য যাইবে ক্রোশ খখা চাটিবারে॥

৮৩৭। ক্ষুধার জালায় ঝালা পালা হৈল একেবারে।
মুখে জাক মাগিয়েছে ময়দা পিষিবারে॥

৮৩৮। ক্ষুরের বদলে নূতন নাপিতের চেয়াড়ীতে কামান শিক্ষা।

সর্ব্বিয়া দেশের প্রবাদ

(সর্ব্বিয়া, ইউরোপীয় তুর্ক দেশের অন্তঃপাতী)।

৮৩৯। আপন হোতে ফল পাকিলে গাছ দিওনা নাড়া।

৮৪০। আপন পক্ষে লড়িবার জন্য নির্বোধকে যদি পাঠাও, তবে বস্তে বস্তে কাঁদ।
৮৪১। ঈশ্বরের শ্রীচরণ কৌষেয় কোমল। কিন্তু লৌহময় তাঁর হয় করতল॥
৮৪২। একটি পারা * দিয়ে বুড়ী † কোলা নাচ্‌তে যায়।
দুটি পারা দিয়ে তবে পরিত্রাণ পায়॥
৮৪৩। ঘোড়াকে মার্ত্তে দেখে ব্যাঙ্‌ও পা উঠায়।
৮৪৪। চোখে দেখে বিয়ে করা অপেক্ষা, কাণে শুনে বিয়ে করা ভাল।
৮৪৫। টাক পড়া মাথা কামান সহজ।
৮৪৬। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের জয় নহে, বীর বুদ্ধির জয়।
৮৪৭। নারীর বড় আর্ত্তনাদ। চোরের বল মিথ্যাবাদ॥
৮৪৮। নেকৃড়েকে জিজ্ঞাস কোন্ সময়ে বড় হিম। সে কহিবে সূর্য্যোদয়ের সময়।
(অর্থাৎ সে সময়ে তাহার গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধ্য থাকে না)।
৮৪৯। পথের ধারের গাছ, সহজে কাটা পড়ে।
৮৫০। পিতৃহীনের রোদন, লাঙ্গলের ফাল্‌কেও বিন্ধে।
৮৫১। পেঁচা পিপ্‌ড়েকে গালি দিল, "মর্‌লো মর্ থেব্‌ড়া মুখী॥
৮৫২। বুড় কুকুর ডাকিলে সাবধান হোয়ে দেখ, ব্যাপারটা কি ?
৮৫৩। মধু হওয়া ভাল নহে, সবে চেটো নেবে। গরল হোয়োনা, থুথু করে ফেলে দিবে॥
৮৫৪। মৌমাছির ফুলে ফুলে ভ্রমণবৎ মানুষের জগতে ভ্রমণ।
৮৫৫। যদি দেশ শুদ্ধ তোমাকে মাতাল বলে, তবে নাচারে পড়িয়া গড়াগড়ী দাও॥
৮৫৬। যে ব্যক্তি আগুন পোহাবে, তাকে প্রথমে ধোঁয়া সহিতেও হবে।
৮৫৭। যে হাত কাটিতে না পার, তাকে চুম্বন কর।
৮৫৮। সকল দুঃখের জন্যে মৃত্যুই মলম।
৮৫৯। সত্য কথা কও, কিন্তু এক দৌড়ে পালিয়ে এস।
৮৬০। সাপে খেকো লোকের গিরগিটে ভয়।
৮৬১। সূর্য্য সেতখানার উপর দিয়ে যান বল্যে অপবিত্র হন না।
৮৬২। ক্ষুধার্ত্ত ডাঁশদের আস্‌তে দেওয়ার চেয়ে পেটভরা ডাঁশদের কামড় সহ্য করা ভাল

মহারাষ্ট্রীয় প্রবাদ

৮৬৩। এই সব লোক কভু সুখী নাহি হয়। হিংসামদে মত্ত, মোহ মুগ্ধ অতিশয়॥
অসন্তুষ্ট তথা যার রুষ্ট ভাব অতি। চিন্তাকুল, আর যার পর অন্নে গতি॥
৮৬৪। কুসংসর্গে ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম হয় ক্ষয়। পোড়া কাঠ সঙ্গে তরু পুড়্যে ভস্ম হয়॥
৮৬৫। জ্ঞাতি কুটুম্বের সহ রাখহ প্রণয়। কাষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন হোলে অগ্নি নাহি রয়॥
৮৬৬। প্রান্তরে বৃহৎ বৃক্ষ ভূমিসাৎ বাড়ে। গুল্মলতা আড়ে থেকে কভু নাহি পড়ে॥
৮৬৭। পঞ্চেন্দ্রিয় মধ্যে যেটি নাহি হয় বশ। সেই পথে বাহিরায় জ্ঞান সুধারস॥
যথা মসকের ‡ যেই স্থান যায় চিরে। সেই স্থান দিয়ে জল ধাবিত বাহিরে॥
৮৬৮। রাখালেরা গোরু রাখে পাচটীর বলে। ঈশ্বর শাসন দণ্ডে মানব মণ্ডলে॥
৮৬৯। সাবধানে শুনে আর বুঝে এক ক্ষণে। জ্ঞাণীর লক্ষণ এই কহে বিচক্ষণে॥

* সর্বিয়া দেশীয় পয়সা। † উক্ত দেশীয় নৃত্য বিশেষ, ইহা যুবা লোকের সাধ্য
‡ ভিস্তী ইতি অসংলগ্ন প্রয়োগ

হিন্দী প্রবাদ

৮৭০। আগন্তুকের মার বন্ধ হস্তের বন্ধনে।
নিন্দকের মুখ বন্ধ করিব কেমনে ॥

৮৭১। আধো আধি বিদ্যা শিক্ষা জীবনে মরণ।
অসম্পূর্ণ বিদ্যা বল কোন প্রয়োজন ॥

৮৭২। আপন হাত, জগন্নাথ।

৮৭৩। আপন ব্যয়ে উদর ভরে।
ডোমে কিন্তু রসুই করে ॥

৮৭৪। একশ খানি মুখের কথা চেয়ে।
লেখা কথা একটি হইলেও মানে সকল ভেয়ে ॥
(শতং বদ মা লিখ)

৮৭৫। কাক মারিলে হাড় মাস কিছুই নাই।

৮৭৬। খোঁজার চেয়ে সোজা ভাল।

৮৭৭। চার পেয়ে পলাইল ভিতর চকোরগণে।
তুল ফুড কীর প্রাণ গেল জালের বন্ধনে ॥

৮৭৮। চুগল খোরের শিকড় পাতরের উপর। (অর্থাৎ স্থায়ী নহে)।

৮৭৯। চোরকে বলে চুরি কর্তে, গৃহস্থকে বলে সাবধান হতে।

৮৮০। চোরের শিকড় পাতরের উপর।

৮৮১। ডালপালা হীন গাছে ফল ধরে না কভু।

৮৮২। দুধলী গেয়ের লাথীও ভাল।

৮৮৩। নাপিতের বিবাহে বরযাত্রী মাত্রেই বরকর্ত্তা।

৮৮৪। পাঁচের সঙ্গে সহবাসে আপদ্ বিপদ্ নাই।

৮৮৫। পেট ভরিলে ক্ষীরে মহিষের গন্ধ কয়।

৮৮৬। বামুণের সঙ্গে মড্ডু ইপোড়ার সহ মরণ।

৮৮৭। ভাল খায়; ভাল পর্বা, কার্য্যে কিন্তু কুড়ে।
ঘোল ষাঁড় যেমন হাল বহেনা বেড়ায় খাদ্য ঢুঁড়ে ॥

৮৮৮। ভালুকে মারিল বাপে।
পোড়া কাঠ দেখে পুত্র কাঁপে ॥

৮৮৯। মার ছুরি, লাগে ভাল, না লাগে ভাল।

৮৯০। ষাঁড়্কে ষাঁড়, আর ষাঁড়কে ষাঁড় বলার ফল ?

৮৯১। রাম রাম মুখে, ছুরী রেখে বুকে।

৮৯২। শ্রদ্ধার ছোলা খুঁটাও ভাল, অশ্রদ্ধার আঙ্গুর ধাবাটাও কিছু নয়।

৮৯৩। সেকরার ঠুক ঠাক্, কামারের এক ঘা।

৮৯৪। হাতীর সঙ্গে, ভেরেণ্ডা গাছের লড়াই।

৮৯৫। হাতে জিনিস্ পাঁচীলে সন্ধান।

উৎকল দেশীয় প্রবাদ

পদ্য

৮৯৬। অকর্ম্মা মানুষ যেদিকে যায়। দেব দেবী তথা হৈতে পলায় ॥

৮৯৭। অবোধ রাজার কাছে ব্যর্থ মনোরথ। মাটীর ঘোড়াতে যাওয়া যোজনেক পথ ॥

৮৯৮। অল্প আয়ী, বহুব্যয়ী, হেন মানবের।
খাটো আঁচলের দশা, নাহি দিতে ফের ॥

৮৯৯। অল্প কথায় যে হয় ঠেঁটা।
জায়ারে যাতনা দেয় যে বেটা ॥
কুড়ে গোরু ঘরে ডাগর পেটা।
যম ঘার কেন যাইবে সেটা ॥
নিতি নিতী ঘরে মরণ লেঠা ॥

৯০০। কিছু মাত্র ভেদ নাই নির্ম্মল চিনীর। সমান সুমিষ্ট তার অন্তর বাহির ॥

৯০১। খাল জমি চাস। ক্ষীর খণ্ড গ্রাস ॥
খাটো বার মাস, খাতির যে করে হেন খামিন্দের পাশ ॥

৯০২। গভীর নদীর সমান আশা।
কুম্ভীরাদি বহু জীবের বাসা
প্রবেশ করোনা সে কর্ম্মনাশা ॥

৯০৩। ঘোরতমঃ পরিপূর্ণ—শরীর মন্দির। জ্ঞানদীপ জ্বালি কর তিমির বাহির ॥

৯০৪। ডাব, মুখ খোলা। নির্ব্বোধ গোয়ালা ॥
মিছে কথায় দ্বন্দ্ব। এই তিন মন্দ ॥

৯০৫ দাসী হৈয়ে ব্রত একাদশী উপবাস।
বারি ভার বাহিনীর বান্ধা কেশ পাশ ॥
যে বিহঙ্গ বাসা করে রাজপথ পাশ।
তাদের মঙ্গল নাহি, হয় সর্ব্বনাশ।

৯০৬। দুধ ঘটিলে মা। নদী ঘটিলে না ॥

৯০৭। ধরম সমান সুহৃদ নাই। মরণের সঙ্গী যে হয় ভাই ॥
"একএব সুহৃদ্ধর্ম্ম নিধনেইপ্যনুযাতি চ।"

৯০৮। পাঁচে যারে ভাল নাহি বলিল কখন। বিফল জীবন তার উচিত মরণ ॥

৯০৯। প্রথমে প্রণয় বড়, সীমা নাহি তার। পরিশেষে এক লেশ প্রাপ্ত হওয়া ভার ॥

৯১০। প্রদীপ নির্বাণ হইলে পরে। তৈল দান কর কিসের তরে ॥
"নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈল দানং"

৯১১। প্রবল নদীর বেগ, এক ভাব ধরে। তৃণ তরু উভয়েই উন্মূলন করে ॥

৯১২। পীরিতের সীমা মোর বল দিবে কেবা।
যে পা ধরে তার, পদ পদ্মাকার করয়ে বিহার।
তারে শত্রুজ্ঞানে আমি দান করি সেবা ॥

৯১৩। বিশ্বাস ঘাতক যেই হয় দুরাচার তার চেয়ে পাপী কেবা সংসারেতে আর ॥

৯১৪। বুঝি, লো নন্দিনি তুই হইলি পাগল। কাঠের ঘোড়ায় কভু নাহি পিয়ে জল ॥
৯১৫। ভগবৎ ইচ্ছা ডেরি গাভীনির চয়। যে দিগেতে টানে সেই দিগে যেতে হয়॥
৯১৬। মন যদি আছে, তবে মালা জপ ভাই। মালা জপ কেন মিছে মন যদি নাই॥
৯১৭। মনেরে পাথর করিবে যেই। পীরিতি পথের পথিক সেই॥
৯১৮। মানস মাতাল মাতঙ্গ প্রায়। সতত বন্ধনে রাখিবে তায়॥
৯১৯। যাহা নাহি দেখিয়াছ আপন নয়নে। গুরু বাক্য হইলেও মেনোনাকো মনে॥
৯২০। যাহার হয়েছে হত সকল আশ্বাস। সেই করে অপরের আশ্বাস বিনাশ॥
৯২১। যাহার মানস সদা চপল। বিফল তাহার ক্রিয়া সকল॥
৯২২। যেই ঘরে আলো করে মনির মণ্ডল। কি করিবে তথা বল প্রদীপ সকল॥
৯২৩। যেই জন তোরে, কুকথা কঠোরে। জালাতন করে, তাহার সনে।
দ্বন্দ্ব নাহি কর, গঞ্জিবে অপর, শুন শ্রবণে, দেখ নয়নে॥
৯২৪। রজক না থাকে যদি গ্রামের ভিতরে। উলঙ্গের তাতে কিছু ক্ষতি নাহি করে॥
৯২৫। রমণীর বিমোহন, ঘর বর সুশোভন। ঘরে কিছু থাক্ আর নাহি থাক্ ধন॥
৯২৬। শঠতা কাহারু প্রতি যেবা নাহি করে। সে জন দেবতা এই সংসার ভিতরে॥
৯২৭। যাইট, কাঞ্চন ব্যয় মিছে কাব্য প্রতি। এক কড়া নাহি মাত্র হরি পদে রতি॥
৯২৮। সব দিন নাহি রয় নবীন যুবতা। সব নিশা নহে কভু, পুর্ণচন্দ্রবতী॥
৯২৯। সমুদ্র বন্ধন আর স্ববংশ নিধন। বেঁচেছিনু তাই সব করিনু দর্শন॥ *
৯৩০। সলিলের রেখা আর হরিদ্রার রঙ্গ। তৃনের অনল আর গোলামের সঙ্গ॥
৯৩১। সহচরি মিছে তুমি কেন কর মান। পর কভু নিজ নহে, নিজ নহে আন॥
৯৩২। সাধুর হৃদয় নবনী নব। অপরেব তাপে যে হয় দ্রব॥
৯৩৩। সাপে দংশিয়াছে নন্দনে যার। কূপের দড়িতে আতঙ্ক তার॥
৯৩৪। স্ত্রী পুরুষে কভু নাই সাক্ষাৎ দুজনে। হরিদ্রা এঁটার ধুম ষষ্ঠীর পূজনে।
৯৩৫। হা বিধাতা! এমন কি কখন সম্ভবে। মধুরস দিয়ে, নিজ ঘর ষিয়ে,
নিম্ব কি মধুর হবে॥
৯৩৬। ক্ষুদে পাক্ সমরেতে সকলের পাছে। ফিরিবার কালে সকলের আগে আছে॥
৯৩৭। চরণেতে নাই মাত্র ভূষণ চমক।
চেয়ে দেখ চলনের কতই ঠমক॥
পিতুলে বেসর নাকে নাড়ে অবিরত।
হইলে সোনার পথ নাচাইত কত॥
৯৩৮। বিয়ের বেলা বেগুন আজ্ঞান।
৯৩৯। সানায়ে ফুঁপাড়্তে ঠাকুরের বার উৎরে গেল।
৯৪০। কাণা সিউণী ধরিলে তিন মন কর্মী।
৯৪১। বড় বিয়ে তার দুইপায়ে আল্তা।
৯৪২। শীকারের সময় কুকুর বাহ্যে বসিল।
৯৪৩। গোরুর পীরিত চেট্যে। মানুষের পীরিত সেঁটে

* নিকষার উক্তি।

৯৪৪। শুড়ের ঘরে ডেয়ে কর্ত্তা।
৯৪৫। দস্ত নগর ভাঙ্গিলে চিন্তা কামার রাজমিস্ত্রী।
৯৪৬। সম্পত্তি রূপ চক্ষুর ছানি, বিপত্তি অঞ্জনে নষ্ট হয়।
৯৪৭। পাগড়ী বান্‌তে কাছারি বরখাস্ত।
৯৪৮। ভেরেণ্ডার রুই আর ভেরেণ্ডার ধারা। তার জন্যে এত কেন কথা বার্ত্তা বাড়া॥
৯৪৯। অন্যায় রাজপুরে বিচালীর বড় মুখ্য * মন্ত্রী।
৯৫০। ঘর করেছে দুয়ার নাই
৯৫১। এর চেয়ে চমৎকার কিবা আছে কথা। পতি না দেখিয়ে হৈল প্রসবের ব্যথা।
৯৫২। অন্ধের হস্তে দীপ দানে দেখিবে কি সেই।
৯৫৩। শুক্‌না নদীতে নৌকার প্রয়োজন কি? ।
৯৫৪। নদী বাড়িলে ঠাকুরের দিব্য। (অর্থাৎ দিব্য দানে কোন ফল নাই)
৯৫৫। ষাইট দেঁড়ো নৌকাতে জলন্দড়ো মাঝী ।
৯৫৬। সোনার খাম্বা ঘরে নিসিন্দার বেড়া।
৯৫৭। পোড়ে ঘর পুড়ুক্। ইন্দুর মাত্র মরুক্॥
৯৫৮। ষাঁড়ের কেন মাছের চিন্তা।
৯৫৯। কোমর আহুড়ের মাথায় পাগ্‌ড়ী।
৯৬০। চল্‌তে না জানে পথের দোষ।
(নাচ্‌তে জানে না বামন ডেকরা। উঠনকে বলে হেটা টেঙ্গরা॥)
৯৬১। ভাগ্যের সন্ধান না নিয়ে কাকের প্রতি প্রহার।
৯৬২। ঔষধ না খেয়ে খলে কামড়।
৯৬৩। ময়ুরের নৃত্য কালে পেচা হয় রাজা।
৯৬৪। না রুইলেই মাথায় চাল বাজে।
৯৬৫। গেয়ের প্রসব দেখে বলদ অস্থির।
৯৬৬। বস্তু হীন সেকর্‌ার আর কার্য্য কিবা। নিক্তি ঘুরাইয়া সেই গর্ত্ত করে দিবা॥
৯৬৭। পর ঘরে মঙ্গল বার।
৯৬৮। গাঁয়ের মেয়ে শিক্‌নী নাকী।
৯৬৯। দূরস্থ পর্ব্বত সুন্দর। দূরস্থ বন্ধু সুন্দর॥
৯৭০। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।
৯৭১। নাখেয়ে আঁচানের ধুম।
৯৭২। ওলো গোদী গোদের পানে চেয়ে কথা ক।
৯৭৩। ঘর পোড়ার জিনিস্ যা পাও তাই ভাল। "শত্রুঞ্চ গৃহমাগতং।"
৯৭৪। কানাগেয়ের ভিন্ন গোঠ।
৯৭৫। মেণী বিড়াল আশুলার উপর বীর।
৯৭৬। বাউরী পাড়ায় খটাস মহাবল।
৯৭৭। ছুলো বিড়াল ভোন্দড়ের প্রতি যোদ্ধা।

* বুদ্ধি বাহির না হয়, সে জন্যে বিচালীর ভড়হ মুখে?।

রুসীয় প্রবাদ।

১। অঙ্গুরীর শেষ সীমা নাই।
২। অতিথি আহ্বান করিতে জানিলে হয় না, অতিথির অভ্যর্থনা জান।
৩। অন্ধ দেখিতে পায় না। কাঙ্গাল * দেখিতে চায় না॥
৪। অন্ন আর লবণ ডাকাতকে ও নরম করে।
৫। অন্ন কখন জঠরকে অন্বেষণ করে না।
৬। অন্যের ধনে ঋণ শোধ সহজ কর্ম্ম।
৭। অলঙ্কারের অভাবই নারীর-কুমতির অভাব।
৮। আকাশের শিশির অপেক্ষা মুখের শিশিরে † অধিক শস্য জন্মে।
৯। আগে আজ্ঞা ধর, পিছে তর্ক কর।
১০। আপন ভেয়ের কাছে প্রশংসা মানা।
আপন ঘরের ধোঁয়ায় চক্ষু কানা॥ "গেঁয়ে যোগী ভিক্ পায় না।"
১১। আপনি মাতাল, চাকরেরা মাতাল নয় বলিয়া, তাদের প্রতি প্রহার।
১২। ঈশ্বর সত্বর না হউন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য অনিবার্য্য।
১৩। ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা কর, কিন্তু নৌকা তীরে লইতে দাঁড়ে জোর দেও।
১৪। ঈশ্বরের সহিত সমুদ্রে যাও, ঈশ্বরের অভাবে ঘরের বাহির হইও না।
১৫। উট্‌কা কুকুর ভিন্‌গাঁয়ে তিষ্ঠিতে পারে না।
১৬। এক গর্ত্তে দুই ভালুকের জায়গা হয় না।
১৭। এক গোঁজের উপর সকল জিনিস টাঙ্গানো যায় না।
১৮। একবার একজন গল্প ধরিলে সকলেই তান ধরে।
১৯। একবার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিলে তোমার আর বৃষ্টিতে ভয় কি?
২০। এক বুদ্ধি ভাল, কিন্তু দুই বুদ্ধি আর ও ভাল।
২১। একশ বৎসর আয়ু হইলেও সর্ব্বদা শিক্ষা করিতে হয়।
২২। এক সময়ে দুই বার বসন্ত হয় না।
২৩। একস্ত্রীতে এক হাট, দুইস্ত্রীতে একটি বাজার।
২৪। এক হাতে গেরো দিতে পারা যায় না। 'এক হাতে তালী বাজে না।'
২৫। এলো আটি, খড় বৈ আর কি?
২৬। ঐশ্বর্য্যের তৃণ শান্তির মাঠে বৃদ্ধি পায়।
২৭। কখন বাছুরেরাও নেকড়ে ধরে।
২৮। কথা চড়ুই পাখি নয়, উড়ে গেল আর ধরা যায় না।
২৯। কথায় কায নাই, কার্য্যমাত্র চাই।
৩০। কন্যা রত্ন বটে, কিন্তু যার কন্যা তার নয়।
৩১। কর্ণ ললাট হইতে উচ্চ হয় না।
৩২। কলমের লেখা কুড়ালিতেও কাটা যায় না।
৩৩। কাকদের আশ্রয় আকাশ, পৃথিবী নয়।
৩৪। কাঙ্গালের অহঙ্কার গাই গরুর পুতুল খেলা।

---

* কাঙ্গল বা দাম্ভিক।
† মর্ম্ম।

৩৫। কালো দেখে ভাল বাস, গোরা হোলেতো সকলেই ভাল বাসে।

৩৬। কাণা কুকুরছানাও আপন মায়ের দিগে যায়।

৩৭। কুঁজো কেবল কফনে * সোজা।

৩৮। কুকুর ডাকছ কেন? নেকড়ের ত্রাস জন্মাইতে।
কুকুর লেজ গুড়চ্ছ কেন? নেকড়ের ভয়ে।

৩৯। কুকুরের ডাক পবনে বয়। (অর্থাৎ ব্যর্থ ডাকাডাকি)

৪০। কুকুরের লেজ কেটে দিলে, সে কখন ছাগল হয় না।

৪১। কুড়িয়ে নিতে রত্নচয়, সকলেই নত হয়।

৪২। কৃষক অভাবে পৃথিবী পিতৃহীন।

৪৩। খেঁকশিয়াল অপনার লেজের গর্ব্বে গর্ব্বিত।

৪৪। খেঁক্‌শিয়াল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুর্গী গণনা করে।

৪৫। গাছকে যতই কম নুইয়ে ধর না, সে খাড়া হবেই হবে।

৪৬। গাছটী ভাল কি মন্দ তাহা জানিয়া তাহার ছায়াতে বসিও।

৪৭। গির্জাঘরে যাবনাকো পথে বড় কাদা। শুঁড়ীর বাড়ী চল যাই, পথ সিধাশাদা॥

৪৮। গোরু ঘোড়া আদি সব বেচিয়া ভাতার। কিনিলেন মহিলার মুকুতার হার॥

৪৯। গোরুর জিব লম্বা বটে, কিন্তু কথা কহিতে অশক্ত।

৫০। গৃহস্থ নির্বোধ হলে গৃহে লক্ষ্মী নাই। গৃহিণী নির্বোধ হলে পুড়ে হয় ছাই॥

৫১। ঘোড়া যতই দৌড়ুক্ লেজ ছাড়িয়া যাবে না।

৫২। ঘোড়ার কাছে শূওর এসে বলে, তোর পা বাঁকা, তোর লোম অসার।

৫৩। চক্ষের জল ব্যতীত, স্ত্রীলোকের বল খাটে না।

৫৪। চাবুক অপেক্ষা ঘোড়া চালান ভাল।

৫৫। ছোট চাবিতে বড় তালা খোলে না।

৫৬। জাত মানুষ মাত্রেরই আহারের ব্যবস্থা আছে।
"জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।"

৫৭। জনক জননীর আশীর্ব্বাদ জলে ডোবে না আগুণেও পোড়ে না।

৫৮। জননী উচান হাত, সুধীরে প্রহার। বিমাতা না তুলে হাত. কিন্তু শক্ত মার্॥

৫৯। জমিদার হংসের মত, তাহার হৃৎপিণ্ড ছোট যকৃৎ বড়।
অর্থাৎ দয়াহীন অথচ হঠাৎ ক্রোধাচ্ছন্ন।

৬০। জমীদারের দয়া সদর দরজা পর্য্যন্ত।

৬১। ঠাট্টা করিবার পূর্ব্বে পশ্চাতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

৬২। তাঁর ভাবনা পর্ব্বতের ওপাশে, তাঁর স্কন্ধের পশ্চাতে মৃত্যু। "শিয়রে শমন।"

৬৩। তাঁর কথা জলে লিখিয়া রাখ।

৬৪। তোমার লাঙ্গলের ফলা অপেক্ষা, বিচার পতির দণ্ড গুরুতর।

৬৫। দলশুদ্ধ ফাঁসীগেলেও সুখের বিষয়।

৬৬। দশবার মাপিবার পর একবার কাট।

৬৭। দাঙ্গাতে কেবল ধনী, মস্তক সামালে। দুঃখী নিজ বস্ত্রখানি সামালে সে কালে॥

৬৮। দানে প্রাপ্ত বস্ত্র লয়ে, উলঙ্গ কাঙ্গাল বলে—"ছি এত মোটা—',

---

* শব রক্ষণার্থ সিন্ধুক।

৬৯। দিনেক মদ্য পান করে, ফক সপ্তা মাথা ধরে।
৭০। দুই জল বিন্দুর ন্যায়, তাহারা একাকার।
৭১। দুটা খরগোশ শীকার করিলে, একটাও কিন্তু ধরা হয় না।
৭২। দুধের ছেলেরা ঈশ্বরকে জানে না, কিন্তু তারা ঈশ্বরের স্নেহভাজন।
৭৩। দুহিতারে সুন্দরী ভাবেন শুধু মাতা। পুত্রে জ্ঞানবান্ ভাবে যেই জন্মদাতা॥
৭৪। ধরা চায় চাষ, ঘোড়া ইচ্ছা করে দানা। রমণীর ইচ্ছা শুধু বেশভূষা নানা॥
৭৫। নারীদের এক সপ্তায় সাত শুক্রবার।
৭৬। নারীর আবদার যে মিটুবে, সে পুরুষ এখনও জন্মে নাই।
৭৭। নারীর বাক্য শিরীষের আটা।
৭৮। নারী হীন নর, জলহীন হংস।
৭৯। না সোঁকা সুঁকী কোরে কুকুরও কুকুরের কাছে এগোয় না।
(অর্থাৎ পরিচয় না পাইয়া আগন্তুকের আলাপ অকর্ত্তব্য।)
৮০। নিজ নারী নহে কভু' জুতার মতন *। বার বার আকর্ষণ আর বিসর্জ্জন।
৮১। নির্বোধের প্রতি যদি দৌত্যভার দাও। তবে তার পশ্চাতে পশ্চাতে তুমি যাও।
৮২। নেকৃড়িয়ার নিকট নিমন্ত্রণ পেয়ে ছাগল অনাগত।
৮৩। নেকেড়েকে যত পার খাওয়াও সে বনের দিকেই চাবে।
৮৪। নেকৃড়েদের মধ্যে মিল থাকিলে, কুকুরের লোপাপত্তি।
৮৫। নেকৃড়েদের সঙ্গে থাকিতে হইলে, নেকৃড়ের মত চীৎকার কর।
৮৬। নেকৃড়ের জন্ম নিয়ে খেঁক্‌শিয়াল হয়?।
৮৭। নেকৃড়ের হাত থেকে পালিয়ে ভালুকের থাবায় পড়িল।
৮৮। পড়িবার পূর্ব্বে যদি কোন্ স্থানে পড়িবে তাহা জানিতে পার,
তবে সেইখানে বিচালী বিছাইয়া রাখ।
৮৯। পতি হন প্রেয়সীর পিতার মতন। নারী হন নরশিরে কিরীট রতন॥
৯০। পত্নী কাটেন কাট্‌না, পতির দেখ নাচ্‌না।
৯১। পরমান্ন থাকে যদি রন্ধনের শালে। বন্ধুর অভাব নাই ভোজনের কালে॥
৯২। পরের ধনে ঋণ পরিশোধ সহজ কর্ম্ম। "পরের ভাতে বেগুণ পোড়া"
৯৩। পরের পীঠে বোচ্‌কা হাল্‌কা বোধ হয়।
৯৪। উনান ঠেঙ্গালে সেই হইবে গরম। নারী ঠেঙ্গাইলে পরে হয়ত নরম॥
৯৫। পাগল গাছ রোপণ করিতে হয় না, তা আপনা হোতেই জন্মে।
৯৬। পাত্তরের প্রতি তীর ছোড়াতে তীরটাই নষ্ট।
৯৭। পার হোয়ে গেল বন॥ না মিলিল ইন্ধন॥
৯৮। পিতলের কড়ায়ের সঙ্গে মাটীর হাঁড়ার বিবাদে কি সাধ্য?
৯৯। পীরিত' আগুন আর কাশ। কভু না রয় অপ্রকাশ॥
১০০। পুত্র জন্ম দিতে জানিলে হয় না, শিক্ষা দিতে জান।
১০১। পুত্র লাভে আনন্দিত হয় ধনী জন। গাভী প্রসবিলে সুখী দরিদ্রের মন॥
১০২। পুরাতন বন্ধু খোঁজ, কিন্তু নূতন বাটী চাই।

* নিজাঙ্গনা নহে কভু নৌকার মতন

১০৩। প্রকাণ্ড গর্দ্দভ হোলেও কখন হাতী হবে না।

১০৪। প্রথম পাত্র মদ্য আরামের জন্য। দ্বিতীয় পাত্র আহ্লাদের জন্য। তৃতীয় পাত্র ঝকড়ার জন্য।

১০৫। প্রথম যৌবন ছায়ার মত। ধর্ত্তেগেলে পলায়, চল্যে গেলে পিছে ধায়।

১০৬। প্রদোষ অপেক্ষা প্রভাত পরিস্কার। (অর্থাৎ শেষাবস্থা অপেক্ষা প্রথমাবস্থায় সকলই উৎকৃষ্ট।)

১০৭। প্রসব বেদনা, বড়ই যাতনা, কিন্তু শীঘ্র বিস্মৃত হয়।

১০৮। ফড়িঙ্ যেন আপন ঘাসের পাতাতেই থাকে।

১০৯। বড় জাহাজের জন্য অনেক জল চাই।

১১০। বড় মানুষের চোক্ রাঙ্গানিতে ভয় করিও না, গরিবের চোখের জলে ভয় কর।

১১১। বড়মানুষের মোসাহেব, তণ্ডুলের তূঁষ।

১১২। বড় লোক বড় লোক জানে। চাষার খবর চাষার স্থানে ॥

১১৩। বৎসর বৎসর নেক্ড়ে লোম ছাড়িলে কি হবে, কিন্তু সে, যে নেক্ড়ে, সেই নেক্ড়ে।

১১৪। বৎসরের দিন সংখ্যা অপেক্ষা জমীদারের খেয়াল সংখ্যা অধিক।

১১৫। বাটী ক্রয় করা অপেক্ষা পড়সী ক্রয় করা ভাল।

১১৬। বাড়ী কিছু কর্ত্তার অলঙ্কার নয়, কর্ত্তাই বাড়ীর অলঙ্কার।

১১৭। বাপে যদি টক্ খায়। ছেলের দাঁত টক্যে যায় ॥

১১৮। বিচারপতি ঘুষ নিলেই মোকদ্দমা ফয়সল।

১১৯। বিদেশে, স্বদেশের একটি কাক দেখলেও সুখের পরিসীমা থাকে না।

১২০। বিধবার আশ্রয় ঈশ্বর, মনুষ্য নহে। "নিরাখালের খোদাই রাখাল"

১২১। বিধবার গৃহাচ্ছাদন জন্য যে একখানা চেলা কাঠ ফেলিয়া দেয় তাহার প্রতি পরমেশ্বর প্রসন্ন।

১২২। বিবাহের তিন দিন পরে জাঁক করিও না, তিন বৎসরের পর করিও।

১২৩। বিভক্ত রাজ্যের শীঘ্র বিনাশ।

১২৪। ভণ্ডের বন্ধুত্বে বিশ্বাস নাই।

১২৫। ভরা পেট উপদেশে বধির।

১২৬। ভাই বিনা থাকতে পারি। পড়সী বিনা থাক্‌তে নারি ॥

১২৭। ভার্য্যার ধন যেন ভর্ত্তার গলার লাঠী। (অর্থাৎ বাহির করিতে পারিলেই বাঁচেন)

১২৮। ভাল কুকুরের গায়েও এঁটুলী আছে।

১২৯। ভাল ভূমি করি বারি বারেক গ্রহণ। নয় বর্ষাবধি তাহা করয়ে স্মরণ ॥

১৩০। ভালুক কখন গোরুর সহোদর নয়।

১৩১। ভালুক নাচতে চায় না, কিন্তু সকলেই তার নাকে দড়ী দিয়ে টানে।

১৩২। ভালুক শিকারী, শিকারের সময় ঘুমোয় না।

১৩৩। ভালুকের সঙ্গে সেঙ্গাৎ পাতাও, কিন্তু টাঙ্গি হাতে রাখ। "নবিশ্বসেদবিশ্বস্তং"

১৩৪। ভোজনার্থে চাষারে করহ নিমন্ত্রণ। ভোজনের পাত্রে সেই রাখিবে চরণ ॥

১৩৫। মদ না খেলে তুমি সত্য কথা কও না।

১৩৬। মরিচায় যেইরূপ লৌহ ক্ষয় হয়। সেইরূপ শোকভরে হৃদয়ের ক্ষয় ॥

১৩৭। মরিবার জন্য প্রস্তুত হও, কিন্তু চাষে হেলা না হয়।
১৩৮। মহাজনের দরজা দিয়ে ঢুকিবার সময় চৌড়া, বাহির হবার সময় বড় কশা।
১৩৯। মাঘ্যী কিন্তু সাঁচা, সস্তা কিন্তু পচা। "সস্তার তিন অবস্থা"
১৪০। মাছ মাঘ্যী হোলে কাকড়ারা ও মাছ। "আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ"
১৪১। মাছেরা মাথা থেকে পচে। (অর্থাৎ বড় লোক হইতেই কদাচার নীচগামী হয়।)
১৪২। মাছিতে মাছি কামড়ায় না।
"কাকের মাংস কাকে খায় না। জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না।"
১৪৩। মাতার চক্ষে জল বহে স্রোতস্বতী।
ভার্য্যা অশ্রু শৈবলিনী * শুষ্ক শীঘ্রগতি। নবোঢ়া নয়নে অশ্রু নীহার বিভূতি॥
১৪৪। মাতালের হাতে ধন থাকিলে আঙ্গুল বেয়ে পড়ে।
১৪৫। মায়ের আশীর্ব্বাদ সমুদ্রের গর্ভেও সঙ্গে সঙ্গে যায়।
১৪৬। মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙ্গে না।
১৪৭। মিষ্ট কথায় কাহারও জিব শুকায়না।
১৪৮। মূর্খ ঢিল ছুড়িলে তাহা খুঁজে পাওয়া সপ্তর্ষির অসাধ্য।
১৪৯। সমুদ্রে ঢিল ছুড়িলে, তাহা উদ্ধার করিতে একশ জ্ঞাণী লোকের অসাধ্য।
১৫০। মূর্খের প্রতি পূজার ভার দিলে প্রনামের চোটে মাথা ফাটাবে।
১৫১। মুর্গী অধিক তা দিলে আণ্ডায় ঘোলা পড়ে।
(অর্থাৎ শিশুদিগকে অধিক লালন করা অকর্ত্তব্য।)
১৫২। মৃত্যু একবার বৈ দুবার নয়।
১৫৩। মেছো কখন মেছোকে নিকটে দেখিতে পারে না। (অর্থাৎ এক ব্যবসায়ীর মধ্যে বন্ধুতা নাই।)
১৫৪। যদি আমাকে ভাল বাস, তবে আমার কুকুরকে মারিও না।
১৫৫। জায়ে জায়ে বিছুটীর সম্বন্ধ।
১৫৬। লুমার মাতঙ্গে বন্ধুতা করিবে।
১৫৭। যার মুখে নাগদানা, সবই তার তিত।
১৫৮। যাহার কখন পীড়া হয় নাই, সে কখন আরামের মুখ জানে না।
"বন্ধ্যা গর্ভ যাতনা জানে না"
১৫৯। যুদ্ধ শেষে অনেকে বীরবর।
১৬০। যেই কুলবতী হয় পবিত্র প্রকৃতি। তার কভু সাজা নয় অন্তঃপুরে স্থিতি॥
১৬১। যে ঈশ্বর তোমাকে আর্দ্র করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে শুকাইবেন!
১৬২। যে কূওর জল খাবে, তাতে থুঁথু ফেলিওনা।
১৬৩। যেখানে পরাক্রম সেই খানেই বিধি।
১৬৪। যেখানে সূতার সঞ্চার সেই খানেই সূঁচ চলে।
১৬৫। যে ঘোড়ায় আরোহণ, সেই ঘোড়া ভক্ষণ।
"তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া"
১৬৬। যে পর্য্যন্ত আমল না হয়, সে পর্য্যন্ত ফসলের তারিফ করিওনা।
১৬৭। যে পাখী আপনার বাসা ভাল বাসে না, সে পাখী আহাম্মক।
১৬৮। রূপবতী ভার্য্যা বটে দেখিতে সুন্দর। কিন্তু গুণবতী ভার্য্যা সঙ্গে সঙ্গ কর॥

* ক্ষুদ্র নদী স্রোত না থাকা প্রযুক্ত যে নদীতে শৈবাল জন্মে।

১৬৯। শক্তি, যুক্তির শ্মশান ভূমি।
১৭০। শম্ভু গৃহগত হইলে ওজন কর। "না আঁচালে বিশ্বাস নাই"
১৭১। শিয়াল মাত্রেই আপনার লেজের প্রশংসা করে।
১৭২। শূকরকে ভোজনাসনে বসাইলে সে ভোজন পাত্রে পা রাখিবে।
১৭৩। শৃঙ্গীগণ মধ্যে কভু ছাগ শৃঙ্গীনয়। পশু মধ্যে শজারুর কেহ না গণয়॥
কর্কট না হয় গণ্য মৎস্যদের মাঝে। বাদুড় না পায় স্থান বিহঙ্গ সমাজে॥
সেই রূপ নারীবশ হয় যেই নরে। পুরুষ বলিয়া তারে কেবা গণ্য করে॥
১৭৪। শৈশবে শিক্ষিত জ্ঞান। বৃদ্ধকালে প্রিয় জ্ঞান॥
১৭৫। সংসার যাত্রা মাঠ যাত্রা নয়।
১৭৬। সকল লোকই ভাল কিন্তু সকলের জন্য নয়।
১৭৭। সকালে উঠিলে কিছু অনুতাপ নাই। সকালে করিলে বিয়ে তৃপ্ত হবে ভাই॥
১৭৮। সতী যুবতীর কর্ণও নাই চক্ষুও নাই।
(অর্থাৎ কুকথায় কর্ণপাত করেণ না, পর পুরুষের প্রতি দৃষ্টি পাতও করেন না)
১৭৯। সরদারী কত জাঁক আপনার ঘরে। নাপিতের শিল সম সমাজ ভিতরে॥
১৮০। সর্ব্ব শর্ব্বরীতে চোর না হয় বাহির। কিন্তু সদা সজাগ থাকিবে সবধীর॥
১৮১। সব গত হয়, সত্য মাত্র রয়।
১৮২। সাজ, না পরানো পর্যন্ত, ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাও।
১৮৩। সারালো গাছে কুড়ুল মার', মড়া গাছ আপনিই পড়ে।
১৮৪। সিন্ধু ও বিন্দুর সমষ্টি।
১৮৫। সুবুদ্ধি এক মস্তকের এক নয় হাত।
১৮৬। সূর্য্য আর মৃত্যু এ দুয়ের প্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করা যায় না।
১৮৭। সোনার খাটে শুলেও পীড়া আরাম হয় না।
১৮৮। স্ত্রীজাতীর এক দিনের মধ্যে বাহাত্তর বাহানা।
১৮৯। স্ত্রী পুরুষের বিবাদে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না।
১৯০। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মধ্যস্থ হওয়া ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারো সাধ্য নাই।
১৯১। স্ত্রীলোকের চুল লম্বা, কিন্তু বুদ্ধি ছোট।
১৯২। স্ত্রীলোকের "হাঁ এবং না" এই দুয়ের মধ্যে সূঁচ রাখিবার স্থান নাই।
১৯৩। স্বপ্ন ভয়ঙ্কর, কিন্তু ঈশর কৃপাকর।
১৯৪। স্বর্ণ পিঞ্জরেতে পক্ষী সুখেতে কাটায়।
কিন্তু তার বড় সুখ হরিত শাখায়॥ "তথাপি জন্মবিটপি ক্রোড়ে মনো ধাবতি"
১৯৫। স্বেচ্ছাচার এক ধনাগার, কিন্তু শয়তান তায় প্রহরী।
১৯৬। হাঁটিয়া পার হওয়া যায় কি না? ইহা জানিয়া তবে জলে নামহ।
১৯৭। হাঁড়ী চেঁচার বর্ণ ভাল, কিন্তু সকল গুলই একাকার।
১৯৮। হাড় থাকিলে মাংস হবে।
১৯৯। হাঁপিয়া লাগাইলে শাল গরম হয় না।
২০০। হিত বক্তা বহুতম। হিত কর্ত্তা অতি কম॥
২০১। হুড়কা আর তাতে মেয়ে মানুষ, বন্ধ থাকে না।
২০২। ক্ষার পাণ্ডু বর্ণ ধরে। বস্ত্র কিন্তু শুক্ল করে॥

প্রবাদমালা সমাপ্ত।

অলংকার শাস্ত্র

(সংজ্ঞা ও উদাহরণ)

[মহাকবি রঙ্গলাল বাংলাভাষায় "অলঙ্কারশাস্ত্র" বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনায় প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কবির জীবনী পাঠে জানা যায় যে তিনি চাকুরি জীবনের অন্তে সহসা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল পঙ্গু অবস্থায় রোগভোগ করিয়া গতায়ু হন। এই ছয় বৎসরকাল শয্যাগত থাকায়, রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে কবির অপ্রকাশিত রচনার বহু পাণ্ডুলিপিই নষ্ট হইয়া যায়। সেই বিনষ্টাবশেষ, ছিন্ন ও পর্য্যুদস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই "অলঙ্কারশাস্ত্র"খানি ছিল। যদিও রঙ্গলাল রচিত এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নয়—অথবা ইহার সম্পূর্ণ অংশ আমাদের হস্তগত হয় নাই—তাহা হইলেও রচনাটির মধ্যে এমন বহু তত্ত্বই রহিয়াছে যাহা আলঙ্কারিকগণের নিকট পর্য্যাপ্ত না হইলেও সাধারণ রসপিপাসু পাঠকদের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে। কাজেই গ্রন্থখানিকে পরিত্যাগ না করিয়া প্রকাশে ব্রতী হওয়া গেল।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

শব্দালঙ্কার

১। **যমক** :—ভিন্নার্থবোধক একপ্রকার শব্দ সকল যদি ক্রমে ক্রমে অর্থের সহিত কথিত হয়; তাহা হইলে যমক অলঙ্কার হইবে। উদাহরণ :—

রসাল রসাল বনে আমোদে আমোদ বনে
পরভৃত রুত তরু তমালে।
করি গুণ গুণ গুণ গাইছে বসন্ত গুণ
মধুব্রত বৃত বৃত তমালে॥

২। **বক্রোক্তি** :—শ্লেষ বা কাকু দ্বারা যদি পরস্পর কথোপকথনে অন্যার্থ আরোপিত হয়; তবে বক্রোক্তি হইবে।

(ক) শ্লেষ—উদাহরণ :—

প্রশ্ন—বলহে পথিক হেথা কি কার্য্যেতে আসা?
উত্তর—কহিতেছি ধ্রুব মম নাহি কোন আশা॥
প্রশ্ন :—ভাল ত বুঝিলে প্রশ্ন, কোথায় উত্তর?
উত্তর :—যে দিকেতে ধ্রুবতারা, সেদিক উত্তর॥
প্রশ্ন—মরি মরি কি চাতুরী! কত জান ছন্দ।
উত্তর—ছন্দ মঞ্জরীতে মম জ্ঞান নহে মন্দ॥
প্রশ্ন—থাক্ থাক্ কাজ নাই, অত বাঁকা চাল।
উত্তর—টেনে সোজা কর যদি বাঁকা থাকে চাল॥

(খ) কাকু—উদাহরণ :—

বহুকাল গত পরবাসে প্রাণেশ্বর।
নবীন মুকুলে মধু পিয়ে মধুকর ॥
মুহুর্মুহু কুহু কুহু কোকিল কুহরে।
মঞ্জরিত সহকার জন মন হরে ॥
আইল বসন্ত ঋতু সুখ মধুমাসে।
এ হেন সময়ে সে কি আসিবে না বাসে!

৩। **শ্লেষালঙ্কার** :—শ্লেষালঙ্কার দুই প্রকার—শাব্দশ্লেষ ও আর্থশ্লেষ।

(ক) **শাব্দশ্লেষ** :—অনেকার্থ প্রকাশ করণ হেতু যে শ্লিষ্ট পদের ব্যবহার হয়; তাহার শাব্দশ্লেষ। এই শ্লেষ আট প্রকার :—

(১) বর্ণগত; (২) প্রত্যয় গত। উদাহরণ :—

কুমার সুন্দর শোভে শিখিতে গমনে।
শিব সুখোদয় হয় নিরখি নয়নে ॥

(৩) লিঙ্গগত, (৪) বিভক্তি গত; (৫) বচনগত; (৬) ভাষাগত; (৭) প্রকৃতিগত এবং (৮) পদগত। উদাহরণ :—

কাক পরভৃত প্রিয় হয় কোন্ কালে।
রম্ভা মিষ্ট লাগে কোথা আদ্রকের ঝালে ॥

(খ) **আর্থশ্লেষ** ঃ—অপিচ স্বভাবতঃ একার্থ বাচক শব্দের যদি বিভিন্ন প্রকার অর্থ হয় তাহা হইলে আর্থশ্লেষ হইবে। উদাহরণ :—

(১) পয়োধর উদয়েতে রসে তনু ফুলে।
সুর তরঙ্গিণী কিবা যায় হেলে দুলে ॥
(২) কালের প্রভাবে রসাতলগত বলী।
কাল ক্রমে প্রকটিত হয়ে থাকে কলী ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থালঙ্কার-সাদৃশ্যমূলক

১। রূপক—উপমান এবং উপমেয় যদি অভেদরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে রূপকালঙ্কার হইবে।

রূপক ও পরিণামালঙ্কারে পার্থক্য ঃ—পরিণামালঙ্কারের সহিত রূপকের অভিন্নত্ব প্রতীক হইবার আশঙ্কা থাকায়, এস্থলে উভয় অলঙ্কারের বিভেদ প্রদর্শন করা আবশ্যক। পরিণামালঙ্কারে উপমান এবং উপমেয়ের উপযোগীত্ব থাকিবে কিন্তু রূপকে এতদুভয়ের প্রত্যেক বিষয়ে ধর্ম্মেরই ঐক্য থাকা আবশ্যক। "মৃদুহাস্য"কে উপঢৌকন হিসাবে ব্যবহার করিলে পরিণামালঙ্কার হয়, কারণ ইহাতে কেবল উপযোগীত্ব আছে—দাতব্য দ্রব্যের সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। এ প্রকার উপযোগীত্ব হইলেই রূপক সিদ্ধ হইবে না—তাহাতে উপমার ও উপমেয়ের সর্ব্বাঙ্গিন সৌসাদৃশ্য থাকিবে।

প্রাচীনমতে রূপক অষ্টবিধ। কিন্তু আধুনিক অর্থাৎ সাহিত্য দর্পণকার মতে অষ্টবিধ ব্যতিত অপর দ্বিবিধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা :—

(ক) শ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন কেবল পরম্পরিত।
(খ) শ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন মালারূপ পরম্পরিত।
(গ) অশ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন কেবল পরম্পরিত।
(ঘ) অশ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন মালারূপ পরম্পরিত।
(ঙ) সমস্ত বস্তু বিষয়ে সাঙ্গ।
(চ) বিবর্তি সাঙ্গ।
(ছ) মালারূপ নিরঙ্গ।
(জ) কেবল নিরঙ্গ।

"পরম্পরিত"র অর্থ এই যে, যে কোন বস্তুর আরোপ হইবে, তাহা অন্য আরোপের প্রতিকারণ হইবে।

"সাঙ্গ"র অর্থ এই যে, অঙ্গী অর্থাৎ বর্ণণীয় প্রধান পদার্থের প্রত্যেক অঙ্গের সহিত উপমানের আরোপ।

"নিরঙ্গ"র অর্থ এই যে, অঙ্গের উল্লেখ না করিয়া কেবল মাত্র অঙ্গীর সহিত উপমানের আরোপ।

এই অষ্ট প্রকার রূপক ব্যতীত সাহিত্য দর্পনকার বলেন যে' সাঙ্গরূপকও শ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন হইতে পারে' অতএব তাহাকে শ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন সাঙ্গ কহা যায়। অপরন্তু অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট রূপকও আছে—অধিকারূঢ় বৈশিষ্টের অর্থ এই যে, উপমেয়ের উপমান অপেক্ষা কোন বিশেষ বিভিন্নতা হইবে। উদাহরণ :

(ক) শ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন কেবল পরম্পরিত। যথা :—

বীরসিংহ মহীপাল ধন্য তব বাহু।
আহবে প্রবল রাজ মণ্ডলের রাহু ॥

(খ) শ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন মালারূপ পরম্পরিত। যথা :—

পদ্মোদয়ে দিনকর তুমি নরবর।
সদাগতি হেতু সমীরণ নিরন্তর ॥
ভূধর নিকর পক্ষে বজ্র ভয়ঙ্কর।
ধরা ধামে তব তুল্য কে আছে অপর!

(গ) অশ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন কেবল পরম্পরিত। যথা :—

ঘুচাইতে জগতের অন্ধকার মসী।
বিভা বারি বরষিছে রবি আর শশী ॥

(ঘ) অশ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন মালারূপ পরম্পরিত। যথা :—

পূর্ণ সুধাকর মরি কিবা মনোলোভা।
মনোজ রাজ্যের শিরে শ্বেতছত্র শোভা ॥
দিগঙ্গনা ললাটেতে চন্দনের বিন্দু।
ব্যোম সরোবরে সরোরুহ রাজইন্দু ॥

(ঙ) সমস্ত বস্তুবিষয়ে সাঙ্গ। যথা :—

অধরে ফুটিল লাল দাড়িমের ফুল।
কেশর কেয়ারী কিবা রমণীর কুল॥
ঝমকে চমকে রূপ, কর দরশন।
কিবা রঙ্গরাশি, হোলী, করে বরিষণ॥

(চ) একদেশ বিবর্ত্তি সাঙ্গ। যথা :—

লাবণ্য জলদ পূর্ণ বিকশিত বামার বদন।
নাহি পিয়ে সেই মধু নেত্র অলি আছে কি এমন ?

(ছ) মালারূপ নিরঙ্গ। যথা :—

বিধাতার নির্ম্মাণ কৌশল এই নারী।
জনগণ নয়নেতে জ্যোৎস্না মনোহারী॥
অনঙ্গের কেলিগৃহ অতি অপরূপ।
আর কি ইহার রূপ বর্ণিব স্বরূপ॥

(জ) কেবল রূপ নিরঙ্গ। যথা :—

দাস যদি করে দোষ প্রভু তারে অভিরোষ
পরবশে প্রহারে চরণ।
সে ত অতি সমুচিত তাহাতে আমার চিত
সন্তাপিত নহেক কখন॥
তব পদাঘাতে প্রিয়ে অঙ্গে ওঠে শিহরিয়ে
লোমাবলী কণ্টক যেমন।
তাহে তব পদতল পাছে হয় সুবিকল
তাই মম দহিতেছে মন॥

(ঝ) শ্লিষ্ট শব্দ নিবন্ধন সাঙ্গ—দেশ বিবর্তি শ্লিষ্ট। যথা :—

দিগঙ্গনাগণ বদন চুম্বন
করে নিশাকর মনের সুখে।
বিকসিত তাহে আনন্দ প্রবাহে
কুমুদ নয়ন যামিনী মুখে॥

(ঞ) অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট। যথা :—

এই যুবতীর বদন রুচির
কলঙ্ক রহিত যামিনী কর।
সুধার সুধার সুচির আধার
পরিণত বিম্ব চারু অধর॥
নয়ন সুন্দর নীল ইন্দীবর
দিবা নিশি সদা বিকচ রহে।
লাবণ্য সাগরে স্নান যেই করে
সুখ লভে নাহি শরীর দহে॥

২। অতিশয়োক্তি : অতিশয়োক্তি পর্য্যায়ে ভেদে অভেদ কল্পনা দৃষ্টে—দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই অলঙ্কারের স্বতন্ত্র লক্ষণ করিবার প্রয়োজনাভাব। উদাহরণ (অসম্বন্ধে সম্বন্ধী) :—

সর্ব্বোপরি কলাপীর কলাপের ছাঁদ।
বিলম্বিত তার তলে অষ্টমীর চাঁদ॥
তদন্তে যুগল কুবলয় শোভাকর।
তার তলে তিল ফুল কিবা মনোহর॥
সকলের নীচে দেখ অপূর্ব্ব লীলায়।
প্রবালের ছড় দু'টি মানস ভুলায়॥

৩। অপহ্নুতি :—এই অলঙ্কার এক প্রকার অপহ্নুতি মাত্র। অতএব স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার আবশ্যকতা নাই। উদাহরণ :—সমস্যা, "জলে লাগায় আগুন"

মায়ের নিকট রাধা আছেন বসিয়া।
হেনকালে দূতী আসি কহিল র সয়া॥
"আমার কানাই তোরে ডাকিছে পিয়ারী"।
শুনিয়া জলিয়ে উঠে আয়ানের নারী॥
"কে তোর কানাই ? আমি—না শুনি, না জানি।
নেশা বুঝি করেছিস্ আগুন-জ্বালানি ?
জ্বলুক আগুন ব্রজে পুড়ে হোক চূর্ণ।
যেখানে রমণী জলে লাগায় আগুন॥"

৪। ব্যতিরেক :—ব্যতিরেক অলঙ্কার বহু প্রকারের আছে। যথা :—

(ক) উপমান গত নিকর্ষকারণ এবং উপমেয় গত উৎকর্ষ কারণ একত্রে উক্ত হইবেক উদাহরণ :—

অকলঙ্ক মুখ তার অতি অনুপম।
কলঙ্কী শশাঙ্ক কিসে হবে তার সম॥

(খ) উপমেয় গত উৎকর্ষ কারণ উক্ত হইবে কিন্তু উপমান গত নিকর্ষ কারণ ব্যক্ত হইবে না।
উদাহরণ :—অকলঙ্ক মুখ তার শরদেন্দু প্রায়।

(গ) উভয় গত উৎকর্ষ এবং নিকর্ষ কারণের অনুক্তি :—
উদাহরণ—সুধাংশু সমান তার মুখ মনোহর।

পরন্তু সাম্য ; আর্থ্য এবং আক্ষেপ ব্যতিরেক অলঙ্কারের বহুতর ভেদ আছে ; তত্তাবৎ ব্যাখ্যা করণের প্রয়োজনাভাব। উদাহরণ :—

প্রতিপক্ষে শশীর শরীর পায় ক্ষয়।
প্রতিপক্ষে পুনরায় ক্রমে পূর্ণ হয়॥
পরন্তু যৌবন ক্ষয়ে পুন পূর্ণ নয়।
তাই বলি সময়ে সার্থক যোগ্য হয়॥

৫। পরিণাম : উপমান এবং উপমেয়ে প্রকৃতার্থ বিন্যাস করিলে পরিণাম হয়। উদাহরণ :—

এস গো! নয়ন ঘরেতে গোপনে রাখি।
পলক-কপাট আড়ালে স্বতনু ঢাকি॥

৬। ভ্রান্তিমান: যে পদার্থে যে বুদ্ধি হওয়া উচিত, তাহা না হইয়া যদি অন্য পদার্থে তদ্বুদ্ধি প্রতিভার সহিত প্রবর্ত্তিত হয়; তাহা হইলে ভ্রান্তিমানালঙ্কার হইবে। যথা :—

চিকণ চন্দ্রিকা চয় ভ্রমভরা সমুদয়,
করিলেক এ মহী মণ্ডলে—
জ্যোৎস্না গাভী স্তনোপরি দুগ্ধ ধায় মনে করি
গোপী গিয়ে ভাণ্ড ধরে তলে॥
শ্রুতি মূলে ইন্দীবর শশী করে শুভ্রতর
রামাভাবে শ্বেত শতদল।
ধবলিত পাকাকুল কিরাত কামিনী কুল
কুড়াইছে ভাবি মুক্তা ফল॥

৭। মীলিত: কোন সমান লক্ষণাক্রান্ত বস্তু কর্ত্তৃক যদি বস্তন্তরের গোপন হয়; তবে মীলিত হইবে। উক্ত সমান লক্ষণাক্রান্ত বস্তু কখন স্বভাব সিদ্ধ হইবে; আবার কখন বা কৃত্রিম হইবে। উদাহরণ: স্বভাব সিদ্ধ। যথা :—

নীলোৎপল দল নিভ হৃদয় প্রদেশে।
কস্তুরী অসিত বর্ণ বিলীন বিশেষে॥

উদাহরণ: কৃত্রিম (—) যথা :—

বরষা ভুক্তিতে যদি থাকে তব মতি।
এসো মোর নয়নেতে করিতে বসতি॥
সিতাসিত আলোহিত মেঘ আছে তায়।
থেকে থেকে মেঘমালা বরষিয়া যায়॥

৮। মালা দীপক: ধর্ম্মী সকলের ধর্ম্মই যদি এক প্রকার হয়; তবে মালা দীপক হইবে। যথা :—

নানা রঙ্গে স্বরভিতে বানাইব বেশ।
ফুলহারে সাজাইব কণ্ঠ আর কেশ॥
কিছু না রাখিব বাকি আপাদ মস্তকে।
মণি আভরণে সব তনু ঝক্‌মকে॥
কান্ত বসন্তেরে লয়ে এল আজি ঘরে।
ভর্ ভর্ চুয়া আর চন্দন আতরে॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থালঙ্কার—বিরোধ-মূলক

(১) বিরোধ: জাতি, গুণ, ক্রিয়া একই দ্রব্যের যদি পরস্পর বিভেদ হয়; তাহা হইলে বিরোধালঙ্কার হইবে। ইহা দশ প্রকার :—

(ক) জাতির সহিত জাতির বিভেদ।
(খ) জাতির সহিত গুণের বিভেদ।
(গ) জাতির সহিত ক্রিয়ার বিভেদ।
(ঘ) জাতির সহিত দ্রব্যের বিভেদ।
(ঙ) গুণের সহিত গুণের বিভেদ।
(চ) গুণের সহিত ক্রিয়ার বিভেদ।
(ছ) গুণের সহিত দ্রব্যের বিভেদ।
(জ) ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার বিভেদ।
(ঝ) ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের বিভেদ।
(ঞ) দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিভেদ।

উদাহরণ

(অ) তোমার বিরহে অহে তনুপ্রাণ মনে দহে,
মলয় মারুত দাবানল।
শোষমণি শশীকর নিদাঘের দিনকর
হইয়াছে নলিনীর দল ॥

(আ) কঠিন মুষল সহ সঙ্গ হেতু অহরহ:
আর গৃহকার্য্যে বহুতর ॥
দ্বিজ দারা চারুকর সরোরুহ মনোহর
কঠিন হয়েছে নরবর ॥

(ই) মাধব গৌরীর ভর্ত্তা রাধা শিব পাশে
ইন্দু কুমুদারি সূর্য্য কমল বিনাশে ॥

(ঈ) পতি আলিঙ্গন বিরহ কারণ কুরঙ্গ নয়নী সতী।
রাকা বিভাবরী কাল বিষধরী জ্বালায় আকুল অতি ॥

(উ) নয়নে মোহিছে মন কিন্তু এর আচরণ
মনোগত কিছু নাহি পাই।
নয়ন অমৃত ক্ষরে অন্তরে কি বিষধরে
হাসাইছে কাঁদাইছে ভাই ॥

(২) বিরোধাভাস: বিরোধের আভাস মাত্র থাকিলে বিরোধাভাস হইবে। উদাহরণ:—

তিন গুণ তব চাঁপা রূপ, রঙ্গ, বাস।
কি অগুণে ভৃঙ্গ তব আসে নাহি পাশ?
মধুলুব্ধ মধুকর ভ্রমে বাসে বাসে।
হেন বহু বল্লভেরে না বসাই পাশে ॥

(৩) বিষম: কারণ হইতে যদি বিরুদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি হয় এবং কার্য্যারম্ভ পরে তাহা নিষ্ফল হইলে পর যদি অনর্থ উপস্থিত হয় এবং দ্বিবিধ বিরূপ পদার্থের একত্র সুসমাবেশ হয়; তাহা হইলে বিষমালঙ্কার হইবে। যথা:—

(ক) নিধি নিধি জলনিধি সৃজন করিলা বিধি
রত্নাকর নাম ভূমণ্ডলে।
ডুবিলাম সাধপুরে রত্ন লাভ থাক দূরে,
মুখ পুড়ে গেল লোণা জলে ॥

(খ) দনুজ মনুজ দেবি, মহেন্দ্র বন্দিত দেবী
রাজলক্ষ্মী কোথা গেল কহ।
বল্কল বসনে রাম বনচারী অবিরাম
বিধির কুবিধি দুর্ব্বিসহ ॥

(৪) বিভাবনা: কারণ ব্যতিত কার্য্যের উৎপত্তি হইলে বিভাবনালঙ্কার হইবে। ইহা দ্বিবিধ:—

(ক) উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা: কার্য্যের প্রকৃত কারণ ব্যতিত যদি করণান্তরের প্রকাশ থাকে; তাহা হইলে উক্ত নিমিত্ত কহা যায়। যথা:—

পরিশ্রম বিনা হয় কৃশ কটিস্থল।
ভীতি লেশহীন তবু নয়ন তরল ॥
অভূষণে রহে বালা ভূষিত বিশেষ।
বয়সের ধর্ম্মে হেন শোভা সমাবেশ ॥

(খ) অনুক্ত নিমিত্ত বিভাবনা :—যে স্থলে উক্ত কারণান্তরের অভাব হইবে, সে স্থলে অনুক্ত নিমিত্ত হইবে। যথা :—

কিবা তার চারু বপু ভুবন মোহন।
মদ নহে অথচ মাতায় তনু মন ॥

(৫) বিশেষ : আধারের স্থলে আধেয়ের বর্ণন হইলে ও একের উল্লেখে অনেক স্থানে সেই বস্তুর আবির্ভাব বোধ হইলে এবং অবর্ণনীয় যে বিষয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ ব্যক্ত করিলে বিশেষালঙ্কার হইবে। যথা :—

অমর ভবনে যারা করিলে গমন।
আকল্প অকল্প গুণগণ অগণন ॥
যাঁহাদের বাক্যাবলী রসায় ভুবনে।
কেন না বন্দিবে তুমি হেন কবি গণে ॥

(৬) বিশেষোক্তি : হেতু সত্ত্বে কার্য্যের অভাব হইলে বিশেষোক্তি হইবে। ইহা দ্বিবিধ :—

(ক) উক্ত নিমিত্ত : যথা :—

ধন সত্ত্বে মদহীন হয় যেই জন।
চপলতা নাহি মাত্র উদয়ে যৌবন ॥
পরাক্রম সত্ত্বে ক্ষমা গুণের আশ্রয়।
এই সব লোক হয় মহা মহাশয় ॥

(খ) অনুক্ত নিমিত্ত : যথা :—

একেশ্বর পঞ্চশর ত্রিভুবন জয়ী।
হরকোপে তনু গেল, বল গেল কই ?

(৭) লেশ : গুণে দোষের আরোপ হইলে এবং দোষে গুণের আরোপ হইলে লেশালঙ্কার হইবে। যথা :—

স্বচ্ছন্দে কাননে চরে যে বিহঙ্গ চয়।
কখন কি কহে তারা কথা রসময় ?
পিঞ্জরে হইয়া বদ্ধ হে শুক বিহঙ্গ।
কত মত মিষ্ট বাক্যে বিতরিছ রঙ্গ ॥

(৮) বিনোক্তি : অন্য সহায়ে যদি কোন বস্তুর শোভার উৎকর্ষ বা লাঘব হয়, তবে বিনোক্তি হইবে।

(ক) শোভন : যথা :—

বিনা জলধর চয় পরিপূর্ণ প্রভাময়
সুধাকর সমুদিত আজি।
বিনা নিদাঘের তাপ গত মলিনতা পাপ
কিবা শোভা পায় বনরাজী ॥

(খ) অশোভন :—যথা :—

বিনোদ বিধুর মুখ নিরখি না পায় সুখ
নলিনীর জীবন বিফল।
পদ্মমুখ বিকস্বর না হেরিল সুধাকর
তাঁর দৃষ্টি কি কারণ বল?

(৯) বিচিত্র বিরোধ বাচন পূর্ব্বক যদি অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ হয়; তবে বিচিত্রালঙ্কার হইবে। যথা :—

প্রণতি পরের পদে উন্নতি কারণ।
পর প্রাণ হেতু করে প্রাণ বিসর্জ্জন॥
সুখ হেতু সদা হয় দুঃখের ভাজন।
সেবকের তুল্য বল মূঢ় কোন্ জন?

(১০) বিকল্প : তুল্য বলের চাতুরীযুক্ত বিরোধে বিকল্পালঙ্কার হয়। যথা :—

নত কর ধনু কিংবা নিজ শিরোদেশ।
কর্ণে আন ধনুর্গুণ অথবা আদেশ॥

(১১) বিষাদন : অভিপ্রেত বিষয়ের বিরুদ্ধ সংঘটন হইলে বিষাদন হইবে। যথা :—

অভিসার মহোৎসবে হইয়া চঞ্চল।
যেমনি চালিনু আনি চরণ যুগল॥
অমনি চণ্ডাল চাঁদ দিয়ে দরশন।
তিমির ঘোমটা বাস করিল মোচন॥

(১২) ব্যাঘাত : যে বস্তু কর্ত্তৃক যাহার অন্যথা হয়, সেই বস্তু কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার তাহার সংস্থান হইলে তাহাকে ব্যাঘাত কহা যায়। যথা :—

যে নয়নে দগ্ধ হেতু হত মনসিজ।
সেই নয়নেতে পুনঃ প্রাণ প্রাপ্ত নিজ॥
অতএব মহেশ-জয়িনী যারা ভাই।
হেন বামনেত্রাগণে বলিহারি যাই॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থালঙ্কার—গূঢ়ার্থ মূলক

১। ব্যাজোক্তি : প্রকাশোন্মুখ যে পদার্থ, ছল দ্বারা তাহার গোপন হইলে ব্যাজোক্তি অলঙ্কার হইবে। যথা :—

গিরীশ গিরিশ কর করিয়া ধারণ। হাসিয়ে কহেন হর হিমালয় প্রতি
গিরিজার পানী ধরি করে সমর্পণ॥ উহু উহু তব তনু শীতল এমতি॥
শিহরিল সত্বরসে শর্ব্ব সর্ব্বকায়। শুনিয়ে সস্মিতমুখী যতেক যুবতী।
বিবাহের বিধিভঙ্গ উপক্রম তায়॥ হিমালয় অন্তঃপুরে রঙ্গরস অতি॥

২। ব্যাজস্তুতি : নিন্দা দ্বারা স্তুতি এবং স্তুতি দ্বারা নিন্দা বুঝাইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হইবে। যথা :—

যে হয় তোমার ভক্ত অনুরক্ত জন।
সে পায় অনন্ত সুখ স্বর্গে নিকেতন ॥
অসহায়ে যদি তুমি না হও সহায়।
তবে তব দীননাথ নাম কেন হায়!

(৩) বিবৃতোক্তি : কবি কর্তৃক যদি গুপ্তশ্লেষ প্রকাশিত হয়; তবে বিবৃতোক্তি অলঙ্কার হইবে। যথা :—

কহিলাম—এখানেতে না আসিব আর।
প্রিয়া কহে—আস কি হে বশে আপনার?

(৪) মিথ্যাধ্যবসিতি : কিঞ্চিৎ মিথ্যা সিদ্ধির নিমিত্তে যদি মিথ্যা অর্থান্তর কল্পনা করা যায়; তাহা হইলে মিথ্যাধ্যবসিতি হইবে। যথা :—

প্রশ্ন—শুন শুন সুবদনি! শুন কলাবতি!
উত্তর—কি হুকুম আর বল, অধিনীর প্রতি ॥
প্রশ্ন—মানময়ি! মান পরিহর, হর রোষ।
উত্তর—হুজুরের কিবা ক্ষতি কিবা তাহে দোষ ॥
প্রশ্ন—ক্ষতি আর বাকি কোথা জীবন হারাই।
উত্তর—জীবন হারাবে কেন? বালাই—বালাই!

(৫) মুদ্রা : প্রকৃতার্থবোধক শব্দের যদি সূচ্যার্থ অর্থাৎ ভঙ্গী ক্রমে অর্থসূচক হয়; তাহা হইলে মুদ্রালঙ্কার হইবে। যথা :—

দুহিতার মৃত্যু পরে জামাতা সুদূর।
শাখা ভেঙ্গে গেল আর উড়িল ময়ূর ॥

(৬) যথা সংখ্য : ক্রমানুসারে যদি এক সমন্বয় হয়; তবে যথাসংখ্য হইবে। যথা :—

ঘরের ঘরনী ছাড় যে যায় পরের বাড়ী,
খায় গিয়ে বাহিরে টোক্কর।
জন্মান্তরে দুরাশয় গাধা হয়ে জন্ম লয়
করে সদা হোঁক্কর হোঁক্কর ॥

(৭) যুক্তি : মর্ম্ম গোপনাভিলাষে ক্রিয়া দ্বারা অপরকে প্রতারিত করণের নাম—যুক্তি। যথা :—

সত্য এই বাণী, দীনহীন জনে, তেজীর তেজের তাগ।
প্রভাত পবনে, চিকুরচঞ্চল, আমার উপরে রাগ ॥

(৮) বিকস্বর : যাহাতে বিশেষের সামান্যত্ব এবং বিশেষত্ব থাকিবে, তাহাকে বিকস্বর কহা যায়। যথা :—

মালিনী হইয়ে পিয়ে কহে কটু বাণী।
একটু গরল নহে সুধা ধারা মানি ॥
যদিও অমরালয়ে আছে সুধা সার।
এমন অমৃত কটু কোথা পাবে আর!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থালঙ্কার—গৌণশ্রেণী

১। **বিধি :** যদ্দ্বারা সিদ্ধ বস্তুর বিধান হয়। যথা :—

কাকে কি কর্পূর খায়, কুত্তা গঙ্গা নায় ?
চন্দন গাধার দেহে, কপি ভূষে গায় ॥
যাহে যার স্বার্থ সিদ্ধ—তাই শোভনীয়।
চোর চাহে অমানিশি—পূর্ণিমা অপ্রিয় ॥

২। **বিধ্যাভাস** বিশেষ প্রতিপত্তির জন্য অনিষ্টার্থে যে সিদ্ধ বস্তুর বিধান হয়; তাহা **বিধ্যাভাস**। যথা :—

(ক) বাঁকার নিকট কেহ নাহি যায় ত্রাসে।
বাঁকা চন্দ্রমায় কভু রাহু নাহি গ্রাসে ॥

(খ) তরণীতে জল বৃদ্ধি, ঘরে বৃদ্ধি ধন।
দু'হাতে সেচন কর, এই তো শোভন ॥

৩। **লোকোক্তি :** লোক প্রবাদের অনুকীর্ত্তনের নাম লোকোক্তি যথা :-

(ক) ভাগ্যবানে কত লোকে শালা হয় চেয়ে।
অভাগার বোনাই না হয় কোন ভেয়ে ॥

(খ) প্রথম প্রহরে জাগে সর্ব্বজন ;
দ্বিতীয় প্রহরে ভোগী।
তৃতীয় প্রহরে জাগে চোরচয় ;
চতুর্থ প্রহরে যোগী ॥

৪। **প্রহেলিকা :** ইহা এক প্রকার হেঁয়ালী বা কুটপ্রশ্ন। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষে যে পদার্থ সম্ভাবিত বিবেচনা হয়, তাহার যথাযথ নিরূপন করিতে পারিলেই কুট প্রশ্নের সমাধান হয়। এই অলঙ্কারের স্বতন্ত্র লক্ষণ করিবার প্রয়োজনাভাব। উদাহরণ :—

(১) রঙ্গে ভঙ্গে ফেরে নারী, নানা বস্ত্র পরে।
উদয়ে মানব সব, হেরে ভাব ভরে ॥ উত্তর :—মেঘমালা।

(২) আছে এক নারী, সেই বড়ই রঙ্গিনী।
হৃদয় শিহরে ডরে, দেখি উলঙ্গিনী ॥
কটি আকর্ষিয়ে রহে অতি প্রেমভরে।
চমকে চমকে কত শত নাশ করে ॥ উত্তর :—তরবারী

(৩) হরির কৃপায় তার হরিৎ বরণ।
জরির বসনে তার শরীরাবরণ ॥
উঠ ওহে উঠ সাধু লহ তারে তুলে।
ওজন করিয়া দিব সোনাসহ তুলে ॥ উত্তর :—জাফরাণ (কুঙ্কুম)

(৪) একই মন্দিরে আছে সহস্তর দ্বার।
প্রতি দ্বারে ঘরে ঘরে নারী অবতার।
প্রতি ঘরে সঞ্চরিত সুধা সরোবর।
যদি বুদ্ধি থাকে তবে দাও হে উত্তর। উত্তর :—মধুচক্র

(৫) যেদিন হইতে মোর নয়ন প্রকাশ।
সেদিন হইতে ছাড়ি জীবনের আশ ॥
ছাড়ায়ে গায়ের ছাল খাল খুলে অরি।
চুষে চুষে রক্ত খায় বল না কি করি? উত্তর :—ইক্ষু ॥

(৬) ঘেরাল ঘাঘরা পরি, রূপে যেন পরী।
অষ্টভূজা একপায়ে দাঁড়ায়ে সুন্দরী ॥
সকল জাতির সঙ্গে তাহার প্রণয়।
হেয়ালী প্রবন্ধে কবি রঙ্গলাল কয় ॥ উত্তর :—ছাতি ॥

(৭) ফুলবন নহে কিন্তু আছে ফুলভরি।
সাপ নহে মুক্তা আছে, জরির লহরী ॥
হেয়ালীতে কোন্ কথা আছে বল বাকি?
সকল কহিনু আর কিছুই না রাখি ॥ উত্তর :—রাখী ॥

(৮) নাথের প্রেয়সী এক মনোহর নারী।
কিবা আভা নিরমল, যেন ঢলে বারি ॥
বারি নহে কিন্তু বারি সম শোভা পায়।
নাথেরে হৃদয়ে রাখে যেই ক্ষণে পায় ॥ উত্তর :—আর্সী ॥

(৯) সারঙ্গ সারঙ্গ ধরে, গরজে সারঙ্গ।
সারঙ্গ করে সারঙ্গ, পলায় সারঙ্গ ॥

উত্তর :—সারঙ্গের চারি অর্থ। যথা :—ময়ূর, সর্প, মেঘ এবং ময়ূরের আনন্দ ধ্বনি।

অর্থ :—ময়ূর সাপকে ধরিল। কিন্তু আকাশে মেঘগর্জন হওয়ায় সেই আনন্দে ময়ূর কেকাধ্বনি করিয়া উঠিলে, ফাঁক পাইয়া সাপ পলাইয়া গেল।

(১০) প্রশ্ন :—হে সখি! শুনহ অই ঘন গরজন
উত্তর :—কহনা সজনি! সে কি হয় নব ঘন ॥
প্রশ্ন :—আবার দেখহ সখি! উঠে জ্বলি জ্বলি।
উত্তর :—বুঝিলাম, ওলো সই! সেই তো বিজলি ॥
প্রশ্ন :—আলো আলি! করে সেই কর সুশোভন।
উত্তর :—তবে বুঝি হবে সেই বলয় কঙ্কণ ॥
প্রশ্ন :—আবার দেখহ ওষ্ঠোপরে শোভাকর।
উত্তর :—এইবার বুঝিলাম হইবে বেসর ॥

—উপপন্ন—

কেমন চতুরা তুমি। বুদ্ধির ধুকড়ী।
যা বলিলে কিছু নয়—হয় গুড় গুড়ি ॥

(১১) পূর্ব্বপক্ষ :— অবলা অক্ষম কোন্ কার্য্য করিবারে!
কিবা সে পদার্থ সিন্ধু রাখিবারে নারে ॥
সেই বা কি বস্তু, হুতাশনে নাহি জ্বলে!
কোন্ দ্রব্য ভস্ম নাহি হয় কালানলে?

উত্তর পক্ষঃ— অবলা অশক্ত নিজে উপজে সন্ততি।
সিন্ধু শাসাইতে নারে মানুষের মতি ॥
পাবকে না পোড়ে ধর্ম্ম, নাহি হয় ছাই।
কালের অসাধ্য যশ লোপ করে ভাই ॥

৫। নিষেধিকা : ইহা এক প্রকার প্রহেলিকা। ইহাতে পূর্ব্ব পক্ষে যে পদার্থ সম্ভাবিত বিবেচনা হয় ; তাহা না হইয়া নিষেধে অর্থাৎ তদন্যথায় অন্য পদার্থ বুঝাইবে। এই প্রকার প্রহেলিকা আকবরের সাম্রাজ্য সময়ে আমীর খসরু দহ্লবী উদ্ভাবন করেন। উদাহরণ :—

(১) সারা বিভাবরী তারে হৃদয়ে রাখিনু।
অপরূপ রূপরঙ্গ সকলি চাখিনু ॥
প্রভাত হইলে তারে করি পরিহার।
হে সখি ! বল্লভ সে কি ?—না সখি ! সে—হার ॥

(২) পথে যেতে আঁচল ধরিয়া টানা টানি।
না শুনে আমার কথা, নাহি কহে বাণী ॥
তার সঙ্গ নাহি মোর ঝগড়া কি ঝাঁটা।
হে সখি ! বল্লভ সে কি ?—না সখি ! সে কাঁটা ॥

(৩) আপনি দোলয়ে আর আমারে দোলায়।
দোলায়ে দোলায়ে মোর মানস ভুলায় ॥
দোলাইতে মনে তার কিছু নাহি শঙ্কা।
হে সখি ! বল্লভ সে কি ?—না সখি ! সে—পঙ্খা ॥

(৪) ধুম ধাম করি সই আইল সে জন।
অন্ধকারে বিছাইনু বিনোদ শয়ন ॥
তার আগমনে বাড়ে মদন উদ্বেগ।
হে সখি ! বল্লভ সেকি ?—না সখি ! সে মেঘ ॥

(৫) বার বার ফিরে ঘুরে আমারে জাগায়।
না জাগি যদ্যপি সখি ! দংশে মম কায় ॥
তাহার জ্বালায় আমি জ্বালাতন আছি।
হে সখি ! বল্লভ সে কি ?—না সখি ! সে মাছি ॥

(৬) উচ্চ অট্টালিকা পরে পালঙ্ক উপরে।
শুইলে সে শির আসি পরশিল করে ॥
আঁখি মেলি সুখে হেরি মনোহর ছাঁদ।
হে সখি ! বল্লভ সে কি ?—না সখি ! সে চাঁদ ॥

(৭) তাহার বিরহে প্রাণ সদাই বিকল।
মিলনেতে যায় তৃষা হৃদয় শীতল ॥
আলিঙ্গন দিয়ে সেই নিভায় অনল।
হে সখি ! বল্লভ সে কি ?—না সখি ! সে জল ॥

(৮) কি সুন্দর মূর্ত্তিধর জল্ ঝল মল।
যার গুণে ঘর মোর হইল উজ্জ্বল॥
বিদায় করিনু তারে পোহাইলে রাতি।
হে সখি! বল্লভ সে কি?—না সখি! সে বাতি॥

(৯) বৈশাখে আমার পাশে আসে সেই জন।
আলু থালু কেশ বাসে করায় শয়ন।
ঘুমাতে না দেয়, না ঘুমায় সে অধর্ম্মী।
হে সখি! বল্লভ সে কি?—না সখি! সে গর্ম্মী॥

(১০) গোঁটা গোঁটা তনু তার দেখিতে সুন্দর।
অনেক যতনে পুষ্ট সেই কলেবর॥
চুম্বনের রস কত পায় রস ভিক্ষু।
হে সখি! বল্লভ সে কি?—না সখি! সে ইক্ষু॥

(১১) মনোহর রঙ্গ ধর, মধুর বচন।
থেকে থেকে করে কত বচন রচন॥
শয়ন না করে, রাম নাম না ভজিয়া।
হে সখি! বল্লভ সে কি?—না সখি! সে টিয়া॥

(১২) পড়িয়ে ছিলাম আমি করিয়ে শয়ন।
হঠাৎ আসিয়ে সেই দিল আলিঙ্গন॥
যখন ছাড়িয়ে গেল প্রাণে বাঁচিলাম।
সকল-শরীর দিয়ে, ছুটে গেল ঘাম॥
মুখে নাহি সরে কথা, শ্রান্ত কলেবর॥
হে সখি! বল্লভ সেকি?—না সখি! সে জ্বর॥

(১৩) আপন অধীন নহে প্রিয় যেই জন।
আমি যাহা চাই নাহি করে সে কখন॥
হাজার যতনে সেই না হল আপন।
হে সখি! বল্লভ সে কি?—না সখি! সে মন॥

(১৪) দিবা নিশি মুখে মুখ রাখে রাখে সে সুজন।
অধর পরশে কিন্তু না কহে বচন॥
আমার আয়তী রাখে পুরে মনোরথ।
হে সখি! বল্লভ সে কি?—না সখি! সে নথ॥

(১৫) সম্পদে বিপদে মম সেই মাত্র আশা।
দিবানিশি—মম হৃদে আছে তার বাসা॥
অনুক্ষণ পূর্ণ করে মম মনস্কাম।
হে সখি! বল্লভ সে কি?—না সখি! সে রাম॥

(১৬) আনিলাম ঘরে তারে দাসী পাঠাইয়া।
সোহাগে সেবিনু সুখে অঙ্গ মিলাইয়া॥
আমার সহিত তার হয়ে গেল মেল।
হে সখি! বল্লভ সে কি!—না সখি! সে তেল॥

(১৭) নব দূর্ব্বাদল শ্যাম মনোহর রঙ্গ।
আঁখি আরক্তিম সুখে, পেয়ে তার সঙ্গ॥
হাসায়ে মাতায়ে করে কত রসবৃদ্ধি।
হে সখি! বল্লভ সে কি?—না সখি। সে সিদ্ধি॥

(১৮) অপরূপ কিবা সখি। দেখ কলিকালে।
আকাশেতে একপদ দ্বিপদ পাতালে॥
শূন্য হতে পুষ্পবৃষ্টি মন্দাকিনী ধারা।
হে সখি। বামন সে কি?—না সখি? ফুয়ারা॥

(১৯) তাপে তপ্ত চাতুর্ব্বর্ণ, করে তাঁর পূজা।
সর্ব্ব শিরোপরে কিবা শোভে অষ্ট ভূজা॥
দ্বিপদে বিপদে তাঁরে না চায় কে সাথি।
হে সখি। অম্বিকা না কি?—না সখি। সে ছাতি॥

(২০) বৈমাত্রেয় বংশ প্রতি অহিত-আচারী।
যাহার নির্দ্দেশে মেঘ বরিষয়ে বারি॥
সহস্র নয়ন শোভা অঙ্গেতে প্রচুর।
হে সখি। বাসব সে কি?—না সখি। ময়ূর॥

(২১) তাহার প্রতাপে তাপে তাপিত সংসার।
কত শত শত গৃহ করে ছার খার॥
জলে না নিভায় তেজ, কাটে তার ঠাণ্ডি।
সে সখি। অনল সে কি?—না সখি। সে ব্রাণ্ডি॥

(২২) নীল নিভ ঘটাধারে বান্ধা আছে বারি।
অতি সুশীতল সেই সর্ব্ব তাপ হারী॥
অই শুন বজ্র শব্দে. বর্ষে অনর্গল।
হে সখি। নীরদ সে কি?—না লো, সোডাজল॥

(২৩) লজ্জাবতী লজ্জাবশে, প্রচ্ছন্ন কুটিরে।
কতই অমৃত ধরে স্বুবর্ণ শরীরে॥
সহজে সম্ভোগ তার নাহি লভে বধূ।
হে সখি। নবোঢ়া না কি?—না সখি। সে মধু॥

(২৪) পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে আমি শ্যাম অবতার।
লোকের সুরুচি হেতু, আর সদাচার।
পরেতে গৌরাঙ্গ হই ভক্তির নিধান।
জগতেরে তৃপ্ত করি, করি রসদান॥

গড়াগড়ি ধরাতলে, এই পরিণাম।
হে সখি। কেশব সে কি?—না সখি। সে আম॥

(২৫) সর্ব্ব বর্ণভুক্ত সেই, নানা দেশে জাত।
ঝল মল তনু রুচি, বিভায় বিভাত॥
মম লজ্জা সজ্জা সই, সেই রক্ষা করে।
দিবানিশি আলিঙ্গিয়ে আছে কলেবরে॥
জন মন মোহনের সেই মাত্র অস্ত্র।
হে সখি। বল্লভ সে কি?—না সখি। সে বস্ত্র॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছন্দ প্রকরণ

[পাণ্ডুলিপিতে কয়েকটি মাত্র সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে উদাহরণ স্বরূপ কিছু কবিতা রহিয়াছে। সংজ্ঞা এবং টিকা সমেত পূর্ণাঙ্গ ছন্দ প্রকরণ তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিনা—তাহা জানা যায় না। যে কয়টি ছন্দের উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে; সেগুলি নিম্নে দেওয়া গেল।]

ষটাক্ষরাবৃত্তি

শশীবদনা ছন্দ :—

শশধর ভাতি। সুবিমল রাতি॥
মম চিত পদ্মে। রসময় সদ্মে॥
করিল কি মায়া। শিহরিল কায়া॥
স্মরি বনিতারে। হরি হরি হারে॥
বিষম দুরন্ত। সময় বসন্ত॥
মলয় সমীরে। দহিল শরীরে॥
মরি মরি আহা। কি বিষম দাহা॥
সরসি তরঙ্গে। বিহসিত রঙ্গে॥
কুমুদ কদম্বে। শশী অবলম্বে॥
মম চিত লোভা। সিত মুখ শোভা॥
নিরখন তাহে। কি করিব আহে॥
বসতি বিদেশে। সুখি বল কে সে॥

সোমরাজী ছন্দ :— প্রকটে বিধুনাম মহাত্ম্য ছটা। মৃদু মন্দ সমীরণ মন্দ স্বরে।
চিত মোহন শোহন গীত ঘটা॥ জগদীশ উপাসনা গান ফুরে॥

সপ্তাক্ষরা বৃত্তি

মধুমতী ছন্দ :—

শতদল কুসুমে। মধুকর চলিছে॥
রমণীর বদনে। ভুরুযুগ চলিছে॥
শশধর সদনে। শশ চিন পশিছে॥
সুমদন মুকুলে। পিককুল রসিছে॥
বুঝি বিধি কুতুকী। সুললিত সকলে॥
সিতসহ অসিতে। রচিল রসছলে॥

কুমার-ললিতা ছন্দ :— গভীর ভব ঘোরে। শরীর নিতি ঘোরে ॥
সদা পতন শঙ্কা। বিঘোষে যমডঙ্কা ॥
তরঙ্গ খর পাপে। ভয়াল তম দাপে ॥

মদলেখা ছন্দ :— যাবে হে যদি দেশে—
পাবে হে হৃদয়েশে।

অষ্টাক্ষরাবৃত্তি অনুষ্টুপ

চিত্রপদ ছন্দ :— ছাইলরে বনশোভা। কুন্দ পলাশ নিম্নালী ॥
গাইলরে মধুলোভা ॥ গাঁথিব মোহন মালা।
চম্পকজাতি পিয়ালী। আয় সবে বর বালা ॥

মানবক ছন্দ :— শাল্মলী পুষ্পে কি নিভা। রক্ত পতাকা উড়িছে।
চারু বসন্তে প্রতিভা ॥ অগ্নি কিবা দিক্ পুড়িছে ॥

বিদ্যুন্মালা ছন্দ :— ঢালী পাকে পাকে পাকে।
ঘোরে বেগে তাকে তাকে ॥

সমানিকা ছন্দ :— মুগ্ধকারী চারু পদ্য। ভাগ্য ভাল লব্ধ অদ্য।
দোষহীন মিষ্ট মদ্য ॥ পান মাত্র মত্ত সদ্য ॥

প্রমানিকা ছন্দ :— বহে সুমন্দ মারুত। ফুটে কদম্ব আবলী।
অলি সুমিষ্ট আরুত ॥ করে বিহঙ্গ কাকলী ॥

মণিমধ্য ছন্দ :— শেখর শোভা হেরহে।
যেমত আভা নীরদে ॥

নবক্ষরাবৃত্তি—বৃহতী

ভুজগ শিশুসৃতা ছন্দ :—পতি ভকতি পালে যেবা।
দিবস রজনী কালেতে—
নিরুপম সতী সাধ্বী সে অমর নগরে যাবে হে
চরম পরমাহ্লাদেতে ॥ চির সুখ তথা পাবে হে ॥

ভুজঙ্গ সঙ্গতা :— চলগো জলে সুলোচনা হইবে রসে বিমোহনা—
অমিয়া সমান সরোবরে। চলিছে প্রবাহ তটান্তরে ॥

দশাক্ষরাবৃত্তি—পংক্তি

চম্পকমালা ছন্দ :— সাগর রঙ্গে ধাবিত তীরে ঘোর রবে গর্জ্জে দিন রাতি
উজ্জ্বল শোভা কজ্জল নীরে ফেণ মুখে হাসে শশী ভাতি ॥

মত্তাছন্দ :— ক্রীড়া রঙ্গে যত শিশু মাতে। চিত্তানন্দে খল খল হাসে।
লম্ফে ঝম্পে ধরি হাতে হাতে ॥ হো হো হো হো কত কল ভাষে ॥

ত্বরিত গতি ছন্দ :— কুসুম বনে বসি বিজনে।
পড়িল মনে রসিক ধনে ॥

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি

(ক) নহেক চম্পা মকরন্দ সঞ্চিতা ।
অলির পাশে অনুরাগ বঞ্চিতা ॥
স্বরূপ সত্ত্বে গুণ নাহি যে জনে ।
কদাপি লোকে নরঈষ্ট না গণে

(খ) অতি নম্র মনে ভজ ঈশ পদে ।
রজনী বিগতে মজি ভক্তি মদে ॥
শুন চেতন হীন নদী নিকরে ।
মধুর স্বর সঞ্চরি গান করে ॥
শুক খঞ্জন কোকিল হংস সবে ।
চকুয়া চকী গাহে সুমিষ্ট রবে ॥

চতুর্দ্দশাক্ষরী

(ক) শতদল মধুকর হরষ রসদ ।
অবিরত পরশই বিমল নন্দদ ॥
শিখি সুখকর জলধর গরজনে ।
চরণ চলিত ঘন ঘন দরশনে ॥
মুকুলিত মধুতরু পিকচিত হর ।
কুহরিত কুহু কুহু রব সুখকর ॥

(খ) বিরহ হতাশে বালা লতিক বিতানে ।
দহিত বিশেষে বিদ্ধা ফুলশর বানে ॥...

(গ) শরমে মরমে মরি মানস দুঃখিত ।
যমুনা পুলিনে হরি নীপতলে স্থিত ॥
মুরলী অধরে ধরি রঙ্গরসাশ্রিত ।
উদয়ে সুখ শর্ব্বরি ইঙ্গিত ভাষিত ॥
কহিছে, "কহ গোপিনী ! কে তুমি কাননে ।
মদনাসব কো পিনি ভাতুনিভাননে ॥
রজনী ঘন ঘোর তমা ভয় বাসনা ।
পর নাগর সঙ্গ বিলোলিত বাসনা ॥
ছিছি লাজ ধরে শ্রবণে মুরলী ধ্বনী ।
মরি মা হৃদয়ে পরমাদ সদাগণি ॥

(ঘ) আজি আলি কৃষ্ণ রাধিকা বনে বিলাস ।
হাবভাব নাট্য রঙ্গ মন্দ মন্দ হাস ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্প কুঞ্জ পুঞ্জরে শতালী ।
এক এক মঞ্জরীস্থ গুঞ্জরে শতালী ॥
মালতীর মাধবীর চারু গন্ধ সার ।
দক্ষিণের মন্দ বায়ু দেয় ভেট ভার ॥
পূর্ণ-চন্দ্র দীপ্ত দিগদশে কিবা বিভাত ।
হেন রাত্রি নাশি হাসি আসিবে প্রভাত ॥

(ঙ) কে হে তুমি পঙ্কীকর বামা পথ গামী ।
আচার্য্য কি পীড়াহর জিজ্ঞাসই আমি ॥
চর্চ্চা যদি থাকে তব জ্যোতির্গণনার ।
দূরস্থিত ভর্ত্তামম বার্ত্তা কহ তার ॥

(চ) রাসে রাধিকা রাণী বিরাজে হেমবর্ণা ।
জ্যোতিপুঞ্জ হীরাগুচ্ছ শোভা পূর্ণ ফর্ণা ॥
হস্তে ন্যস্ত লীলাপদ্ম শোভেভৃঙ্গ ঘোরে ।
মুক্তা মাল হেলা লোল ঘাঘোরার ডোরে ॥
ভালে বিন্দু আধা ইন্দু সিন্দুরের রেখা ।
কোলে তার গোলাকার তারা দেয় দেখা ॥

(ছ) মদালসা বরাননী ধরাসনে গতা ।
ধরাতলে পড়ে যথা তরুচ্যুতা লতা ॥
সরোবরে গিয়ে সখী সুসিক্ত অঞ্চলে ।
মুখারবিন্দ সুন্দরে ভিজাইলা জলে ॥
উঠে বসে বিনোদিনী হয়ে সচেতনা ।
কহে, "অল সুলচনা ! হৃদে কি যাতনা ॥
অনঙ্গ অঙ্গহীন কে বলে মিছে মিছে ।
প্রসূনবাণ মানসে জ্বলে যথা বিছে ॥

(জ) দ্রুতপদে ফুলবনে নিধুবনে চল। ইমন পূরবি ধরে চিত বশীকর।
দিনগতে হরি বিনা সুখ কিবা বল॥ ষড়জ মধ্যম সুরে অমিয় শীকর।
নিরখিবে মুরহরে বিজন কাননে। থর থরাস্ত শিহরে রসভরে তনু।
মধুর বেণুবদনে ব্রজ বঁধূ সনে। কমলিনী ভরুযুগে রতি ধরে ধনু।

ষোড়শাক্ষরা

সঙ্গগুণে যোগ্যদশা প্রাপ্ত হবে লোকসভে।
পুষ্পসনে কীট গিয়ে দেবশিরে স্থান লভে॥
মৌচয়নী মৌচয়নে কালহরে পুষ্পবনে।
বদ্ধ হয় ব্যাধ করে শস্যহারী পক্ষী সনে॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রসপ্রকরণ

[পাণ্ডুলিপির সূচীপত্রে দেখা যায় যে, রঙ্গলাল এই পরিচ্ছেদে—কাব্যের রস, গুণ, দোষ প্রভৃতি, বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে সেগুলির কিছুই পাওয়া যায় না। হয় এই পাতাগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—নহেত রঙ্গলাল আদৌ সে রচনায় হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।]

অষ্টম

ভাব প্ররোহ

১। বিলাস :—প্রিয় সমাগমে নায়িকার স্থান বা আসন পরিবর্ত্তন, অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ প্রভৃতি ললিত ভাবের নাম বিলাস।

উদাহরণ :—তারপর পঞ্চশর শিক্ষার বিজয়।
কি বলিব সে বিচিত্র বচনীয় নয়॥
মৃগলোচনার দেহে বিভ্রম বিস্তার।
তাহে দূরীভূত হলো ধীরতা আমার।
এমনি প্রচুর সেই সাত্ত্বিক বিকার।
ধন্য কাম আচার্য্যের শিক্ষা চমৎকার।

২। বিব্বোক :—ভালবাসার দ্রব্যে অথবা নায়কে অতি গর্ব্ব প্রযুক্ত যে অনাদর, তাহার নাম – বিব্বোক।

উদাহরণ :–প্রাণপণে হইলেও সাধু সদাচারী।
তবু দোষ দৃষ্টি করে যেই সব নারী॥

প্রাণদানে অগ্রসর হইবেক তারা।
তবু নাথ প্রতি নাহি ধায় নেত্র তারা॥
মনে মনে যে পদার্থে অতি অভিমত।
প্রকাশ্যে তাহার প্রতি যেন স্পৃহাহত॥
ত্রিলোক অদ্ভুত হেন ভাবিনী নিচয়।
তব প্রতি হয় হেন প্রসন্ন হৃদয়॥

৩। কিলকিঞ্চিত:—প্রিয় সম্মিলনে স্মিত, শুষ্করোদন, হাস্য, ত্রাস, শ্রম এবং অনিচ্ছা প্রকাশ প্রভৃতি মিশ্রভাবের নাম কিলকিঞ্চিত।

উদাহরণ:—ধরিতে বাসনা নাই শুধু হাত ধরে।
মধুর হসিত মুখে ভর্ৎসে প্রিয়বরে॥
হের কিবা অশ্রুবিনা রোদন মাধুরী।
মনে সুখ মুখে কান্না বাহবা চাতুরী॥

৪। মোট্টায়িত:—প্রিয় বল্লভের কথা মনে পড়িলে তাহার ভাব চিত্তে ভাবনা করিয়া কর্ণকণ্ডুয়নাদির নাম—মোট্টায়িত।

উদাহরণ:—শুন রসাধার তোমার কথার
আরম্ভ হইলে পর।
সেই মদালসা কতবা লালসা
রসে হয় গর গর॥
কর্ণ কণ্ডুয়ন কতবা জৃম্ভণ
বদন সরোজ রাজে।
অলসে নবোঢ়া দেয় অঙ্গমোড়া
কত ভঙ্গী-ভাবে সাজে॥

৪ (ক) কলহান্তরিতা:—অতি মানভরে প্রিয়কে বিমুখ করিয়া পরে তজ্জন্য অনুশোচনা-কারিনী নায়িকার নাম কলহান্তরিতা।

উদাহরণ:—সাধনা করিল কত না শুনিনু কানে।
না হেরিনু তাঁর উপহার হার পানে॥
তাঁর হিতে প্রিয়সখী কহিল বিস্তর।
কিছুই না মানিলাম মানে করি ভর॥
শেষে নিপতিত হয়ে মম পদ তলে।
নিরাশ্বাসে যখন গেলেন তিনি চলে॥
সে সময়ে হায় আমি করেতে ছাঁদিয়া।
কেন না রাখিনু তাঁরে হৃদয়ে বাঁধিয়া॥

৫। কুট্টমিত:—কেশাকর্ষন বা চুম্বন হেতু হর্ষভরে অকস্মাৎ শিরঃ বা হস্ত কম্পনের নাম—কুট্টমিত।

৬। বিভ্রম:—নাথের আগমন সংবাদে হর্ষরাগে ব্যস্ত হইয়া যে স্থানের যে ভূষণ তাহা পরিধান করিতে অন্যস্থানে নিয়োগ করার নাম—বিভ্রম।

উদাহরণ :—সাজ না হইতে স্বাঙ্গ রাগ মনোরম।
বাহিরে আগত শুনি প্রাণ প্রিয়তম॥
বিপরীত বেশ করে হইয়া চঞ্চল।
ললাটে পরিল ধনী দলিত কজ্জল॥
অলক্তে আরক্ত করে নেত্র মনোহর।
কপোল ফলকে লেখে তিলক সুন্দর॥

৭। ললিত :—আপন সৌভাগ্যের বা রূপ লাবণ্যের গরিমায় অঙ্গ সঞ্চালনায় যে সুকুমার রসের উদয় হয়—তাহার নাম ললিত।

উদাহরণ :—মন্মথ মন্থর গতি অতি সুললিত।
নেচে নেচে বামপদ কমল চলিত॥
মঞ্জীরে নিখাদ নাদ ঝুমুর ঝুমুর।
অন্য পদক্ষেপে তত না বাজে ঘুঙুর॥

৮। মদ :—সৌভাগ্য এবং যৌবনাদি অহংকারের নাম—মদ।

উদাহরণ :—আনিলাম নিজ করে তোমার সে অলী।
কপোলেতে লিখিদেছে এ কুসুমকলী॥
গরবিনী করো্যে গেলো অত অহঙ্কার।
ওরূপ সোহাগ অন্যে লভে নাকি আর!
দেখাইতে পারিতাম হেন চিত্রফুল।
যদি নাথে বেপথু না হত্যো প্রতিকূল॥

৯। বিকৃত :—ব্রীড়াবশতঃ যাহা বক্তব্য, তাহা বলিবার সময় না বলবার নাম—বিকৃত

উদাহরণ :—চির বিরহান্তে আসি প্রিয়া সম্বোধনে।
জিজ্ঞাসিনু "কেমন, আছ হে সুলোচনে।"
কিছু না কহিল কান্তা—কিন্তু দু'নয়ন।
সকলি কহিল করি অশ্রু বরিষণ॥

১০। তপন :—প্রিয়বিচ্ছেদে আবেশ বশতঃ যে বিফল চেষ্টা তাহার নাম তপন।

উদাহরণ :—শুনহে নাগর তব বিরহে বিধুরা।
যে দশায় আছে সেই প্রমদা মধুরা॥
নাসাপথে নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ধায়।
ধূলায় ধূসর ধনী ধরনী লোটায়॥
শুনহে তাহার প্রাণ সম প্রিয়তম।
স্বপনেও চাহে সেই তোমার সঙ্গম॥
সেই হেতু সদা বাঞ্ছা নিদ্রা যাইবার।
পোড়া বিধি সে সুখেও বঞ্চিয়াছে তার॥

১১। মৌগ্ধ্য :—প্রিয়তমের নিকট বসিয়া জানিয়া শুনিয়া অজ্ঞানের মত কোন পদার্থের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করার নাম—মৌগ্ধ্য।

উদাহরণ :—প্রসন্ন হইয়া নাথ অধিনীরে বল।
এই যে কঙ্কণে মম শোভে মুক্তাফল ॥
এই ফল ফলে কোন তরুর শাখায়।
কোন গ্রামে রোপণ বা কে করিল তায় ॥

১২। বিক্ষেপ :—প্রিয়জনের বিরহে ভূষণাদি অর্দ্ধেক রচনা এবং নির্জ্জন স্থানে ইতস্তত বৃথা অবলোকনের নাম—বিক্ষেপ।

উদাহরণ :—অর্দ্ধ বিনায়িত বেণী বিচল অম্বর !
অর্দ্ধমাত্র লেখা ভালে তিলক সুন্দর ॥
ইতস্তত সচকিত চক্ষের চাহনী।
কিছু কিছু গুপ্তকথা ব্যক্ত করে ধনী ॥

১৩। কুতূহল :—রমণীয় বস্তুদর্শনে চঞ্চলতার নাম - কুতূহল।

উদাহরণ :—প্রসাধিকা কোলে ছিল চরণ কমল।
উঠায়ে লইয়া তাহা হইয়া চঞ্চল ॥
কোন বিলাসিনী বালা দলমল গতি।
গবাক্ষের উপরেতে দাঁড়ায় যুবতী ॥
অপরূপ শোভা তাহে হৈল গৃহভাগে।
গৃহ তলে ফলে রঙ্গ আলতার রাগে ॥

১৪। হসিত :—যৌবনোদ্ভেদে বৃথা হাসির নাম—হসিত।

উদাহরণ :—অকারণ অকস্মাৎ এই কৃশোদরী।
পুনরায় যখন হাসিছে হো হো করি ॥
অবশ্য তখন এর হৃদয় মাঝার।
অধিকার হইয়াছে অনঙ্গ রাজার ॥

১৫। চকিত :—বল্লভের অগ্রে বসিয়া কখন কখন নারীদিগের যে ভয় ও ভ্রম হয়, তাহার নাম—চকিত।

উদাহরণ :—বাম উরু ধরা বামাদের উরুস্থলে।
বিঘট্টিত করে চলে সফরীর দলে ॥
ত্রাস পেয়ে শিহরিয়ে কাঁপে থরথর।
বিভ্রমেতে পরিপূর্ণ সব কলেবর ॥
হেতু বিনা হয় যারা ভয়ে অভিভূত।
হেতু সত্বে শিহরিবে ত্রহেন অদ্ভুত ॥

১৬। কেলি :—কান্তাসহ বিহারের নাম—কেলি।

উদাহরণ :—প্রিয়া নেত্রে পুষ্পরজ পরিষ্কার তরে।
নায়ক ফুৎকার পাড়ে যথাযত্ন ভরে ॥
না হয় বিফল নেত্র প্রয়াস বিফল।
পীনোন্নতা পয়োধরা হইয়া বিকল ॥
পরিণত পয়োধর পঙ্কজ প্রহারে।
হৃদয় আহত করি ফেলিল তাহারে ॥

(২)

সকল নায়িকার অনুরাগ চিহ্ন।
আমি যদি হেরি এই নব ললনায়।
নিকটে আইলে তবে মম প্রীতি চায়॥
ভুজ মূলে অভিনব নখাঘাত রেখা।
কোনরূপ ছলে দেখাইতে মদলেখা॥

১৭। শ্রম :—রতি এবং পথভ্রমণাদিতে যে ঘর্ম্ম, শ্বাস এবং নিদ্রাকর্ষণ হয়; তাহার নাম—শ্রম।

উদাহরণ :—সুকুমারী সীতা যথা শিরীষ বিসদ।
পুরী পরিসরে গিয়ে তিন চারি পদ॥
জিজ্ঞাসেন কতদূর যেতে হবে আর।
রামনেত্রে প্রথমাশ্রু তাহে অবতার॥

১৮। মদাত্যয় :—মদ্য পান করিয়া মোহ, আনন্দ এবং কলহ জনিত ভাবকে মদাত্যয় বলে। উত্তম লোকেরা মদ্যপান করিয়া নিদ্রাভোগ করে; মধ্যমেরা হাস্য করে ও গীত গায় এবং অধমেরা কটুকথা বলে ও রোদন করে।

উদাহরণ :—তিন পাত্র পান করি প্রগল্ভতা চেড়েছে।
প্রমদা সভায় হাস পরিহাস বেড়েছে॥
জড়িমায় যুক্ত কত বোল চাল ফুটেছে।
রঙ্গেবতরঙ্গ তাহে হাস্যার্ণবে উঠেছে॥
অতি গোপনীয় কথা সভামাঝে ভেঙ্গেছে।
ভাল বটে তিন পাত্রে এত রঙ্গ রেঙ্গেছে।

১৯। মোহ :—ভীতি, দুঃখ, আবেগ, চিন্তার প্রকৃতি, বিত্তের অস্থিরতায় গাত্রের ঘূর্ণন এবং পতন, ভ্রম দর্শনাদির নাম—মোহ।

উদাহরণ :—দারুণ দুঃসহ দুঃখে স্তম্ভিত ইন্দ্রিয় চয়।
মদন মোহিনী রতি ক্ষণে মোহ গত হয়॥
অজ্ঞাত সে ক্ষণে সতী পতির মহা দুর্গতি।
মোহ হৈল উপকারী বান্ধব তাহার প্রতি॥

২০। বিবোধ :—নিদ্রাপগমে চেতনার উদয়ে জৃম্ভণ, অঙ্গ-ভঙ্গ, নয়নোমীলন, অঙ্গাবলোকন প্রভৃতির নাম—বিবোধ।

উদাহরণ :—চির রতি পরিচ্ছেদে সুষুপ্তি বিহ্বলে।
শিয়র ভাবিয়া সতী সুপ্ত শয্যাতলে।
আলুলিত চারু তনু, লাগিয়াছে খিল।
প্রিয়কণ্ঠে আলিঙ্গন নাহিল শিথিল।

২১। স্বপ্ন :—নিদ্রিত ব্যক্তি বিষয়ানুভব করিয়া যে কোপ, আকো, ভয়, গ্লানী, সুখ, দুঃখ প্রকাশ করে, তাহার নাম—স্বপ্ন।

উদাহরণ :—স্বপনে তোমার রূপ করি দরশন।
গাঢ় আলিঙ্গন হেতু মনে আকুঞ্চন॥
শূন্যতে উঠানু যবে বাহু-লতা-দ্বয়।
দেখি দশাক্রম দেবতার দয়া হয়॥
হিম বিন্দু ছলে তরু, কিশোলয় 'পরে॥
মুক্তাফল সমস্থল অশ্রুপাত করে॥

২২। আলস্য :—শ্রম বা গর্বভরালস্য হেতু জৃম্ভণাদির নাম—আলস্য।

উদাহরণ :—ভূষিত না করে অঙ্গ নাহি আর অঙ্গ ভঙ্গ
সখী সঙ্গে রস ভাষ নাই।
গর্বভরালস সাজে বদন সরোজ-রাজে
ঘন ঘন উঠিতেছে হাই॥

২৩। নিদ্রা :—শ্রান্তি, ক্লান্তি, মদাদিজনিত চৈতন্যের সঙ্কোচকে নিদ্রা কহা যায়। ইহা জৃম্ভণ, অক্ষিমিলন, উচ্ছ্বাস, গাত্র ভঙ্গাদির কারণ।

উদাহরণ :—কভু কথা অর্থযুত কখন বা অর্থচ্যুত
মন্থর অক্ষর অনিবার।
ঘুমঘোরে দু'নয়ন আধ আধ নিমীলন
জাগে রূপ হৃদয়ে আমার॥

২৪। অবহিত্থা :—ভয়, গৌরব, লজ্জাহেতু হর্ষাদির সংগোপন করাকে এবং আন্তরিক ভাব-গোপন করিয়া বিষয়ান্তরে আলাপ বা বিলোকনাদি করিলে অবহিত্থা কহে।

উদাহরণ :—দেবর্ষির বাক্য সাঙ্গ ব্রীড়াবশে বিকলাঙ্গ
পিতা পাশে দাঁড়াইয়া সতী।
অধোমুখ অরবিন্দ লীলাপদ্ম পত্র বৃন্দ
গণিতে লাগিল গুণবতী॥

২৫। ঔৎসুক্য—অভিলষিত পদার্থ অপ্রাপ্তে কালক্ষেপে অসহিষ্ণুতা, চিত্ততাপের বৃদ্ধি, স্বেদ ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগকে ঔৎসুক্য কহা যায়।

উদাহরণ :—যে জন করিল মম কৌমার হরণ।
সেই ত আমার পাশে বসিয়া এখন॥
সেই মধু মাস এই, সেই পূর্ণমাসী।
সেই ত মালতী এই ফুল্ল রাশি রাশি॥
সেই নীপ সৌরভেতে প্রবল পবন।
সেই আমি, সেই জন করি দরশন॥
কিন্তু হায় কেন মম মানস বিকল।
স্মরি স্মরি নর্মদায় ... ...
বেতসী তরুর তলে যে হইল লীলা।
সুরতে সুরত হায় রস ... ...

২৬। উন্মাদ :—কাম, শোক, ভয় প্রভৃতি জনিত চিত্ত সম্মোহকে উন্মাদ কহা যায়। ইহাতে অকারণ হাস্য, রোদন এবং প্রলাপাদির উদ্ভাবনা হয়।

উদাহরণ :— ভাইরে ভ্রমর ভ্রম নিরন্তর
নানা দেশে ঘুরে ফিরে।
মোর প্রিয়তমা অতি নিরূপমা
দেখেছ কি মোহিনীরে?

২৭। স্মৃতি :—পূর্ব্ব অনুভূত কোন বিষয়ের জ্ঞানকে স্মৃতি কহা যায়। ইহাতে চিন্তাদির দ্বারা ভ্রূর উন্নয়ন বা অভিনয়াদি হইয়া থাকে।

উদাহরণ :—কপট ঘুম ঘোরে মিলিতাক্ষ দেখি মোরে
বালা হৃদে সাহস জুরায়।
ঈষৎ নয়ন তারা প্রকাশিয়ে মুখ সারা
আড়ে আড়ে মম প্রতি চায়॥
দেখি আয়ী কুতূহলী মৃদুহাসি পড়ে ঢলি
লজ্জাবতী লজ্জা পায় মনে।
তব মুখ স্মিতময় অর্দ্ধফোটা কুবলয়
স্মরি আমি সদা সর্ব্বক্ষণে॥

২৮। ত্রাস :—নির্ঘাত অর্থাৎ মহাঝটিকা, বিদ্যুৎ, উল্কাপাত প্রভৃতির সময় যে ভীতি ভাবের উদয় হয়, তাহাকে ত্রাস কহা যায়। ইহাতে দেহকম্পনাদি হয়।

উদাহরণ :—সুর তরঙ্গিনী জলে সুর সুরঙ্গিনী দলে
সন্তরে বিহরে কেলি করে।
মীন বিঘট্টিত উরু প্রকম্পিত গুরু গুরু
দুরু দুরু হৃদয়ে শিহরে॥
নব কিশলয় প্রায় কাঁপে পানীদ্বয় তায়
সখীমুখ হেরে ত্রাস ভরে।

২৯। শঙ্কা :—
উদাহরণ :— বিভাবরী পরিগত দেখে বালা অনুক্ষত
প্রানেশের নখর নিকরে।
লজ্জা ভয়ে ভীতা অতি চন্দন লেপিছে সতী
চিহ্নচয় লুকাবার তরে।
দশনে দারিত তার বিম্বাধর সুধাধার
ঢাকি তাহে জারকের রসে।
কৃষোদরী সচকিত হৃদয়েতে বড় ভীত
ইতস্তত চায় দিক্ দশে।

৩০। উৎকণ্ঠিত :—
উদাহরণ :— বুঝি নাথ বাঁধা গেল অপরের পাশে।
বিরক্ত হইল কিবা সখীর সম্ভাষে॥

কিম্বা কোন কার্য্যে, অনুরোধ গুরুতর।
আজ না আইল হেথা প্রাণের ঈশ্বর ॥
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে বার বার।
বহুক্ষণ নয়নেতে বহে অশ্রুধার ॥
রোদনে রোদনে বালা বিকলিত মন।
দূরে ফেল্যে দিল যত পুষ্প আভরণ ॥

৩১। হর্ষ :—অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপণে চিত্ত প্রসাদের নাম হর্ষ। ইহাতে অশ্রুপাতাদি হয়।

উদাহরণ :—হেরি পুত্র মুখ মনে অতিসুখ
পলক না পড়ে আর।
যেরূপ সুদীন পাইল সুদিন
লভি নিধি পুনর্ব্বার ॥
প্রফুল্ল মানস পূর্ণ স্নেহরস
ফুলিয়া উঠিল দেহ।
যথা ইন্দুদয়ে প্রফুল্লিত হয়ে
পয়োধি প্রকাশে স্নেহ ॥

৩১। মতি :—

উদাহরণ :— অসংশয় মনোরমা ক্ষত্রি পরিগ্রহ ক্ষমা
নহে কেন তার প্রতি মম মন ধায়রে।
মতের সন্দেহ স্থলে যে দিগে অন্তর চলে
সেই ত প্রমাণ দেয় অপারে উপায় রে।

৩২। নির্ব্বেদ :—

উদাহরণ :— ধিক ধিক ধিক মোরে করিনু কি কায।
এক বিন্দু ছিদ্র ছিল কলসীর মাঝ।
সারিবার তরে সেই রেনু-বং গর্ত্ত।
চূর্ণ করিলাম শঙ্খ দক্ষিণ আবর্ত্ত।

৩৩। চিন্তা :—চিন্তা এক প্রকার ধ্যান, ইষ্টবস্তর অপ্রাপ্তিতে জগৎ শূন্যবোধ হয় ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদির পরিত্যাগ ইহার এক চিহ্ন।

উদাহরণ :—বিকচ কমলোপরে রাখিয়াছ সুধাকরে
এ যে অতি বিরোধ সংযোগ।
চন্দ্রাননে দিয়ে কর সুমুখি কি চিন্তা কর—
হৃদয়েতে উদ্বেগ আভোগ ॥

৩৪। প্রবাস :—কার্য্য বা শাপ বশতঃ ভিন্নদেশে থাকার নাম প্রবাস। অঙ্গ-বস্ত্রাদির মালিণ্য, মস্তকে একবেণী ধারণ, নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, রোদন ও ভূমিতে পতন প্রভৃতি ইহার ক্রিয়া। অপর—অঙ্গের অসৌষ্টব, তাপ, পাণ্ডুতা, কৃশতা, বস্তুবৈরাগ্য, অধৃতি, অনালম্ব, তন্ময়, মূর্চ্ছা, মৃত্যু—প্রবাসে স্মরদশায় এই দশদশা হয়।

অসৌষ্ঠবের অর্থ মলিনতা।
তাপের অর্থ বিরহ জ্বর।
বস্তুবৈরাগ্যের অর্থ অরুচি।
সকল বিষয়ে ঔদাস্তের নাম অধৃতি।
অনালম্বনতার অর্থ মানসের শূন্যতা বা স্মরণ শক্তির বিচ্ছেদ।
অন্তরে ও বাহিরে বিরহিত প্রিয়বস্তুর প্রকাশকে তন্ময় বলে।
কার্য্যতঃ এই প্রবাস জনিত বিরহ ভাবী, ভবন্ এবং বর্ত্তমান এই তিন প্রকার হয়।
উদাহরণ—শাপপ্রযুক্ত প্রবাস। যথা—মেঘদূতে নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহ।
উদাহরণ—ভূত। যথা :—

চিন্তা ভরে চিত্ত যেন বেদনা বিহীন।
কপোল কমল চারু করতলে লীন॥
প্রভাতের চাঁদ প্রায় মলিন বদন।
শ্বাসে শুষ্ক বিম্বাধর সুধার সদন॥
ব্যজনী নলিনীদল আর হিমবারি।
তাপ নিবারণে এরা মানিলেক হারি॥
কামিনীরে এ দশায় করিয়া ক্ষেপন।
সহিতেছে ধরাধামে কোন অভাজন॥

উদাহরণ—ভাবী। যথা :—

"প্রিয়ে!—তবে আসি।"
"যাও হে বিদেশি॥"
"তবে বৃথা কেন,
শোক কর হেন?"
"গমনে তোমার,
শোক কি আমার!"
"কেন চক্ষে জল,
করে ছল ছল।"
"নাহি যাও ত্বরা।
তাইতে কাতরা॥"
"ত্বরা পরিহরি
যাইলে সুন্দরি।
কিবা উপকার
হইবে তোমার?"
"তব গতি সহ,
করিছে কলহ—
করিতে পয়ান
আগে মম প্রাণ॥"

৩৫। বিপ্রলব্ধ :—পূর্ব্বরাগাদি বা প্রবাসজাত বিরহ ব্যতীত সম্ভোগে পুষ্টি বর্দ্ধন হয় না,—ইহারই নাম বিপ্রলব্ধ। যেরূপ বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে আস্তর মাখাইতে অর্থাৎ কষায়িত করিতে হয়; কষায়িত না করিলে উত্তর রঙ্গ প্রতিফলিত হয় না—সেইরূপ বিপ্রলব্ধ ব্যতিত সম্ভোগ সুখের গাঢ়তা হয় না।

(ক) পূর্ব্বরাগান্তর সম্ভোগ। যথা :—

উঠ দূতি, চল ফিরে গৃহেতে যাইলো,
প্রহর হইল গত, তবু না আইল।
অন্যের নিকটে সেই করিয়াছে গতি,
তার হয়ে চিরদিন সুখে থাক্ পতি।

(খ) প্রবাসানন্তর সম্ভোগ। যথা :—

প্রশ্ন ;—কুরঙ্গ-নয়নি। কহ আপন কুশল।
উত্তর :—যেমন কৃশাঙ্গ মোর তেমনি কুশল ॥
প্রশ্ন :—এতাদৃশ কৃশ তুমি হইলে কেমনে ?
উত্তর :—তোমার শরীর পুষ্ট সেই ত কারণে ॥
প্রশ্ন :—আমার পৃথুল তনু কিসের কারণ।
উত্তর :—প্রিয়াসহ সম্মিলন সুখ নিবন্ধন ॥
প্রশ্ন :—ওহে সুভ্রু। সে সুখ ত ভুঞ্জি নাই কভু।
উত্তর :—তবে কেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা কর প্রভু ?

৩৬। বৈরাগ্য :—

উদাহরণ :—না, কেহ মম প্রেমাধীন হইল কখন।
না, আমিও কাহারে কভু অর্পিলাম মন ॥
না, প্রমোদ তরঙ্গে কভু ভাসিল এ চিত।
না, মোহ মেঘে কখন হইনু আচ্ছাদিত ॥
না, কর্ষিলাম ক্ষেত, নাহি বপিলাম বীজ।
না, কাটিলাম শস্য, কিবা কহিলাম নিজ ॥
হা! হৃদয়ের ভ্রমজাল, হল অপসৃত।
আ! মানস কন্দরে কত আনন্দ নিঃসৃত ॥
না, আমি কারো পুত্র, নহে কেহ নিজ মোর।
না, আমি কারো মিত্র, নহে কেহ মিতা মোর ॥
না, আমি কারো বৈরী, নহে কেহ মম অরি।
না, সহচর কারো, নহে কেহ সহচরী ॥
আ! এতদিনে হল মম স্বাধীনতা সার।
না, আমিও কাহারও—কেহ, না হয় আমার ॥

৩৭। আময় :—

উদাহরণ :— বিবর্ণ বিরস মুখ, হৃদয় সরস।
হেরি সখি তব তনু নিতান্ত অলস ॥
এই সব লক্ষণেতে দেয় পরিচয়।
তোমার অন্তরে আছে বিষম আময় ॥

৩৮। মরণাকাঙ্ক্ষা :—

উদাহরণ :—চারিদিক ময় ভ্রমর নিচয়
ঝঙ্কার রে ঘুরে ফিরে।
চন্দন কানন প্রসূত পবন
বহ বহ ধীরে ধীরে॥
রসাল মুকুলে কোকিল সংকুলে
কুহর পঞ্চম স্বরে।
চুম্বক পাষাণ আমার পরাণ
যাক যাক ত্বরা করে॥

৩৯। মৃত্যু :—

উদাহরণ :—নিশা শেষে বিদলিত পুষ্প শেফালিকা।
বিলোকনে বিনোদিনী সে নব মালিকা॥
কষ্টে কান্তা যদি দেহে রাখিবে জীবন।
কিন্তু তাম্রচূড় রব শুনিবে যখন॥
তখন কি আর সেই থাকিবে জীবনে।
কিম্বা তপস্বিনী বেশে প্রবেশিবে বনে॥

নবম পরিচ্ছেদ

(১) ভাব :—জন্ম হওয়ার পর পর্য্যন্ত নারীদিগের নির্ব্বিকার মনে যৌবনোদয়ে যে বিকারের উদ্রেক হয়, তাহার নাম—ভাব।

উদাহরণ :—সেই ত বসন্ত এই সুরভি সময়।
সেই ত মলয়ানিল মন্দ মন্দ বয়॥
সেই ত অবলা এই করি নিরীক্ষণ।
কিন্তু যেন ভাবান্তর প্রাপ্ত এর মন॥

(২) হাব :—যুবতীদিগের অভিলাষ প্রকাশক ভ্রূনেত্রাদির কিঞ্চিৎ বিকার ভাবকে হাব কহা যায়।

উদাহরণ :—নবনীপ পুষ্পসম শিহরিত কায়।
দাঁড়াইলা শৈলসুতা বিচিত্র শোভায়॥
পূর্ব্বভাব পরিগত বঙ্কিম নয়ান।
ইতস্ততঃ আরোপিত কটাক্ষ সন্ধান॥

(৩) হেলা :—যুবতীদিগের দেহে সেই চিত্ত বিকারের সমধিক যে স্ফূর্ত্তি,তাহার নাম—হেলা।

উদাহরণ :—সহসা নিরখি তার অন্য ব্যবহার।
সকল শরীরময় বিভ্রম বিস্তার॥
সখীদলে হল্যো এই সংশয় সঞ্চার।
এই কি সেই মুগ্ধ বালা, কিংবা কেহ আর?

(৪) শোভা :—রূপ-যৌবন-লালিত্যাদি অঙ্গভূষণের নাম—শোভা।

উদাহরণ :— বাল্য অনন্তর কিবা মনোহর
বয়স লভিল সতী।
বিনা অলঙ্কার শোভা চমৎকার
চারুদেহে হল্যো অতি ॥
বিরহে আসব তার গুণ সব
প্রসব করে যে কাল।
নহে পুষ্পময় কিন্তু সে সময়
পঞ্চশর শর জাল ॥

(৫) কান্তি :—যে রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ মাত্র মন আকৃষ্ট হয় এবং মনে শৃঙ্গার রসের সঞ্চার হয়, তাহার নাম—কান্তি।

উদাহরণ :— নয়নের চঞ্চলতা খঞ্জন গঞ্জন।
পাণিযুগ জিনিয়াছে রাতুল রঞ্জন ॥
উচ্চ কুচ হেরি নহে সংশয় ভঞ্জন।
করিকুম্ভ মুখে বুঝি দিল সে অঞ্জন ॥
লাবণ্যে চটকে আর কাঞ্চন লাঞ্ছন।
বাণীর লালিত্য চারু অমৃতে বাঞ্ছন ॥
কটাক্ষ অঞ্চলে করে নিন্দার ভাজন।
কিবা নীল সরোজের সোদর সুজন ॥

(৬) দীপ্তি :—কান্তির অতি বিস্তীর্ণতার নাম দীপ্তি অর্থাৎ রূপ-লাবণ্যের অতিশয় উজ্জ্বলতাকে দীপ্তি বলে।

(৭) মাধুর্য্য :—সকল অবস্থাতেই রমণী বিশেষের যে রমনীয়তা, তাহার নাম—মাধুর্য্য।

উদাহরণ :—শৈবালে আবদ্ধ পদ্ম কিবা মনোহর।
চাঁদের কলঙ্ক রেখা শোভার আকর ॥
বল্কল পীধান করি এই তন্বী বালা।
আ মরি কি সমধিক সৌন্দর্য্যের ডালা ॥
স্বভাবতঃ যাহারা মধুরা সুনিশ্চয়।
তাহাদের দেহে কিবা ভূষণ না হয় ॥

(৮) প্রাগল্ভ্য :—কেলি কলায় কামিনীদিগের নির্ভয়তার নাম—প্রাগল্ভ্য।

উদাহরণ :—আলিঙ্গন পেয়ে দেয় কয়ে আলিঙ্গন।
চুম্বিলে চুম্বন চয় করে প্রত্যর্পন।
দংশন করিবা মাত্র দংশিয়া তখনি।
প্রানেশ্বরে দান করে এই সব ধনী।

(৯) প্রগল্ভা ধীরা :—

উদাহরণ :—পাছে পতি কাছে এসে বসে একাসনে।
আগ বাড়াইয়া বালা যায় অভ্যর্থনে ॥

সহসা প্রাণেশ যদি দেয় আলিঙ্গন।
দূরে বসি তাম্বূলের সজ্জা আয়োজন॥
রস আলাপন কিছু, মুখে নাহি সরে।
দাসী গণে নানা কার্য্যে নিয়োজিল ঘরে॥
এই রূপ নীরবেতে নানা ছল করি।
নাগরের প্রতি কোপ প্রকাশে নাগরী॥

(১০) প্রগল্‌ভা ধীরা ধীরা:

উদাহরণ:—শুনহ সুন্দর তুমি বিনা অলঙ্কারে।
কাড়িয়া নিয়াছ মম মন একেবারে॥
আজ তার নখরে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার।
সুখে মম মন চুরি বাকি থাকে আর॥

(১১) প্রগল্‌ভা অধীরা: (১)

উদাহরণ:—রাগেতে আরক্ত মুখ হেরি প্রমদার।
চুম্বিতে গেলাম সেই সুধার আধার॥
অমনি করিল কান্তা চরণ প্রহার।
অমনি ধরিনু হেসে চরণ তাহার॥
কাঁদিতে লাগিল বালা হইয়া বিবশ।
কলহে সুখে কত···সে রস॥
তার সেই রোস রস মনে হল্যে পরে।
কতই কৌতুক উঠে আমার অন্তরে॥

(২)

একা সনে নিরখিয়ে দুই প্রেয়সীরে।
পশ্চাৎ হইয়া ধীর যায় ধীরে ধীরে॥
কৌতুক ক্রীড়ার ছলে কৌশল করিয়া।
একের নয়নরোধ করে, কর দিয়া॥
ঈষৎ বাঁকায়ে কণ্ঠ বিহ্বল মানস।
অন্যের মুখারবিন্দে পিয়ে সুধারস॥
কামিনী কপোলে খুলে গুপ্ত হাসিছটা।
মানসে উদয় মহা প্রেমোল্লাস ঘটা॥

(১২) ঔদার্য্য:—সকল অবস্থাতে বিনয় অর্থাৎ নম্রতার নাম—ঔদার্য্য।

উদাহরণ:—না কহে কঠোর কথা দুঃখ পেয়ে মনে।
না করে কটাক্ষপাত কুপিত নয়নে॥
ক্রোধে কান্তা রত্নসিতি না করে ক্ষেপন।
কেবল গবাক্ষে করি মুখ সমর্পণ॥
সখীমুখ একদৃষ্টে করে বিলোকন।
পরিপূর্ণ অশ্রুজলে ভাসে দু'নয়ন॥

(১৩) ধৈর্য্য:—নারীদিগের মনোবৃত্তির চাঞ্চল্যহীনতা এবং আত্মশ্লাঘার রাহিত্যকে ধৈর্য্য কহা যায়।

উদাহরণ:— পূর্ণ সুধাকর প্রকাশিয়া কর
জ্বলুক গগন ময়।
করুক দাহন আমার মদন
মৃত্যু চেয়ে বড় নয়॥
পিতা লোক-প্রিয় অতি শ্লাঘানীয়
মাতৃকুল সমুজ্জ্বল।
অতি অমলিন সকলে কুলীন
তাহে মম কিবা ফল?
যার প্রতি মন প্রাণ সমর্পন
করিয়াছি, প্রাণ সই।
তাহার বিহনে রহিব জীবনে
এমত পিয়াসী নই॥

(১৪) লীলা:—প্রিয় পুরুষের বেশভূষা, প্রেমগর্ভ বচন প্রভৃতির প্রীতিজন্য যে অনুকরণ, তাহার নাম—লীলা।

উদাহরণ:—মৃণাল ভুজঙ্গ বালা পরি গিরিবালা।
জটারূপে বিনাইলা কবরী বিশালা॥
এইরূপ হরবেশ ধরি লীলা ছলে।
রক্ষা করে শৈলসুতা জগতী মণ্ডলে॥

(১৫) বিচ্ছিত্তি:—অল্প বেশভূষায় নারী বিশেষের যে কান্তির অধিকতা, তাহাকে বিচ্ছিত্তি কহা যায়।

উদাহরণ:—নির্ম্মল সলিলে ধৌত কোমল শরীর।
রঞ্জিত তাম্বূল রঙ্গে অধর রুচির॥
সুচিকণ শুভ্র শাটি দেহে ঝলমলে।
যথেষ্ট এ সজ্জা চারু বিলাসিনী দলে॥
সজ্জা গজ্জা ধুমধাম সেইখানে চাই।
যেখানে অতনুর কোদণ্ডে শর নাই॥

(১৬) ছল :

উদাহরণ :—দন্ত সংমিলিত সব করির ধরন। ছল ছাড়া নাই, দেখ যতেক করম। স্বার্থ বিনা নাহি প্রেম, স্নেহ ব্যবহার। রুচি অনুসারে যত আহার বিহার ॥

(১৭) অভিসারিকা :

উদাহরণ :—করিলাম যুগল কঙ্কন পরিহার। কটি তটে আঁটিয়া বাঁধিনু চন্দ্রহার ॥ মুখর মঞ্জীরে যত্নে করিনু নীরব। তারপর শুন সই সমাচার সব ॥ অভিসারে মহোৎসবে হইয়া চঞ্চল। যেমন চালিনু আমি চরণ যুগল ॥ অমনি চণ্ডাল চন্দ্র দিয়ে দরশন। তিমির ঘোমটা বাদ করিল মোচন ॥

(১৮) প্রেমাভিসারিকা :

উদাহরণ :—তাম্বুলাক্ত দন্ত পাতি দেখাইছে চেটি বিকৃত স্বরেতে কত কথা কহে বেঁটি হয় দারা হ্রেষা মত হাস্য অকারণ। হেথা হোথা যেথা সেথা চলিত চরণ ॥ বাঁকা বাঁকা চালে চল্যে যুবা দল কাছে। নিতম্ব উঠায়ে ঊর্দ্ধে ঘুরে ঘুরে নাচে ॥

(১৯) বাসক সজ্জা :

উদাহরণ :—দূর কর ফেল সখি কনক কেয়ূর। রত্ন বালাতেই হবে ভূষণ প্রচুর ॥ কায নাই গুরুভার শতেশ্বরী হার। এক নরী মুক্তমালা যথেষ্ট আমার ॥ শুন সই মনোভাব উৎসব সময়। বহুতর সজ্জাগজ্জা উপযুক্ত নয় ॥

(২০) উভয়ের মান :

উদাহরণ :—পীরিতির ঝগড়ায় দুজনই রেগেছে। অলীক ঘুমের ঘোর মানমদে চেগেছে ॥ পালঙ্কের দুই টৈরে দুই তনু সরেছে। স্তম্ভিত শরীর দুই শ্বাসরোধ করেছে ॥ পরস্পর কান পেতে এই তাগতেগেছে। কার কত ধৈর্য্যগুণ পরখিতে লেগেছে ॥

(২১) মান ভঙ্গ :

উদাহরণ :—সুন্দরি বচন ধর, রোষভাব পরিহর,
হের পদ প্রান্তে আমি পতিত তোমার।
একেবারে স্নেহলোপ, এ হেন বিষম কোপ,
কখন ইহার আগে হয় নিতো আর ॥
নাথ মুখে এইরূপ, শুনি বাক্য রসকূপ,
আড়ে আড়ে হরিণাক্ষী মেলিয়া নয়ন।
ঝর ঝর অনিবার, একাধারে অশ্রুধার,
মান ভঙ্গে করিতে লাগিল বরিষণ ॥

(২২) প্রথমাবতীর্ণ যৌবনা :

উদাহরণ :— নব বালা নব মন রাজ্যের ভিতর। অভিষিক্ত হৈল হেরি রতির ঈশ্বর ॥ নবরাজ্যে অরাজক হয় সমুদয়। পরধন লুঠিতে লাগিল অঙ্গচয় ॥ কটির স্থূলতা নিল জঘন সুন্দর। কুচের কৃষতা কেড়ে লইল উদর ॥ নয়নেতে ছিল চারুভাব সরলতা। সেইভাব হরণ করিল রোমলতা ॥

(২৩) প্রথমাবতীর্ণ মদন বিকারা :

উদাহরণ :— অলস মন্থর পদ পড়ে ধরাতলে
গো পড়ে ধরাতলে।

অন্তঃপুর হত্যে ধনী আর না নিকলে
গো আর না নিকলে।
হো হো রবে হাস্য করি পড়ে নাকো ঢল্যে
গো পড়ে নাকো ঢল্যে।
কত মত ছলা কলা শরমের ছলে
গো ব্যক্ত লজ্জা ছলে।
কিছু কিছু কভু কভু কথাবার্ত্তা বলে
গো কথাবার্ত্তা বলে।
তাতে কত সুগভীর ছেঁদো ভাব খলে
গো ছেঁদো ভাব খলে।
রঙ্গে যদি পতি কথা কহে সখীদলে
গো কহে সখী দলে।
তখনি কটাক্ষ হানে ক্রোধভরে ছল্যে
গো ক্রোধভরে ছল্যে।

(২৭) রতিবামা :

উদাহরণ :— চাহিলে নাহার পানে অধোদিগে চায়। সম্বোধিলে মুখে তার কথা না জুগায়॥ পালঙ্কের পাশে ফিরে দাঁড়ায় সুন্দরী। বলে আলিঙ্গন দিলে কাঁপে থরথরি॥ গমনে উদ্যত যদি হয় সখীগণ। কোল কুঞ্জ পরিহরি যেত্যে আকুঞ্চন॥ এইরূপ রতি সুখে বিরতা হইয়া। নবোঢ়া ললনা মম হইয়াছে প্রিয়া॥

(২৫) চন্দ্রোদয়ে আলম্বন ভাব :

উদাহরণ :—সুধাকর নিজকর করি প্রসারণ। উদয় শিখর স্তনে করে আরোপণ॥ তাহাতে তিমির রাশি কাঁচলী কষণ। বিগলিত স্খলিত হইল সেইক্ষণ॥ দিগঙ্গনা মুখশশী করিল চুম্বন। প্রকাশিল তাহে তার কুমুদ নয়ন॥

(২৬) স্বয়ংদূতী :

উদাহরণ :—শুনহে পথিক বর পিপাসা কাতর। তৃষা শান্তি হেতু কেন যাও অন্যত্তর॥ এখানেতে ঘনরস আছে সুপ্রচুর। তাহে কিহে তব তৃষা না হইবে দূর?

(২৭) মানে মৃদুশীলা :

উদাহরণ :—নাথের প্রথম দোষে মনে পেল ক্লেষ। বলিবারে নারে বালা রসাভাস শ্লেষ॥ নিকটে নাহিক সখী দেয় উপদেশ। বিভ্রমতে সকলাঙ্গ শিহরে বিশেষ॥ নয়ন নলিনযুগে অশ্রুর আবেশ। সিক্ত তাহে নিরমল কপোল প্রদেশ॥ কেবল রোদন ধনী করে অবশেষ। সে জলেলোটায় লোরচারু চূর্ণ কেশ॥

(২৮) প্ররূঢ় যৌবনা :

উদাহরণ :—নয়নের চঞ্চলতা খঞ্জন গঞ্জন। পাণিদ্বয় জিনিয়াছে রাতুল রঞ্জন॥ উচকুচ হেরি নহে সংশয় ভঞ্জন। করিকুম্ভ ধরে কিসে বিনোদ ব্যঞ্জন॥ কান্তি কৃত চাঁপা আর কাঞ্চন লাঞ্ছন। বাণীর লালিত্য চারু অমৃতে রাঞ্জন॥

* * * *
* * * *

(২৯) স্মরান্ধা :

উদাহরণ :—ধন্য তুই নাথ সহ রস আলাপনে লো রস আলাপনে।
কত মত তোষো তারে বিনোদ বচনে লো বিনোদ বচনে॥

হায়...নাথ কর পরশনে লো কর পরশনে।
তোর দিব্য, যদি মোর কিছু থাকে মনে লোকিছু থাকে মনে ॥

(৩০) গাঢ় তারুণ্য :

উদাহরণ :—হৃদয়েতে কিবা শোভা অতি উচ্চ স্তন। যেমন সুরুষতর কটি মনোহর।
নয়ন যুগল কিবা দীর্ঘ আয়তন ॥ তেমনি সুগুরুতম নিতম্ব সুন্দর ॥
ভুরু দুটি দেখি বটে বঙ্কিম আকার। আহা হেরি কি মাধুরী গতির ঠমক।
কিন্তু ভুরু চেয়ে বাঁকা বচন ইহাঁর ॥ মরি মরি যৌবনের একিরে চমক ॥

(৩১) বিবিধ সুরতজ্ঞা :

উদাহরণ :—পালঙ্কপোষেতে দেখি কত মত দাগরে কত মত দাগ।
কোথাও লেগেছে লাল তাম্বুলের রাগ রে তাম্বুলের রাগ ॥
কলঙ্কিত অগুরুর পঙ্কে কোন ভাগ রে পঙ্কে কোন ভাগ।
কোথাও চুনের দাগ পাইয়াছে লাগরে পাইয়াছে লাগ ॥
কোথাও মেরেছে পদ আলতার আঁক রে আলতার আঁক।
ভেঙ্গেছে আস্তরে ভাঁজ, হয়েছে দো ফাঁক রে হয়েছে দো ফাঁক ॥
দাপটে ঝাপটে তেজি পুষ্প ঝাঁকে ঝাঁকরে পুষ্প ঝাঁকে ঝাঁক।
পড়িয়াছে শয্যাতলে শুষ্ক যেন খাঁকরে শুষ্ক যেন খাঁক ॥
কহে শয্যা দেখাইয়া এইসব দাগরে এই সব দাগ।
নানা ছন্দো বন্ধে রামা কৈল রতি যাগরে কৈল রতি যাগ ॥

(৩২) বিচিত্র সুরতজ্ঞা :

উদাহরণ :— প্রাণপতি প্রতি, নবীন যুবতী,
কুরঙ্গ নয়নাশীলা।
মাতিলে মানস, চতুরতা রস,
রতি রসে প্রকাশিলা ॥
এরূপ কৌশল, চর্বিল চপল,
চুম্বনের চুচুকৃতি।
শুনি সেই স্বর, কত কবুতর,
শিক্ষালতে হল্যোব্রতী ॥

(৩৩) ভাবোন্নতা :

উদাহরণ :—মধুর বচন মুখে কটাক্ষে কটুতা। বারবার অনিবার স্ফারিতা নয়না।
ঘন ঘন তর্জনীর তর্জনে পটুতা ॥ হানিছে অপাঙ্গ বান ভাবিনী ললনা ॥
অলস মন্থর ভাবে অঙ্গের চলনী। এইসব অস্ত্র দিয়ে পঞ্চশর করে।
উত্তর সাধক তার মদন জ্বলনী ॥ ত্রিলোক বিজয়ে বালা সহায়তাকরে ॥

(৩৪) আক্রান্ত নায়কা :

উদাহরণ :—বেঁধে দেহ পুনঃ নাথ স্খলিত অলক। রতি শেষে বলি এই বচন সরস।
ললাটে লাগিয়া দেহ অগুরু তিলক। পূর্ণচন্দ্রমুখী পেয়ে পতির পরশ ॥
পয়োধর তটে দেখ ছিঁড়ে গেছে হার। একেবারে আনন্দে মাতিল অতিমনে।
পুনরায় গেঁথে দেহ প্রানেশ আমার ॥ পুনরায় মগনা ললনা নিধুবনে ॥

বিবিধ রচনা

রঙ্গলালের "বিরহ বিলাপ" [মুখবন্ধ]

বিরহ বিষাদে মম অন্তর কাতর তম,
নিদ্রা বিনা ক্ষিপ্তের লক্ষণ।
শৈশবের সহচরী বীণায় আদর করি,
করিলাম করেতে গ্রহণ।
ভাবিলাম যদি তার, ঝঙ্কার সুধার ধার,
জুড়ায় এ তাপিত হৃদয়।
বিলাপেতে অনিবার, শান্তি না হইল তার,
বৃথা বিগলিত অশ্রুচয়। ১॥

যতক্ষণ বিভাকর, বরিষে প্রখর কর,
ততক্ষণ অশ্রু বরিষয়।
যতক্ষণ শশিকরে, নিশির (১) তিমির হরে,
ততক্ষণ অশ্রুবন্ধ (২) নয়।
হায়! ভবচক্রে ঘোর, যে সময় যায় মোর,
তখনো ত অশ্রুপাত হয়,
স্তব্ধভাবে যেইকালে বদ্ধ থাকি চিন্তাজালে,
সেকালে ও অশ্রু বরিষয় (৩)। ২॥

এই কথা লোকে ভাসে, যাতনার ধার নাশে,
কালের দূরতা সুনিশ্চয়।
আরো লোকে এই বলে, অতি তীব্র শোকানলে,
নিবাতেই কাল যোগ্য হয়।
একথাটা সত্য নাকি? হয় হোক্ তাতে বা-কি?
আমি কিন্তু জানি নাই তাহা;
আমি মাত্র জানি এই, যত গত হয় সেই,
তত বুক ফেটে—যায় আহা! ৩॥

শোকের তুফানে মগ্ন,— দুঃখভরা হেতু ভগ্ন,
আমার হৃদয় জলযান,
অনুভূত পরিগত, আমোদ আহ্লাদ যত,
তাহাদের সমাধি সমান।
যেন পরিশুষ্ক দাম, নয়নের অভিরাম,
পল্লবে না পরিণত হবে,
না জানিবে সুপ্রকাশ, নিদাঘ কালের হাস,
বসন্তের লাবণ্য—বিভবে। ৪॥

কেন আমি করি খেদ, কেন হৃদি করে ভেদ
ক্ষয়করি চিন্তা নিশাচরী?
ওরে মন বাক্য ধর তমাল *বসন পর,
হায়! কথা না শুনে কি করি?
হায়! মনে যে সময় একথা উদয় হয়
সে আমায় না করে গণন,
সে কথা কঠিন অতি, মেতে উঠে মন মতি,
জ্ঞান নেত্র রোধে, অসহন (৪)। ৫॥

দিবা অবসান পরে নিশা আগমন করে,
তিমিরের পশ্চাতে মিহির,
ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাত, পরিগতে অচিরাৎ,
স্থিরতার আবির্ভাব স্থির।
কিন্তু হায়! মমমনে, কেন তবে অনুক্ষণে
অনন্ত তিমির বেড়ি রহে?
অবিরত তাহা থেকে, বেগে (৫) উঠি ঝোঁকে ঝোঁকে,
দুঃখের নিশ্বাস ঝাড় বহে। ৬॥

ভালবাসিতাম আগে, আজো বাসি অনুরাগে,
বাসিব রে জাবৎ জীবন।
যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি-নিজ,
চিরদীপ্ত রবে হুতাশন।
সে অনলে নিরন্তর, মমশ্বাস উষ্ণতর
তাপিবেক চরম নিশ্বাস,
পরেতে অনন্ত দীপ্তি, প্রবেশি পরমতৃপ্তি
প্রাপ্ত হয়ে রহিবে প্রকাশ। ৭॥

তব (৬) চন্দ্র নিভানন, তড়িৎ-কেলি-সদন—
অসিত নয়ন মনোহর;
তব (৭) সুরভিত শ্বাস, মাধুর্য্যের অধিবাস,
বিনোদ বঙ্কিম বিম্বাধর।
পদ্মাকার তবাকার, যাহে কত শোভাধার
বসন্তের প্রসূন নিকর।
সুনীল নিবিড় কেশ, ধরি এক এক বেশ, (৮)
ঝলসেছে কত ফুলশর। ৮॥

---

(১) পাঠান্তর-'নিশায়'।
(২) পাঠান্তর—'আঁখি শুষ্কনয়'।
(৩) পাঠান্তর—'অশ্রুধারা বয়'

* তামস (?) মূলে আছে wrap thee in pride (৪) এই কয় পঙ্ক্তি গিরীন্দ্রমোহিনী অনুলিপিতে নেই। (৫) 'কেঁপে'-পাঠান্তর (৬) 'পূর্ণ' পাঠান্তর (৭) 'মন্দ'-পাঠান্তর (৮) 'শেষ'-পাঠান্তর।

কপোল যুগল মাঝে, কিবাচারু রেখা সাজে,
রত্নশিলা ললাট ফলক,
বীণার ঝঙ্কার প্রায়, তবস্বরে মোহ যায়,
শ্রুতিযুগ পাইয়ে পুলক।
প্রথমেতে যেইক্ষণে, দেখিলাম চন্দ্রাননে,
শুনিলাম মধুর বচন,
সেইক্ষণে জানিলাম, মনে মনে মানিলাম,
বচনীয় নহ তুমি ধন (৯)। ৯॥

বিমল মুকুর যথা, সেরূপ যদ্যপি কথা
প্রতিবিম্ব করিত রুচির,
কিম্বা জ্যোতিশ্চিত্রণ*প্রায়, তোমার সুচারুকায়,
বুক থেকে করিত বাহির,
তবে তোমা নিরীক্ষণে, ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিজনে,
তবপদে লুটায়ে পড়িত,
দগ্ধ হয়ে প্রেমানলে, হৃদয় সহস্রদলে,
প্রতিমার অর্চ্চনা করিত। ১০ ॥

তোমার রূপের জোর, প্রথমে হৃদয়ে মোর,
যখন হইত অনুভূত,
যেন লয়ে প্রহরণ, লক্ষ্য করি মম মন,
মারিলেক কোন্ দেবদূত।
সৌদামিনী পরিকর তোমার কটাক্ষশর,
প্রভাসহ মৃত্যুর মিলন,
বিষম আঘাত তার, সহ্য বল হয় কার?
মম সহ্য নহে কদাচন। ১১ ॥

তদবধি বর্ষ কত, হইল আগত গত,
তোর সহ না ছিল দর্শন,
কিন্তু হায় নিরন্তর, ক্ষুধা এক ঘোরতর,
চিত্ত মোর করিল চর্ব্বন।
তারপর বর্ষকত, সমাগত পরিগত,
জুড়াতে নারিল ক্ষুধানল,
নিরবধি (১০) সেই ভুক, দাহন করিল বুক,
শান্তি বিনা সতত বিকল। ১২ ॥

সে চারু মাধুর্য্যাবলী, ভুলিতে নারিনু বলি,
অনুযোগ ক'রনা আমায়,
সেই সব রূপরাশি জানি, মন নিজ-ফাঁসি,
ইচ্ছা করি পরিল গলায়।
হরিধ্যান পরায়ন, উর্দ্ধরেতা যোগিগণ,
সে সব করিলে দরশন,
না পারিবে বহুকাল, তাহাদের শরজাল,
কখনই করিতে লঙ্ঘন। ১৩॥

শেষে মোর ভাগ্যে লেখা, পুনঃ তোর সহ দেখা,
দয়া প্রকাশিলে তবে তুমি;
আনন্দ না যায় ধরা যেন এই বসুন্ধরা
সেইক্ষণে হলো স্বর্গভূমি।
আহা! আহা! কি মধুর। মাদকে মানসপুর
পূর্ণমম হল সে সময়,
সুখের নাহিক ওর, ভাবেতে হইল ভোর,
কিবা সেই দিন রসময়! ১৪ ॥

তোমার কি পড়ে মনে, মুগ্ধ কর সেইক্ষণে
শান্তি সুখময় যেইক্ষণে—
মম-যুগ বহু পাশে শহরিত তনুত্রাসে,
বাঁধা তুমি পড়িলে বন্ধনে?
অর্দ্ধ-বিকসিত ফুল, তুমি তার সমতুল
লয়ে গেনু বিবাহ বাসরে;
প্রজাপতি করতলে প্রণয় প্রদীপ জ্বলে,
ব্রতোচিত পণ পরস্পরে। ১৫ ॥

এখন কি পড়ে মনে; সেই সমুদয় পনে—
মুদ্রাঙ্কিত নিকর চুম্বনে?
তব দৃঢ় অঙ্গীকার, আমার লো প্রাণামার,
ভুলিবে না যাবৎ জীবনে?
প্রাণে প্রাণে পরিণয় হয়েছিল যে সময়,
প্রেমোন্মদে মত্ত দুই মন; (১১)
একতানে শুভদৃষ্টি, পরস্পরে সুখবৃষ্টি
সেইক্ষণ হয় কি স্মরণ (১২)? ১৬ ॥

---

(৯) পাঠান্তর—"বচনের অতীত রতন"।
* ফটোগ্রাফের প্রথম বাঙ্লা
(১০) পাঠান্তর—"সে অবধি"।—
(১১) পাঠান্তর—"প্রেমোল্লাসে পূর্ণ বসুন্ধরা"
(১২) পাঠান্তর—"সে আনন্দ নাহি যায় ধরা"।

এখনকি পড়ে মনে, মম করে যেইক্ষণে
তোর কর পড়িল বন্ধনে ,
অপ্সরার মধুধ্বনি সহকারে সুবদনি,
মোরে ধন্য কর এ বচনে—
"এই কর, এই মন, অধীনার এ জীবন,
তোমারই হইল এখন"—
মুগ্ধ হয়ে সে কথায়, পড়ে আমি বসুধায়
তব পদ করিনু বন্ধন। ১৭॥

হা! সুখের দিনচয়! আর কি তুলনা হয়,
অনুপম সে সুখ নিকর,
যখন আনন্দ স্রোত, করিলেক ওতপ্রোত,
দ্রবীভূত উভয় অন্তর?
সুরভি ভারেতে নত, মলয় মারুত মত,
সে সময় আমরা দুইজন,
মধুর ভাবেতে মাতি, পূর্ণ বসন্তের ভাতি
যুক্ত হয়ে করিনু চুম্বন (১৩)। ১৮॥

হা সুখের দিনচয় দরশন সে সময়,
যদি না হইত পরস্পরে,
যদি আমাদের মন, না করিত আলিঙ্গন,
প্রেমপূর্ণ লিপি পরিকরে,
কিংবা পরিহাস নলে, জ্বালিয়া হৃদয় স্থলে,
না গড়িতাম স্বর্ণ শিকল,
না গড়িতাম এই বেড়ী, এখন যা আছে বেড়ি
হায়! মম চরণ যুগল। ১৯॥

দু'জনায় প্রেমাবেশ, কত স্নেহ নাহি শেষ,
এক এক কটাক্ষ তোমার,
আর এক এক দৃষ্টি, করিত তড়িৎ সৃষ্টি,
অবসান না ছিল তাহার।
খঞ্জন নর্ত্তন সম তব গতি অনুপম,
কি আর তুলনা দিব তার?—
তোমার মধুর কথা, বাণীর বীণায় যথা
বিনির্গত বিনোদ ঝঙ্কার। ২০॥

পান করি' প্রেমাসব যেন এক অভিনব,
অবনীতে উভয়ের বাস,
কি বিচিত্র! সেইকালে. তোমার প্রতিভা জ্বালে,
আমার প্রতিভা পায় নাশ—
যেরূপ যামিনী কর— করে হরে অন্যকর,
উপগ্রহ গ্রহণ সময়;—
অন্তর্হিত সেই তারা, একেবারে, দীপ্তি হারা
বিভাষিত শুধু সুধাময়। ২২॥*

হেন প্রেম মূর্ত্তিমান্, দুই প্রাণে এক প্রাণ,
সে যে ঘোর তন্ত্রের প্রয়োগ,
সেরূপ তন্ময় আর, এজগতে হওয়া ভার,
আত্মায় আত্মায় সুসংযোগ।
নন্দনকানন জাত, অতি সুখময় বাত,
সম্ভোগ করিনু দু'জনায়,
সে প্রণয় স্বর্গপুরে, ভোগ করে যত সুরে,
আনিলাম সে প্রেম ধরায়। ২৩॥

যথা মনোহরতর, শরদ শশীর কর,
সমুজ্জ্বল করে' সমুদয়,
সে রজত প্রভায় (১৪), নিমজ্জিত করিকায়,
অসিত পদার্থ সিত হয়,
সেই রূপে মহাবল, মন্ত্রৌষধে সুকুশল,
ওরে প্রেম অন্তরীক্ষ চয়।
তোর মহামন্ত্রবলে, যে কিছু এ-ধরাতলে
সকলই সমুজ্জ্বল হয়। ২৪॥

তোর ভানুকর ছেদী, কাচের ফলক ভেদী,
দৃষ্ট কি উজ্জ্বল বর্ণচয়।
অতিশয় তুচ্ছতর, পদার্থ নিকরোপর,
রঙ্গ দান করে দীপ্তি ময়।
কিবা হেম, কি লোহিত, সুনীল কপিশ পীত,
হরিতাদি রঙ্গ শোভাময়।
যে কোন দিব্যাঙ্গনা, স্বর্গ হতে সুশোভনা
লোকালোকে রঙ্গ বরিষয়। ২৫॥

(১৩) "হইনু শোভন"—পাঠান্তর।

(১৪) "শুক্লতর সে শোভায়"—পাঠান্তর

* ২১নং স্তবকটি পাওয়া যায় নাই।

যে দিকের প্রতি চাই, সেদিকে দেখিতে পাই,
প্রভার না হয়রে অবধি,
প্রভাম্বিত ভূমিতল' প্রভাম্বিত রণস্থল,
প্রভাম্বিতা হাস্যময়ী নদী,
প্রভায় পবন বহে, প্রভায় গগন দহে,
হীরকের প্রভাপরিকর—
নবকপোতিনা ! (১৫) মোর, প্রোজ্জ্বল নয়নে তোর
প্রজ্জ্বলিত ছিল নিরন্তর। ২৬ ॥

তোর মুখ সুমধুর জিনিয়ে অময় পুর
তথাছিল উজ্জ্বল আকারা;
পাশাপাশি পরস্পর, সন্ধ্যাতারা মনোহর,
সহ প্রভাতের শুকতারা।
যে হেরেছে একবার ভুলিবার সাধ্যকার,
সেই চারু নক্ষত্র যুগল।
কিবা সে চমক তার, চিক্ মিক্ অনিবার,
মদ ভরে করে টল টল। ২৭॥

উড্ডীন বিহঙ্গ কাল, আনন্দের মুক্তামাল,
ছড়াইত দুই পক্ষ থেকে,
বিভাবনা সেই কালে, মহামূল্য মনিমালে,
আমাদের পথ দিতে ঢেকে।
স্বর্ণময়ী যত হোরা, আমাদের কাছে তোরা
ছিলি সব অনুরক্তা দাসী,—
যখন যা হত সাধ, যোগাতিস্ বিনাবাধ,
নিত্য নব রস রাশি রাশি। ২৮ ॥

মর্ত্ত্য প্রেম যে সময়ে, অতিব উন্নত হয়ে,
সর্প পথে করয়ে গমন (১৬)
যেই পথে স্থির বায়ু, হরয়ে তাহার আয়ু
শ্বাসরোধ হয় ক্ষণে ক্ষণ।
যথা পেয়ে পক্ষ নব, প্রাবৃট্ পতঙ্গ সব,
মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়।
যাহাতে প্রভূত হয়, সেই আসি সঞ্চারয়
অচিরাৎ তাহাদের লয়। ২৯॥

হায়, স্বপনের মায়া ! আসন্ন বিপদ ছায়া,
আগে আসি হয়রে উদয়;
স্বপ্ন দেখিলাম আমি— হইয়াছি তটগামী,
নিম্নে নদী অতিবেগে বয়।
রজতের রাশি প্রায়, কত উর্ম্মি বহে তায়
চক্রাকার আবর্ত্ত নিকর,
আমার হৃদয়' পর সেই ক্ষণে শোভাকর
ছিল এক কুসুম সুন্দর। ৩০॥

অতিশয় খরতর, অনিবার্য্য বেগধর,
প্রবাহিত সলিল নিচয়,
যেন তা ! বেগভরে, গমনে সন্ধান করে
বাঞ্ছনীয় শান্তির উদয়।
সেইক্ষণে, আহামরি ! মোরে পরিহার করি,
স্রোতে গিয়ে পড়িল সে ফুল,
মনোজ্ঞ প্রসূন সেই, আমার হৃদয়ে যেই
শোভাদান করিল অতুল। ৩১॥

অচিরাৎ তার পরে, প্রিয়ে ' তব কলেবরে,
হইল রে পীড়ার সঞ্চার,
দিবা বিভাবরী যায়, হইল নির্ব্বাণ প্রায়,
প্রাণরূপ প্রদীপ তোমার,
অবশেষে ওরে প্রাণ ! সে বিপদে পেলে ত্রাণ,
রক্ষা পেলে ঈশ্বর ইচ্ছায়,
কিন্তু হায় ! সুকুমার, প্রেম পুষ্প সুধাধার,
শুকাইয়া গেল কুয়াশায়। ৩২ ॥

পুন যবে হ'ল দেখা, বিরাগের ভাব লেখা,
দেখিলাম তোমার নয়নে,
সুধাধার তবাধরে' এক চুম্বনের তরে
কতই লালসা করি মনে,
কত আকিঞ্চন সহ সাধিলাম অহরহ,
ব্যর্থ হ'ল সাধনা সকল,
ঘৃণাতে ভরিয়ে আঁখি বিরাগ তুষারে মাখি,
ফিরাইলে মুখ শতদল। ৩৩॥

(১৫) পাঠান্তর—"প্রভান্বিত হিয়া মোর', ।
(১৬) "করিল আশ্রয়"—পাঠান্তর (১৭) "হয় হয় হয়"—পাঠান্তর

জ্ঞানহীন একেবারে নিরাশায় ক্ষিপ্তাকারে (১৮)
তোরে ত্যজি' আইলাম চলি',
দয়াবশে সে সময়, বরষিল দেবচয়,
মমপর হিমাশ্রু আবলি।
পূর্ব্বকার ব্যবহার, করিলে লো পরিহার,
না দিলে বসিতে একবার,
ক্ষেপে উঠি সেইক্ষণে, যখন পড়য়ে মনে,
'এসো' বাক্য না বলিলে আর।৩৪॥

ভাবিলাম ওরে প্রাণ! করিয়াছ অভিমান,
পারিতিতে হেনরীতি আছে,
এত যবে তব রোষ, অজানত কোন দোষ
করিয়া থাকিব তোর কাছে!
কিন্তু পরে হ'ল বোধ, দোষজন্য নহে ক্রোধ
কালক্রমে গত সেই ভ্রম,
শেষে জানিলাম স্থির, মমপতি বিরতির,
ছিল কোন হেতু গূঢ়তম। ৩৫ ॥

অতিশয় ব্যগ্র হয়ে, চাহিলাম সবিনয়ে,
দরশন ক্ষণেকের তরে,
না করিয়ে শ্রুতিপাত, করিলে-লো পদাঘাত,
সে সকল বিনয়-উপরে।
বিরাগেতে গরগর দিয়াছিলে যে উত্তর,
অল্পাক্ষর বটে সে উত্তর।
কিন্তু খর তরবার সম তার তীক্ষ্ণধার
হৃদয় ছেদনে পটুতর। ৩৬ ॥

হেন চারু দেহে তোর, হেন হৃদি সুকঠোর,
নিবসতি পাইল কেমনে?
অসম্ভব অতিশয়, প্রকৃতির বিপর্য্যয়
অবশ্যই মানিব লো মনে!
যেন দ্রব হেমময়, কোষের ভিতরে রয়,
লৌহখণ্ড সুকঠিনতর,
হীরা বটে দীপ্তিময়, কিন্তু আর কিছু নয়,
লোকে তারে কহেলো প্রস্তর। ৩৭ ॥

প্রেমপুষ্প যে সময় নব বিকসতি হয়,
সেকালের তব লিপিচয়,
অতিশয় করি যত্ন, পূর্ব্ব অভিজ্ঞান রত্ন,
রাখিয়াছি সেই সমুদয়।
এবে আমি যেইক্ষণ, করি তাহা অধ্যয়ন
প্রতি বাক্যে আজো এত জোর(১৯)
নিবারিতে নাহি পারি, অতিবেগে অশ্রুবারি
প্রবাহ নয়নে বহে মোর(২০)।৩৮॥

তোর ক্রূর করাঙ্গুলি, লিখিল কি কথাগুলি,
আদরের ধন যারা (২১) মোর!
কহ,—এই কথা সব, হয়েছিল কি প্রসব,
নির্দয় হৃদয় থেকে তোর?
মোহনীয় মন্ত্রপ্রায়, প্রতি বাক্যে হায়, হায়—
এখনো অনঙ্গ (২২) দীপ্তি পায়,—
যেন কোন সুসেবিত, অতিথি হইয়ে প্রীত,
অনিচ্ছুক লইতে বিদায়। ৩৯ ॥

তারপর পরিগত, দিবস সপ্তাহ কত
আইল যাইল কত মাস,
কিন্তু আজো সমাকারে, রাখিয়াছ আপনারে—
ঢেকে রেখে দিয়ে—মানবাস।
বিলাপেতে অনিবার শুকাইল প্রানামার
মৃত্যু মাত্র রহিয়াছে বাকি,
জীবিত থাকিতে দারা, আমি যেন পত্নীহারা
সম হয়ে রয়েছি একাকী! ৪০ ॥

যথা উচ্চ তরুবর অভ্যন্তরে নিরন্তর,
সুপ্তভাবে থাকি হুতাশন,
অকস্মাৎ বহির্গত, হয়ে কালানল যত
কাননেরে করায় দাহন,
সেইরূপ অবিকল, অলক্ষে বিরহানল,
ভস্মসাৎ করিয়ে আমায়,
এখন হইয়ে ঘোর, হৃদয় কাননে মোর,
দাহন করিছে উভরায়। ৪১ ॥

(১৮) "ক্রোধে ক্ষোভে নিরাশায়,
একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায়"—পাঠান্তর।

(১৯) "মনেহয়"—পাঠান্তর।
(২০) 'সদা রয়'—পাঠান্তর
(২১) 'অতি'—পাঠান্তর (২২) 'প্রণয়'—পাঠান্তর

এই কথা লোকে কয়, কারণ পাইলে লয়,
সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যলোপ পায়,
কিন্তু এটি চমৎকার, কেন এই কথা আর,
প্রেম পরিচ্ছেদে না জুয়ায়।
দেখলো প্রমাণ তার তব বিরহে আমার
ক্রমে আরো বাড়িছে বেদনা,
আমার আত্মায় পশি, জড়াইয়ে কসি'কসি'
চূর্ণ করে ভুজঙ্গী শোচনা। ৪২ ॥

মানুষের আন্তরিক (২৩) ভাবচয় হয় ঠিক,
কাচে ভুগ্ন ভাস্করর সম,
কাছে উপস্থিত যবে তথায় বিস্তরে তবে
নিজ নানারঙ্গ নিরুপম,
একি ঘোর নিরাশ্বাস, হৃদে হায় পরকাশ
যেন মায়াবীর মায়া ধর,
দীপ্তদিবা দ্বিপ্রহরে, সমুদয় দীপ্তি হরে
করে দেয় ঘোর বিভাবরী। ৪৩ ॥

তমোপূর্ণ ধরাতল, তমোময় নভস্থল,
তিমিরেতে পূর্ণ সমীরণ,
তমোপূর্ণ মাঠঘাট, তিমিরেতে পূর্ণবাট,
তমোপূর্ণ মম নিকেতন,
তমোপূর্ণ দিনকর, তমোপূর্ণ সুধাকর,
তমোপূর্ণ চারু তারাদলে,
সমাধির অভ্যন্তরে, যেই তমঃ বাস করে
তাহা মোর হৃদয় কমলে। ৪৪ ॥

যদিও আপন পণ করিয়াছ উল্লঙ্ঘন,
ভাঙ্গিয়াছ নিজ সত্যব্রত,
যদিও আমার প্রতি, এতেক বিরাগবতী,
নিদয়া কঠিনা অবিরত,
যদিও শশীর মত, নিত্য তব ভিন্ন মত
এক ভাবান্বিতা তুমি নহ,
কিন্তু আমি লো তোমার সন্ধ্যাপ্রতি হিমাকর
এক ভাবে আছি অহরহ। ৪৫ ॥

হায়! কোথা এবে আর, সেই সব অঙ্গীকার,
সুসময়ে কৃত দুজনার?
হায়! কোথা সেই সব, অটল প্রতিজ্ঞা তব
করেছিলে ব্যক্ত কতবার?
হায়! কোথা সে সকল, তব পণ অবিচল,
লঙ্ঘিলে যা এবে অনায়াসে?
হায়! কোথা সে প্রণয়, সর্ব্বজয়ী যেই হয়,
পরাজিত হল তব পাশে? ৪৬ ॥

হায়! তোরা কোথা গেলি? হায়রে কে দিল ফেলি,
তোদিগে উপেক্ষা সমীরণে,
তবু নাহি মানে মন, এখনোরে প্রাণধন,
কেন তোরে ধ্যায় অনুক্ষণে?
যথা সেই শূন্য থেকে কুলিশ পড়িয়া ঝেঁকে
মহীরুহে করিলে দারণ,
তবু সেই শূন্য পানে রহে স্থাণু একধ্যানে
নিজ শির করি উত্তোলন। ৪৭ ॥

আমারে লো প্রিয়ে হায়! নিজ প্রাণ বায়ু প্রায়
ভাবিতে বলিতে শতবার।
আমার বামেতে বসি, সোহাগ রসিতে রসি
প্রাণাধিক বলিতে তোমার।
এখন বুঝিনু ফন্দী সে সকল অভিসন্ধি
নিমন্ত্রতে আমার মরণ,
হায়! মম মৃত্যু নয়, করিতেছ সুনিশ্চয়,
আপনারি আত্মার ঘাতন! ৪৮ ॥

হর হর অভিমান ওলো ও পাষাণি প্রাণ
হও হও দ্রব লো প্রেয়সি!
প্রণয়ের স্রোতজলে আবার যাহলো গলে
মম শুষ্ক হৃদি দেহ রসি,
কর পুনঃ সুকোমল, আপন হৃদয় স্থল,
মম শির বিশ্রামের স্থান,
হয় দেবী অধিষ্ঠাত্রী, হও পুনঃ, দয়াদাত্রী
হও পুনঃ পূর্ব্বের সমান। ৪৯ ॥

(২৩) পাঠান্তর—"বুঝি তব আন্তরিক"

আর মোর নাহি সয় এ ঘোর যাতনা চয়,
অধৈর্য্য বাতুলের প্রায,
হইল অনেক কাল, ঘেরিয়াছে মৃত্যুকাল
তবু প্রাণ নাহি বাহিরায় !
এসলো, প্রেয়সী মোর ! এখনো যদ্যপি তোর,
হৃদে থাকে দয়ার সঞ্চার,
জীবন নিধনকর, মারি এক দৃষ্টিশর
প্রাণবায়ু হর লো আমার। ৫০ ॥

যদিও তোমার মূর্ত্তি, নয়নে না পায় স্ফূর্ত্তি
কিন্তু সদা মনে বিদ্যমান,
চারিদিকে যেন হেরি, আকাশে রয়েছে ঘেরি,
মন্ত্রে বিমোহিত এক প্রাণ।—
প্রকৃতি আপন মুখে, তোমার প্রতিমা সুখে,
ধারণ করিছে প্রাণ প্রিয়ে !
অতি প্রিয়তম, মম, এহেন বিষম ভ্রম,
অনিবার দেয় বাড়াইয়ে। ৫১ ॥

যামিনীর অধিপতি, কিম্বা তারা জ্যোতিষ্মতী
আমি ত নাকর দরশন,
কি ধরায়, কি আকাশে যত শোভা পরকাশে
কিছুই না হেরে লো নয়ন।
ফলতঃ নিরখি হেন, ক্ষুদ্র এক চক্রে যেন,
সমাবেশ হইয়া সকল,
তব অনির্ব্বচনীয়, রূপরাশি কমনীয়,
পাইতেছে শোভা সমুজ্জ্বল ! ৫২ ॥

সুরভির নিকেতন মলয়জ সমীরণ
তোরে লয়ে তাহার বড়াই,
প্রত্যেক হিল্লোলে তার, চারুগন্ধ সুধাধার,
তোর নিশ্বাসের ঘ্রান পাই।
মধুকর গুঞ্জরণ পূর্ণ প্রীতি কুঞ্জবন,
কিবা তরু পুঞ্জ গীতি ময়,
যেন বিহঙ্গের স্বর তরঙ্গ মধুরতর
তোমারি সুস্বর বিতরয়। ৫৩ ॥

ওলো কপোতীনি মোর ! মোহন মূরতি তোর,
মনো নেত্রে হেরি নিরন্তর,
আজো করি অনুভব, তব মৃদুমন্দ রব,
ধ্বনিত আমার বক্ষোপর,
যেই রব সুধাময়, প্রকটিতে সে সময়,
কৃতার্থ যখন প্রেমসুখে,
সোহাগেতে দ্রব হয়ে সময় যাইত বয়ে
দোঁহে থাকিতাম মুখে মুখে। ৫৪ ॥

অন্তাপিরে প্রাণধন ! তোরে করি দরশন
যেন সন্ধ্যা তারা মনোহর,
এক একবার প্রিয়ে, বাতায়নে দেখা দিয়ে
প্রকাশিছ শ্রীমুখ সুন্দর,
যেইরূপ ভাবধরি, পূর্ব্বে তুমি প্রাণেশ্বরী,
থাকিতে লো নাথ প্রতীক্ষায়
সে নাথের পদ আর, সঞ্চারিত পুনর্ব্বার
না হইতে পারে বা তথায়। ৫৫ ॥

দেখিতেছি এইক্ষণে, বসিয়াছ চন্দ্রাননে,
শ্রান্তিকর এই দ্বিপ্রহরে,
একাকিনী মৌনাকারে, অপঠিত চারিধারে,
পড়ি' আছে পুস্তক নিকরে ;
যথা সীতা সুরূপসী, শোকেতে ছিলেন বসি,
কারাগারে অশোকের বনে,
কিম্বা অবিকল স্থির, শ্বেতোপল মূরতির
পলক স্থগিত দুনয়নে। ৫৬ ॥

আরো যেন প্রাণ তুমি, লুটিয়ে পড়েছ ভূমি
শীর্ণ হয়ে যেতেছ শুকিয়ে,
যথা প্রস্ফুটন কালে কবলিত কীটজালে
শোভাশূন্য পুষ্প প্রাণ প্রিয়ে।
এত দুঃখ তবান্তরে, তথাপি লো নাহি সরে,
সেই কথা তোমায় বদনে,
যে কথাটি তবদাসে, অবিলম্বে তব পাশে
আনিবেক সংশয় বিহনে। ৫৭ ॥

আর করি দরশন, শিহরিছ প্রাণধন।
যেন দেখি আপনার ছায়া।
আবার ঈক্ষণ করি, অনিদ্রায় শয্যোপরি,
ছট্ ফট্ করে তব কায়া।
অই কি নিশ্বাস ঘোর, হৃদয় হইতে তোর
বিনর্গত হইলরে প্রাণ,
অই কিলো সুলোচনা! অশ্রু সলিলের কনা,
তোমার নয়নে বিদ্যমান। ৫৮ ॥

এই যাই, যাই আমি, হয়ে অতি দ্রুতগামী,
অনুরক্ত প্রেমিক বিহিত,
শীতল করিতে তব, দুঃখের তরঙ্গ সব,
যাহা তোর হৃদে সমুত্থিত।
যাই চুম্বনেতে কান্তে! তোমার নয়নো পান্তে,
অশ্রুবিন্দু করিবারে দুর
কিন্তু মরি হায়! হায়! ভেবে বুক ফেটে যায়,
তুমি কোথা, আমি কোথা বিধুর। ৫৯ ॥

দুর দুর রে সকল, বিফল স্বপ্নের দল
সারহীন মিথ্যা দৃষ্টিছায়া,
হও হও দূরীভূত, কল্পনায় আবির্ভূত
ওরে মরীচিকা মিথ্যা মায়া,
একে ভ্রান্তি ভরে ঘোর, মাতায়েছ মতি মোর
তুমি ফের বঞ্চহ আমায়
দেখাইয়ে প্রীতিকর, নানাদৃশ্য মনোহর,
হায় তারা কোথা শেষে যায়! ৬০ ॥

হায় স্মৃতি ভয়ঙ্করী, ডাকিনীর বেশ ধরি',
হৃদয়েতে হইয়ে উদয়,
ভোজরাজী ছায়া মত, মনের কল্পনা যত,
একে একে করিল বিলয়।
অপসৃত করি ভ্রম, সরাইল সে বিষম
ক্ষিপ্তবৎ বিহ্বল স্বপন,
পরে দিল পরিচয়, আমি আর কেহ নয়,
সেই পরিত্যক্ত অভাজন। ৬১ ॥

ছাড়িয়ে রঙ্গিল তন্ত্র. সেইস্থানে রাখ যন্ত্র,
মিলে যথা প্রতিভা সংকাশ।
পরিপূর্ণ নিষ্কপতা, স্বীয় শিল্প কুশলতা
সত্য আসি করুন প্রকাশ।
অহো অপরূপ একি! মোরে সুখময়ী দেখি
মাতিয়াছ আমোদ আহ্লাদে।
নাহি জান দোষ লেশ যেন নির্দ্দোষীর শেষ
কারো মনে ভাঙ্গনি বিষাদে। ৬২ ॥

নিকুঞ্জের প্রীতি কর, প্রমোদিতে পক্ষীবর
সম তুমি মেতেছ প্রমোদে,
হাব ভাব লীলা হেলা— সহ মনোমত খেলা
খেলিতেছ বিবিধ বিনোদে।
যথা ভস্মীভূত হয়ে অভিনব তনুলয়ে
সমুত্থিত বিহঙ্গ বিশেষ,
পূর্ব্ব প্রেম ভস্ম থেকে, নব অনুরাগ একে,
উঠাইছ সুখী হতে শেষ। ৬৩ ॥

হওলো হওলো সুখী, তার সহ বিধুমুখী,
যাঁরে মন সঁপেছ এখন,
নবপ্রেম শস্য রাশি, আনন্দ রসেতে ভাসি,
সংগ্রহ করহ প্রাণধন।
কখনো কিরূপ রঙ্গে ভালবাসা মম সঙ্গে
ছিল ইহা হওল বিস্মৃত।
পূর্ব্বকথা পূর্ব্ব রতি, কর ওলো রসবতি।
ভোগবতী জলে নিমজ্জিত। ৬৪ ॥

তথাপি সমুদ্র সম, সীমাহীন প্রেম মম
তব প্রতি জান ইহা স্থির;
ফেলহ গুলন সূত্র তল নাহি পাবে কুত্র
অতল, অস্পর্শ, সুগভীর।
তবসনে সুবিচ্ছেদ হাজার হউক ভেদ
তবু আমি তোমারি নিশ্চয়,
সুদূর গগনে বসি সমুদিত বটে শশী,
কিন্তু সিন্ধু হেরি ফুল্ল হয়। ৬৫ ॥

আয়স্কান্তের প্রতি, চুম্বকের যথা গতি,
এক ভাবে সেই দিকে ধায়,
অথবা যখন রবি, যেখানে প্রকাশে ছবি,
রাধাপদ্ম সেই দিকে চায়।
তারো চেয়ে রসবতী এক ভাবে তব প্রতি,
অবিরত আছে মম মন,
হায়! সেই একভাব, না হইবে তিরোভাব,
যদবধি রহিবে জীবন। ৬৬॥

যদ্যপি একের প্রতি, সমর্পিলে রতি মতি,
তারে কর অচলা ভকতি,
তবে প্রিয়ে সুনিশ্চয়, আমারি সে ভক্তি হয়,
অবশ্যই আমারই সে রতি।
যেহেতু লো চন্দ্রাননে, নিরবধি মম মনে,
জাগরূক একমাত্র দেবী,
তাঁহাকেই যথাশক্তি, আরাধি সহিত ভক্তি
তুমি সেই, তোমারেই সেবি। ৬৭॥

সে ভক্তির অর্দ্ধভাগে, যদি পূজিতাম আগে
আপনার ইষ্ট দেবতায়,
যেই নিষ্ঠা সহকারে, সাধিয়াছি লো তোমারে,
সাধিতাম অর্দ্ধভাগে তাঁয়,
তবে এতদিনে মম, মুনিত্ব পবিত্রতম
সংগ্রহ হইত অসংশয়,
যে পথ কণ্ঠকময়, মোর ভাগ্যে কভু হয়?
পাইতাম তাহা অসংশয়। ৬৮॥

আছে বটে সমুজ্জ্বল, কত কত নেত্র দল,
স্নেহ প্রেম হাস্যের সে ভোর,
আছে বটে মধুময়, অধর অমৃতাশয়
সে অমৃত করায়ত্ত মোর,
কিন্তু সে সকলে প্রাণ! প্রেমহারা সম প্রাণ,
কোনরূপে সুখ নাহি পায়,
পেয়ে এত তিরস্কার ভাবান্তর নাহি তার
আকর্ষিয়ে আছেলো তোমায়। ৬৯॥

হায় হায় কি অদ্ভুত, নিকর নয়ন যুত,
হন সেই প্রণয় দেবতা;
পদ সঞ্চরণে আমি, হই যেই পথগামী,
যেই দিকে ফিরাই ভ্রূলতা'
কিবা লোকারণ্য ময়, নগরীর রথ্যাচয়
কিবা হর্ম্ম, কিবা কুঞ্জবনে,
নক্ষত্রের নিভ সাজে সজ্জিত কুহেলী মাঝে
দেখি যেন তব চন্দ্রাননে, ॥৭০॥

সেই মুখ পূর্ণ শশী, থেকে থেকে হে রূপসী
নিশিতে বিশোধ দেয় দেখা, (২৪)
আর সখি সেই ক্ষণ করি আমি দরশন
সমুদিত দুই শশী লেখা (২৫)
শূন্যে এক সুধাকর অন্য মম বক্ষোপর
একি ভ্রান্তি দৃষ্টি কহরে আমারে।
যেই সেই ব্যঙ্গরত, মুখ ভঙ্গি কতমত,
করে মানসিক নেত্র চিন্তাগারে। ৭১॥

তব আত্মা রাজা প্রায়, অনুগত প্রজা তায়,
মম মনোগত ভাবগণ,
যেন তারা অনু দিন, দুর্জ্ঞেয় কারণাধীন,
তোরে ঘেরি ঘোরে ঘন ঘন।
ঘুরিতেছে অবিশ্রান্ত, শ্রান্তি ভারে ভারাক্রান্ত
ঘূর্ণমান প্রতিক্ষণ সহ,
যথা সব গ্রহগণ, বেড়ি বেড়ি বিবর্ত্তন,
ভ্রমন করিছে অহরহ। ৭২॥

প্রেয়সি! স্মরণ কর, যে মন মুকুরোপর
তব মোহনীয় মূর্ত্তিছায়া,
পতিত হয়েছে প্রাণ! সেই স্থানে বিদ্যমান,
রহিবেক নিত্যচিত্র প্রায়া।
সে ত আর কিছু নয়, কাচের স্বরূপ হয়
ভঙ্গুর ভঙ্গিতে পারে শেষে,
গুরুতর চিন্তাভার, রক্ষিত উপরে তার
চুরমার হবে লো বিশেষে। ৭৩॥

---

(২৪) পাঠান্তর—'বিরহে নেত্রপর'
(২৫) পাঠান্তর—শশধর।

হৃদয়েতে সমুদ্গত, হয়ে থাকে ভাব যত
প্রেম তাহে কি বিচিত্রতম !
অনুরাগ চন্দ্রমার, ইহা পূর্ণ কলা সার
দেখ দেখি এর পরাক্রম।
যে নরক তলাতলে যে স্বর্গ সর্ব্বোচ্চস্থলে.
সে দুয়ে মিলায় এক স্থলে
ছুঁয়াহয়ে নিজানল, করে দেয় সমুজ্জ্বল,
যে জনের হৃদয়—মণ্ডলে।৭৪॥

লহ আকর্ষিয়ে সব, মোহনীয় মন্ত্র তব,
যাহে ছাইয়াছে মম প্রাণ
যে মায়া শৃঙ্খল দিয়ে, রেখেছ তারে বাঁধিয়ে
ভাঙ্গ তারে করি খান খান।
বিষম যাতনাময় সেই ত বন্ধন চয়
আমি কেন পড়িব একাকী ?
সে সময়ে স্বাধীন, হইয়ে নিগড় হীন
স্বচ্ছন্দে আছহ দিয়ে ফাঁকি ॥৭৮॥

সেই স্বর্গে অবস্থান, ছিল মম যবে প্রাণ,
সদয়া ছিলে লো মম প্রতি,
নরক যাতনা ঘোর, দেখ হায় হায় মোর,
ভোগ সার হয়েছে সম্প্রতি।
আহা আমি এইক্ষণ; করিতেছি নিরক্ষণ,
আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ,
আমার নহেক আর, দাসবৎ ব্যবহার
করে মম শত্রুর সদন ॥৭৫॥

সলিলে অঙ্কিত রেখা, কিবা তাহা শূণ্যে লেখা
সেই রূপ পূর্ব্ব প্রেম-কথা
তব চিত্ত পরিহরি হায় অতি ত্বরা ত্বরি,
লোপ পেয়ে গিয়েছে সর্ব্বথা।
কিন্তু মম চিত্ত পটে, সে সকল সুপ্রকটে,
অক্ষয় অক্ষর রূপ ধরি,
তাম্রের ফলকোপর, যথা সুগভীর তর
বিখোদিত শাসন সুন্দরী ! ৭৯॥

মনে মানি সুসম্ভব, এই ভাবান্তর তব,
কেবল ছলনা অনুসরি,
বুঝিবারে মম মন, মম সত্য, মম পণ,
পরীক্ষা করিছ প্রাণেশ্বরী।
কিন্তু হায় একবার, ভেবে দেখ প্রাণামার,
বিরহ শুষিছে রক্ত মম,
আমার সংহার তরে, করাল কবন্ধ বরে,
পাঠায়ে দিয়েছে কিবা যম। ৭৬॥

হে অমৃতপরা প্রিয়ে ! নিজ মন ফিরে নিয়ে
ফিরে দেহ হৃদয় আমার ;
ফিরে দেহ মম মন, দিয়াছিলে যে চুম্বন,
সব ফিরে লহ পুনর্ব্বার।
বিচ্ছেদে বিভিন্নাকার বিজনে বসতি সার,
ইহাই যদ্যপি সমুচিত,
শুনরে হৃদয়, হায় ! তবে ফিরে আয়, আয়
তিতিক্ষায় মজ ওরে চিত্ত। ৮০॥

সুখের সময়ে প্রাণ ! সদা মম সন্নিধান
এই কথা কহিতে সুন্দরি !
তব সহবাসে মম, বোধ হয় স্বর্গোপম,
ঘোর অরণ্যানী ভয়ঙ্করী।
কিন্তু যবে প্রত্যাহার, কর প্রেম আপনার,
তার সাক্ষী সেই মন্ত্রবল,
এখন লো এই ভব, করি আমি অনুভব,
ভয়াল সাহারা মরুস্থল। ৭৭॥

হায় ! হায় ! যথাগত প্রলাপ বা বকি কত
বল তাহে কিবা উপকার ?
যদি আমি এইক্ষণে, পুন পাই সেই মনে,
হারায়েছি যারে একবার—
সেই মন হতজ্ঞান, আছে অনুকম্পবান,
ধড় ফড় তব মন তরে,
রাখ রাখ তুমি তায়, কিন্তু ফিরে দেহ হায় !
সুপবিত্র চুম্বন নিকরে। ৮১॥

হয়ত যখন আমি হব পরলোকগামী,
তাপিতা হইবে সে সময়ে,
জীবিত নারিল যাহা, মৃত সাধিবেক তাহা,
গলে ধরি কাঁদিবে নিদয়ে।
হয়তো সুকঠোর অনন্ত হৃদয় তোর,
নমিত হইবে সে সময়ে,
আগে-অনুভূত-নয়, যে মর্ম্ম বেদনাচয়,
তখন জানিবে সমুদয়। ৮২।।

আর কাজ নাই ওরে, রুদ্ধমানা বীণা তোরে
এইস্থানে কররে শয়ন,
সুষুপ্তি সম্ভোগ কর, কিছু কাল তব স্বর,
স্তব্ধ ভাবে করুক যাপন;
যেই কর, রে তোমার, চালনা করিত তার,
আর নাহি চলে সেই কর,
এই পণ্য আর্ত্তস্বর জাগাইল যে অন্তর
এখন স্তম্ভিত সে অন্তর। ৮৩।।

হোক্ হোক্ আহা! আহা! মম ভাগ্যে আছে যাহা
তোরে ও বিদায় দিই প্রাণ;
মঙ্গল হৌক তোর, যদি অতি সুকঠোর,
হয় তোর হৃদয় পাষাণ,
কভু যেন মন তব, নাহি করে অনুভব,
নিরাশ্বাস জনিত বেদনা,
যেন নাহি হয় জ্ঞাত, ক্ষোভে চূর্ণ মনো সাধ,
অন্যতম নরক যাতনা। ৮৪।।

বিদায় বিদায় প্রাণ! যদবধি দীপ্তিমান,
প্রাণদীপে রবে শিখাশেষ,
তদবধি প্রাণেশ্বরী! একান্ত প্রার্থনা করি,
নাহি পাও কোন রূপ ক্লেশ (২৬)।
শেষ শ্বাসবায়ু যবে, আমার বাহির হবে,
বহিবে বিদায়ী অশ্রুকণা,
সেক্ষণেও তোর তরে সুখহেতু সর্ব্বান্তরে,
বিভু স্থানে করিব প্রার্থনা। ৮৫।।

স্বপ্নাবেশে দেশ ভ্রমণ

একদা স্বপনে এই হয় দরশন,
পদ্মা প্রবাহেতে যেন করিতে ভ্রমণ,
বিচিত্র বারেন্দ্র ভূমে কার বিলোকন,
নিকটে উদয় আসি মূর্ত্তি বিমোহন।

*

সুধীর গম্ভীর ভাব পুরুষ প্রাচীন,
মম প্রতি জ্ঞান কথা কন সমীচীন।
কিবা স্মৃতি শ্রুতি স্মৃতি কণ্ঠের অধীন,
কিবা ধৃতি শান্তি যেন নয়নে আসীন।

*

মমসহচরগণ না দেখে তাঁহারে,
পদ্মার তরঙ্গ রঙ্গ সভয়ে নেহারে।
তাঁর উপদেশে মম উদিত উৎসাহ,
হৃদয় কন্দরে বহে আনন্দ প্রবাহ।

*

মহাযোগী মনু বাক্য বজ্রগ্রন্থী সম,
কিবা জনস্থানস্থিত কানন দুর্গম।
সেই গ্রন্থী মোচন করেন অবহেলে,
তাঁর গুনে সে দুর্গম বনে পথ মেলে।

তাঁহার কৃপায় জানি এই তত্ত্বসার,
কিবা ছিল আর্য্য ভূমে পূর্ব্ব ব্যবহার।
দেশে দেশে নিগদিত তাঁর গুণগ্রাম,
ভুবনে ভরিল শ্রীকুল্লুক ভট্টনাম।

*

তথা হইতে আইলাম কাটয়া প্রদেশে;
তথায় জাহ্নবী বটে উল্লাসিত বেশে।
চরে চরে, চরে নানা বিহঙ্গ বিকলী;
শ্রবণ মোহিত করে কলিত কাকলী।

*

সে কল কলন মম মনে নাহি ধরে;
সে স্বরে কি সুধা ক্ষরে শ্রবণ বিবরে?
তার চেয়ে মিষ্টতান বাজিল শ্রবণে,
যে তানে জগত মুগ্ধ একতান মনে।

*

দেখিলাম একদ্বিজ মত্ত চিত্ত গানে,
উপনীত নারায়ণ ক্ষেত্র সন্নিধানে:
মুখে "জয় জগদীশ হরে" অবিশ্রাম।
শুনিলাম কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর ধাম।

(২৬) গিরীন্দ্রমোহিনীর অনুলিপিতে এ পঙ্ক্তিটি নেই

মূর্ত্তিমতী করে দ্বিজ রাগিণী নিকরে ;
মুঞ্জরে নীরস তবু মধুর সুস্বরে—
ভৈরবী, বাসন্তী বেলাবলী, মধুমালী,
কল্যাণী, গুর্জ্জরী পট্ট মঞ্জরী, রঙ্গিণী।
*
এমন মধুর গাথা আর নাহি হবে।
কে বলে ধরায় নাহি অমৃত সম্ভবে ?
শব্দসিন্ধু ভাবসিন্ধু করিয়া মন্থন,
শ্রীগীতগোবিন্দ সুধা করিল গ্রন্থন।
*
কি-ছার লবঙ্গলতা, সুধীর সমীর।
কি ছার কোকিল কল নির্ঝরের নীর।
এ হেন ললিত, হেন কোমলতা যার,
হেন সুমধুর, হেন বিকল কি আর ?
*
ধন্য পদ্মাবতী ‡ সতী, ধন্য পতি তব,
জগৎ ব্যাপিল যার সুরচ গৌরব।
জয় জয়দেব তব কবিত্ব অতুল,
বাঙ্গালার কীর্ত্তি কল্পলতিকার মূল।
*
তরল তরঙ্গীগঙ্গা প্রাবৃট-প্রভাবে,
ঢল ঢল ঢল অঙ্গ যবে ঢল নাবে ;
প্রবল প্রবাহ বেগে ধায় ত্বরা ত্বরি
নদীয়ার ঘাটে আসি উপনীত তরী।
*
সহচর গণ উঠে করে নিরীক্ষণ,
বুদ্ররায় প্রতিষ্ঠিত বুদ্র পুরাতন,
কাংস্যকার গৃহে কামধেনু পরিপাটী,
শিবালয় শ্রেণী, প্রমুদিত পুষ্পবাটী।
*
আমি ত সে সব কিছু দেখিতে না পাই ;
অন্য জন মানবের সঙ্গে দেখা নাই।
দেখিলাম দ্বিজত্রয় মহামহাশয়।
একে একে তাঁহাদের শুন পরিচয়।

প্রথমে প্রসিদ্ধ প্রমা, খ্যাত শিরোমণি,
গোতমীয় জ্ঞান গরিমায় রত্নখনি।
বিজ্ঞান-কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ প্রকাশি,
রাখিলেক নিত্য প্রতিষ্ঠিত যশোরাশি।
*
শিশুকাল হত্যে তাঁর বুদ্ধি সুপ্রখর*
অঙ্কুরেতে পরিচয় দেয় তরুবর।
মিথিলায় প্রবসতি বিদ্যালাভ হেতু ;
সর্ব্বোপরি আসন লভিল যশঃ কেতু।†
*
দ্বিতীয় দ্বিজেন্দ্র ধরে জগদীশ নাম ;
বৈশেষিকে বিশেষ প্রবুদ্ধ গুণধাম।
শ্রীসিদ্ধান্ত মুক্তাকবি সন্দর্ভ সিন্দূরে
মাজিয়ে মালিন্য ভিন্ন করিলেক দূরে।
*
অক্ষপাদে কনাদে তাঁহার তুল্য নাই,
কতই গভীর বুদ্ধি ভাবিতে না পাই।
অনুমান, উপমান, শব্দের সন্ধান—
পদে পদে প্রমাণের অকাট্য বন্ধান।
*
কিসে দুঃখ, কিসে জন্ম, প্রবৃত্তি বা কিসে,
কিসেই বা দোষ আর মিথ্যা জ্ঞান দিশে,
পর পর কিসে এই সব পায় নাশ,
দ্বিতীয় সূত্রের অর্থে করিল প্রকাশ।
*
তৃতীয় ব্রাহ্মণ যোগী বয়সে কিশোর,
কটিতটে কর্ব্বূর কৌপীন বেড়া ডোর,
কষিত কনক কান্তি প্রেমরসে ভোর,
শিহরিত তনু রুচি কদম্বের কোর।

* টীকা : প্রবন্ধ আছে শিশুকালে শিরোমণি একদা এক চতুষ্পাঠীতে অগ্নি আনয়নার্থ গিয়াছিলেন। আধার লইয়া না আসাতে অধ্যাপক ব্যঙ্গ করাতে প্রামাণিক শিশু তৎক্ষণাৎ অঞ্জলিবদ্ধ করপ্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন—"অগ্নিদেউন"। ব্যঙ্গকারী শিশুর প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন

† ইয়ুরোপীয় নিয়মে ছাত্রদিগের আসন উন্নতি অবনতি ব্যাপার এদেশে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল।

‡ জয়দেবের বনিতা

শিশুকালে সংসার বিরাগী সর্ব্বত্যাগী
পরিণামে শুদ্ধ হরিনামে অনুরাগী ;
অহিংসা পরমধর্ম্ম, প্রেমমাত্র সার,
দেশে দেশে এই তত্ত্ব করিল প্রচার,

সংসারের দুঃখ দেখি অন্তরেতে দহে,
নয়নেতে করুণার অশ্রু-নদী বহে।
হায় প্রেমদেবে অন্ধ দেশ ভেদে কহে,
চৈতন্য চৈতন্য-হীন প্রলয় প্রমোহে॥

বিচিত্র স্বপ্নের ক্রিয়া হেরি অনন্তর,
সহসা সে ভাব পুনঃ হইল অন্তর।
যেন ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া উদয়,
পুণ্যতীর্থ যথা সপ্ত ঋষির নিলয়।

যেন কোন মহাযোগে হইয়াছে মেলা,
আসিয়াছে কত সাধু সঙ্গে লয়ে চেলা ;
স্নান দান পূজা হোম কর্ম্মকাণ্ড খেলা,
কলবর স্থির ভাব নহে এক বেলা।

দেখিলাম কতশত পণ্ডিত ধীমান,
কিবা দেবঋষিগণ আসি মূর্ত্তিমান।
কথায় কথায় কত যুক্তির লহরী,
রসহীন তর্কনদী রসে যায় ভরি।

দেখিলাম একধারে বসি ধরাসনে
ধীরদ্বয় মগ্ন, বাক্য শাস্ত্র-আলাপনে।
কভু হাসে, কভু কাঁদে স্বভাবের বশে ;
শ্রোতৃগণ অভিষিক্ত নব নব রসে।

একের মোহন ভাব বর্ণিব কি আর।
কবিত্ব ছটায় হরে মানসান্ধকার।
অষ্টাদশ ভাষায় ভাস্বর ভূরি জ্ঞান,
চন্দ্রকলা প্রভাবতী জনক ধীমান্।

করেতে করিয়া এক বিমল দর্পণ
যাহার নয়ন পথে করেন অর্পণ,
সে হেরে অদ্ভুত অতি তাহার ভিতরে
মানুষিক মানসিক ভাব স্তরে স্তরে।

অপূর্ব কুহকী এই মায়িক প্রধান।
স্পষ্ট পরিচয় কিছু না করে প্রদান।
মহামন্ত্রী গদাধারী পুরুষাকৃতে,
কোথায় নিবাস কিছু না কহেন ভ্রমে।

কেবা সেই মহাদেব উমা নাম যাঁর,
কেবা সেই ভাতৃদেব বল্লভ তাঁহার ?
নিজনামে কবিরাজ উপাধি সংযুত,
নাহি জানি বৈদ্য কিম্বা ব্রাহ্মণের সুত।

দ্বিতীয় সুধীর বৈদ্য দলের তিলক,
খুলিয়াছে নানা শাস্ত্র-কবাট-কীলক।
ব্যাকরণ কাব্য অভিধানে গুণগ্রাম,
ভরত মল্লিক নাম, পিণ্ডিরায় ধাম।

এইরূপ কতরূপ-রূপ গুণধর,
মেলাতে মিলিত যেন অমর নিকর।
প্রশান্ত বদনভঙ্গী, প্রশস্ত ললাট,
বাক্য বন্ধে গৌড়ীয়, বৈদর্ভী, ছেক, লাট।

পুনরায় সেই ভাব পাইল বিলয়,
হেরি যেন কলিকাতা কমল আলয় ;
বিপুল বিনোদ বহু সৌধ সারি সারি ;
গণনায় স্থির নহে কত নরনারী।

অগণিত নদী উপনদীর সমান,
নানাদিকে পথপুঞ্জ করিছে প্রয়াণ,
জনতার স্রোত তাহে বহে দিবা রাতি'
বিবিধ বিচিত্র যান, নৌকা নানাজাতি॥

মহাকলরব ভিন্ন কিছু শ্রুত নয়,
জলের প্রপাত প্রায় অনুক্ষণ বয়।
বিপণী ভরিয়া দ্রব্য কতশত মত,
ভারতে বাণিজ্যলক্ষ্মী নবব্রতে রত॥

দেখিলাম বটে বহু পদার্থ অদ্ভুত,
ফলে সে সকলে মন নহে তৃপ্তিযুত।
পূর্ব্ব দৃষ্ট মহা-মহাপুরুষ সমান।
অন্বেষিতে লাগিলাম ধীমান শ্রীমান॥

রহস্য সন্দর্ভ-এর ৪র্থ পর্ব্বের ২৮ খণ্ডে, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২২ পর্য্যন্ত।

ভাবী পতি রাজোন্নতি নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ
প্রিন্‌স অফ্‌ ওয়েলস্‌ বাহাদুরের প্রতি
ভারত ভূমির অভ্যর্থনা

ভূমিকা :

"পঙ্কানামপি ভূতানাম্‌ উৎকর্ষং পুপুষুর্গুণাঃ।
নবে তস্মিন্‌ মহীপালে সর্ব্বং নবমিবা ভবৎ ॥
—কালিদাস ॥

"নরেন্দ্র মূলায়তনাদনন্তরং।
তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজ সংজ্ঞিতম্‌ ॥
অগচ্ছ দংশেন গুণাভিলাষিণী।
নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্‌ ॥'
—কালিদাস ॥

কে বলে ভারত ভূমি বয়সে জরতী।
অপ্সরা আকারা নিত্য নবীন যুবতী ॥
যথা কত শত গত দেব পুরন্দর।
একা শচী নিত্য নব, স্বর্গে নিরন্তর ॥
মন্দার কুসুম সম লাবণ্য-নিলয়।
কাল কাল সর্প শ্বাসে ম্লান নাহি হয় ॥
আর যথা প্রভাতে প্রভাত কমলিনী।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা সম প্রদোষে মলিনী ॥
পুনরায় প্রভান্বিতা ভাস্কর উদয়ে।
ললিত লাবণ্যময়ী—তিমির অত্যয়ে ॥
সেরূপ ভারতভূমি সময়ে সময়ে।
ম্লানমাত্র দুর্গতি-তামসী তমোচয়ে ॥
সুদিন উদয়ে পুব নব ভাবান্বিতা।
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমোদ-প্রভায় প্রভান্বিতা ॥
ইংরাজের অভ্যুদয়ে বিভা-বিভাসিতা।
অদ্যাপি ছিলেন মাত্র অর্দ্ধ বিকসিতা ॥
যুবরাজ সমাগমে সীমা নাই সুখে।
আনন্দ মঙ্গলধর প্রস্ফুটিত মুখে ॥

গীত

(১)

কহিছে ভারত ভূমি, এসো এসো নাথ তুমি,
মহামান্যা মহিষীর প্রথম নন্দন।
কিবা পিতা কিবা মাতা, কিবা পতি কিবা ভ্রাতা
বহুদিন হেরে নাই দাসীর নয়ন ॥
ওহে মম মনোচোর, তুমি তো হইবে মোর,
জাতি কুল ধনমান প্রাণের ঈশ্বর।
এসো এসো হৃদে বস, হেরি মুখ তাম-রস,
সরস হউক মম মানস ভ্রমর ॥
জরাজীর্ণ বটি আমি, তোমায় নিরখি স্বামী,
পুনরায় পাইলাম নবীন যৌবন।
পূর্ব্বাপূর্ব্ব রত্নাকর, আমার যুগল কর,
প্রসারিত পাইবারে প্রেম আলিঙ্গন ॥
হের ওহে প্রিয়তম, হিমাদ্রি কপোলে মম,
ঝর ঝর আনন্দাশ্রু ঝরে অনুক্ষণ।
নিরখি তোমার মুখ, দূরে গেল সব দুঃখ
করে বুক ধুক্ ধুক্ না সরে বচন ॥
যত কুলবধূ ধনী, দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন।
হৃদয় রঞ্জন মম নয়ন অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব ভঞ্জন ॥

(২)

তুমি মম নহ পর, গত শত সম্বৎসর,
তব মাতামহ কুলে পরিণীতা আমি।
তব অগ্রে যশোধন! মম পতি চারি জন,
একে একে সকলে হলেন স্বর্গগামী ॥
শোকানলে দহে গাত্র, পরিণীতা নামে মাত্র,
দেখি নাই তাঁহাদের শ্রীমুখ মণ্ডল।
পলাশীর যুদ্ধজয়, যেই দিবসেতে হয়,
সেই দিনে ভগ্ন মম দাসীত্ব-শৃঙ্খল ॥
জয় ভেরী ঘোর ধ্বনি, বিবাহ বাজনা গণি,
মম দেহে গোরোচনা যবন-রুধির।
কামান আতস-বাজী, বিজয় পতাকা রাজী
প্রমোদ-পবনে কিবা হইল অস্থির ॥
তারপর বারত্রয়, হইয়াছে পরিণয়,
হয় নাই কভু কিন্তু, শুভ দরশন।
সে আশা পূরিল আজ, এসো এসে যুবরাজ
লও হে প্রণয়-পুষ্প ভর্কতি চন্দন ॥
যত কুলবধূ ধনী, দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন ॥
হৃদয় রঞ্জন মম নয়ন অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব ভঞ্জন ॥

(৩)

সুখের দিবস আজ, রোদনের কিবা কাজ
তবু কিছু শ্রীচরণে করি নিবেদন।
সত্যনিষ্ঠা তপোদানে, আর্জ্জব অমিত জ্ঞানে,
ভূষিত ছিলেন মম পূর্ব্ব পতিগণ ॥
পরূরবা কার্ত্তবীর্য্য, রামনাম মহাবীর্য্য,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিক্রম তপন।
তাঁহাদের নাম স্মরি, হৃদয় বিদরে মরি,
আর কি হইবে সেই সুদিন ঘটন ॥
তারপর এলো কাল, এলো সে যবন কাল,
ঘোরী ঘোর শত্রু আর গজনী দুর্জ্জন।
মৎসরতা মদে ভোর, রুধির শুষিল মোর,
নন্দন-নিকরে কত করিল নিধন ॥
মধ্যে কিছু দিন ভাল, প্রসন্ন হইল ভাল,
রামরাজ্য আকবরের সুখের শাসন।
এসো এসো যুবরাজ, সে সুখ পেলাম আজ,
নিরখিয়া নাথ তব চারু চন্দ্রানন ॥
যত কুলবধূ ধনী দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন।
হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব ভঞ্জন ॥

শুন ওহে ভাবীবর, গুণের সাগর বর,
কৃতাঞ্জলি ভিক্ষা এই ও রাঙ্গাচরণে।
দীনা ক্ষীণা সুপ্রাচীনা, বলিয়া দাসীরে ঘৃণা,
করোনা করোনা প্রিন্স রেখো হে স্মরণে ॥
ছেলেগুলি বটে কালো, কিন্তু পিতৃভক্তি-আলো,
সমুজ্জ্বল তাহাদের হৃদয় কমল।
কালো বলে অবহেলা, কর না প্রভুত্ব বেলা,
ক্ষুধা হলে খেতে দিও অন্ন আর জল ॥
জননীর কাছে গিয়ে, বলিবে হে বিবরিয়ে,
ভক্তি বৎসলা তিনি করুণার খনি।
আমার যাতনা যত, সকলি ত অবগত
আছেন ইন্দিরা রূপা ইণ্ডিয়া জননী ॥

পদ্ম পুষ্পের প্রতি

আ মরি ! আ মরি ! একি শোভা মনোহর,
সরোবরে সমুদিত অপূর্ব্ব অপ্‌সরা !
নীলকান্ত-মণি-নিভ সরসীর নীর,
তাহে পদ্মরাগ প্রভা প্রকারে রুচির।
প্রসারিত মরকত পুঞ্জ পুঞ্জ দল,
পরাগের রাগ যেন বৈদূর্য্য বিমল।
অপরূপ অয়স্কান্ত মধুপ-মণ্ডল
উড়ে পড়ে আকর্ষণে বিলাসে বিহ্বল।
আহা মরি ! কি মাধুরী ধরে কর্ণিকার।
ঈষৎ বীজের শ্রেণী দশন আকার !
এমন হাস্যের ছটা কোথা দৃশ্যমান ?
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান ?
সকল সৌন্দর্য্যসহ তুমি উপমেয় ;
সকল সৌভাগ্য দেখি তোমার আধেয়,
মূর্ত্তিমতী প্রজ্ঞাসতী, দেবী সরস্বতী,
হে নলিনি, তোমার নিকুঞ্জে নিবসতি।
শ্রীরূপিণী সিন্ধুবালা, চঞ্চলা কমলা।
তোমার নামেতে তাঁর খ্যাতি সমুজ্জ্বলা।
নিরবধি তোমাতে তাঁহার অধিষ্ঠান—
দুই কর কমলেতে তুমি শোভমান।
তুমি সেই কামিনীর ছিলে হে আধার,
কমলদহেতে যেই করিল বিহার ;
নিরখি শ্রীমন্ত সাধু হারাইল জ্ঞান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান ?

কুসুমের সার তুমি, শোভার নিধান,
নিজে নিরুপমা, উপমার উপাদান।
ললিত লাবণ্যবতী ললনার সহ,
উপমার উপযোগী আর কেবা কহ ?
অতুল রাতুল তব, সাদৃশ্য শোভন,
অভিলাষি কর, পদ, নয়ন, বরণ।
নব কলিকার সুকুমার সে আকার,
ধরিবারে উরসিজে বাসনা অপার।
মৃণাল লালিত্য লভ্যে বাহুতে প্রয়াস,
তব মধু সঞ্চয়ণে অধরের আশ।
বিফল প্রয়াস আশ ; সবে হতমান ;
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান ?
যে কালে ছিল না এই জগৎ প্রকাশ ;
নাস্তি, ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুত, আকাশ ;
সকলের মূলাধার, সর্ব্ববীজ যেই,
সর্ব্ব ধর্ম্মমতে মাত্র আবির্ভূত সেই ;
পুরাণে প্রসিদ্ধ সেই পুরুষ প্রধান,
করিবারে এইসব সৃষ্টির বিধান,
অনন্তে অনন্তশায়ী ক্ষীরোদ সাগরে,
তোমারে করিলা সৃষ্টি নাভি-সরোবরে।
তুমি আদ্যসৃষ্ট তাহে শ্রেষ্ঠ অতিশয়,
তোমাতে প্রজাত প্রজাপতি মহাশয়।
সর্ব্বজন পিতামহ তোমার সন্তান।
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান ?

তীর্থগণ মাঝে যথা পুরী বারাণসী,
গোপীগণ মাঝে যথা রাধা গরীয়সী,
নক্ষত্র সমাজে যথা রোহিণী রূপসী,
অপ্সরার মধ্যে যথা প্রধানা উর্ব্বশী,
অমরা মণ্ডলে যথা বাসব-প্রেয়সী,
পুষ্পরাজ্যে কমলিনী সেরূপ শ্রেয়সী।
কুমুদ মহিষী তব, তুমি হে মহিষ ;
তোমার সুষুপ্তি কালে জাগে সেই নিশি।
সহদলবল যবে থাক হে বিকসি,
ইন্দ্রের অমরাবতী হয় সে সরসী।
প্রণত তোমার পদে হয় হে ধীমান, *
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
গণনায় দুই পুষ্প ধরাতে প্রধান,
শোভা আর সুরভির নিয়ত নিধান।
উভয়েই সর্ব্ব অগ্রে জাত এই দেশ ; ‡
উভয়েই এক নামে বিখ্যাত বিশেষে।
শ্বেত রক্ত উভয়েই দুই বর্ণ ধর ;
উভয়ের নালে আছে কণ্টক নিকর।
উভয়েই করে জনগণ মনোহর ;
কালে কালে কত কাব্যে কল্পিত সুন্দর।
কিন্তু তব তুলনায় না হয় লাঘব,
দেশান্তরে গোলাপের বাড়িল গৌরব।
সর্ব্বকালে সমভাবে তোমার সম্মান।
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
[illegible] পদার্থ তুমি [illegible] ;
তাপ আর হিম সমতায় সুখে রও।
বরষায় প্রপীড়িত হও হে নলিনী ;
হেমন্ত শিশিরে তব প্রতিভা মলিনী ;
বসন্তে বিপুল শোভা বাড়ে অতিশয়,
সরোবরে হয় যেন কমলা নিলয়।
কি আর বর্ণিব শোভা, ওহে শত পত্র! †
শরদের শিরে যবে হও আতপত্র,
মরকত দণ্ডোপরে রক্ত মখমল,
নীহারের মুক্তা হারে করে ঝলমল।
কাঞ্চন কলস কর্ণিকার জ্যোতিষ্মান্,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

প্রেমের ভাণ্ডার তুমি এই সে কারণ
তব অনুগত কত হেরি জীবগণ।
চিরকাল তব প্রেমে মত্ত মধুকর,
দুই শিরোমণি বলি খ্যাত চরাচর,
মধুস্বরে চাটুবাদে করি গুঞ্জরণ,
মধু লয়ে অন্য ফুলে করে পলায়ন।
পাতকী কখন কর্ম্মফল-কি এড়ায়?
কেতকী কণ্টকে তার ছিন্ন ভিন্ন কায়।
অপর কৃতঘ্নকারী, সুবাসিত বারি
পান করি, তব মূল উচ্ছেদন-কারী।
সে কলুষে অঙ্কুশে ললাট খান খান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
কবির সর্ব্বস্ব তুমি ভারতে বিশেষ ;
তোমা ধরি ধরামধ্যে ধন্য এই দেশ ;
বিরহ-অনল শান্ত সুকোমল দলে ;
তব বীজ, জপমালা সিদ্ধ-করতলে ;
সুজনে সুজনে প্রেম যদি ভঙ্গ হয়,
তব সূত্র সহ তবু উপমান রয়।
বর্ণিবারে কেবা পারে ওহে কোকনদ,
তোমার সুরভি-ভার ইন্দ্রের সম্পদ ;
মলয়-পবন হরি সেই সব ধন,
কেন বা অরণ্য দেশে করে বিতরণ।
তব মকরন্দ অন্ধে করে দৃষ্টি দান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
স্বপ্ন[illegible] কাল্পনিক [illegible] কল্পনা,
ভীষণ ভাবনা তার, কত বিভাবনা,
সেই মধ্যে ফুটাইল কত বা কমল।
দুই, চারি, ছয়, আট, দশ, বারো দল।
তিন-গুণ-ময়ী নাড়ী মৃণালিকা তায়,
খেলিছে মরালবর, বর্ণনে না যায়।
কে দেখেছে এসব কাল বিচিত্র সরোজ,
দেহ চিরি অস্ত্রবৈদ্য না পাইল খোঁজ।
প্রাকৃতিক মানসিক দুই রূপ তব।
মানসিক রূপ কভু দর্শন সম্ভব?
সে জেনেছে যে পেয়েছে সেরূপ সন্ধান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

* কোন জার্ম্মান জ্ঞানিপ্রবর পদ্মপুষ্পকে প্রথম নিরিক্ষণ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন

† 'শতপত্র' এই নাম পদ্ম এবং গোলাব উভয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

‡ ইউরোপীয় উদ্ভিদ্বিদ্যা বিশারদ কোন কোন মহাশয়ের মতে গোলাব ভারতবর্ষীয় পুষ্প

বিগত যামিনী যোগে স্বপন সঞ্চার,
কি হেরিনু অপরূপ, দেখিব কি আর ?
হে মিত্র * মোহিনী তুমি এক সরোবরে
ভাসিতেছ যেন প্রফুল্লিত কলেবরে।
মিত্রের নির্দ্দেশে আমি নামিলাম জলে।
ধাইলাম ধরবারে তোরে, লো চপলে।

* সূর্য্য।

যত যাই তত তুমি, চলিলে অন্তরে।
? ?
প্রসারিত করে ধাই, ব্যাকুলিত প্রাণ,
অমনি হাসিয়ে তুমি হল্যে অন্তর্ধান।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর ; দুঃখে হতজ্ঞান,
নিরূপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান ?

কটক, ১ মাঘ ১৭৮৯ শকাব্দা।

দুর্গাস্তোত্র

নমো ! মহাশক্তি, দেবি ! জগৎ-জীবনী।
বীর্য্য, প্রেম, মৃত্যু, মায়া, সকলি আপনি॥
যে হোক তোমার নাম, তুমি মাগো তারা।
কালের জনম পূর্ব্বে ছিলে সারাৎসারা॥
বিনত মস্তকে দুর্গে ! প্রণতি ! প্রণতি চরণে।
এসো, এসো, এসো, মাগো ভুবন ভবনে॥
নমো ! দশভুজা দেবী ! সিংহে সমাসীন।
দেশ কাল পাত্র তব আজ্ঞার অধীন॥
তুমি সকলের বীজ, তব মহোদরে।
অবিরত জাত হ'য়ে পুনঃ তথা মরে॥
তিনে এক, একে তিন, অচিন্ত্য বিশেষ,
তোমাতেই জাত ব্রহ্মা, উপেন্দ্র, মহেশ,
তুমি আদ্য সনাতন, দেবি ! ভয়ঙ্করী।
তুমি সকলের সৃষ্টি আর লয় কারি॥
নীলাকাশে বিভাসিত তারা রত্নহার।
কুসুম মাধুরী চারু ঘেরি চারিধার॥
ঘোর ঝঞ্ঝাবাত, আর বিদ্যুৎ বল্লরী।
প্রকাশিছে তব শক্তি, লাবণ্য লহরী॥
উর মহাদেবি ! আজি মেঘাবৃতাসন।
হিমাদ্রী অনন্ত হিমে আছে উন্নয়ন॥
যেখানেতে তোমার যুগল রাঙ্গা পায়।
মুগ্ধ হয়ে মহাকাল সুখে নিদ্রা যায়॥
যেখানে নক্ষত্র নেত্র বিহঙ্গ—উপরি।
দেবসেনাপতি দেব, সুযোগ্য প্রহরী॥
প্রশান্ত বেশেতে তথা দেবগণপতি।
বিজ্ঞাবে করেন ধ্যান প্রেমানন্দমতি॥
কমলা কমল-আসনে হসিতা বিমল।
উষা যথা চিত্রকরে আকাশ মণ্ডল।
কোলে লয়ে স্বর্ণবর্ণ, ধন ধান্য ধন।
মাতা বসুধার করে দেব নিকেতন॥
শ্বেত সরোজাভা, সরস্বতী বীণাপাণি।
মোহিনীর শ্রেণী, কলা কলাপের রাণী॥
তুহিনের মাঝে জাগাইল দিব্য গান।
প্রজ্বলিত আনন্দ-অনলে যেই স্থান।
এসো, এসো মহাশক্তি ! দেবি ! প্রভান্বিতা।
হইয়ে সৌন্দর্য্যে আর মাধুর্য্যে মণ্ডিতা॥
তুমি এক আশা দুর্গে ! দুর্গতি সময়।
তুমি গো আশ্রয়মাত্র, সহায় নিশ্চয়॥
শান্তি আর সুখে ধন্য কর এই দেশ।
এ বৎসর যেন নাহি হয় দুঃখ লেশ॥
সুতসুতা সহ এসো, কৈলাস বাসিনী।
দুর্গে ! দুর্গে ! ওমা দুর্গে ! দুর্গতি নাশিনী॥

নারায়ণ ২য় বর্ষ ২য় খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা আশ্বিন-১৩২৩ সাল (পৃষ্ঠা ১২০৫-০৬ পর্য্যন্ত) উপরোক্ত কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদারের মারফতে প্রাপ্ত।

গোপার স্বপ্নদর্শন

বিনোদ শয়ন শালে একদা ক্ষণদা কালে
পতি পাশে করিয়া শয়ন।
গোপালিনী নিদ্রা যান নিশি হয় অবসান
স্বপন করেন দরশন ॥
প্রকম্পিত ধরাতল প্রকম্পিত কুলাচল
মারুতে চালিত তরুকুল।
ক্ষিতি আছে উলটিয়া কে যেন উৎপাটিয়া
দিয়াছে তাহার আদ্যমূল ॥
সশিখর গিরিগণ উপড়িয়া ঘন ঘন
পড়িতেছে ধরণী উপর।
নিশাকর দিবাকর প্রকাশ না করে কর
খসি পড়ে নক্ষত্র নিকর ॥
মুক্তকেশ পরিকরে জড়িত দক্ষিণ করে
মাণিক মুকুট চূরমার।
ছিন্ন যেন দুই ভুজ ছিন্ন দুই পদাম্বুজ
নগ্নতনু দেখে আপনার ॥
ছিন্ন মুকুতার হার মেঘ রে মে যেন তার
আচ্ছাদিত সব কলেবর।
ভাঙ্গিল খাটের পায়া অকস্মাৎ নিজ কায়া
নিপতিত ধরণী উপর ॥
দেখিছেন গুণবতী শ্রীবিহীন নিজ পতি
সুরুচির ছত্র দণ্ড ভঙ্গ।
ছিন্ন আভরণ চয় অবকীর্ণ ভূমিময়
ভগ্ন রাজ বিভবের অঙ্গ ॥
চামর মুকুট ভগ্ন হেরি রামা শোকে মগ্ন
বিহ্বল বিকল শয্যা পরে।
ঘন ঘন উল্কাপাত নির্ঘাত বহয়ে বাত,
অধিকার ছাইল নগরে ॥
দেখেন বিভগ্ন বর্ম্ম নানা শর অসি চর্ম্ম,
ভগ্ন রণতূরী ভেরী সব ॥
ভগ্ন রত্ন সিংহাসন ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ,
ভগ্ন রথ প্রাপ্ত পরাভব ॥
ছিন্ন স্বর্ণময় জাল, প্রলম্বিত মুক্তামাল
হেরে উর্ম্মিময় মহার্ণব।
মেরুশ্রেষ্ঠ মেরুবর কাঁপিতেছে থর থর
ত্রিজগতে আগত বিপ্লব ॥

এইরূপে পতি প্রাণা নিরখিয়া স্বপ্ন নানা
জাগিয়া উঠিয়া বরাননে।
শিহরিত কলেবর ঘূর্ণনেত্র ইন্দীবর,
কহিলেন পতি সম্বোধনে ॥
হে দেব কি হবে মোর যেরূপ স্বপন ঘোর
দেখিলাম বিষম ভীষণ।
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভ্রান্তি হৃদয়ে বিগত শান্তি
শোকেতে আচ্ছন্ন মম মন ॥
শুনি স্বপ্ন বিবরণ প্রশান্ত হসিত হন
মধু স্বরে কহেন সুধীর।
ব্রহ্মস্বর বিরাবিত * কম্পবিক করম্বিত
বাদিত কি দুন্দুভি গভীর ॥
কহিছেন "প্রাণপ্রিয়ে প্রমুদিত হয় হিয়ে
তব পাপ নাহিক কখন।
বহু পূর্ব্ব পুণ্য ফলে হেন স্বপ্ন ভাগ্যে ফলে
কেবা হেরে হেন সুস্বপন ॥
যা দেখিলে গুনবতি! প্রকম্পিতা বসুমতী
নিপাতিত সচূড় ভূধর।
তাহার এ অর্থ হয় সুরাসুর নাগচয়,—
যক্ষ রক্ষ কিন্নর কি নর ॥
সর্ব্বভূত যোড় করে তোমার অর্চ্চনা করে
হবে তুমি সর্ব্ব পূজনীয়া।
যে তুমি দেখিলে পুন দক্ষিণে কুন্তল গুণ
বৃক্ষ সব পড়ে উপড়িয়া ॥
জান প্রিয়ে সুনিশ্চয় ভবজাত ক্লেশচয়
অচিরাৎ ছিন্ন ভিন্ন হবে।
মোহজাল হবে ছিন্ন না রবে ভ্রমেতে ক্লিন্ন
সুপ্রসন্ন দৃষ্টি হবে ভবে ॥
যে দেখিলে শুচিস্মিতে খসি পড়ে ধরনীতে
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র নিচয়।
ধ্রুবজ্ঞান জ্ঞানালোক পূর্ণ হবে ইহলোক
ভ্রমতম পাইতে বিলয় ॥
যে দেখিলে শাক্য বালা ছিন্ন গজ মুক্তামালা
নগ্ন তব চারু কলেবর।
জান ইহা কৃশোদরি! নারীদেহ পরিহরি
পুরুষত্ব পাইবে সত্বর ॥

যে করিলে দরশন ভগ্ন সব সুখাসন
ছত্রদণ্ড রত্ন বিভূষণ।
অকস্মাৎ ভগ্ন হয় খট্টাপদ চতুষ্টয়
ভূমিতলে করিলে শয়ন॥
নিশ্চয় জানিহ তবে রাজাগণ নষ্ট হবে
একছত্র হবে ত্রিভুবন।
চতুর্বর্ণ পরিবর্ত্তে এক বর্ণ রবে মর্ত্তে
জাতি অভিমানের নিধন॥
যে দেখিলে অগণিত উল্কা হল প্রপতিত
ঘোরতম তমোময় পুরে।
সুবিমল প্রজ্ঞাদীপ প্রভাযুক্ত জম্বুদ্বীপ
মোহবিদ্যা তমো যাবে দূরে॥
যে দেখিলে ভগ্ন বর্ম্ম ধনু শর অসি চর্ম্ম
ভগ্নরথ রত্ন সিংহাসন।
অর্থ তার এই প্রিয়ে বৈরভাব বিনশিয়ে
শান্তি রাজ্য করিবে স্থাপন॥
যে দেখিলে মেরুবর প্রকম্পিত থর থর
মহার্ণবে তরল তরঙ্গ।
অযুক্ত ধর্ম্মের ভাণ আর নাহি পাবে স্থান
যাগযজ্ঞ যাঁহার হবে ভঙ্গ॥"
দিবা ভাগে যথা শশী ম্লান ভাবে শূন্যে পশি
মুদিত কুমুদী প্রতি চায়।
কিংবা যথা দিন পতি মলিনী নলিনী প্রতি
প্রদোষে নিরখি অস্ত যায়॥
ম্লান ভাবে তদ্রূপ্রায় নিজপ্রিয় প্রমদায়
সিদ্ধার্থ করেন বিলোকন।
কাতরা কুমার দারা মুকুতার হারা কারা
অশ্রু ঝরে হইতে নয়ন॥
পাষাণ প্রতিমা যথা মুখে নাহি স্ফুরে কথা
পলক না পড়ে দু' নয়নে।
পর্য্যুসিত স্থলপদ্ম অধর সুধার সদ্ম
রাহু কি গ্রাসিল চন্দ্রাননে॥
"ধৈর্য্য ধর প্রাণ প্রিয়ে হৃদে যোগ সমাশ্রিয়ে
বিবেক বৈরাগ্য সহকারে।
অনিত্য এ ভব মায়া সায়ন্তনী তরু ছায়া
বুঝে জীব বুঝিতেও নারে॥
যদিও স্বপন মত ভাবী সংঘটন যত
দেখা দেয় মানসে তোমার।
যদিও দেবতাগণ বিচলিত সিংহাসন
বিলোড়িত ভ্রম অধিকার॥
যদিও যাতনাচয় ভবাময় হেম ক্ষয়
সন্নিকট কিয়ৎ উপায়।
যদিও সংসার প্রীতি মৃগ তৃষ্ণা সমরীতি
দেখিতে দেখিতে লয় পায়॥
তথাপি তোমার প্রতি আমার অচল রতি
অদ্যাপিও নহে ভাবান্তর॥
এখনো প্রেয়সি তোরে হৃদয় কমল কোরে
ভাব ভরে ভাবি নিরন্তর॥
বিবাহ বাসর প্রায় মন মম মোহ যায়
যশোধরা রূপ গুণ ধ্যানে।
যত হয় দূর গত মৃণাল তন্তুর মত
বান্ধা রবে পরাণে পরাণে॥
তুমি ত জান হে ভাল গত মম কত কাল
চিন্তাজালে দিবা বিভাবরী।
ভব ভ্রান্তি দুঃখ চয় কিরূপেতে ক্ষয় হয়
তদুপায় অন্বেষণ করি॥
যখন সময় হবে কল্পনা সফল হবে
যা' হবার অবশ্যই হবে।
বিবেক বিজয় তূরী রবে ক্ষিতি যাবে পূরি
মোহ রাজ্য কত কাল রবে?
অবিজ্ঞাত অগণিত আত্মা তরে সুচিন্তিত
মম আত্মা বিশেষে কাতর।
যে দুঃখ আমার নহে সে দুঃখে জীবন দহে
আমার নাহিক আত্ম পর॥
যদি হে পরের লাগি হই আমি দুঃখভাগী
তব প্রিয়ে কর বিবেচনা॥
যারা মম দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী বিধুমুখি
তাদের বিচ্ছেদে কি যাতনা॥

প্রভাত

মৃণালাভা ম্লান হয়, হেরি দিবাকরোদয়,
নিশাকর চলে অস্তগিরি।
যামিনী হইল সারা, সমুদিত শুক-তারা,
সমীরণ বহে ধীরি ধীরি ॥
কিবা তরুলতাচয়, ঢলঢল রসময়,
নীহারের হার শোভে গায়।
ভানুসহ সরলতা, করি সরোরুহলতা,
অন্তরের অনল নিবায় ॥
কুমুদ মুদিল আঁখি, জাগিল যতেক পাখী,
মুক্তকণ্ঠে আরম্ভিল গান।
মোহন মধুর স্বরে, শ্রবণ মোহিত করে,
সুশীতল করিল পরাণ ॥
প্রকৃতির শোভাকর, বিমল অরুণ কর,
নিনাদ নীরদ করে শোভা।
কালিন্দী প্রবাহে যেন, কোকনদবৃন্দ হেন,
মধুকর মত্ত মনোলোভা ॥
কাননে ডাকে পাপিয়া, করি পিয়া পিয়া পিয়া,
প্রিয়া প্রিয়গণেরে জাগায়।
বিধু আর নাহি রবে, [illegible] জাগ সবে,
[illegible], এই রব গায় ॥
সুসার উষার [illegible], [illegible] ভাল ভাল,
[illegible] কোকিলে [illegible]।
তাহে দ্যুতি দূতী হয়ে, [illegible],
ধরণীতে করিছে প্রচার ॥
বিভা গতে বিভাবরী, শ্রীহরি স্মরণ করি,
চলেছেন অতি দ্রুতগতি।
বিকাশে কুসুম কলি, সৌরভ গৌরবে অলি,
মাতিয়াছে সচঞ্চল মতি ॥
দিবাকর করে ভাতি, যেন প্রবালের পাঁতি;
বরিষয়ে ধরণী হৃদয়ে।
অথবা সুবর্ণশরে, যামিনীরে বিদ্ধ করে,
কার্য্যসিদ্ধ করণ আশয়ে ॥
অরণ্যে অরুণ আস্য, দেখিয়া বিলাসে লাস্য
আমোদে মাতিল মৃগকুল।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে, না চয়া বেড়ায় রঙ্গে,
কত খায় তৃণাদির মূল ॥
যামিনী দেখিয়া শেষ, বিবরে লুকায় শেষ,
আর চোর পেচক প্রভৃতি।

কুঞ্চিত কুটিল জন, প্রফুল্ল সরল মন,
গেল ঘুমঘোরের বিকৃতি ॥
শিশিরে করিয়া স্নান, শস্যক্ষেত্র হাস্যবান
যেন তপ্ত কাঞ্চন কিরণ।
আসিয়া কৃষাণগণ, করে কত আয়োজন,
অঙ্কুরাদি বৃদ্ধির কারণ ॥
কেহ সেচে বারিধারা, কেহ রোপিতেছে চারা,
কেহ হল করিছে ধারণ।
গোপাল বালক যত, সহ গাভী শত শত,
মাঠে মাঠে করে গোচারণ ॥
ঝিল্লি হয়ে পরিশ্রান্ত, স্বীয় রব করে ক্ষান্ত,
শান্ত কৈল শ্রবণ কুহরে।
বকুল শাখায় বসি, অস্তাচলে হেরি শশী,
পিকবর ললিত কুহরে ॥
হেরি দিবাকর ভাতি, প্রদীপে নিবিল বাতি,
সারারাত্রি ছিল দীপ্তিমান্।
যুবক যুবতী জাগে, উভয়ে বিদায় মাগে,
অনুরাগে মোহিত পরাণ ॥
নয়নে নয়নে বাঁধা, স্বতন্ত্র তনুর আধা,
পরস্পর করে হেন জ্ঞান।
কেমনে বিরহ সবে, আপন দম্পতী সবে,
মনে [illegible] করনে [illegible] ॥
হেরি প্রকাশ [illegible] দিন, সরোবরে যত মীন,
তরঙ্গ সঙ্গে কেলি করে;
মরাল করাল স্বরে, কিবা সন্তরণ করে,
হৃদয় প্রসন্ন ভাব ভরে ॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে, কুক্কুট কর্কশ হাঁকে,
মাঝে মাঝে কাকে দেয় যোগ।
কিন্তু কি মধুর কাল, নীরস কর্কশ জাল,
কর্ণপুরে দেয় রসভোগ ॥
হেরিয়া বালার্ক মুখ, অন্তর্ধান হোলো দুখ,
সুখ আসি আবির্ভাব কত।
ব্রহ্ম আরাধনে রত, ব্রহ্ম উপাসক যত,
হেরি ব্রহ্মমুহূর্ত্ত আগত ॥
মোহন প্রণব শব্দ কান্তেরে করয়ে স্তব্ধ,
মানস ভাসায় ভক্তিরসে।
ধন্য ধন্য নিরঞ্জন, গর্ব্ব পর্ব্বত ভঞ্জন,
পৃথিবী পূরিল ভাববশে ॥

কাল

বৎসর গেল, বর্ষ এল, তুমি ত এলে না!
স্থির করিয়াছ কি তবে আর দেখা দিবে না?
মনে ছিল নিজগুণে ক্রমে হইবে সদয়,
অথবা সকল ক্লেশ দূর করিবে সময়।

কোনটাইত হইল না, এ কি বিষম দায়!
চিরকাল কি কাঁদিতে হ'বে করি' হায় হায়!
সেটা কি কথা? কাল ভূতে করে সকল নাশ;
দিন যত যাইতেছে, বাড়িতেছে মম ত্রাস।

চিন্তা

বিমুগ্ধ করিয়া তুমি হয়েছ বিমুখ,
আর কি দিবে না তুমি তব সঙ্গ সুখ?
দিবানিশি তুমি চিন্তা, তুমি জ্ঞান, ধ্যান,
সব কাজে সব ক্ষণে, তুমিই প্রধান।
সর্ব্বোপরি তবে কেন অগ্রসর নও?
সুমুখ হইয়া কেনই দুর্ম্মুখ হও?
এতদিন দেবধ্যানে হয় পরিত্রাণ,
তোমার কুহকে পড়ে যাইতেছে মান।

তোমাতেই জাত সব সুখ ও অসুখ,
তব নিয়মে যে দেখি একমাত্র দুঃখ।
একগুণ দিয়া তুমি লও গুণ শত,
তব চিন্তা সর্ব্বগ্রাসী, আর দিব কত?
চিন্তামণি শান্তি করে সকল কুগ্রহ,
বর্ষগতে হবে কি শেষ তব নিগ্রহ?
সময়ে যদ্যপি না হইলে প্রতিকার,
এ সকল ভাবনা কেবল অপকার।

নিঃস্বার্থ প্রেম

(১)

নাহি তারে জিজ্ঞাসিনু—"কে হে তুমি বালা"
না কহিনু তারে নিজ হৃদয়ের জ্বালা॥
না করিনু কোন কার্য্য নিষেধে তাহার।
না তাহার ইচ্ছা আমি করিনু স্বীকার॥
মানসে না রাখি মাত্র, পরশের আশা।
কি কাজ সহিব বল তার কটু ভাষা॥
যখন হইল দেখা সে চঞ্চলা সনে।
মনের আবেগ যত গত সেক্ষণে॥
ক্ষণে নিরখিয়া পুষ্প সুখে ভাসে মন।
সৌভাগ্য মানিয়া মনে করিনু গমন॥

(২)

বহুক্ষণ প্রিয়ারে না করি দরশন।
অতিশয় চঞ্চল হইল মম মন॥
চিত্তের উদ্বেগে বেগে হইনু বাহির।
গলি গলি খুঁজিলাম হইয়ে অস্থির॥
বাজারে বাজারে আর চাতরে চাতরে।
অন্বেষণ করি ফিরি কাতর অন্তরে॥
অবশেষে শুভক্ষণে দেখা পাই তার।
একেবারে পরিষ্কার সব অন্ধকার॥
ক্ষণে নিরখিয়া মুখ সুখে ভাসে মন।
সৌভাগ্য মানিয়া মনে করিনু গমন॥

কার্পাসের শনি ত্যাগ

মাটিতে শরীর মাটী—ভিজিলাম জলে।
ক্রমে অঙ্কুরিত বীজ, যুক্ত ফুলে ফলে॥
এ দেহ হইল যবে ফলের ভিতরে।
আসিয়ে চতুরা নারী লয়ে গেল ঘরে॥
কোষ হতে বাহির করিয়া কলেবর।
ভাল করে শুকাইল, ছাদের উপর॥
তারপর জাঁতে দিয়ে পিষিল শরীর।
অস্থি মজ্জা বাছি' বাছি' করিল বাহির॥
ধুনিয়া ধুনিয়া পরে চড়ায়ে ধনুক।
এঁটে সেঁটে বস্তা বাঁধে ফেটে যায় বুক॥
অতএব কত নারী কৌশল সংযুতা।
চরকায় ফেলে মোরে কেটে নিল সূতা॥
সূতা লয়ে তাঁতী করে বসন বয়ন।
ধোবার পাটেতে পড়ি ঝুরিল নয়ন॥
রংরেজের ডাবরায় মরি জ্বলে পুড়ে।
অঙ্গময় রঙ্গভরে নিঙ্গুড়ে নিঙ্গুড়ে॥
তারপর দরজীর কিছু দয়া নাই।
কেটেকুটে মাপসহ করিল সিলাই॥
এখন শনির দশা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
আমারে সকলে কহে কাঁচুলী আঙ্গিয়া॥
এত দুঃখ পেয়ে আমি শেষ এই বেলা।
রমণীয় হৃদয়েতে করিতেছি খেলা॥

নীতিকুসুম

(ক)

মন, মতি আর দুগ্ধ যদি কেটে যায়।
পুন নাহি জুড়, কর, সহস্র উপায়॥

(খ)

যেখানেতে রহ   তার মত কহ
অন্যথা না কর ভাই॥
"বিড়ালেতে উট   ধরি দিল ছুট"
"বটে, বটে"—কহ তাই॥

(গ)

নিশি দুপহর   সকল সংসার
গাঢ় নিদ্রা যায় সুখে।
কেবল সম্ভোগী   করে জাগরণ
মরে বিরহিণী দুখে॥

(ঘ)

সরোজ শুকায়ে গেলে না মরে ভ্রমর।
বারি বিনা মঞ্জরয়ে আম্র তরুবর॥
কাহারো বিহনে কারো নাহি হয় ক্ষতি।
দুর্দ্দিন সহনে দেহ, রাখয়ে শকতি॥

(ঙ)

হউক কুলায় শব্দ লপট্ ঝপট্।
ছিদ্রহীন ভূষা সেই, সদা অকপট।
অগণিত ছিদ্র আছে চালনীর গায়।
তার চড়চড় শব্দ সহা নাহি যায়॥

(চ)

কেহ বা নিকটে থাকি অপকার করে।
কেহ উপকার করে থাকিয়া অন্তরে॥
মরাল মৃণাল গ্রাসে, বিনাশে কমল।
ভাণু বিকশয়ে তায় শোভা নিরমল॥

(ছ)

শুকাইলে সরোবর, হইলে পর্পট।
মরাল না ছাড়ে সেই সরসীর তট॥
পূর্ব্বপ্রেম হেতু সেই, কৃতজ্ঞ বিশেষ।
কঙ্কর চূনিয়ে খায়, নাহি ভাবে ক্লেশ॥

শৈশব

শৈশব কি সুখের সময়।
যেই দেখে সেই কোলে লয়॥
কেহ সমাদরে লয়ে খেলে।
কেহ বা দোলায় দোলে হেলে॥
কেহ বা দিতেছে কুতুকুতু॥
হাসি শিশু হয় লুতুপুতু॥
কেহ চুমে সুচারু বদন
কেহ হৃদে করিছে বন্ধন॥
কেহ চুমি দেয় মুখে চুমি।
কেহ বা বাজায় ঝুমঝুমি॥
শৈশব কি সুখের সময়।
মনে হলে হয় সুখোদয়॥

সংসার-অরণ্য

শুন ওরে মনোমৃগ, হও সাবধান।
সংসার অরণ্য এই সংকটের স্থান॥
কতই কণ্টক ইতে আছে পরিপূর্ণ।
অলক্ষ্যেতে মায়াজালে পড়িবে রে তূর্ণ॥
দূরে দূরে মৃগতৃষ্ণা অই দেখা যায়।
ভ্রমে পড়ি ভ্রমি ভ্রমি না যাও তথায়॥
অবিরত প্রজ্জ্বলিত কাম দাবানল।
মোহ সমীরণে ক্ষণে হতেছে প্রবল॥
আসছে নিষাদকাল অতি ভয়ঙ্কর।
থেকে থেকে ছাড়িতেছে অনুতাপ-শর॥
ভ্রমিছে শার্দ্দুললোভ বিকট দর্শন।
হিংসা জায়া সঙ্গে তার ফেরে অনুক্ষণ॥
সদান্ধ চঞ্চল তব মানস নয়ন।
স্থিরভাবে ঘোর বনে করয়ে ভ্রমণ॥

বৃদ্ধদশা

কি দুর্দশা, বন্ধো ! যবে আসে, বৃদ্ধদশা !
যৌবনের সুখ যত, নাশে, বৃদ্ধদশা !
বৃথা ভোগ তৃষ্ণা পরকাশে, বৃদ্ধদশা !
ছাই পাড়ে সব অভিলাষে, বৃদ্ধদশা !
না আসুক, প্রেমিকের পাশে, বৃদ্ধদশা !

হরিনাম

নেত্রহীন দেহ যথা নিশি চন্দ্র হীনা।
মেঘ বিনা ধারা যথা, বিপ্র বেদ বিনা।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম বিনা ॥১॥

পক্ষীপক্ষ বিনা, যথা দন্তী দন্তচ্যুত।
পতিহীনা সতী, পিতৃহীন বেশ্যাসুত।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম চ্যুত ॥২॥

নীরহীন কূপ আর ধেনু ক্ষীরহীনে।
দীপহীন গৃহ, তরুবর ফলহীনে।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম হীনে।
স্মর হরিনাম মন কিবা নিশি দিনে ॥৩॥

তিনি মাত্র দাতা ভবে আর কেহ নাই।
তিনি নাহি দিলে ক্ষুব্ধ হওনারে ভাই।
দিতে তিনি নিতে তিনি জগতের প্রভু।
আর কার কাছে হাত পাতিও না কভু ॥৪॥

বিভুগান

মানুষের মানসের ইচ্ছায় কি হয়।
বিভুর ইচ্ছায় মাত্র ঘটে সমুদয় ॥
বলি ইচ্ছা করেছিল হয় দুর্গপতি।
বিভুর ইচ্ছায় তার হল অধোগতি ॥১॥

হাড়ের পিঞ্জর এই চাম দিয়ে মোড়া।
ভিতরেতে অহঙ্কার ভরা আগাগোড়া ॥
উপরে সুরঙ্গ রঙ্গ দেখা যায় চারু।
বড়ই চতুর সেই যে ইহার কারু ॥২॥

কিছুই না নিত্য হয় এ অনিত্য ভবে।
এই আসে এই যায় নিত্য নিত্য সবে ॥
কিবা ভোজবাজী এই, কিবা ছায়াবাজী।
নাচিতেছে রঙ্গভূমে পুত্তলিকা রাজী ॥
দেখিতে দেখিতে যায় সুখের যৌবন।
শুধু জরা এসে আর না করে গমন ॥৩॥

গরলে অমৃত হয়রে নিঃসৃত
সাগর গোষ্পদ হয়।
প্রবল অনল হয় সুশীতল
মেরু হয় রেণু চয় ॥
বিপক্ষ ঘুচিয়া বৈরিতা মুছিয়া,
বিপক্ষ সপক্ষ পুন।
কবিবর কয় সব সপক্ষয়
বিভুর কৃপার গুণ ॥৪॥

দোতলা তেতলা ঘররথ অশ্ব গজবর
ত্যজ ত্যজ প্রিয় পরিজন।
ত্যজহ সুশীলা দারা ধরি সারমেয় ধারা
স্বর্গ পথে উঠ ওরে মন ॥৫॥

প্রিয়, প্রিয়, সবে কয়, প্রিয় নাহি চিনে।
কেবা প্রাণ প্রিয়তম, সেই জন বিনে ॥
তাঁর সঙ্গে সংমিলন হলে একক্ষণ।
সদা কাল সদানন্দ ভাসিবে রে মন ॥৬॥

খাঁটি যার মন সেজন কখন
প্রেমসূত্র ভঙ্গ করে ?
শতযুগ জলে থাকি চকমকি
অগ্নি নাহি পরিহরে ॥৭॥

শুক্রতারা

একি হে প্রেয়সী বল, আকাশেতে সুনির্ম্মল,
তারা ওই চারু শোভা ধরে।
নিকর কিরণ ধর, বটে তার কলেবর,
কিন্তু নহে দীপ্ত প্রেমকরে॥
কেবল রূপেতে মন, গলেনাকো কদাচন,
সুখদ প্রণয়রস বিনে।
চক্ষুমাত্র দগ্ধ হয়, মন কিন্তু দগ্ধ নয়,
হৃদয়ের বিনোদ বিপিনে॥
আছে অতি মনোহর, যুগল নক্ষত্রবর,
বিরাজিত বিমল কিরণে।
প্রোজ্জ্বল হীরকচয়, সরমে মলিন হয়,
খরতর কর দরশনে॥
শূন্যে নাহি শোভে তারা, তবে কোথা আছে তারা,
তুমি কি জান না সবিশেষ।
এই দেখ তারাদ্বয়, শোভা করে অতিশয়,
তব যুগ্ম নয়নের দেশ॥
যে নয়ন আকর্ষণে, টেনে আনে দেবগণে,
দেবলোক পরিক্রম করি।
মর্ত্ত্যে তারা এসে কয়, নয়ন মনোজালয়,
নন্দন কানন পরিহরি॥
স্বর্গের উজ্জ্বল তারা, আর নাহি স্মরে তারা,
ভুলে গেল কামিনী নয়নে।
শূন্যের তারকাচয়, সামান্য আলোক রয়,
নহে দীপ্ত প্রণয় কিরণে॥

রঙ্গলাল অবসর কালে হিন্দী দোঁহার বঙ্গানুবাদ করিতেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

গঙ্গাস্নান করি যদি মুক্ত হও ভাই।
মৎস্য আর মণ্ডুকেরা বিমুক্ত সদাই॥
মুণ্ড মুড়াইয়া যদি সিদ্ধ হও ভবে।
লোম ছিন্ন মেষগণ সিদ্ধ হয় তবে॥১

উপবাসে পড়ে থাক আপত আলয়ে।
অনাহারে দিন দশ যায় যাক্ বয়ে।
তুলসী কহেন তবু উদরের তরে।
কখন যেওনা ভাই কুটুম্বের ঘরে॥২

কেন কাজী উচ্চৈঃস্বরে দিতেছ আজান
তবে বুঝি, নাই ভাই ঈশ্বরের কান!
জান নাকি পিপীড়ার পাদক্ষেপ ধ্বনি
ধ্বনিত তাঁহার কর্ণে দিবস রজনী॥৩

নবদ্বার যুক্ত এক সুচারু পিঞ্জরে।
পবনে রচিত পক্ষী সতত বিহরে॥
কিমাশ্চর্য্য দেখ ভাই! কহেন কবীর।
এতক্ষণে কেনই বা না হয় বাহির॥৪

যদবধি আসি না ছেদয়ে তরু তদবধি রহে ছায়া।
কহেন তুলসী উপদেশ বিনা কেমনে কাটিবে মায়া ॥৫
প্রেমের পিয়ালা সেই জন পিয়ে যে দেয় দক্ষিণা শির।
লোভী নাহি পারে,—প্রেম প্রেম করে, কহেন কবি কবীর ॥৬

গান

চিত্ররেখার অনিরুদ্ধ লইয়া শূন্যপথে গমন—বিভাস যৎ

কে ও যায় অম্বরে, রে বামা, কে ও যায় অম্বরে।
যেন অস্ত থেকো শশী চলে উদয় ভূধরে।
রূপে আলো করে,—পুঞ্জ তিমির সংহরে।—
ধরি দুই করে, রে বামা, ধরি দুই করে।
পুরুষরতন এক পালঙ্ক উপরে,—
স্থির কলেবরে—আছে ঘোর নিদ্রাভরে।
যেন দিগন্তরে, রে বালা, যেন দিগন্তরে।
আরে, পক্ষ মেলি পরী যায় অমর নগরে।—
সমীরণ ভরে,—উড়ে উড়ানী নিথরে।
চলে একেশ্বরে, রে বামা, চলে একেশ্বরে।
নিশীথ সময় ঘোর কিছু নাহি ডরে।—
কি সাহস ধরে,—ধন্য রামা রত্ন বরে।—
উত্তরে সত্বরে, রে বামা, উত্তরে সত্বরে,—
আরে, শোণিত নগরে উষা বিহার বাসরে
হেরি প্রাণেশ্বরে—দেহে, জীবন সঞ্চরে।—
কহে কবিবরে, রে বামা, কহে কবিবরে,
হেন দূতী নাহি এবে সংসার ভিতরে
বিরহসাগরে প্রেমী জনেরে উদ্ধারে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সঙ্গীতের সমকালেই রচিত আর একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাও সম্ভবতঃ উপরোক্ত উষাহরণ গীতিকাব্যের জন্য রচিত হইয়া ছিল।

মুলতান—যৎ

মরি কি সুন্দর ব্যবহার।—
তব সম চুরি কার্য্যে কেবা তুল্য আছে আর।
বাল্যে বৃন্দাবন লীলা, কত চুরি প্রকাশিলা,
অন্ন বস্ত্র দধি দুগ্ধ হরিলে যে ভারে ভার ॥
হরিলে হে ব্রজনারী, কি কর্ম্ম বুঝিতে নারি,
মাতুলানী হরি' নিলে, হায়, হায়, কি আচার।

কাটিয়ে যৌবনকাল, একি রুচি যদুলাল,—
কুবুজা দাসীরে হরি মথুরায় কর বিহার ॥—
প্রৌঢ়ে দ্বারকাতে গিয়ে, শান্ত না হইল হিয়ে,
হরিলে ভীষ্মক-সুতা, বিশেষে খ্যাত সংসার।
বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়, ডাকাতিতে পুত্র বড় ;
পৌত্রটি হরিল উষা, স্বপনে প্রেমসঞ্চার।

অর্জ্জুনের নিকট সত্যভামা কর্তৃক সুভদ্রার অবস্থাবর্ণন ॥
খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

ধন্য ধনুর্দ্ধারি,
ধন্য হে, ধন্য মতিমান্। ধন্য বাণ।—
ধন্য দ্রোণাচার্য্য তোমায় শিখালে শর সন্ধান।—
ধন্য পুণ্যব্রতে ব্রতী, তীর্থ পর্য্যটনে রতি,—
সম্প্রতি, যুবতীর প্রতি মারিলে হে পঞ্চবাণ।
অবলা সরলা হায়, বনের হরিণী প্রায়,
সংহার করিয়া তায়, কি আর বাড়িবে মান।
কি কায হে ধনঞ্জয়, ধরণী করিয়ে জয়,
হরিয়াছে সদাসয়, কৃষ্ণ অনুজার প্রাণ।—
তোমার কটাক্ষশরে, জর জর কলেবরে,
তব রূপ ধ্যান করে, করে চিত্ত একতান।—
কহে রঙ্গ যে জন মারে, লোকে কেন ধ্যায় তারে
সত্য পুষ্পময় শরে, করে সবে হতজ্ঞান।

নিম্নোদ্ধৃত গীতটিও সম্ভবতঃ উপরে উদ্ধৃত গীতের পালার অন্তর্গত,—

পুষ্পক রথে ভদ্রার অশ্বচালনা।
খাম্বাজ—দোলন।

আহা মরি হায়, কে হে তুমি রমণীরতন।—
বিমানে, বিমানে, কর বিমানে রঙ্গে চালন।—
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যেন শোভে মুক্তাদাম,—
অমৃত শীকরে কিবা, ভূষিত শশলাঞ্ছন।
এক করে ধরি রাস, অপরে ঘুরাও পাস,
ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস, ফেনমুখে অশ্বগণ।—
রমণী পুরুষ সাজ, পুরুষের সম কায,—
পুরুষেরে দেহ লাজ, কভু ধরে শরাসন।—
কহে রঙ্গ অনুজার, শিক্ষা দেখি চমৎকার,
কৃষ্ণেরে সারথ্যে পার্থ করে বুঝি নিয়োজন।

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' মহাবাক্য অবলম্বনে রচিত নিম্নোদ্ধৃত গীতটি ভক্ত বৈষ্ণব পাঠকগণের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবে :—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দেখ ওগো বৃন্দে, বিহনে গোবিন্দে, শূন্যময় কুঞ্জবন।—
জলশূন্য সরোবর, অলিশূন্য ইন্দীবর,—
প্রাণশূন্য কলেবর, হরিশূন্য বৃন্দাবন।
শুনেছি সই এ সংসারে, একান্তে যে ভাবে যারে,
তন্ময় হয় সে জন, কহে জ্ঞানীগণ;—
আমি ত সই নিরন্তর, ভাবি সে শ্যামসুন্দর,
তবে কেন কৃষ্ণগত না হয় জীবন।
কহে রঙ্গ, তব হরি, বৃন্দাবন পরিহরি,
এক ক্ষণ নাহি রন, কথা পুরাতন;
ভাব দেখি আর্ত্ত ভাবে, এখনি তাহারে পাবে,—
বল গো কোথায় যাবে,—তব কৃষ্ণধন।—

এইবার বাৎসল্যরসের কয়েকটি গীত পরিবেশিত হইল। এই সহজ সরল সঙ্গীতগুলি কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রতিধ্বনি তুলিতে পারে তাহা কেবল বাঙ্গালীই বুঝিতে পারিবে :—

ভবানী স্তোত্র

দক্ষ গো মা যক্ষ নন্দিনি!
বিপদ নাশিনি!
আমায় বিপদেতে দাও মা দেখা
ওগো ভবের ভবানী—
আশ্বিনেতে হও মা চণ্ডী
চৈত্রেতে হও বাসন্তী মা মাগো—
কালকেতু যে ব্যাধের ছেলে
তারে দিলে রাজধানী ॥

বিজয়া—ভৈরবী

ওহে গিরি দিনকর হইল উদয়।
উমা শরতের শশী অস্তগত হয়।
ওই দেখ গিরিরায়, প্রাণকুমারী গিরিজায়,
শিবালয়ে লয়ে যায়, জামাতা নিদয়।—
ওহে গিরি কাল যামিনী, কি পুরুষ কি কামিনী
সুখে ছিল সমুদয়—
আজ আমায় হয়ে নিদয়া,—ছেড়ে যান অভয়া,
মায়াহীন মহামায়া—কঠিন হৃদয়।

গৌরী—আড়াঠেকা

আয় যাদু আয়রে, আয় যাদু আয় রে,
আয় কোলে আয় রে।
কেমনে ভুলিয়ে ছিলি অভাগিনি মায় রে।
গোঠে পাঠাইয়ে তোরে, সারাদিন আঁখি ঝোরে,
অবিরত দুগ্ধ ক্ষরে, স্তন ফেটে যায় রে।
ক্ষুধায় আকুলী ব্যাকুলী, সর্ব্বাঙ্গে ধূসর ধূলি,
কেহ ননী মুখে তুলি, দেয়নি তোমায় রে।
তুমিরে অন্ধের নড়ী, কৃপণের ধন কড়ি,
না দেখিলে এক ঘড়ী, ঘটে ঘোর দায় রে।
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু, যুক্ত তব মুখ ইন্দু,
হেরি মম দুঃখসিন্ধু, উথলিত হায়রে।
কহে রঙ্গ চমৎকার, পুত্রস্নেহ যশোদার,
এমন জগতে আর না দেখি কোথায় রে।

সীতার 'বনবাস' এর গান।

রঙ্গলালের মাতুলপুত্র ডাক্তার অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি যাত্রার দল সংগঠিত করেন। বর্দ্ধমান স্কুলের অধ্যাপক রমাপতি রায় মহাশয় এই যাত্রার দলের জন্য 'সীতার বনবাস' নামক একটি পালা রচনা করিয়া দেন। রঙ্গলাল ইহাতে প্রায় ৫০।৫৫টি গান সংযোজিত করিয়া দেন।

৩০ নং গান (জুড়ি)

ডি. সুর—রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল আড়াঠেকা।

পঞ্চমাস গর্ভকালে নির্ব্বাসিতা সীতা।
তপোবনে রাজবালা রাজার বনিতা॥
হায়রে বিধাতা শত ধিক তব কাজে।
পতিসোহাগিনী কোথা কাঙ্গালিনী সাজে॥
কোথা সে কোমল শয্যা কোথা সিংহাসন।
রাজ্যেশ্বরী সীতাভাগ্যে হল তৃণাসন॥
হা! রাম! জীবিতেশ্বর! হাহাকার করি।
কোন মতে প্রাণ মাত্র রহিলেন ধরি॥
এইরূপে তপোবনে পঞ্চমাস গত।
ক্রমশঃ প্রসবকাল হল সমাগত॥
একবারে দুই সুত প্রসবিলা সতী।
পুত্রমুখ নিরখিয়ে হরষিতা মতি॥

যথাকালে জাতকর্ম্ম আদি সমুদায়।
সমাধান করিলেন মুনি মহোদয় ॥
যুগল বালকে করি লালন পালন।
করেন জানকী সতী কালের হরণ ॥
ভাবিয়া আপন ভাবী জীবন্মৃত প্রায়।
শয়নে কি জাগরণে মুখে হায় হায় ॥
ক্রমশঃ যুগল শিশু শুক্লশশী সম।
বাড়িতে লাগিল রূপে গুণে নিরুপম ॥
বেদ আদি বিদ্যা শিক্ষা দিল মুনিবর।
কত ক্রিয়া শিশুদ্বয় হইল তৎপর ॥
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর হল গত।
পরে প্রকাশিত হবে পর কথা যত ॥

৪৩ নং গান (লব ও কুশ)
সি সুর—তাল—আড়া ঠেকা

বিশুদ্ধা চরিতা সীতা পতিব্রতা ধরাতলে।
সে হেন সতীরে হে রাম বনে দিলে কোন্ ছলে ॥
না ভাবিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম, সাধিলে অসাধু কর্ম্ম,
বিন্ধিলে দারুণ শল্য সতীর হৃদি কমলে ॥
তাই যদি ছিল মনে কি কার্য্য সিন্ধু বন্ধনে
কেন বধিলে রাবণে সুগ্রীবাদি বলে ॥
কেন আনি নিজবাসে পুনঃ দিলে বনবাসে
কেমনে ভুলিলে বা সে পরীক্ষা কথা অনলে ॥

৪৯ নং গান (সীতা)
বি সুর—রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী

পুনঃ চাহিবেন কি বিধি আমায় কৃপানয়নে!
দুঃখিনী সীতারে কি নাথ করেছেন মনে ॥
কত আশা মনে আসে, বসিব পতির পাশে,
সোহাগিনী হব পুন তাঁর মিলনে ॥
মনের বেদনা যত কাঁদিয়ে জানাব কত
দেখিব প্রবোধ নাথ করেন কেমনে ॥

৫৪ নং গান (কুশ ও লব)
তাল—দশকুশি

প্রাণের কুশি ভাই মায়ের নাহিরে চেতন
বুঝি আজ হারালাম রে মা রতন ॥

খেলান্তরে গেলে ঘরে, মুখচুম্বন কে আর করে—ধরে অধরে,
কে বলিবে আর তোমায় অঞ্চলের ধন ॥
কে থাকিবে আর আগারে, ক্ষুধা পেলে খাবার চাব কারে,
ভাইরে মনের মতন-রে কে আর করিবে যতন ॥
বনে ছিলাম মনের সুখে, কত কথা শুস্তে পেতাম জননীর মুখে,
সে সব ফুরাল ভাইরে জনমের মতন ॥
কি বলিব গিয়ে ঘরে, ঋষিকন্যা জিজ্ঞাসিলে পরে আমারে।
যজ্ঞে এসে ভাই মায়ে দিলাম বিসর্জ্জন ॥

৬ নং গীত

ডি সুর—বাউল

আরে কালে কালে এর পর আর কি হবে রে;
মিনষের কোলে ছেলে দিয়ে মাগীরা লড়ায়েতে যাবে রে।
যারা ছিল কাঁথা চোরা, তাদের হাতে টাকার তোড়া
ঠকির মর্য্যাদা বাড়া, মানী জনার মান যাবে।
কলিতে মুটের মাথায় রেশমী ছাতা গাড়ু লয়ে ··· যাবে।*(১)
বদ্যি হ'ল পদ্ধি ছাড়া, পণ্ডিত হল মূর্খ ভেড়া
মেয়েরা ঘোড়ায় চড়া, মিন্‌ষেরা ঘাস্ কাটবে;
কলিতে বরের ঘরে পাল্কি চড়ে মেয়েরা বে কর্ত্তে যাবে ॥
পূর্ব্বে ছিল তালের হুঁকো, এখন সব রূপোবাঁধা সোণামুখো
তা' দেখে হলাম ভেকো, টেকো মাথায় চুল হবে*(২)
কলিতে, জোলার ছেলে মাকু ফেলে
কুলীন হয়ে মান বাড়াবে রে ॥

হোলির গান

(১)

সুর—খাম্বাজ, তাল—যৎ

হোলির দিনে শ্যাম যদি তোমায় পাই হে—
বনমালী বনফুলে সাজাই হে—
চম্পক সেবতি মল্লিকা মালতী—
ফুলেরই পাংখা বানাই হে—
পাঁচরাঙা ফুল দিয়ে, ঝালোর লাগাইয়ে,
সোহাগে পাশে বসি পাংখা হিলাই—
আর সাধ মিটাই হে—।

(২)

সুর—খাম্বাজ; তাল—যৎ

কেন গেলাম সই আনিবারে বারি।
দাঁড়ায়ে যমুনা তটে ত্রিভঙ্গ মুরারী ॥
আবির গুলাব মারে নন্দলাল,
আঁখি হল লাল ভারি—
খসিল বসন কাঁচলি কষণ—
লাজ সংবরিতে নারি—
কি করি মারে পিচকারী ॥

---

(১) পাঠান্তর—"গাড়ু নিয়ে আঁচাবে"। (২) পাঠান্তর—"চুল গজাবে"

(৩)

ঘর ঘর হতে শ্যামলী উজলি
বাহিরে আসিছে চলি।
কুসুমী ওড়না কিবা ঝকমকে
কাঁচলি সে চপলি॥
যে দিকেতে চাও সেই দিকে শুধু
রঙ্গিনী অবলা বলী।
নিখিল ব্রজের অপ্সরা যত
ফিরিতেছে গলি, গলি॥
কিবা লীলা'হেলা, কিবা কেলি কলা
কি বিনোদ খেলা হোলি।

পিয়ারী হল পিয়ারী

(অর্থ :—প্রিয়া পাণ্ডুবর্ণা হইল)

প্রদোষ সময় প্রিয় রসময় আসিবে শুনি পিয়ারী।
মনের আবেশে মনোহর বেশে সাজিল সুন্দরী নারী॥
পিয়ার কেশর পিয়ার বেশর ঝলকে পিয়ার হার।
পিয়ার বসন কাঁচলি কষণ পিয়ার চন্দনসার॥
অধর হিন্দুলে পিয়ার তাম্বুলে কিবা শোভা মনোহারী।
পিয়ার এল না, করিল ছলনা পিয়ারী হল পিয়ারী॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ বা চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ*

রামচন্দ্র ... অযোধ্যার রাজা।
লক্ষ্মণ ... ঐ ভ্রাতা।
চন্দ্রকেতু ... লক্ষ্মণের পুত্র।
লব ... রামচন্দ্রের পুত্র।
(বাল্মিকীর আশ্রমে পালিত)।
সুমন্ত্র ... মন্ত্রি।
যজ্ঞাশ্ব, অশ্বরক্ষক, মুনি বালকগণ, সৈন্যগণ এবং জুড়িগণ বশিষ্ঠ ঋষি।

দৃশ্য :—অযোধ্যার যজ্ঞস্থল

রাম, লক্ষ্মণ ও বশিষ্ঠ আসীন।
অশ্বসহ অশ্বরক্ষকের প্রবেশ।

—গীত—

রাগিনী—বিভাষ, তাল—ঝাঁপতাল।
চলে অশ্ববর দম্ভে,
সবেগে লম্ফে ঝম্পে
অধরা ধরা কম্পে
ধরে কে জোরে ?
আমি মরদ যেই,
ধরে রেখেছি তেঁই,
অন্যে কে পারে করে
দেখিলে ডরে।
ঝক্ ঝক্ ঝক্, ঝক্-মক্ সাজে,
কুলিন সমতেজে
যবন গতি অতি
বিরতি অন্তরে॥

(গীতান্তে অশ্বরক্ষক রামচন্দ্রকে প্রণাম করিবে।)
অশ্বরক্ষক :—মহারাজ অশ্ব উপস্থিত, কি আজ্ঞা হয়।—
রাম :—লক্ষ্মণ! যজ্ঞীয় অশ্বকে যথাবিধানে পূত করে দিগ্বিজয়ের জন্য ছেড়ে দাও।
লক্ষ্মণ :—যে আজ্ঞা মহারাজ।
(বশিষ্ঠের যজ্ঞীয়অশ্ব পূতকরণ)

* সীতার বনবাস নাটকে "অশ্বমেধ যজ্ঞ" বা "চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ" নামক একটি পালা রঙ্গলাল সংযোজিত করিয়া দেন।

রাম :—লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ :—কি আজ্ঞা—

রাম :— কুমার চন্দ্রকেতুকে যজ্ঞের অশ্ব রক্ষার্থে নিযুক্ত কর। সামন্ত রাজগণ এক অক্ষৌহিনী সৈন্য সমেত কুমারের অনুগমন করুন।

লক্ষ্মণ :—যে আজ্ঞা।

ইতি নিষ্ক্রান্ত।

দৃশ্য :—বাল্মিকীর আশ্রম

মুনি বালকগণ, অশ্ব ও সৈন্যগণ।

১ম, মুঃ, বাঃ :—(অশ্ব দেখিয়া)—একি চমৎকার পশু! একি পশু!

২য় মুঃ বাঃ :—আহা আমরা পশুশাস্ত্রে যে ঘোড়ার বিবরণ পড়েছিলাম, আজ চক্ষে তা দেখলাম। এ পশুর নাম ঘোড়া— চল, লবকে গিয়ে বলি।

(লবের প্রবেশ)

মুঃ, বাঃ, গণ :—ভাই, যে ঘোড়ার বিবরণ আমরা পশুশাস্ত্রে পাঠ করেছিলাম—আজ তা প্রত্যক্ষে দেখলাম।

লব :—ঘোড়া! কেবল পশুশাস্ত্রে কেন? সংগ্রাম শাস্ত্রেও তার বর্ণনা: আছে। সে কি প্রকার পশু, বল দেখি?

মুঃ, বাঃ, গণ :—পশ্চাতে বিপুল পুচ্ছ ঘন ঘন নড়ে।
আহা কিবা দ্রুতগতি উড়ে যেন ঝড়ে॥
কিবা দীর্ঘ গলদেশ খুর চতুষ্টয়।
ঘাস খেয়ে এত বল দৃষ্ট নাহি হয়॥
কিবা অপরূপ মনোহর ঠাম।
ছড়াইয়া যাইতেছে কাঁচা কাঁচা আম॥

লব :—এই যে ঘোড়া, কি চমৎকার, কি চমৎকার!

মুঃ বাঃ, গণ :—কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত!

লব :—এযে দেখছি অশ্বমেধের ঘোড়া।

মুঃ বা গণ :—কেমন করে জান্‌লে এ অশ্বমেধের ঘোড়া?

লব :—আরে মূর্খগণ, তোরা কি পড়িস্‌নি যে অশ্বমেধ ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণে ধনুর্দণ্ডধারী সৈন্যেরা নিযুক্ত থাকে! ঐ দেখ এই ঘোড়ার সঙ্গে শাস্ত্রধারী পুরুষেরা রয়েছে। এতেও যদি বিশ্বাস না হয়, তবে ওদের জিজ্ঞাসা কর্।

মুঃ, বাঃ, গণ :—ওহে সৈন্যগণ—এ ঘোড়া কি জন্য সেনা বেষ্টিত হয়ে ভ্রমণ করছে?

জনৈক সৈন্য :—স্বয়ং রামচন্দ্র দশরথ কুলকেতু।
ছাড়িলেন এই অশ্ব অশ্বমেধ হেতু॥
সপ্তলোকে কেবা বার তাঁহার সমান।
এই সে পতাকা তার বীর্য্য অভিজ্ঞান॥

লব :—কি ! কি ! একি আস্পর্দ্ধার কথা। তবে কি পৃথিবীতে আর বীর নেই ?

সৈন্য :—মহারাজের তুল্য ক্ষত্রিয় বীর কোথায় ?

লব :—ধিক্ তোদের স্পর্দ্ধায় ! তোরা কি বলছিস্ ? যদি তোদের রাজার এতই বীরত্ব, তবে এত বিভীষিকা কেন ? এত অহঙ্কার কেন ? আমি এখনই তোদের পতাকা হরণ করবো—কে রাখ দেখি !

(মুনি বালকগণের প্রতি)—তোমরা ঢিলিয়ে ঢিলিয়ে বেটার ঘোড়াকে তাড়িয়ে দাও। তপোবনের হরিণদের সঙ্গে ও চরে বেড়াক্।

(লব পতাকা লইল এবং মুনি বালকেরা ঘোড়াকে তাড়াইয়া দিল।)

সৈন্য :—(সক্রোধে)—ধিক্ তোর চপলতায় ! তোর সগর্ব্ববাক্য নির্দ্দয় সৈন্য শ্রেণীরও অসহ্য ! থাক্, থাক্, রাজপুত্র চন্দ্রকেতু আস্‌ছেন। এই মনোহর বনশোভা দর্শনে তাঁর কৌতূহল জন্মেছে—নচেৎ তোরা দেখতিস্ তোদের কি শাস্তি হতো। তোরা পালা, পালা—বনে গিয়ে লুকো।

মুঃ বাঃ গণ :—ভাই লব ! তোমার কথায় আমরা ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে দিলাম। উঃ ওকি ! ঐ দেখ চক্‌মক্ অস্ত্রধারণ করে তোমাকে মারবার জন্যে সৈন্যশ্রেণী আস্‌ছে। এখান হতে আশ্রম ও অনেক দূর। চলো—আমরা ত্রস্ত হরিণযূথের ন্যায় পলায়ন করি। (মুনি বালকগণ পলায়ন।)

লব :—(সগর্ব্বে ধনুষ্টঙ্কার করিয়া)—কি ? অস্ত্রচালনা করে মারতে আস্‌ছে ?

এই যে ধনুর ছিল্‌কা রসনা সোসর।
প্রকট উৎকট দণ্ড শর ভয়ঙ্কর ॥
উগরিছে ঘনঘোর ঘোষণ মর্ম্মর।
ভেঙ্গে পড়ে বজ্র যেন স্তব্ধ চরাচর ॥
কৃতান্তের সম বক্ত্র করিয়া প্রকাশ।
এখনি করিতে চায় ত্রিজগৎ ত্রাস ॥

সৈন্য :—ইঃ, বেটার তেজের কথা দেখ ! বনের ফল মূলাহারী, বনচারী, বল্কলধারী তোর আবার কিসের বীরত্ব ! তোর মৃত্যু আসন্ন—এই দেখ্, এই খরতর শরজালে তোকে বধ করি।

লব :—রে শৃগাল ! হিমালয় গুহাবিহারী মাতঙ্গ বিদারী সিংহ শাবকের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি তোদের কথা ?

(যুদ্ধ—লব সৈন্যদের প্রতি শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন।)

১ম সৈন্য :—প্রাণ যায়, প্রাণ যায়—পালাও, পালাও—সকলে পালাও। এ কালান্তের কাল, বনের বাঘ কোথা থেকে এল ?

২য় সৈন্য :—ভয় নেই, ভয় নেই। ঐ কুমার চন্দ্রকেতু আস্‌ছেন। ঐ দেখ সুমন্ত্র বায়ুবেগে অশ্ব-চালনা করেছেন।

(যুদ্ধ চলিতে লাগিল।)

(সুমন্ত্র ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্রকেতু :—আর্য্য সুমন্ত্র ! দেখুন, দেখুন—এই মুনি বালকের কি তেজ—কি পরাক্রম ! এই বীর বালক যেন প্রসিদ্ধ রঘুবংশজাত অঙ্কুরের মত সৈন্যঘটা বেষ্টিত হয়ে অবহেলে তাদের

আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। সহস্র সহস্র শরজালে সৈন্যদের বিকলিত করছেন। তাঁর জ্বলিত শর সহস্রে হস্তীদের কপোল দেশ দলিত হচ্ছে। বীররসে তাঁর মুখকমল আরক্তিম হয়েছে। আহা কি বীর্য্য—কি পরাক্রম!

সুমন্ত্র :—আয়ুষ্মন্! সুরাসুর অপেক্ষা প্রভাবাতিশয়, তোমার ন্যায় রূপবান এই বীর বালককে দেখে আমার মনে ধনুর্ভঙ্গ করণার্থ মিথিলায় গমনকারী রাক্ষসকুল সংহারী ধনুর্ধারী রঘুনন্দনের মূর্ত্তি স্মরণ হচ্ছে।

চন্দ্রকেতু :—কিন্তু আমার ভূরি ভূরি সৈন্যগণ, একমাত্র এই শিশুর প্রতি যে সহস্র সহস্র শর সঞ্চালন করছে—তা দেখে আমি লজ্জিত হচ্ছি।

দেখ আর্য্য যেন ঘোর বরষা উদয়।
করাল কুন্দলি দল সমসৈন্যচয় ॥
ধূলায় ধূসর শর ছোটে শন্ শন্।
রসের নির্ঘোষ যেন বজ্রের ঘোষণ ॥
কণ কণ কনক কিঙ্কিণী সৌদামিনী।
মদজল ঝাড়ে করিযূথ কাদম্বিনী ॥

সুমন্ত্র :—বৎস, তোমার সৈন্যগণ একত্রিত হলেই বা ওর কি করতে পারতো? তারা ত এখন শরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে।

চন্দ্রকেতু :—আর্য্য সত্বর হোন—সত্বর হোন। আমার আশ্রিত সৈন্যদের এই বীর শিশু সংহার প্রমথন করতে আরম্ভ করছে।

সুমন্ত্র :—(স্বগত) আমি কেমন করেই বা সুকুমার কুমার চন্দ্রকেতুকে এই বীর শিশুর সঙ্গে দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাব! (চিন্তা করিতে করিতে) কিন্তু আমি ইক্ষাকু বংশে বৃদ্ধ হয়েছি; এখন আর উপস্থিত দ্বন্দযুদ্ধ নিবারণ করবার উপায় নেই (চন্দ্রকেতুর প্রতি)—আয়ুষ্মন্! ঐ দেখ বীর শিশু তোমার নিতান্ত সন্নিকট হয়েছে।

চন্দ্রকেতু :—(অন্যমনস্কভাবে) ওঁর নাম কি?

সুমন্ত্র :—বৎস! ওঁর নাম লব।

চন্দ্রকেতু :—ভো, ভো—মহাবাহু লব! ও সব সৈন্যদের সঙ্গে তোমার প্রয়োজন কি! এই আমি এসেছি—অনলের তেজ অনলেই প্রশমিত হোক্।

সিংহ শিশু সমযোগ্য শৃগাল তনয়!
তার প্রতি দ্বন্দ্বী হয় কেশরী তনয় ॥
সৌপর্ণের সমকক্ষ না হয় চটক।
অনন্ত বাসুকীরাজ তাহার যোটক ॥
বজ্রসহ ইরম্মদ দেয় দরশন।
অনলেই অনলের তেজ প্রশমন ॥

লব :—(উর্দ্ধদৃষ্টি)

সুমন্ত্র :—কুমার দেখ, দেখ

সিংহশিশু শুনি যথা মেঘের গর্জ্জন
করিযূথ মথনেতে ক্ষান্ত একক্ষণ ॥

বিষম নিনাদ করি উর্দ্ধদিকে চায়।
সেইরূপ বীর শিশু দেখিছে তোমায় ॥

লব :—সাধু, রাজপুত্র সাধু! সূর্য্যবংশের উপযুক্তই তোমার সত্য এবং সুমধুর বাক্য। এসব সৈন্যদের সঙ্গে আমার প্রয়োজন কি ?—তোমার সঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব।

(সামন্তরাজগণ ও সৈন্যদল লবের সম্মুখে আসিয়া পড়িল)

তোরা পালিয়ে গিয়ে আবার মরতে এসেছিস্—ধিক মূর্খদল! তোরা কি আমাকে রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিবি না ?

(রাজাগণ পশ্চাতে বাণ নিক্ষেপ)

চন্দ্রকেতু :—(সৈন্য ও রাজাগণের প্রতি) নৃপতিগণ! ধিক তোমাদের! ধিক তোমাদের বিফল যুদ্ধ চেষ্টা! তোমরা অগণিত সৈন্য বেষ্টিত ও হস্তী-অশ্ব ও রথারোহণে বর্ম্ম সম্বদ্ধ হয়ে এই মৃগচর্ম্মাবৃত পদব্রজে গমনকারী মনোহর মূর্ত্তি বালকের প্রতি আক্রমণ করছো! ধিক্—তোমাদের অনর্থক চেষ্টায় ধিক্!

লব :— কে রাজপুত্র আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করছেন ? (চিন্তা করিয়া) ভাল, কাল বিলম্বে আর প্রয়োজন কি ? সৈন্যেরা ব্যতিব্যস্ত করছে—আমি তাদের এই জৃম্ভক অস্ত্রে স্তম্ভিত করি।

(লবের বাণ ত্যাগ —সৈন্যগণের অচৈতন্য ও পলায়ন)

সৈন্যগণ :—কি হলো, কি হলো—প্রাণ যায়, প্রাণ যায়—হাত-পা যে সব অবশ হয়ে পড়লো। মলাম—মলাম—(ভূমিতলে স্তম্ভিত ভাবে পতন)

চন্দ্রকেতু :—আর্য্য সুমন্ত্র! সৈন্যগণ অচল নিস্পন্দ, পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় কেন হল ? দেখুন, দেখুন।

সুমন্ত্র :—একি! তাইতো, সৈন্যগণের কোলাহল যে একেবারে প্রশান্ত হয়ে গেল। বৎস, বুঝেছি লব জৃম্ভকাস্ত্রে সৈন্যদের স্তম্ভিত করেছেন।

একবার মহাভয়ঙ্কর অন্ধকার।
আর বার তড়িতের রসনা বিস্তার ॥
আঁখি উন্মীলিত নিমীলিত অনুক্ষণ।
চিত্র লিখিতের ন্যায় হল সৈন্যগণ ॥
গভীর নরকোদরে তিমির যেমন।
জৃম্ভকাস্ত্রে ছাইয়াছে সমস্ত গগন ॥
উগরিছে অগ্নিশিখা কপিল বরণ।
প্রচণ্ড অনলে যেন দ্রবিত কাঞ্চন ॥
যুগপ্রলয়ের প্রায় ঘোর সমীরণে।
সঞ্চালিত শরপুঞ্জ হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥
যথা বিন্ধ্যাচলে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ রাশি।
সৌদামিনী গুহাচয়ে দিতেছে প্রকাশি ॥

কিন্তু এ কোথা হতে জৃম্ভকাস্ত্রের শিক্ষা পেলে ?

চন্দ্রকেতু :—অনুমান করি, ভগবান বাল্মীকির স্থানে শিক্ষা করে থাকবে

সুমন্ত্র :—বাল্মীকিতো অস্ত্র ব্যবহারে পটু নন—বিশেষতঃ জৃম্ভকাস্ত্রে। এ অস্ত্র কৃশাশ্বের নিকট বিশ্বামিত্র পেয়েছিলেন ; বিশ্বামিত্রের স্থানে তোমার জ্যেষ্ঠতাত রামচন্দ্র প্রাপ্ত হন।

চন্দ্রকেতু :—কিন্তু বেদমন্ত্র নির্ণেতা পরমপদ প্রাপ্ত অপর জ্ঞানীগণও তার ব্যবহার জানেন।

সুমন্ত্র :—বৎস, সাবধান— । ঐ বীরবালক সমাগত।

চন্দ্রকেতু :—আহা, কেমন করেই বা আমি এই মসৃণ রাজপট্ কান্তির প্রতি শরনিক্ষেপ করি। ওকে আলিঙ্গন করবার জন্য কদম কুসুমের ন্যায় পুলকে আমার লোমহর্ষণ হচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধ না করেও ক্ষান্ত থাকতে পারি না। আমার উভয় শঙ্কট হলো—লব কি মনে করবেন যদি আমি প্রতিনিবর্ত্তন করি। না—বীরবৃত্তি অতি নিদারুণ—স্নেহের পথে বাধা জন্মায়।

সুমন্ত্র :—(অশ্রুপাত করিতে করিতে) হৃদয়, তুমি কেন অসম্ভব কল্পনা করছো! এই বীর শিশুর আকৃতি ও প্রকৃতি অবিকল শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়, কিন্তু আমার সে আকাঙ্ক্ষা বৃথা—

মনোরথ বীজ দৈব করিল বিনাশ।
লতা কাটা গেলে কোথা পুষ্পের বিকাশ ?

চন্দ্রকেতু :—আর্য্য সুমন্ত্র! আমি রথ হতে অবতরণ করি।

সুমন্ত্র :—কেন ? কি কারণ ?

চন্দ্রকেতু :—এই বীরপুরুষের পূজা করা উচিত—বিশেষ পদচারীর সঙ্গে রথীর যুদ্ধ করা উচিত নয়—এই শাস্ত্র।

সুমন্ত্র :—আয়ুষ্মন্! তোমার এই ক্রিয়া যথার্থই শাস্ত্র সঙ্গত।

সাংগ্রামিক ন্যায় ইহা ধর্ম্ম সনাতম।
ইহাতেই খ্যাত রঘুবংশ সিংহাসন ॥

চন্দ্রকেতু :—(রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক লবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) আর্য্য! সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রকেতু তোমাকে অভিবাদন করছে।

লব :—কুমার, আপনি রথোপরি অতিশয় শোভান্বিত ছিলেন। আমার প্রতি এ সমাদর কেন ?

চন্দ্রকেতু :—হে, মহাভাগ—তাহলে আপনিও এক রথকে অলঙ্কৃত করুন।

লব :—(সুমন্ত্রের প্রতি) আর্য্য! আপনি পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে রথে প্রস্থাপন করুন।

সুমন্ত্র :—তুমিও তবে চন্দ্রকেতুর অনুরোধ রক্ষা কর।

লব :—আর্য্য! রথারোহণে আমার কোন আপত্য নাই। কিন্তু আমরা বনচারী—রথসঞ্চালনে আমাদের অভ্যাস নাই।

সুমন্ত্র :—বৎস, তুমি রাজসভার উপযুক্ত সৌজন্যগর্ভ বচন রচনে পারদর্শী। যদি ইক্ষ্বাকু কুলচন্দ্র রামচন্দ্র তোমাকে দর্শন করতেন ; তাহলে তাঁর হৃদয় স্নেহরসে প্লাবিত হত।

লব :—আর্য্য ; সেই রাজর্ষির সৌজন্যের কথা আমারা অনেক শুনেছি। (সলজ্জভাবে) আমরাও যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস নই ; আর কেই বা সেই রাজা রামচন্দ্রের গুণরাজির ব্যাখ্যা না

করে। কিন্তু তোমাদের তুরঙ্গ রক্ষক সৈন্যদের সাহংকার বাক্যে সমস্ত ক্ষত্রিয় কুলের অপমান হয়েছে।

চন্দ্রকেতু :—(মৃদুহাস্যসহ)—তবে কি আমার জ্যেষ্ঠতাতের প্রতাপাতিশর্য্য শুনে তোমার মনে ঈর্ষার উদয় হয়েছে ?

লব :—আমার ঈর্ষা জন্মেছে কিনা—সে কথায় কাজ নেই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, রাজা রামচন্দ্র যেখানে জিতেন্দ্রিয় এবং তাঁর প্রজাবর্গও জিতেন্দ্রিয়—তা না হলে, রাক্ষসকুল নিধনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন ? সেখানে তাঁর সৈন্যরা কেন রাক্ষসের মত সগর্ব্ব বাক্য বলে— ?

রাক্ষসের ভাষা সর্ব্ব শক্তিতা আকর।
তাহাতেই জগতের অশুভ নিকর ॥
কিন্তু সেই ভাষা মধু অমৃত নিলয়।
কামধেনু সম যাহা মোদিল প্রবয় ॥
পাপহীন নিষ্কলঙ্ক যশের নিধান।
সুনৃত সুধীর বলি কহেন ধীমান ॥

সুমন্ত্র :—সুপবিত্র চরিত্র বাল্মীকির শিষ্য এই বালকের কি জ্ঞানগর্ভ কথা—জ্ঞানী প্রবর ঋষিদের উপদেশেই এর চমৎকার জ্ঞানোপার্জ্জন হয়েছে।

লব :—কুমার চন্দ্রকেতু, তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করেছ, তোমার জ্যেষ্ঠতাতের প্রতাপাতিশর্য্যে আমি কি ঈর্ষা পরবশ ! আমি তার উত্তরে জিজ্ঞাসা করি— ক্ষত্রিয়দের ধর্ম্ম কি একমাত্র আধারে পর্য্যবসিত ?

সুমন্ত্র :—তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, তুমি নিশ্চয়ই রঘুপতির চরিত্র মহিমা অবগত নহ। সত্য বটে আমাদের সৈন্য সংহার করে অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছ ; কিন্তু তাই বলে তুমি অখণ্ড যশস্বী জামদগ্ন্য পরাভবকারী রামচন্দ্রের নিন্দা করতে পার না।

লব :—(সহাস্যে)—আর্য্য ; তোমাদের রাজা, জামদগ্ন্যকে পরাস্ত করেছিলেন বটে কিন্তু তাতে অহঙ্কারের বিষয় কি আছে ? এ কথা সকলেই জানে যে ব্রাহ্মণদের বীর্য্য কেবল বচনে মাত্র, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের বীর্য্য তাদের বাহুদ্বয়ে। কাজেই শস্ত্রগ্রাহী জামদগ্ন্যকে দমন করাতে তোমাদের রাজার আর প্রশংসা কি ?

চন্দ্রকেতু :—আর্য্য, আর্য্য ! আর বিফল বাগবিতণ্ডায় কাজ নেই। এই অভিনব পুরুষাবতারের কাছে ভগবান ভৃগুনন্দনও বীর নন।

লব :—কেনা জানে রঘুকুল পতির মহিমা।
আমি ক্ষুদ্র নরাধম কিবা দিব সীমা ॥
যাঁর এক কীর্ত্তি, সুন্দ সুন্দবীর জয়।
খরসহ যুদ্ধে অন্য কীর্ত্তির উদয় ॥
বালী বধে আর এক কীর্ত্তি চমৎকার।
অলক্ষ্যে মারিয়া বাণ কীর্ত্তির প্রচার ॥
মেঘনাদ সহ যুদ্ধ খ্যাত ত্রিজগতে।
তব তাতে কপি বাঁচাইল কোন মতে ॥

চন্দ্রকেতু :—(চঞ্চল হইয়া)—কি প্রগল্‌ভতা ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠতাতকে নিন্দা করে মর্য্যাদার সীমা লঙ্ঘন করলে ?

লব :—কি ? আমার প্রতি ভ্রূভঙ্গী !

চন্দ্রকেতু :—তবে এস। আর বিলম্ব কেন ?

লব :—এই নীল-লোহিত ললাটস্থ নয়নের অগ্নিরাশির ন্যায় অনল-বর্ষণকারী অগ্নিঅস্ত্র নিক্ষেপ করলাম—সামালো—সামালো—

চন্দ্রকেতু :—রসো—রসো—প্রবল জলদজাল বিস্তারিত ঘোরতর অন্ধকারাবৃত করাল কাল স্বরূপ বরুণ বাণে তোমার বাণ নিবারণ করছি।

(যুদ্ধারম্ভ এবং চন্দ্রকেতু ও লব যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।)

আসরে জুড়িগণের প্রবেশ ও গীত

মরি কি ঘোর রণ ছুটিছে প্রহরণ
উঠিছে অনুক্ষণ বিজলী মুখে তার।
দেখ প্রখর রাগে রঞ্জিত রক্তরাগে
যুগল আঁখি ভাগে অরুণ কমলাকার ॥
নাচিছে ভ্রূ-যুগল যেন ভ্রমর দল
কমল বনে বিহার করিছে অনিবার।
স্খলিত কেশজাল গলিত পুষ্পমাল
ঘর্ম্মে শোভিত ভাল কিবা সে মুক্তাহার ॥
প্রভাত ভানু সঙ্গে জবা কি ফুটে রঙ্গে
বহিছে সব অঙ্গে রুধির একধার।
বন্ বন্ বন্ বন্ বন্ ঘোরে বিমল সমর ঘোরে
ছাইল খরশরে বনের চারি ধার ॥

(যবনিকা)

চন্দ্রহংস নাটক*

—প্রস্তাবনা—

(সূত্রধরের বেশে নারদের প্রবেশ)

নান্দী-গীত—বেহাগ ধ্রুপদ

পরব্রহ্ম পরমেশং বিভোনির্ব্বিশেষং
ত্বং হি আদ্য মধ্য শেষং।
নিরাকার নির্ব্বিকার নিরাধার সর্ব্বাধার
পরিব্যাপ্ত সর্ব্বদেশং ॥
করুণাময়, করুণা বরুণালয়
দেহি করুণালেশং।
সৃজন পালন লয়, ইচ্ছাধীন সমুদয়,
তাপহর ত্রিলোকেশং ॥ (প্রস্থান)

(দুইজন সেনার সহিত অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জুন। ওহে সেনাগণ! আজ যজ্ঞের অশ্ব যে কোথায় গেল, তার কিছুই ত সন্ধান হয় না।

১ম সেনা। হাঁ, কুমার! আজকে ঘোড়ার তত্ব পাওয়াই দায়।

(নেপথ্যে বীণাধ্বনি)

২য় সেনা। কুমার শুনুন, শুনুন! ঐ শুনুন কি যে আশ্চর্য্য বীণার ধ্বনি হতেছে।

অর্জুন। অহো! আজ বড় শুভদিন যেহেতু দেবর্ষি নারদের সহিত সাক্ষাৎ হবে।

(নারদের পুনঃ প্রবেশ)

আগচ্ছ! আগচ্ছ! মহামুণে—আগচ্ছ!

নারদ। জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেসাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ। ধনঞ্জয় কুশল কহ।

অর্জুন। শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সকলি মঙ্গল, কিন্তু—

নারদ। কিন্তু কিহে?

অর্জুন। আজ যজ্ঞের ঘোড়ার তত্ব পাওয়া যায় না।

নারদ। ওহে তার নিমিত্তে এতটা চিন্তে কিসের—আমি তার অনুসন্ধান দিতেছি।

অর্জুন। তবে যথাবিহিত আজ্ঞা হউক।

নারদ। তবে শোন—কুন্তিনী নগরধিপতি পরমভাগবৎ চন্দ্রহংস নামা রাজা তোমার সারথীর চরণাবলোকন করণ মানসে মকরাক্ষ ও পদ্মাক্ষ নামক পুত্রদ্বয়কে যজ্ঞের ঘোড়া ধরতে আজ্ঞা দিয়েছেন। তাহারাই ঘোড়া ধরিয়াছে।

অর্জুন। মহাশয়, বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ সদাত্মাদিগের কথা আপক্ষা জগতে আর কিছুই মধুরতর নাই; অতএব আপনি চন্দ্রহংস রাজার ইতিহাস প্রকাশ করুন।

---

* সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা সম্ভব পর হইল না।

নাবন্ন। তবে অবধান কর।

(সকলের প্রস্থান)

—ইতি প্রস্তাবনা—

প্রথম অঙ্ক—প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুণ্ডিনী নগরের নিভৃত স্থান বিশেষে কতিপয় অন্তরঙ্গের সহিত ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।

ধৃষ্টবুদ্ধি। ওহে বন্ধুগণ!

বঃ গণ। আজ্ঞে কি বলছেন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমরা ত দেখ্‌ছো, আমাদের রাজাটা দিন দিন বয়ে যাচ্ছে; রাজ্যের কিছুই তত্ত্ব লয় না; কেবল জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞ নিয়ে দিনরাত থাকে—কি পাপ! কতকগুলো ফুল চন্দন নিয়ে জল ছ্যাচে; জল যদি ফুলগাছে দেয়, তবু তাতেও কিছু ফল আছে। এমন মুখ্যুও কোথাও দেখিনি—কাব্য, কলা, আমোদ প্রমোদ সব অধঃপাতে গেছে—

নাহি আর রাজসাজ হয়েছেন তিল্‌কে।
ক্ষত্রিয় জাহাজ হয়ে আজ কাস্ খিল্‌কে॥

মদ্য মাংস বিবর্জ্জিত নাহি পুজে কেল্‌কে।
মাথায় চৈতন ফক্কা যেন রোগা শেল্‌কে॥

আমার মতে এই বিট্‌লে রাজার প্রাণসংহার করাই উত্তম কল্প।

জনৈক। যে আজ্ঞে! ঐ পরামর্শই উত্তম—এ অকর্ম্মণ্য রাজার কোন্ প্রয়োজন? একে সংহার মুদ্রা দেখিয়ে মশায় রাজা হন এ আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা।

ধৃষ্টবুদ্ধি। এমন কথাও হয়!

জনান্তর। রাশি রাশি চুণা-পুঁটি করিয়ে সংহার।
এতদিন রাজ্যহ্রদে করিলে বিহার॥
এবার কাত্‌লা মারি হও হে প্রধান।
তা না হলে কুম্ভীরের কোথা থাকে মান?

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমরা ত মেরে ফেলতে বল,—কেমন করে ফেলা যায় বল দেখি?

জনৈক। মশাই কোন রকমে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলুন না।

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাধু সাধু, বেশ বলেছ। এখন বল দেখি কিরূপে বিষ খাওয়ান যায়!

জনান্তর। মিষ্টান্নযোগে—

ধৃষ্টবুদ্ধি। তা আর হয় না; রাজার আর সে কাল নেই—মেঠাইমোণ্ডা আর রোচে না। দিনান্তে মাল্‌সা পুড়িয়ে ঠেঁটে কলার ঘাড় ভাঙ্গেন।

জনৈক। রাজা দুধ খায়—তার সঙ্গে বিষ দিলে হতে পারে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। আচ্ছা বলেছ—তবে বাগুরা গোয়ালিনীকে ডাক—তারি এ কর্ম্ম।

[নেপথ্যাভিমুখে জনৈক পদাতিকের বাগুরাকে আহ্বান।]

পদাতিক। অ রে বাগুরী গোলিনী! আরে ও বাগুরি! বাগুরী হো—বাগুরী ঘরমে হ্যায়?

(বাগুরার প্রবেশ)

বাগুরা। (পদাতিকের প্রতি) কে রে? কেন গো গেরস্ত গারস্ত ঘরের মেয়েছেলেকে অমন করে ডাকা—কেন গো?

পদাতিক। আরে ভোঁষড়ী—দেওয়ানজি মোশে, তোহাকে ডাক্‌ছে, কুছু কোথা বাতরা হোবে। রাম দোহাই—কুচ্ছু ভয় না আছে।

বাগুরা। চ, চ, এই পোদ্দারের দোকান হয়ে যাচ্ছি। ও মা এত তলব কিসের গা—

পদাতিক। আরে শমুরী, পদ্দার পদ্দার করিয়ে করিয়ে সারা দিন রাত মারা হোগি! পদ্দার কে এত জরুর কেন আছে?

বাগুরা। আর বাবু পোদ্দারের জন্যেই আমার সব্বনাশ হল—আমি হাড়ে-নাড়ে জ্বালাতন হয়েছি! জান্‌লে জমাদার ঠাকুর? বুঝি পোদ্দারের জন্যেই আমার পেশাটা উঠলো।

পদাতিক। আরে সে কি রে?

বাগুরা। তবে শোন।

বাগুরার গীত

রাগিণী—ঝিঁঝিঁট তাল—একতালা।

আরে আরে, আমার দুধের যোগান দেওয়া হলো দায়।
দুধের যোগান দেওয়া হলো দায়—
এ দুঃখ কহিব বল কায়?
নয়নে বিষম নেশা কিরূপে চালাব পেশা,
কি করি বলনা—পিরীতি ছলনা—ললনায়॥

[গীতান্তে ধৃষ্টবুদ্ধিকে প্রণাম করিল।]

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে ও বাগুরা! তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।

বাগুরা। কি কথা গো! ও মা—আমার সঙ্গে আবার কিসের কথা গো?

ধৃষ্টবুদ্ধি। শোন্, শোন্, শোন্!

বাগুরা। শোন্—শোন্ কি গো? আমাদের ত শোন্-পাটের ব্যবসা নেই—দুধের ব্যবসা—তাতে কিছু বলবার হয় বলুন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। বাগুরা, আমি তোমায় একটি ভার দেবো। সে ভারটি বড় গুরুতর—সামান্য দুধের ভার নয়।

বাগুরা। (নিম্ন স্বরে) ও মা! এ আবার কি ছেঁদো কথা! (জোরে) কি ভার মশয়?

ধৃষ্টবুদ্ধি। গোয়ালিনী, তোর সঙ্গে কিছু গোপনে কথা আছে।

বাগুরা। গোপনে আবার কিসের কথা মশয়? যা বলতে হয়, এই সভার মাঝখানে বলুন।

[ধৃষ্টবুদ্ধি বাগুরার কানে কানে কথা কহিলেন]

না মশয়, আমরা এমন নষ্টদুষ্ট অমন্দ মেয়েছেলে নই।

(বাগুরা প্রস্থানোদ্যত হইল।)

ধৃষ্টবুদ্ধি। আরে ও বাগুরা—ফেরো, ফেরো।

পদাতিক। আরে ও গোলিন্, তোহার মাথাটি খাই—কোথা যাস্, হেথা আ রে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। (অঙ্গুলি প্রদর্শনপূর্ব্বক) কেন? এতে তোর অলাভ কি?

বাগুরা। বলি, দেয়ানজি মশয়, তা নয়। আমি আপনার কথাটা ভাল বুঝতে পাল্লেম না।

ধৃষ্টবুদ্ধি। (শ্লিষ্ট ইঙ্গিতে) তুমি বড় হাবা! চুণ দিয়ে পান খেতে জান না! (আরক্ত নয়নে) মর্ মাগী—আমার সঙ্গে আবার চালাকী!

বাগুরা। (সভয়ে) আজ্ঞে না, না—বলি তা নয়। মোরা মুরুক্ষু সুরুক্ষ্ লোক, ছেঁদো কথা টতা বুঝতে সুঝতে পারিনে—তবে নিতান্ত যে বুঝতে পারিনে এমনও নয়। মশয়ের কথাটা যেন কেমন কেমন লাগছে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। কেমন লাগছে? মিষ্টি না তেতো? যদি তেতো হয়—তবে তোর যাতে মিষ্টি লাগে তা করে দেওয়া যাবে। পাকা ইমারৎ—পাঁচ হাজার খান্ মোহর—কেমন! আর কিছু চাই?

জনৈক। আর একটি জোয়ান রকম দোয়াল। ব্যস্, একেবারে সোনার ওপর মীনা!

বাগুরা। শুনলেন দেন্‌জি মশয়—একি ভদ্দরলোকের ছেলের মত কথা? মোরা গেরস্ত গারস্ত ঘরের বৌ ঝি, অমনধারা ঠেস্বাঠুস্বি সইতে পারিনা।

জনান্তর। তা সইতে পারবে কেন?

বাগুরা। (সক্রোধে) পেন্নাম্ হই দেন্‌জি—আমি চল্লুম, মশাইএর কাছেও যদি মোদের ইজ্জৎ হুরমৎ রইল না, তবে আর কোথায় থাকবে?

ধৃষ্টবুদ্ধি। (সক্রোধে পারিষদদিগের প্রতি) তোমরা কি হে! কাজের সময়ে অগড়ম্ বাগড়ম্ কথা কইতে তোমাদের কে বলে? এ সময় রসিকতা ভাল লাগে না। ভাল গোয়ালিনী—এর বিহিত করা যাবে—এখন শোন দেখি।

বাগুরা। আচ্ছা, বলুন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। রাজার অন্তঃপুরে তুমি যে দুধের যোগান দিয়ে থাক, তার নিয়ম কি?

বাগুরা। এই বড় মা-রাণীর মহলে আদ্‌মোণ; আর ছোট মা-রাণীর পনেরো সের; আর সখী সইলিদের দু'সের করে বরাদ্দ আছে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। আরে না—আমি জিজ্ঞেস করি রাজার জন্যে কত দুধ দিয়ে থাক।

বাগুরা। আজ্ঞে এই আমার নন্দিনী বলে যে একটি কামধেনু আছে, তাকে একবার দুইলে আদসের হয়, সেই দুদ্‌রত্তি দিয়ে রাজা শালগেরাম নাইয়ে তাই ভাতের সঙ্গে খেয়ে থাকেন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। (মৃদুস্বরে) ভাল, সেই দুধের সঙ্গে যদি কোন কাণ্ড কারখানা করতে পারিস তবে যা দিতে চেয়েছি তা ভিন্ন আরো কিছু দিতে পারি।

বাগুরা। মশয় যা থাকে ভাগ্যে, একখেলা খেলবো—মশয়ের অনেক নূন খেয়েছি।

(সকলের প্রস্থান)

চন্দ্রহংস নাটকের কয়েকটি গীত

বেহাগ— ধ্রুপদ

পরব্রহ্ম পরমেশং বিভো নির্ব্বিশেষং ত্বংহি আদ্য মধ্য শেষং
নিরাকার নির্ব্বিকার নিরাধার সর্ব্বাধার পরিব্যাপ্ত সর্ব্বদেশং
করুণাময় করুণাবরুণালয় দেহি করুণালেশং
সৃজন পালন লয়, ইচ্ছাধীন সমুদয়, তাপহর ত্রিলোকেশং।

ছায়ানট— একতালা

শুধু ভাঙ্গা গৃহ দিলি। কালি মা গো!
দিনে দিনে বাঁধন ছিঁড়ে ঝুলে ঝিলি মিলি॥
এক ঘরে নটা দ্বার, তবু তাহে অন্ধকার।
জ্ঞানের আলো নাহি জ্বলে—আঁধারে রাখিলি॥

মালকোষ—একতালা

চলে রঙ্গে ভঙ্গে রঙ্গিণী সঙ্গে লইয়ে সঙ্গিনী,
যেন চঞ্চলতা গেল উদিত হইল সৌদামিনী।
মত্ত মাতঙ্গ গামিনী ধনী চম্পক বরণী রমণী মণি,
ঈষদ হাসিনা মধুর ভাষিণী, রূপে রতি সতী অরুন্ধতী জিনি॥

ইমন—জলদ তেতাল

ঐ এল্যো যামিনী নাগিনী, দংশিবারে বিরহিণী।
আকাশের নীল কায়, তারাগণ শোভাপায়,
তারা কভু নহে তারা, চিত্র করা ভুজঙ্গিনী।
শ্বাস ছলে মৃদু বায়ু, হরে বিরহীর আয়ু,
হিমবিন্দু বিষবিন্দু বরিষে ফণী ভামিনী॥

বেহাগ—একতালা

কি শোভা হেরি, আ মরি! কে দেখেছে হেন শোভা গো!
মেঘের শোভা সৌদামিনী, চাঁদে শোভে যামিনী,
এ যে শোভে চাঁদের কোলে তড়িৎ লহরী!
কে ছোট কে বড় রূপে, ভিন্ন নহে কোন রূপে,
সোণাতে মিশিল সোণা, দেখ সবে নয়ন ভরি।

—:*:—

অভিনন্দনপত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র মহাশয় বিজ্ঞবরেষু। মহাশয়!

আপনার এ নগরে শুভাগমন হওয়ায়, আমরা এতদ্দেশীয় জমিদার ও নগরবাসিগণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও সদালাপ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত কার্য্যের অনুরূপ যথোচিত সম্মান করিতে অসমর্থ; কিন্তু স্ব স্ব মনোগত অভিপ্রায় যৎকিঞ্চিৎ আপনার নিকট ব্যক্ত না করিলে আপনার অনুগ্রহভাজন হইতে পারি না, এজন্য আমাদের ক্ষমতানুরূপ যৎসামান্য প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম। যদিও আপনি ভিন্নদেশনিবাসী তথাপি আপনার সহিত আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ সমন্ধ আছে; কারণ, আমরা সকলে এক রাজার অধীনে থাকিয়া, এক প্রকার শাসনের ফলাফল ভোগ করিতেছি; বিশেষতঃ, আপনি আমাদের উড়িষ্যা প্রদেশের এক উৎকৃষ্ট জমিদারীর অধিকারী, সুতরাং কোন প্রকারে আমরা আপনাকে ভিন্ন জ্ঞান করিতে পারি না, এবং আপনার নানাবিধ যত্ন ও চেষ্টায় উড়িষ্যার যে সকল হিত সাধিত হইয়াছে, আমরা তাহা স্মরণ করিয়া আপনাকে আত্মীয় জনের অপেক্ষা অধিক প্রিয়জ্ঞান করি।

যদিও প্রশংসিত ব্যক্তির প্রশংসা কীর্ত্তন করিলে, তাহা প্রশংসিতের প্রীতিকর হয় না, কিন্তু চন্দ্রদর্শনে সমুদ্র উচ্ছলিত না হইয়া ক্ষান্ত হইতে পারে না; অতএব আপনার যত্নে সাধিত মহোপকার গুলির দ্বারা পূর্ব হইতে আমাদের চিত্ত কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ থাকায়, সম্প্রতি আপনার দর্শনলাভে স্ফীত হইয়া, এরূপ প্রবহমান প্রবাহে আপনার গুণানুবাদকীর্ত্তনাশয়ে উন্মুখ হইয়াছি যে, আমরা কোন প্রকারে মৌনাবলম্বন পূর্বক নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না। আপনি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ অর্থাৎ 'ভারতবর্ষীয় সভা'র একজন সুযোগ্য সভ্য, উক্ত সভা অস্মদ্দেশীয় লোকগণের আশা-কল্পতরুস্বরূপ, তদ্দ্বারা নিত্য নিত্য আমাদের যে কত প্রকার হিত সাধিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আমরা সম্যকরূপে ব্যক্ত করিতে অক্ষম। আমরা উক্ত সভা হইতে দূরে থাকিলেও, সভার সভ্যগণ আমাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। সে সভার কার্য্যকলাপদর্শনে আমরা এরূপ মোহিত হইয়াছি যে, অদ্য কয়েক মাস হইল, আমরা একটি শাখা সভা স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছি। দুর্ভিক্ষের সময়ে উক্ত সভা গবর্ণমেণ্টকে সৎপরামর্শপ্রদানে লেশমাত্র ক্রটী করেন নাই। এবং ১২৭৩ সালে রাজস্ব মাপের আজ্ঞা প্রচার হইতে বিলম্ব হইলে সে সভা দ্বারা সে বিষয়ের উদ্যোগ এবং আপনার কর্ত্তব্য সাধনে ক্রটী হয় নাই; এই সভা দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান না হইলে জমিদারগণ ও প্রজাগণকে যে কতদূর ক্লেশ সহ্য করিতে হইত, তাহা সকলে সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা এক্ষণে আপনাকে উক্ত সভার প্রতিনিধি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, সভার প্রতি আমাদিগের মনে যেরূপ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারসের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা এক্ষণে ব্যক্ত না করিলে, এরূপ সুযোগ আর পাইবার আশা নাই। কেবল আপনি ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য বলিয়া যে আমাদিগের প্রতিষ্ঠার পাত্র হইয়াছেন, তাহা নহে; আপনি অন্য লোকের সহায়তায় অথবা স্বতন্ত্ররূপে এদেশের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত অবিচলিত চিত্তে যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এবং গতবর্ষে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য যেরূপ সুপ্রণালীতে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণস্থল।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষনিবারণের সাহায্যদান সভার সভ্যস্বরূপে আপনি যেরূপ সু-বিধানের অনুষ্ঠান করিয়া, আমাদের দেশের অসহায় ভদ্রকুলজাত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না। এদেশের জাতিসংস্কার অতি গুরুতর নিয়মে বদ্ধ আছে, জাতিনাশের ভয়ে লোকগণ সর্ব্বদা সাবধানে পূর্ব্বাপরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে কাল যাপন করে। বস্তুতঃ

জাতিভ্রষ্ট লোকসকল সমাজভুক্ত হইয়া থাকিতে না পারিলে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ; কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রথম বর্ষে এবিষয়ের প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত না করায়, অনেক লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে ; যাহাদের জীবনাশা বলবতী হইয়াছিল, তাহারাই অন্নছত্রে ভোজন করিয়া, জাতি কুল মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়াছে। যদি দ্বিতীয় বর্ষে এপ্রকার লোকদিগের সাহায্যের জন্য বিশেষ উপায় বিহিত না হইত, তাহা হইলে এদেশের যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইত, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু আপনি সে সকলের উদ্ধারের মূল কারণ। আপনি সাহায্যদানসভায় থাকিয়া, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণের ঘরে ঘরে শুষ্ক তণ্ডুল বন্টন করিবার বিধান করায়, তাহারা সম্যকরূপে আপনাদের জাতিরক্ষা করিয়া অন্নকষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। ভদ্রলোকের সংখ্যা যত অধিক হয় দেশের তত শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু আপনি রক্ষা না করিলে, এ প্রদেশের লোক সকল কি প্রকারে দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিত, তাহা অন্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন।

রাজস্ব মাপ সম্বন্ধে জমা ওয়াশীল বাকী কাগজ দাখিল করিবার বিরুদ্ধে আপনি যে সকল হেতু দর্শাইয়াছিলেন, তাহাতে অত্রস্থ জমিদারগণ আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। এবং যদিও গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া প্রথমত উক্ত কাগজ গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই ; কিন্তু আপনার আপত্তি সকল সর্ব্বাংশে যথার্থ বলিয়া, এক্ষণে উক্ত কাগজ লইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্ব্ব হইতেই গবর্ণমেণ্টকে সুপরামর্শ দেওয়ায়, আমাদের মন আপনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যৌক্তিকতা বিষয়েই হউক, অথবা সমস্ত জমিদারগণকে সমানরূপে শতকরা ৪০, চল্লিশ টাকা মালিকানা দেওয়ার প্রস্তাবেই হউক, আপনি এ সমস্ত ব্যাপারে যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন। যদিও আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বঞ্চিত হইলাম, তথাপি সমান রূপ মালিকানা পাইবার সম্পূর্ণ আশা দেওয়া গিয়াছে। অতএব, যে প্রকারেই আমরা আপনার বিষয় আলোচনা করিতেছি, ততই আপনি আমাদের যে একজন প্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী, একথা পুনঃপুনঃ আমাদের মনে বদ্ধমূল হইতেছে।

জগদীশ্বর আপনাকে যেরূপ উচ্চপদে আরোহিত ও বিশেষরূপে গুণশালী করিয়া, সাধারণের হিতসাধন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ এই উড়িষ্যা প্রদেশের প্রতি করুণা কটাক্ষ করিয়া আপনাকে এ প্রদেশের এক প্রধান জমিদারীর অধিকারী করায় আমাদের মঙ্গলের উপায় যে আপনার দ্বারা সাধিত হইবে, সে আশাও দৃঢ়তর হইয়াছে। অতএব আমরা এই প্রার্থনা করি যে, করুণাময় পরমেশ্বর আপনার শরীর ও মনোবৃত্তি সকল সুদীর্ঘকাল সবল ও সতেজ রাখুন। উত্তরোত্তর আপনি সম্যকরূপে সাধারণের মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হউন। আমরা তাহা দর্শন করিয়া পরম সুখ লাভ করি। পরিশেষে আমরা এইমাত্র নিবেদন করিতেছি যে, আপনি স্বাভাবিক সদাশয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের এই কৃতজ্ঞতা ও স্নেহসূচক অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে একান্ত বাধিত ও বশীভূত করুন।

Bholanath chunder—Raja Digambar Mitra C. S. I HIS LIFE AND CAREAR, Vol. I, Second edition—1895, Chapter, XIV Public Reception of Digambar at Katak, P 245—249

কটকে ডেপুটি কালেক্টর বাবু জগমোহন রায়ের বৈঠকখানায় দিগম্বর মিত্রের সম্বর্ধনা হয়। উৎকল দীপিকা সাপ্তাহিকের ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮১৮ সংখ্যায় এই সম্বর্ধনার বিবরণ ও অভিনন্দনপত্র অতিরিক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী রবিবারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎকলদীপিকা থেকে সম্বর্ধনার বিবরণও দিগম্বরের জীবনী গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে।

আলোচ্য অভিনন্দনপত্রটি রঙ্গলালের রচনা বলিয়া অনুমিত হয়।

তৃতীয় সর্গ।— ৪১

বিফল বিবাহ।

শিখরে সঞ্চিত বারি, নির্মল-মনোহারী,
অতিবেগে— নিম্ন দেশে ধায়।
পাষাণে রচিত বর্ত্ম, ফিরে তার গতি বর্ত্ম,
ঘুরে ঘুরে স্রোত ফিরে যায়॥
তাহাতে রচিত হ্রদ, কিবা বারি সুবিশদ,—
সমুজ্জ্বল দর্পণের রূপে।
প্রকৃতি বেশেছে সাজি, ইন্দ্রনীল রত্নরাজী,
গলাইয়ে সোহাগ-আগুনে॥
সেইজলে শত শত, মানিকের তোড়া মত,
শোভা পায় রক্ত কোকনদ।
স্ফটিকের দীপাকার, কিবা ভাতি চমৎকার,
বিকশিত শ্বেত শতদল॥—
কমল কুমুদ কোলে, লিপ্ত আশা-রসভোলে,
উঠিবার শক্তি নাহি আর।

উমা কাব্যের—তৃতীয় স্বর্গ, পৃষ্ঠা ২৯১ দ্রষ্টব্য।

The Native Aristocracy of Bengal

[For the Calcutta Literary Gazette.]

June 7, 1856. pp. 355.

Is there or was there ever such a thing as an aristocracy in Bengal? Bengal though not a country classed among the ancient seats of civilization in India, still had its kings and barons more than two thousand years ago; but the descendants of the Boodhist family of Pauls, the Brahmin worshipping dynasty of Adisoor, and the Coolin creating Sens of Bicrampore are now no more. Still we have the very independent little principality of Tipperah, the annals of which were shronicled in verse by bards eight hundred years ago. Then we have the Raj family of Cooch Behar compared with the antiquity of which the Burdwan family is but of yesterday. Next in rank are those who were created Rajahs by the Emperors of Delhi, such as the extinct house of Protap Aditya, the Rajahs of Natore, Burdwan, Nuddea, &c. The first of these once became so powerful that it had thrown off allegiance to its imperial linage lord, the Nabob of Moorshedabad was in dread of Protap Aditya, and Jehangeer was compelled to send *Man Sing*, the celebrated Hindu general with a strong force to punish this rebel;—it was the timely assistance and services rendered to this Army during one of those dreadful Nor Westers so prevalent in Bengal that procured for the once opulent Roy family of Nuddea the title of Rajah and the Zemindary which once stretched from Krishnagore to the Northern skirts of the Bay of Bengal. Besides these there are the descendants of many petty barons, who styled themselves Rajahs and were scattered throughout the Midnapore districts, many of whom were reported to be smugglers and supporters of Portuguse pirates that infested the courts. Latterly when the British lion began to "rule supreme" over the destinies of India, and when the fallen representative of the House of Tamerlane had nothing to give away but empty and high-sounding titles and honors, he lavished them profusely upon protegees and servants of English Governors to ingratiate himself into their favour. These were Nubkissen Moonshee, of Sobhabazar, Ramlochan Roy of Andool, and Jaynarain Ghosal of Bhoocoyloss &c., &c., &c. There were Rajahs too created by the English, whenever they were benefitted by the parties so created, but the patents were procured from Delhi and signed and sealed by the Emperor for in his name the English, thought it politic

to rule at that time. Lokenath, an oilman, was created a Rajah for concealing and protecting Mr Hastings when the factory at Cossimbazar was captured by Surafadoula. Sookmoy, a rich banker, and another, and opulent weaver of danish bunder, were also dignified with the little of Rajah for supplying the English with funds to carry on Guerilla warfare of those time. Of late the Government confers this superlatively high title on men who contribute munificently to undertaking conducive to the welfare of the country. Our late Governor General created two of these Rajahs when Rajah of Puttiala and the Burmese Ambassadors were sojourning here. These then constitute the aristocracy of Bengal. But who are the Coolins, about whom so much of late was written and spoken ? The "high born" of the lands who claim supreme ascendancy in questions of hymeneal privilages ? They are the pure descendants of five Brahmin Knights, and their *Sudra* squires, who fifteen hundred years age came from Canouge in Upper Hindustan and settled themselves in Bengal by the invitation of Adlsoor the then king of Vicrampore. Formerly the following nine merits were required in the order of Coolinism, good conduct, humility, learning, fame, pilgrimage to the sacred shrines, firmness of purpose,wealth,devotion, and charity but the degenerated dececendants of the original Coolins can claim no such virtues of their noble Ancestors save the pride of high birth and the unnatural privilage of marrying at their will ; but they are falling fast in their glory, and the faster they fall the better.Before we conclude, let us speak a word or two by way of recomendation to the powers that be to regularate this aristocracy and give it an European form for it has been shown that almost all the opulent and worthy nobles of Bengal date the origin of their dignity to their English conquerors. Therefore it is high time they should be classified according to their ranks and privileges. Then again the little of Rajah being a very dignified one,for it means "A king" in its original signification, it is ridiculous to see the Governor General conferring the same on persons at his pleasure. The patents ought to bear the seal manual of the Sovereign instead of his delegate. Whenever the Governor General thanks proper to confer a little on some worthy man, let it be a less dignified onc than a Rajah. Why not procure Kingthoods and Baronetcies and but the worthies who have rendered invaluable service to the Government or the country with them ! Some delicate ears there are which could not bear to hear of a "Sir *Prosonokoomar Tagore* ;" but this must be sheer prejudiee, for "*Tempus vincit*

amnr,' They feel no disgust in using the cognomen of Knighthood, while speaking of the cetebratecl Parsee Knight of Bombay.

THE NATIVE ARISTOCAREY OF BENGAL.

The Calcutta Literary Gazette : September 6, 1855. pp. 564-5.
To the Editor of the Calcutta Literary Gazetee.

Sir, In an articale on the above subject which appeared in your paper some time ago, I had traced out the origin of the Nudia family by stating that the Patriarch of it (Bhubanund) having assisted the celebrated Rajpoot General Mansing in quelling the insurreetion of a petty chieftain in Eastern Bengal, this was of course, did obtain the title of Raja from Jehanguire— given out on the authority of Bharut Chunder, a Bard, who flourished in the court of the Nadia Raja a hundred years ago. *The Hindu Patriot*, however, while noticing the article, contradicted this by asserting that the family was first ennobled with the title of Raja by the British Government in the person of Shibchunder, great grand father of the present Raja. This led me to make proper inquiries by referring the matter (through a friend) to the Raja himself, who was very kindly furnished me with the necessary information. The purport of which is as follows :

"The original *firman* granted by Jehanguire. to Bhubanund is lost but there is sufficient proof of the famiiy's being ennobled long before the English ever thought of holding supreme sway in India. There is a letter patent still extant in the family bearing the seal and signature of Aurunzebe, in which Rudra Roy, great grand father of Krishna Chunder and grand son of Bhubanund, was spoken to which the little of Raja Bahadoor. The date of this *firman* was destroyed by worms. Then, again, the Emperor Mahomed Shaw conferred on Krishna Chunder the title of Maharajender Bahadoor. The *Sumud* bears the Persian date, 25 Rubee-ul-Aoose of 17th Juluse. His son and successor Shibchunder had the title of Maharaja Deeraj Bahadoor from the then Nawab of Moorshedabad, and afterwards acknowledged as such by the British Government.

The *Patriot* also erried in contradicting my assertion that Lokenauth was made a Raja for concealing and protecting Mr Hastings when the tactory at Cossimbazar was seized by Seraj-ud-Doula. The *Patriot* says the title was not a formal one—but what I learn from a creditable source goes far to establish my former statement —with this exception only—that Mr Hastings found shelter under Kant Baboo, father of Lokenauth ; but the old man declined the

honor of a title for himself urged by Hastings—reserving it at the same time for his son Lokenauth, Accordingly the title was pertuated in the family ever since. If the *Patiot* would take trouble of searching the Archives of the Government House, he could find the record of Lord Auckland's formally conferring the title on Kishen Nauth; the unfortunate victim of Terrorism, who committed suicide some years ago.

Yours faithfully

Khidderpore, 30th July 1856. R

AN INDIAN JACK SHEPPARD

The Calcutta Literary Gazettee : July 12, 1856. p. 435.

The days of a Bishonaut Baboo or a Ragunaut Baboo were long gone by, when fresh acts for the supression of docoities engaged the attention of the Lagislature, and Commissioner with high pay and a large retinue paraded throughout the length and breadth of the Lower Provinces ; and when Magistrates and their subordinates appeared even on the scent. At this time a daring Bengalee out-law returned home from transportation. The following translation of a letter in the *Prabhakur*, would be read with interest by the anthor of *Jack Sheppard.*

(*Translated from the Probhakur, 11th June, 1856.*)

Gour Churn Majee, a famous dacoit Chief of Bissenpore, Zila Baraset, was first apprehended by the authorities for his innumerable delinquencies in 1842, after eluding various pursuits for a length of time, and was incarcerated for the period of six months with hard labour and in chains, but in a very short time he made his escape by scaling the high walls of the Alipore Jail : being obliged to surrender himself again he was committed this time for three years, bound all fours manacles and chains ; in a few days, however, he was again enabled to scale the prison walls which are reported to be 14 feet high, and closely guarded by well-armed sentinels but his exploits do not end here. By way of defience, he prepetrated a daring gang robbery in a village called Ramsagur, on his way home. The then Magistrate of the Zillah arrested him after a most tiresome chase, and imprisoned him in an iron cage, but from this he three times escaped, till at last, the Magistrate was ordered by the Sudder Nizamut Adwalut to barand the felon's forehead and transport him for life to Penang. Whilst leaving these shores he consoled his relatives and friends by saying

that he would return soon. Look then at the almost miraculous achivement of this docoit ! He kept his word,—he did return home —but the Darogah of Thanna Bissenpur with his myrmidons arrested him on the 26 May last, and amid a hundred drawn swords he was sent to the Magistracy to take his trial. He was asked by the Magistrate to relate the real facts as to how he had braved the ocean and regained his native shore. The brigand replied by saying that after passing three years of captivity in despondency he one day dreamt that his family were incessantly bemoaning his fate, particularly his mistress, for whom he was to be banished for ever from his fatherland ; she with dishevelled hair and tatters weeping for his loss. He awoke from his troubled dream and the following morning he made his escape from the Jail, and threu himself on the mercy of the waves in despair. He caught at something floating in the waves, but was overcome and lost his senses ; he knew not how long he was in that state. After some days he found himself thrown ashore in a deep wood, where he wandered for three days, subsisting on wild berries and fruits. At last he reached a miserable hamlet, on hls way to Calcutta. He reached the metropolis, from whence a mouth before had returned home, and passed some days in merriment and festivity with his family and friends. The dacoit went on to say "the Darogah has apprehnded me without any cause, so your Worship will kindly set me at liberty."

R

PROCEEDINGS OF THE ASSATIC SOCIETY OF BENGAL FOR JANUARY, 1874.

4. Identification of certain tribes mentioned in the **Puranas with those noticed in Col. E. T. Daltons Ethnology of Bengal.**

—By Babu Rangalal Banerji, Deputy Magistrate, Cuttack.

Little has hitherto been done to identify the various aboriginal races casually noticed in ancient Sanskrit literature. The notes on the subject appended to Professor Wilson's transltion of the *Vishnu Purana*, valuable as they are, as embodying the opinious of a through scholar and a man of vast experience, are nevertheless brief, obscure and often unsatisfactory, particularly regarding those races whose representatives are now no longer extant, or are few, insignificant or widely scattered. Particular races such as the Coles. the Bheels and the Khonds, have been described at greater length in many essays and reports, but in their cases attention has been confined to what they now are, and nothing, or next to nothing, has been done to unravel their ancient history. The Nagas

have been more fortunate ; they have had a great number of historians, and a great deal has been already written about their antiquity ; but even as regards them, much yet remains to be known of what and who they were. The little knowledge hitherto possessd by European scholars regarding the autochthones of India have been a serious impediment in the way of a successful study of this branch of Indian archæology. Few knew the the names of the ancient races, and fewer still of the modern ones with whom they could compare them. This difficulty has, however, now been in a great measure removed. The publication of Col. Dalton's magnificent work on the Ethnology of Bengal has placed in the hands of the public a large mass of information on the subject of the most authentie kind, and the way to identification on the part of those who are familiar with Sanskrit literature, is elear. The learned author has not himself attempted much in the way of identifying the races he has described with those named in Sanskrit works, but his book affords valuable help in the prosecution of the task ; and I have availed myself of it in compilling the following rough notes regarding the antiquity of some of the races noticed by him. My object is to bring together all the salient points regarding the different races from Sanskrit works and to render them easily accessible to European scholars as helps towords further reaearch.

No. 1. The first races I have to notice are Kiratas, otherwise called Kiratis and Kirantis.

Manu clsassifies the Kiratas under the head of Mlechchhas in Chapter X, where he reckons them along with the Paundras, Odras, Dravidans, Kambojas, Yavauas, Paradas, Chinas and the Pahnavas, All these tribes have been indentified ; the Paundras or Paundrakas were the people of Western Bengal. Professor Wilson enumerates the following districts of Bengal aud Behar to have comprised the ancient Pundra, viz. Rajshahi, Dinajpur, Rangpur, Nadiya, Birbhum, Burdwan, Mindapur, Midnapur Jangal Mahals, Ramgarh, Pachets, Palamow and part of Chunar. The word Pundra signifies sugarcane of a particullar species, called Punri Akh in Bengali, so that Pundra evidently means the country of sugarcane. It may be remarked here, that the other name of Bengal, Gauda, is derived from *Guda* or molasses ; Gauda cosequently means the land of molassess. The two names of the country thus have a meaning almost analogous in purport. The quotation from Manu proves beyond a doubt that Bengal and Behar were reckoned as Mlechchha Desa, or unholy land, in the days of the great Hindu lawgiver ; and there was then no distinction of caste in those countries, for Bharata, the

sage, defines Mlechehha Desa as the country where the four castes do not duell.

The Odras are the Uriyas, not of course the Brahmins, Karans and other Aryan castes which have settled in Orissa, but an aboriginal tribe whose representatives are found in the or Chasus of that province.

The Dravidas are identined with "the people of the Coromandel Coast from Madras southwords, those by whom the Tamil language is spoken," they are in fact still called, Dravidas by all orthodox Hindus. Wilford regards the Kambojas as the people of Arachosia, Arrian speaks of a country called Cambistholi ; as the last two syallables of them represent the Sanskrit, *Sthala* (place), it evidently means the land of Kamboja, (Vide note, Wilsons Vishnu Purana, page 182. Vol 2). The Kamboja country was famous for its horses.

The term Yavana is now generally accepted as meanig the Greeks, The Parkirta Yona is another form of Ion, by which name the Greeks were known throughout Western Asia but a difference of opinion on the subject exists in some quarters.

The Sakas are the Sakai and Sacæ of classical writers, the Indo-Seythian of Ptolemy, They "extended about the commencement of the Christian Æra along the west of India from the Hindu Koh to the mouth of the the Indus."

The Paradas were Probably Parthians the Pahnabas, or Palhavas according to some readings, were people of the country lying between India and Persia, the modern word Pahlavi, the language of Afganistan, retains a trace of Pahlava.

The Chinas were the people of cf China or Chinese Tartary according to some authorities.

The Daradas are the modern Durds—they are still living in the very same country where Manu found them, their country lies along the course of the Indus above the Himalays, just before it descends to India.

The Khasas are the Khasyas of North-East Bengal.

It is a noticeable fact, that these twelve trives of Mlechchhas mentioned by Manu, all belong to the North of India and the North-West frontier. excepting the Odhra and the Dravidas, this shews that the aboriginal Kols, Bheels, Gonds, &c., were unknown or very little known in Manu's time : the last were rekoned more as giants and monsters (Rakshasas) than men.

But to return to the Kiratas. They have been noticed in Book II, chapter III. of the Vishnu Purana, as a people living on the east of Bharatia or India, they were known to the Greeks as the Ceriadæ.

These foresters and mountaineers are still living in the mountains, east of Hindustan, and are still called Kiratis or Kirantis.

The bard of Sipra, Kalidasa, notices the Kiratas in his famous poem Kumar Sambhaba or the Birth of the War-god, when describing the Lord of mountains, Himalaya.

Although the Kiratas were classed by our poets and sages among *Mlechchhas* or barbarians, still it is clear that they were not hated or shnunned by the Aryan conqurerors, like the other aboriginal tribes of India. The great hero of Mahabharata, Arjuna, adopted the name, nationality, and guise of a Kirata for a certain perid to learn archery, and the use of other arms from Siva, who was consiered as the diety of the Kiratas, Thus episode of the Mahabharata was taken up by the poet Bharavi who describes it in detail in his celebrated poem Kiratarjuniya.

Again, both the Himalaya-born gooddesses Uma and Ganga have the nicknames Kirati applied to them by our lexicographears ; and is a question therefore whether these goddesses were the daughters of some Kirata chieftain of the Himalaya, married to Siva, a Hindu divinity, affording an example of miscegeneration among the two races effected at a very early period of History , or whether Siva was himself a Mongolian. His residence in the far Kylasa, his braided hair, his oblique eyes, his great proclivity for smoking, his reputed authorship of the Tantrika, nasal, monosyllabic Mantras, go far to prove him to be a Mongolian rather than of an Aryan type. I have shown that a modern Kiranti or Kiratis are the Kiratas of Ancient India ; this can be also proved geographically aud ethnologically—we find them occupying the same conntry as described in the Puranas, and their physical traits and manner of livelihood agree.

The Kirats, though now turned into cultivators and eaters of rice were flesh-eaters in Ancient India, like their brethern living on the other side of the Himalayas, in fact, their chief occupation was nothing else but the chase.

Is is remarkable that the medicinal Chirretta is a corruption of Kirata, which is the Sanskrit name for this drug. The only other synonyms in Sanskrit are *Bhunimba, Araryya-tikta and Kandalitikta*, the first means that it is the *nim or azadirachta* of the earth, the second implies the bitter of the non-Aryans, and the third signifies that which contains bitter in its trunk. The second name is very suggestive. It is a well known fact that the Chirretta grows in the lower ranges of the Himalays, the country of the modern Kirantis or Kiratis.

In the topographical lists of Mahabharata, Bhisma Parba, separate mention of the Kiratas occurs more than once ; this leads me to infer that the aborigines now known under that appellation must have separated themselves and formed differnt clans before the great epic was composed, Rajmala, which gives an analysis of the royal family of Tipperah, states that the ancent name of Tripura was Kirata. According to Major Fisher the people of Tripura are the same origin with the Kacharis, but Colonel Dalton places the Kacharis in the same group with the Kirantis—the latter are placed under the head of "Northern borderers", and the former under "Population of the Assam valley." The dispersion of a race of hunters like the Kirtas was natural, and it was helped to a large extent by the Aryan settlers pushing them on further and further as they spread, and that will account for wide range they now occupy.

No. 2. Hayasyas, Haioos or Hayas. The horse faced race.

Dr. Campbell gives a tradition that the Hayas originally "came from Lanka, having left that country after the defeat of their king Ravana by Ramchandra : but the Raksha king Ravana is still their hero and god, and they have no other. They say that they remained a long time in the Decan, whence they journeyed on to Semorounghar the days of the glory, and that lastly, but a long time ago, reached the hills, their present abode." Now the Kinnaras, or heavenly choristers, were described by the poets of India as living in the Himalaya under Kuvera, the Indian Plutus, and they were yclept Hayasyas or horse-faced, and epithet which is well accounted for when we read the physical traits of the modern Haioos or Hyas in Hodgson. The tradition of their being the kinsmen of Ravana is explained by the fact that Ramayana, Kuvera. the lord of the Hyaśyas, is styled the step-brother of Ravana. Again the Hyaśyas were designated Kinnaras, which means, men of ugly features. Mr. Hodgson's description certifies the deformity of this people very planly and pointedly, as will be seen in the following extract. 'The physiognomy of this tribe is rather of the Mongolian cast, the bridge of the nose is not perceptibly raised, the cheek bones are flattened and very high ; the forehead narrow." This description may be applied generaily to all the offshoots of the Mongolian race inhabiting the sub-Himalayas. The profile and full face sketches given by Hodson at page 78, Vol. XVII, Part I of the Journal of the Society, fully justify the Indo-Aryan writers in designating the race with the epithet *Turanga-vadanas* or horse-faced.

Mr. Hodgson defines the Kirant country thus :—

1. Sankoji to Likhu.
2. Likhu to Arun.
} Khombuan.

3. Arun to Mechi.
4. Singiela ridge.
} Limbuan.

He observes that the Khombuan and the Limbun are, at all events, closely allied races : and according to Dr. Campbell, in the generic term Limbu, are included the Kirantis, the Eakas (Hodgson Yukhas), i. e. Yakshas, and Kais. That the Kiratas and Yakshas herded together or occupied the same region of Himalays in Ancient India may be gathered from the extract from Kalidasa :

The Kimpurushas were the Kinnaras, i. e, the Hayasyas, i. e. the modern Haioos. That they originally migrated from Mongolia may be deduced from the fact of Hindu geographers placing the Kimpurusha varsha, or the county of the Kimpurushas, between the Himalaya and Hemakuta or Altai mountains.

No. 3. Yakshas=Eakas or Yakhas.

Those people are thus described in the Purans. "The Yakshas are the servants of Kuvera, moving in pairs, with storax and stones in their hands, dark as collirium, their faces deformed, eyes a dull brown, their statures enormous : they are dressed in crimson robes and crystal beads. Some of them are of high shoulder-bones." This description, however, is totally contradicted by Kalidasa, who describes the wife of his exiled Yaksha, in the following lines :

"There, in the fane, a beauteous creature stands.
The first best work of the Creator's hand,
Whose slender lims inadequately bear
A full-orbed bosom, and a wight of care ;
Whose teeth like pearls, whose lips like Bimbas show,
And fawn-like eyes still tremble as they glow."

(*Wilson's translation.*)

The contradicion, however, may be easily accounted for when we call to mind the difference between the matter-of-fact description of the Puranas with that of the great poet of Ujjayini replete with elevated fancy and imagination. The Puranic description agrees best with modern ethnology.

The ancients knew well that the country of the Yakshas was the land of the pine and turpentine. The Sanskrit for *Pinus longlfolia*

and terpentine is Yaksh Dhupa, or incense of the Yokshas, This "is a native of the Himalayas at elevations of 5 to 600 feet, and also found in the Kherree Pass, the entrance to Nepal. The wood is light, and being full of resinous matter, like the *Pinus Deodara* both are frequently employed in the hills for making torches, as picces of other species often are in other parts of the world. A very fine turpentine is obtained as an exudation from incisions made on the trunk." The tree is sometimes called Sarala, or straight, on account, no doubt of its erect shape. It is thus noticed by Kalidasa.

"Hark ! the gales whistling through the woods. of pine.
Urging to madness all the straining boughs.
That twist and chafe and bend and intertwine,
The latent flame to wildest fury rouse,
Singeing the long hair of the mountain cows.
Quick ! rain a thousand torreuts on the crest.
Of the kind hill and cool his burning brows :
With wealth of water thou art richly blest,
And fortune's sweetest fruit is aiding friends distrest."

V. 55 Griffith's translation of the Meghaduta.

A very aromatic unguent was said to have been much used by the ancient Yakshas called *Yksha Kardama* or Cerate of Yakshas, composed of camphor, agallocham, musk and kakkola (*Myrica Sapida ?*) All these ingredients exccepting, agalloham, are productions of the sub-Himalayan range. In the Meghaduta, the following verse shew that Yakshas were in the habit of burning incense or aromatic powders in their bed-rooms,

"Here filled with modest fears, the Yaksha's bride
Her charms from passions eagerness would hide ;
The bold presumption of her lovers' hand
To cast aside the loosened vest, withstands ,
And, feeble to resist, bewildered, turns ;
Where the rich lamp with lofty rediance burns ;
And vainly whelms it with a fragrant cloud
Of *scented* dust, in hope the light to shroud."

Wilson's translation of the Meghduta

The following extract again shews that the Yakshas must have great experts in achitecture and the art of painting ;—

"And she* has charms which thoughts but there extols
High as theyself her airry turrets soar,
And from her gilded palaces there swells
The voice of drums, loud as they thunder's roar

* Alaka, the city of Yakshas.

Thy pearls are mockt by many a jewelled floor,
Come, with the glories of thy bow compare
The varied tints on arch and corridor ;
And, for they lightning in the midnight air :
Look in her maiden's eyes and own a rival there"

Griffith's translation of the Meghaduta

We have no description of the houses modern Yakshas, but we have that of the houses of a cognate tribe, the Bhutias, which shews that "in the construction of their houses. they are rather in advance of their neighbours of the plains. They are compared to small farm-houses in England and to Swiss cottages, built generally of rubble stone and clay of two, three and sometimes of four stories ; all the floors are neatly boarded with deal, and on two sides are well constructed varandas ornamented with carved and painted wood-work. One of these is sometimes enclosed for the women, the front opening by sliding panels when thev wish to peep. The workman-ship displays considerable skill in joining, the panelling being very good of its kind." The description in Sanskrit quoted above was that of a Prasada, a temple according to the commenrator. Compare the above description with that of a modern temple visited by the writer in 1849 :—

"It is a sqare building with gable ends and a thatched projecting roof under the gable, facing the north ; there is a projecting balcony in front of a large bay window which lights a races at the opposite end of the temple containning three large Buddist images, all seated in the usual cross-legged attitude of absorbed contemplation. They appeared to be formed of clay. and were exceedingly well executed and respledent with gilding. The apartment about 20 feet square, is boarded, and the walls are cntirely coverded with painting of figures in smilar penitential attitudes but differently dressed...The colors were particularly brilliant and well chosen, and the drawing toleravely correct to heighten the effect. A priest's house also of stone and with its projecting roof and balconies a picturesque effect."

No. 4. Bhillas—Bhils or Bheels.

The following is a description of a Bhilli or Bheel workman from the *Hyagriva-vadha Kavya.*

"The Bhilla damsel, clad in leaves girl with a creeper, was recting on the brow of a hill, whilst her husband was engaised in decorating her locks with hill-jessaminess, called by herself."

This description puts one in mind of the Patua or Juanga women so graphically described and illustrated by Col. Dalton. Very likely the Bhil women had not given up the vardant foliage for their dress when the *Hyagriva-vadha* was composed but a hypothesis may be started as to the origin of the Bhillas of Rajputana and Juangas of Keonjhar. It is a Puzzle to ethnologists whether the Bhils and the Kols do not belong to the same aboriginal stock. Mr. Forbes Ashburhar, the Rev. Mr. Dunlop Moore, Sir Jhon Mulcolm, Captain Probyn and other authorities are of opinion that the Kols or Kalis and the Bhils are not distinct races. and we know that Jungas or Janguas are are a sub division of the Kolarian racee, the conjecture therefore follows that the Kolarian race with all its branches was known to the Puranic writers under the generic name of Bhills, for we have hitherto failed to find in the Puranas and the poetic literature of the middle ages any description or details of the Kola distinct from those of .he Bhils. The Bramha Vaivarta Purana ascribes the origin of the Kols to a Tivara mother. Parasara and others say that the Bhillas were born of a Tivara father and a Bhrahmani mother.

The Bhils speak a sort of Hindi throughout their haunts in Rajputana, and they are much more Hindunized in their habits and customs than most of the other aboriginal tribes of Southern India. Indeed, the elder Hindu writers classed them among the *Antyajas* or lowest castes of the Hindus It has been already noticed that the great Parasara, the father of the still greater Vysa, ascribes their origin to a Brahmani mother aud Tivara father : the Tivara is the modern Tiar of Northern India and Bengal, and the Tivaras according to the same authority were the offspring of a .Chnrnaka woman by a Pundraku, both very low castes, the Churnakars are the Chunaris or markers of chunam ; and this facts show that the Bhillas were considered from a very early perisd to be a cross between between an Aryan and an aboriginal tribe. Later writers particularly lexicographers, it is true, classed them among the mlechchhas, but neither Manu nor the other law-givers have done so. Parasara appears to be great tolerator of all the hated tribes, and this may be accounted for by the fact, that he himself, begot Vyas by a Kaivarta woman called Matsyagandha or she of fishy-smell. Her son, Vyasa, of course, gtves her a Kshatriya origin by a most unnatural myth, though he admits her to be the mursling of Dosa, the Kaivarta chief. Now these Kaivartas have been classed along with the Bhils in one of the law books of the Hindus. So we have not only the Kaivartas but the Rajakas (washermen) and the

Charmakars (leather dressers) in this category. The Charmakars are scarcely considered as Hindus. Sir Geoge Campbell, speaking of them in his Ethnology of India says "They used to be sowrn in a court by a peculiar guru of their own, not by the ordinary name of God." But though the Chamars are hated as out castes and helots to this day, their congeners, the Kaivartas and Rajakas, are not—at least in Bengal. The late millionaire lady Rashmani Dasi of Janbazar was a Kaivarta, and the first man of Calcutta, who interpreted English merchants to the weavers of sutaloti, was a Rajaka, or washerman ; his name was Kali or Kalan Sarkar, and one of the streets in the native part of the town slill bears his name ; he is said to have been the foremost native of influnce in Calcutta during his time. The Kaivartas, the Rajakas, and the Chamaras have much improved in physique and complexion ; in fact some of them are as fair as the fairest of Brahmans, owing to their constant contact with the Indo-Aryans, but their old brother Bhilla still retains the same Ethiopian colour and diminutive stature which characterised him when *Parasara* found him in his jungle home thousands of years ago.

The modern Bhills do not appear to be so exclusive as other branches of the great Kolarian race. Sir George Campbell says. "It seems very strange that they should have no languege of their own," and we are given to understand by Col.-Tod that the Oondru Bhil "still claim the privilege of performing the *teeka* on the inaguration of the decendants of Bappa," and that the Bhumia Bhil chief of Oguna Panora "is of mixed blood, from the Solanki Rajput, on the old stock of pure (Oogla) Bhils." It is a curious fact, that the autochtones of Indian preside prominently in the coronation of their Aryan conquerars to this day, in many places. The interesting scene witnessed by Colonel Dalton in Kaunjhar on the occasion of the late inauguration of young Dhananjaya Bhanga, is an instance of this misdirected loyalty ; but this interchange of good offices and blending of two diffirent races are the natural consequence of the promiscuous association we have had in India from the days when Rama conquered Ceylon with his aboriginal cohorts to the days when Seringapatam and Assaye were surrendered.

In the later poems of the Hindus, we find that in the Sayambora or the ceremony of proud daughters of the solar and lunar royal races in the choosing of their hustands, even the outcaste Bhilla and other aboriginal chieftains were invited, and sat side by side with the flowers of Kashatriya as chivalry and heroism.

In concluding this paper, I may notice *en-passant* a curious

mistake committed by Col. Tod where he translated "Vena Putra" as children of the forest. Vena Putra means the children of Vena, the notorious infidel king, in whose time intermarriages of the Original four great castes were allowed, whence originated all the Antyajas who represent the lower orders of the Hindu community.

Mr. Phear said if the identifications were well founded, as to which an opinion eould hardly be formed upon the short extract from the paper which had been read, they would be valuable contributions to ancient Hindu history. The interest, and at the same time the difficalty of questions such as those dealt with by the paper, might bs illustrated by some curious facts. Col. Dalton in his Ethnology of Bengal remarks, that the dances of the Santal girls of the present day almost precisely correspond with the description given in the Vishnu Purana of the dances of the cow-girls in which Krishna formed the centre point, and he Mr. Phear, would say from his own observation, that he thought it impossible for any one who witnessed the joyous light-hearted dances of the young people both Oraons and Kols on the Chutia Nagpur plateau not to be at once struck with their resemblance to the scenes of the Puranic traditions. And thus we seemed to have arrived at the noteworthy fact, that marked peculiarities of social manners and habits, which the Puranas depict as obtaining among supposed Ayans of the purest water,are now to be observed among non-Aryans, and it may be added are to be observed there exclusively, for it is hardly too much to say that the hilarious enjoyment of life, and the vivacious dances still to be seen on the outside of the Hindu populations, have became at this time, what ever was the case In the days of antiquity, foreign to the Hindus. It is also remarkable that perhaps the best illustration, which could be given of the system of internal state administration among the ancient Aryans so far as it is disclosed to us by Manu, would be drawn from the actual administrative organization of the Kols. i.e. non-Aryan, community as it existed down to very recent times.

THE INDIAN ANACREON, BEING

Translation from the Letter-day Snskrit Poets,

No. 1. To My Lady Love, During A Lunar Eclipse-

O tarry not, my love, beyond the bower,
Lo. yon ascends the node ; 'tisth eclipse hour
'Twould leave the moon, thy radient face to swallow,
Drawn by its more effulgent, brighter halo.

No. 2. A Lady To Another Seeing Her Toilette Unruffled In The Morning.

Unrublod is the saffron-patch on thy radiant cheek ;
Untouch'd is the sandal-paste on thy bosom sleek ;
Lo, still the collyrium adorns thy dark eyes' fringe ;
And thy lips are are vermil still with the *Tambul's* tinge.
O tell me, thou lady O' the graceful gait.
Is thy husband a dolt, or peevish mate ?

No. 3. The Answer To The Abovc.

My lord came home after long, weary years,
And half the night was spent in wand'ring talk ;—
Then sped the moments with my frets and tears ;
But when a little clamed, alas ! the cock
Crew and Aurora, like a rival came,
With angry face, and smether'd all the flame !

No. 4. To An Unrelenting Maid.

Thy face, a full-blown lotus fair.
Thy eyes, a light blue lily pair :
Thy teeth are kunda blossoms white ;
Thy lips are blooming roses bright ;
Thy person—*Champas* claim their own ;
O, why thy heart is hard as stone ?

No. 5. To A Lady

They say, from flowers spring forth flowerests rare,
The thing till now was heard, ue'r seen of men :
Lady ! thy learning face divine doth bear
Two roses blooming soft on lilies twain !

No. 6. A Lover's Prayer.

O Lady with the sparkling'een,
Give me a look again as keen,
For ancient sages truly say,
Poison's force, poison takes away. R

° Tambul is the prepared Pan,—and not betel leaf alone.

§ It may be explained to the English reader that it is sill indelicate among good Hindus to give themselves up to connubial felicities during morning and and evening the holy hours of prayer :—it is a sin to transgress this law, R.

Mookerjee's Magazine, December 1873. pp. No.—655-56

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলী জেলার একেবারে উত্তর প্রান্তে এবং বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার অনতিদূরে বেহুলা নদীর পার্শ্বে বাকুলিয়া গ্রাম অবস্থিত। বেহুলার অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইলেও বাকুলিয়া আজিও স্বনামধন্য হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রামের উৎপত্তি ও নাম করণ কোন অতীতে কি ভাবে হইয়াছিল, তাহা আজ আর সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না।

সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বাকুলিয়া বাসী কোন ভট্টাচার্য্য-তনয়া হৈমবতীকে বিবাহ করিয়া পরম কুলীন মাণিক চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনিধি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতামহ। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বেশকিছু ভূসম্পত্তি ছিল যাহার আয়ের দ্বারাই তিনি সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করিতেন। এই রামনিধির বাড়ীর অন্দর মহলে, রন্ধন শালার পার্শ্বে, সূতিকা কক্ষে ১২৩৩ সালের ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার শুক্লা একাদশী তিথিতে (ইং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ ২১শে ডিসেম্বর) রঙ্গলাল ভূমিষ্ঠ হন। *

গুপ্তি পাড়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম রামেশ্বরপুরেই কবিবরের পূর্ব্ব পুরুষগণ বাস করিতেন। (যদিও কবির পিতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঘনা পাড়ার, অম্বিকা-কালনা হইতে এক ক্রোশ দূর, গোসাই বাড়ীতে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ কুলীন হন এবং নিজ গ্রাম রামেশ্বরপুরে আর ফিরিয়া যান নাই।) গুপ্তি পাড়া ও বাকুলিয়ার ব্যবধান দুই ক্রোশ উপমিত হয়। কৌলিন্য মর্য্যাদায় কবির পূর্ব্ব পুরুষগণ ছিলেন সাগরদীয়া বন্দ্যঘণ্টীয়, ফুলিয়া মেল, কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান। রঙ্গলালের পিতা রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন এই কৌলিন্য প্রথা অনুযায়ী কমপক্ষে ষোলটি বিবাহ করিয়াছিলেন। কবি জননী হরসুন্দরী দেবী তন্মধ্যে অন্যতমা। রামনারায়ণ আরবী ও ফার্সী ভাষার সহিত ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করায় মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের ছোট দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্বামীর বহু বিবাহ এবং অসময়ে মৃত্যু (রঙ্গলালের আট নয় বৎসর বয়সের সময়, ১৮৩৫ খৃঃ) ও পিতার পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল থাকাতেই বোধ হয় হরসুন্দরী দেবী পুত্রদের লইয়া পিত্রালয়ে থাকিয়া যান। কবি জীবনে মাতুল পরিবারের প্রভাব তাহারই ফলশ্রুতি।

রামনারায়ণের সর্ব্বসমেত সাতটি পুত্রের নাম পাওয়া যায়,—যজ্ঞেশ্বর, তারাচাঁদ, গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল, উমেশচন্দ্র, মধুসূদন ও হরিমোহন। ইহাদের মধ্যে গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল ও হরিমোহন সহোদর। গণেশচন্দ্র রঙ্গলালের অগ্রজ এবং হরিমোহন অনুজ ছিলেন।

রামনিধির পাঁচ পুত্র ছিল—রামকমল, রামকুমার, মধুসূদন, দীননাথ ও চন্দ্রমোহন। ইহাদের মধ্যে রামকমল ও রামকুমারের সহিত কবিবরের সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকমল নিজ অধ্যবসায় বলে প্রভূত অশৈর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং তৎকালীন সমাজে নিজেকে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে পূর্ণিয়া সহরে এক ইউরোপীয় এঞ্জিনিয়ারের অধীনে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই সততা, নিষ্ঠা ও বুদ্ধি মত্তায় পদোন্নতি লাভ করিতে থাকেন। যাহার ফলে সল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন। কয়েক বৎসর পরে উক্ত

* শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এবং ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির জন্ম ১২৩৪ বঙ্গাব্দাতে (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন।

এঞ্জিনিয়ার সাহেব কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে বদলি হইয়া আসিলে রামকমলও কাজের সুবিধার জন্য তাঁহার সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং খিদিরপুরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে এই অঞ্চলেই ১৮৩১ খৃঃ (বর্ত্তমান রামকমল ষ্ট্রীট) ১০ বিঘা জমির উপরে প্রাসাদোপম আবাস-ভবন নির্ম্মাণ করেন।

মাত্র তেরো বৎসর বয়সে রাম কমলের সহিত গুপ্তি পাড়ার বরোদা সুন্দরী দেবীর বিবাহ হয়। কিন্তু কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় পরবর্ত্তী কালে প্রথমে মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি·আই-ই, মহাশয়ের ভগ্নী দুর্গামণি এবং পরে সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পিতৃস্বসা কৈলাস বাসিনীর সহিত রাম কমল পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল না। অপুত্রক রাম কমল ভাগিনেয়দিগকেই পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বরদাসুন্দরীও তাহাদের যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করিতেন। কৈশোরে ভাগিনেয়গণ মাতৃহীন হইলে ইনিই তাহাদের মাতার অভাব পুরণ করিয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে রঙ্গলাল বাকুলিয়ার গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন এবং পরে স্থানীয় মিশনারী স্কুলে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে থাকেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সবিশেষ উন্নত না থাকায় এবং পরবর্ত্তী জীবনে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া, ১৮৩৭ খৃঃ ১লা জুলাই "হুগলী কলেজ" (মহীসিন কলেজ) স্থাপিত হইলে রামকমল ভাগিনেয়দিগকে সেই কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন ; এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার শ্যালক সদর আমীন গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চুচুড়াস্থ বাড়ীতে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য রঙ্গলাল বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তবে এই সময় হইতেই রঙ্গলালের বাংলা কাব্যসাহিত্য, ইতিহাস ও ইংরাজী কাব্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়।

কিছুদিন পরে গণেশ চন্দ্রের সহিত ভূকৈলাশের রাজা সত্যশরণ ঘোষালের কনিষ্ঠ কন্যা বরাঙ্গী দেবীর বিবাহ হয়। কলিকাতার শেরিফ অফিসে একটি কর্ম্মের সংস্থান করিয়া গণেশচন্দ্র খিদিরপুরে মাতুলালয়েই বাস করিতে থাকেন।

আনুমানিক ১৮৪১ খৃঃ রঙ্গলালের সহিত নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী দেবীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা রাখালদাসী দেবীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হয়। ইহার দুই বৎসর পরে (১৮৪৩ খৃঃ) কবি-জননী হরসুন্দরী দেবী দেহত্যাগ করেন। রঙ্গলাল তখন তাঁহার স্ত্রী এবং অনুজ হরিমোহনকে সঙ্গে লইয়া মাতুল রাম কমলের খিদিরপুরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। রাম কমল তখন হরিমোহনকে অগ্রজদের ন্যায় ব্যবস্থায় "হুগলী কলেজে" ভর্ত্তি করিয়া দেন।

খিদিরপুরে আসিয়া আর কোন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি না হইলেও রঙ্গলাল জ্ঞান আহরণের স্বকীয় প্রচেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি রাখিলেন না। রাম কমলের ও ভূকৈলাসের রাজবাটির বিশাল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে এবং ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি পরবর্ত্তীকালে বাংলা ভাষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা হইতে যে সকল কাব্য বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন তাহা মূল কাব্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইত, অনুবাদ বলিয়া কল্পনা করা বিশেষ কষ্টকর ছিল। এই সময়ই রাম কমলের বিশিষ্ট বন্ধু খিদিরপুর নিবাসী রাজনারায়ণ

দত্ত মহাশয়ের পুত্র মধুসূদন (পরবর্ত্তী কালে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত) ও তাঁহার সহপাঠী গৌরদাস বসাকের সঙ্গে রঙ্গলালের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ইঁহারা উভয়েই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সাহিত্যালোচনার উপযুক্ত সহযোগী পাইয়া রঙ্গলাল পরম প্রীতি লাভ করেন। মধুসূদনের সহিত বন্ধুত্ব এতই নিবিড় হইয়াছিল যে, মাতৃহীন রঙ্গলাল এবং হরিমোহন তাঁহার মাতা জাহ্নবী দাসীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

এই সময়ে খিদিরপুরের সাধারণ দরিদ্র বালকদের বিদ্যাভ্যাসের কোন সুযোগ নাই দেখিয়া রঙ্গলাল তাঁহার অগ্রজ গণেশচন্দ্রের সহায়তায় রামকমলের বাসভবনের একটি কক্ষে ১৮৩৩ খৃঃ একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং নিজেই অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া স্বীয় প্রচেষ্টায় চারি বৎসর পর্য্যন্ত রঙ্গলাল বিদ্যালয়টিকে সঞ্জীবিত করিয়াও রাখিয়াছিলেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা দানের ব্যাপারে বাংলার যাত্রাগানের একটা বিশেষ স্থান আছে,—যে শিক্ষা রঙ্গলালকেও বাল্য বয়স হইতেই প্রভাবিত করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই রঙ্গলাল নিবিষ্ট চিত্তে যাত্রা গান শুনিতে খুব ভালবাসিতেন, কথিত আছে একবার তন্ময় হইয়া যাত্রা শুনিবার সময় প্রজ্জ্বলিত বাতি পড়িয়া ওষ্ঠের উপরি ভাগ পুড়িয়া যায়। (অবশ্য এই ধরণের একটি চিহ্নই তাঁহার সরকারী কার্য্যের বিবরণ পুস্তকে সনাক্ত-চিহ্ন হিসাবে লিখিত আছে।) বাল্যকালে মনের উপরে যাত্রার শিক্ষার প্রভাব এবং পরবর্ত্তী জীবনে কলেজে ও মাতুলের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যাদি পাঠ ও সর্ব্বোপরি ভূকৈলাশের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের উৎসাহ রঙ্গলালের কল্পনা প্রবণ কিশোর চিত্তকে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তখন হইতেই রঙ্গলাল কিছু কিছু কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং বেশ কিছু ইংরাজি কবিতার বঙ্গানুবাদ করেন। এই কবিতাগুলি পরে কাশী প্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত "হিন্দু ইন্টেলিজেন্সা" এবং তাহারও কিছু দিন পরে "সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ে সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রভাব ছিল। তাহার রচনায় গতানুগতিকতার ছেদ ও নতুনত্বের আস্বাদে বাংলার তরুণেরা তাহার বিশেষ ভক্ত হইয়া উঠেন। রঙ্গলালও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তরুণ-চিত্তের সম্রাট গুপ্তকবির সহিত মিলিত হইবার জন্য রঙ্গলালের ভাব বিহ্বল কবি সত্ত্বা ব্যাকুল হইয়া উঠিল কিন্তু অন্তরায় সাধিল মাতুল রামকমলের অসুস্থতা।

রামকমলের ভাইয়েরা সকলেই তাহার উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। তদুপরি জ্যেষ্ঠ কন্যা মনোমোহিনী দেবী অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসায় এবং অপর কন্যা কামিনী দেবী বিবাহ যোগ্যা না হওয়ায় ইহারা সকলেই রামকমলের চিন্তার কারণ হইয়া পরেন। সর্ব্বোপরি চতুর্থ ভ্রাতা দীননাথ বিধবা পত্নী ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলে সমস্যা আরও প্রকট হইয়া দাড়ায়। পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া পিতা রামনিধি কাশীবাসী হইয়া পড়েন। এক গণেশ চন্দ্র ব্যতীত এই বিরাট পরিবারে আর কেহই উপার্জনক্ষম ছিলেন না। ফলে গুরুতররূপে পীড়িত রাম কমল তাহার অভাবে পরিবারের সকলের অবস্থা কি হইবে সেই কথা ভাবিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। অতঃপর বন্ধু রাজনারায়ণ দত্ত ও অনুজ রাম-কুমারের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাহার ৭।৮ লক্ষ টাকার সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি কতকগুলি বিশেষ সর্ত্তে গৃহ দেবতা শ্রীশ্রী ৺গোপালজী ঠাকুরের

নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়াই সমীচীন। সেই মতানুসারে ১৮৪৫ খৃঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রামকমলের সমস্ত সম্পত্তি গৃহদেবতার নামে উইল করা হয়। ভাগিনেয়দের জন্যও রামকমল উইলে বিশেষ ব্যাবস্থা করিয়া রাখিয়া যান। তাহারা যতদিন ইচ্ছা তাঁহার নিজ বাটিতে বাস ও আহারাদি করিতে ও তাঁহার গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন। তাহারা এক সংসারে থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি জগমোহন সাহার নিকট হইতে যে বাড়ীখানি ক্রয় করিয়াছেন উক্ত বাড়ীখানি তাহাদের প্রাপ্য হইবে। উইল করার কয়েকমাস পরে ১৮৪৫ খৃঃ ১লা আগষ্ট মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে রামকমলের মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে ১৮৪৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠপুত্র জহরলালের জন্ম হয়। উইলের সর্ত্ত অনুসারে বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি গৃহদেবতার সেবায়েত নিযুক্ত হইয়া দেবত্ব সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবেন; সেই মতে আলীপুর আদালত ১৮৪৬ খৃঃ ১১ সেপ্টম্বর রামকুমারকে প্রথম সেবায়েত নিযুক্ত করেন।

মাতুল রামকমলের মৃত্যুর পর রঙ্গলাল সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন। তখন তিনি অধিকাংশ সময়ই ভূকৈলাস রাজবাটির গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন ও সাহিত্য অনুশীলনে অতিবাহিত করিতেন। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসেবীদিগের সহিত পরিচিত হইবার প্রচেষ্টাও ছিল তখন তাঁহার প্রবল। এই প্রচেষ্টাই একদিন তাঁহাকে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত করিয়া তুলে। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ায় রঙ্গলাল বড়ই উল্লসিত হইলেন। গুপ্ত কবি রঙ্গলালকে বড় স্নেহ করিলেন এবং তাঁহার রচনার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন। ক্রমে গুপ্ত কবির সহিত তাঁহার পরিচয় এত নিবিড় হইল যে, "তিনি মধ্যে মধ্যে মাতুলালয় হইতে গুপ্ত কবির কলিকাতাস্থ আবাস ভবনে চলিয়া আসিতেন এবং সময় সময় মাসাধিক্ কাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিতেন।"

ঈশ্বর গুপ্ত তরুণ কবি রঙ্গলালের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পৃষ্টপোষকতা করিতেন। জন মানসে রঙ্গলালের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখ (১৮৩৭ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে গুপ্ত কবি লিখিলেন:—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইহার সদগুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিবো। কবিত্ব ব্যাপারে ইহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য—উভয় রচনার দ্বারা পাঠক বর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"—একজন তরুণ কবির পক্ষে একজন যুগস্রষ্টার নিকট হইতে এইরূপ প্রশংসা কতখানি গৌরবের বস্তু তাহা সহজেই অনুমেয়। রঙ্গলাল অন্যান্য পত্র পত্রিকা সম্পাদনা করিলেও ঈশ্বর গুপ্তের সহিত তাঁহার এই প্রীতির সম্পর্কের কখনও ছেদ পরে নাই। তাই গুপ্ত কবির মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত রঙ্গলাল যেখানেই থাকুন না কেন সংবাদ প্রভাকরের সংযোজিত লেখকের দায়িত্ব সযত্নে পালন করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশ ছিল "কবি গানে"-এ মুখরিত। বাংলার অভিজাত সম্প্রদায় তখন কবির গানে বিশেষ উৎসাহী। তাহারা নিজেরাই কবির দল গঠন করিয়া এমন কি সংগীত রচনা করিয়া পর্য্যন্ত স্বীয় দলের পৃষ্টপোষকতা করিতেন। ভাল কবির দল তখন আভিজাত্যের বিষয় হিসাবে পরিগণিত হইতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত

বিত্তশালী কবিদলের জনকরা গুপ্ত কবিকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। রঙ্গলাল গুপ্তকবির স্নেহের পাত্র ছিলেন বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই এই অভিজাত সম্প্রদায়ের সুনজরে পতিত হন। তরুণ বয়সেই অপূর্ব্ব সংগীতরচনার শক্তির পরিচয় পাইয়া ক্রোড়পতি রামদুলাল সরকারের বংশধর আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব (ছাতু বাবু ও লাটু বাবু নামে খ্যাত) রঙ্গলালকে তাঁহাদের কবিদলের "কবি" নিযুক্ত করেন। এই কবিদলের সহিত যুক্ত হইয়া রঙ্গলাল অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে বাংলাদেশে "সুকবির" আখ্যা লাভ করেন। এই সময়ই বহুবাজারের অক্রূর দত্তের বংশধর উমেশ চন্দ্র, গিরিশ চন্দ্র, রাজেন্দ্র এবং পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই মহাশয়দিগের সহিত রঙ্গলালের যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মে।

১৮৪৮ খৃঃ ছাতু বাবু পশ্চমাঞ্চল দেশভ্রমণে বাহির হইলে রঙ্গলাল ও তাহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। ছাতুবাবু যখন কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই সময় হঠাৎ লাটুবাবুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বাষ্পীয়পোত যোগে ১৮৪৯ খৃঃ ২১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে রঙ্গলাল "কাশী যাত্রা" নামে একখানি ভ্রমণ কাহিনী মূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পুস্তকখানি এখন আর পাওয়া যায় না। এই সময়ই (আনুমানিক ১৮৫০ খৃঃ) কবিবর "উষাদরণ" নামে একখানি "গীতি কাব্য" প্রকাশ করেন। সংরক্ষণের অভাবে কবির জীবদ্দশাতেই গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার কিছুদিন পরে রঙ্গলাল সাধক কবি রামপ্রসাদ ও বৈষ্ণব কবিদিগের ভাবাদর্শে অনেকগুলি সুমধুর ভক্তিগীতি রচনা করেন এবং সঙ্কলনটির নাম দেন "শক্তি ও বিষ্ণু বিষয়ক গীত গ্রন্থ"। পাণ্ডুলিপিটি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপহার দেন। যতীন্দ্রমোহন তাঁহার কনসার্টপার্টিতে ঐ গানগুলি বাজাইবার নির্দ্দেশ দেন। কনসার্ট পার্টির বাদ্যযন্ত্রে গানগুলি শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং গীতগুলি সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিবেশনের জন্য নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশে উৎসাহী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পাণ্ডুলিপিখানি হারাইয়া যাওয়ায় তাহা আর সম্ভবপর হয় নাই।

১৮৫০ খৃঃ রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা হীরামতি জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসরেরই ১৫ই জুলাই "সংবাদ রসসাগর" নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে রঙ্গলাল পত্রিকাটির স্বত্বাদি ক্রয় করিয়া মুদ্রাযন্ত্রটি ক্ষেত্রমোহনের মলঙ্গা লেনস্থ বাটি হইতে খিদিরপুরে ১নং রামকমল স্ট্রীটে আনিয়া স্থাপন করেন এবং যথারীতি নিজ সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবারে প্রকাশ করিতে থাকেন। পত্রিকাখানির মাসিক মূল্য আটআনা এবং বার্ষিক মূল্য পাঁচটাকা (অগ্রিম) ধার্য্য করেন। ১২৫৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা (১৮৫২ খৃঃ এপ্রিল) হইতে পত্রিকাটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রঙ্গলাল "সংবাদ সাগর" রাখেন। এই নাম পরিবর্ত্তনের বিষয়ে গুপ্তকবি তাঁহার "সংবাদ প্রভাকরে" ১২৫৯ সাল ৩রা বৈশাখ (১৮৫২ খৃঃ ১৪ এপ্রিল) লিখিলেন,—"আমাদিগের স্নেহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক নূতন বৎসরের শুভাগমনে রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে পত্রের নাম "রস সাগর" ছিল, এইক্ষণে "সংবাদ সাগর" হইয়াছে, এই রসাভাব জন্য পত্র আরও রসময় হইয়াছে। কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরই রসের স্থল এবং সাগরেই রত্ন, অতএব প্রার্থনা এই সাগর পূর্ব্বে রস সাগর ছিল, অধুনা যশঃ সাগর হউক।" এই সময়ই কবিবর, মহাকবি কালিদাসের ঋতু সংহারের বঙ্গানুবাদ করেন। ১৮৫১ খৃঃ ৮ই মার্চ সংবাদ প্রভাকরে এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞাপনও বাহির হইয়াছিল।

এই সময়ই রঙ্গলালের দ্বিতীয় কন্যা ধনমতির জন্ম হয় (১৮৫২ খৃঃ), এবং কলেজের পড়া শেষ করিয়া হুগলী হইতে হরিমোহনও খিদিরপুরে চলিয়া আসেন। সংসার ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় গণেশ চন্দ্র মাতুল রামকুমারের নিকট পৃথক হইবার প্রস্তাব করিলে তিনি ২নং রামকমল স্ট্রীটের পুরাতন বাড়ীখানিতে ভাগিনেয়দিগের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময় রঙ্গলালের প্রচেষ্টাতেই মেসার্স সেল্লেট্‌জি এ্যাণ্ড কোং (Messers schelletzi and co.) অফিসে হরিমোহনের একটি কর্ম্মের সংস্থান হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ফার্ম্মের শিল্পবিভাগের বড় সাহেব মিঃ রাইসের সুনজরে পড়িয়া শিল্প ব্যবসায় বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠেন। কিন্তু মিঃ রাইস দেশে চলিয়া গেলে হরিমোহনের কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। ইহার পর আরও একটি কর্ম্মের সংস্থান হইলেও তাহা হরিমোহনের মনঃপূত হইল না। অবশ্য এই স্থলেই কার্য্যব্যপদেশে এক ইংরাজ রেশমের দালাল মিঃ বাস্‌কিন-এর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয় এবং মিঃ বাস্‌কিনের পরামর্শ অনুযায়ী উভয়ে একত্রে একটি রেশম চালানীর ব্যবসা আরম্ভ করেন। তখন মোরান্ কোম্পানী-নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রচুর পরিমানে রেশম ক্রয় করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতেন। এই প্রতিষ্ঠানে রেশম যোগানের ভার প্রাপ্ত হইয়া হরিমোহন ও মিঃ বাস্‌কিন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

ভারত বন্ধু ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা কল্পে ডাক্তার এফ, জে, মোয়েট ১৮৫১ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় "বেথুন সোসাইটি" নামক একটি সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করেন। "রস-সাগর" সম্পাদক রঙ্গলাল প্রায় প্রথম হইতেই এই সভার সদস্য ছিলেন। প্রায় প্রতিমাসেই এই সভার অধিবেশন হইত এবং তাহাতে ইংরাজীতে লেখা নানা বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ হইত। ১৮৫২ খৃঃ ৮ই এপ্রিল রাত্রি আট ঘটিকায় মেডিকেল কলেজ গৃহে যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কলিকাতার রামবাগানস্থ দত্ত বংশোদ্ভব ইংরাজী ভাষায় সুলেখক হরচন্দ্র দত্ত মহাশয় "বাংলা কাব্য" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেখক এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলা কাব্যকে ইংরাজী কাব্য অপেক্ষা অপকৃষ্ট প্রমাণে তৎপর হইয়াছিলেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে অনেকেই মৃদু ভাবে প্রবন্ধের বিরূপ সমালোচনা করেন। বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিত মহাশয় দীপ্ত কণ্ঠে এই প্রবন্ধের কঠোর প্রতিবাদ করিলে ইংরাজী সাহিত্য-রস-বিভোর কৈলাস চন্দ্র বসু মহাশয় বলেন, "...বাংলা কাব্য সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যাহা শিক্ষিত ও মার্জ্জিত-রুচির ব্যক্তির সন্তোষ বিধান করিতে পারে। ইহা কুৎসিত অশ্লীলতা ও কুরুচিতে পরিপূর্ণ···।" নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি মুখে মুখেই কবি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" হইতে কোন কোন অংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বাস্তবতা প্রতীয়মান কল্পে প্রচেষ্ট হন। এই মন্তব্যে সভার মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় (১১ ঘটিকা) সভাপতি মহাশয় সভার কার্য্য আগামী সভার দিন পর্য্যন্ত মুলতবী রাখেন। অতঃপর ১৮৫২ খৃঃ ১৩ই মে মেডিকেল কলেজ গৃহে রাত্রি আট ঘটিকার সময় বেথুন সোসাইটির পরবর্ত্তী অধিবেশন বসে ; সভার অন্যান্য কার্য্যের সমাপ্তির পরে পূর্ব্ববর্ত্তী সভায় হরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে তাহার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়া রঙ্গলাল "বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" নামক ৫১ পৃষ্ঠা ব্যাপি এক নিবন্ধ পাঠ করেন। এই দিনও রাত্রি অধিক হওয়ায় রঙ্গলালের নিবন্ধের বিশেষ কোন সমালোচনা হওয়ার পূর্ব্বেই ডাঃ মোয়েট সভা ভঙ্গ করিয়া দেন। নিবন্ধটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৫৯ সালের ৪ঠা আষাঢ় (১৮৫২ খৃঃ ১৬ই জুন) সংবাদ প্রভাকরে গুপ্তকবি বইটির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৫৩ খৃঃ এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত রঙ্গলাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত "সংবাদ সাগর" সম্পাদনা করেন। ইহার পর কোন অজ্ঞাত কারণে কাগজখানির সম্পাদনার কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। সংবাদ প্রভাকরে কবিবর এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞাপনও দিয়াছিলেন। সেই বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ১২৬০ সালের ৩রা আষাঢ় (১৮৫৩ খৃঃ ১৬ই জুন) সংবাদ প্রভাকরে গুপ্ত কবি লিখিলেন, "আমাদিগের জীবণাধিক স্নেহান্বিত সুলেখক সুকবি সংযোগী সাগর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংপ্রতি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ বশতঃ সাগর পত্র সম্পাদনে স্বাবকাশশূন্য হইবায় তদ্বিষয়ে সাধারণের সুগোচর করণার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে যে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই পত্র নিম্ন-ভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে এতৎপ্রতি মনযোগ পূর্ব্বক নয়নাস্তপাত করিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে, যত্ন মাত্র না করিয়া আমরা সর্ব্বদাই সাগরোদ্ভব অমূল্য মহারত্ন সকল প্রাপ্ত হইতাম। অধুনা সেই অত্যুৎকৃষ্ট অব্যক্ত সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইলাম। যাঁহার রচিত গদ্য পদ্য জনসমূহের পক্ষে অনন্ত শ্রুতিসুখকর এবং উপকার জনক, তিনি লিপি কার্য্যে বিরত হইলে তদপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যে সকল পত্র কেবল কটু কাটব্যে পরিপূরিত, দেশের মহানিষ্টকর, সৎসংস্কার সংহার করিয়া পাঠকগণকে কুসংস্কারে পরিপূর্ণ করে, সদুপদেশের বিনিময়ে অসদুপদেশে ও দ্বেষে দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, যে সকল বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতী অনুশীলনের পথে পদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদিগ্যে কুশিক্ষা প্রদান করিতেছে, সেই সকল পত্রের বিনাশ হইলে কিছু মাত্র খেদ নাই, বরং তদ্বিষয়ে বুধবর্গের পক্ষে অতিশয় কল্যাণকর হয়। চক্ষুঃ আছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি শক্তি নাই, সে চক্ষু যেমন শুদ্ধই পীড়াদায়ক সেইরূপ গ্লানি-জনক গ্লানি-সূচক পাপপূরিত পত্র সকল কেবল অশেষ অসুখ ও বিষম বিপদের কারণ হইয়াছে, গোশালা শূন্য থাকুক তথাচ দুষ্ট গাভীর প্রয়োজন করে না। ...অতএব হে সহযোগিগণ! মৃত্যুকে নিকট জ্ঞান করিয়া অভিমান পরিত্যাগ কর। লেখনী যন্ত্রে অমৃত বৃষ্টি করিতে থাক। মধুর বচনে জগৎ সংসার মুগ্ধ কর। সমুদ্রে পরিপূর্ণ পীযূষ সত্বে কেন হলাহল লইয়া দানব বৎ ব্যবহার কর।..."

"সংবাদ সাগর"-এর সম্পাদনার কার্য্য হইতে কি কারণে বিরত হইলেন তাহা জানিতে না পারা গেলেও ইহাই অনুমান হয় যে তিনি এই সময় বন্ধুবর ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় সম্পাদিত সচিত্র মাসিক পত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এর সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন।

১২৬১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৮৫৪ খৃঃ) রঙ্গলালের দ্বিতীয় পুত্র পান্নালাল জন্ম গ্রহণ করেন। সংসার ক্রমশ বড় হওয়ায় এবং সুনির্দ্দিষ্ট কোন আয় না থাকায় কবিকে এই সময় যথেষ্টই অর্থ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়।

এই সময় রাজা সত্যচরণ ঘোষাল এবং রংপুরের কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি পৃষ্ঠ পোষক-গণের নির্ব্বন্ধ কাব্য রচনার অনুরোধে রঙ্গলাল রাজস্থানী বৃত্ত পদ্মিনী উপাখ্যানের কাব্যে রূপ দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৮৫৫ খৃঃ রাজা সত্যচরণ ঘোষালের মৃত্যুতে কবিবর বিশেষ ভাবে মর্ম্মাহত হন এবং কাব্যখানি সম্পূর্ণ করিবার অনুপ্রেরণা হারাইয়া ফেলেন। প্রায় তিন চার বৎসর পরে কাব্যখানি সম্পূর্ণ করিয়া ১৯শে আষাঢ় ১২৬৫ বঙ্গাব্দে (১৮৫৮ জুলাই) প্রকাশ করেন।

সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয় অধ্যক্ষ এবং লেখক মেজর ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন ১৮৫৩ খৃঃ "কলিকাতা

লিটারারী গেজেট" নামক একখানি ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রঙ্গলালের যে সমস্ত ইংরাজী প্রবন্ধ বা গল্প এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে The Native aristocracy of Bengal (১৮৫৬ খৃঃ ৭ই জুন) বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। An Indian Jack sheppard (১৮৫৬ খৃঃ ১২ই জুলাই) আর্টিকেলটি লিখিয়াও কবি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। ইতি মধ্যে কবির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আশুতোষ দেব পরলোক গমন (১৮৫৬ খৃঃ ২৯শে জানুয়ারী) করেন, ইহাতে কবি অত্যন্ত মনোবেদনা অনুভব করেন।

বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৫৬ খৃঃ ৪ঠা জুলাই হইতে "এডুকেশন গেজেট" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। পাদরী রেভারেণ্ড ও'ব্রায়েন স্মিথ্ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তিনি রঙ্গলালকে তাঁহার সহকারি হিসাবে মনোনীত করেন। নিদারুণ অর্থ কষ্টের দিনে মাসিক একটি আয় সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ায় রঙ্গলাল বড়ই উপকৃত হন। স্মিথ্ সাহেব গ্রীক এবং লাটিন ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। রঙ্গলাল তাহার সংস্পর্শে আসিয়া এই দুইটি ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। এই সময় কবির কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল জন্ম গ্রহণ করে (১৮৫৭ খৃঃ)। গ্রীক ভাষায় জ্ঞান জন্মিলে কবি গ্রীক সাহিত্য হইতে Batrachomyomachia নামক একখানি উপকাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া ধারাবাহিক ভাবে এডুকেশন গেজেটের কয়েকটি সংখ্যায় এই সময় প্রকাশ করেন। এই উপকাব্যখানির বাংলা নামকরণ হয় "ভেক মূষিকের যুদ্ধ"; পরে ১৮৫৮ খৃঃ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় জয়নারায়ণ সর্ব্বাধিকারী ও বহুবাজারের অক্রুর দত্ত বংশোদ্ভব উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় ইংরাজ কবি গোল্ড স্মিথ ও পার্নেল-এর "The Hermit" নামক কবিতাদ্বয়ের সার্থক বঙ্গানুবাদের জন্য যথাক্রমে ১০ টাকা ও ৩৫ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। রঙ্গলালের অনুবাদই শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হওয়ায় কবি উভয় পুরস্কারই লাভ করেন। গুপ্ত কবির মন্তব্য সহ ১লা জৈষ্ঠ্য ১২৬৫ সালের (১৮৫৮ খৃঃ ১৩ মে) সংবাদ প্রভাকরে কবিতা দুইটি প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৬৬ সালের জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ় (১৮৫৯ খৃঃ মে ও জুন) মাসে প্রকাশিত এডুকেশন গেজেটের পর পর পাঁচটি সংখ্যায় "বঙ্গ বিদ্যার আদ্য বিবরণ" নামক রঙ্গলালের একটি মূল্যবান নিবন্ধ মুদ্রিত হয়। ইতিমধ্যে কবিবরের পরম শ্রদ্ধার পাত্র এবং পৃষ্ঠপোষক বাংলা কাব্যসাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনাবসান ঘটে (১০ই মাঘ ১২৬৫ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে বেদনা বিধুর কবি চিত্ত বড়ই শোকবিহ্বল হইয়া পড়ে।

এডুকেশন গেজেট সম্পাদনার সুযোগে রঙ্গলাল সরকারী শিক্ষা বিভাগের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। গেজেটের সামান্য বেতনে সাংসারিক ব্যয় সঙ্কুলান কষ্টকর হইতেছিল বলিয়া কবিবর তাঁহাদের কাছে একটী অধিকতর বেতনের কার্য্যের জন্য সুপারিশ করিতে থাকেন। এই চেষ্টার ফলে, প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৮৬০ খৃঃ ৬ই মার্চ্চ হইতে ছয় মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করিলে রঙ্গলাল তাঁহার স্থলে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হন। সেই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রায় অধ্যাপকই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। সেই ভাবে রঙ্গলালও বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষক হইয়াছিলেন।

এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার জনক এবং বাঙ্গালীর প্রকৃত বন্ধু ডেভিড হেয়ার সাহেব ১লা জুন ১৮৪২ খৃঃ পরলোক গমন করিলে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষার মানসে কিশোরী চাঁদ

মিত্র মহাশয় নিজ সম্পাদনায় স্বীয় ভবনে হেয়ারের বন্ধু ও ভক্তগণকে লইয়া "হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতি" গঠন করেন। প্রতিবৎসর ১লা জুন তারিখে ভারতীয়দের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধন বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ বা বক্তৃতাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। কিশোরীচাঁদ স্বীয় প্রচেষ্টায় পরে হেয়ারের গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের নিকট হইতে আড়াই হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া "হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড" গঠন করেন; এবং এই পুরস্কার ভাণ্ডার হইতে প্রতি বৎসর সমিতি কর্তৃক বিজ্ঞাপিত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বাংলা প্রবন্ধ রচয়িতাকে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। রঙ্গলাল ১৮৬০ খৃঃ "শরীর সাধনী বিদ্যার গুনোৎকীর্ত্তন" প্রবন্ধটি লিখিয়া এই পুরস্কার লাভ করেন। বিচারকের আসনে সমাসীন ছিলেন—মহাত্মা রাম গোপাল ঘোষ, আচার্য্য কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

লর্ড ডালহৌসির শাসন কালের প্রথম কয়েক বৎসর সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক প্রতিপন্ন হওয়ায়—সরকারকে উচ্চহার-সুদে টাকা ঋণ করিতে হইতেছিল। তাহার উপর সিপাহী বিদ্রোহের উপশম করিতে ইংরাজের ভারতীয় সরকারের অর্থনৈতিক-কাঠামো একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। এই অবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে ইংলণ্ডের সেক্রেটারী-অব-স্টেট স্যার চার্লস উড ১৮৬০ খৃঃ ভারতবর্ষের বড়লাটের শাসন-পরিষদে একজন সভ্যের পদ শূন্য হইলে ইংলণ্ডের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিঃ জেমস্ উইলসনকে ভারতে প্রথম রাজস্ব সচিব নিয়োগ করিয়া পাঠান। মিঃ উইলসন্ ভারত সরকারের ব্যয়-সঙ্কোচ, আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা এবং আয় বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব বিভাগের অনেক সংস্কার করেন। ইহার মধ্যে বাজেট করিবার প্রণালীর উদ্ভাবন এবং কাগজী মুদ্রার প্রচলন বিশেষ অভিনবত্বের দাবী রাখে। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য মিঃ উইলসন্ ইন্‌কাম ট্যাক্স নামে এক নতুন করের প্রবর্তন করেন। প্রতি প্রজার বার্ষিক আয়ের একটি অংশ এই কর হিসাবে সরকারকে দেয়। এই ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে অধিকাংশ ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। যে সমস্ত ইংলণ্ডীয় ব্যক্তি এই করের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মাদ্রাজের গভর্ণর স্যার চার্লস ট্রেভিলিয়ন ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রবার্ট নাইটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎ সত্ত্বেও ১৮৬০ খৃঃ এই নতুন করের প্রবর্তন হয়। ইহার ফলে এই দেশে ইনকাম ট্যাক্স এসেসর এবং ডেপুটি কালেক্টরের অনেকগুলি পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৬০ খৃঃ ৫ই নভেম্বর কলিকাতা গেজেটে রঙ্গলালের নিয়োগের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। তিনি নদীয়া জেলার অন্যতম এসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন। এই রাজকার্য্যে নিয়োগের ব্যাপারে রঙ্গলাল তাহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ নিত্যকালী দেবীকে একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন।

তৎকালীন বোর্ড অব রেভেন্যুর সদস্য ছিলেন ডব্লিউ, ড্যাম্পিয়ার এবং সেক্রেটারী ছিলেন তাঁহারই পুত্র হেনরী লুসিয়াস ড্যাম্পিয়ার। হেনরী লুসিয়াস পিতার অনুমতি ব্যতিরেকেই স্বীয় রুচিঅনুযায়ী এক কন্যাকে বিবাহ করেন। মিঃ ডব্লিউ, ড্যাম্পিয়ারের দৃষ্টিতে এই মহিলা তাহাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক প্রতিপত্তি অপেক্ষা অবরবর্গীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ফলে পিতা পুত্রের মধ্যে মন মালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং পরে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। পিতা এবং পুত্র উভয়েই রাজা সত্যশরণ ঘোষালের বিশেষ বন্ধু ব্যক্তি ছিলেন। তাই রাজা এই পরিস্থিতির অবসানকল্পে উৎসাহী হন। ইঁহাদের মিলন মানসে একদিন রাজা উভয়কেই পৃথক পৃথক ভাবে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। পূর্ব হইতেই রাজা দুই জনকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে আদর

আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, যাহাতে একে অপরের উপস্থিতি বুঝিতে না পারেন। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে উভয়েই রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মিঃ হেনরী লুসিয়াস তাঁহার স্ত্রী ও নবজাত পুত্র সমভিব্যাহারে আসিলেন। রাজা বৃদ্ধ ড্যাম্পিয়ারের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে বলিলেন "আপনার পুত্রের নবজাত পুত্রটি কি সুন্দরই না হইয়াছে, আপনার পরিবারের নিশ্চিত গৌরব বৃদ্ধি করিবে।" বৃদ্ধ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "আমার কোন পুত্র বা পৌত্র নাই।" রাজা তখন ধৈর্য্য রাখিয়া বলিলেন, "সে কি! শিশুটি তো এই বাড়ীতে আছে।"—এই সময় রঙ্গলালও বৃদ্ধ ড্যাম্পিয়ারের আপ্যায়ন-কক্ষে উপস্থিত ছিলেন; রাজা ইঙ্গিত করিবামাত্র তিনি অন্য কক্ষ হইতে শিশুটিকে আনিয়া বৃদ্ধের ক্রোড়ে দিলেন। শিশু পৌত্রকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধের সমস্ত ক্রোধের উপশম হইল। সুযোগ বুঝিয়া রঙ্গলাল মিঃ হেনরী লেসিয়াস ও তাহার অর্ধাঙ্গিনীকে বৃদ্ধের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা বৃদ্ধ ড্যাম্পিয়ারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে বক্ষে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত বিচ্ছেদের অবসান ঘটান। আনন্দোচ্ছল পরিবেশের পরিসমাপ্তিতে ড্যাম্পিয়ার পরিবার রঙ্গলালের পরিচয় জানিতে উৎসাহী হইলে রাজা তাঁহার বিষদ পরিচয় দেন এবং তাঁহাকে একটি উপযুক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া করুণা প্রকাশের অনুরোধ জানান। ইহার কিছুদিন পরেই রঙ্গলাল ইন্‌কাম ট্যাক্স এসেসর ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন।

১৮৬০ খৃঃ ৬ই নভেম্বর নদীয়া জেলার অন্যতম অস্থায়ী ইন্‌কাম ট্যাক্স এসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া রঙ্গলাল প্রথমে শান্তিপুরে রাজকার্য্যে যোগদান করেন। তাঁহার পূর্ব পরিচিত কার্য্যদক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল তখন শান্তিপুরের সাব ডিভিসনাল অফিসার থাকায় রঙ্গলালের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। প্রথমাবস্থায় তাঁহার গৃহেই অবস্থিতি করিয়া রঙ্গলাল সরকারী কাজ কর্ম্মের তদারকি করিতে থাকেন। ডিসেম্বর মাসে তাহার কর্ম-কেন্দ্র দামুরহুদায় স্থানান্তরিত হইয়া যায়। এই স্থানে অবস্থান কালে ১৮৬১ খৃঃ ৩১ শে জানুয়ারি কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা হীরামতির বিবাহ বাগবাজার নিবাসী, বিদ্যালয় পরিদর্শক, জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগিনেয় প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়-এর সহিত সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় খিদিরপুরের বাড়ীতে সুসম্পন্ন হয়। এই বিবাহে রঙ্গলাল উপস্থিত হইতে পারেন নাই। গণেশচন্দ্র সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীন থাকায় হরিমোহনকেই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এইস্থানে আট নয় মাস রাজকার্য্য পরিচালনার পর গড়পোতায় কয়েক মাস কার্য্যব্যপদেশে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় কবি দামুরহুদায় বদলী হইয়া আসেন। তখনই কবির দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ "কর্ম্মদেবী" ১২৬৯ সালের ৩০শে আষাঢ় (১৮৬২ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ খৃঃ মধ্যভাগে কাব্যখানি লেখা শেষ করিলেও কবি রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রবাসে অবস্থিতি করায় প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। এই সময় "কলম্বাস" নামক একখানি গদ্য গ্রন্থও রচনা করেন। কবি যশঃ এবং আর্থিক লাভের পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনায় পুস্তকখানি আর প্রকাশিত হয় নাই। মিঃ উইলসনের মৃত্যুর পরে স্যামুয়েল লেং ভারতবর্ষের রাজস্ব সচিব হইয়া আসেন এবং ব্যয় সংকোচ মানসে ইন্‌কাম ট্যাক্স আদায়ের নিয়মের পরিবর্তন করিয়া এসেসরের পদগুলি উঠিয়া দেন। ইহার ফলে ১৮৬২ খৃঃ রঙ্গলালের ইন্‌কাম ট্যাক্স এসেসরের চাকরির অবসান ঘটে। ইহার পর রঙ্গলাল আবার কিছু-দিন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদনার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

অতঃপর ১৮৬৩ খৃঃ প্রথম ভাগেই রঙ্গলাল বালেশ্বরে স্পেশ্যাল ডেপুটি কালেক্টরের পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। বালেশ্বরের শিক্ষা সমিতির সদস্য হিসাবেও মনোনীত হন। উড়িষ্যায় চাকুরী হওয়ায় রঙ্গলাল উড়িয়া ভাষা শিক্ষায় সচেষ্ট হন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই উড়িয়া ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময় কয়েক বৎসর ধরিয়া রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের "রহস্য সন্দর্ভ" নামক মাসিক পত্রিকায় রঙ্গলালের "উৎকল বর্ণন", উৎকল কবি দীনকৃষ্ণদাসের জীবনী ও তাঁহার রচিত "বর্ষা বর্ণন" কবিতার বঙ্গানুবাদ, কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের-জীবন কাহিনী এবং তাহার বৈদেহীশ বিলাপের অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ এবং "স্বপ্নাবেশে দেশ ভ্রমণ" ও "পদ্মপুষ্পের প্রতি" কবিতাদ্বয় প্রকাশিত হয়। এতৎ ব্যতীত উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় রঙ্গলালের অভিভাষণটিও প্রকাশিত হয়।

মাতুলের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুরাতন বাড়ীখানির অবস্থা খুবই জীর্ণ হইয়া পড়ায় উহা বসবাসের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া অনুমিত হওয়ায় ভ্রাতা হরিমোহন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের খিদিরপুরস্থ (২০ নং সারকুলার গার্ডেন রীচ রোড) দ্বিতল বাড়ীখানি দশ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া ১৮৬৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে সপরিবারে চলিয়া আসেন।

কবির জ্যেষ্ঠপুত্র জহরলাল কলিকাতার হিন্দুস্কুল হইতে ১৮৬৪ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে হরিমোহন তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। এই বৎসরের ১৫ ই ডিসেম্বর রঙ্গলাল স্থায়ীভাবে কটকের ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। তখন তাহার মাসিক বেতন দুই শত টাকা হইয়াছিল। এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কটকের শিক্ষাসমিতির সদস্যও মনোনীত করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার, জহরলালের সহিত ভবানীপুর নিবাসী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা নিত্যকালী দেবীর শুভ পরিণয় হরিমোহনের ব্যবস্থাপনায় সুসম্পন্ন হয়। রঙ্গলাল এই বিবাহেও উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। রঙ্গলাল এই সময় তাঁহার পরিবারবর্গকে কটকে লইয়া যাওয়ার অভিপ্রায় হরিমোহনকে পত্রযোগে ব্যক্ত করেন। কটকে যাওয়া তখন সহজসাধ্য ছিল না। বলদে টানা গাড়ীই একমাত্র নির্ভর ছিল। কলিকাতা হইতে তদনুরূপ কোন গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া হরিমোহন কবিকে কটক হইতে একখানি গাড়ী ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইতে লিখেন। (কারণ পদাধিকার বলে হয়তো তাঁহার পক্ষে খুব অসুবিধা হইবে না,—এই চিন্তা করিয়া।) সেইমতে ১৮৬৫ খৃঃ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি রঙ্গলাল একখানি বলদের গাড়ী খিদিরপুরের অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। গাড়ীখানি দুই সপ্তাহ পরে খিদিরপুরে আসিয়া পৌঁছায়। অতঃপর ১৮৬৫ খৃঃ ৫ মে পান্নালালের উপনয়ন হইয়া যাওয়ার পরে কবি পত্নী দুইপুত্র (পান্নালাল ও মতিলাল) এবং কনিষ্ঠ জামাতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া ৪ঠা জুন কটক অভিমুখে যাত্রা করিয়া আগষ্ট মাসে তথায় যাইয়া পৌঁছান। অত্যধিক পরিশ্রমে বলদ দুইটি রুগ্ন হইয়া পড়ায় এবং গাড়ীর ভগ্নপ্রায় চাকাগুলি মেরামতির জন্য কটক পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। কবি পত্নীকে কটকে পৌঁছাইয়া দিয়া ৯ই ডিসেম্বর উমেশচন্দ্র খিদিরপুরে ফিরিয়া আসেন।

ইহার কিছুদিন পরে অগ্রজ গণেশচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যুতে কবি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। ১৮৬৫ খৃঃ ১৯শে ডিসেম্বর গণেশচন্দ্র অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিবার সময় হঠাৎ ভূপতিত হইয়া পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। বিশিষ্ট চিকিৎসকদের অনেক

চেষ্টা সত্ত্বেও ১৮৬৬ খৃঃ আনুমানিক ৩রা জানুয়ারি বিধবা পত্নী ও একটি শিশু কন্যা (জন্মঃ ১৮৬৪ খৃঃ আনুমানিক এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে) রাখিয়া মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গতায়ু হন। গণেশচন্দ্রের জীবনে দুইবার পত্নী বিয়োগ ঘটে এবং ভ্রাতাদিগের অনুরোধে তৃতীয়বার বিবাহিত হন। তিনি কাব্যচর্চা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়া ছিলেন। তাঁহার রচিত "চিত্ত সন্তোষিণী" "কৃষ্ণ বিলাস" ও 'ঋতুদর্পণ" যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

রঙ্গলাল যখন কটকে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই সময় উৎকলীয় ভাষায় কোন সংবাদ পত্র ছিলনা। জনজীবনে শিক্ষার প্রসার কল্পে, স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রঙ্গলাল স্বীয় প্রচেষ্টায় "উৎকল দর্পণ" নামক একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত করেন। এই পত্রটি সম্বন্ধে অদ্যাবধি কেহ কোন প্রকার উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কোন তত্ত্ব সংগ্রহ করে নাই। রঙ্গলাল কটকে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরে উড়িষ্যায় এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই সময় রঙ্গলালের কর্মে নিষ্ঠা ও দক্ষতা উর্দ্ধতন রাজকর্মচারীদিগকে মুগ্ধ করে ; ফলে ১৮৬৭ খৃঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি পঞ্চম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন এবং বেতন বর্দ্ধিত হইয়া ৩০০ টাকা হয়। ১৮৬৮ খৃঃ রঙ্গলাল পুনরায় শিক্ষা সমিতির সদস্য হন এবং উন্মাদাগারের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। দুর্ভিক্ষের সময় রাজা দিগম্বর মিত্রের সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এই সময় রাজা উড়িষ্যায় আসিয়া তাঁহার প্রজাদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। কটকের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই মহৎ কার্য্যের জন্য রাজাকে একটি সম্বর্ধনা সভার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানান এবং একটি মানপত্র দ্বারা অভিনন্দিত করেন। এই মানপত্রটি রঙ্গলাল কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়াই অনুমিত হয়। কটকে অবস্থিতিকালেই ১লা আশ্বিন ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খৃঃ) রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য "শূরসুন্দরী" প্রকাশিত হয়।

১৮৬৯ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি রঙ্গলাল হুগলী জেলার জাহানাবাদ মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া আসেন। পর বৎসর (১৮৭০ খৃঃ ২৫ শে নভেম্বর) তিনি হুগলী নগরীতেই হাকিমের পদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার মাহিনা বর্দ্ধিত হইয়া চারিশত টাকা হয়। এই সময় তিনি হুগলী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদেও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কবির দ্বিতীয় পুত্র পান্নালালের এই সময়েই মাত্র ষোল বৎসর বয়সে হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কাদম্বিনী দেবীর সহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে রঙ্গলাল ছুটি লইয়া খিদিরপুরে আসিয়াছিলেন এবং তখনই কবি দেখিলেন যে, মাতুল প্রদত্ত বাড়ীখানি এরূপভাবে ভূমিসাৎ হইয়াছে যে তাহা আর কোন রূপ সংস্কারের অপেক্ষা রাখে না। তদবস্থায় হরিমোহন সম্পত্তি ভাগ করিবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী রঙ্গলাল মাতুল প্রদত্ত বাড়ীটির জমিটুকু পাইবেন ও হরিমোহন ইট, কাঠ প্রভৃতি ইমারতী দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবেন এবং কবিবরের বাকুলিয়া গ্রামে বাগানের নিমিত্ত যে সামান্য জমিটুকু আছে তাহার স্বত্বও হরিমোহনকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। রঙ্গলাল তাহাতেই রাজী হইলেন এবং মাতুল প্রদত্ত বাড়ীর জমিতে একখানি বাড়ী নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইলেন। প্রথমে হরিমোহনই কবিবরের বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তিনি এই কার্য্য সম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে কবিবরের জ্যেষ্ঠপুত্র জহরলালের তত্ত্বাবধানেই বাড়ী তৈয়ারীর প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু সামান্যতম কার্য্য সম্পন্ন হইবার পরেই অর্থাভাবে সাময়িকভাবে বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্য ব্যাহত হয়।

জাহানাবাদে আসিয়া কবির স্বাস্থ্য ভাল যাইতে ছিল না। মধ্যে মধ্যেই তিনি জ্বরে ভুগিতে-ছিলেন। তাঁহার পিতাও এইরূপ জ্বরেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কবি স্বীয় জীবন সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাঁহার অবর্তমানে এ বিরাট উপার্জন অক্ষম পরিবারের কথা চিন্তা করিয়া কবি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। এইরূপ চিন্তাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে কবি কোন মৌলিক রচনা সৃষ্টি করিতে না পারিলেও সাহিত্য সাধনা হইতে একেবারে বিরত হন নাই। তিনি এই সময় "সত্যার্ণব" পত্রিকার সম্পাদক রেভারেণ্ড জেমস্ লং সাহেবের উৎসাহে তাঁহারই সংগৃহীত বিভিন্ন প্রবাদ বচনের বাংলা ভাষায় মর্মানুবাদ করেন। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইলেও প্রথম খণ্ড সম্পর্কে কোন কিছুই জানা যায় না। কবিবর তাঁহার প্রিয় কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মহাশয়ের "চণ্ডী মঙ্গল" কাব্যের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের সংস্করণও নিজ সম্পাদনায় প্রকাশ করেন।

রঙ্গলালের তৃতীয় মাতুল মধুসূদনের তৃতীয় পুত্র অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যবহারিক জীবনে চিকিৎসক হইলেও তিনি বিশেষ নাট্যানুরাগী ছিলেন এবং নিজেই একটি শখের যাত্রাদল গঠন করিয়াছিলেন। কবি তাঁহাকে কয়েকটি যাত্রার পালা লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেইগুলি যখন অধিক অভিনয়ে জনপ্রিয়তা হারাইতেছিল অঘোরনাথ তখন নতুন পালার জন্য রঙ্গলালকে লিখিয়া পাঠান; কবি প্রবাসে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় বর্ধমান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমাপতি রায় মহাশয়কে অঘোরনাথের জন্য একখানি যাত্রার পালা লিখিয়া দিবার অনুরোধ জানান। সেই মতে তিনি অঘোর নাথকে "সীতার বনবাস" নামক একখানি যাত্রার পালা লিখিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না, তাই পালায় গীত সংযোজন করিতে পারেন নাই। সংগীতের অভাবে অঘোরনাথ বিশেষ অসুবিধায় পড়েন। ১৮৭১ খৃঃ রঙ্গলাল যখন হুগলীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন অঘোরনাথ তখন কয়েকদিন হুগলীতে থাকিয়া "সীতার বনবাস" পালার জন্য অনেকগুলি গীত লিখিয়া লন। হুগলী হইতেই কবিবর মহাকবি কালিদাস বিরচিত "কুমার সম্ভব" কাব্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ১২৭৯ সালের ১লা ভাদ্র (১৮৭২ খৃঃ)।

রঙ্গলাল যখন হুগলীতে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় (১৮৭২ খৃঃ) একটি চাঞ্চল্যকর মকদ্দমা তাঁহার আদালতে আসে। মহানাদ গ্রামের খৃষ্টিয় ধর্মপ্রচারকগণ দুইটি ভদ্র হিন্দু কন্যাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়ায় কন্যাদ্বয়ের পিতা ধর্মপ্রচারকগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। অভিযোগ পুলিশ দ্বারা তদন্ত করিয়া ধর্মপ্রচারকগণ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় রঙ্গলাল তাহাদের অভিযুক্ত করেন এবং তাহার রায়ে খৃষ্টধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধে পরোক্ষে কঠোর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ধর্মপ্রচারকগণ জজ সাহেবের কাছে আপীল করিলে জজ সাহেব নিম্ন আদালতের রায় পাঠ করিয়া রঙ্গলালের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করেন। তাহার পর রঙ্গলালের কৈফিয়ৎ এবং আপীল-মোকদ্দমার সমস্ত নথীপত্র একত্র করিয়া জজ সাহেব বিভাগীয় কমিশনর মিঃ, সি. টি. বাক্‌ল্যাণ্ড-এর নিকট প্রেরণ করেন। মিঃ বাক্‌ল্যাণ্ড কোন প্রকার মন্তব্য না করিয়া কাগজপত্রগুলি বাংলার ছোট লাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের নিকট প্রেরণ করেন। ছোট লাট এই পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত সাপেক্ষে ১৮৭৩ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী রঙ্গলালকে তিন মাসের জন্য সাস্‌পেণ্ডের আদেশ দেন এবং এই অন্তবর্তী কালে রঙ্গলাল মাহিনার

পরিবর্তে একশত টাকা ভাতা পাইবেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় বাংলা গভর্ণমেন্টের পলিটিকেল সেক্রেটারী মিঃ সি. টি. বার্নার্ডের সহিত দেখা করেন। মূলতঃ তাহার প্রচেষ্টাতেই মিঃ বার্নার্ডের রঙ্গলালের উপর একটা ভাল ধারণা জন্মায় এবং তাঁহার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই ঘটনার পরে ১৮৭৩ খৃঃ ৭ই এপ্রিল বার্নার্ড সাহেব রঙ্গলালকে আবার কটকে বদলী করিয়া দেন।

কটকে বদলী হইবার সংবাদ পাইয়া রঙ্গলাল সপরিবারে হুগলি হইতে খিদিরপুরে চলিয়া আসেন এবং একটা পারিবারিক বন্দোবস্ত করেন। সেই মতে জহরলাল সস্ত্রীক হরিমোহনের বাড়ীতে থাকিয়া রঙ্গলালের বাড়ীর নির্মাণ-কার্য্যের তদারকি করিবেন এবং পান্নালাল হোষ্টেলে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবে। কন্যাদ্বয় (হীরামতি ও ধনমতি) নিজ নিজ স্বামী-পুত্র-কন্যা লইয়া স্ব স্ব শ্বশুরালয়ে যথাক্রমে বাগবাজার ও বহুবাজারে যাইয়া থাকিবে এবং রঙ্গলালের নিকট হইতে মাসোহারা পাইবে। খিদিরপুরে এক সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিয়া রঙ্গলাল পত্নী ও কনিষ্ঠ পুত্র মতিলালকে সঙ্গে লইয়া বাষ্পীয়পোতে কটকের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

১৮৭৩ খৃঃ ২১শে এপ্রিল রঙ্গলাল দ্বিতীয়বার কটকে আসিয়া কটকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কর্মভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পুরাতন মনিব রেভেনশা সাহেবই তখনও কমিশনর ছিলেন। রঙ্গলালের দ্বিতীয় বার কটকে আগমনকে তিনি স্বাগত জানান এবং তাঁহার উপর ট্রেজারির ভার অর্পণ করেন। এই বৎসরই তিনি রেভেনশা কলেজিয়েট স্কুল কমিটির সদস্য হন এবং পরবর্তী বৎসর (১৮৭৪ খৃঃ) কটক লোকাল বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৭৩ খৃঃ কবিবর রঙ্গলালের নিকট বড়ই দুর্বৎসর। এই বৎসরই কবিবরের বিশিষ্ট সুহৃদ বাংলা সাহিত্যের দিকপাল মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও সুকবি দীনবন্ধু মিত্র এবং বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক কিশোরীচাঁদ মিত্র ইহলীলা সম্বরণ করেন। এই দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন :—

"মধুসূদনের" শোকে বিবশা দুঃখিনী,
না হ'তে চেতন নেত্র মুদিল "কিশোরী",
তার শোক অশ্রু জল না ছুইতে বক্ষঃস্থল
মাতৃকোল "দীনবন্ধু" গেল শূন্য করি
ঈশ্বর তোমারি ইচ্ছা—বঙ্গ অভাগিনী।

কটকে আসিয়া অবধি রঙ্গলাল এবং পরিবারের অপরাপর সকলেই নানারূপ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। ইহাতে সাংসারিক কাজকর্মে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রঙ্গলাল তখন জহরলালকে সস্ত্রীক কটকে চলিয়া আসিবার জন্য পত্র দেন। পিতার নির্দেশ মতো দীক্ষাগুরু-বংশীয় অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কে বাড়ী নির্মাণের দায়িত্ব দিয়া ১৮৭৪ খৃঃ জহরলাল সস্ত্রীক কটকে চলিয়া যান। অক্ষয়কুমার দুই বৎসরের মধ্যে রঙ্গলালের খিদিরপুরের বাড়ীর একতালার নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। কটকে অবস্থিতিকালে কবিবরের সহিত কবি নবীনচন্দ্র সেনের পরিচয় ঘটে। এই সময় রঙ্গলাল পুরাতত্ত্ব বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা করিতে ছিলেন। এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই বিষয়ে কিছু প্রবন্ধও লিখেন। রঙ্গলালের বিভিন্ন নীতি-বিষয়ক

শ্লোকে রচিত "নীতি কুসুমাঞ্জলি" নামক একটি খণ্ড কাব্য এই সময় ধারাবাহিক ভাবে (১২৮২ সালের পৌষ হইতে চৈত্র) বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৬ খৃঃ রঙ্গলালের নিকট বড়ই মর্মান্তিক। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া এই বৎসরই মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। মতিলাল খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া কটকের রেভেনশা কলেজে ভর্তি হন। কবি পত্নী এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং পুত্র বিয়োগের দুই বৎসর পরে (১৮৭৮ খৃঃ) গতায়ু হন।

ইহার পর কটকে অবস্থিতি শোকসন্তপ্ত রঙ্গলালের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। তিনি বাংলাদেশে বিশেষতঃ খিদিরপুরের নিকট কোন স্থানে বদলী হইবার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার ফলে ১৮৭৯ খৃঃ ৬ই মার্চ্চ হাবড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর রূপে বদলী হইয়া আসেন। রঙ্গলাল দ্বিতীয় বার কটকে যাইয়া ছয় বৎসর ছিলেন এবং বাংলাদেশে বদলী হইবার প্রাক্কালে তাঁহার মাসিক বেতন চারিশত টাকা হইতে পাঁচশত টাকা হইয়াছিল। রঙ্গলাল উড়িষ্যায় অবস্থিতি করিবার সময়ই তাঁহার কাঞ্চীকাবেরী কাব্যখানি রচনা করেন (১৮৭৮ খৃঃ) যদিও প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

রঙ্গলাল খিদিরপুরের বাড়ী হইতে প্রত্যহ যানযোগে হাবড়ায় যাইয়া সরকারী কার্য্য করিতেন। খিদিরপুরের বাড়ী সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার পান্নালাল এবং কন্যাদ্বয় সকলেই সপরিবারে এই বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রঙ্গলাল অনেকখানি পূর্ব শোক ভুলিয়াছিলেন। জহরলাল তখনও সপরিবারে উড়িষ্যায় অবস্থিতি করিয়া কটকে রেভনশা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। রঙ্গলালের ইহা আর মনঃপূত হইতেছিল না। কবিবরের শেষ জীবনে সকল পুত্র কন্যাকে লইয়া এক সঙ্গে দিন কাটাইবার মনোবাসনা হইয়াছিল। তাই তিনি জহরলালকে কটকে হইতে চলিয়া আসার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখেন। সকল অসুবিধার কথা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পিতার ইচ্ছাকে রূপদিবার জন্য জহরলাল শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া কটক হইতে খিদিরপুরে চলিয়া আসেন।

জীবন-সায়াহ্নে শোক, তাপ, দুঃখ, দুর্দশার মধ্যেও কবি কাব্য সাধনার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। হাবড়ায় সরকারী কার্য্য পরিচালনার মধ্যেও আত্মীয় খেলাৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর (নেপাল) শখের যাত্রাদলের জন্য কয়েকটি যাত্রার পালা লিখিয়া দিয়াছিলেন,—লক্ষ্মণ বিজয় ইহাদের অন্যতম। পালাটি এখন বিলুপ্ত। কবিবর হিন্দী দোহার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাই বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমুজ্জ্বল করিবার মানসে তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া তুলসীদাস ও কবিরের দোহাবলীর অনুবাদ করেন। প্রতীত হয় যে এই সময়ই কবিবর মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত" কাব্যের এর বঙ্গানুবাদ করেন। সংস্কৃত ভাষায় যেইরূপ অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি আছে বাংলা ভাষায় তদ্রূপ কোন পুস্তক না থাকায় রঙ্গলাল বড়ই ইহার অভাব অনুভব করিতে থাকেন। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি বাংলা ভাষায় একখানি অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়নে প্রচেষ্ট হন। ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন না হওয়ায় কবিবর তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

হাবড়ায় বৎসর দুই কার্য্য করিবার পরে কোন এক সময়ে কবিবরের কাছারী হইতে কতকগুলি নথিপত্র হারাইয়া যায়। তদন্ত সাপেক্ষে ১৮৮০ খৃঃ ৪ঠা ডিসেম্বর রঙ্গলালকে সাময়িকভাবে

কার্য্য হইতে অপসারিত করা হয় এবং তাঁহার মাসিক ভাতা আড়াই শত টাকা ধার্য্য হয়। কিয়ৎদিন তদন্তের পরেই প্রকৃত দোষীকে নিরূপণ করা সম্ভব পর হইলে রঙ্গলালকে পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কবিবরের বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তাঁহার মনে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই অপসারণকে তিনি যথেষ্টই অপমান জনক বলিয়া মনে করেন। সেই জন্য ১৮৮১ খৃঃ ১১ই জানুয়ারি হইতে কবি এক বৎসর তিন মাসের বিদায় ছুটি লন। এই ছুটির মধ্যেই রঙ্গলাল সচেষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পান্নালালকে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তায় প্রধান করণিকের পদে নিযুক্ত করইয়া দেন।

অবসর গ্রহণের কিছুদিন পূর্ব্বে কবির জীবনে চরম দুর্ভোগ নামিয়া আসে। কবি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া কবির জিহ্বা অসাড় হইয়া পড়িলে কবি বাকশক্তি রহিত হইয়া পড়েন। রোগ উপশমের জন্য কবির এ্যালোপেথিক চিকিৎসা হইতে ছিল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হইতেছিল না দেখিয়া একজন হাকিমকে কবির চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই হাকিমের চিকিৎসায় কবি কিছুটা সুস্থ বোধ করেন এবং উঠিয়া বসিতে সমর্থ হন এবং তখন হইতে নিজ মনোভাব লিখিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম হওয়ায় কবির অনেক কষ্টের অবসান ঘটে। এই সময় কবির ছুটি শেষ হইয়া আসিলে তিনি পেনসনের জন্য আবেদন করেন। ১৮৮২ খৃঃ ১১ই এপ্রিল রঙ্গলাল সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আড়াই শত টাকা মাসিক পেন্‌সন্ মঞ্জুর হয়।

হাকিমী চিকিৎসা কবির পক্ষে যথেষ্টই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। কবিবর ক্রমে ইনভেলিড্ চেয়ারে বসিয়া বাড়ীর সম্মুখে রাজপথের পার্শ্বে আসিয়া বসিতে সমর্থ হন এবং সাধারণের সাক্ষাতে কবিচিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠে। ইহার কিছুদিন পরে কবির জন্য একখানি পেরাম্বুলেটর ও একজন চাকরের ব্যবস্থা করা হয়। তখন কবি সেই পেরাম্বুলেটরে চড়িয়া খিদিরপুর অঞ্চলে রাজপথ পরিভ্রমণে বাহির হইতেন। প্রায় পাঁচ বৎসর কবির এই ভাবেই দিন অতিবাহিত হইতেছিল। কিন্তু কন্যা ধনমতির হঠাৎ মৃত্যু কবির মনে গভীর শোকের রেখাপাত করে। ১৮৮৭ খৃঃ প্রথম ভাগে ধনমতির নাশিকার মধ্যে একটি ক্ষত হইয়া রক্ত ক্ষরণ হইতে আরম্ভ হয় এবং অল্পদিনেই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া একমাসের মধ্যেই মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। সংবেদনশীল কবিচিত্ত এই নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলে কবি পুনরায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং ইহাই কবিবরের অন্তিম শয্যা।

কবিবরের ইচ্ছানুসারে ২২শে বৈশাখ ১২৯৪ সাল (৪ মে ১৮৮৭ খৃঃ) তাঁহাকে খিদিরপুরে আদিগঙ্গার তীরে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় তিনি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে অন্তিম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কুলগুরু অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০শে বৈশাখ সেইখানেই আসিয়া কবিবরকে ইষ্টমন্ত্র শুনান। ৩১ বৈশাখ পূর্বাহ্নে কবিবরের শেষ ইচ্ছানুযায়ী প্রায়শ্চিত্য এবং চান্দ্রায়ণ ও সমাধা করা হয়। দ্বি-প্রহরের পর হইতে কবিবরের দৈহিক অবস্থার অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারই নির্দ্দেশে তাহার অর্ধ অঙ্গ গংগার পবিত্র সলিলে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। এইরূপে নবরাত্রি গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিয়া বাণীর অমর সাধক পুরুষকারের চরিতকার বাংলা সাহিত্যে আখ্যান কাব্যের জনক শৌর্য্যব্রতী রঙ্গলাল সমস্ত জাগতিক দুঃখ যন্ত্রণার অবসান ঘটাইয়া করুণাময়ীর অনন্ত আনন্দরাজ্যে নিজের স্থান করিয়া লন।

—হরিবন্ধু মুখটি

গ্রন্থ-পরিচিতি

প্রাকবাক : ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে—পূর্ব ভারতের এক বিশাল ভূখণ্ডে ও তথাকার অধিবাসীদের সহস্র বছরের গ্লানিময় জীবন শেষ হলো। তৎপর দিনের প্রত্যুষের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হলো আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন, যেটা মধ্যযুগে চিন্তা করার কল্পনা-বিলাসও ছিল না। বহু বছর এই ভূখণ্ডের মানুষ, মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় 'Long sunk in superstition's night, By sin and Satan driven,'—এক মোহময় আঁধারে নিমজ্জিত ছিল—যেখানে ছিল কেবল হতাশা ও আক্ষেপ। বাঙালী জাতি এ সময়ে আত্মস্থ হলে, নিজেকে জগৎ-সভায় উপাস্থাপিত করল ও নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার সুযোগ পেল। এই সময়ে কলকাতাকে কেন্দ্রকরে কয়েকজন মনীষী জাতিকে গড়বার কাজে এগিয়ে এলেন। তাঁদের অবলম্বন ছিল অতি সীমিত, কিন্তু এই প্রচেষ্টা ছিল দৃঢ়তর। আশ্চর্যের বিষয় এইসব মনীষীদের আন্তরিক সদ্ ইচ্ছাই উনিশশতকে জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে গিয়েছে।

এর পশ্চাৎপট অন্বেষণে দেখা যায় এক বিত্তহীন কবির অবদান। তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁরই উৎসাহে বর্ধিত হলেন কয়েকজন সত্যকার কুল-তিলক। তাঁরা দেশে আনলেন সত্যকার ধ্যান-ধারণার কথা। এই সব ধ্যান-ধারণা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। জগৎ-সভায় অতি শীঘ্রই তাঁরা জ্ঞান-গরিমা নিয়ে উপস্থিত হলেন। এই সময়ের একজন মনীষী কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসাহী পাঠকেরা রঙ্গলাল সম্পর্কে এই ক'টি বই পড়তে পারেন।

১। কবি-চরিত—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯।

২। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মন্মথনাথ ঘোষ ১৩৩৮।

৩। বাংলা সাময়িকপত্র ব্রজেন্দ্রনাথ—বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঘ ১৩৩৬।

৪। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রাবণ ১৩৫০।

৫। মহাকবি রঙ্গলাল—শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রাবণ ১৩৬১।

শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গলালের বংশধর। তিনি কবিবরের জীবনী ছাড়াও, তাঁহার অপ্রকাশিত ও লুপ্তপ্রায় রচনার একটি সঙ্কলন পারিবারিক কাগজপত্রের সহায়তায় "রঙ্গলাল-রচনা সংগ্রহ" নামে প্রকাশিত করেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি শুধু:পূর্ব পুরুষের তর্পণ করেন নি, বাংলা-সাহিত্যের এক লুপ্তপ্রায় অধ্যায়ের উদ্ধারসাধনও করেছেন।

বর্তমান রচনাবলী : এ যাবৎ রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী হিসাবে বাজারে যে সব গ্রন্থাবলী পাওয়া যায়, সেগুলির কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ নয়। অনেক রচনাই তাতে নেই। কবিকে সামগ্রিকভাবে পাওয়া যায় না। বর্তমান সম্পাদক এর অভাব পূরণ করেছেন। অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করে রঙ্গলালের জীবিতকালের সংগ্রহগুলি পুনর্মুদ্রণ করেছেন। এছাড়া শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত-সংগ্রহ ও নানা সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি একত্রে এই সংগ্রহে প্রথম প্রকাশিত করেছেন। নিম্নে এই রচনাবলীতে প্রকাশিত রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১. **কলিকাতা কল্পলতা :** কলিকাতা নগরীর উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ে ১৮৫১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কালের ইতিবৃত্তমূলক প্রবন্ধ। শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত "রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহ" (প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৬৬ সাল) গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। এই রচনাটিই কলকাতার ইতিহাসের প্রথম বাংলা রচনা বলিয়া প্রতীত হয়। কবিবরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লিখিত। প্রবন্ধটি "গরভারতী" পত্রিকাতেও (কার্তিক ১৩৬৬ সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়।

২ **বঙ্গ বিদ্যার আত্ম বিবরণ :** বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ে ১৮১২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কালের ইতিবৃত্ত মূলক আলোচনা। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন এবং তৎকালীন সাহিত্য সেবকদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইহাতে পাওয়া যায়। রচনাটি ১২১৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে প্রকাশিত এডুকেশন গেজেটের পর-পর পাঁচটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিসাবে ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই। এটিও শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত "রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহে" সঙ্কলিত হয়েছে। সজনীকান্ত দাস তাঁহার "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৬৯ সাল) গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের রচনার যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে এটির কোন উল্লেখ নাই। অনুসন্ধান-জহুরী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই রচনাটির কোন সন্ধান না পাওয়ায়, তার সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদিতে এটির উল্লেখ করিতে পারেন তাই।

৩. **বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ :** বাঙ্গালা কাব্যের পর্যালোচনা মূলক প্রবন্ধ। ১৮৫২ খৃঃ ১৩ই মে মেডিকেল কলেজ গৃহে রাত্রি ৮টার সময় বেথুন সভায় রঙ্গলাল এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অনেকটা বক্তৃতার নিয়মে লিখিত। কবিবর প্রবন্ধটি ২রা জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ সাল তারিখে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২। "সংবাদ সাগর" পত্রের গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ৪ঠা আষাঢ় ১২৫৯ সালের "সংবাদ প্রভাকরে" এই গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকার করে কবিবর ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছিলেন, "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া সমাদরপূর্বক গ্রহণ করলাম। অবকাশ মতে দৃষ্টি করিয়া অভিমত ব্যক্ত করিব।" রেভারেণ্ড লং কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ১৮৫৫ খৃঃ প্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় রঙ্গলালের প্রণীত Defence of Bengali Poetry'ও নামে উল্লেখ আছে। পুস্তকটির প্রথম প্রকাশের সুদীর্ঘ ৮৬ বৎসর পরে কলকাতার রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্থার প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালাভুক্ত দশম সংখ্যক গ্রন্থ হিসাবেও পুনর্মুদ্রিত হয়। এক্ষণ ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রের প্রথম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৬৮ সালে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪. **উৎকল বর্ণন :** উড়িষ্যা দেশ সংক্রান্ত ইতিহাসিক বিষয়ক প্রবন্ধ। নিজ অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ এই প্রবন্ধটি রচিত হলেও মূলভাগে স্টার্লিং রচিত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন বলিয়া মনে হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "রহস্য-সন্দর্ভ" মাসিক পত্রিকার ১ম পর্ব—৫ম খণ্ডে (১৮৬১ খৃঃ) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এটি কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

৫. **কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা :** "কটকের উৎকল ভাষোদ্দীপনী"সভার ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের অধিবেশনে রঙ্গলাল সভাপতি হন এবং উৎকল সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য কি করণীয় সেই সম্বন্ধে এই সারগর্ভ ভাষণটি দেন। ভাষণটি "রহস্য সন্দর্ভ" পত্রিকার ৪র্থ পর্ব—৪২ খণ্ডে (১৮৬৬ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। এটিও কোন গ্রন্থ ভুক্ত হয় নি।

৬. **দীনকৃষ্ণদাস :** উড়িষ্যায় রাজা প্রতাপ রুদ্রের সময়ে দীনকৃষ্ণদাস নামে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইনি রসকল্লোল কাব্যের রচয়িতা। আলোচ্য রচনাটি তাঁর "বর্ষা বর্ণন" কবিতার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত জীবনী ও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা। রহস্য-সন্দর্ভের ২য় পর্ব—১৫শ খণ্ডে (১৮৬৪ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। এর আগে কোন গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নাই।

উপেন্দ্র ভঞ্জ : বাঙ্গালার কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সমকালে উড়িষ্যার "ঘুমসর"

রাজ্যের রাজা উপেন্দ্র ভঞ্জ কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। আলোচ্য রচনাটি তাঁর জীবনী ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা এবং তাঁর রচিত বৈদেহীশ বিলাসের অংশ-বিশেষের অনুবাদ। "রহস্য-সন্দর্ভের ২য় পর্ব —১৬শ খণ্ডে (১৮৬৩ খৃঃ) রচনাটি প্রকাশিত হয়। এটিও সঙ্কলিত হয়নি।

৭. **শরীর সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্তন**ঃ ১৮৬০ খ্রীঃ মধ্যভাগে ৬১ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয় এবং বহুকাল হেয়ার স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত ছিল। কবি রচনাটি প্রথমে হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতি কর্তৃক বিজ্ঞাপিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পাঠান এবং বিচারক মণ্ডলী কর্তৃক ১৮৬০ খৃঃ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় একশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। "সোমপ্রকাশ"-এ (২০শে আগস্ট ১৮৬০ খ্রীঃ) পুস্তকটির একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়, "নূতন গ্রন্থ।—শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্তন নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ হেঅর বার্ষিক সমাজের পুরস্কার ফল।" সর্বত্রই প্রবন্ধটির নাম "শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্তন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে পুস্তকখানি সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার উপরে "শরীর সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্তন বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

৮. **পদ্মিনী উপাখ্যান**ঃ রাজস্থানের পুরাবৃত্তে বর্ণিত পদ্মিনী উপাখ্যানের বাঙ্গালা কাব্যরূপ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৫। নূতন স্বাদের বাঙ্গালা কবিতার প্রথম পুস্তক। সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৯শে আষাঢ় ১২৬৫ খৃঃ (জুলাই ১৮৫৮ খৃঃ) প্রথম প্রকাশিত হয় কাব্যখানির তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করার সুযোগ কবিবর পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যাপটিষ্ট মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১লা বৈশাখ ১২৭২ বঙ্গাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ ৫ই ভাদ্র ১২৭৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের হিন্দু পেট্রিয়ট এ পুস্তকটির একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়," বিজ্ঞাপন। পদ্মিনী উপাখ্যান। শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত বীর-করুণা-রসাশ্রিত উক্ত কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা চৌরঙ্গী সদর স্ট্রীট ১০ নং ভবনে এডুকেশন গেজেট আফিসে তত্ত্ব করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ২ টাকা। প্রদেশবাসি মহাশয়েরা উক্ত মূল্য ভিন্ন এক আনার মূল্যের ডাক ষ্টাম্প পাঠাইবেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কাব্যখানির পুণর্মুদ্রন করেন। এই প্রকাশনটি 'পদ্মিনী'র তৃতীয় সংস্করণ হইতে পাঠ গৃহীত হয়েছে। প্রকৃত পুস্তকের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা না পাওয়া যাওয়ায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে একটি বড় তফাৎ দেখা যাইতেছে। ব্রজেনবাবু যে বিজ্ঞাপনটিকে "তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন" বলিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা মূলতঃ দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন। তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি এইরূপ ছিল।" পদ্মিনী তৃতীয় বার প্রকটিত হইল। অনুগ্রাহক গ্রাহকদিগের অনুরোধ মতে আমি ইহার সহজ সহচরী শৈবাল বল্লীকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিলাম—সুতরাং তাহাতে যে কিছু দোষ বা গুণ উদ্ভাবিত হইবে তাহা তাঁহাদিগের প্রতিই অর্শিবে। (রঙ্গলাল—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, ২০৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ।)

পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশিত হইলে পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎ-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে উহার বিস্তৃত সমালোচনা করেন। সেই সুন্দর সমালোচনাটি এস্থলে উদ্ধৃত করলাম।

"আমরা শ্রুত আছি, একদা অপরাহ্ণে শরৎকালের-মনোহর বায়ু সেবনর্থে তিন জন বিজয়া-মুরক্ত নাগরিক প্রিয় বিজয়ার ধূমে আঘূর্ণিত-নয়নে পথভ্রমণ করিতেছিল, ইত্যবসরে পথিমধ্যে একখানি শারদীয়া প্রতিমা দৃষ্টিগোচর হইল। পীতধূমের মাহাত্ম্যেই নাগরিকদিগের কবিতাশক্তি প্রকৃষ্টরূপে উদ্ভূতা ছিল,মহিষ-মর্দ্দিনীর অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে তাহা একেবারে উচ্ছ্বসিতা হইলে এক নাগরিক কহিলেন, "সখে, আইস, আমরা একটা কবিতা রচনা করি?" দ্বিতীয় নাগরিক তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "ভাই, তিনজনে তিন চরণ রচনা করিয়া কবিতা সম্পূর্ণ করিতে হইবে।" এই পণ স্থির হইলে প্রথম নাগরিক বিশেষ প্রযত্নে প্রথম চরণ রচনা করত কহিলেন, 'ওমা ভবের ভবানী'। দ্বিতীয় নাগরিক ভবানীর অনুপ্রাস রক্ষা করা কঠিন বোধে কহিলেন, 'দূর মূর্খ, নীর মীল কলি?' পরে অনেক কষ্টে অনুপ্রাস সিদ্ধ করিয়া কহিলেন, 'কি শোভা সিঙ্গীর পীঠে চড়ানী'। এই প্রকারে দুই নীর অনুপ্রাস সাঙ্গ হইলে তৃতীয় নাগরিক মহাক্রোধে কহিলেন, 'রে হতভাগা! সমস্ত নীর মীল শেষ কলি?' এবং মানসিক সকল বৃত্তির পরিশ্রমে অনেক শিরোবেদনা ও ঘর্ম্মের পর নীর অনুপ্রাস-বিশিষ্ট তৃতীয় পদ পূর্ণ করিলেন, যথা, 'ওমা সাপকে দিয়া চোরাকে কামড়ানী।' অধুনা কোন নূতন পদ্যগ্রন্থ দেখিলেই আমাদিগের মনে এই নীর মীলের উপাখ্যান স্মরণ হয়; যেহেতু যে কোন নব্য গ্রন্থ গ্রহণ করা যায় তাহাই অর্থ ও ভাব বিহীন অকিঞ্চিৎকর অনুপ্রাস পরিপূর্ণ দেখা যায়। এই নিমিত্ত নব্য বাঙ্গালী-পদ্য দেখিলেই আমরা নীর মীলের আশঙ্কায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। সম্প্রতি কোন কাব্য-প্রিয় বন্ধুর অনুরোধে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নামা একখানি নূতন গ্রন্থ পাঠ করিতে আমাদিগের সে আশঙ্কার সমাধা হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ কবি বটে সন্দেহ নাই। তিনি আধুনিক কাব্যাভিমানিদিগের ন্যায় কএক শব্দালঙ্কারকেই কবিত্ব স্বীকার করেন না। ভাব ও অর্থই তাঁহার পূজ্য, এবং ঐ দেবসেবায় তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সদ্ভাবের আকর, এবং সেই ভাবসকল মনোহর ভঙ্গীতে অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই শুভ ঘটনার পক্ষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাখ্যানের সৌন্দর্য্যে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন মানিতে হইবে। ভীম-সিংহ -গেহিনী সুবিখ্যাত পদ্মিনীর ন্যায় শৌর্য্য-গুণসম্পন্না পতিপ্রাণা রূপলাবণ্যবতী রমণী পতি-ব্রতাদিগের ইতিহাসমধ্যেই সমধিক প্রাপ্যা নহে। শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী পতিভক্তির অনুরাগে রামায়ণকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, পদ্মিনীর সতীত্ব-মাহাত্ম্য তাহা হইতে খর্ব্ব নহে। সাধ্বী স্ত্রীদিগের অনুকীর্ত্তন সময়ে তিনি অবশ্যই শ্রেষ্ঠা মধ্যে গণ্যা হইবেন। তদ্গুণ কথনে যে গ্রন্থের সাফল্য হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি? পরন্তু এ কথা কহিয়া আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণগরিমা খর্ব্ব করিতে মানস করি না। তিনি টড সাহেবকৃত ইংরাজী গল্পের কএক পৃষ্ঠা হইতে সুদীর্ঘ কাব্য বিরচিত করিয়াছেন; অতএব তাঁহার রচনাশক্তির প্রশংসা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপর ঐ রচনা যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে ও সুললিত ভাষায় বিকশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। সর ওয়ালটার স্কট্ নামা সুবিখ্যাত ইংরাজি কবি তাঁহার কাব্য সকলের আরম্ভে এক বন্দীকে কোন গৃহস্থের বাটিতে আনাইয়া তাহার মুখ হইতে আপন কাব্য সুব্যক্ত করেন। এই প্রকারে পুনরাবৃত্ত কথনে অনায়াসে পাঠকের মনোহরণ হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ দৃষ্টান্তের অনুসারে কোন সরোবর তীরে এক নবীন ভাবুকের নিকট জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণের মুখ হইতে পদ্মিনীর উপাখ্যান নিঃসৃত করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ অনুকরণের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে। ওয়াল্টার স্কট্ সাহেবের গায়ক

গৃহস্থের বাটীতে আহ্নিক সমাপন করিয়া সন্তপ্ত মনে হার্পযন্ত্র সাহায্যে আখ্যায়িকা করিতে আরম্ভ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাচীন ব্রাহ্মণ তৈলাক্ত দেহে ও নক্তক স্কন্ধে 'স্নানাশয়ে জলাশয়ে' আসিয়া অকৃতাহ্নিকাবস্থায় শতাধিক পৃষ্ঠা আখ্যান অনুকীর্ত্তন করেন ইহাতে কদাপি মনঃপ্রীতি জন্মে না। জঠরাগ্নির বিরুদ্ধে কালিদাসের কবিতাও রুচি-প্রদায়িনী নহে। ভগবান্ বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন যে রণক্ষেত্রস্থ যুদ্ধোন্মুখ অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবদ্গীতা শ্রবণ করাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে দৃষ্টান্তে মধ্যাহ্ন সময়ে কাব্যের অনুরোধে অকৃতাহ্নিক থাকা প্রিয়-কল্প বোধ হয় না। পরন্তু কল্পিত ব্রাহ্মণের ক্লেশে পাঠক মহাশয়দিগের অপরাহ্নে উক্ত গ্রন্থা-লোচনায় কোন মতে রসের হানি হইবেক না।

কবিদিগের এক প্রধান লক্ষণই এই যে সদ্ভাবকে উজ্জ্বল ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেন। ঐ ভঙ্গী সিদ্ধ করিতে কদাপি অর্থের কৌশল এবং কদাপি শব্দের কৌশল অবলম্বিত হয়। সাহিত্যকারেরা এই কৌশলদ্বয়কে অলঙ্কার শব্দে অভিধান করেন, সুতরাং অলঙ্কার দুই প্রকার প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কবিরা অর্থালঙ্কারকেই শ্রেষ্ঠ মানিতেন, এবং তাহার প্রয়োগেও তাঁহারা বিশিষ্ট নিপুণ ছিলেন। আধুনিক কবিরা তাহার বিনিময়ে শব্দালঙ্কারে অনুরাগী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কাব্যে অনুপ্রাস-যমকের সাহায্যে মনের পরিবর্ত্তে কর্ণের বিনোদ অধিক হয়। সহৃদয় ব্যক্তি-দিগের পক্ষে এ প্রথা কোন মতে আদরণীয় নহে, এই প্রযুক্ত তাঁহারা প্রাচীন কাব্যেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইহা উল্লিখিত করা বাহুল্য যে শব্দালঙ্কার সাবধানে স্থান বিশেষে প্রযুক্ত হইলে অতীব রমণীয় বোধ হয়, পরন্তু মনুষ্য-দেহের স্থানে স্থানে সদ্ভঙ্গীতে অলঙ্কার না দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আভরণে আচ্ছাদিত করিলে যে রূপ সৌন্দর্য্যের হানি হয়, সেই রূপ অবিবেচনায় কবিতার সর্ব্বত্র যমকের আবরণ হইলে রসের একান্ত ব্যাঘাত লইয়া থাকে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কবিদিগের যথার্থ প্রথা সাবধানে গ্রহণ করিয়া অর্থালঙ্কারের বাহুল্য প্রচার করিয়াছেন, তত্রাপি তাঁহার গ্রন্থে শব্দালঙ্কারের অভাব নাই। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত সংগৃহীত করিতে হইলে আমাদিগের পত্রে স্থানাভাব হইয়া উঠে, এই প্রযুক্ত পাঠকবৃন্দকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিতে হইল, তাঁহারা পদ্মিনী উপাখ্যান পাঠ করত অনায়াসে তাহার সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

সুরস নূতন ভাব বর্ণন করা আধুনিক কবিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর, তথাপি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বকীয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। একস্থানে তিনি শেখরাগ্রে সূর্য্য কিরণের নির্ম্মল-জ্যোতির বর্ণনে পরম চাতুর্য্যের সহিত লিখিয়াছেন, 'প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে।' বোধ হয় পাঠকবৃন্দ আমাদিগের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে এ উপমা অপুর্ব্ব বটে। অপর এক স্থানে পদ্মিনীর লজ্জার প্রশংসায় তিনি লিখিয়াছেন—

'কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা, মৃতপ্রায় পর পরশনে।

ইহাও অসাধারণ সুন্দর বলিয়া মানিতে হইবে। প্রভাতকালে চন্দ্রের মিলন হইবার কারণ বর্ণিত করিবার ছলে বন্দ্যোপাধ্যায় কবিত্ব করিয়াছেন—

'সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র সভায়। তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ শরমের দায়॥'

এবংবিধ অপরাপর অনেকগুলি পদ্য আমরা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি; পরন্তু এতদপেক্ষায় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব সুরস ভাষায় বিন্যস্ত করিতে প্রস্তাবিত গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষ, এবং তাহার পাঠে সহৃদয় ব্যক্তিরা অবশ্যই আনন্দলাভ করিবেন। গ্রন্থারম্ভে রাজপুতনার মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি মেখলায়।'

এই চরণ পাঠ করিবামাত্র কালিদাসের রচনা স্মৃতিপথে উদিত হয়। অপর একস্থানে ভীমসিংহের কারাবদ্ধাবস্থার বর্ণনে কবিবর লেখেন—

হেথা ভীমসিংহ রায় দেখিয়া স্বাক্ষর।
কিছুকাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর॥
মোহ ভঙ্গে পুনর্ব্বার বাড়িল যাতনা।
চক্ষে অশ্রু সহ শোভে ক্রোধ অগ্নিকণা॥
একি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘ দলে॥
মোহমেঘে ক্রোধ সৌদামিনী দেয় দেখা।
সেই হেতু জলে জ্বলে অনলের রেখা॥

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুললিতভাষাসম্পন্ন নহেন, কবিকঙ্কণের ওজোগুণও ইনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। অপর স্থানে স্থানে বিকট * কঠিন শব্দ ব্যবহৃত করিয়া রসেরও হানি করিয়াছেন, তথাপি রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার কাব্য সমাদৃত করিবেন; বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় ললনারা যে ইহার পাঠে পরিতৃপ্তা ও সদুপদেষ্টা হইবেন, সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের কাব্য লালিত্য প্রযুক্তই বিশেষ বিখ্যাত তদর্থে তাঁহাকে জয়দেবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অপর তিনি বাঙ্গালিভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বিরচিত করিয়াছেন মানিতে হইবে। কিন্তু কোন এক ব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ অবিকল চরিত্র বর্ণন করিতে তিনি বিশেষ সক্ষম হয়েন নাই। সুচিত্রকরেরা যে প্রকার বর্ণাদি দ্বারা কোন এক ব্যক্তির চিত্র প্রস্তুত করিলে তাহা সে ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহার অবিকল বোধ হয় না, তেমনি কবিদিগের গরিমা এই যে তাঁহাদের বাক্যদ্বারা তাদৃশ প্রতিরূপ চিত্রিত করিতে পারে, যাহা অভীপ্সিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহার বোধ হয় না। হোমর যে সকল যোদ্ধাদিগের বর্ণন করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বোধ হয়, একের বিবরণ অন্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ ব্যাসদেব অর্জ্জুন ও কর্ণ এবং ভীম ও দুর্য্যোধনকে বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, তথাপি একের বিশেষণ—অন্যে কদাপি সংলগ্ন হয় না। এই ক্ষমতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়; ইহার দ্বারা ঈশ্বরসৃষ্ট মানবমণ্ডলীর প্রত্যেকের কায়িক পার্থক্য লক্ষণ অনুকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতচন্দ্র এ ক্ষমতায় সম্পন্ন ছিলেন না। বোধ হয় কেবল মালিনী এবং সাধী মাধী ভিন্ন তাঁহার নায়ক নায়িকার কেহই এমত কোন লক্ষণ বিশিষ্ট পক্ষে যাহাদ্বারা তাহাদিগকে অন্য নায়ক নায়িকা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার বিদ্যাকে বিদ্যাবতী বর্ণিত করিবার ইচ্ছা করেন; অথচ সমস্ত কাব্যের এক স্থানেও তাহার বিদ্যাবতীত্ব প্রকাশিত হয় নাই। সুন্দরের বর্ণনায় সামান্য লম্পট ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উপলব্ধি হয় না।

এতদপেক্ষায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নায়ক নায়িকারা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার পদ্মিনীর চিত্র দেখিয়া কেহই অন্য স্ত্রীর সহিত তাহার সাম্য করিতে পারিবেন না। আক্ষেপের বিষয় এই যে কবিবর পদ্মিনীকে এক কদর্য্য পত্র লেখাইয়া সহৃদয়দিগের মনে বেদনা দিয়াছেন, নতুবা আমরা তাঁহাকে অনুপমা করিতে শঙ্কিত হইতাম না। সে যাহা হউক পদ্মিনী উপাখ্যান অন্নদা মঙ্গল হইতে লঘু হইলেও যে বঙ্গ কাব্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ মধ্যে গণ্য হইবেক ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রচলিত রীত্যানুসারে গ্রন্থকার মহাশয় আপন প্রবন্ধ কল্পনায় ছন্দঃ সকল অক্ষর গণনায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; তদন্যথায় সংস্কৃতবৃত্তি ছন্দঃসকল বৃত্তিগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিলে সংস্কৃতজ্ঞ দিগকে বিরস হইতে হইত না। পরন্তু তন্নিমিত্ত আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুযোগ করিতে

* ৬৮ পৃষ্ঠায় 'রবেলোক' শব্দ তাহার এক দৃষ্টান্ত।

পারি না। বৃত্তের অবহেলায় তিনি ভারতাদি সমস্ত বাঙ্গালি কবির অনুগামী মাত্র হইয়াছেন; তবে আমাদিগের এ স্থলের এ প্রসঙ্গ করার এইমাত্র অভিপ্রায় যে তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। সামান্য কথায় বলে 'লঘুগুরু যান না,' অথচ আমাদিগের কবিমাত্রেই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা কবিতা নিবন্ধন করেন। কেহই লঘুগুরুর অনুসন্ধান করেন না। এই অবিধির প্রতিকার করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সক্ষম। তাঁহার ছন্দ সকল যে প্রকার সাধু, এবং কাব্য রচনায় তিনি যে প্রকার সুপটু, ইহাতে আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারি যে তিনি চেষ্টা করিলে বাঙ্গালি ছন্দের অনেক উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আর অধিক লিখিবার স্থানাভাব; অতএব আমরা রাণা ভীমসিংহের উৎসাহ বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে ইত্যাদি"

কর্ম্মদেবী ঃ "রাজস্থানীয় সতী-বিশেষের চরিত্র"—"শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুকীর্ত্তিত"—৩০শে আষাঢ় ১২৭২ বঙ্গাব্দতে (১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতা হইতে ব্যাপটিষ্ট মিশন যন্ত্রে সি. বি. লুইস কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পদ্মিনী উপাখ্যানের ন্যায় ইহার আখ্যান বস্তুও কর্ণেল টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১১।

কর্ম্মদেবী প্রকাশিত হলে প্রতিভার বরপুত্র রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য সন্দর্ভ' মাসিক পত্রে উহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা করেন। সেই দুষ্প্রাপ্য সমালোচনাটি সংযোজিত হইল

"স্কালিজর, পণ্টেনসের গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাব্যের অধিকাংশই এক প্রকার বিকৃত বর্ণনাদ্বারা পরিপূর্ণ। যদি তাঁহার গ্রন্থ হইতে 'কমল' এবং 'পাটল' প্রভৃতি কতিপয় শব্দ পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।' বাঙ্গালা ভাষায় এখন যত কাব্য হইতেছে তাহাদের বিষয়ে এরূপ বলিলে, বোধ হয়, কিছু অন্যায় বলা হইবেক না; যেহেতুক অধুনা যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ কাব্য নামে প্রচলিত হইতেছে তাহার অনেকেই একপ্রকার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ফলে ইহা নিঃশঙ্ক হইয়া বলা যাইতে পারে যে এখন বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনা শব্দবিন্যাস মাত্র; দুই এক গ্রন্থের দুই এক স্থান ব্যতীত অন্যত্র কবির কবিত্বের পরিচয় পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। অর্থই বাক্যের শরীর; শব্দাদি অলঙ্কার স্বরূপ। সেই শরীরের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া অলঙ্কারের প্রতি যত্ন করা বুদ্ধিজীবি জন্তুর লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যের তাদৃশ আদর কেন? আর নলোদয়ের অনাদরই বা কেন? এই প্রকার আলোচনা করিলে অনায়াসে বোধ হয় যে নলোদয় শব্দের ঘটামাত্র; তাহাতে কাব্যের লেশ মাত্র নাই; এবং তন্নিমিত্তই তাহ শকুন্তলাদির তুল্য হইতে পারে নাই।

"আমরা যে গ্রন্থের সমালোচনে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই গ্রন্থ বর্ণিত দোষ হইতে নিতান্ত বিবর্জিত নহে। যাঁহারা ঐ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে গ্রন্থকর্ত্তা "নয়ন" "ইন্দীবর" "ভাতি" "ধরাসন" প্রভৃতি কতিপয় শব্দ মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছেন। পরন্তু ইহা আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে সম্প্রতি যে সকল কাব্য প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। কবিত্বের গৌরব ইহাতে প্রকৃত আছে; এবং বঙ্গভাষায় এরূপ কবিতা প্রচুর হইলে ভাষার উন্নতি স্বীকার করিতে হইবে।

"প্রস্তাবিত কাব্যের নায়কের নাম সাধু, নায়িকার নাম কর্ম্মদেবী, এবং প্রতিনায়কের নাম অরণ্যকমল।

"যশলমীরের অন্তঃপাতী পুগল-দেশে ভট্টিবংশসম্ভূত অনঙ্গ দেব নামে এক রাজা ছিলেন। অশেষ-গুণ-সম্পন্ন, মধুর প্রকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি, বীর্য্যশালী সাধু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। সাধু একদিন শ্রবণ করিলেন, যে মোগল পাঠান প্রভৃতি বণিক্‌দলেরা ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া বিপাশানদীতীরে অবস্থান করিতেছে। এই কথা শুনিবা মাত্র তিনি ক্রোধানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যবনেরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি দুর্দ্দশা করিয়াছিল, তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। 'কান্যকুব্জ' 'সোমনাথ' 'মধুপুরী' 'কালিঞ্জর' প্রভৃতিকে যবনেরা ভগ্নাবশেষ করিয়াছে, এই দুঃখ তাঁহার মনে নবীকৃত হইয়া উঠিল। তিনি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া বিপাশা-নদীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং যবনদিগকে পরাভূত করিয়া ভারতভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

"সাধু গৃহে প্রত্যাগমন-সময়ে ঔরিন্ট নগরাধিপ মাণিক্যদেবের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কন্যার নামই কর্ম্মদেবী। কবির বর্ণনানুসারে কর্ম্মদেবী ধীর প্রকৃতি নহেন। ইনি প্রগল্‌ভা ও উদ্ধতা। কর্ম্মদেবীর বয়স ষোড়শ বৎসর। তিনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন। তিনি পিতার একমাত্র দুহিতা। রাঠোররাজ অরণ্যকমলের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছিল, কিন্তু অরণ্যকমলের প্রতি কর্ম্মদেবীর কিছু মাত্র অনুরাগ ছিল না। তিনি সাধুর রূপ ও গুণ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমোহিত হইলেন, ও বিহার উদ্যানে সখীগণ সমক্ষে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, সে হয় সাধুকে পতিত্বে বরণ করিবেন, নয়—

'যদি অন্যে হয় স্বামী, জীবন ত্যজিব আমি, অথবা ত্যজিব নিকেতন।
বিজন বিপিন মাঝে, ভ্রমিব যোগিনী সাজে, ভবব্রত করিব উদ্যাপন ॥
আত্মহিত যজ্ঞ ভাঙ্গি, সাধুর মঙ্গল মাঙ্গি, দিবানিশি করি যাপন।
বনচারী মৃগদল, নাহি জানে কোন ছল, তারা হবে সহচরগণ ॥
বলিতে বলিতে কথা, বাড়িল মনের ব্যথা মূর্চ্ছাগত পতিতা ধরায়।'

"সখীগণ, কর্ম্মদেবীকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিল। সাধু প্রদোষবায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে উদ্যান-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক শশব্যস্ত সখীগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সখীগণ কুমারের সহিত বিশ্রম্ভালাপ আরম্ভ করিল। কতকক্ষণ পরে কর্ম্মদেবী সচেতন হইলেন। ইতিমধ্যে শারিকা নামে এক সখী কুমারকে উপহাস করিয়া বলিল—

'কেমন এ বীরধর্ম্ম বুঝিতে না পারি। চিত্ত চুরী করিলে হে করিলা মোহিতা ॥
কোথা শৌর্য্য? বীর হয়ে চৌর্য্য অধিকারী? সাধু কন বীরধর্ম্ম আছে কি না আছে।
অবলা সরলা বালা ঠাকুর-দুহিতা। রজনী প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে ॥'

এই কথা বলিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে সাধু বলীচক্রে দিগন্তপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা সকলকে পরাজিত করত আপনার অলৌকিক বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সকলের নয়নানন্দ হইলেন।

'এমন সময়ে দেখ অপূর্ব্ব ঘটনা। ধর ধর রাজপুত্র এ কুসুম-হার।
হেম থাল করে এক নবীনা ললনা ॥ কুমারী শ্রীকর্ম্মদেবী-কৃত পুরস্কার ॥
কুসুমের মালা তাহে শোভে মনোহর। দেখাইলে রঙ্গ ভূমে শিক্ষা চমৎকার।
ধীরে ধীরে গতি করে যথা বীরবর ॥ তব যোগ্য পুরস্কার কিবা আছে আর ॥
তুরঙ্গ রাখিল সাধু প্রমদা নিরখি। করিলেন সমর্পন পাণি সহ প্রাণ।
কহিতে লাগিল কথা কুমারীর সখী ॥ এই কুসুমের হার তার অভিজ্ঞান।।

"রাজকুমার এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

'শুন শুন সভাস্থ সমস্ত জনগণ।
কর্ম্মদেবী-দত্ত এই মালা সুশোভন॥
সরলা ভূপতি-বালা আমারে বরিলা।
অযাচিত ধন-দানে কৃতার্থ করিলা॥
কিন্তু এই নিবেদন শুন সহচরী।
—মালামাত্র শিরে ধরি পরি॥
যথা বিধি বিবাহের যদি পাই টীকা।
তবে সে বরিতে পারি ভূপতি-বালিকা॥'

"এই ব্যাপার দেখিয়া কত লোক কত কথা কহিতে লাগিল। অরণ্যকমলের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল, সুতরাং মাণিক্য-দেবের ইচ্ছা ছিল না, যে সাধুর সহিত কর্ম্মদেবীর পরিণয় হয়। কিন্তু কুমারীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। বর-বধূ সুখে কালাতিবাহন করিতেছেন, এমন সময়ে অরণ্যকমলের পত্র আসিল। অরণ্য-কমল এই পত্রে সাধুকে ভর্ৎসনা করিয়া, যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। সাধু পত্রের প্রত্যুত্তর দিলেন, এবং কর্ম্মদেবীর সহিত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে চণ্ডনা-নদীতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সাধু পরাজিত হইলেন, এবং অরণ্যকমলের অস্ত্রাঘাতে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। রাজকুমারী শোকে অধীরা হইয়া জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিলেন। যে স্থানে এই হৃদয়-বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা 'কর্ম্মসরোবর' বলিয়া বিখ্যাত হইল।

"কবি এই বিষয় উপলক্ষণ করিয়া আপনার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সাবধান হইয়া পাঠ করিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি? কর্ম্মদেবী পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কখন বা ললিত ও মধুর রচনা বীক্ষণ করিয়া হৃদয় বিস্ময় বিকসিত হইয়াছে; কখন বা বীর্য্যোদ্ধত প্রণয়-সুকোমল বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অন্তরাত্মা অননুভূতপূর্ব্ব পরস্পর বিরোধি ভাব সমূহে বিলোড়িত হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া কত শতবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। যিনি ক্ষণকালের জন্যও আমাদের মনে এইরূপ ভাব উদ্রিক্ত করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকে সহস্র সহস্র সাধুবাদ প্রদান করি। যতক্ষণ আমরা কর্ম্মদেবী পাঠ করিয়াছি, অন্ততঃ ততক্ষণ হৃদয় এই দুর্দগ্ধীকৃত সংসার হইতে আনীত হইয়া কোন এক রম্য উপবনে সুখ সঞ্চরণ করিয়া অমৃত হ্রদে অবগাহন করিয়াছে। আমরা যাহা বলিলাম তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমরা অনুরোধ করি, যে সহৃদয় পাঠকগণ কর্ম্মদেবী আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। তাহাতে নিশ্চয় জানিবেন যে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

"প্রস্তাবিত কাব্যের প্রশংসানন্তর সমালোচনের ধর্ম্মরক্ষার্থে তাহার দোষেরও কিঞ্চিৎ বর্ণন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে তদ্বিষয়ে এগ্রন্থে তাদৃশ অবকাশ নাই, কেবল এক বিষয়ের আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব; তাহা বিশেষ উৎকট নহে তত্রাপি তাহাতে গ্রন্থকারের দৃষ্টির হানি হইয়াছে, মানিতে হইবে। ছন্দোময় কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থল বিশেষে কি প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ করিলে কাব্য উত্তম হইতে পারে ইহা কবির নিরূপণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা দ্বারাই কবির কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইবে যে যেখানে বীররস বিষয়ক কাব্য বলিতে হইবেক সেই স্থলে তদুপযুক্ত বীর্য্য বিশিষ্ট ছন্দঃ প্রয়োগ করাই উচিত। আদিরস বিষয়ক বর্ণনা করিতে হইলে বীররসের ছন্দঃ তথায় প্রয়োগ করা কোন মতেই পরিপাটী হয় না। স্ত্রীলোকের কথোপ-কথন স্থলে দীর্ঘ দীর্ঘ ছন্দঃ প্রয়োগ করা যথার্থ কবির লক্ষণ নহে। তাহা হইলে কাব্যের অপকর্ষ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে,

আর কবিরও মানের হানি হয়। আমরা ভবভূতিকে একজন মহাকবি বলিয়া জানি। যে ব্যক্তি তাঁহার উত্তরচরিত, বীরচরিত, মালতীমাধব পাঠ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার কবিত্ব গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মহাকাব্যেরও অনেকস্থলে আমরা নিন্দা করিয়া থাকি। তিনি মালতীমাধব মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের মুখ হইতে এমনি সমস্ত পদ ও কঠিন কঠিন শব্দ বিনির্গত করাইয়াছেন, যে বড় বড় বিদ্বান্ লোকের মুখ হইতেও সে প্রকার শব্দ ও পদ নির্গত হওয়া সম্ভব নহে। শ্রীহর্ষ এ বিষয়ে ভবভূতি অপেক্ষা প্রশংসনীয়। তিনি আপন রত্নাবলীর প্রাকৃতে তাহার বিশেষ নিদর্শন দিয়াছেন। তথায় স্ত্রীলোকের মুখ হইতে যে প্রকার কোমল মধুর শব্দ নির্গত হওয়া উচিত, কবি তদ্বিষয়ে যতদূর করিতে পারেন করিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন রত্নাবলী বিলাপ করিয়া আপনার দুঃখ আপনাকে জানাইতেছেন, সেই সময়ে কবি শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে, যে প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, সংস্কৃতজ্ঞ কোন্ ব্যক্তির তাহা অবিদিত আছে? কালিদাসের এ বিষয়ে কথাই নাই।[c] বিলাপের সময় কি প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিয়া সকলে বিলাপ করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার অজ-বিলাপ আর রতি-বিলাপেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই দুইস্থল পাঠ করিতে করিতে বোধ হয় যেন কোন মর্ত্ত্য যথার্থই বিলাপ করিতেছে, তাহা কবির রচনা নহে। যদি কালিদাস অজ-বিলাপ আর রতি-বিলাপের সময় সেই প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ না করিয়া শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত প্রভৃতি দীর্ঘ দীর্ঘ ছন্দঃ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে কখনই কথিত দুই বিলাপের এত সমাদর হইত না। পরন্তু কালিদাস প্রভৃতির কথায় প্রয়োজন কি? আমাদের ভারতচন্দ্র ছন্দঃপ্রয়োগ বিষয়ে সামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার দক্ষযজ্ঞ-নাশ ও রতি-বিলাপ, এই দুই স্থলের ছন্দঃ পাঠ করিলে বোধ হয় যেন প্রকৃত কেহ সেই সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি তিনি রতিবিলাপের সে প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ না করিয়া দক্ষযজ্ঞ নাশের ছন্দঃ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই তাঁহারা প্রশংসা করিতাম না। ফলে শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই, এবং কোন কোন স্থলে তিনি শৃগালের গর্ত্ত হইতে বৃহদাকার গজেন্দ্র বহিষ্কৃত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের উক্তিস্থলে যে প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার স্থানে অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়াছে! সাধুর মরণের পর কর্ম্মদেবী খেদ করিয়া তাঁহার সহোদরকে কহিতেছেন—

> কপোতিনী কপোত ধিয়ায়, হায়! বিধি আনি মিলাইল তায়।
> হইতে না হইতে মিলন সুখ, ঘটিল বিরহ ঘোর দায়॥
> কোথা থেকে আইল নিষাদ ক্রূর, কপোত মারিল বিষবাণে।
> কাতরা কপোত বধূ বিরহের বাণে কিবা আশ্বাস পরাণে॥

"সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাপ স্থলেএরূপ ছন্দঃ প্রয়োগ উচিত কি-না। ভারতচন্দ্রের রতি বিলাপের ছন্দের সহিত ইহার তুলনা করিলে কত অন্তর হইবে, তাহা যাঁহারা এই দুইস্থল পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তিনিআরও একস্থলে যেখানে সাধু সংগ্রাম সজ্জা করিয়া কর্ম্মদেবীর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছেন, সেইখানে—

> 'আইলা বিধুমুখী বিদায় লইতে তব কাছে হে।
> নিবেদন তব প্রতি আমার আর কি বল আছে হে॥

এইরূপ ছন্দঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা কোন মতেই উচিত নহে। ইহাতে করুণা রসের

কিছুমাত্র উদ্রেক হয় নাই। বিশেষতঃ এরূপ স্থলেই বারম্বার 'হে' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া রসের হানি করিয়াছেন।

"আর কয়েক স্থানেও ছন্দের অনুপযুক্ততা দৃষ্ট হয়। আর নায়িকার স্বভাব রাজস্থানীয় স্ত্রীলোকের মত সকল স্থলে বর্ণিত হয় নাই। কোন কোন স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার স্বদেশীয় মহিলাগণের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু সমুদায়ে বিবেচনা করিলে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি গ্রন্থখানি কমনীয় হইয়াছে।"

১০. **শূরসুন্দরী**ঃ "রাজস্থানীয় বীরবালা বিশেষের চরিত্র"। ১লা আশ্বিন ১২৭৫ বঙ্গাব্দ। (১৬ই নভেম্বর ১৮৬৮ খৃঃ) তারিখে ব্যাপটিষ্ট মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে এক হাজার কপি মুদ্রিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬।

শূরসুন্দরী প্রকাশের পর রমেশচন্দ্র দত্ত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' বাঙ্গালা সাহিত্যের যে মনোজ্ঞ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন তাতে রঙ্গলালের কাব্যগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে লিখেছিলেন :—

"Rangalal Banerjea is a living poet and a Deputy Magistrate, and has written three spirited poems on Episodes from Rajput history. His পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী and শূরসুন্দরী are full of spirited description of war and heroism. No authentic history perhaps affords to the poet such stirring tales of heroism and valour as that of Rajasthan and our poet has served his country well by embalming passages from the annals of Rajasthan in admirable verse."

কোনও কোনও সমালোচক রঙ্গলালের কাব্যগুলির আলোচনায় তাঁকে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির আসন প্রদান করেছিলেন। 'কলিকাতা রিবিউ' নামক সুবিখ্যাত ত্রৈমাসিকে 'শূরসুন্দরী'রও (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে) একটি বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অনুমান করেন, সমালোচনাটি ডব্লিউ. এস. সীটনকার লেখনী-কৃত। সমালোচনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হল।

"Babu Rangalal Banerjee is one of the best Bengali writers of the day; and though he has written a great deal in prose, is chiefly known as poet. And he is no mean poet. Indeed to our mind, he is perhaps *the first Bengali poet of the day*. We are aware of the claims of Mr. M. M. S. Dutta, whom we remember to have been styled the "Milton of Bengal." It reminded us of the incident, when Coleridge, the poet and metaphysician, heard Klopstock, the author of the "Messiah" called the German Milton. 'Yes a *very* German Milton,' replied Coleridge. Not that we deny merit to Mr. Dutta as a poet, his powers are undoubtedly great. But he is such a Tartar in the field of Bengali literature, that he is bound by no laws and rules whatever, but deems himself superior to them. Such license may be allowable in super-human geniuses like Goethe and Shakespeare; but in a poetaster like

Mr. Dutta, it is simply intolerable. Mr. Dutta is wild, irregular, eccentric; Babu Rangalal is neat, elegant, and idiomatic. A great fault in Mr. Dutta is—and it is a very vulgar fault—that he tries to pick out all the hardest words in the dictionary. The practice of all great poets, like Wordsworth and Tennyson, is just the opposite, they use the most common, simple and familiar words. Mr. Dutta never writes Bengali poetry, one would suppose, without having Amarkosh or Wilson's Sanscrit Dictionary before him.

"Rangalal Banerjea's muse derive, inspirtion, it seems, chiefly from Colonel Tod's **Annals of Rajasthan.** Some years ago he favoured us with the elegant poem of **Padmini-Upakhyan**, a tale of Raiput story; and now he presents to his countrymen the **Sura Sundari**, a tale founded on an incident of the same story. The story lies in a nutshell. The Emperor Akbar was fond of Rajput ladies, the chief of his *harem* being Yodha, the sister of Maun Sing, once the Viceroy of Bengal. Akbar heard of the beauty of *Sati* the wife of *Prithvi*, brother of the Raja of Bhikanir and wanted to have her. With this view he got up a *nourojah* or Fancy Fair, at which all the beauties of his vast empire assisted. *Prithvi's* wife, peerless in beauty, "a very incarnation of feminine grace," was of course there. As gentlemen were not permitted to be present at the Fair, Akbar assumed the disguise of a *Yogi*, who, on account of his sanctity, is allowed access everywhere. But the plans of the imperial Yogi were disconcerted by his beloved consort Yodha, whom jealousy instigated to assume the disguise of a Yogini and to follow in the wake of her husband. Akbar, however happening to meet *Sati* alone, used every sort of entreaty. *Sati*, true to her name, repels him, and he retires completely baffled. The story is well conceived, the images select, and the description natural. Our poet has a minor fault, however, which he would do, well to correct. Babu Rangalal Banerjea is a little too fond of alliteration—the besetting sin of Bengali poets An alliteration here and there is pleasing; but an excessive use of it grates upon the ear. Witness the following from page 4—

Dillir dordanda darpa dipta das disi and similar examples might be quoted from almost every page. We are aware that Babu Rangalal Banerjea's countrymen are fond of excessive alliterations, but he

should aim at imparting to them a juster and a more refined taste. Not withstanding this, and some other faults which might be pointed out, the *Sura Sundari* is on the whole, a choice and successful poem."

১১. **কাঞ্চীকাবেরী :** "উৎকল-দেশীয় বীর-রসাত্মক আখ্যান বিশেষ। বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত।" কাঞ্চিকাবেরী কাব্যের ভূমিকায় মুদ্রিত হয়েছে কটক, ২০শে কার্ত্তিক ১৭৯৯ শকাব্দা (১২৮৪ বঙ্গাব্দা) কিন্তু মুদ্রাকরের বিবৃতিতে দেখা যায় যে, কলকাতার শশীভূষণ দাস দ্বারা গণেশ যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকখানি বি. মিত্র এ্যাণ্ড কোং কর্তৃক ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে (১২৮৬ বঙ্গাব্দা) প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি রচনার বেশ কিছুদিন পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এটির প্রকাশ সময়ে কলকাতা গেজেটে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল," "An epic poetory from the history of Orissa. Gives much legendary, mythological and antiquarian information regading that province"

এই গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় কবি তাঁর গ্রন্থ বিষয়ে তথ্যাদি উল্লেখ করেছেন। তিনিই প্রথম বাংলা এবং উৎকল সাহিত্যের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করেন। কাব্যটির সমাদর এখনও আছে। সম্প্রতি এর নব মূল্যায়ন হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় "কাঞ্চীকাবেরী"র এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এতে উড়িয়া এবং বাঙ্গালা দুই ভাষায় কাব্য দুইখানিই এক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। টীকা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও প্রকটিত হয়েছে।

এছাড়া সম্প্রতি (Dec. 1973) পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সম্মেলনে প্রকাশিত 'Souvenir'-এ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কাঞ্চীকাবেরী' সম্বন্ধে বলেছেন :

"The very scholarly edition of a 17th century Oriya poem on the romantic story of **'Kanchi Kaveri'** in Bengali characters,...of Rangalal Benerji's Bengali Epic—the **'Kanchi-Kaveri'**, all done by Prof. Sukumar Sen.

১২. **উষা :** "মারবর দেশীয় উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।" কাব্যখানি রচনা কাল এখনও নির্ণিত হয় নাই। কবির জীবিতকালে এটির প্রকাশ ঘটে নাই। শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহ" (ভাদ্র, ১৩৬১ সাল)-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। যদিও কাব্যখানি সম্বন্ধে শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কিছু মন্তব্য করেন নাই তবুও পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হয় কাব্যখানি অসম্পূর্ণ অথবা পাণ্ডুলিপির শেষের দিকের পাতা হারাইয়া গিয়াছে। শিবলাল বাবু কাব্যখানির কিছু কিছু পঙক্তিতে সকপোল কল্পিত শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ফলে মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই কোন সঙ্গতি নাই। এই সঙ্কলনে তাহা সংশোধিত হইল।

১৩. **ভেক মূষিকের যুদ্ধ :** গ্রীক্ সাহিত্যে Batrachomyomachia নামে একটি অতি প্রাচীন উপকাব্য আছে। এই উপকাব্যখানি এক সময়ে মহাকবি হোমারের রচনা বলিয়াই অনেকে ধারণা করতেন কিন্তু এখন এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। পেন নাইটের মতে এই উপকাব্যখানি সুইডাম ও প্লুটার্ক পাইগ্রেস নামে একজন গ্রীসদেশীয় সুকবির রচনা। আলোচ্য রচনাটি তাহারই অনুবাদ। তিন সর্গে সম্পূর্ণ এই উপকাব্যখানির অনুবাদ প্রথমে এডুকেশন গেজেটে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৮ খৃঃ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত

হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩। সুকবি ডাক্তার টমাস পার্ণেল এই উপকাব্যখানির সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং কাব্যখানির নাম দেন Battle of the Frog and Mice। এই অনুবাদিত উপকাব্যখানিই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম বীররসাত্মক-ব্যঙ্গ-কাব্য। ইহার পর বৎসর পরে জগদ্বন্ধু ভদ্রের "ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য" ১৮৬৮ রচিত হয়েছিল।

১৪. **কুমারসম্ভব**ঃ মহাকবি কালিদাসের "কুমারসম্ভব" কাব্যের বঙ্গানুবাদ। আলোচ্য পুস্তকে কবিবর মূল কাব্যের প্রথম সাতটি সর্গ এবং ১লা ভাদ্র ১২৭৯ সাল (১৬ইনভেম্বর ১৮৭২ খৃঃ) হইতে অষ্টম সর্গের সন্ধ্যা বর্ণনাটি অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি শ্রীরামপুর শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলফ্রেড যন্ত্রে মুদ্রিত ও কবিবর কর্তৃক হুগলী হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৯। তাঁর আগে আর কেউ এই কাব্যের বঙ্গানুবাদ করেন নাই।

২৮শে নবেম্বর ১৮৭২ সালে 'কুমার সম্ভব' সমালোচিত হয় 'হিন্দু গেজেয়েট পত্রে।

"No contemporary Bengali poet is better known to his countrymen than Babu Rangalal Banerji. His *Karmadevi* and *Surasundari* are familiar as house hold words in every part of the country, and for elegance of diction, playful imagery, and rich flow of language have been generally accepted as models of Bengali compostion. If at times they fail to attain the sweetness of Bharat Chandra, they are nowhere disfigured by the low thoughts. commonplace ideas and the disgusting licentiousness which prevail in the works of the laureate of Krishna Chandra. Written by an accomplished well-educated scholar, whose taste has been cultivated by perfect familiarity with the classics of India on the one hand, and the literature of England on the other, they blend the luxnriance of the east with the chastity of the west, and ofter a rich treat to the lover of the truly beautiful. As original compositions founded on the mediaeval legends of Rajasthan, delineating the highest moral, mental and physical qualities of the noblest specimens of the Hindu race, they have, besides, a peculiar charm for Indian readers. who cannot contemplate the glories of their solar line without feeling a sort of reflex light being thrown on themselves. The work whose title heads this notice has not this recommendation in its favor, as its heroes are divine personages, and not men ; it lacks likewise. the charm of originality, as it is only a translation ; but these drawbacks are amply compensated by the halo which surrounds the glorious name of Kalidasa, the greatest poet of the Augustan age of Sanskrit literature, and which is by itself enough to touch the most sympathetic chord in the hearts of Hindu readers. Nor are the intrinsic merits of the translation by any means secondary. The rendering is

throughout as close as the idioms of the two languages will admit of, and the attempt to preserve the spirit that intangible something which forms the soul of poetry and which so freqently vanishes altogether in the process of translation—has in many places proved highly success. sful much more so than in Mr. Griffith's "Birth of the War God." Doubtless the latter had to contend against a serious difficulty—the extremely dissimilar character of the English and Sanskrit languages, and the difference of taste in the class of readers for whom his book was designed ; while the former had to deal with a Sanskritic dialect in which the words of the original may be, and have often been ; transferred bodily without any alteration. and an audience whose taste and sympathies are all on the side of the original ; still the task was one which none but a person of high poetical taste and thorough mastery over the two languages could grapple with any prospect of success. And we have great pleasure in recording our opinion that the success in the present venture is great. We are glad too to notice that the translator has worked only on the first seven cantos of the Kumara, and rejected the apocryphal sequel which never issued from the pen of Kalidasa. We must add, however, that chaste, elegant and faithful as the rendering is, it is at times too thorough a reproduction of the phraseolgy of the original to be easily intelligible to the ordinary Bengali reader, and it can look to a small circle of well educated people for appreciators. Had the author adopled an easier style, and more popular and simpler words, he would have perhaps sacrificed a little of his classical purity, but at the same time secured a much wider circulation for his work."

—'Hindoo Patriot'– 18. 11. 1872.

১৫. **মেঘদূত ঃ** মহাকবি কালিদাসেরই "মেঘদূত" কাব্যের বঙ্গানুবাদ। কাব্যটির অনুবাদ রঙ্গলাল কবে করেছিলেন তা জানা যায় না। শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহ"-এ প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৬. **ঋতু সংহার ঃ** মহাকবি কালিদাসের 'ঋতু সংহার" কাব্যেরই বঙ্গানুবাদ। কবিবর কোন্ সময়ে কাব্যটির অনুবাদ করেছিলেন তাহা সঠিক বোঝা যায় না। কারণ ১৮৫১ খৃঃ ৮ই মার্চ সংবাদ প্রভাকরে যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল তাহা এইরূপ :— "ঋতু সংহার"। মহাকবি কালিদাস প্রণীত ঋতু সংহার যাহা মৎকর্ত্তৃক বঙ্গীয় পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা অবিলম্বে মুদ্রিত হইয়া প্রকটিত হইবেক। শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।" কিন্তু পুস্তকখানির প্রকাশের কোন সংবাদ কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। অবশ্য এই কাব্যের-

অন্তর্গত "শরৎ-বর্ণন" কবিতাটি "মানসী"তে (৩য় বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৮ সাল) প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহে"ই সম্পূর্ণ কাব্যটিকে প্রথম দেখিতে পাই।

১৭. **নীতি কুসুমাঞ্জলি :** বিভিন্ন হিতকথার মর্ম্মানুসারে রচিত খণ্ড কাব্য। কোন বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে এগুলো লিখিত নয়। ১২৮২ সালের পৌষ হইতে চৈত্র পর্যন্ত এই চার মাসের বঙ্গদর্শনে ২০২ টি এই খণ্ডকাব্য "নীতি কুসুমাঞ্জলি" নামে প্রকাশিত হয়। রঙ্গলাল এগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন নি। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত "রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী" হিতবাদী সংস্করণে (১৩১২ সালে) প্রথম প্রকাশিত হয়।

৮. **ইউরোপ ও এস্যাখণ্ডস্থ প্রবাদমালা :** এই বইটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু প্রথম খণ্ডের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। দ্বিতীয় খণ্ডটি ৯৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি গদ্য-গ্রন্থ। ১৫ই নভেম্বর ১৮৬৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড জেমস্ লং কর্তৃক সংগৃহিত বিভিন্ন ভাষার প্রবাদ বচনের মর্মানুবাদের বাংলা সংস্করণ।

—সনৎ কুমার গুপ্ত

সমাপ্ত